বাঙলা কাব্যসংগীত-আলোচনার পথিকৃৎ
প্রখ্যাত সংগীত-সমালোচক
শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র
শ্রদ্ধাস্পদেষু

নিবেদন

বাঙলা কাব্যসংগীত সম্পর্কে আগ্রহ গত দুতিন দশক ধরে যতটা বেড়েছে, কাব্যসংগীতের ইতিহাসসম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ ও অনুশীলনের সুযোগ ততটা বাড়েনি। কাব্যসংগীতে বাঙালির প্রীতি ও সংস্কার সহজাত; কিন্তু পথিকৃৎ বা অতীত পদচারীদের সম্পর্কে নিস্পৃহতা বা ঔদাসীন্যও মজ্জাগত। এই বিষযে স্বনামধন্য গবেষক ও সংগীতরসিক শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র দীর্ঘকাল ধরে বিচিত্র অজ্ঞাত তথ্য আমাদের পরিজ্ঞাত করেছেন। আরও অনেক গবেষক ও সংগীত-সমালোচক নানা ধরনের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের কাব্যসংগীত সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্যের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এই বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখা গেছে অজস্র গ্রন্থ অসংখ্য পুস্তিকা বিচিত্র বিপুল তথ্যাদি আজও নেপথ্যের নীরব ধূলিশয্যায় পড়ে আছে। সুরের সঙ্গে একদা যা বহুশত শ্রোতার মনোরঞ্জন করেছিল, সুর ও স্মৃতি হারিয়ে তাদের কাব্যসম্পদহীন পাঠ আজ গবেষক ও অনুসন্ধিৎসুর নাগালের বাইরে যাওয়ার উপক্রম। বর্তমান গ্রন্থ সেই লুপ্ত ইতিহাসের কিছুটা পুনরুদ্ধার ও বিষয়গত বিশ্লেষণের প্রযাস। সেইসঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে একটি পরিণত সর্বাঙ্গীণ সাহিত্যিক বিশ্লেষণ—কাব্যসংগীতের আদর্শেই।

বিষয়টি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাপত্র হিসেবে অনুমোদিত হয়েছিল কয়েকবৎসর পূর্বে আমার অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর নির্দেশনায়। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদার গবেষণা-পত্রটির প্রশংসা করেছিলেন এবং লেখককে বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডি উপাধির জন্য সুপারিশ করেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বাঙলা কাব্যসংগীত সম্পর্কে এমন একটি 'কোষগ্রন্থ' রচনার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। বর্তমান গ্রন্থটি সেই গবেষণাপত্রের মুদ্রণ নয়, এটি প্রায় স্বতন্ত্র গ্রন্থ, তবে সেই গ্রন্থের উপকরণ এতে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। আজ অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক মজুমদার উভয়েই লোকান্তরিত। তাঁদের আশীর্বচন এবং আমার নির্দেশক অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর শুভাশিস নিয়ে এই গ্রন্থ পাঠকসমাজের কাছে তুলে দিতে পেরে কৃতার্থ। গ্রন্থপ্রকাশের ব্যাপারে আমার সর্বক্ষণের নির্দেশক ও দীক্ষাগুরু অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যের শুভৈষাও আমাকে উদ্দীপ্ত করেছে। এই সুদীর্ঘ গ্রন্থ প্রকাশে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় দায়িত্ব গ্রহণ করায় কর্তৃপক্ষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। শ্রমসাধ্য নির্ঘণ্ট রচনার দাবি সানন্দে পূরণ করেছেন শুভানুধ্যায়ী শ্রীদেবকুমার বসু।

অরুণ বসু

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা ৭

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব : উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যসংগীত

দ্বিতীয় পর্ব : রবীন্দ্রসংগীত

প্রথম পর্ব ঃ
উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যসংগীত

কী জাদু বাঙলা গানে,
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা ॥

কথামুখ

১

'কথা জিনিষটা মানুষেরই আর গানটা প্রকৃতির। কথা সুস্পষ্ট এবং বিশেষ প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, আর গান অস্পষ্ট এবং সীমাহীনের ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধমালার 'শ্রাবণসন্ধ্যা' নামক রচনায় বলেছেন যে, সেইজন্যে কথায় মানুষ মনুষ্যলোকের এবং গানে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মেলে। গীতিকাব্যের অশ্রুত সুরস্পন্দ আনন্দবোধের সহৃদয় উপলব্ধিতে সমাহৃত, আর গানের সুর শ্রুতির মাধ্যমে রাগরাগিণীর আশ্রয়ে সীমাহীনতায় বিস্তৃত। গীতিকবিতার রস পাঠ্য, গানের রস শ্রাব্য। গীতিকবিতা কবির অন্তর-পুরুষের অনন্যতাকে পাঠকের চিত্তে সঞ্চারিত করে দেয়, গান তাকে বিশ্বভুবনে বিস্তীর্ণ করে দেয়। এইজন্য কথার সঙ্গে মানুষ যখন সুরকে জুড়ে দেয়, কবির ভাষায়, তখন 'সেই কথা আপনার অর্থকে আপনি ছাড়িয়ে গিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যায়—সেই সুরে মানুষের সুখদুঃখকে সমস্ত আকাশের জিনিস করে তোলে, তার বেদনা প্রভাতসন্ধ্যার দিগন্তে আপনার রঙ মিলিয়ে দেয়, জগতের বিরাট অব্যক্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি বৃহৎ অপরূপতা লাভ করে, মানুষের সংসারের প্রাত্যহিক সুপরিচিত সংকীর্ণতার সঙ্গে তার ঐকান্তিক ঐক্য আর থাকে না।'

ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্যে প্রতীচ্য কাব্যের যে সকল আদর্শ গৃহীত ও প্রতিষ্ঠিত হয়, গীতিকবিতা তার মধ্যে একটি। শব্দটি সদ্যোলব্ধ হলেও যে মন্ময় কাব্যবন্ধকে গীতিকবিতা বলা হয়, তার আদর্শ বাঙলা সাহিত্যে পুরাতন। অথচ কবিতার অঙ্গ থেকে পূর্বজন্মের সংস্কারের মত সুর খসে গেলেও কবিতা না বলে গীতিকবিতা শব্দটি কেন ব্যবহৃত হল? বীণা-যন্ত্রের সঙ্গে গেয় ছিল বলে বিদেশী সাহিত্যে 'লিরিক' শব্দটি গড়ে উঠেছিল, সেই যন্ত্রসম্পর্ক-ব্যতিরেকেই এখন যার পঠনীয় রূপ স্থিরনির্দিষ্ট, বাঙলা সাহিত্যে ভাব আদর্শেই গীতিকবিতা শব্দটি তৈরি হয়েছে। গীতিকবিতা আধুনিক কালে কেবলই কবিতা, গান নয়। তথাপি গান ও গীতিকবিতার মধ্যে কোথাও সূক্ষ্ম সাদৃশ্যও আছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর একটি প্রবন্ধে এই বিষয়ে মনোজ্ঞ ও স্বল্পাক্ষর আলোচনায় বলেছিলেন—

"গীত মনুষ্যের এক প্রকার স্বভাবজাত। মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু কণ্ঠভঙ্গিতে তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। ...এই স্বরবৈচিত্র্যের পরিণামই সংগীত। সুতরাং মনের বেগ প্রকাশের জন্য আগ্রহাতিশয্যপ্রযুক্ত, মনুষ্য সংগীতপ্রিয়, এবং তৎসাধনে স্বভাবতঃ যত্নশীল।

কিন্তু অর্থযুক্তবাক্য ভিন্ন চিত্তভাব ব্যক্ত হয় না, অতএব সংগীতের সঙ্গে বাক্যের সংযোগ আবশ্যক। সেই সংযোগোৎপন্ন পদকে গীত বলা যায়।

গীতের জন্য বাক্যবিন্যাস করিলে দেখা যায় যে, কোনো নিয়মাধীন বাক্য-বিন্যাস করিলেই গীতের পারিপাট্য হয়। সেই সকল নিয়মগুলির পরিজ্ঞানেই ছন্দের সৃষ্টি।

গীতের পারিপাট্যজন্য আবশ্যক দুইটি—স্বরচাতুর্য এবং শব্দচাতুর্য। এই দুইটি পৃথক পৃথক দুইটি ক্ষমতার উপব নির্ভর করে। দুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। যিনি সুকবি তিনিই সুগায়ক, ইহা অতি বিরল।

কাজে কাজেই, একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করেন। এই রূপে গীত হইতে গীতিকাব্যের পার্থক্য জন্মে। গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দো-বিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক, এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল; অগেয় গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল।

অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য"।[১]

বঙ্কিমচন্দ্র গান ও গীতিকবিতার মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করলেও সে পার্থক্য নির্দেশ করেননি, বরং নিয়মাধীন ছন্দোবদ্ধ বাক্যবিন্যাস, স্বরচাতুর্য ও শব্দ-মাধুর্য এই যে তিনগুণের উল্লেখ করেছেন, গীতিকবিতার ক্ষেত্রে তার প্রথম এবং তৃতীয় গুণ অপরিহার্য। গীত হওয়াই গীতিকবিতার আদিম উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু যখন দেখা গেল সুরব্যতিরেকেই কবিতা নন্দনীয় ও চিত্তভাব-ব্যঞ্জক, তখন গীত ও গীতিকবিতার পথ পৃথক হয়ে গেছে। কিন্তু তখনও যদি কোনো গীতিকবিতা সেই আদিম উদ্দেশ্য নিয়ে, অর্থাৎ গীত হওয়ার জন্যই লিখিত হয় তখন তার গীতিকবিতার ধর্মও বজায় থাকে, আনন্দদানের ক্ষমতা ও চিত্তভাবব্যঞ্জনার সীমাও প্রসারিত হয়ে যায়। বক্তার ভাবের পরি-স্ফুটতাই গান ও গীতিকবিতার যুগপৎ লক্ষ্য। গীতিকবিতার সঙ্গে সুর যুক্ত হলে অর্থবোধ বদলে যায় না, সেই অর্থবান বাক্সমষ্টি হয়ত অধিকতর

গভীর ভাবতাৎপর্য লাভ করে। যেমন, শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে চলেছেন—সঙ্গে ধূলিঅশ্রুমলিন নববধূ সীতা, কোমলতনু কিন্তু প্রতিজ্ঞানিষ্ঠ অনুজ লক্ষ্মণ। নববিবাহের আনন্দরঞ্জিত মুহূর্তগুলি অকালশোকের মেঘচ্ছায়ে পাণ্ডুবিবর্ণ, অপ্রত্যাশিত কুলিশপতনে দশরথের শালপ্রাংশু বৃঢ়স্কন্ধ দেহ ঈষদানত বাক্যাহত, স্খলিতবাস জননী মূর্ছাতুরা। সমগ্র নগরবাসী পথে দাঁড়িয়ে সজল চোখে মিনতি জানাচ্ছেন, রাম ফিরে এসো। পাঁচালিকার বিষাদের এই চরম মুহূর্ত বর্ণনায় সামান্য একটু সুর ছুঁইয়ে দিলেন, হয়ত অনুপ্রাসবলয়িত ভাষার চরণে সামান্য ভৈরবীর স্বরবিন্দু পড়ল, অমনি কথার উপলগুলি নড়ে উঠল, সেই সুর কথার যন্ত্রণাকে পংক্তির সমাধি থেকে তুলে নিয়ে গেল উপরে, প্রভাতের অরুণবর্ণ আভাসে। শুধু পূরবীর ছোঁওয়া দিয়ে বেহুলার ভাসান গান শ্রোতাকে নিয়ে যায় কোন নিরুদ্দেশে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় পরিবেশনার উৎকর্ষ, আবেদনের গভীরতা ছাড়া কবিতা ও গানের মধ্যে সাধারণত কোনো প্রভেদ করি না আমরা। কবিতায় যে সম্পদ ও বাণীবদ্ধ নিহিত থাকে, তারই সোপানে সোপানে চরণ ফেলে সুর উঠে যায় রসাস্বাদনের সেই শীর্ষবেদিকায়, যেখানে কলালক্ষ্মীর সিংহাসন।

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে সংগীত ছিল তাই একান্ত বাক্‌নির্ভর, পদাশ্রিত। কর্ণানন্দ লিখেছেন, গোবিন্দদাসের সংগীতে পৃথিবী প্লাবিত হয়ে যেত। ধর্ম-মঙ্গলের কবি ঘনরাম তাঁর পূর্বসূরীকে প্রণাম জানিয়েছেন এই বলে—ময়ূরভট্টে বন্দিব সংগীতে আদি কবি। কিন্তু সে সংগীত প্রকৃতির সংগীত নয়, সে শুধু ছিল কথাকে বহন করে নিয়ে যাবার ছন্দবিশেষ। বাঙলার গীতিকাব্য তখন বৈরাগ্যের গৈরিকবাস পরেছে মাত্র, ঔদাসীন্যের একতারা হাতে তোলেনি। কীর্তনগান কথার অর্থধ্বনিকে সুরের বৃষ্টিধারার মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে অরূপের অভিসারে, কিন্তু কেবল কথায় তা সম্ভব হয়নি, তাই রাগরাগিণীর প্রভূত উপকরণে আখরের সহযোগিতায় তাকে পরিপূর্ণ সংগীত করে তুলতে হয়েছে। সাধারণ মানুষ তবু বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদ কীর্তনে না শুনে, কেবল পাঠ করেই আনন্দ পায়, বেদনায় অভিভূত হয়। কারণ কীর্তনের সাহায্য-ব্যতিরেকেই পদাবলী নীরব সংগীত।

বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের ইতিহাস তাই কেবল কাব্যের বা কেবল সংগীতের ইতিহাস নয়। যদিও রচনাকালে সুরের সহযোগিতা থেকেই সেগুলির জন্ম তবু তাদের কাব্যগত ভাবসম্পদই সেগুলিকে সাহিত্যের ইতিহাসের অঙ্গীভূত করে রেখেছে। নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতা ভরত কথাপ্রধান

সংগীতের নাম দিয়েছিলেন কাব্যবন্ধ। একমাত্র কীর্তন ছাড়া মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের সর্বাংশই প্রায় গেয় ছিল এবং সেই সুর ছিল প্রধানত কথার ছন্দোময়তাকে প্রসন্ন করার জন্য, অতিরিক্ত কোনো লাবণ্য তাতে ছিল না। আঠারো শতক পর্যন্ত বাঙলা কাব্যের ইতিহাসে সর্বত্রই এই কাব্যবন্ধ। সুর সর্বপ্রথম কথাবস্তুর তুলনায় স্বাতন্ত্র্য লাভ করতে সুরু করে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে। এই শতকের শাক্তপদগুলিতে দেখা গেল কথা আর নিজেকে সেখানে বেঁধে রাখতে পারছে না, সুর এসে কথাকে ভাবের স্বাধীনলোকে মুক্তি দিয়েছে। শাক্তকবিরা বৈষ্ণবকবিদের মত গোষ্ঠীগত ঐক্যে কাব্য রচনা করতে নামেননি, জগৎ ও জীবনের রহস্যে ও ভক্তির ঐকান্তিকতায় তাঁরা গান বেঁধেছিলেন। বাঙলার আগমনী-বিজয়া গানে মাতৃহৃদয়ের যে উৎকণ্ঠিত বেদনা, পদাবলীর মাথুরের সঙ্গে তার সাদৃশ্য থাকতে পারে কিন্তু সম্পর্ক নেই। বৈষ্ণবকবিরা প্রথমে কবি, তারপর গায়ক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কীর্তনিয়ারা প্রচলিত কাব্যপদকে গ্রহণ করে তার উপর রাগরাগিণী অর্পণ করে তাকে কীর্তন করে তুলেছেন। কিন্তু নবমী রাত্রিতে কন্যাবিচ্ছেদের দুঃসহ কাতরতায় শাক্তকবি জননীকণ্ঠে যে করুণ মিনতি সংযুক্ত করেছেন 'ওরে নবমী নিশি, না হইওরে অবসান', তা একান্তভাবেই সুরাশ্রিত। রামপ্রসাদের গানগুলিতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, সার্থক গীতিকবিতার ছন্দোরক্ষার দিকে কবির সতর্কতা ছিল না। আঠেরো উনিশ শতকের কবিওয়ালাদের পদ সম্পর্কেও এই কথাই বলা যায়। পূর্বযুগের কবিদের মত রাজসভার সমাদর, রাজন্যবর্গের আশীর্বাদ বা সভাসদবৃন্দের উপঢৌকন কিছুই কবিওয়ালাদের অদৃষ্টে জোটেনি। তাঁদের কাব্যভাষায় সরস্বতীর বীণাতারের ঝংকার নেই, বীণাপাণির রাজহংসের পাখা-ঝাপটানিমাত্র আছে। কবিওয়ালাদের গানের সমালোচনাপ্রসঙ্গে আমরা প্রায়ই তাদের কাব্যসবহীনতা কচিহ্রস্বতার প্রতি কটাক্ষ করে থাকি। কিন্তু কবিওয়ালাদের রচনা যে বিশুদ্ধ সাহিত্য নয়, আধুনিক কালের নবজাগ্রত ব্যক্তিসত্তা সুরের মাধ্যমে এই সকল গানে প্রকাশ লাভ করেছে, এই কথাটি নতুন করে ভেবে দেখতে হবে।

কবিওয়ালাদের গানের পর বাঙলা কাব্যসাহিত্যে গান ও গীতিকাব্যের সীমানা স্পষ্টরেখ হয়ে উঠেছে। আঠারো শতকের শাক্ত পদাবলী ও কবি-গানকে অনুসরণ করে যাত্রা-তরজা-খেউড-আখড়াই-টপ্পা প্রভৃতি সুরধর্মী কাব্যধারা একদিকে চলে গেছে এবং অন্যদিকে মহাকাব্য-মঙ্গলকাব্যের বর্ণনা-মূলক ধারার বিবর্তনে এসেছে মধুসূদনের কাব্য-মহাকাব্য। মধুসূদন যে

মহাকাব্যিক ধারার নবপ্রবর্তন করলেন, এক হিসাবে তার মধ্যে কবিমনের স্বকীয়তা, অনন্যসাধারণ ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ ঘটেছে বলে তাকেও মন্ময় কাব্যের মধ্যে ফেলা যায়। তথাপি মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সুরকে বর্জন করা, কিন্তু বিহারীলাল চক্রবর্তী তাঁর গীতিকবিতায় সুরকে আবার ফিরিয়ে এনেছেন। সংগীতপ্রবণতাই বিহারীলাল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক গীতিকবিতার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।

২

যে কবিতা ও সংগীত এইভাবে সাহিত্যর ইতিহাসে পরস্পর বাহুবন্ধনে বাঁধা হয়ে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী অগ্রবর্তী হয়েছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সেই সংগীতনিবদ্ধ কবিতার ইতিহাসরচনাই আমাদের বক্ষ্যমাণ আলোচনার উদ্দিষ্ট। বিশুদ্ধ সংগীত কবিতার বা বাণীর উপর নির্ভর করে না, কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখেছি বাঙলা সাহিত্যের এক বিপুল অংশ সুরনির্ভর। কালক্রমে সেই সুর হারিয়ে গেলেও তার বাক্‌সম্পদকে সাহিত্যের ইতিহাসের উপকরণরূপেই গণ্য করা হয়। যদি রামপ্রসাদের পদ বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসভুক্ত হয়, তবে নিধুবাবুর গান কেন সাহিত্যসভায় অপাংক্তেয় থাকবে? কবিতায় যুক্ত থাকলেও সংগীতকে অনেকে কবিতার চেয়ে উচ্চস্থান দিয়ে থাকেন। এই বিষয়ে একটা প্রাচীন মতের উল্লেখ করা যেতে পারে। সবুজপত্রের যুগে রবীন্দ্রনাথ সংগীতের মুক্তিবিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন এবং কবিতার পাঠ্যছন্দকে কয়েক প্রকার সংগীতের তালে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁর সমকালীন একজন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তির প্রতিবাদ করে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। সেখানে তিনি কাব্য ও সংগীতের সম্পর্কপ্রসঙ্গে বলেন—

"রসাত্মক বাক্য কাব্য। ভাববাহুল্যে চিত্তবিনোদনে রসাত্মক বাক্যের প্রভূত প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিশ্বের যে রস, যে সৌন্দর্যরাশি ক্রান্তদর্শী কবিকর্তৃক সংকলিত ও ছন্দোনিবদ্ধ হইয়া অস্মদ্‌সমক্ষে যে রূপরসে ভাববৈভবের বৈচিত্র্যে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সংগীতে তাহা চরমোৎকর্ষ লাভ করে। শ্রুতিসুখসম্পাদনে ও রসোদ্দীপনায় কাব্যে যে শক্তি নিহিত আছে, সংগীতে তাহা সহস্রগুণে বর্ধিত হইয়া থাকে। শ্রুতিবিনোদনে বা রসোদ্দীপনায় কবিকে কল্পনার বিচিত্র শক্তির শরণাপন্ন হইতে হয় বটে, কিন্তু সেই অপূর্ব শক্তি কাব্যের সংকীর্ণ পরিধিমধ্যেই নিবদ্ধ থাকে। সংগীতে কিন্তু

অভূতপূর্ব স্ফুরণের সহিত নানা ছন্দোবন্ধে সেই শক্তি অপূর্বভাবে বিকশিত হইবার অবসর পায়। যেখানে যতটুকু হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় সংগীতে সেইখানে সেই পরিমাণেই প্রয়োগ করিবার সুবিধা ও স্বাধীনতা আছে। মাত্রা-যতি-সমবায়ে কাব্যনিবদ্ধ ছন্দের দ্বারা ভাষার সৌষ্ঠবসাধন হয় সত্য। সংগীত কিন্তু যতি-মাত্রাদি-বিন্যস্ত ছন্দোনিবদ্ধ স্বরাদির আরোহণাবরোহণ-মূর্ছনা-কম্পন প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে ভাষাকে প্রাণস্পর্শিনী শক্তিতে পরিণত করে। এই-জন্যই লোকে সংগীতের অনেক নিম্নস্তরে কাব্যের অবস্থান এই কথা বলিয়া থাকেন। সাহিত্যের পদবহুল গদ্য অপেক্ষা স্বল্প পদবিন্যাসে রচিত রসাত্মক বাক্য যে কারণে শ্রেষ্ঠ, তেমনি বর্ণবহুল কাব্য অপেক্ষা কেবল স্বল্পধাতু-মাত্রা-সমবায়ে সমুৎপন্ন সংগীতও ঠিক সেই কারণেই কাব্য হইতে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। এই সমস্ত কারণে রসাত্মক বাক্য যে নিয়মে (যেমন কথকতায়) আবৃত্ত হইয়া থাকে, ঠিক তন্নিয়মাধীন হইয়া কবিতা গীত হইবার রীতি নাই। এই-জন্যই কাব্যের ছন্দ যে নিয়মে রচিত হইয়া থাকে, সংগীতের ছন্দ ঠিক তদ্-বিধানে সর্বথা নিয়ন্ত্রিত হয় না। বঙ্গভাষায় হ্রস্বদীর্ঘভেদবিবর্জিত অক্ষর-সমবায়ে পদ্যকাব্যের ছন্দ গ্রথিত হয়। এইজন্য বাঙলা ছন্দে রচিত কোনো কবিতা বিশেষকে, গায়নকালে যে রাগিণী যে কবিতাটিতে সংযোজিত হইবে, সেই রাগিণীর উপাদানভূত স্বরাদিধাতুতে, কবিতার ছন্দযতিবিন্যাস প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া হ্রস্বদীর্ঘাদি মাত্রার বিন্যাসপূর্বক তাহা গানে বসাইবার উপদেশ আছে। গানে ধাতু ও মাত্রাই মুখ্য, কবিতায় নিবদ্ধ পদাবলী মুখ্য নহে। গীতাদিতে কাব্যের পদসমষ্টি যে মুখ্য নহে, গৌণ—তাহা বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিরচিত গীতাদির আলোচনা করিলেই প্রমাণিত হয়। পদাবলীর ভাষা সংস্কৃত নহে। শব্দ বানান করিবার প্রণালীও সংস্কৃতের অনুরূপ নহে। ঠিক প্রাকৃতের মতনও নহে। সংস্কৃত ব্যাকরণে বা ছন্দঃশাস্ত্রে যে সমস্ত নিয়ম আছে, পদাবলীর রচনায় তাহা রক্ষিত হয় নাই। প্রাকৃত ব্যাকরণও রক্ষিত হয় নাই। তারপর হ্রস্বদীর্ঘস্বর ব্যবহারের নিয়ম বড় সূক্ষ্ম ও কঠিন। আমাদের দেশে তাহা সম্যক জানা না থাকায় বিদ্যাপতিরচিত পদাবলীর সংস্করণে গীতাদি অত্যন্ত বিকৃত বিদুষ্টছন্দ হইয়াছে। বিদ্যাপতির ছন্দ দেখিতে পয়ারত্রিপদীসদৃশ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা পয়ারত্রিপদী নহে। বিদ্যাপতি গানের নিমিত্ত পদরচনা করিতেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আবৃত্তিকালে তাঁহার যে ছন্দ পতন হইত তাহা নহে। তিনি সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব বিশেষভাবে অবগত ছিলেন।...সুতরাং ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব

নহে।…গীতাদিতে মাত্রা ও ছন্দের অনুরোধে হ্রস্বদীর্ঘের বিনিময় হইয়া থাকে। ইহাও সংগীতশাস্ত্রসংগত। এই কারণে বেশ প্রতীয়মান হইতেছে, গীতাদি-বিষয়ে স্বরাদিতে নিবদ্ধ যে ছন্দ মুখ্য পদ্যকাব্যে তাহা গৌণমাত্র[২]।"

আলোচ্য অভিমতের বিস্তারিত বিশ্লেষণে না গিয়েও বলা যায় সংগীত কবিতাকে অতি অবশ্যই উর্ধ্বস্তরে উন্নীত করে, অন্তত রবীন্দ্রনাথ বারবার এই সত্যই তাঁর গানে জানিয়ে গেছেন। কিন্তু অনুভূতির ক্ষেত্রে সংগীতের আবেদন যাই হোক না কেন, বাঙলার আধুনিক কাব্যের ইতিহাস, সংগীতের দিক থেকে কাব্যানুপন্থী বলে, সাহিত্যের ইতিহাসের পৃষ্ঠাতেই তার আলোচনা অনিবার্য হয়ে ওঠে। যে সময় থেকে বাঙলার সংগীতচর্চায় একটি প্রবল প্রবাহ কবিতার সাহায্য গ্রহণ করেছে সেই সময় থেকেই বাঙলা কাব্যের একটি নতুন উৎসমুখ উদ্‌বারিত হয়েছে, তার নাম কাব্যসংগীত। এই কাব্যসংগীতের কাব্য কবিতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যসংগীত সম্পর্কে বহু আলোচনা করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের হাতেই এই কাব্যসংগীতের পূর্ণতাসাধন ঘটেছে সে কথা বলা বাহুল্য। বহুকাল পূর্বে উপেন্দ্রকিশোর রায় এই বিষয়ে একটি যুক্তি ও তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছিলেন, তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

"আমাদের সংগীত স্বর লয় রাগ আর তালের ব্যাপার। এ সকলই ইহার উপভোগ্য বস্তু। ইহার আনন্দ অতি গভীর, ইহার সাধনা তপস্যাবিশেষ। ইহার ত্রুটি এই যে, ইহাতে ভাবের স্থান অতি সংকীর্ণ। আমাদের সংগীতাচার্যগণ অতি পণ্ডিত লোক, কিন্তু তাঁহারা কবি নহেন।……

গানের মধ্যে মিষ্টতা এবং কবিত্ব স্বভাবতই থাকিবার কথা।…সংগীতকে যদি ধর্মসাধনের উপযোগী করিতে হয়, পিপাসু ভক্তের প্রাণের বেদনা তাহা দ্বারা প্রকাশ করিবার যদি প্রয়োজন থাকে, তবে আর তাহাকে কেবল বুদ্ধির হাতে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। ভাবকে তাহার সহায় করা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে।

সেইরূপ সংগীত আমাদের বাঙলা দেশের কীর্তন আর ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত রবীন্দ্রনাথের গান।…বাস্তবিক সংগীত অপেক্ষা ভক্তিসাধনের উৎকৃষ্টতর উপায় আর নাই। ব্রাহ্মসমাজের সংগীতগুলি যে আমাদের কী অমূল্য সম্পত্তি তাহা সকলে বুঝিবার সময় এখনও হয় নাই, কারণ দেশে সে পরিমাণ সংগীতচর্চার অভাব।…কালে এই অভাব পূর্ণ হইবে আশা করা যায়। তখন লোকে ইহার মর্ম বুঝিতে পারিবে।…

কথা সংসারের ফেরিওয়ালা। সে প্রাণের দ্বারে আসিয়া চাই গো, চাই গো বলিয়া চিৎকার করে, কিন্তু তাহার ভিতরে প্রবেশ করিবার আজ্ঞা নাই। সংগীত যদি তাহাকে আসিয়া ভিতরে লইয়া যায় তবেই সে প্রাণের দেখা পায়।...

সংগীতের উপাদান দুইটি, ছন্দ আর স্বর। কথা আর ছন্দের যোগে গান, উহা অর্ধমিলন। কথা ছন্দ আর স্বরের যোগে সংগীত, উহা পূর্ণমিলন। কথা হারিলে কবিতা, কবিতা হারিলে গান—এইরূপ করিয়া ইহারা ক্রমেই আত্মাকে পরমাত্মার নিকটস্থ করিতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পৌঁছিবার শক্তি ইহাদের কাহারও নেই। পরিণামে ইহাদের সকলকেই নিরস্ত হইতে হয়। শেষের সম্বল একমাত্র সেই প্রেম বা ব্যাকুলতা, যাহা হইতে সংগীতের উৎপত্তি। উহাই আত্মার সংগীত। সে সংগীত কানে শোনা যায় না, প্রাণে ভোগ করিতে হয়। কবি কী সুন্দরই বলিয়াছেন—

> যে গান কানে যায় না শোনা
> সে গান যেথা নিত্য বাজে,
> প্রাণের বীণা নিয়ে যাব
> সেই অতলের সভামাঝে।

...ভক্তির পথে ভগবানের নিকট যাইতে হইলে মনের সেই আবেগকে ফুটাইয়া প্রেমে পরিণত করিতে হয়। এ কার্যে কথা অতি উত্তম সহায়। ভাব আগোছালো এবং বিষয়বুদ্ধিহীন, কথা চতুর এবং কার্যক্ষম। কথা কর্ণধার না হইলে আবেগ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে পারে[৩]।"

প্রাগুক্ত আলোচনা প্রধানত ভক্তিসংগীতের প্রতি ধাবিত হলেও কাব্য-সংগীতের ক্ষেত্রে কথার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে। এই কথাপ্রধান সংগীত উনিশ শতকের বাঙলাদেশকে প্লাবিত করেছিল, ভক্তি প্রেম মানব নিসর্গ সর্বপ্রকার বিষয়ভেদেই কবিতার একটি বিশিষ্ট স্বরনির্ভর ধারা বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল। বাঙলা সংগীতের তথা কাব্যসংগীতের এই নবজাগরণের সূত্রপাত নিধুবাবুর হাতে এবং তার শ্রেষ্ঠ পুরুষ রবীন্দ্রনাথ—এই দুই ব্যক্তিত্বের মধ্যবর্তী পথটিই কাব্যসংগীতের ইতিহাস। জনৈক আধুনিক সংগীতবিদের মন্তব্য—

"বাঙলা গানের মাধুর্য কাব্যের উৎকর্ষের উপরেই প্রধানত নির্ভর করে। একথা বলা যেতে পারে না যে, এর ঐতিহ্য সংগীতের উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেউই আমাদের বাউল কীর্তন টপ্পাকে অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু এই গানগুলির মধ্যে সংগীতের চেয়ে সাহিত্যগুণই প্রধান।

এর মধ্যে বাঙলা দেশের দার্শনিক তত্ত্বটা প্রধানভাবে কাজ করেছে। এমনি-ভাবেই বাঙলা সংগীত ও বাঙলার জীবনদর্শন পারস্পরিক সম্বন্ধে সম্পৃক্ত ও অপরিহার্য এবং প্রত্যেক রসবেত্তাই একথা স্বীকার করবেন যে, রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য আরও উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট[৭]।"

বাঙলার এই নতন কাব্যসর্বস্ব গানের মধ্য দিয়ে বাঙলার সাহিত্যধারার, বিশেষ করে আধুনিক গীতিকবিতাধারার যে একটি নবতর শাখা গড়ে উঠতে চলেছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে শ্রদ্ধাবান ও সচেতন ছিলেন। 'প্রতীচ্যদেশের মনীষীসমাজে বিপুল সমাদরলাভান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে' (জুলাই ১৯২১) সংগীতসঙ্ঘের বার্ষিক উৎসবে প্রদত্ত সম্বর্ধনার উত্তরে 'আমাদের সংগীত' নামে কবি একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। উক্ত প্রবন্ধে বাঙলাদেশের সাহিত্য ও সংগীতসম্পর্কে আলোচনা করে কবি বলেছিলেন যে, বাঙলাদেশে চিরকালই সংগীত ও কাব্য পরস্পরের সহচর। "বাঙলাদেশে হৃদয়ভাবের স্বাভাবিক প্রকাশ সাহিত্যে। · কিন্তু একটা বাণীর মধ্যে তো মানুষের প্রকাশের পূর্ণতা হয় না, এইজন্যে বাঙলাদেশে সংগীতের স্বতন্ত্র পংক্তি নয়, বাণীর পাশেই তার আসন।" বাঙলাদেশের ঐতিহ্য অনুসারেই কাব্যসংগীত একটি মহৎ শিল্পরূপে পরিণত হবে, রবীন্দ্রনাথ এই কথা বিশ্বাস করতেন। সবুজপত্রে প্রকাশিত উক্ত 'আমাদের সংগীত' (১৩২৮) প্রবন্ধে তিনি বলেন, "বাঙলাদেশে কাব্যের সহযোগে সংগীতের যে বিকাশ হচ্ছে, সে একটি অপরূপ জিনিস হয়ে উঠবে। তাতে রাগরাগিণীর প্রথাগত বিশুদ্ধতা থাকবে না, যেমন কীর্তনে তা নেই। অর্থাৎ গানের জাতরক্ষা হবে না, নিয়মের স্খলন হতে থাকবে, কেননা তাকে বাণীর দাবি মেনে চলতে হবে। কিন্তু এমনতর পরিণয়ে পরস্পরের মন জোগাবার জন্য উভয় পক্ষেরই নিজের জিদ কিছু না কিছু ছাড়লে মিলন সুন্দর হয় না। এইজন্য গানে বাণীকেও সুরের খাতিরে কিছু আপোষ করতে হয়, তাকে সুরের উপযোগী হতে হয়। যাই হোক, বাঙলাদেশে এই একজাতের কাব্যকলা ক্রমশ ব্যাপক হয়ে উঠবে বলে আমি মনে করি। অন্তত আমার নিজের কবিত্বের ইতিহাসে দেখতে পাই—গানরচনা অর্থাৎ সংগীতের সঙ্গে বাণীর মিলনসাধনই এখন আমার প্রধান সাধনা হয়ে উঠেছে[৫]।"

৩

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই বাঙলা গীতিকবিতা সংগীতের সাহায্যে প্রথম আত্মপ্রকাশ করতে সুরু করে, অথচ কাব্যসাহিত্যের আধুনিক যুগের

ইতিহাস তখনও শুরু হয়নি। ইতিহাসের বিচারে আধুনিকতার মুদ্রাচিহ্নগুলি পলাশির যুদ্ধের পর থেকেই আবির্ভূত ও প্রকট হতে শুরু করেছে, গ্রাম্য অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বদলে নতুন ধনতান্ত্রিক সমাজের লক্ষণ দেখা দিয়েছে, কলকাতা শহর গড়ে উঠছে, পরান্নপুষ্ট মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্‌ভব হচ্ছে, ইংরাজি-জানা বেনিয়া-মুৎসুদ্দিদের হাতে আসছে কাঁচা টাকা, নতুন মালিকানা, আইন-আদালতের নতুন কাঠামো তৈরি হচ্ছে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ শুরু হচ্ছে, কাব্যের জীর্ণ নির্মোক খসে পড়ছে। এই ক্রান্তিলগ্নে শাক্তসংগীতগুলির মধ্যেই প্রথম আধুনিক কালের ব্যক্তিআত্মার ক্রন্দন বেজে উঠেছে, ভক্তি-আখ্যায়িকার পুরনো সেগুন কাঠের আসবাবে আদিরসের ঘুণপোকা ঢুকে তাকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগসন্ধির আকাশে লগ্নবদলের নক্ষত্র। মঙ্গলকাব্যের ধারায় অন্নদামঙ্গল রচনা করলেও ভারতচন্দ্রের কাব্যে মঙ্গলকাব্যের নাভিশ্বাস উঠেছে। তার জীর্ণ আঙ্গিক ও দেবমাহাত্ম্যপ্রচারের পূর্বতন অন্ধ বিশ্বাস এই কাব্যে শিথিল অন্তঃসারশূন্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুরশিদকুলি খাঁ আলিবর্দি খাঁর রাজত্বে রাজস্ব আদায়ের জন্য একদিকে যেমন এক শ্রেণীর জমিদার-তালুকদারের আবির্ভাব ঘটেছে, অন্যদিকে তেমনি বনেদি প্রাচীন জমিদারবংশের দুরবস্থা চরমে উঠছে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে শুরু হয়ে গেছে বর্গিদের অত্যাচার এবং আরও বহু মনুষ্যসৃষ্ট ও নৈসর্গিক কারণে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অনিবার্য হয়ে উঠছে। দেশীয় শিল্পবাণিজ্য প্রায় ধ্বসে পড়ছে, ইংরাজ বণিকদেব বাণিজ্যবিস্তার বেড়ে চলেছে, ইংরাজদের অনুগ্রহলাভের জন্য এক শ্রেণীর দেশবাসীর মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা দিয়েছে, শিল্প-সাহিত্য নিতান্ত বিলাসের সামগ্রীতে পবিণত হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের মাত্র দুজন প্রতিনিধিস্থানীয় কবি ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ একই দেশকালে একই সমাজ-পরিবেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

অন্নদামঙ্গলের সমাপ্তি প্রসাদী সংগীতের পথকে নিরঙ্কুশ করে দিল। একদিকে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর অন্নদামঙ্গল, অন্যদিকে রামপ্রসাদের প্রসাদী সংগীত, অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যে দুইই বিস্ময়। ভারতচন্দ্রের কাব্যে মঙ্গল-কাব্যের মৃত্যু ঘটলেও নাগরিক জীবনের ভ্রষ্টাচার, তার রুচিহীন বিলাসিতা, কদর্য জীবনাদর্শ, সুলভ দৈহিক চেতনা, ক্লিষ্ট শব্দ ও ধ্বনিস্পন্দপ্রীতি দেবতার শিলমোহর নিয়ে উপস্থিত। আর রামপ্রসাদ কোনো রাজসভা অথবা রাজন্য-বর্গের কৌতুকলরস দৃষ্টির সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত, আত্মমগ্ন চেতনায় এক পরম বৈরাগ্য

ও মধুর জীবনাসক্তির যৌগপত্যে এক অপার্থিব গীতিকবিতা সৃষ্টি করেছেন। বাঙলা কাব্যসংগীতের ইতিহাসের সঙ্গে এই দুই কবির যোগই গভীর। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের রুচিবিকৃতি উনিশ শতকের নাগরিক জীবনে গভীরভাবে সংক্রামিত হয়েছিল। গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা ও আরো বহু আদিরসাত্মক প্রণয়গীতে তার প্রমাণ আছে। রামপ্রসাদের শক্তিসাধনার পদও তেমনি বিশ শতকের প্রথম-দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ভক্তিবাদপ্রচারে, মাতৃনামমহিমায়, ঈশ্বরাকৃতিতে, এমন কি দেশাত্মবোধক চেতনাতেও সঞ্চারিত হয়েছিল।

এক হিসাবে বাঙলা কাব্যসংগীতের সূচনা রামপ্রসাদেই। সংগীত দেশকাল-নিরপেক্ষ হলেও কাব্য যুগপ্রেরণায় নিয়ন্ত্রিত হয়। আগেই বলা হয়েছে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলাদেশ ছিল দুর্ভাগ্যের তমসায় আচ্ছন্ন। একদিকে মোগল শাসনের ভগ্নদণ্ড দেশের প্রান্তভাগে তার অবিসংবাদিত প্রভুত্ব ও প্রতাপ বিস্তারে ব্যর্থ হয়েছিল, স্থানীয় ভূস্বামী ও আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের দোর্দণ্ড প্রতাপ বৃদ্ধি পেয়েছিল, অন্যদিকে ইংরাজ ও অন্যান্য বিদেশী বণিকদের আনাগোনা ও কুঠিস্থাপনে দেশের ভবিষ্যৎ ভাগ্যাকাশ ঘনমেদুর হয়ে উঠেছিল। এর সঙ্গে বর্গির অত্যাচার, দুর্ভিক্ষ, রাজস্ব-নিষ্কাশন, দৈব পীড়ন তো ছিলই—সাধারণ মানুষের লাঞ্ছনার আর সীমা ছিল না। রাজসভায় বিলাসিতার পঙ্কস্রোত, হঠাৎ-বাবুদের গৃহে বিলাসিতা ও স্বেচ্ছাচারিতার মহোৎসব, সাধারণ মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ মানুষের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ—কালের দিগন্তে এই বৈপরীত্য ঘনিয়ে উঠেছিল। যুগের অশিষ্ট রুচিপ্রভাবেই হোক, অথবা প্রথাগত কাব্যের আদর্শ অনুসরণের অভ্রান্ত তাড়নাতেই হোক, রাম-প্রসাদও ভারতচন্দ্রের মতই বিদ্যাসুন্দর রচনা করেছিলেন। কিন্তু নাগরিক জীবনের উৎকট আদিরসপ্রীতি তাঁর কবিধর্মকে চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রিত করার পূর্বেই সাধক রামপ্রসাদ তাঁর একমুখী গীতসাধনায় আত্মমগ্ন মাতৃউপাসনা ও মানববৃত্তিপ্রধান আধ্যাত্মিকতার একটি নিজস্ব ক্ষেত্র আবিষ্কার করে নেন। মাতা ও সন্তানের মধুর বাৎসল্য ও স্নেহার্দ্র ভক্তিসম্পর্কস্থাপনে এবং গোষ্ঠি-নিরপেক্ষ ব্যক্তিতান্ত্রিক মাতৃআরাধনায়, সর্বোপরি এক স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত নিজস্ব সুরসৃষ্টিতে তিনি সমগ্র বাঙলাদেশকে চিরকালের মত বিমোহিত করেছেন। মাতৃনামশ্রবণ ও সম্বোধনের এই সুললিত কারুণ্য ও ব্যাকুল কাতরতা ধনীর প্রাসাদ থেকে দীনতমের পর্ণকুটিরে, অবকাশ থেকে কর্মসংগ্রামে, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণের আরাম ও আত্মার আনন্দ হয়েছে। শক্তি-

গীতির কালী অষ্টাদশ শতকের যুগমাতা। ইনি একই সঙ্গে ভয়ংকরী ও ভীতিহরা, অন্নপূর্ণা ও করালবদনা, স্বর্ণমণ্ডিতা দশভূজা ও শ্মশানচারিণী, রক্তকৃপাণধারিণী, ভক্তবৎসল ও রুদ্রাণী, হরমনোমোহিনী ও অশিববিনাশী, এক কথায় বৈপরীত্যের বিগ্রহ, উৎকেন্দ্রিক যুগজীবনের অধিষ্ঠাত্রী। হয়ত আঠারো শতকের সমকালীন সমাজের বিষম অসংগতি ও বিভ্রান্ত বিশ্বাস কবিদের চেতোদর্পণে এমন এক দেবীর কল্পনা প্রতিবিম্বিত করেছে যিনি এক ভ্রস্ত সময়ের বিরোধাভাসকে, বিপন্নকালের আত্মসংকটকে আপনার বিচিত্র প্রতিমায় রূপায়িত করতে পারেন। সমগ্র শতাব্দীর আলোকলুপ্ত আশাহীন নীরন্ধ্র অন্ধকারই এই সকল পদে শ্মশানের চিত্রকল্পে পরিবর্তিত হয়েছে। মহাকালের ভয়াবহ নিষ্ঠুরতাই মহাকালীর চরণে বিনত হয়ে আপনার মুক্তি অন্বেষণ করেছে। শাক্তপদকর্তাগণ ঐতিহাসিক বিচারে সকলেই সরস্বতীর বাণীসিদ্ধ সাধক ছিলেন না, এ তথ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রামপ্রসাদ, রঘুনাথ রায়, হরু ঠাকুর, রাম বসু (শেষোক্ত কবিবৃন্দ কবিগানও রচনা করেছিলেন) ব্যতীত অন্যান্য কবিরা ছিলেন প্রায় সকলেই বিষয়কর্মব্রতী জমিদার, রাজামহারাজা, দেওয়ান, বণিক বা সংসারী। অথচ শাক্তপদাবলীর বিষয়বস্তু এই নশ্বর সংসারের অনিত্যতা, হীরামুক্তামাণিক্যের ইন্দ্রজালচ্ছটার প্রতি বৈরাগ্য, জীবন-যৌবনের দ্রুত বিলীয়মান পরিণতি, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষয়িষ্ণুতা, সৌভাগ্যের অতর্কিত বিনাশাশঙ্কা। তারই বিকল্পে এই সকল পদকর্তা কালিকার স্থিরনিশ্চিত অচঞ্চল পদসৌন্দর্য, অপার্থিব সম্পদ প্রার্থনা করেছেন। হয়ত ব্যক্তিগত জীবনের অশান্তি, পারিবারিক জীবনের অসন্তোষ, বৈষয়িক জীবনের ভঙ্গুরতাকে রোধ করার চূড়ান্ত ব্যর্থতাই তাঁদের এমন কোনো দেবতার চরণোপান্তে উপনীত করেছে, যিনি জীবনের দুর্ভাগ্য ও ট্র্যাজেডিরই প্রতীক। কালীর মূর্তিপরিকল্পনায় জীবনের সেই অসহায় আর্তি ও আতঙ্কই প্রতিফলিত হয়েছে। সংসারজীবনে নৈরাশ্যপীড়িত কবি শেষ পর্যন্ত জগজ্জননীর স্নেহলোভে কাতর হয়ে পড়েছেন, স্থাবর সম্পদরক্ষার চরম ব্যর্থতাই যেন মাতৃচরণের অপার্থিব সম্পদকে জোর করে আঁকড়ে ধরতে অনুপ্রাণিত করেছে। জীবনের বৈপরীত্যই যে অষ্টাদশ শতকীয় শ্যামাসংগীতের মূল প্রেরণা তার প্রমাণ এই পদাংশ—

ওমা কারে করেছ রাজ্যেশ্বর মা অতুল ধনের অধিকারী
কারে করেছ পথের কাঙাল মুষ্টিমেয় অন্নের ভিখারি।
কেউ বা সুখে কাটায় নিশি পুষ্পশয্যায় শয়ন করি

কেউ বা গাছের তলায় তৃণশয্যায় দুঃখে কাটায় মা বিভাবরী।
সকলি তোমার খেলা বুঝেও বুঝিনে॥

'শাক্তপদতরঙ্গিণীর গোমুখী' রামপ্রসাদ শক্তিউপাসনাকে শাস্ত্রানুমোদিত আচারপরায়ণতা ও তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ থেকে মুক্ত করে তাকে সাধারণ মানুষের কর্মপীড়িত জীবনের সহজিয়া মাতৃব্যাকুলতা ও সংস্কারহীন ভক্তিতে পরিণত করেছিলেন। রামপ্রসাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অনাগত কালের সমুদ্রকল্লোল শুনতে পেয়েছিলেন, তাই দেবতা ও মানুষের সঙ্গে ব্যক্তি-তান্ত্রিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। 'মা আমায় ঘুরাবি কত'—বাঙলা গীতি-কবিতার এখানেই প্রথম অস্ফুট উষারাগ, এই প্রথম কবিকণ্ঠ আপনার সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্বকে দেবতার সমীপে স্থাপন করেন। রামপ্রসাদ তন্ত্রসিদ্ধ সাধক ছিলেন এবং তার সংগীতাবলী তাঁর অন্তর্জীবনের সাধনা সিদ্ধি বিশ্বাস ও ভক্তিবাদের প্রচারগীতি হলেও ভক্তিসম্পর্কিত এক লোকায়ত মানবতাবাদের জন্যই বাঙলাদেশে তাঁর জনপ্রিয়তা দুই শতকেব অধিককাল ধরে দৃঢ়মূল হয়েছে। অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত গোত্রহীন ভক্তিব তিনি এক নূতন সুর প্রবর্তন কবেছিলেন, এক নূতন কবিভাষা বচনা করেছিলেন। একটি অকপট আত্মউদ্‌ঘাটনে, একটি পরিপূর্ণ বিশ্বাসে, সহজ জনজীবনের নিত্যদৃষ্ট পদার্থ বস্তু বা ঘটনার উপমেয়তার মধ্য দিয়ে জীবনের জটিল গভীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-দানেও তিনি ভক্তিগীতির এক নূতন সৃষ্টি ঘটিয়েছেন। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে দেখিয়াছেন, ছন্দ বিষয়েও রামপ্রসাদেব কতখানি দক্ষতা ছিল এবং এই বিষয়েও তিনি 'আধুনিক কালের অগ্রদূত'।[৬] সুতরাং বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ প্রসাদী সংগীতের মধ্য দিয়েই প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল বলা যেতে পারে।

ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পব থেকে উনিশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙলা কাব্যের ধারা স্বচ্ছন্দ স্রোতোবেগ ও তরঙ্গের আলোছায়াকম্পন হারিয়েছে। এই যুগে গ্রামকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা ভগ্নদশায় উপনীত হয়েছে, কলকাতায় নাগরিক সভ্যতার পত্তন হয়েছে, জমিদারবাবু-মধ্যবিত্ত-চাকুরিজীবী ইংরাজিনবিশ নূতন শ্রেণীসম্প্রদায়ের উদ্‌ভব হয়েছে। ফলে সংস্কৃতি-শিক্ষা-রুচিমানেরও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর (১৭৬০) প্রায় একশো বছর পরে ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যু (১৮৫৯) হয়। পুরাতনের অনুবৃত্তি এবং নতুন যুগের চিন্তাধারা ও রীতির অনুসরণ এই পর্বের লক্ষণ। এখনও পর্যন্ত প্রতীচ্য শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতি ও সাহিত্য বাঙলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করতে পারেনি,

কিন্তু আসন্ন প্রভাতের পূর্বাভাস শেষরজনীর তারকাপুঞ্জের ঔজ্জ্বল্যের মধ্য দিয়েই আভাসিত হচ্ছিল। এই যুগের কবিরা উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না। নূতন গড়ে-ওঠা [illegible] ব্যবসায়কেন্দ্র ও প্রমোদরাজধানীর মনোরঞ্জনই ছিল এ পর্বের কবিদের উপজীবিকা। পূর্বতন যুগের রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত-পাঁচালির বদলে এক নূতন ধরণের সুরপ্রাণ পাঁচালি গান, রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত শুদ্ধ প্রণয়কবিতার বদলে কবিসংগীত নামক একজাতীয় দেহসচেতন অমার্জিত গান, শ্যামাবিষয়ক ভক্তিগীতি ও আগমনী-বিজয়া, কিছু কিছু লৌকিক প্রেমকবিতা, নূতন প্রণালীর যাত্রা—মোটামুটি এই হল ক্রান্তিলগ্নের সাহিত্য-সংবাদ। কবিসংগীতই এই যুগের কাব্যসাধনায় বৈচিত্র্যে পরিমাণে ও কবি-সংখ্যাধিক্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। কবিওয়ালারা দেশের এক অপরিণত বিকৃতরুচি ও বিশৃঙ্খল পরিবেশে উপজাত হয়েছিলেন বলে তাঁদের বিষয়বস্তুর মধ্যে তাই শ্রোতৃসমাজের চারিত্রিক অবনতিরই প্রতিফলন ঘটেছে। কবিওয়ালারা উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন ছিলেন না, কিন্তু সাহিত্যচর্চা দেশের লোক-সমাজের সর্বস্তরে নিম্নতম জীবিকাধারীর মধ্যেও যে প্রসারিত হয়েছে, তাঁরা তার প্রমাণ। কবিসংগীতগুলি ছিল উত্তরপ্রত্যুত্তরমূলক, বাদ্যসমারোহে আসরে-বিবদমান প্রতিপক্ষের মধ্যে গেয় উপস্থিতরচনা। এই ধরণের রচনায় সাধারণ নিম্নরুচি মানুষের যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, শব্দালংকারপ্রিয়তা, ভাষার উপর স্বোপার্জিত অধিকার ও ছদ্ম যুক্তিবাদ প্রকাশ পেয়েছিল তা বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন—

"এই নষ্টপরমায়ু কবির দলের গান আমাদের সাহিত্য এবং সমাজের ইতিহাসের একটি অঙ্গ—এবং ইংরাজ-রাজ্যের অভ্যুদয়ে যে আধুনিক সাহিত্য রাজসভা ত্যাগ করিয়া পৌরজনসভায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে এই গানগুলি তাহারই প্রথম পথপ্রদর্শক"।[৭]

কবিসংগীতব্যতীত যাত্রা পাঁচালি শ্যামাসংগীত বাউলগান টপ্পা আখড়াই ঢপকীর্তন খেউড় তর্জা হাফআখড়াই প্রভৃতি আরও নানা জাতীয় রচনায় এই পর্ব ভারাক্রান্ত। এই পর্বকে 'গানের যুগ' বলা হয়েছে। বাণীবিগ্রহের দীনতাকে সমকালীন কবিরা যে গানের সুরের বিচিত্র স্বরমূর্ছনার দ্বারা আবৃত করতেন তাতে সন্দেহ নেই। তার কারণ, বিশুদ্ধ কাব্যপাঠের কৌতূহল তখনও জনসাধারণের মধ্যে জেগে ওঠেনি। কাব্যপ্রচারের জন্য মুদ্রাযন্ত্রের ব্যাপক প্রচলন হয়নি। উচ্চবিত্ত সমাজ আপনার সৌভাগ্যগর্বিত বিলাসিতার অপরিহার্য অঙ্গরূপে গীতবাদ্যের আয়োজন করত, এবং তাদের প্রতিবিনোদনের

জন্যই এই ধরণের সংগীতের প্রচার ঘটেছিল। লোকসংগীত ওস্তাদি গান লঘু সংগীত মার্গসংগীত কীর্তন প্রভৃতি বিভিন্ন সাংগীতিক ঐতিহ্য আপন আপন স্বাতন্ত্র্য একীকৃত করে সবই বাঙলা সাহিত্যের প্রাণরস পুষ্ট করেছিল। একেই আমরা বাঙলা কাব্যসংগীত নামে অভিহিত করেছি। এই কাব্যসংগীতের প্রথম দিকে কিছু জড়তা আবর্জনা বর্ণনাবাহুল্য ভক্তিপ্রাবল্য ও প্রাচীন রীতির অনুবর্তন থাকলেও ধীরে ধীরে কাব্যসংগীতেও একপ্রকার রোমাণ্টিক আন্দোলন দেখা দেয় ও কাব্য-সংগীত গীতিকবিতার সমস্পর্ধী ধারা হয়ে ওঠে। নিধুবাবু থেকে শুরু করে রবীন্দ্র-নাথ পর্যন্ত বাঙলার এই নূতন গীতিকাব্যধর্মী কাব্যসংগীতই আমাদের আলোচ্য।

৪

"বাঙলা গানে ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশে, স্বকীয়তা-স্থাপনের প্রয়াসই হচ্ছে কাব্যসংগীতে রোমাণ্টিক আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বযুগে যাঁরা গান রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে রাধামোহন সেন নিধুবাবু কালীমির্জা শ্রীধর কথক এই চারজন প্রচলিত সংগীতের বিধিবদ্ধ রূপকে অর্থাৎ কনভেনশানকে পুরোপুরি স্বীকার করেননি। এদের মধ্যে নিধুবাবু ব্যক্তিগত চেতনাকে সর্বাপেক্ষা অধিক স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। রোমাণ্টিক চিন্তার প্রধান প্রেরণা এসেছিল তাঁরই কাছ থেকে। তারপরে বিভিন্ন পরিকল্পনায় কাব্যসংগীত বিচিত্র হয়ে উঠতে থাকে এবং রোমাণ্টিক আন্দোলন সার্থক হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ রচয়িতাদের বুদ্ধি-দীপ্ত সৌকর্যসম্পন্ন সৃষ্টিতে"।[৮]

সংগীতসমালোচকের এই উক্তি সমর্থন করেই বলা যায় যে, সংগীতের মধ্যে ব্যক্তিগত চেতনাকে প্রাধান্য দান করে গীতিকবিতা বা লিরিকেরআবেগে কাব্যসংগীত রচনার ইতিহাস নিধুবাবু সৃষ্টি করেন এবং তাঁর পরবর্তী উত্তরসাধকদের হাতেই গড়ে উঠল, আমাদের কাব্যসাহিত্যের বিপুল ঐতিহ্য। সেই ইতিহাসের দিক থেকে তার মূল্যায়ন করার প্রয়োজন আছে। যদি মন্ময়তা এবং সৌন্দর্যব্যাকুলতা, ব্যক্তিগত আবেগ ও ললিত প্রকাশরীতি রোমাণ্টিক গীতি-কবিতার লক্ষণ হয়, তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বিহারীলালের পূর্বে রামনিধি গুপ্তই বাঙলা সাহিত্যের প্রথম লিরিক-রচয়িতা, তাঁর মধ্যেই আধুনিক যুগের রোমাণ্টিক চেতনার একটি সার্থক বিকাশ ঘটেছিল। নিধুবাবু বাঙলা গীতিকবিতার ধারায় এমন একটি পরমাশ্চর্য বিস্ময়রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন যে উনিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত বাঙলাদেশে এমন গীতিকারের সাক্ষাৎ মেলে না যার উপর নিধুবাবুর প্রভাব পড়েনি।

ক্ষুদ্রায়তন বাক্‌বন্ধে হৃদয়ের গভীর বেদনা ও প্রেমানুরাগ প্রকাশের এই ভঙ্গিটি অচিরকালেব মধ্যেই আশাতীত জনপ্রিয়তা লাভ করল। নিধুবাবুব অনুপ্রেরণায় এবং অনুসরণে বাঙলা ভাষায় প্রেমভাবনা, হৃদয়বেদনা, মর্মোৎসারিত ভালোবাসার উপলব্ধি, সৌন্দর্যবোধ, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, আত্মস্বাতন্ত্র্যঘোষণা প্রভৃতি ব্যাপারগুলি এত অনায়াস হয়ে উঠেছে যে উনিশ শতকের শেষপ্রান্তে এসে শুধু প্রেমের গানের সংখ্যা কয়েক সহস্রে পরিণত হয়েছে, কেবল সংগীত-সংকলনের সংখ্যাও প্রায় পঁচিশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। শতাব্দীর মধ্যভাগে গীতিকবিতার আসরে দেখা দিলেন বিহারীলাল—কিন্তু ক্ষেত্র প্রস্তুতই ছিল। বিহারীলাল স্বয়ং নিধুবাবুর অনুপ্রেরণায় গীতরচনায় অভ্যস্ত ছিলেন। কাব্য-সংগীত যেমন বাঙলা রোমান্টিক গীতিকবিতাকে প্রভাবিত করেছে, রোমান্টিক গীতিকবিতাও তেমনি কাব্যসংগীতকে প্রভাবিত করেছে। কাবণ ঈশ্বর গুপ্ত থেকে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের কবিবৃন্দ প্রায় সকলেই কিছু না কিছু কাব্যসংগীত বচনা করেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই ধাবার সবশ্রেষ্ঠ প্রকাশ যাঁর কাব্যপ্রতিভাব নীলাভ বিদ্যুতে বাঙলা কাব্যসংগীত শতাব্দীকালের মধ্যে জ্যোতির্ময়তম হয়ে উঠেছে।

নিধুবাবু থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙলা কাব্যসংগীতের যে ইতিহাস তাকে বাঙলা সাহিত্যের অপরিহার্য অধ্যায়রূপেই গণ্য করা উচিত অথচ সংগীতেব নামাবলী জড়ানো বলে এই বিপুল সাহিত্য ও গীতিকবিতাকে সাধারণ কাব্য-পৃষ্ঠায় স্থান দেওয়া হয়নি। কাব্যগীতকাবদের কেউ কেউ ব্যক্তিগত প্রতিভায় সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পেলেও মোটামুটি কাব্যসংগীতকে গীতিকবিতা থেকে পৃথক করাই হয়েছে। তাব কাবণ, এই সুবিপুল কাব্যসংগীতের মধ্যে গীতিকবিতার উৎকর্ষ অপেক্ষা পৌনঃপুনিকতা, মন্থব অনুচিকীর্ষা, পল্লবগ্রাহিতার সংখ্যাও কম নয়। সেইজন্য অধিকাংশ কাব্যসংগীতই জন্মকালের স্বল্প পবিসরে আপন নশ্বর লীলাখেলা সমাপ্ত করে গতায়ু হয়েছে। সুবের অভিভাবকত্বেই তাদের জনপ্রিয়তা বহমান ছিল, কিন্তু কালক্রমে সুর হারিয়ে যাওয়ায় তার কাব্যমূল্য বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবাবে অধীরা নারীব মত আপনার স্বাধীন অস্তিত্বের দাবি বেশি দিন টিকিয়ে রাখতে পারেনি। গীতিকারকদের মধ্যে শতকরা দুতিনজন কবির কাব্যসংগীতের সংকলন স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। মোটামুটি বৃহৎ গীতসংকলনগ্রন্থাদিতেই কাব্যসংগীতগুলি নিবদ্ধ ছিল। ধীরে ধীরে সেই গ্রন্থগুলি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ হয়ে পড়ায় বাঙলা কাব্যসংগীতের এক সমৃদ্ধগৌরব যুগের চিহ্ন মুছে যেতে বসেছে। উনিশ শতকের গানের

স্বরগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো চেষ্টাই আমাদের সাংস্কৃতিক উদ্যমের অঙ্গীভূত হয়নি।

অথচ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলা কাব্যসংগীত তার উৎকর্ষের শীর্ষচূড়ায় আরোহণ করেছিল। একদিকে কবিসংগীত এবং তারই রূপান্তর ও ধারায় আখড়াই হাফআখড়াই তর্জা পাঁচালিগান দেশকে প্রমোদে পূর্ণ করে রেখেছিল। অন্যদিকে রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রহ্মসংগীত ও প্রাচীন যুগের ধারায় শক্তিপদ হরিভক্তিবিষয়ক পদ আমাদের আধ্যাত্মিক চিত্তজাগরণের সম্পদ হয়ে উঠেছিল। ব্রহ্মসংগীত বাঙলা কাব্যসংগীতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়। ক্রমবর্ধমান ব্রাহ্মধর্ম-আন্দোলন এই সংগীতের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল, সংগীতের শিল্পরুচি ও সৌন্দর্যচেতনার গুণে ব্রাহ্ম-আন্দোলন অনেকখানি অসাম্প্রদায়িক সার্বভৌমত্ব লাভ করেছিল। এই ব্রহ্মসংগীতের মত বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মবিশ্বাসীরাও তাঁদের ভক্তিধর্মকে সংগীতে প্রচার করার জন্য হৃদয়ের সমস্ত আবেগ, প্রতিভা ও উৎকণ্ঠাকে নিয়োগ করেছিলেন। পাঁচালি যাত্রা ও উনিশ শতকের লোকরঞ্জক পৌরাণিক নাটকগুলি এই ভক্তিসংগীতে প্লাবিত হয়ে যায়। এমন কি, এই ধর্মসংগীতের প্রেরণায় উনিশ শতকের শেষভাগে এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে মুসলমানী আধ্যাত্মিক সংগীত এবং খ্রীস্টধর্মাশ্রয়ী সংগীতও বাঙলায় অসংখ্য রচিত হয়েছিল।

ব্রহ্মসংগীতগুলি বাঙলা কাব্যসংগীতের ইতিহাসে যথার্থই এক নূতন ধারা। অপৌরাণিক অপৌত্তলিক নিরাকার ঈশ্বরের প্রতি শাস্ত্রীয় বা কৌলিক পূজার্ঘ্য-নিবেদন নয়, কেবল বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রেরণায় এবং হৃদয়ের স্বাভাবিক অসাম্প্রদায়িক ভক্তিতে নিবেদিত এই সংগীতগুলির স্বরে স্বরে উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবী ধর্মান্দোলনের ইতিহাস নিহিত আছে। ব্রহ্মসংগীতের পিছনে ভক্তির সঙ্গে প্রেমের, হৃদয়ের সঙ্গে মননের, সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে উদারতার এবং প্রচারের সঙ্গে সৌন্দর্যচেতনার মিলনটি চিত্তাকর্ষক বলেই তার ইতিহাসের পন্থানিরূপণ করা আধুনিক কাব্যসংগীতের ইতিহাসরচনার জন্য অনিবার্য। অবশ্য ব্রহ্মসংগীতে অহুচিকীর্ষা, একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি নেই এমন নয়—তথাপি আমাদের কাব্য-সংগীতের ইতিহাসে ব্রহ্মসংগীতের গুরুত্ব অপরিসীম। এই ব্রহ্মসংগীতের ক্রমবিকাশের ধারাতেই রবীন্দ্রনাথের গীতকার ও স্বরকাররূপে আবির্ভাব ঘটেছে।

বাঙলা প্রেমসংগীত এবং নাট্যসংগীতবিভাগেই কাব্যসংগীত। বিস্ময়কররূপে সমৃদ্ধ হয়েছে। আধুনিক মানুষের ব্যক্তিপ্রাধান্য, আত্মস্বাধীনতা ও চরিত্র সর্বাধিক প্রকাশিত হয়েছে এই প্রণয়াবেগবর্ণনায়। প্রেমের স্বাধীনহৃদয়বৃত্তি

মধ্যযুগের সাহিত্যে নানা কারণে বাধাগ্রস্ত ছিল। উনিশ শতকের নারীআন্দোলন সমাজে নারীত্বের সম্মান শ্রদ্ধা ও মূল্যবোধকে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করেছিল নারীর প্রতি পুরুষের সম্পর্ক কোনো পারিবারিক বা শাস্ত্রীয় অনুশাসনের দ্বার নিয়ন্ত্রিত না হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন হৃদয়ের মানদণ্ডে বিবেচিত হতে থাকে। তাই প্রেমকে ঘিরে কাব্যে-সাহিত্যে-নাটকে এত রোমাঞ্চ, সংগীতে এত তরঙ্গ, বাতাসে এত সৌরভ। এই নতুন প্রেমচেতনা সর্বপ্রথম নিধুবাবুর গানেই অভিনব অসাম্প্রদায়িক ভাষায় ও ঐতিহ্যহীন সুরের চমকপ্রদ আঙ্গিকে প্রকাশিত হল আধুনিক কালের জনৈক সংগীত-সমালোচক বলেছেন, "তিনি শুধু টপ্পারই প্রতিষ্ঠাতা নন, বলতে গেলে আধুনিক বাঙলা কাব্যসংগীতের প্রথম প্রেরণাও তাঁর কাছ থেকেই এসেছে"।[৯] নিধুবাবু উচ্চাঙ্গসংগীত, দেশীসংগীত ভালো ভাবেই শিক্ষা করেছিলেন এবং তাঁর স্বাভাবিক কবিপ্রতিভাকে মাঝে মাঝে আখড়াই গানেও চালিত করেছিলেন। তিনি যদি তাঁর স্বভাবকবিত্বকে সেদিন কবিওয়ালা-সম্প্রদায়, আখড়াই হাফআখড়াই দলের গীতকাররূপে স্থায়ীভাবে নিয়োজিত করতেন, তবে বাঙলা কাব্যসংগীতের আধুনিক যুগের ইতিহাস বিলম্বিত হত সন্দেহ নেই। উনিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যেই বাঙলার সমগ্র শিক্ষিত সমাজে তাঁর গান প্রচারিত হয়েছিল, এমন কি শিক্ষিত নিরক্ষরের মুখে টপ্পা সেদিন জাতীয় সুর হয়ে উঠেছিল, এ গৌরব আর কার ভাগ্যে ঘটেছে? অথচ সেদিন মুদ্রাযন্ত্র সুলভ ছিল না, পত্রপত্রিকার সহায়তা ছিল না, বেতার রেকর্ড প্রভৃতি প্রচারমাধ্যম কিছুই তাঁর অদৃষ্টে জোটেনি। এমনকি মুকুন্দদাসের মত লোকরঞ্জন যাত্রা বা গিরিশচন্দ্রের মত থিয়েটারের সাহায্যও তিনি পাননি। অত্যন্ত সহজ ভাষায় সুগভীর হৃদয়ের কথা তিনি অনায়াসে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন—মার্জিত সারল্য মাধুর্য এবং প্রসাদগুণ দিয়ে, পয়ারত্রিপদীর বাঁধারীতি অস্বীকার করে অথচ একপ্রকার স্বাভাবিক ভাবচ্ছন্দ ও আন্তরকাব্যত্বে তাঁর গানগুলি যুগহৃদয়ের পদাবলী হয়ে উঠেছে। প্রেমের সূক্ষ্মতা সন্ধান, নারীর দেহমনের সৌন্দর্য আবিষ্কার, মন নামক একটি নবলব্ধ ব্যাপারের বিবিধ কার্যকলাপ, মানাভিমানের শত প্রকরণ, সমাজশাসনে মিলনসম্ভাবনার বিঘ্নে বিষণ্ণতা ও সত্যকার হৃদয়ানুগত্যের নামে অঙ্গীকার, প্রেমের যে কত অসংখ্য প্রকারবিচিত্রতা দেখা দিল সে যুগের প্রেমসংগীতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করলে তা জানা যাবে। নিধুবাবুর ব্যক্তিগত জীবনের কিছু নিষিদ্ধ কিন্তু 'বিশুদ্ধ' প্রণয়াবেগের সঙ্গেও তাঁর গানগুলি জড়িত বলে জনশ্রুতি প্রচারিত হয়েছে। এই ধরনের সংবাদ

সত্য হলে প্রমাণিত হয় নিধুবাবুই সেই প্রথম আধুনিক যুগের রোমান্টিক গীতিকবি, যিনি আপন জীবনের অভিজ্ঞতার সংরাগ দিয়ে গান বেঁধেছিলেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার এই সাধারণীকরণের অর্ধশতাব্দীর বেশি কাল পরে বিহারীলালের আবির্ভাব।

বাঙলা নাটকের সূত্রপাত উনিশ শতকের মধ্যভাগের পর থেকে এবং সূত্রপাতের কাল থেকেই বাঙলা নাটকের জনপ্রিয়তার একটি প্রধান উপাদান হয় সংগীত। সমকালীন জনপ্রিয় সংগীতধারা মুখ্যত নাট্যসাহিত্যের মাধ্যমেই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ শতক পর্যন্ত সাধারণ মানুষের কাছে সহজে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য যাত্রাপাঁচালির হাতেই পূর্বে এই দায়িত্ব অর্পিত ছিল; কিন্তু নাটক একটি যৌথ শিল্প বলে নাট্যকারমাত্রই গীতকার হয়ে উঠলেন না। নাট্যসংগীতরচনা ও সুরযোজনার দায়িত্ব অপরের উপর অর্পিত হল আর তার ফলে নাটকের জনপ্রিয়তা বেড়ে গেল।[১০] অবশ্য কোন নাটকের জন্য কারা সেকালে গান রচনা করে দিয়েছিলেন সে তথ্য সর্বদা সহজলভ্য নয়, বরং মনোমোহন বসু গিরিশচন্দ্র গীতিকাররূপেই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। বাঙলা কাব্যসংগীত নিধুবাবুর সময় থেকেই বিশেষভাবে ব্যক্তিগত ভাবানুভূতির বাহন হয়ে পড়ায় কিছুটা নাট্যধর্মী হয়ে উঠেছিল। এখন নাট্যকারদের হাতে পড়ে কাব্যসংগীত বিচিত্র পরিবেশে ও চরিত্রের মুখে ব্যবহৃত হল, ফলে বাঙলা গীতিকাব্যের সম্ভাবনা যে কী ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল তা অকল্পনীয়। রঙ্গমঞ্চই ভাবালুতার সঙ্গে বাস্তবতার সমন্বয় ঘটিয়ে বাঙলা গানের আয়ুকে সুদীর্ঘ করে দিয়েছিল। মনোমোহন গিরিশচন্দ্র বাঙলা গানকে নাটকে ব্যবহার করে বাঙলার লোকায়ত সুর, পাঁচালি-তর্জা-আখড়াই-কীর্তন-ঢপ এগুলির মধ্যে একটি সার্থক সমন্বয় ঘটালেন। সেই সঙ্গে ভক্তিকেও সংগীতের একটি অপরিহার্য অঙ্গ করে তুললেন। উনিশ শতকের শেষ দিকে বাঙলাদেশে বিশেষ করে কলকাতায় যে ধর্মসংস্কার-আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, মনোমোহন গিরিশচন্দ্রের ভক্তিসংগীত তাতে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এবং সেই সংগীতগুলি সব নাটকের মধ্য দিয়েই জনপ্রিয় হয়েছিল।

মোটের উপর উনিশ শতকের প্রথম থেকে শেষভাগ পর্যন্ত, বাঙলা কাব্যসংগীতের সবচেয়ে সমৃদ্ধ পর্বে, সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি পৃথক অধ্যায় এই কাব্যসংগীতের দ্বারাই নির্মিত হয়েছে—যদিও সেই অধ্যায়ের মানচিত্রটি এখনো জরিপ করে আঁকা হয়নি। বাঙলা সাহিত্যে তথা বাঙলা কবিতায় যে সমস্ত ধারা শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পল্লবিত হয়েছে কাব্যসংগীতেরও তার প্রভাব পড়েছে।

অল্পবিস্তর সমস্ত কবিই সামান্য কিংবা প্রচুর গান রচনা করেছেন, পরবর্তী সংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলিতে তাঁদের নাম দেখা যাবে। উনিশ শতকের গীতিকাররা সকলে অসাধারণ কবি বা পণ্ডিত ছিলেন না, সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য যে বিদ্যা ও ঐতিহ্যপ্রীতি দরকার তা তাঁদের ছিল। দেশীয় ভাবধারা ও পৌরাণিক ঐতিহ্য, সামাজিক পরিস্থিতি ও ইতিহাস, জাতীয় চাহিদা ও ভারতীয় সংগীতের পূর্বতন ধারার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে তাঁদের গান এত সহজে জনচিত্তের গভীরে প্রবেশ করতে পারত না। নিধুবাবু দাশরথি গিরিশচন্দ্র মনোমোহন সকলেই বাঙালীর জাতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে থেকেই অভিনবত্ব ও নূতনত্বের আস্বাদ দান করেছেন।[১১]

বাঙলা দেশাত্মবোধক গানের ইতিহাস অবশ্য খুব প্রাচীন নয়, কারণ যে স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা অরণি হয়ে চিত্তে তাপাগ্নি জ্বালায়, উনিশ শতকের শেষ দুই এক দশক ছাড়া সেই প্রেরণা জাতীয় জীবনে যথেষ্ট তীব্র হয়ে ওঠেনি। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই আমাদের দেশে সত্যকার জাতীয় সংগীতের ভাবোচ্ছ্বাস দেখা দেয়। উনিশ শতকের দেশাত্মবোধক গান, বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সমকালীন এবং অসহযোগ-আন্দোলনের সমকালীন গান সবগুলিই আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্বদেশচেতনার ইতিহাস এই জাতীয় কাব্যসংগীতে কেমন করে বিকশিত হয়েছে তার সম্পূর্ণরূপটি দেখাতে হলে আধুনিক যুগের দ্বারপ্রান্ত অবধি আসতে হয়। বাঙলা দেশপ্রেমাত্মক কাব্যসংগীতের ইতিহাসে দ্বিজেন্দ্রলাল অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের অবদান অসামান্য হলেও রবীন্দ্রপরবর্তী গীতরচয়িতা হিসাবে তাঁদের গানের আলোচনা এখানে উহ্য রাখা হয়েছে। তাঁদের বিপুল আগ্নেয় প্রতিভা স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে।

বাঙলা কাব্যসংগীতের এই আলোচনা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়, কিন্তু ইতিহাস-রচনার খশড়া বা প্রাথমিক উপাদানসংগ্রহ মাত্র। কাব্যসমালোচনার বা রসগ্রাহী বিশ্লেষণের মানদণ্ডে কাব্যসংগীতের গীতমূল্য সর্বদা বিচার করা সম্ভব হয়নি। অনেক অক্ষম গীতরচনা সুরের আনুকূল্যে হয়ত একদা অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল কিন্তু সুরহারা সেই গান তার বাক্‌রূপের পঙ্গুতা আজ কোনো মতেই গোপন করতে পারে না। তথাপি সংগীতের ইতিহাসে তার ভূমিকাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। গীতরচনা কাব্যরচনার চেয়েও কঠিন শিল্প বলে মনে হলেও মোটামুটি কাব্যসংগীতের ব্যবহারিক আদর্শ জানা হয়ে গেলে স্বল্পাক্ষর একটি গীতরচনা যে কোনও কৃতবিদ্য ব্যক্তির পক্ষে সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের বাঙলা গান এইরূপ অনায়াসসৃষ্টি,

কবিত্বে দীন অথবা প্রথাগত, সমজাতীয় কিংবা অতিসরলীকৃত। তাছাড়া মিত্রাক্ষর ব্যবহারের অনিবার্যতায় নিয়ন্ত্রিত বলে কবিত্বের স্বাভাবিক প্রকাশ বাহৃত এখানে ব্যাহত। তথাপি সেই বন্ধনের মধ্যেও মুক্তির ফুল ফুটিয়েছেন কবিরা এবং তাঁদের অনেকের পদই যথার্থ গীতিকবিতা হয়ে উঠেছে। বাঙলা কাব্যসংগীতের ছন্দোরূপেও কবিতার মত বহু পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে ; উপমা উৎপ্রেক্ষা, অলংকৃত প্রকাশভঙ্গি, চিত্রকল্প ব্যবহারের দিক থেকেও তাতে কত অসামান্যতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আমাদের আলোচনা যেহেতু তার ঐতিহাসিক বিবরণরেখা অঙ্কন করা সেইজন্য সেই বিষয়ে বিশ্লেষণাত্মক গবেষণাকে আমরা পরিহার করেছি। বাঙলা গানের স্বরবিচিত্রতাই একটি স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয় হতে পারে, কিন্তু সে প্রসঙ্গ বিশেষজ্ঞের সহৃদয় উপলব্ধি ও নিষ্ঠাপূর্ণ তথ্যানুসন্ধিৎসার উপর নির্ভরশীল। আশা করা যায়, কাব্য-সংগীতের অবহেলিত পর্ব আমাদের কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে নূতন মূল্যে ও তাৎপর্যে, শ্রদ্ধায় ও ঐতিহ্যপ্রীতিতে প্রতিষ্ঠিত হবে।

৫

বাঙলা কাব্যসংগীতের ঐতিহ্যবাহিত পথেই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব এবং রবীন্দ্রনাথেই এই ধারা মহাসাগরসংগমে মিলিত। কাব্যসংগীত শব্দটি রবীন্দ্রনাথও স্বয়ং তাঁর নানা লেখায় ব্যবহার করেছেন এবং অন্যান্য সংগীত-বিশেষজ্ঞরাও আজ এই শব্দটি গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সংগীত-বিষয়ক আলোচনায় দিলীপকুমার রায়ও স্বীকার করেছেন যে, "বাঙলা গানে একরোখা স্বরবিহার নামঞ্জুর। কারণ এ গানকে বলা যেতে পারে কাব্যসংগীত।" 'সাংগীতিকী' গ্রন্থের 'স্বর ও কথার রফা' প্রবন্ধে তিনি এই কাব্যসংগীতের স্বপক্ষে এবং বাঙলা কাব্যসংগীতের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। ১৩২৬ সালের পৌষে রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যগীতি' নামে একটি স্বরলিপিগ্রন্থ প্রকাশিত হয়—কিন্তু সেখানে কাব্যগীতি শব্দটি হয়ত অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল। উক্তগ্রন্থের গানগুলি কবির কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের কবিতা থেকে গৃহীত ও পরে স্বরারোপের ফলে সংগীতে পরিণত বলে কবি সেইগুলিকে 'কাব্যগীতি' বলেছিলেন[১২]। কিন্তু উক্ত কাব্যগীতে এমন আরও অনেক গান আছে যেগুলি কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত নয়—গানের নিজস্ব আঙ্গিকেই রচিত। অতএব কাব্যগীতি কবির আপন গীতের বিশেষণাত্মক অভিধারূপে স্বয়ং কবিকর্তৃকই ব্যবহৃত হয়েছে দেখা যাচ্ছে।

কাব্যসংগীতের বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম নির্দেশ করেন সাধনা পত্রিকায় ১৩০১ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রলালের 'আর্যগাথা' সমালোচনা প্রসঙ্গে। 'আধুনিক সাহিত্যে' সংকলিত উক্ত প্রবন্ধে কবি প্রথমে সাধারণ কবিতা ও সুরযুক্ত কবিতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। গানে স্বভাবতই কথার চেয়ে সুরের প্রাধান্য, সুরব্যতিরিক্ত কথার শ্রীহীনতা ও অর্থশূন্যতা গোপন করা যায় না। সংগীতের দ্বারাই যখন ভাবপ্রকাশ করা হয় তখন কথা নিঃসন্দেহে উপলক্ষ। কথার দ্বারা অভিব্যক্ত বিষয়ের সুপরিস্ফুটতা আর ভাবের অস্পষ্টতার মধ্যে বিরোধ স্বীকার করে কবি বলেছেন, "যাহা কথার অতীত, যাহা অহৈতুক —সেই সকল ভাব, অন্তরাত্মার সেই সমস্ত আবেগ-উদ্বেগগুলি সংগীতেই বিশুদ্ধভাবে ব্যক্ত হইতে পারে।" হিন্দুস্থানী গানে কথার ভূমিকা সামান্য বলেই সংগীতের কল্লোলপ্রবাহ সেই কথাগুলিকে নিয়ে নানাভাবে খেলা করে, সুরের আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়। এই বিষয়ে এ পর্যন্ত মতভেদ নেই বা মতভেদের কারণ নেই। কিন্তু কবি লিখেছেন—

"বিশুদ্ধ কাব্য এবং বিশুদ্ধ সংগীত স্ব স্ব অধিকারের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু বিদ্যাদেবীগণের মহল পৃথক্ হইলেও তাঁহারা কখনও কখনও একত্র মিলিয়া থাকেন। সংগীতে ও কাব্যে মধ্যে মধ্যে সেরূপ মিলন দেখা যায়। তখন উভয়েই পরস্পরের জন্য আপনাকে কথঞ্চিৎ সংকুচিত করিয়া লন, কাব্য আপন বিচিত্র অলংকার পরিত্যাগ করিয়া নিরতিশয় স্বচ্ছতা ও সরলতা অবলম্বন করেন, সংগীতও আপন তালসুরের উদ্দাম লীলাভঙ্গকে সম্বরণ করিয়া সখ্যভাবে কাব্যের সাহচর্য করিতে থাকেন।"

কেবল এইমাত্র লিখলেই বাঙলা কাব্যসংগীতের একটি সার্থক সংজ্ঞা লাভ ঘটত, গত শতকের সুরু থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত বাঙলার সংগীতরসিক কবিদের এই সাধনার যথার্থ একটি স্বরূপ নির্ণয় করা যেত। কবি এই বিষয়টিকে স্বভাবতই বিষয়ের নিজস্ব আকর্ষণে গ্রহণ করেছিলেন এবং আপন সংগীতপ্রবণ চিন্তানুকূল্যে অধিকতর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রাচীন সাহিত্যের উদাহরণ দিয়ে ইতিহাসসম্মত দৃষ্টিতেই কবি বলেছেন যে, আমাদের দেশে চিরকালই কাব্য ও সংগীতের সম্মেলন ঘটেছে, গানের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ও স্বাধীন পরিণতি এদেশে স্থান পায়নি। চণ্ডীমঙ্গল অন্নদামঙ্গল বৈষ্ণব পদাবলী সবই কাব্য অথচ গেয় অর্থাৎ কাব্যকে অন্তরের মধ্যে সুরের দ্বারা ধ্বনিত করা হত, কাব্যকে চতুর্বিকীর্ণ করার জন্যই সুরের পক্ষযোজনা। কীর্তন যেন 'ভাবের বোঝাইপূর্ণ সোনার কবিতা ভরাসুরের সংগীতনদীর মাঝখান' দিয়ে প্রবাহিত। অবশ্য

এমন রচনা আছে সুরের প্রতি নির্ভরশীলতার মাত্রাধিক্যে যার কাব্যত্ব সুখপাঠ্য হয়না, যার বাকশব্দগত পঙ্গুতা আবৃত্তিকালে পীড়াদায়ক, কিন্তু অধিকাংশ কাব্যসংগীতের ধর্মই হওয়া উচিত সুরব্যতিরেকে সুরের আকাঙ্ক্ষাকে ফুটিয়ে তোলা। যেন কবিতারূপে পাঠ করলেও তার আকৃতিপূর্ণ সংগীতটি আমাদের কল্পনায় ধ্বনিত হতে থাকে, 'যেমন ছবিতে একটা নির্ঝরিণী আঁকা দেখিলে তাহার গতিটি আমরা মনের ভিতর হইতে পূরণ করিয়া লই।' তাছাড়া আর একধরণের কবিতা আছে যা সংগীতের মত কোনো সুখস্মৃতি বা সৌন্দর্যস্বপ্ন জাগিয়ে দেয়, যাকে কবি বলেছেন 'গীতরস'। "কবিতায় যখন বিশুদ্ধ সৌন্দর্যমোহ অথবা ভাবের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত হয় তখন কথা তাহার চিরসঙ্গী সংগীতের জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতে থাকে।"

দ্বিজেন্দ্রলালের আর্যগাথার গানগুলি সম্পর্কে কবি যা লিখেছিলেন, তাঁর নিজের গান সম্পর্কে তা প্রত্যক্ষতর সত্য। কাব্য ও সংগীত এই উভয়কে কবি একই শাস্ত্রের অঙ্গ বলে ঘোষণা করেছেন, সে শাস্ত্রের নাম দিয়েছেন ললিতকলা শাস্ত্র। 'কথা ও সুর' নামক প্রবন্ধে (১৯৩৭) এই বিষয়ে তাঁর অভিমত ছিল—

"কালিদাস রঘুবংশে বলেছেন বাক্য এবং অর্থ একত্রে সংপৃক্ত। কিন্তু যে বাক্য কাব্যের উপাদান অর্থকে সে অনর্থ করে দিয়ে তবে নিজের কাজ চালাতে পারে। তার প্রধান কারবার অনির্বচনীয়কে নিয়ে, অর্থের অতীতকে নিয়ে। কথাকে পদে পদে আড করে দিয়ে ছন্দের মন্ত্র লাগিয়ে অনির্বচনীয়ের জাদু লাগানো হয় কাব্যে, সেই ইন্দ্রজালে বাক্য সুরের সমান ধর্ম লাভ করে। তখন সে হয় সংগীতেরই সমজাতীয়। এই সংগীতরসপ্রধান কাব্যকে ইংরেজিতে বলে লিরিক, অর্থাৎ তাকে গান গাওয়ার যোগ্য বলে স্বীকার করে। একদা এই জাতীয় কবিতা সুরেই সম্পূর্ণতা লাভ করত। কবিতার এই সম্মিলিত সম্পূর্ণরূপ সে দিন গান বলেই গণ্য হত, বৈদিককালে যেমন সামগান।

সুরসম্মিলিত কাব্যের যুগলরূপের সঙ্গে সঙ্গেই সুরহীন কাব্যের স্বতন্ত্র রূপ অনেকদিন থেকেই আছে। অপেক্ষাকৃত পরে যন্ত্রের সাহায্যে গানের স্বাতন্ত্র্যও ক্রমে উদ্ভাবিত হল।······

আমি যে গানের আদর্শ মনে রেখেছি তাতে কথা ও সুরের সাহচর্যই শ্রদ্ধেয়, কোনো পক্ষেরই আনুগত্য বৈধ নয়। সেখানে সুর যেমন বাক্যকে মানে, তেমনি বাক্যও সুরকে অতিক্রম করে না।······

আধুনিক বাঙলা গানও একটি স্বাভাবিক বিশেষত্ব নিয়েছে। এই সংগীতে কথাশিল্প ও সুরশিল্পের মিলনে একটি অপরূপ সৃষ্টিশক্তি রূপ নিতে চাচ্ছে"।[১৩]

অন্যত্রও কাব্য এবং সংগীতের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনায় আপন গানের উদাহরণ দিয়েছেন কবি, বলেছেন, "আমার গানের কবিতাগুলিতে বাক্যের আম্বরিকতাকে আমি প্রশ্রয় দিইনি—অর্থাৎ সেইসব ভাব, সেইসব কথা ব্যবহার করেছি, স্বরের সঙ্গে যারা সমানভাবে আসনভাগ করে বসবার জন্যই প্রতীক্ষা করে।"[১৪]

আর একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন, "কাব্যরচনাই বাঙলা গানের মুখ্য উদ্দেশ্য, স্বর-সংযোগ গৌণ। এই সকল কারণে বাঙলা সাহিত্যভাণ্ডারে রত্ন যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা গান।"[১৫]

সুতরাং কবির আত্মস্বীকৃতিই প্রমাণ করে বাঙলা কাব্যসংগীতের ঐতিহ্য অনুসরণ করেই তিনি কাব্যসংগীতের স্বকীয় সম্পদ রচনা করেছেন। প্রথম জীবনে আপনার গানকে পাঠ্য কবিতারূপে প্রচার করায় তাঁর সংকোচ ছিল কিন্তু শেষবয়সে গীতবিতান প্রকাশকালে এই গ্রন্থকে একটি সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থরূপে প্রচার করার দিকেই কবির চিত্তপ্রবণতা উন্মুখ হয়েছিল। তাই প্রথম সংস্করণ গীতবিতানের কালানুক্রমিক গীতসজ্জা বর্জন করে দ্বিতীয় সংস্করণে গানগুলিকে তিনি বিষয়সূত্রে নবগ্রথিত করেন এবং পূজা প্রেম প্রকৃতি প্রভৃতি শিরোনামা নির্দেশ ছাড়াও পারস্পরিক বহু অনুভবগম্য সূক্ষ্ম ভাবসাদৃশ্যে, তাদের মধ্যে এক প্রকার অদৃশ্য অন্তর্বয়নের দ্বারা বিনিসুতোর মালা পরিয়ে দিয়েছেন। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথকে বাঙলা কাব্যসংগীতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বলা যায়।

অথচ রবীন্দ্রনাথের সংগীতসৃষ্টি তাঁর অন্যান্য সাহিত্যসৃষ্টিকে উপেক্ষা করেনি। কবি হিসাবে তাঁর জীবনব্যাপী বাণী ও কাব্যাদর্শ তাঁর সমস্ত সারস্বত সৃষ্টিতেই প্রতিফলিত। রবীন্দ্রনাথের সংগীতের কবিনির্দিষ্ট বিষয়বিভাগ অবলম্বন করেই আমরা এই আলোচনানিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সেই এক অখণ্ড সমগ্র কবিপুরুষ বা সারস্বত ব্যক্তিত্বকেই দেখার চেষ্টা করেছি। তাঁর ভক্তি ও ধর্মসাধনার মূল আদর্শই কেমন করে তাঁর পূজা পর্যায়ের সংগীতে প্রতিফলিত হয়েছে, তাঁর প্রকৃতিদৃষ্টির সমগ্রতাই তাঁর ঋতুর গানগুলিকে কী আনন্দময় প্রেরণায় উৎসারিত করেছে, তাঁর দেশপ্রেমের স্বরূপ কী এবং সেই স্বরূপ তাঁর স্বদেশচেতন গানগুলিতে কীভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে, মোটামুটি সে বিষয়ে কয়েকটি স্থূল নির্দেশদানের চেষ্টা করা হয়েছে। মহাপ্রতিভার সেই দুরধিগম্য রহস্যনিকেতনে প্রবেশ করার অধিকার যাঁর আছে তিনি নিশ্চয় রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে কবির সমগ্র সাহিত্যসাধনার তুলনামূলক আলোচনা করে রবীন্দ্রমনীষার পূর্ণরশ্মি বিশ্লেষিত করে দেখাবেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও সংগীতের তুলনামূলক আলোচনা এবং নাট্য-সংগীতের বিস্তারিত বিশ্লেষণ ছাড়াও রবীন্দ্রসংগীতের কালানুক্রমিকতা নির্ণয়ের একটি অপটু ঐতিহাসিক চেষ্টাও যথাসম্ভব এই আলোচনায় করা হয়েছে। কাব্যসংগীত বা কাব্য, নাটক বা ছোটগল্প, রবীন্দ্রনাথের যে কোনও সৃষ্টির বিচার করতে গেলে যথার্থ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় স্থাপন করে দেখা উচিত। রবীন্দ্রনাথ জীবনের একেবারে প্রভাতকাল থেকেই রচনার স্থানকাল সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন ছিলেন। মানসী কাব্যগ্রন্থ থেকেই তাঁর রচনার সঙ্গে তাই রচনাকাল ও প্রায়শ স্থাননির্দেশ আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিপুল সংগীত-সৃষ্টির সঙ্গে রচনাকালের উল্লেখ নেই। সম্ভবত অদূরভবিষ্যতে বিশ্বভারতী এই বিষয়ে আমাদের দীর্ঘকালের প্রয়োজন নিবসনের ব্যবস্থা করবেন। মোটামুটি প্রকাশিত গ্রন্থাদি, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রচনা এবং রবীন্দ্রজীবনীর সাহায্যে আমরা রবীন্দ্রনাথেব গীতবিতানে প্রকাশিত সংগীতগুলিব কিছু অংশেব কালনির্দেশ করতে পেরেছি এবং রবীন্দ্রনাথের সংগীতশিল্পী-জীবনের একটি রেখাবয়ব রচনা করেছি। রবীন্দ্রনাথের পূর্বপ্রকাশিত যে সব সংগীতগ্রন্থ পরবর্তীকালে আর মুদ্রিত হয় না, যেমন রবিচ্ছায়া, প্রবাহিণী—এইগুলিতে প্রকাশিত কবির সংগীতগুলির তালিকাও পবিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে।

১ গীতিকাব্য (বঙ্গদর্শন বৈশাখ ১২৮০)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়. বিবিধ প্রবন্ধ

২. হিন্দুসংগীত ও কবিবর স্যাব ববীন্দ্রনাথ—কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্তচিন্তামণি (১৩২৫)

৩. ভাবতীয় সংগীত—উপেন্দ্রকিশোব বায় , প্রবাসী ১৩১৯ ফাল্গুন

৪. রবীন্দ্রসংগীতের ঐতিহ্য—শৈলজাবঞ্জন মজুমদাব : গীতবিতান পত্রিকা ১৩৬৮

৫. আমাদেব সংগীত—'সংগীতচিন্তা'য় সংকলিত

৬। ছন্দশিল্পী বামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র--প্রবোধচন্দ্র সেন. বিশ্বভারতী পত্রিকা কার্তিক-পৌষ ১৩৭৩

৭। কবিসংগীত—রবীন্দ্রনাথ (লোকসাহিত্য)

৮। ববীন্দ্রসংগীতেব রূপকল্প--রাজ্যেশ্বব মিত্র, সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'ববীন্দ্রনাথ, মনন ও শিল্প' গ্রন্থের অন্তর্গত

৯। বাঙলার গীতকার—রাজ্যেশ্বব মিত্র (আশ্বিন ১৩৬৩) ,, বাঙলাব টপ্পা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

১০। যেমন গিবিশচন্দ্রেব গানেব সুরকার হিসাবে এঁদের নাম পাওয়া যায়—রামতাবণ সান্যাল, দেবকণ্ঠ বাগচি, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল দত্ত (হাবুবাবু), সুবেন্দ্রনাথ দত্ত (তমুবাবু), নবেন্দ্রনাথ সরকাব, জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শশিভূষণ কর্মকাব, বৈকুণ্ঠনাথ বসু, বেণীমাধব বসু। দ্রষ্টব্য গিরিশ-গীতাবলী

১১। প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য সংগীত ও সংস্কৃতি—রাজ্যেশ্বর মিত্র : পরিচয় বৈশাখ ১৩৬৬

১২। যথা, এ শুধু অলস মায়া, কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া, ধরা দিয়েছি গো আমি

আকাশের পাখি, যাত্রী আমি ওরে, খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে, আবার মোরে পাগল করে দিবে কে—এগুলি প্রধানত কড়ি ও কোমল এবং মানসীর, একটি গীতাঞ্জলি ও একটি সোনার তরীর কবিতারূপে সুপরিচিত। কাব্যগীতে অলকে কুসুম না দিও, আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে, আমার দিন ফুরালো, কেন সারাদিন ধীরে ধীবে, সময় আমার নাই যে বাকি, পাখি আমার নীড়ের পাখি—ইত্যাদি গানগুলি গানের আঙ্গিকেই রচিত

১৩। 'সংগীতচিন্তা'র কথা ও সুর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

১৪। দিলীপকুমার রায় ও কবির আলোচনা, 'সংগীতচিন্তা'ব আলাপ-আলোচনা অংশে পুনরুদ্ধৃত

১৫। বাঙলা শব্দ ও ছন্দ, শ্রাবণ ১২৯৯, 'সংগীতচিন্তা'য় উদ্ধৃত

উনিশ শতকের কাব্যসংগীত : গীতরূপ-বৈচিত্র্য

১

বাঙলা সাহিত্য প্রাচীন ও মধ্যযুগে একান্তভাবেই স্বরাশ্রিত ছিল কারণ মুদ্রাযন্ত্রহীন সমাজে সে সাহিত্যের প্রচার ছিল শ্রুতিনির্ভর, ধর্মপ্রাণ এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির দোসর। কবিরা ছিলেন প্রধানত গায়ক। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে এসে সাহিত্য থেকে সেই অভ্যস্ত গায়নভঙ্গি অন্তর্হিত হতে থাকে এবং পাঠ্যসাহিত্য রচিত হয়। আবার এই সময়ে থেকেই আর এক ধরণের সাহিত্য গড়ে উঠতে থাকে যাকে কাব্যসংগীত বলা যায়। কাব্য এবং কাব্যসংগীত পরস্পরকে প্রভাবিত করে উনিশ শতকে সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে চলে, আজ পর্যন্ত তার সমান্তরধারা অক্ষুণ্ণ আছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধকেই বাঙলা গানের উষাযুগ বলা হয়। বাঙালির সাহিত্যচেতনায় সেদিন যে নবজাগরণ এসেছিল, যার সংগীত-সংস্কৃতিতেও তার প্রভাব পড়েছিল। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে রামগতি ন্যায়রত্ন ১৮২৮-১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দকে 'গানের যুগ' আখ্যা দিয়েছিলেন। এই সময় থেকেই মার্গসংগীতের পুনরুদ্ধার ও কাব্যসংগীতের সমাদরের প্রতি সুধী বিদগ্ধ মানুষের মনোযোগ নিবিষ্ট হয়। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে বাঙলাদেশে ধ্রুপদের চলন হয়। পশ্চিমবাঙলার বিষ্ণুপুরের মল্লদেশীয় মহারাজা রঘুনাথ সিংহ তানসেনবংশীয় শিল্পী বাহাদুরসেনকে বিষ্ণুপুরে আনেন। বাঙলাদেশে মনোহরশাহি ও রেনেটি কীর্তনও এই সময় থেকেই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সুরু করে। ঢাকা শহরও অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে উচ্চাঙ্গসংগীতের কেন্দ্র হয়। এর আগে মুর্শিদাবাদের নবাববাড়িতে নিয়মিত ভারতীয় উচ্চাঙ্গসংগীতের অনুশীলন হত। রূপরামের ধর্মমঙ্গল পাঠে জানা যায়, বিষ্ণুপুরের রাজারা ছিলেন বৈষ্ণব ও বিদগ্ধ। অথচ বৈষ্ণব হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কীর্তনের সমাদর ছেড়ে দিল্লি থেকে মুসলমান ওস্তাদ আনিয়ে গানবাজনার চর্চা করতেন এবং এইভাবে নিজেদের রাজকীয় মর্যাদা রক্ষা করতেন।[১] আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে কলকাতা শহরে ধনী-বিত্তশালী-ভূস্বামী-ব্যবসায়ী শ্রেণীর উপনিবেশ স্থাপিত হয় এবং এইভাবে একপ্রকার নাগরিক সংস্কৃতি গড়ে উঠতে থাকে। তাদের রুচিবিলাসিতা, অবকাশরঞ্জন, আমোদের অন্যতম উপকরণ ছিল গীতিবাদ্য-চর্চা, তা কবিসংগীত বা আখড়াই গান যাই হোক না কেন। তাদেরই আমন্ত্রণে অথবা তাদের পৃষ্ঠপোষকতার দরাজ সৌভাগ্যের লোভে ভারতবর্ষের নানাস্থান

থেকে অবাঙালি গুণী সংগীতশিল্পীরা বাঙলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। বিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক লালা কেবলকিষণ, বেতিয়ার মহারাজ নওলকিশোরের আশ্রিত শিবনারায়ণ মিশ্র ও গুরুপ্রসাদ মিশ্র কলকাতাতেই উপনিবিষ্ট হলেন।[২] এইভাবে কলকাতার নাগরিক সভ্যতাপত্তনের গোড়া থেকেই অভিজাত ধনবান ভূস্বামী ও রাজন্যব্যক্তিদের অর্থ ও পদমর্যাদা-রক্ষার প্রতিযোগিতায় বাঙলার সংগীতসংস্কৃতি সমৃদ্ধ হতে সুরু করেছিল। এরই ফলে বাঙলা গানে এই সময় থেকেই রাগরাগিণী ও বিভিন্ন অঞ্চলের গায়কি ও ঢঙের মিশ্রণে প্রগতির সূচনা হতে থাকে, গানের কাব্যবস্তুর উপর যার প্রভাব পড়া অনিবার্য। ঠিক এইভাবেই অবাঙালি গীতরীতি ও হাল্কা-বিষয় নিয়ে নিধুবাবু বাঙলাদেশে টপ্পা নামক একজাতীয় কাব্যসংগীতের সৃষ্টি করেন।

বাঙলা ১৩১২ সালে ভূতপূর্ব অনুসন্ধান পত্রের সম্পাদক এবং বঙ্গবাসী পত্রিকার অন্যতম সংগঠক দুর্গাদাস লাহিড়ী 'বাঙালির গান' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক বাঙলাদেশের সংগীতধারাকে সাতটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। আমরা সেই বিভাগকে যথার্থ মনে না করলেও আলোচনার সুবিধার জন্য এখানে উদ্ধৃত করলাম—

"প্রথম যুগের সংগীতরচয়িতা ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবকবিগণ, তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে আজিও যে সকল সংগীত রচিত হইতেছে, তৎসমুদয়কে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া মনে করি।

দ্বিতীয় যুগের প্রবর্তক কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ। তাঁহার অনুসরণে আজিও যাঁহারা সংগীত রচনা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে রামপ্রসাদের সম্প্রদায়মধ্যে গণ্য করি। আজু গোঁসাই, রামদুলাল দাস প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের প্রথম দলভুক্ত। তৃতীয় যুগে কবিগীতির সৃষ্টি। রঘুনাথ হরু ঠাকুর রাম বসু প্রভৃতি এই সময়ের প্রসিদ্ধ কবিগীতির রচয়িতা। ইহারা যে অমূল্য ভূষণে বঙ্গভাষাকে সুসজ্জিত করেন তাহা চিরদিন সমুজ্জ্বলে বিরাজ করিবে।

বাঙলা সংগীতের চতুর্থ যুগ টপ্পা। ভারতচন্দ্রের পর নিধুবাবুই সর্বপ্রথম সরল বাঙলা ভাষায় বিশুদ্ধ ভাবব্যঞ্জক টপ্পাসংগীত রচনা করিয়া বাঙালিকে মোহিত করেন। শ্রীধর কথক প্রভৃতি নিধুবাবুর পরবর্তী টপ্পাগীতির রচয়িতাগণ এই সম্প্রদায়ভুক্ত। কীর্তন ও পদাবলীরচয়িতাগণই পঞ্চম যুগের প্রবর্তক। বৈষ্ণবকবিগণের পদাবলী ভাঙিয়া কীর্তনের সৃষ্টি। পাঁচালি, কবিগীতিরই রূপান্তর মাত্র। মধুকান কীর্তনের এবং দাশরথি রায় পাঁচালির প্রবর্তক।

তাহার পর বাঙালির গানে আর এক নূতন যুগের সৃষ্টি হয়। তাহাই ষষ্ঠ

যুগ। রাজা রামমোহন রায় এই যুগের প্রথম পথপ্রদর্শক। ইনিই প্রথমত ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন। তৎপরবর্তী ব্রহ্মসংগীতরচয়িতাগণ ইহারই অনুকরণ করিতেছেন।

বর্তমান যুগকে আমরা সংগীতের সপ্তম যুগ অভিহিত করিতে চাই। এ যুগে নূতনত্ব কিছুই নাই। এ যুগে নামে যাহা কিছু হইয়াছে সকলই পূর্ববর্তী গীতরচয়িতাগণের অনুসরণ মাত্র। যাত্রা থিয়েটার এবং ধর্মসংগীত প্রভৃতিতে রচনার নামে নূতন পন্থা আর প্রবর্তিত হইতেছে না। অনুকরণে নানারূপ গানই রচিত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে সকল যুগের গানেরই সংমিশ্রণ দেখিতে পাই। সুতরাং বর্তমান যুগকে মিশ্র যুগ নামে অভিহিত করিলেও করিতে পারা যায়।"

বর্তমান যুগকে মিশ্র যুগ বলা হয়ত অসংগত নয় কারণ বিংশ শতাব্দীর সমগ্র সংগীতসাধনাই এক বিপুল ঐতিহ্যস্বীকরণ ও সাঙ্গীকরণের পালা। আধুনিক কাল পর্যন্ত বাঙলার শ্রেষ্ঠ গীতিরচয়িতাদের গানে পূর্বোক্ত নানা শ্রেণীর গানেরই সম্মেলন ও সমাবেশ ঘটেছে। তবে প্রাগুক্ত শ্রেণী-বিন্যাসে সুর ও গীতরূপের দিকেই বিশেষভাবে সংকলয়িতা দৃষ্টি দিয়েছেন, বিষয়ের দিকে নয়। তাই দেশাত্মবোধক গানের বা অন্য কোনো বিষয়ের নির্দিষ্ট উল্লেখ এখানে করা হয়নি। সুরের প্রতি মনোযোগ দিলেও দুটি ব্যাপার তিনি এড়িয়ে গেছেন। প্রথমত তিনি বাঙলার লোকসংগীতের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন এবং দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রসংগীত নামক এক আশ্চর্য গীতরূপের আবির্ভাব সম্পর্কে বিশেষ কোনো মন্তব্য করেননি। যদি সংকলয়িতার শ্রেণীবিভাগ স্বীকার করা যায় তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত বাঙলা গানে আরও কয়েকটি শ্রেণী রচনা করা সম্ভব হবে। তার এক একটির নাম রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলের গান, অতুলপ্রসাদের গীতধারা, রজনীকান্তের গান, দ্বিজেন্দ্রগীতি ও আধুনিক গান। অবশ্য এই ধরণের শ্রেণীবিন্যাসের মৌলিক রীতিতেই প্রশ্ন উঠতে পারে। তথাপি বাঙলা গানের ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রথম রেখাপত্রটি দুর্গাদাস লাহিড়ীই রচনা করেছেন বলে উত্তরকালের ধন্যবাদ অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য।

২

পূর্বেই বলা হয়েছে, অষ্টাদশ শতকের শক্তিগীতি পদাবলীতেই প্রথম বাঙলা কাব্যসংগীতের অস্পষ্ট বিকাশ ঘটেছিল। এই পদসাহিত্যের প্রার্থনার ভঙ্গিতে, মাতৃমহিমায়, ভক্তের আত্মার আর্তনাদে এমন একটি অভিনবত্ব ছিল, যার ফলে

এগুলি বৈষ্ণবপদের মত গোষ্ঠীকেন্দ্রিক হয়ে ওঠেনি, হয়েছিল মুক্ত ব্যক্তিচিত্তের কম্প্রশিখা। বৈষ্ণব পদাবলীর ক্ষয়িষ্ণুতার যুগে রামপ্রসাদ যে শক্তিগীতের প্রবর্তন করলেন, উনিশ শতকের কাব্যসংগীতের সঙ্গে তার একটি দৃঢ়বন্ধন স্থাপিত হয়েছে। সাধক কমলাকান্ত, মহারাজ রামকৃষ্ণ, মহারাজ নন্দকুমার, কুমার নরচন্দ্র, প্রেমিক মহেন্দ্রনাথ, কালী মির্জা, রামলাল দত্ত, বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, এমন কি ব্রাহ্মসমাজের ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল পর্যন্ত সকলের প্রেরণাই ছিলেন রামপ্রসাদ। ত্রিপুরার বরদাখাতের জমিদার মুজা হুসেন আলি পর্যন্ত মহাড়ম্বরে শ্যামাপূজা করে কালীনামের গান বাঁধলেন, শ্যামাসাধনার সারস্বতক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা ক্রমশ বিলীন হয়ে এল। এই অসাম্প্রদায়িকতার জন্যই শ্যামাসংগীত আধুনিক কাব্যগীতের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। সাধনাকে কবিত্বের সামগ্রী করে বৈরাগ্যের এমন ক্রন্দনকাতর আকৃতি সৃষ্টি করা একালের চেতনা ছাড়া সম্ভব হত না।

তথাপি অষ্টাদশ-উনবিংশ শতক-সূচনাব শক্তিগীতি আধুনিক কাব্যসংগীতের জনক হতে পারল না। কারণ শেষ পর্যন্ত জননীর বিশ্বব্যাপ্ত শক্তিলীলার কাছে কবিদের বিস্ময় ধর্মান্তরীণ হয়েই দেখা দিল, তত্ত্ব ও পরিভাষার বন্ধন কবিরা ভাঙতে পারলেন না। লোকায়ত বাণীভঙ্গি, গ্রাম্য কথ্যভাষা ও শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ এতে রোমান্টিকতা এনে দিতে পারেনি। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকে ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুকাল এই এক শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গসাহিত্যে কোনো উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি, কিন্তু এই যুগেই সাহিত্য পরিণত হল জনসভার সাহিত্যে[৩]। জনৈক সাহিত্যের ইতিহাসকারের মতে এই ক্রান্তিলগ্নের 'জনসংগীত' হল কবি-তর্জা-খেউড[৪]। উমাসংগীত বা আগমনী-বিজয়া গান শাক্তপদেরই সম্প্রসারণ, যাত্রা-পাঁচালিকে আমরা কাব্যসংগীতরূপে না দেখে পূর্বতন মঙ্গলকাব্য কাহিনীকাব্যেরই শাখারূপে গণ্য করি। একমাত্র কবিসংগীতগুলিতেই আধুনিক কালের ব্যক্তিত্ব অল্পবিস্তর আভাসিত হয়েছে। কবিসংগীত আংশিকভাবে পদাবলীরই উত্তরাধিকার, কিন্তু এঁদের রচিত প্রেম-লীলায় রাধাকৃষ্ণ কেবল অনুষঙ্গহীন স্মৃতিমাত্র, বৈষ্ণবকবির দার্শনিকতা বা আধ্যাত্মিক ভাবদ্যোতনা নেই। বৈষ্ণবের আধ্যাত্মিক ভাবপরিমণ্ডল অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে মানবিক আবেগসম্মত নরনারীর বাস্তবজীবনের পটভূমিকায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই সকল প্রেমকবিতায় মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্মতা, মানসিক চিত্তবিকারের বিশ্লেষণপ্রকৃতি একেবারে দুর্লভ নয়। কবিওয়ালাদের রচিত বহুগানে রচনাকৌশল ও শিল্পনৈপুণ্যের সঙ্গে ভাবগভীরতার সম্মিলন

ঘটেছে। তাঁদের এই স্বাধীন প্রেমবর্ণনার প্রেরণা তখনকার সমাজজীবন থেকেই তাঁরা পেয়েছিলেন। সেই যুগের সমাজের মধ্যে যে অবরুদ্ধ আক্ষেপ ও গুঞ্জন ছিল, নরনারীর সম্পর্কের মধ্যে একটি অতলস্পর্শী বাধার ব্যবধান ছিল, স্বাধীন মানবিক চিত্তচরিতার্থতার পিছনে যে একটি সংকীর্ণ সমাজনিষেধ ছিল, কবিওয়ালাদের গানে তারই প্রতিরূপ ধরা পড়েছে। কবিওয়ালাদের গান সেই বিধিবন্ধনের বিরুদ্ধে বিকৃতরুচির বিদ্রূপ। কাহিনী নয়, পত্র নয়, উপন্যাস নয়, আইন নয়—মৃদু রাগিণীর স্নিগ্ধ লাবণ্য মাত্র আশ্রয় করে, নিতান্ত সহজ কথায় যে কী বিদ্রোহ প্রতিবাদ, বিদ্রূপ ও বিস্ময় ছড়ানো যায়, তার প্রমাণ এই সামান্য গীতটি—

হউক হে হউক প্রাণ যাউক আমার
খেদ নাই তাহাতে।
তোমারে পাইলাম যদি কী করে লাজেতে?
লোকে বলে কলঙ্কিনী হইল কুলেতে,
আমি বলি এতদিনে আইলাম কূলেতে। (রামনিধি গুপ্ত)

উনিশ শতকেই প্রথম কবিওয়ালাদের গান সংগ্রহের চেষ্টা হয়। এই শতকের প্রথম দশক থেকেই বাঙালি সুধীবর্গের দৃষ্টি বাঙলা সাহিত্যের এই জাতীয় লুপ্তপ্রায় অবহেলিত কীর্তিগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং কবিসংগীতের এক জাতীয় সাহিত্যিক মূল্যায়নের চেষ্টাও দেখা যায়।[৫] ঈশ্বর গুপ্তই সম্ভবত প্রাচীন কবিদের জীবনী এবং কবিসংগীতের সংরক্ষণ ও সংগ্রহে সর্বপ্রথম গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় দেন। মনোধর্মে কবিগায়কদের সঙ্গে তাঁর খুব একটা দূরত্ব ছিল না, যদিও নবযুগের ধর্ম-কর্ম ভাবান্দোলন ও কর্মতৎপরতাও গুপ্ত কবিকে প্রবঞ্চিত করেনি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিজে কবিগান গাইতেন, আখড়াই হাফআখড়াই ও কবির দলে আমন্ত্রিত হয়ে পরবর্তীকালেও গান বেঁধে দিয়েছিলেন। সংবাদপত্র পরিচালনাকালে তরুণ কবিযশঃপ্রার্থীদের দ্বারা তিনি যে কলেজীয় কবিতাযুদ্ধের প্রবর্তন করেছিলেন, তার পিছনেও গুপ্ত কবির কবিওয়ালাসুলভ যুযুধান মনোবৃত্তি কিছুটা সক্রিয় ছিল। এ ছাড়া তাঁর অনুপ্রাসপ্রিয়তা, দুর্বোধ্যতা ও কষ্টকল্পনা, পরনিন্দা ও ছিদ্রানুসন্ধিৎসা, প্রহেলিকাবিলাস ও প্রাচীনতাপ্রীতি কবিগায়কদের সঙ্গে গুপ্ত কবির সূক্ষ্ম ভাবৈক্য বহন করে।

সাধনা পত্রিকায় কবিগানসমালোচনাপ্রসঙ্গে ১৩০২ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "চারজোড়া ঢোল, চারখানা কাঁসি এবং সম্মিলিত কণ্ঠের প্রাণপণ চিৎকার বিজনবিলাসিনী সরস্বতী এমন সভায় অধিককক্ষণ টিকিতে পারেন না।"

'ভিক্টোরিয়া যুগের বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থের রচয়িতা হারাণচন্দ্র রক্ষিত রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের জন্য যথোচিত ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। দেশের সমগ্র কবিওয়ালাদের যাবতীয় রচনা একত্রে সংগৃহীত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে না, হারাণচন্দ্র তার কারণ নির্দেশ করে বলেছেন যে, এইগুলি নতুন করে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ও প্রচারিত হলে 'বর্তমান কালের অনেক কবিআখ্যাধারী শিক্ষা ও সভ্যতাভিমানী রুচিবাগীশের মুখ শুখাইয়া যায়। সাধনার সমালোচক তথা রবীন্দ্রবাবু কী বলেন?'

অথচ মনে হয় হারাণচন্দ্র নিজেও কবিসংগীতগুলির সঙ্গে গভীরভাবে বা অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত ছিলেন না। কেবল রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। রাম বসু হরু ঠাকুর বা শ্রীধর কথক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার অভাব ছিল না এবং তাঁদের গান তিনি ভালভাবেই জানতেন। প্রকৃতপক্ষে কবিগানের কাব্যধর্ম বা বিষয়গত বিশিষ্টতা রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে ততটা কটাক্ষের কারণ নয়, যতটা তার গায়নভঙ্গি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে কবি-গানের যুগ, তৎকালীন নাগরিক জীবনের অবক্ষয়, কবিসংগীতের উদ্ভবের কতটা প্রেরণা হয়েছিল, এই বিষয়েই ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করেছিলেন। কবি-গানের সাহিত্যমূল্য আবিষ্কারের প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধরচনার পর বেশি করে শুরু হয়েছিল, এটাই রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের গৌণ ফল বলা যায়। রামগতি ন্যায়রত্ন বলেছিলেন—

"১৭০০ শতকের কিছুপূর্ব হইতে ১৭৫০-৫৫ শক [১৮২৮-১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দ] পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে অনেকানেক মহাত্মা নানা বিষয়ের নানাবিধ গীতরচনা করিয়াছিলেন। সেই সকল বিচিত্র পদাবলীসমন্বিত চমৎকারজনক ভাবসম্পন্ন গীতদ্বারাও বাঙলা ভাষার কম পুষ্টিসাধন হয় নাই। ঐ সকল গীত এক্ষণে সমগ্ররূপে কোথাও পাওয়া যায় না, কিন্তু সম্প্রতি কয়েক মহাশয় বহু পরিশ্রম-স্বীকারপূর্বক ঐ লুপ্তপ্রায় গীতের অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহাতেই সেগুলি আবার জীবনলাভ করিয়াছে"।[৬]

রামগতি এই প্রসঙ্গে নিধুবাবুকেও কবিওয়ালা বলে অভিহিত করেছেন এবং অন্যান্য কবিওয়ালাদের বিষয়ে লিখেছেন—

"গীতরচকরা কেহই বিদ্যাবিষয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন না, কিন্তু আসরে বসিয়াই তৎক্ষণাৎ যথোপযুক্তরূপে প্রত্যুত্তর গীতরচনা করিবার অলৌকিক শক্তি থাকায় ইহাদিগকে সকলেই যথেষ্ট সমাদর করিত।

অসংখ্য কবিসম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে অনেকের রচনাতেই অসাধারণ

কৌশল ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ থাকিত, এজন্য তৎকালিক বিজ্ঞলোকেরা, বিশেষত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমহাশয়েরা কবির গান শুনিতে বড়ই অনুরক্ত ছিলেন'—এ কথা রামগতি ন্যায়রত্ন স্বীকার করেছেন। কিন্তু পরবর্তী সমালোচকদের অনেকেই কবিগান সম্পর্কে যেরূপ উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগের পরিচয় দিয়েছেন তা অতিশয়োক্তি মনে হয়। ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত অজ্ঞাত লেখকের 'প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি' প্রবন্ধে (১২৮৯) কবিসংগীত এবং উমা-শ্যামাসংগীত প্রভৃতির কাব্য ও ভাবসম্পদের প্রতি মোহগ্রস্ত অন্ধ সমর্থন জানানো হয়েছে। সাহিত্যপরিষদ পত্রিকার 'প্রাচীন কবিসংগীত' প্রবন্ধের (১৩০২) অজ্ঞাতপরিচয় লেখকও কবিগানের মধ্যে অসামান্য সৌন্দর্য ও কাব্যসম্পদ আবিষ্কার করেছেন। তাঁর মতে—

"শৈলশ্রেষ্ঠ হিমগিরির অনন্ত সৌন্দর্যভাণ্ডারের মধ্যে যেমন সুরধুনীর আবেগময়ী সলিলরেখা, কবির অনন্ত ভাবপ্রবাহের মধ্যে সেইরূপ সংগীতধারা।... কবির সংগীত কবিত্বে উদ্ভাসিত, কবিত্বে গৌরবান্বিত এবং কবিত্বে স্বাভাবিকভাবে বিকাশপ্রাপ্ত। উহাতে কল্পনা নাই, ভাবের জটিলতা নাই, বা অপ্রাকৃত ও অসম্বদ্ধ বিষয়ের সমাবেশ নাই।"

গোঁজলা গুঁইয়ের একটি গান ('এসো এসো চাঁদবদনি') সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "রচয়িতা যে প্রকৃতিসিদ্ধ কবিত্বশক্তিতে মহৎ ছিলেন, এই একটি গানেই তাহার পরিচয় আছে"। এমন কি রাজনারায়ণ বসুর মত সমালোচক পর্যন্ত সেদিন এমন মন্তব্য করেছেন—

"হরু ঠাকুরের একটি কবিতাতে এইরূপ দেখা যায়—

নাম প্রেম তার, সাকার-নহে বস্তুটি সে নিরাকার
জীবন-যৌবন-ধন কিবা মন-প্রাণ বশীভূত তার।
মুখে লোক বলয়ে পিরিতি সুখের সার।
প্রাণের বাহিরও হয় সে যখন জীবনে যেন মরে রই।

কী চমৎকার ভাব। ইহা প্লেটো অথবা কোলরিজের উপযুক্ত। কোলরিজ একস্থানে বলিয়াছেন—

All thoughts all passions all delights
Whatever stirs this mortal frame,
Are all but ministers of love,
And feed his sacred flame.

হরু ঠাকুরের কবিতাটি ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বোধ হয় না।"

সুতরাং কবিসংগীত সম্পর্কে এই ছিল সে কালের শিক্ষিত এক শ্রেণীর মনোভাব। বাঙলা কাব্যসংগীতের ইতিহাসে কবিসংগীতের কয়েকজন গীতকারের স্থান অবশ্য স্বীকার্য।

কবিগান মুখ্যত ছিল প্রতিযোগী-ভাবাপন্ন দুই দলের মধ্যে উত্তরপ্রত্যুত্তর। সখীসংবাদ, বিরহ, খেউড়, কবিগানের বৈশিষ্ট্যরূপে গণ্য হয়। গত শতকের মধ্যভাগে কবিগান তর্জার লড়াইয়ে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে দাঁড়া কবির দলের নাম করা যায়। কবিগানে উত্তরপ্রত্যুত্তরের ধরাবাঁধা পালাগানকেই দাঁড়া কবি গান বলা হত। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বই এই দলের বৈশিষ্ট্য ছিল। উত্তরপ্রত্যুত্তরের কোনো কোনো গানে আদিরসের আধিক্য এনে বৈচিত্র্যসঞ্চার করা হলে সেই গানই খেউড নামে পরিচিত হত। অষ্টাদশ শতকেব মধ্যভাগে শান্তিপুর অঞ্চলের খেউড় গান বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিল। জনৈক সাহিত্যের ইতিহাসকাব[৭] লিখেছেন—

"উমাসংগীত ও খেউড গান হইতেছে কবিগানেরই পূর্বপশ্চাৎ অঙ্গ এবং তর্জা যাত্রা ও পাঁচালি হইতেছে কবিগানের অন্য পবিণত রূপ।..ইহার প্রধান অঙ্গ হইতেছে 'লহর' অর্থাৎ গানের মাধ্যমে বাগ্‌যুদ্ধ, ইহাব ভূমিকা হইতেছে মালসী বা দুর্গাবন্দনা, এবং পবিশিষ্ট হইতেছে খেউড বা অভদ্র গান। লহবের জন্য পুবাণের কলহমূলক পালাই কবিগানের বিষয় এবং পৌবাণিক পাত্রপাত্রীব ভূমিকায় দুই দলের পবস্পরের অভিযোগখণ্ডন এবং পাল্টা অভিযোগপ্রদান কবিগায়কেব কার্য।"

প্রাচীন মহাকাব্য-মঙ্গলকাব্যের উত্তরাধিকাবই পাঁচালির সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে। গায়েনেব পায়ে নূপুর, হাতে চামর-মন্দিরাসহযোগে প্রাচীন পাঁচালি পরিবেশিত হত। কীর্তন ও বৈঠকি গান ভেঙে পাঁচালিব আধুনিক রীতির জন্ম হয। অনেকে মনে করেন পাঁচালি থেকেই ঢপকীর্তন ও যাত্রাব উদ্ভব হয়েছে। ওস্তাদি ঢঙে রচিত আখডাই ও হাফআখড়াই গান এই পর্বের আর একটি বিশিষ্ট গীতরূপ। এই গানে বাজনা ও সংগতের বিশেষ পরিপাট্য ছিল। এই সময়ের শ্রেষ্ঠ গীতরূপ টপ্পা। টপ্পাকেই আধুনিক কাব্যসংগীতের যথার্থ সূচনার গৌরব দান করা যায়। উনিশ শতক অতিক্রম করে আধুনিক কাল পর্যন্ত এই টপ্পাসংগীত বাঙলা কাব্যগীতকে অধিকার করে আছে, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

গীতিকাব্যে সনেট আবিষ্কারের সঙ্গেই কাব্যসংগীতে টপ্পার প্রবর্তনের তুলনা করা যায়। এই সংক্ষিপ্ত সীমিত অবয়বের মধ্যে সুরমূর্ছনায় হৃদয়াবেগ উজাড় করে দেওয়ার আশ্চর্য রীতিটি বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিধুবাবুই প্রথম প্রচলন করেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, যে মৌলিক গীতরীতির সঙ্গে টপ্পার সাদৃশ্য আছে, তা হিন্দুস্থানী একজাতীয় লোকসংগীত[৮]—কিন্তু কাব্যসাহিত্যের বা মানবহৃদয়ের সঙ্গে তার বিশেষ সংযোগ ছিল না। নিধুবাবুই সর্বপ্রথম সেই অবাঙলা গীতরূপকে আধুনিক বাঙালি সমাজের নূতন শ্রবণে প্রয়োগ করলেন, এই সদ্যোলব্ধ সুরকে নিবিড় হৃদয়োৎকণ্ঠা ও প্রেমবেদনাপ্রকাশে ব্যবহার করলেন। অবরুদ্ধ যুগজীবনের নিবিড় কামনা কিছুকাল ধরেই প্রকাশের পথ পাচ্ছিল না, লৌকিক পাঁচালি কাব্যের আধারে আত্মার ব্যাকুলতা ঘনীভূত হচ্ছিল না। নিধুবাবুই সে যুগের প্রেমবেদনাকে ক্ষুদ্র গীতের ছিদ্র দিয়ে অসীম রাগিণীতে ধ্বনিত করে তুললেন।[৯] নিধুবাবুর হাতেই একালের মানুষের সর্বপ্রথম ধর্মনিরপেক্ষ আত্মভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটল।

প্রথম যুগে টপ্পা 'আদিরসাত্মক প্রণয়সংগীত' হিসাবেই প্রসিদ্ধ ছিল। শব্দটির মূল অর্থ হিন্দিতে 'লম্ফ' এবং তা থেকে দাঁড়ায় 'সংক্ষিপ্ত লঘু প্রকৃতির গীত'। 'সংগীততানসেন' গ্রন্থে দুই প্রকার গানের রীতি আছে, ধ্রুপদ ও রঙিন গান। ধ্রুপদ ২৪ প্রকার, রঙিন প্রায় অর্ধশত। খেয়াল ও টপ্পা রঙিন গানেরই প্রকারমাত্র। 'সংগীতরাগকল্পদ্রুমে'র মতে, নিধুবাবুর টপ্পাকে রঙিন গান বলা যায়।[১০] টপ্পার বৈশিষ্ট্য সংক্ষিপ্ত আয়তনে কবিতার ভাবগর্ভতার মধ্য দিয়ে একটি সুরের নিটোল তরঙ্গ ফুটিয়ে তোলা। সনেটের অক্টেভ-সেস্টেটের মত টপ্পাতেও একটি উদয়বিলয়ের লীলাময় তরঙ্গরচনা আছে। এর ভিতরে রয়েছে কাব্যের স্পন্দন, বাইরে সুরের কম্পন। একটি আন্দোলনযুক্ত তান যখন বাণীর প্রতিটি ধ্বনির ভিতর দিয়ে হিল্লোলিত হয়ে ওঠে, তখনই অন্তরের তারে তারে তার প্রতিধ্বনি জাগে, তখনই তা হয় রসের সামগ্রী—সে রস কাব্যপাঠের রসের সঙ্গেই একাত্ম। তাই টপ্পা কেবল সংগীতের জগতের অধিবাসী নয়, সে কবিতার রাজ্যেরও বাসিন্দা। টপ্পায় রসসৃষ্টি করতে হলে এই কাব্যের প্রাধান্যটি অক্ষুণ্ণ রাখা চাই।[১১] টপ্পাকে ধ্রুপদী সংগীতের অঙ্গ করে তুলেছিলেন শোরি মিঞা নামে জনৈক বিহারী মুসলমান সংগীতজ্ঞ [আসল নাম গোলাম নবী, পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য]। কর্মসূত্রে নিধুবাবু বহুকাল ছাপরায় ছিলেন এবং এই গীতরীতি সংগ্রহ করে আপন ভাষায় প্রয়োগ করার অভ্যাসকৌশল আয়ত্ত

করেন। পশ্চিমী টপ্পায় তানের কাজে খুব দ্রুত, কিন্তু নিধুবাবু এই তানের উপর এমন একটা আন্দোলনের ভাব নিয়ে এলেন যার ফলে টপ্পার করুণ আবেদন হয়ে উঠল হৃদয়গ্রাহী, শ্রবণমনোহর। টপ্পার উপযোগী কতকগুলি বিশেষ রাগ আছে, তবে নিধুবাবু নানা ধরনের রাগ নিয়েই টপ্পা রচনা করেছেন। গীতরত্ন দ্বিতীয় সংস্করণ পরিশিষ্টে নিধুবাবুর ব্যবহৃত রাগরাগিণীর সংখ্যা ১০৩টি। টপ্পায সব বকম গানই রচনা হয়, তবে এ পর্যন্ত বিরহাশ্রিত প্রেমের গানই বেশি। টপ্পার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব সুদীর্ঘকালের রাধাকৃষ্ণগীতি-কীর্তন-প্রসাদী-বাউল-পাচালি প্রভৃতি গীতরীতিকে পিছনে ফেলে সে আধুনিক কালের একমাত্র যৌবন-সংগীতে পরিণত হয়েছে। পৌরাণিক অনুষঙ্গকে দূরীভূত করে টপ্পা আধুনিক সমাজের মানবিক প্রেমচেতনাকে অবলম্বন করেছে। এই সর্বপ্রথম বাঙলা গান প্রেমিক বা প্রেমিকাকে সম্বোধন করার বীজমন্ত্র শেখালো—'প্রাণ'। টপ্পাই প্রথম নাগরিক জীবনের কাব্যসংগীত।

বাঙলা কাব্যসংগীতের সূচনাপর্বে টপ্পার সঙ্গে আখড়াই গানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্কে রামনিধি গুপ্তের 'গীতরত্নের' ভূমিকায় যে সকল কৌতূহলজনক তথ্যাদি আছে তা নিম্নরূপ—

"১২১০ সালেব পূবে মৃত মহামতি মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের সময়ে বাঙালি মহাশয়দিগের মধ্যে আখড়াই গানের অত্যন্তামোদ ছিল। তখন উক্ত মহারাজের নিকট কুলুইচন্দ্র সেন নামক একজন বৈদ্য আখড়াই বিষয়ে প্রতিপন্ন ছিলেন। ঐ মহাশয় সংগীতশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পারদর্শী ছিলেন, তাঁহাকে আখড়াই গাহনার একজন জন্মদাতা বলাই কর্তব্য হয়, তিনি রামনিধি গুপ্তের অতি নিকটসম্বন্ধীয় মাতুলপুত্র ছিলেন। কিন্তু নিধুবাবু তাহার পর অখড়াই বিষয়ে যে সকল নূতন প্রণালী করেন, এমত আর কেহই করিতে পারে নাই, ঞিহার [ইঁহার] কৃত প্রণালীই অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে।

১২১০ সালে যখন মহামান্য মহারাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর আখড়াই আমোদে আমোদী হইলেন, তখন শ্রীদাম দাস, বাম ঠাকুর ও নসিরাম সেকরা প্রভৃতি কয়েকজন সর্বদাই আখড়াই সংগীতের সংগ্রাম করিত, তাবতেই এ বিষয়ে পণ্ডিত ছিল, কিন্তু শৌখিন ছিল না, পেশাদারি করিয়া টাকা লইত।

১২১২ কিংবা ১৩ অব্দে নিধুবাবুর উদ্যোগে এতন্নগরে, দুইটি সংশোধিত শখের আখড়াই দলের সৃষ্টি হয়, তাহার একপক্ষে বাগবাজার ও শোভাবাজারস্থ সমুদায় ভদ্রসন্তান এবং আর একপক্ষে মনসাতলা অথবা পাতুরিয়াঘাটানিবাসী নীলমণি মল্লিক মহাশয় ও তাঁহার বন্ধুবর্গ ব্রতী হইলেন, এই উভয় দলে 'বাদী' হইলে

নিধুবাবু বাগবাজারের পক্ষ হইয়া গীত ও স্বর প্রদান করিলেন এবং মল্লিকবাবুর পক্ষে শ্রীদাম দাস এবং ৺কুলুইচন্দ্র সেনের পুত্র ৺গোকুলচন্দ্র সেন প্রভৃতি কয়েকজন গীত ও স্বর প্রস্তুতকরণার্থে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহাতে শ্রীদাম দাস প্রভৃতি ভবানী-বিষয় এবং খেউড় প্রস্তুত করিলেন, প্রভাতী প্রস্তুত করিতে গোকুলচন্দ্র সেনের উপর ভারার্পণ হইল, তাহাতে তিনি ঐ মোহাড়া রচনা করিলেন, যথা—

ওই যে অরুণ আলো কামিনী দহিতে।

কিন্তু ইহার চিতেন পড়েন এবং অন্তরা প্রস্তুত করিতে বিলম্ব হওয়াতে নিধুবাবুকে কহিলেন, খুড়া মহাশয়, ইহা মোহাড়া প্রস্তুত করিয়াছি। কাল-বিলম্ব হয়, অতএব অনুগ্রহ করিয়া ইহার চিতেন প্রভৃতি রচনা করিয়া দিউন, তাহাতে বাবু এই নিম্নলিখিত চিতেন পড়েন এবং পরচিতেন রচনা করিয়াছিলেন. যথা—

নিবারি শরীর শোভা কুমুদী সহিতে।
না হতে সুখের লেশ রজনী হইল শেষ
চকোরী চাঁদের আশা তেজিল দুঃখেতে।"[১২]

এই ভূমিকা থেকে দেখা যাচ্ছে রামনিধি আখড়াই গানেও পারদর্শী ছিলেন। বস্তুত টপ্পা আখড়াই গানের আসরেও অপাংক্তেয় ছিল না. হাফআখড়াই গানেও ছিল। আবার টপ্পার সঙ্গে খেয়াল মিশিয়ে টপখেয়াল পদ্ধতিরও প্রচলন হয়েছিল। নিধুবাবুর জীবদ্দশাতেই তাঁর প্রবর্তিত টপ্পার এই জনপ্রিয়তা স্বভাব প্রতিভারই পরিচায়ক। ঠুংরি অপেক্ষা টপ্পাতে স্বরের গুণপনা দেখানোর সুযোগ বেশি। তানের বৈচিত্র্য, লয়ের কৌশল. এক একটি শব্দের উপর ছোটছোট তানসহযোগে বা গমকের সঙ্গে অপূর্ব ছন্দহিল্লোল তোলার অবকাশের জন্য সংগীতশিল্পীদের কাছে টপ্পা জনপ্রিয় হল। এইজন্য এই হিন্দুস্থানী গীতরীতিটি একান্তভাবে বঙ্গীয় হয়ে গেছে। জনৈক সংগীতবিশেষজ্ঞের মতে—

"টপ্পা গোড়ায় হিন্দুস্থানী রীতিতে রচিত হলেও বাঙলাদেশে এসে নবরূপ ধারণ করেছে, তার মধ্যে বাঙলার নিজস্ব রুচি ও মেজাজের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। হিন্দুস্থানী টপ্পায় অত্যন্ত দ্রুততালের যে তাড়া আছে, বাঙলা টপ্পায় তা নেই— এখানে তালগুলির গতি মন্থর। কেবল তাই নয় এইসব তালে মোটামুটিভাবে তালের হিসাব থাকলেও মাত্রাগুণতির হিসাব নেই. অর্থাৎ স্বর মাত্রার সঙ্গে লাফালাফি করে অগ্রসর হয় না—ছন্দ এখানে গা ঢাকা দিয়ে পিছনে সবে আসে[১৩]।"

অবশ্য টপ্পা সম্পর্কে প্রাচীন কয়েকজন সংগীতকার বিরূপ মনোভাবও পোষণ

করতেন এবং সংগীতশাস্ত্রের দিক থেকে টপ্পা বিষয়ে অন্যরকম তথ্যও পাওয়া যায়। উনিশ শতকের বিখ্যাত সংগীতশাস্ত্রবিদ্ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

"ধ্রুপদ ও খেয়াল অপেক্ষা যে গান সংক্ষিপ্ততর তাহার নাম টপ্পা। ইহার কেবল দুই তুক, আস্থায়ী ও অন্তরা। খেয়ালের প্রায় সকল তালই টপ্পায় ব্যবহৃত হয়, কেবল রাগিণীতে ইহা খেয়াল হইতে বিভিন্ন হইয়া থাকে। খেয়ালের রাগে টপ্পা রচিত হওয়ার নিয়ম নাই। প্রাচীন রাগিণীর মধ্যে কেবল ভৈরবী খাম্বাজ চৈতা গৌরী কালেংড়া দেশ ও সিন্ধু এই কয়টিতে টপ্পা হয়। টপ্পা আধুনিক কালের উৎপন্ন, এবং ইহার প্রকৃতিসংক্ষেপজন্য কাফি ঝিঁঝিট পিলু বারোয়াঁ মাঝইমন ও লুম এই কয়েকটি আধুনিক রাগ টপ্পায় ব্যবহৃত হয়[১৪]।

অস্মদ্দেশীয় অনেক লোকের এইরূপ সংস্কার যে, আদিরসবিষয়ক গানকেই টপ্পা বলে। কিন্তু সেটি ভ্রম। গানের এক পৃথক রীতির নাম টপ্পা। ইহাতে সকল প্রকার গানই হয়। ফলত উহার গতি দ্রুত ও প্রকৃতি হাল্কাবশত উহা ঈশ্বরবিষয়ক গানের উপযোগী নহে। ইদানীং ব্রহ্মসংগীত প্রায়ই টপ্পার স্বরে রচিত হইতে দেখা যায়। ইহা নিতান্ত অসংগত ও অন্যায়। ইহা সংগীততত্ত্বে অজ্ঞতা ও অনুন্নত রুচির ফল[১৫]। সংগীতের প্রধান কার্য স্মৃতিউদ্দীপনা। অতএব যে স্বর শুনিতে অন্তঃকরণে মহৎ উন্নত প্রশান্ত ও বিরাট ভাবাদির উদয় হয়, তাহাই ভক্তি ও উপাসনার যথার্থ উপযোগী। টপ্পার স্বরের যেরূপ প্রকৃতি, উহা হাস্য আনন্দ প্রণয় তামাসা উল্লাস প্রভৃতি লঘুভাবোদ্দীপনবিষয়ে সম্যক উপযোগী এবং ঐ সকল বিষয়েই উহা সর্বদা ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। অতএব টপ্পার স্বর শুনিলে মনে ঐ সকল ভাবের উদয় হওয়া ভিন্ন ভক্তির ভাব কখনই উদ্দীপিত হইতে পারে না[১৬]।"

যে হিন্দুস্থানী সংগীতের ঐতিহ্য থেকে টপ্পার প্রচলন ঘটেছে, সেখানে টপ্পার কথাবস্তুর মূল্য ছিল, টপ্পা উচ্চাঙ্গসংগীতমাত্র ছিল না। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থ থেকে আরো জানা যায়—

"সংগীতসার গ্রন্থে লিখিত আছে যে, অযোধ্যানিবাসী গোলাম নবী নামক এক ব্যক্তি টপ্পা রচনা করিয়া তাহার অতি প্রিয়তমা প্রণয়িনী শোরির নামে ভণিতা দিয়া গাহিতেন, এইজন্যই শোরি মিঞা টপ্পাপ্রণেতা বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন, বস্তুত গোলাম নবী তাহার আসল নাম, শোরি তাহার স্ত্রীর নাম। প্রায় ৭৬ বৎসর অতীত হইল গোলাম নবী ৫০ বৎসর বয়ঃক্রমে লখনৌ নগরে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন"।

কৃষ্ণধনের গ্রন্থরচনার ৭৬ বৎসর পূর্বে গোলাম নবীর মৃত্যু হয়ে থাকলে

নিধুবাবুর বয়স তখন আনুমানিক ৬৮ বৎসর। টপ্পাকে প্রেমসংগীতরূপে প্রতিষ্ঠিত করার প্রেরণা নিধুবাবু সম্ভবত এই পূর্বস্রষ্টার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। নিধু-বাবু কেবল টপ্পার গীতরীতিকেই কণ্ঠস্থ করে আনেননি, টপ্পা তাঁর হাতেই নর-নারীর প্রেমসম্পর্কের পদাবলী হয়ে উঠেছে। নিধুবাবুর জীবনীসংগ্রহকালে ঈশ্বর গুপ্ত সখেদে মন্তব্য করেছিলেন যে. সকলেই 'নিধু নিধু' শব্দ আবৃত্তি করেন, কিন্তু নিধু ব্যক্তির নাম কি গীতিরীতির নাম অনেকেই জানেন না। কিন্তু গুপ্ত কবির সন্দেহ সম্ভবত অমূলক ছিল। সেকালের জনৈক সাহিত্যঐতিহাসিক লিখেছেন—

"নিধুর গান নিধুর টপ্পা নামে পরিচিত। হিন্দি খেয়াল টপ্পা ও গজলের সুর ভাঙিয়া একটু অভিনব প্রণালীতে তিনি বাঙলায় এই টপ্পাসংগীতের প্রচার করেন। ইতিপূর্বে সাধনসংগীতই বাঙলার প্রধান সম্বল ছিল। বড জোর ভারত-চন্দ্রের প্রণয়সংগীতগুলি কোথাও কোথাও গীত হইত। কিন্তু এই হইতে নিধুবাবুর টপ্পা বাঙলার সর্বত্র প্রচলিত হইল। এবং বলা বাহুল্য নিধুর দেখাদেখি অনেকেই এ পথে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু প্রতিভা ও শক্তির অভাবে তাঁহাদিগকে বিফল-মনোরথ হইতে হইল। কেবল কথকচূড়ামনি শ্রীধর সেই পরবর্তীকালে ভাগ্যবান কবি কোন কোন অংশে নিধুকেও অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন"।[১৭]

বাঙলা কাব্যসংগীতের আধুনিক যুগের প্রবর্তক ও আদি স্রষ্টা, শিল্পী ও বাঙলার প্রথম প্রেমগীতিকার. রোমান্টিক গীতিকবিতার পথিকৃৎ নিধুবাবু বা রামনিধি গুপ্ত অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের কিছুপূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগের কিছুপূর্বে তিরোহিত হন। রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছেন. "ইনি ১৬৬৩শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৭৫৬শক (১৮৩৪ খৃঃ অঃ ?) পর্যন্ত, অর্থাৎ ৯৭ বৎসর জীবিত ছিলেন"—সুতরাং ভারতচন্দ্রের মৃত্যুসময়ে তাঁর বয়স ১৯ বৎসর ছিল।[১৮] নিধুবাবু তাঁর জীবৎকালেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁর যে গীতসঞ্চয়ন প্রকাশিত হয় তার ভূমিকায় নিধুবাবুর পুত্র কবির জীবনকাহিনী মুদ্রিত করেন। নিধুবাবু সৎ ধর্মভীরু আমোদপ্রিয় সুরসিক ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শান্তিপ্রিয় চাকুরিজীবী নাগরিক ছিলেন। সংগীতশাস্ত্রে তাঁর দক্ষতা ছিল এবং গানবাজনার চর্চা করতেন। সেই সূত্রে তৎকালীন কলকাতার প্রমোদসংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল। ১২১২-১৩ সালে বাগবাজারের কাছে শৌখিন আখড়াই হাফআখড়াই দলের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। সেখানে তিনি 'গঞ্জিকাসেবী ভদ্রসন্তান, উপস্থিত কবি এবং শৌখিন নামধারী বাবুদের' আটচালার আড্ডায় উপস্থিত থেকে টপ্পা শোনাতেন। এই আটচালাতেই নিধুবাবুর নেতৃত্বে সেকালের বিখ্যাত 'পক্ষীর দল' গড়ে উঠেছিল

বলে ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর জীবনীসংগ্রহে জানিয়েছেন। জনৈক আধুনিক প্রবন্ধকার লিখেছেন—

"নিরক্ষর জনতাও বটতলার যুগকে অস্বীকার করতে পারেনি কারণ তখন এটাই ছিল ডালহৌসি ও চৌরঙ্গিপাড়ার সম্মিলন। ধনীবাবুদের বাসস্থান ছিল এই পাড়া জুড়ে। অশিক্ষিত চাটুকার ভাঁড় পাষদ দালাল কাপ্তেনদের পক্ষেও তখন সাহিত্যের চেয়ে সহজ হয়ে উঠল সংগীত। চটুল সংগীতের সাহায্য নিয়ে তারা দাতার মরমমন্দিরে প্রবেশের চেষ্টা করলেন। তাই অক্ষরের মুদ্রিত সাহিত্যের আগে নগর কলকাতায় যে সার্বিক চেতনা এসেছিল, তারই সুবিধাবাহী হয়েছিল নিধুবাবুর জনপ্রিয় টপ্পালহরী। তিনি বাংলাদেশে মাস-কমিউনিকেশনের অগ্রদূত"।[১৯]

নিধুবাবুর প্রেমের গানের সংখ্যাধিক্য দেখে মনে হয়, এইগুলির পিছনে কোনো সাক্ষাৎ প্রেরণা বা উদ্দীপনা ছিল। মুর্শিদাবাদের মহারাজা মহানন্দ রায় যখন কলকাতায় আসতেন তখন তাঁর সঙ্গে শ্রীমতী নামে এক রূপবতী ও গুণবতী বুদ্ধিশালিনী রক্ষিতা থাকতেন। ইনি 'রামনিধিবাবুকে অন্তঃকরণের সহিত ভালবাসিত ও অতিশয় স্নেহ করিত এবং বাবুও তাহার বিস্তর গৌরব ও সম্মান করিতেন'।[২০] নিধুবাবুর চরিতকার স্পষ্টভাষায় লিখেছেন, এই সম্পর্ক কেবলমাত্র নিষ্কাম সৌহার্দ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কারণ 'নিধুবাবু লম্পট ছিলেন না, কেবল স্তুতি বিনয় স্নেহ এবং নির্মল প্রণয়ের বশ্য ছিলেন'। তাঁর চরিতকার লিখেছেন যে, নিধুবাবুর অধিকাংশ গানই এই সময়ে রচিত এবং উক্ত মহিলার চিত্তবিনোদনের জন্য তাঁর সম্মুখেই তিনি রচনা করতেন। 'সেখানে বসিয়া মনের মধ্যে যখন যেমন ভাবের উদয় হইত, তৎক্ষণাৎ তাহারই এক এক গীত রচনা করিতেন।'

নিধুবাবুর যৌবনকালে বিদ্যাসুন্দর কাব্যের রুচিবিকৃতি কামিনীকুমার-চন্দ্রকান্তজাতীয় কাব্যের মধ্যে দিয়ে মদনমোহনের বাসবদত্তা পর্যন্ত পৌঁছেছিল। রাসু, নৃসিংহ, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু, হরু ঠাকুর, অ্যান্টনি ফিরিংগি নিধুবাবুর সমসাময়িক কবি। বিরহ গোষ্ঠ মান দান মাথুর সখীসংবাদ প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক সংগীত ছিল কবিগানের প্রধান অঙ্গ—সর্বত্র এগুলি হয়ত অস্বাস্থ্যকর ছিল না, কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর বিশুদ্ধতা ক্রমশ নিম্নরুচিতে পর্যবসিত হচ্ছিল। বিদ্যাসুন্দর-কবিগানকে গ্রহণ না করে হিন্দি খেয়াল-টপ্পা ভেঙে নিধুবাবু লিখলেন প্রেমের গান, নবযুগের স্বাধীন হৃদয়ানুভূতির কাব্য-সংগীত। তাঁর প্রায় সব গানই এই রকম কাব্যসংগীত এবং প্রেমগীতি, রাধাকৃষ্ণ

বা বিদ্যাসুন্দরের বেনামিতে লেখা নয়। ডক্টর সুশীলকুমার দে লিখেছেন, "কবি আপন হৃদয়ের অনুভূতি ভালবাসা ও মনের ব্যথা স্বাধীনভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।"[২১] প্রাচীন সাহিত্য ছিল বহির্জগৎনির্ভর, সেই রীতি ভঙ্গ করে নিধুবাবুই প্রথম আপনার সুখদুঃখ আত্মপ্রকৃতির কথা বললেন। তাঁর গানে কিছু কিছু রুচিদুষ্টতা থাকলেও অধিকাংশ গানেই মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর 'নানান দেশের নানান ভাষা' গানটির উল্লেখ করে হারাণচন্দ্র রক্ষিত লিখেছেন—

"মাতৃভাষায় বিমুখ পরভাষায় পণ্ডিত 'স্বদেশহিতৈষিণী' মহাত্মাদের কবির এই অমৃতময়ী উক্তিটি স্মরণ করিবার বিষয়। সাময়িক যশঃ বা পদগৌরবে তাঁহারা বড় হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সেই স্বদেশহিতৈষণা জুয়ারের জল— এই আছে এই নাই। মাতৃসেবায় যে বিমুখ, মাতৃভাষার অনুশীলন যে জীবনে করিল না, তাহার স্বদেশভক্তির কথা শুনিলে কাঁঠালের আমসত্ত্ব মনে পড়ে।"[২২]

পরবর্তীকালে নিধুবাবুর জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে বহু নিম্নরুচির গান তাঁর নামে চলে গেছে। তাঁর গানে চরণের মিল প্রায়শ নেই, কথা অত্যন্ত সহজ সরল এবং আন্তরিক। শব্দ ছন্দ ও অলংকার রচনারীতিকে ভারাক্রান্ত করেনি।

নিধুবাবুর মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে ১২৪৪ সালে তাঁর গানের সংকলন 'গীতরত্ন' প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্ভবত এই সংকলনের ভূমিকা স্বয়ং কবিকৃত ছিল। ১২৭৩ বঙ্গাব্দে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় এবং ১২৭৫ বঙ্গাব্দে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণ অচিরে নিঃশেষিত হয়ে গেলে অন্যান্য প্রকাশক জাল গ্রন্থ ছাপতে সুরু করেন। দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে এই বিষয়ে বিস্তারিত ও কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ আছে। গীতরত্ন গ্রন্থটিকেই নিধুবাবুর একমাত্র প্রামাণিক গীতচয়নিকা বলে মনে করা যেতে পারে। গীতরত্নের বহু গান সমকালীন একাধিক পদসংকলনে উদ্ধৃত হয়েছে। ১২৫২ সালে কৃষ্ণানন্দ ব্যাসরসসাগর 'সংগীতরাগকল্পদ্রুম' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন, এতেও নিধুবাবুর রচিত সার্ধশতাধিক গান ছিল। ১২৯৩ সালে আশুতোষ ঘোষালকর্তৃক সংগৃহীত 'সংগীতরত্নমালা বা কবিবর নিধুবাবুর রচিত গীতাবলী' পুস্তকে নিধুবাবুর নামে বহু গান প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। ১৩০৩ সালে বটতলা থেকে প্রকাশিত বৈষ্ণবচরণ বসাক সম্পাদিত 'গীতাবলী বা রামনিধি গুপ্তের যাবতীয় গীতসংগ্রহ' গ্রন্থে সংগৃহীত গানগুলির প্রামাণিকতা সন্দেহজনক। বঙ্গবাসীপ্রকাশিত 'সংগীতসারসংগ্রহ' ২য় ভাগ (১৩০৬), বসুমতীপ্রকাশিত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকাসহ 'রসভাণ্ডার' (১৩০৬), অবিনাশচন্দ্র ঘোষ সংকলিত 'প্রীতিগীতি' (১৩০৫),

বঙ্গবাসীপ্রকাশিত 'বাঙালির গান' (১৩১২), দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়' ২য় খণ্ডেও (১৯১৪) নিধুবাবুর গান আছে।

নিধুবাবুর গান জনপ্রিয়তাবশত কিরূপভাবে অপরের দ্বারা অধিকৃত বা আত্মীকৃত হয়েছে ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁর পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে তার কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন।[২৩] গীতবত্নের 'এই কি তোমার প্রাণ ছিল হে মনে' এবং আরও কিছু কিছু গান জনৈক তারাচরণ দাস রচিত 'মন্মথ-কাব্যে' পাওয়া যায়। নিধুবাবুর স্ত্রীবিয়োগের উপলক্ষে রচিত বলে কথিত 'মনঃপুর হতে আমার হারায়েছে মন' গানটিও উক্ত গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে। বনওয়াবিলালপ্রণীত 'যোজনগন্ধা', মুনসী এরাদোতপ্রণীত 'কুরঙ্গভানু' প্রভৃতি কাব্যে ও গীতরত্নের বহু গান চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'বঙ্গীয় সংগীতরত্নমালায়' উৎকলিত নিধুবাবুর একটি গান 'পিরিতি পরম রতন' মধুসূদনের 'পদ্মাবতী নাটকে'ও আছে। নিধুবাবুর গানের সঙ্গে সমকালীন গীতকারদের গান এত বেশি মিশে গেছে যে এবিষয়ে তথ্যসন্ধান করা প্রায় অসম্ভব। নিধুবাবুর বিখ্যাত 'ভালবাসিব বলে ভালবাসিনে' গানটি একাধিক সংগ্রহে নিধুবাবু ছাড়াও রামবসু ও শ্রীধর কথক, এঁদের নামেও প্রচারিত, অনেকের মতে এটি শ্রীধর কথকের রচনা, গীতরত্নেও গানটি নেই। আবার নিধুবাবুর নামে প্রসিদ্ধ কয়েকটি গান গীতরত্ন সংকলনে নেই, যেমন, 'নয়নের দোষ কেন মনেরে বুঝায়ে বল', 'তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে'[২৪]। 'প্রেমে কী সুখ হত' গানটি গীতরত্নে নেই, কিন্তু 'প্রীতিগীতি' ও 'নিধুবাবুর গীতাবলীতে' নিধুবাবুর নামে আছে। আশুতোষ ঘোষালকৃত 'বঙ্গীয় সংগীতরত্নমালা'য় নিধুবাবুর গানের সঙ্গে শ্রীধর কথক, কালী মির্জা, ছাতু বাবু (আশুতোষ দেব) প্রভৃতি অন্যান্য গীতকারের গান মিশে গেছে। 'তারে ভুলিবো কেমনে' গানটি 'গীতাবলী' ও 'রসভাণ্ডারে' নিধুবাবুর নামে, কিন্তু প্রীতিগীতিতে হরিমোহন রায়ের নামে পাওয়া যায়। এইরূপ উদাহরণ প্রচুর আছে। মোটামুটি এইগুলি আধুনিক কাব্যসংগীতের স্রষ্টা রামনিধি গুপ্তের অসাধারণ জনপ্রিয়তারই পরিচায়ক।

নিধুবাবুর পর টপ্পারচনায় খ্যাতি অর্জন করেন শ্রীধর কথক ও কালী মির্জা। তাছাড়া রাধামোহন সেন, যদুনাথ ঘোষ, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, জগন্নাথপ্রসাদ বসু-মল্লিক, চারুচন্দ্র রায় প্রভৃতি গীতকারও অনেক টপ্পাঙ্গের গান লিখেছিলেন। শ্রীধর কথক ও কালী মির্জা দুজনেই শক্তিশালী গীতরচয়িতা ছিলেন, দুজনের গানই নিধুবাবুর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গেছে। হারাণচন্দ্র লিখেছেন, "নিধু অপেক্ষাও শ্রীধর বা বঙ্গের আধুনিক কোনো কবি প্রণয়সংগীতে সমধিক শক্তিমত্তা

দেখাইলেও নিধুকেই তাঁহার গুরু স্বীকার করিতে হইবে।" আবার অন্যত্র তিনি লিখেছেন, "নিধু ও শ্রীধর যেন দুই জনেই ভাবরাজ্যের রাজা এবং বঙ্গের সারা মিঞা [শোরি মিঞা] ও তানসেন, তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই।" শ্রীধর সম্ভবত ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে হুগলিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ লালচাঁদ বিদ্যাভূষণ ছিলেন খ্যাতনামা কথক, বহরমপুরের কালীচরণ ভট্টাচার্য নামক কথকের কাছে শিক্ষানবিশি করেন। যৌবনে পাঁচালি ও কবিদলের সঙ্গে শ্রীধরের সংযোগ ছিল, কিন্তু ক্রমে গোষ্ঠীর প্রথাবদ্ধরীতি ত্যাগ করে শ্রীধরের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন হৃদয়ানুভূতির আবেগ প্রাধান্য লাভ করে। শেষ পর্যন্ত টপ্পাগানেই তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

কালী মির্জা বা কালিদাস চট্টোপাধ্যায় উনিশ শতকের প্রথমেই সংগীতে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ছিলেন গুপ্তিপাড়ার অধিবাসী, সংগীতে দক্ষতা অর্জনের পর কাশী লখনৌ দিল্লি প্রভৃতি অঞ্চলেও সংগীত শিক্ষা করেন এবং সম্মানসূচক 'মির্জা' উপাধি লাভ করেন। সংস্কৃত ও ফার্সিভাষায় তাঁর অধিকার ছিল। তিনি যৌবনে কিছুকাল বর্ধমানের যুবরাজ প্রতাপচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন, সেখান থেকে বহুকাল মাসিক বৃত্তিও পেতেন। 'বাঙালির গানে' বর্ণিত হয়েছে, "মির্জা মহাশয়ের জীবনের অধিকাংশ সময় কলিকাতাস্থ বিখ্যাত ঠাকুরবংশীয় মৃত মহাত্মা গোপীমোহন ঠাকুরের আশ্রয়ে অতিবাহিত হয়। তাঁহার সংগীতবিদ্যায় এবং বিবিধ সদগুণে মোহিত হইয়া মহানুভব গোপীমোহন তাঁহাকে আপন পারিষদমধ্যে গণ্য করিয়া লন। ইনি পলাশির যুদ্ধের সাত আট বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বিংশতি বৎসর মধ্যে পরলোক গমন করেন।" কালী মির্জা ভক্তি ও তত্ত্বসংগীত ছাড়া প্রণয়সংগীতও রচনা করেছিলেন। কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেবের 'সংগীতরাগকল্পদ্রুমে' কালী মির্জার আড়াই শতাধিক গান সন্নিবেশিত হয়েছে। অবশ্য কালী মির্জা গায়করূপেই প্রসিদ্ধ, কবি হিসাবে তাঁর খ্যাতি নিধু-শ্রীধরের প্রতিস্পর্ধী ছিল না। তাঁর কাব্যাংশে দাশরথির আনুপ্রাসিকতা ও কষ্টকল্পনা আছে[২৫]। অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গীতিলহরী'র (১৯০৪) তথ্যে জানা যায় যে, রামমোহন কালী মির্জার কাছে সংগীতশিক্ষা লাভ করেছিলেন।

৪

উনবিংশ শতাব্দীর বহুজনপ্রিয় গীতরূপের সঠিক প্রকৃতিনির্ণয় অধুনা প্রায় দুঃসাধ্য, কারণ সেকালের এই সকল গীতপ্রকৃতির স্বরলিপি না থাকায় তার

যথার্থ স্বরূপটি নিরূপণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নানা পরস্পরবিরোধী মতবাদে ও তথ্যের অভাবে এই ব্যাপারে আমাদের জ্ঞানের অভাব থেকেই যাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আখড়াই গানের ইতিহাস আলোচনা করা যায়। ইতিপূর্বে টপ্পার সঙ্গে আখড়াই গানের সম্পর্ক আলোচনাকালে আখড়াই গান বিষয়ে নিধুবাবুর গীতসংকলন গীতরত্নের ভূমিকা থেকে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি উদ্ধার করা হয়েছে। আখড়াই গান একপ্রকার উচ্চাঙ্গগীতরূপ হলেও বাঙলা কাব্য-সংগীতে টপ্পার পর আখড়াই গান অবলম্বনেও অনেক কবির দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছিল। সংবাদপ্রভাকরে কবিজীবনী-সংগ্রহকালে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই গানের উৎপত্তির ইতিহাস ও অন্যান্য প্রচারবিবরণ যা সংগ্রহ করেন, সেগুলি প্রথমে উদ্ধৃত করা হচ্ছে—

"১২১০ সালের পূর্বে মৃত মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের সময়ে বাঙালি মহাশয়-দিগের মধ্যে 'আখড়াই' গাইবার অত্যন্ত আমোদ ছিল। তখন উক্ত মহারাজের নিকট কুলুইচন্দ্র সেন নামক একজন বৈদ্য আখড়াইবিষয়ে অতিশয় প্রতিপন্ন ছিলেন। ঐ মহাশয় সংগীতশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পারদর্শী ছিলেন, তাঁহাকে আখড়াই গাইবার একজন জন্মদাতা বলাই কর্তব্য হয়। যদিও তাঁহার পূর্বে ও তৎসমকালে উক্ত বিদ্যায় বিশেষ নিপুণ আর কয়েক ব্যক্তি এতন্নগরে ও চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানে সজীব ছিলেন, তথাচ এই মহাশয়কে তাঁহাদিগের সকলের অপেক্ষা প্রধান কহিতে হইবেক, যেহেতু ইনি আপন ক্ষমতা ও শক্তিদ্বারা পুরাতন বিষয়ের কোনো কোনো অংশ পরিবর্তনকরতঃ অনেক নূতন সৃষ্টি করেন। সুর ও গীতকে নানাপ্রকার রাগরাগিণীতে যুক্তকরতঃ নূতন নূতন বাদ্যের সূচনা করিয়াছিলেন। ঐ কলুইচন্দ্র সেন ৺রামনিধি গুপ্তের অতি নিকটসম্বন্ধীয় মাতুল ছিলেন। আখড়াই গীতের ইনি যে সকল নূতন প্রণালী করেন সেই প্রণালীই অদ্যাবধি প্রচলিত রহিয়াছে।

১২১০ সালে যখন মহামান্য মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুর আখড়াই আমোদে আমোদী হইলেন, তখন শ্রীদাম দাস, রাম ঠাকুর ও নসীরাম সেকরা প্রভৃতি কয়েকজন সর্বদাই আখড়াই সংগীতের সংগ্রাম করিত, ইহারা তারতেই এই বিষয়ে বিশেষ পণ্ডিত ছিল, কিন্তু শৌখিন ছিল না, পেশাদারি করিয়া টাকা লইত।

১২১১ অব্দে নিধুবাবুর উদ্যোগে এতন্নগরে দুইটি সংশোধিত শখের আখড়াই দলের সৃষ্টি হইল। তাহার একপক্ষে বাগবাজার, শোভাবাজারস্থ সমুদয় ভদ্রসন্তান এবং আর একপক্ষে মনসাতলা অথবা পাতুরেঘাটানিবাসী ৺নীলমণি মল্লিক মহাশয় ও তাঁহার বন্ধুবর্গ ব্রতী হইলেন। আখড়াই যুদ্ধের

স্থিরতার নাম 'বদী' ও পক্ষ-প্রতিপক্ষের নাম 'বাদী'। এই উভয়দলে 'বদী' হইলে নিধুবাবু বাগবাজারের পক্ষ হইয়া গীত ও সুর প্রদান করিলেন এবং মল্লিকবাবুর পক্ষে শ্রীদাম প্রভৃতি কয়েকজন গীত ও সুর প্রস্তুতকরণার্থ প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সংগীতসংগ্রাম শ্রবণ-দর্শনকরত নগরস্থ সমস্ত বিশিষ্ট লোক অপর্যাপ্ত আনন্দ-সাগরে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে শখের আখড়াই স্থাপিত হইলে ব্যবসায়ীদিগের আখড়াইয়ের দল একেবারে উঠিয়া গেল।"[২৬]

উল্লেখযোগ্য যে এই বিবরণই প্রায় অবিকৃত আকারে 'গীতরত্নে'র ভূমিকায় দেখা যায়, যা পূর্বে উদ্‌ধৃত করা হয়েছে। গুপ্ত কবির এই কৌতুকপ্রদ বিবরণ আখড়াই গানের ইতিহাস সম্পর্কে মোটামুটি আলোকপাত করে। ঈশ্বর গুপ্ত আরও জানিয়েছেন যে শখের আখড়াই এইভাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করায় কলকাতার অধিকাংশ গীতপ্রিয় বিত্তশালী পরিবারেই আখড়াই গানের রেওয়াজ হল। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবার, জোড়াসাঁকোর সিংহপরিবার, গরানহাটার বসাকপরিবার, শোভাবাজারের 'কালীশংকর ঘোষের পুত্রগণ ও শ্যামপুকুরের দিগম্বর মিত্র, হলধর ঘোষ প্রভৃতি কতিপয় বন্ধু' প্রত্যেকেই নিজেদের অঞ্চলে একটি করে আখড়াইয়ের দল গড়ে তোলেন এবং তাদের সকলের সঙ্গেই বাগবাজারের দলের দুএকবার করে গীতসংগ্রাম হয়েছিল। স্বভাবতই এই সকল সংগীতদ্বৈরথে নিধুবাবু ও 'গাহনাপক্ষে অদ্বিতীয় স্বরসিদ্ধ সুরজ্ঞ কোকিলকণ্ঠ বাবু মোহনচাঁদ বসু'র শক্তিতে পারদর্শী বাগবাজারের দলের জয়ই সুনিশ্চিত ছিল। তবে বাগবাজারের পক্ষের পরাজয়ও দু একবার ঘটেছিল, কারণ, গুপ্ত কবি রসিকতা করে লিখেছেন—

"গাহনা বাজনার জয়পরাজয় 'হাওয়ার' উপরেই নির্ভর করে। গীত সুর ও গায়ক, এই তিন সর্বোৎকৃষ্ট হইলেও এক একদিন হাওয়ার দোষে জমাট হয় না, ফাঁকে ফাঁকে উড়িয়া যায়। যাঁহারা সকল বিষয়েই অপকৃষ্ট, দৈববশত 'হাওয়ার' গুণে তাঁহারা এমত 'লগ্ন' করেন যে তচ্ছ্রবণে শ্রোতৃমাত্রেই সীমাশূন্য সন্তোষ-সাগরে মগ্ন হইতে থাকেন, বিশেষত রাগরাগিণীর খেলা ছেলেখেলা নহে, অতিশয় কঠিন। যে সময়ের যে রাগ, সেই সময়টি না হইলে সে রাগের রাগ থাকে না, ইহাতে সময়ের বৈলক্ষণ্য জন্য রাগের অনুরাগ না হইয়া সহজেই বিরাগ হইতে পারে। যাহা হউক সকল পক্ষই পরস্পর জয়ী ও যশস্বী হইবার জন্য যথাযোগ্য যত্নের ত্রুটি করেন নাই, সাধ্যমত সাধন করিয়াছেন, ইহাতে কোন কোনবার বাগবাজারের দল পরাভব হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কোনবারে সর্বতোভাবেই পরাভব হয়েন নাই।"

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত স্পষ্টই মোহনচাঁদ বসুকে হাফআখড়াই গানের প্রবর্তক বলে উল্লেখ করেছেন এবং সমসাময়িক অন্যান্য সাক্ষ্যও এই সিদ্ধান্তের সমর্থক। সংবাদ-প্রভাকরে পাই—

"এই মহাশয় [মোহনচাঁদ বসু] স্বয়ং হাফআখড়ায়ের সৃষ্টিকরতঃ বঙ্গদেশস্থ সমস্ত লোককে মুগ্ধ করিয়াছেন এবং দাঁড়া কবির যে সকল সুর ও রথ, দোল এবং সংকীর্তন প্রভৃতির যে যে সুর করিয়াছেন তাহাই পীযূষ পরিপূর্ণ।...

যদিও দৈবশক্তি দেবীর অনুগ্রহেই ৺মোহনচাঁদ বাবুর এতদ্রূপ নাম সম্ভ্রম প্রতিপত্তি হইয়াছে, তথাচ রামনিধি গুপ্ত মহাশয়কেই তাঁহার সর্ববিষয়েরই মূলাধার কহিতে হইবেক, কেননা তাঁহারই দ্বারা শিক্ষা ও তাঁহারই দ্বারাই সংস্কার।"

মোহনচাঁদ বসুর পূর্বে জোড়াসাঁকোর রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় ও পাথুরিয়াঘাটার রামলোচন বসাক প্রভৃতি কয়েকজন হাফআখড়াই করেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মন্তব্য করেছেন যে তাঁদের গানকে যথার্থ হাফআখড়াই বলা যায় না। কারণ 'তাঁহারা পেশাদারি দাঁড়া কবির সুরে গান করিয়া কেবল বসিয়া গাহিতেন'। কিন্তু মোহনচাঁদের সুরে অসাধারণ নতুনত্ব ছিল, আখড়াই ভেঙে হাফআখড়াইয়ের প্রথম কৃতিত্ব তাঁরই। প্রথম যেদিন তিনি এই অভিনব গীতরীতি বড়বাজারের ধনী রামসেবক মল্লিকের গৃহে পরিবেশন করেন শীতকালের এক শনিবারের রাত্রে, "বোধ হয় তৎকালে প্রশংসার শব্দে বাটির থাম পর্যন্ত কাঁপিয়াছিল।" এই জনধন্যতাই তাঁকে নূতন প্রণালীর প্রবর্তকের সম্মান দান করেছিল। সেদিন জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটার দল সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়েছিল। পরে তারাও এই নতুন প্রণালী গ্রহণ করে।

আখড়াই গীতে উত্তরপ্রত্যুত্তর ছিল না। যাঁদের সুর ও গান ভাল হত, তাঁদেরই জয় হত। তাঁরা 'ঢোল বাজিয়া আনন্দপূর্বক গান করিতেন'। উভয় পক্ষেই তিনটি করে গীত গাইতেন—প্রথমে একটি 'ভবানী' বিষয়ক, পরে একটি 'খেউড়', সর্বশেষে এক একটি 'প্রভাতী'। সর্বদাই দুদলে, কখনো তিনদলে গীতযুদ্ধ ঘটত। গানের রীতি ছিল এইরূপ—'ভবানীবিষয়ের মহড়ায় ২৬টি অক্ষরে একটি ত্রিপদী, চিতেনে এইরূপ একটি ত্রিপদী, এবং পাড়ঙ্গে দুইটি ত্রিপদী। ইহাতেই কেবল সুর ও রাগরাগিণীর পাণ্ডিত্য এবং বাক্যের পারিপাট্য।' এই ধরনের আখড়াইতে বাদ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।[২৭] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন, 'ঠাকুরানীবিষয়ক গাহনার নিয়ম ও সংগতের নিয়ম যেরূপ, খেউড় ও প্রভাতীর নিয়ম অবিকল সেইরূপ'। আরও জানা যায়,

'আখড়াই খেউড ও প্রভাতী গীতে কি মহড়া কি চিতেন কি পাডঙ্গ অর্থাৎ, অন্তরা ইহার প্রত্যেকেতেই চতুর্দশটি অক্ষর, অর্থাৎ, একটি করিয়া পয়ার'। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, আখডাই গান বাক্‌ছুট রাগপ্রধান স্বরচর্চা মাত্র ছিল না—বাঙলা কাব্যের রূপরীতির উপরই এর স্থির ভিত্তি ছিল। শান্তিপুরের যে ভদ্রসন্তানরা সর্বাগ্রে আখড়াই গান চালু করেন, তাঁদের সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্ত ১২৬১ সালের ১লা ভাদ্র সংবাদপ্রভাকরে বলেছেন যে, তাঁরা ভবানী-বিষয়ক গাইতেন না, কেবল খেউড ও প্রভাতী গাইতেন। সেই সকল গীতে 'ননদী' ও 'দেওডা' (দেবর ?) এই সকল শব্দের উল্লেখ থাকত এবং গুপ্ত কবির ভাষায়, 'রচকেরা অতিশয় অশ্রাব্য কদর্য বাক্যে গীতসমুদয় রচনা করিতেন, তৎকালে তাহাতেই অত্যন্ত আমোদ হইত।' এ থেকেই প্রমাণ হয়, আখডাই গানকে অসুস্থ রুচির হাত থেকে উদ্ধার করে সুস্থ স্বাভাবিক কাব্যপ্রসঙ্গের বাহন করাতেই কলকাতার আখডাইশিল্পীরা এবং পরে হাফআখডাই গায়কগণ যত্নবান হয়েছিলেন। কুলুইচন্দ্র সেন, মোহনচাঁদ বসু হয়ত গীতকার ছিলেন না, কিন্তু নিধুবাবু, জোডাসাঁকোর দুর্গাপ্রসাদ বসু আখডাই গানের জন্য উত্তম কাব্যগীত রচনা করে দিয়েছেন। ঈশ্বর গুপ্ত উদ্ধৃত নিধুবাবু-রচিত আখডাই গানের একটি উদাহরণ এখানে সংকলিত হল—

যথা ভবানী বিষয়ক

ত্বমেকা ভুবনেশ্বরী সদা শিবে শুভকরী
নিরানন্দে আনন্দদায়িনী ।১
নিশ্চিত ত্বং নিরাকারা অজ্ঞানবোধে সাকারা,
তত্ত্বজ্ঞানে চৈতন্যরূপিণী ॥২
প্রণতে প্রসন্না ভাব ভীমতর ভবার্ণব,
ভয়ে ভীত ভবামি ভবানী ।৩
কৃপাবলোকন করি, তরিবারে ভববারি
পদতরী দেহি গো তারিণী ॥৪

যথা খেউড

সাধের পিরিতি সুখে দুখ পাছে হয় ।১
তুমি হে চঞ্চল অতি, সদা এই ভয় ॥২
গোপনে যতেক সুখ প্রকাশে তত অসুখ
ননদী দেখিলে পরে প্রণয় কি রয় ॥৩

তথা প্রভাতী.

যামিনী কামিনী বশ হয় কি কখন ।১

হলে কি ও বিধুমুখ হেরি হে মলিন ॥২

নলিনী হাসিবে কেন, কুমুদী বিরসানন,

এসুখে অসুখ তবে, করে কি অরুণ ॥৩

৫

'বাঙালির গানে'র সম্পাদক বাঙলা গানের যে শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন, তাতে উনিশ শতকের গানের মধ্যে কবিগীতির উল্লেখ ছিল, টপ্পা পাঁচালি ঢপ-কীর্তনের উল্লেখ ছিল, কিন্তু আখড়াই তর্জা ইত্যাদির উল্লেখ ছিল না। আমরা কবিগীতকে খাঁটি কাব্যসংগীতের অন্তর্ভুক্ত করিনি, আখড়াইকে করেছি। অবশ্য ঢপকীর্তনকে যেমন পাঁচালির শাখা, তেমনি আখড়াই হাফআখড়াই তর্জা প্রভৃতিকেও কবিগানেরই প্রকারভেদ মনে করা যেতে পারে। হাফআখড়াই গান আখড়াই গানের প্রকারভেদ হলেও এই গানের ইতিহাস সম্পর্কে কয়েকটি প্রাচীন তথ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। ১২৬১ বঙ্গাব্দের ১লা ভাদ্র সংবাদ-প্রভাকরে ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন—"সর্বাগ্রে শান্তিপুরস্থ ভদ্রসন্তানেরা আখড়াই গাহনার সৃষ্টি করেন, ইহা প্রায় ১৫০ বৎসরের ন্যূন নহে'। অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের সূচনাতেই আখড়াই সংগীতের উদ্ভব। কিন্তু আখড়াই সংগীত সম্পর্কে গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় ভিন্নমত পোষণ করেন।[২৮] তিনি লিখেছেন যে, সংগীতসংগ্রাম একটি প্রাচীন বঙ্গীয় রীতি। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে শান্তিপুর ফুলিয়ায় এই জাতীয় আখড়াই সংগীতসংগ্রাম খুবই জনপ্রিয় ছিল এবং মহাত্মা হরিদাস ঠাকুর ছিলেন এর নেতা। এই আখড়াই-সংগ্রামই কালক্রমে "কালস্রোতের কৌটিল্য ও রুচির পরিবর্তনে স্বভাবকবিদিগের আজীব্য হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা অর্থের প্রলোভনে পড়িয়া যদিও কথঞ্চিৎ পরিবর্তিতাকারে সম্পূর্ণ নিয়ম ও ভাবসম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সক্ষম থাকিল বটে; কিন্তু ব্যবসায়ের মধ্যে আনিয়া সেই মহনীয় আখড়াই সংগীতসংগ্রামকে কবির লড়াই করিয়া ফেলিল। তাহারই অনুকরণে সাধারণ অশিক্ষিত স্বভাব-কবি মুসলমানগণ আবার একটা নূতন করিয়া বসিল; তাহার নাম হইল তর্জার লড়াই। আবার শিক্ষিত ভদ্রবংশীয় যুবক ও প্রৌঢ়গণ উক্ত তিন প্রকারের ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া নিজেদের মৌলিকত্ব প্রমাণ করিবার জন্য আখড়াই সংগীত নাম দিয়া নূতন এক প্রকার দল সৃষ্টি করিলেন।"

এই ধরনের সংগীতসংগ্রামের কেন্দ্র ছিল শান্তিপুর, শান্তিপুর থেকে সপ্তগ্রামে তা ছড়িয়ে পড়ল। "সপ্তগ্রামে আবার আখড়াই সংগীতসংগ্রাম পূর্ণ প্রভাবে চলিতে লাগিল। ভাগীরথীর দেহ ক্ষীণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সপ্তগ্রাম হইতে বাণিজ্যকেন্দ্র হুগলি চুঁচুড়ায় সরিয়া আসিল। তাহার সহিত আখড়াই সংগীতসংগ্রাম প্রভৃতিও ধনীর সেবনীয় হইয়া চুঁচুড়ায় আসিয়া আসন পাতিল। ভাগীরথী তথায় ক্ষীণ হওয়ায় বাণিজ্যকেন্দ্র কলিকাতায় চলিয়া আসিবার কালে সহচর সংগীতসংগ্রামাদিও কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল।" এইভাবে কলকাতাবাসী ধনীদের গৃহে আমোদপ্রমোদ উৎসবোপলক্ষে সংগীতসংগ্রামের আহ্বানে আখড়াই গান জনপ্রিয়তা অর্জন করল। গানের প্রকৃতি ও পরিবেশনেও পরিবর্তন এল। পূর্বে দুএকটি ঢোলের সংগতের সঙ্গে দুএকখানি কাঁসির সংগত চলত, কবিওয়ালাদের 'চিতেন পরচিতেন পদের সুর আদায় করা হইত।' কিন্তু বিলাসী ধনীরা ঢোলক ও কাঁসির স্থলে মন্দিরা চালালেন, দাঁড়িয়ে গান গাইবার বদলে উপবিষ্ট গানের প্রবর্তন ঘটালেন, প্রশ্নোত্তররীতি রয়েই গেল। ফলে কবিগান ভদ্রসমাজে প্রবেশ করল, দাঁড়া কবির গান পৃথক হয়ে গেল। এই সময় কলকাতার সিমুলিয়ায় কালীচন্দ্র দিঘড়ির [দীর্ঘাঙ্গী] পুত্র হরেকৃষ্ণ দিঘড়ির 'কবিত্ববিকাশ ও সংগীতকলায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য কবিওয়ালাদিগের নিকট বিখ্যাত হইয়া উঠিল'। ইনি হরু ঠাকুর নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। কালীচন্দ্রের বন্ধু প্রসিদ্ধ কবি রঘুনাথ দাস হরু ঠাকুরকে নিজের দলে টেনে নিলেন। নবকৃষ্ণের সভায় গান গেয়ে হরু ঠাকুর সম্মান লাভ করেন ও রাজার উৎসাহে পৃথক দল স্থাপন করেন। এই সময় জোড়াসাঁকো পাথুরিয়াঘাটা বাগবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে এক একটি দলে এক একজন বিখ্যাত গীতকার ও সুরকার থাকতেন, যেমন জোড়াসাঁকোর শখের আখড়াই দলে ছিলেন রামনিধি গুপ্ত ও কুলুইচন্দ্র সেন। জোড়াসাঁকোর দল গোলাম আব্বাসনামক জনৈক 'দিল্লিওয়ালা কালোয়াতকে' আনিয়ে গায়কদের শিক্ষিত করেছিল বলে নিধুবাবুও তাঁর দলকে সম্পূর্ণ নতুন করে সংস্কার করেছিলেন। ভবানীপুরবাসী জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় পাথুরিয়াঘাটার দলে গান বেঁধে দিতেন। এই দলগুলির পারস্পরিক সংগ্রামে কোনো এক সময়ে আখড়াই গানে খেউড়কে অনুপ্রবিষ্ট করার পর থেকেই আখড়াই গান ভেঙে হাফআখড়াই গানের চলন হয়। 'আখড়াই সংগীতসংগ্রামে বাজনার পারিপাট্য ও প্রাচীন রীতি-অনুসারে-প্রচলিত ওস্তাদি কবির প্রশ্নোত্তর লইয়া কালোয়াতিছাঁচে গানের তালমানলয়াদির পারিপাট্যদ্বারা যে সংগীতসংগ্রাম

করিতে লাগিলেন, হাফআখড়াই সংগীতসংগ্রাম নামে তাহার প্রচলন হইয়া পড়িল। ফুলিয়া গ্রামে যে আখড়াই সংগীতসংগ্রাম প্রচলিত হয়, শান্তিপুরে যাহার বিকাশ হয়, সপ্তগ্রাম চুঁচুড়া ও কলিকাতায় আসিয়া যাহার বৈচিত্র্য ও বিকৃতি ঘটিয়া যায়, ফুলিয়ার মুখুটিবংশের প্রধান পুরুষ লোকোত্তরপ্রতিভাশালী স্বভাবকবি ও স্বভাবকালোয়াত রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আবার তাহাকে সেই পূর্বভাব ও প্রাচীন সম্পদের অধিকারী করিয়া বিশেষিত করিবার জন্ম হাফআখড়াই সংগীতসংগ্রাম নামে প্রচলিত করিলেন।"[২৯]

রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর নিধুবাবুকে দিয়ে শোভাবাজার ও বাগবাজারে দুটি দল গড়ে তোলেন। দলের মধ্যে মোহনচাঁদ বসুর প্রতিভা বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। গঙ্গাচরণ ভট্টাচার্য মহাশয় জানিয়েছেন যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও এই দলে গান রচনা করতেন। কিন্তু তথ্যটি সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর। রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের মৃত্যু ঘটেছিল ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে, ঈশ্বর গুপ্ত তখন ১১ বৎসরের বালক, এই বয়সে তাঁর পক্ষে গানরচনা সম্ভব নয়। মনোমোহন বসু তাঁর 'মনোমোহন গীতাবলী'তে[৩০] হাফআখড়াই সংগীতের যে উৎপত্তির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন, তা বরং ঈশ্বর গুপ্তের বিবরণের সঙ্গে মেলে। ভূমিকায় 'হাফ-আখড়াইয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' প্রবন্ধে মনোমোহন লিখেছেন, "হাফআখড়াইয়ের সৃষ্টিকর্তা বাগবাজারবাসী স্বর্গত সুবিখ্যাত বাবু মোহনচাঁদ বসু। তাঁহার প্রণীত সুরমাত্রই মনোমুগ্ধকর, নিতান্তই মধুময়। তাঁহার কৃত শব্দযোজনাও তেমনি মধুর ছিল।" এই প্রবন্ধে মনোমোহন জানিয়েছেন যে স্বয়ং মোহনচাঁদ বসুর নিকট তথ্য সংগ্রহ করে ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মুখে ও লেখা থেকে এবং অন্যান্য সূত্রে সংগৃহীত সংবাদ ও তথ্যের ভিত্তিতেই প্রবন্ধটি লেখা। প্রথমে ফুলআখড়াইয়ের আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, শান্তিপুর ইত্যাদি স্থানে যে সকল আখড়াই গান প্রচলিত ছিল, সেগুলি নিতান্তই রুচিদুষ্ট। কুলুইচন্দ্র সেন মহাশয় আখড়াই গানের এত শ্রীবৃদ্ধি ও নূতন সৃষ্টি করেন যে, 'তাঁহাকেই এক প্রকার ইহার জন্মদাতা বলিলেও বলা যায়। শুদ্ধ নানা প্রকার রাগ রাগিণীযুক্ত সুর বলিয়া নয়, নূতন নূতন বাদ্যের বিকাশও তাহা হইতে হয়।' নিধুবাবুও মাতুলের শিক্ষা ও উৎসাহে আখড়াই গানের উন্নতিতে কৃতযত্ন হয়েছিলেন। তবে আখড়াই গান ও নিধুবাবুর টপ্পা যে এক নয় সে বিষয়ে মনোমোহন বসু স্পষ্ট জানিয়েছেন। নিধুবাবুর উদ্যোগে "১২১১ বঙ্গাব্দে প্রথম দুটি সংশোধিত প্রণালীর শখের দলের সৃষ্টি হয়। একপক্ষে বাগবাজার ও সভা-[শোভা] বাজার, অপরপক্ষে পাথুরিয়াঘাটা প্রভৃতি স্থানের

ধনী ও গৃহস্থ ভদ্রগণ। তুমুল ব্যাপার—সেরূপ জিগীষাপ্রণোদিত হুলুস্থুলু কাণ্ড ও ঘোরঘটার আভাস এখনকার লোকের মনে ধারণা হওয়াই ভার। এক কথায় শহর তোলপাড়।" এই নাগরিক উত্তেজনা ও সংগ্রামে জয়পরাজয়ের প্রবল 'ঘোরঘটার' কথা গঙ্গাচরণ ভট্টাচার্যের গ্রন্থে আছে, যদিও মনোমোহন বসুপ্রদত্ত বিবরণ ও তারিখের সঙ্গে মেলে না।[৩১]

পরবর্তীকালে ঈশ্বর গুপ্ত ও মনোমোহন হাফআখড়াই সংগীতের সঙ্গে নিজেরাও যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। হাফআখড়াই সংগীতকে কাব্যসংগীতের ইতিহাসে আলোচনার স্বপক্ষে এটিও একটি যুক্তি। মনোমোহনের জনৈক চরিতকার লিখেছেন—

"ধর্ম নীতি ইত্যাদি সম্বন্ধীয় প্রশ্ন লইয়া দুই দল গায়কের মধ্যে এই আখড়াইয়ের লড়াই চলিত। দেশের অনেক প্রসিদ্ধ লোক ইহার কোন না কোনো দলে নেতৃত্ব করিতেন।...মনোমোহন প্রভৃতির সহিত কাশীধামে অবস্থানকালে গুপ্ত কবি এক হাফআখড়াইয়ের আসরে অন্য উপযুক্ত লোক না পাইয়া মনোমোহনকেই প্রতিপক্ষ নির্বাচিত করেন এবং তাঁহার সহিত সংগীত-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।.. মনোমোহন এই লড়াইয়ে গুরুকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গুরুশিষ্যের এই সংগীতসমরের কাহিনী মনোমোহন-গীতাবলীতে লিপিবদ্ধ আছে[৩২]।"

বাঙলা কাব্যসংগীতের ইতিহাসে কবিগান আখড়াই হাফআখড়াইব্যতীত অন্যান্য গীতরূপগুলির কথাও প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। এ যুগের অন্য দুটি গীতরীতি যাত্রা ও পাঁচালিকে অন্যান্য কাব্যসংগীতের ইতিহাসভুক্ত করা যায় না, যদিও রূপরীতির দিক থেকে এগুলিতে প্রাচীন ভক্তিধর্মের বদলে অনেকক্ষেত্রেই আধুনিকতা দেখা দিয়েছিল। এদের মধ্যেও কাব্যসংগীতের অনেক প্রকীর্ণ উদাহরণ আছে। এইসব তথাকথিত যাত্রায়, বিশেষ করে বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় কথা গদ্যভাগ নাচ অভিনয় ইত্যাদি ছাড়াও যথেষ্ট গান থাকত এবং সেইসব গান জনপ্রিয়তাও লাভ করেছিল। 'প্রীতিগীতি' গ্রন্থে গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রার বহু গান সংকলিত হয়েছে। 'বাঙালির গানে' ও বিদ্যাসুন্দর যাত্রা এবং আরও বহু যাত্রাপালার বিভিন্ন ধরনের গান সংকলিত হয়েছে। এই জাতীয় যাত্রাগানই পরবর্তীকালে নাট্যসংগীতে পরিণত হয়েছে। নাট্যনিবদ্ধ কাব্য-সংগীতগুলি অবশ্য পৃথকভাবে আলোচিত হবে, কিন্তু যাত্রার বিচ্ছিন্ন গানগুলির মধ্যে কাব্যসংগীতের উপাদানের অভাব থাকায় সেইগুলিকে বাঙলা কাব্যগীতির ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা যায় না।

এই পবের আর একটি গীতরীতির নাম ঢপ বা ঢপকীর্তনের প্রবর্তক মধুসূদন কিন্নর বা মধু কান (১৮১৮-১৮৬৮ খ্রীঃ)। কেউ কেউ রূপচাঁদ অধিকারীকেও ঢপের প্রবর্তক বলেছেন। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে রূপচাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে লেখা আছে—'ঢপকীর্তনপ্রবর্তনে ইনি সমধিক প্রসিদ্ধ।' রূপচাঁদের ঢপের কথা রামগতি ন্যায়রত্নও তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কীর্তনের সুরের উপরই ঢপের প্রতিষ্ঠা এবং কবিগানের জগৎ বিশেষত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলোকই ঢপের উপকরণ। ঢপকে অনেকে ঢপ-পাঁচালি বলেন, সুতরাং পাঁচালির রীতিভঙ্গি বা সুরের প্রভাবও খানিকটা এর মধ্যে ছিল। তারাপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন—'পাঁচালি দ্বিবিধ—অপরিণত ও সুপরিণত। অপরিণত পাঁচালির সংযোগভাষণ গদ্যে রচিত হয়। ইহার নাম ঢপ'।[৩৩] অথচ বিশ্বকোষে আসল কীর্তনকেই ঢপ বলা হয়েছে। পূর্বে রূপদাস নামক এক ব্যক্তির নাম ঢপের শিল্পী হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। রামগতি ন্যায়রত্নকথিত রূপচাঁদ ও রূপদাস এক ব্যক্তির নাম কি না নিশ্চিত বলা যায় না। বিশ্বকোষে একটি প্রবাদের উল্লেখ আছে—

ঢপে রূপ কীর্তনে স্বরূপ
রামায়ণে রাম ও চণ্ডীতে হাম।[৩৪]

রূপের পর অঘোর দাস, দ্বারিক দাস ও শ্যাম বাউল প্রভৃতি ঢপশিল্পীদের নাম পাওয়া যায়। এই ঢপ ছিল প্রাচীন কীর্তনেরই রূপ মাত্র। তারও বহুকাল পরে মোহনদাস বৈরাগী ঢপের নূতন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। বিশ্বকোষের মতে, "তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী ঢপোদিগের 'তুক্কো' ব্যতীত 'ছুট' নামে আর এক প্রকার গানের ছড়া দ্বারা রাধাকৃষ্ণ ও সহচরিদিগের ভাবপ্রকাশের নূতন পদ্ধতি প্রবর্তিত করিলেন।[৩৫] এই ছুটের মধ্যে বৈষ্ণবদিগের কবিত্ব, শব্দানুপ্রাস ও বাগ স্তব প্রকাশের বিলক্ষণ যত্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনুপ্রাসযুক্ত ছুট রচনাবিষয়ে যেমন মোহনদাসের নাম বিখ্যাত, সেইরূপ মধুসূদন কান নামে আর এক ব্যক্তির নাম বড় প্রসিদ্ধ। অধুনাতন ঢপো ও ঢপীরা অনেকেই মধুর ছুট গান করিয়া থাকেন, তাহার ছুটের সর্বশেষে সূদন এই নামে ভণিতা আছে।

মধু কানের গানের রচনা প্রণালী দেখিলে বোধ হয় যে কান অতিশয় অনুপ্রাসভক্ত ছিলেন; কিন্তু তাদৃশ শক্তি না থাকায় তিনি ঢপকে এক রকম বেঢপ করিয়া তুলিয়াছেন; তাঁহার অধিকাংশ গীতের মধ্যে কিছুমাত্র কবিত্ব দৃষ্ট হয় না, কবিত্ব দূরে থাকুক, অনুপ্রাসের অনুরোধে এত অশুদ্ধ শব্দবিন্যাস আছে যে, তাহাতে পদে পদে দ্বিরুক্তি ও ব্যর্থপ্রয়োগদোষ ঘটিয়া যায় এবং কোনো কোনো গীতের অর্থসংগতি করিতে পারা যায় না।" বিশ্বকোষ

জানিয়েছেন, যে উনিশ শতকের শেষ দিকে ঢপ গান মহিলাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। জগমোহিনী নামে কানবংশীয় একটি স্ত্রীলোক "ঢপের কীর্ত্তনে অসাধারণ যশস্বিনী হইয়াছিল। সে এখানকার কীর্তনিয়াদের ন্যায় মোহনদাসের বা মধু কানের লম্বা লম্বা ছুট গাহিত না, প্রাচীন কীর্তনিয়াদের ন্যায় ছোট ছোট তুক্ক গাহিত।"

মধু কানের ঢপ কীর্তনভাঙা হলেও আধুনিক পাঁচালি রীতির বিশেষত্ব নিঃসন্দেহে এর মধ্যে অল্পবিস্তর প্রবেশ করেছিল। বিশ্বকোষের আলোচনাকারও স্বীকার করেছেন, "ঢপের কীর্ত্তনে যে প্রস্তাব বা কৃষ্ণলীলাঘটিত গান হয় গায়ক কি গায়িকা গদ্যে বক্তৃতা করিয়া তাহা প্রকাশ করে। বক্তৃতার শেষভাগে একটি ক্ষুদ্র পদ্য তানলয়স্বরসংযোগে গাহিয়া উপসংহার করাই নির্দিষ্ট নিয়ম। যথা মাথুর পালায় শ্রীমতী রাধিকার উক্তি—'কৈ সখি কৃষ্ণ তো এতদিনেও আর প্রত্যাগমন করিলেন না, আর কী আশায় জীবন ধারণ করি' ইত্যাদি. উপসংহারে—'ও সেই আসি বলে মাধব গেছে, ও তার আমার আশাবল কই আর আছে'। এই শেষ গদ্যটুকুর নাম 'তুক্কো'। এই সময় খোলীরা ভয়ংকর কাণ্ড করিয়া সেই তুক্কের সঙ্গে বাজাইয়া থাকে। খোলীরা ইহাকে মান বলে কিন্তু শুনা যায় অনেক স্থলে এরূপ মান দেওয়ায় দলপতির মান থাকা কঠিন হয়।" অন্যত্র বলা হয়েছে, "ঢপের কীর্তনে গানের ভাগ অতি অল্প। উহার সমস্তই বক্তৃতাদ্বারা প্রকাশ পায়। বক্তৃতাশেষে তানমানস্বরসংযোগে একটি তুক্ক গান করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের উপসংহার হইয়া থাকে।" অতএব এইসব আলোচনা থেকে মোটামুটি প্রমাণিত হল, প্রাচীন কীর্ত্তনের সুর ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে পাঁচালির গদ্যধর্মিতা ও কথকতার ভঙ্গি যুক্ত করে, কবিসংগীতের তুক্কো প্রভৃতি রীতি মিশ্রিত করে, বিশেষ এক ধরণের বর্ণনাত্মক রাধাকৃষ্ণলীলা গাওয়াই ছিল ঢপ নামক নতন গীতরীতির বৈশিষ্ট্য। এই রীতি মধুসূদন কানের হাতে কবিত্বপ্রতিভার আনুকূল্যে বাঙলা কাব্যসংগীতের ইতিহাসে আপনার একটি ক্ষুদ্র আসন দখল করেছে। মধু কানের সুর সম্পর্কে 'বাঙালির গানে'র সম্পাদক লিখেছিলেন, "তিনি ক্রমে ক্রমে মান মাথুর অক্রূরসংবাদ ও কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি পালা রচনা করেন। তাঁহার সংগীতগুলি ভক্তিরসপ্রধান। গানের সুরে তিনি কাহারও অনুসরণ করেন নাই—স্বয়ং আবিষ্কার করিয়াছিলেন।" মধু কানের রচনায় দাশরথির সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। তাছাড়া ঈশ্বর গুপ্তের সমসাময়িক হওয়ায় গুপ্ত কবির দ্বারাও প্রভাবিত হওয়াও তাঁর পক্ষে আশ্চর্য নয়। পদাবলীর বিষয়বস্তুকে বাঙালি জীবনের সহজ লোকসংস্কারের অনুকূল করে অথচ সহজ

ভক্তিরস থেকে বঞ্চিত না করে মধু কান যে সংগীতগুলি রচনা করেছিলেন, তার কাব্যধর্ম উচ্চাঙ্গের না হলেও একেবারে নিকৃষ্ট নয়।[৩৬] তাঁর রচনায় অনুপ্রাস শব্দের ধ্বনিঝংকারেও এক প্রকার কবিত্বের স্পর্শ মেলে, যথা—

দিলাম আমি লও সোনা তবুতো ভালবাস না
তুমি চাহ যে সোনা দিয়াছি সেই সোনা।
ও সোনা হৃদয়ের সোনা—
কেলে-সোনার সমান সোনা এই কাঁচা সোনা,
ঘুচে যাবে উপাসনা নিলে এই সোনা
তবে আর দাঁড়াও কেনে পেলে তো বা-শোনা।
লয়ে সোনা আর এসো না
রাখ অতি সাবধানে,
মদন কয় কোরো না সোনা
ওতো জারা সোনা ও সোনা রোগশাসনা॥

পৌরাণিক প্রসঙ্গহীন সহজ ভক্তিধর্মের প্রকাশে মধু কানের একটি গান ঊনিশ শতকের ব্যক্তিত্বস্পর্শময় কাব্যগীত হয়ে উঠেছে—

বিফলে দিন যায় রে বীণে।
শ্রীহরির সাধন বিনে অসার খলু সংসারে
সারাৎসার নাম শুনবিনে।
বৃথা গুণগুণ রবে কি গুণ পাও সগৌরবে
নির্গুণে আর কে তারিবে গুণাতীত গুণ বিনে।
জ্ঞান বীণে অনুরাগ, জ্ঞান কত রাগিণী রাগ
ভক্তিরাগে যুক্ত কর রাগে যেন ঘটে বিরাগ,—
মূল কথা শোন মন দিয়ে মূলমন্ত্র মিশাইয়ে
মূলতানে আলাপ করিয়ে মজ বিশ্বমূলতানে॥
দীপক বাসনা জ্বলে যেন জ্বলে প্রেমানলে,
নির্বাণে পাইবে মুক্তি মল্লারে আনহ জলে;—
ত্যজিয়ে মনের ভ্রান্তি মিশাইয়ে জয়জয়ন্তী
যখন জয়জলদকান্তি জয় হবে যমনিদানে॥

১। বাঙলায় সংগীতের ইতিহাস,—মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

২। 'বাঙলার সংগীত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা'—রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অধুনাতন, পৌষ ১৩৬৩ আরও স্মরণীয় "বাঙলায় হিন্দুস্থানী খেয়ালের বীজ রোপিত হয় খ্রীঃ ১৯শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে

তখন বহু মুসলমান সংগীতশিল্পী দিল্লি আগ্রা ও ভারতের অন্যান্য স্থান থেকে বাঙলায় এসে হুগলি, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, কৃষ্ণনগর, গোবরডাঙ্গা, বিষ্ণুপুর, মুর্শিদাবাদ, ময়মনসিংহ, ঢাকা, আগরতলা, কুমিল্লা, নাটোর, আসাম, গৌরীপুর এবং বিশেষ করে কলকাতায় বসবাস করতে থাকেন। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ক্লাসিক্যাল সংগীতের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জোড়াসাঁকোর রাজবাড়িতে তখন প্রায় প্রত্যহই হিন্দু ও মুসলমান গায়কদের সংগীতের আসর বসত।"—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—ভাষণাবলী (১৯৬১ ডিসেম্বর)

৩। "কিন্তু ইংরাজের নূতন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভার উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান।"—কবিসংগীত, রবীন্দ্রনাথের 'লোকসাহিত্য'। বিনয় ঘোষ 'জনসভার সাহিত্য' গ্রন্থে কবিসংগীতকেই জনসভার প্রথম সাহিত্যসৃষ্টি বলেছেন

৪। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীনপর্ব)—তারাপদ ভট্টাচার্য (১৯৬২) পৃঃ ১১৪

৫। সংবাদপ্রভাকরে কবিওয়ালাদের জীবনী ও কাব্যসংগ্রহের পর এই বিষয়ে আরো কিছু প্রয়াস ও কবিসংগীত সম্বন্ধে আলোচনা—প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি—'ভারতী' (১২৮৯) কবিওয়ালা—'নব্যভারত', লেখক ব্রজসুন্দর সান্যাল (১৩১১), কবির গান—'জন্মভূমি' (১৩০৩), প্রাচীন কবিসংগ্রহ—'সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা' (১৩০২), প্রাচীন কবিসংগ্রহ—গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৪), সারস্বতকুঞ্জে রাম বসুর বিরহ—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪), গুপ্তরত্নোদ্ধার বা প্রাচীন কবিসংগীত সংগ্রহ—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪)

৬। বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব (১২৯৪), ২য় সংস্করণ।

৭। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস—তারাপদ ভট্টাচার্য

৮। টপ্পার সাংগীতিক প্রেরণা ধ্রুপদ খেয়ালের মতই। ক্যাপ্টেন উইলার্ড নামে জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে, টপ্পা রাজপুতনার উটচালকদের গান ছিল

৯। "ভাবের উদয়মাত্রেই মুখ হইতে স্বভাবতঃ যে সকল কথা নির্গত হইত, ইনি তাহাই সুর ও রাগভুক্ত করিয়া গান করিতেন"—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, সংবাদপ্রভাকর, ১ শ্রাবণ ১২৬১

১০। নানা নিবন্ধ—ডঃ সুশীলকুমার দে, 'রামনিধি গুপ্ত'

১১। গানের আসর—শার্ঙ্গদেব, দেশ, ১৯ সংখ্যা, ২১ বর্ষ, ১৩৬১

১২। গীতরত্ন—রামনিধি গুপ্ত (৩য় সং)

১৩। বাঙলা লোকগীতির সুরবিচার—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাঙলার লোকসাহিত্য' ১ম খণ্ড গ্রন্থের পরিশিষ্ট

১৪। গীতসূত্রসার—কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৯১)। পূর্বেই বলা হয়েছে, নিধুবাবুর টপ্পার ব্যবহৃত রাগরাগিণীর মিশ্রণসহ সংখ্যা ১০৩টি। সুতরাং কৃষ্ণধনের এই পর্যালোচনা বাঙলাদেশের টপ্পা সম্পর্কে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য নয়

১৫। স্বয়ং নিধুবাবু টপ্পায় একটি ব্রহ্মগীতি রচনা করেছিলেন। টপ্পার সুরে ব্রহ্মগীতরচনার ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রসৃত। যে সুরে 'সকল প্রকার গানই হয়' ব্রহ্মগীতের ক্ষেত্রে তার ব্যবহার 'সংগীততত্ত্বে অজ্ঞতা ও অনুন্নত রুচির ফল' এরূপ মন্তব্য একদেশদর্শিতা মাত্র

১৬। গীতসূত্রসার—কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৯১)

১৭। ভিক্টোরীয় যুগের বাঙলা সাহিত্য—হারাণচন্দ্র রক্ষিত (আশ্বিন ১৩১৮)।

১৮। বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, ২য় সং (১২৯৪)। ডঃ সুশীলকুমার দে 'নানা নিবন্ধে' রামনিধি গুপ্ত সম্পর্কিত আলোচনায় নিধুবাবুর কাল নির্ণয় করেছেন, ১১৪৮ [১৭৪১] —১২৪৫ [১৮৩৯] বঙ্গাব্দ। মৃত্যু তারিখ ২১ চৈত্র। তিনি তিনবার বিবাহ করেছিলেন, যথাক্রমে ১১৬৮, ১১৯৮ এবং ১২০১।২ সালে।

১৯। বটতলার নিধুবাবু—জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সমকালীন, বৈশাখ ১৩৭৫

২০। ভূমিকা—গীতরত্ন। এই ভূমিকায় নিধুবাবুর জীবনী রচনা করেছেন নিধুবাবুর পুত্র জয়গোপাল। কিন্তু ডঃ সুশীলকুমার দে সাহিত্যপরিষদে পঠিত প্রবন্ধে (২৪শ বার্ষিক ৩য় মাসিক অধিবেশনে) বলেছেন—'এই জীবনবৃত্তান্ত জয়গোপাললিখিত নহে. প্রভাকরে (১ শ্রাবণ ১২৬১ নিধুবাবুর যে জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা হইতেই সংকলিত।

২১। নানা নিবন্ধ—সুশীলকুমার দে, প্রাগুক্ত প্রবন্ধ

২২। ভিক্টোরীয় যুগের বাঙলা সাহিত্য

২৩। নানা নিবন্ধ—সুশীলকুমার দে, প্রাগুক্ত প্রবন্ধ

২৪ এই গানটি সম্পর্কে 'ভিক্টোরীয় যুগের বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থে হারাণচন্দ্র রক্ষিত লিখেছেন "প্রণয়িনীর প্রতি কি গভীর প্রেম অভিব্যক্তি। ভালবাসার সামগ্রী এমনই হয় বটে তার তুলনা এ পৃথিবীর কোন বস্তুতেই নাই। প্রেমের ভাষাও নাই- 'তোমারই তুলনা তুমি'। এ ভাবের অভিব্যক্তিটি নিধুর মত কবিই প্রকাশ করিতে পারেন। বঙ্গভাষা এই ভাবটি পাইয়া গৌরবান্বিত হইয়াছে।"

২৫ বাংলার গীতকার—রাজ্যেশ্বর মিত্র, ১ম স

২৬। সংবাদপ্রভাকর ১লা শ্রাবণ ১২৬১। দ্রষ্টব্য ভবতোষ দত্তসম্পাদিত 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিজীবনী' (পৃঃ ১০১) এবং নিরঞ্জন চক্রবর্তীর উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাঙলা সাহিত্য' (পৃঃ ১১)

২৭। 'সংগতের বাদ্য পিড়েবান্দ দোলন দৌড় সবদৌড় এবং গানসমাপন সময়ে যে বাদ্য, তাহার নাম মোড় কি মহড়া কি চিতেন কি পাড়ঙ্গ। সকল গাহনার বাদ্য প্রায় একরূপ; কিঞ্চিৎ প্রভেদমাত্র। ত্রিপদীর একটি পদ যথা—'নিশ্চিত ত্বং নিরাকারা'—এই কয়েকটি কথা গাহিতে যেমন রাগরাগিণীর পরিবর্তন, অমনি তৎসঙ্গে সঙ্গেই বাদ্যের পরিবর্তন হইয়া থাকে।...প্রথমে মহড়া গাহিয়া গায়কেরা একবার বিশ্রাম করেন, ঐ সময়ে সাজ বাজিয়া থাকে, সেই সাজ সাঙ্গ হইলে আবার চিতেন ধরেন। চিতেন সাঙ্গ হইলে আবার সাজ বাজে; তৎপরে পাড়ঙ্গ গাহিয়া গান সমাপন করেন।'—সংবাদপ্রভাকরের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ। আখড়াই গানের সংগত এত আশ্চর্য ছিল যে, "উত্তরপশ্চিমপ্রদেশীয় অদ্বিতীয় সংগীততৎপর গায়ক ও বাদ্যকর মহাশয়েরা কোনক্রমেই সহজে তাহার মর্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন না।"—১২৬১ সালের ১লা ভাদ্রের সংবাদপ্রভাকর থেকে জানা যায় যে চুঁচুড়ার আখড়াইদল কলকাতায় গাইতে আসতেন—"ইঁহারা হাঁড়ি কলসী প্রভৃতি ২২খানা যন্ত্র বাজাইতেন, ইহাতে তাবতেই চুঁচুড়ার দলকে 'বাইসেরা' বলিতেন"। আখড়াই দলের বিভিন্ন বাদ্য ও বাদ্যকার সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আরও তথ্য আছে

২৮। হাফআখড়াই সংগীতসংগ্রামের ইতিহাস—গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য (১৩২৬, ৩০শে ভাদ্র, প্রকাশ ১৩৩২ ভাদ্র)।

২৯। হাফআখড়াই সংগীতসংগ্রামের ইতিহাস

৩০। 'মনোমোহন গীতাবলী / অর্থাৎ বাবু মনোমোহন বসুকৃত হাফআখড়াই, কবি, নাটক / গীতাভিনয় পাঁচালি প্রভৃতি বিবিধ গান / শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত। / মাঘ ১২৯৩ সাল, ইং ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭

৩১। গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্যের 'হাফআখড়াই সংগীতসংগ্রামের ইতিহাস' সম্পর্কে ডঃ ভবতোষ দত্ত 'ঈশ্বর গুপ্তের কবিজীবনী' সম্পাদনাকালে লিখেছেন--'এই ইতিহাস কতদূর নির্ভরযোগ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।'

৩২। 'মনোমোহন বসু'--কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রবাসী (১২শ ভাগ, ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা), বৈশাখ ১৩১৯

৩৩. বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস—প্রাগুক্ত গ্রন্থ

৩৪ 'প্রবাদ আছে জগন্নাথ স্বর্ণকারের পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ চণ্ডীর পালাগায়ক রাঙ্গারাম মালাকার অহংকার করিয়া ঐ কথা বলিয়াছিল। তৎকালে কীর্তনে স্বরূপদাস, ঢপে রূপদাস, রামায়ণ গানে রামচন্দ্র হাজরা এবং চণ্ডীর গানে রাঙ্গারামের তুল্য কেহ ছিল না।" (বিশ্বকোষ)

৩৫, "যথা কলঙ্কভঞ্জনের গীত/মোহনচাঁদের ছুট।--রাগেশ্রী টিমা তেতালা/দেখো কৃষ্ণ যাই জলে তব কষ্টে প্রাণ জ্বলে/লজ্জা যদি পাই হে জলে ঝাঁপ দিব যমুনার জলে।... ইত্যাদি"। মোহনদাস বৈরাগী সম্পর্কে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে বলা হয়েছে "ইহার ছুট-সংগীত বিশেষ প্রসিদ্ধ।'

৩৬। ঢপকীর্তন প্রসঙ্গে বিশ্ববীণা, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

উনবিংশ শতাব্দীর গীতকার ও গীতসংকলন

১

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল পর্যন্ত বাঙলাদেশের ইতিহাসের যুগসন্ধির বিস্তারিত বিবরণ বর্তমানে আমাদের আলোচ্য নয়, কিন্তু এই অন্তর্বর্তী সময় বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ। পলাশির যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ভারতচন্দ্রের জীবনাবসান একদিকে যেমন প্রাচীন কাব্যধারার অবসান ঘোষণা করল তেমনি প্রাচীন শাসনব্যবস্থারও চিরপতন ঘটল। কিন্তু সূর্যাস্ত মানেই চিরতমিস্রা নয়, গোধূলির বর্ণধূসর আকাশে বহুক্ষণ গতাস্ত দিবাকরের আলোকরেশ লেগে থাকে। তাই উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙলা কবিতার ধারা সেই প্রাচীন সুরনির্ভর, গতানুগত পন্থাতেই চলেছিল। উপযুক্ত প্রতিভার অভাবে, যুগোচিত কাব্যবাহন আবিষ্কারের অপেক্ষায় এবং অনিশ্চিত রাজনৈতিক সংকটে, সর্বোপরি নতুন ভূস্বামী-মুৎসুদ্দি-জমিদার-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় সংগীতই হয়ে উঠেছিল এই মধ্যবর্তী সময়ের জপমন্ত্র, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। যে কবিসম্প্রদায়ের ইঙ্গিত করে রবীন্দ্রনাথ 'গোধূলি-আকাশের পতঙ্গ' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, সমগ্রভাবে প্রাগাধুনিক সন্ধিলগ্নের গীতকারদের সম্পর্কেই সে কথা বলা যায়। তবে সাহিত্যের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অপাংক্তেয়ের মূল্যবোধও পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই কারণে কবিগীতের রচয়িতাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অবজ্ঞাসূচক মন্তব্যের বিরুদ্ধে একদা প্রবল প্রতিবাদ উঠেছিল। জনৈক আধুনিক সংগীতবিশেষজ্ঞ গত সার্ধ দুই শতক পূর্বের বাঙলা সংগীতের ইতিহাসকে নতুন দৃষ্টিতে বিচার করার আহ্বান জানিয়েছেন—

"খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতকের সূচনা থেকে ১৯শ শতকের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত বাঙলাদেশে সংগীতের জগতে আর একটি রেনেসাঁস বা নবজাগরণের সূচনা হয়। ভারতচন্দ্র রায়, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু প্রধানত শ্যামাসংগীত, টপখেয়াল ও টপ্পা প্রভৃতি গানের প্রচলন করেন। অযোধ্যানাথ গোস্বামী বা আজু গোঁসাইও রসিকতাস্থলে অনেক গান রচনা করেছিলেন। তখন বাঙলার দুর্গামণ্ডপ ও চণ্ডীমণ্ডপগুলি ছিল সাহিত্য শিল্প কাব্য ও সংগীত আলোচনার কেন্দ্ররূপ।...পরে হরু ঠাকুর, দেওয়ান রঘুনাথ রায়, রাজা রামমোহন, দেওয়ান রামদুলাল, রাম বসু প্রভৃতি এবং পরবর্তীকালে দাশরথি

রায়, রসিকচন্দ্র রায়, মনোমোহন বসু, শ্রীধর কথক, গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি সংগীতরচয়িতা ও গীতশিল্পীদের আবির্ভাবে বাঙলার সংগীতসমাজ বেশ জাগ্রত হয়েছিল"।[১]

ভারতচন্দ্র এবং রামপ্রসাদকে প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের অন্তর্গত ধরে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙলা সংগীতের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। সমকালীন সংগীতজগতের এই নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের ফলে বাঙলাদেশে সংগীত সম্পর্কে গণমানসের সচেতনতা কতদূর বৃদ্ধি পেয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই পর্বে প্রকাশিত একাধিক সংগীতসংকলন গ্রন্থে। উনিশ শতকের শেষভাগে গত শতকের বিপুল সংগীতের দুটি উল্লেখযোগ্য সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল, একটি দুর্গাদাস লাহিড়ীর সম্পাদনায় 'বাঙালির গান' এবং অন্যটি নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ভারতীয় সংগীতমুক্তাবলী'[২]। অবশ্য বঙ্গবাসীপ্রকাশিত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এবং চারুচন্দ্র রায় সম্পাদিত তিন খণ্ড 'সংগীতসারসংগ্রহ' নামক গীতচয়নিকাটির নামও উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া ব্যক্তিগত গীতসংকলনের সংখ্যা প্রায় অগণ্য বলা যায়। অধিকাংশ বৃহৎ সংকলনগ্রন্থে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বিশেষত বৈষ্ণব পদাবলীর গানও প্রসঙ্গত উদ্ধৃত হয়েছে।

'ভারতীয় সংগীতমুক্তাবলী' গ্রন্থের সংকলয়িতা তাঁর গ্রন্থসম্পর্কে ভূমিকায় লিখেছিলেন, "ভারতের সংগীতরত্ন সংগ্রহ করিয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করাই ভারতীয় সংগীতমুক্তাবলী প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য।" এই গ্রন্থপ্রকাশের পর কলকাতার বহু অসাধু গ্রন্থব্যবসায়ী এই সংকলনের উপকরণ আত্মসাৎ করে বহু সংগীতপুস্তক বিনা কৃতজ্ঞতায় প্রকাশ করেছেন বলে সম্পাদক ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। এই পুস্তকের গানগুলি ছিল সুনির্বাচিত ১১টি পর্বে বিভক্ত—১ম অধ্যায় জাতীয় সংগীত, ২য় সামাজিক সংগীত, ৩য় পৌরাণিক, ৪র্থ ঐতিহাসিক, ৫ম ব্রহ্মসংগীত, ৬ষ্ঠ শ্যামাবিষয়ক, ৭ম বাউল, ৮ম হরিনামসংগীত ও সংকীর্তন, ৯ম খ্রীষ্টিয়ান ধর্মসংগীত, ১০ম বিবিধ ধর্মসংগীত, ১১শ বিবিধ সংগীত, প্রসিদ্ধ সংগীতরচয়িতাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ। প্রতি পর্বের গানগুলিও আবার বিষয়-বৈচিত্র্যভেদে নির্দেশিত হয়েছিল। যথা—

জাতীয় সংগীত—উদ্দীপনা ও শোচনাসূচক, বিবিধ, মুদ্রাশাসন আইন, জন্মভূমি, বঙ্গভাষা, দিল্লিদরবার, নব্যবঙ্গের প্রতি, ভিক্টোরিয়ার প্রতি, জাতীয় মহাসমিতি সম্বন্ধে—ইত্যাদি।

সামাজিক সংগীত—নারীজাতির হীনাবস্থা, অবরোধপ্রথা, নরনারীসম্মিলন,

বাল্যবিবাহ, বৈধব্য, কৌলীন্য, বহুবিবাহ, কন্যাপণ, জাতিভেদ, দারিদ্র্য, সুরাপান, দেশাচারবিষয়ক গীত।

পৌরাণিক সংগীত—দক্ষযজ্ঞ, শিবের বিবাহ, আগমনী, শুম্ভনিশুম্ভ যুদ্ধ, ধ্রুব-প্রহ্লাদ চরিত্র, হরিশ্চন্দ্র ও নলোপাখ্যান, সাবিত্রী ও শকুন্তলোপাখ্যান, শ্রীমন্ত-সংবাদ, ব্রজবৃত্তান্ত, গোষ্ঠলীলা, অক্রুরসংবাদ।

ঐতিহাসিক সংগীত—বাল্মীকি ও বুদ্ধদেবের প্রতি, রামের রাজ্যাভিষেক, বনবাস, লঙ্কাসমর, সীতার বনবাস, অভিমন্যুবধ, তরণীসেনবধ, মেঘনাদবধ, সীতাহরণ, নিমাইসন্ন্যাস (চৈতন্যলীলা), দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, সুভদ্রাহরণ, বিজয়-বসন্ত, ভীমসিংহের প্রতি আলাউদ্দিনের উক্তি, সিরাজদৌল্লার উক্তি, লক্ষ্মণসেনের প্রতি পদ্মিনীর উক্তি, রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে, তাজমহলদর্শনে, কানপুর হত্যাকাণ্ড, ১৮৫৭ সালে দিল্লি অধিকার, পাণ্ডবনির্বাসন, প্রতাপসিংহ, বিল্বমঙ্গল ইত্যাদি।

ব্রহ্মসংগীতের বিষয়বিভাগ ব্রহ্মসংগীত পর্যায়ে বিবৃত হয়েছে। শ্যামাসংগীত বিভাগে কোনো বিষয়বৈচিত্র্য নির্দেশিত হয়নি, বাউলেও বিষয়বিভাগ নির্দেশিত হয়নি। হরিনামসংগীত ও সংকীর্তনেও বিষয়বিভাগ নেই। খ্রীষ্টিয়ান ধর্মসংগীতে আছে—খ্রীস্টের জন্ম, মৃত্যু, বিশ্রামবার, পবিত্রতা ইত্যাদি। বিবিধ ধর্মসংগীত পর্যায়েও বিষয়ানুসারিতা রক্ষিত হয়নি। বিবিধ সংগীত পর্যায়ে আছে—কন্যাদায়, বিবাহের পণ, পয়সার মাহাত্ম্য, জুবিলি গীত, বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে ও তাঁহার মৃত্যুবিষয়ে, কৃষ্ণদাস পাল, দ্বারকানাথ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির মৃত্যুবিষয়ে, মহারানী স্বর্ণময়ী, গঙ্গাসাগরে সন্তান ভাসানো, সুরেন্দ্র নাথের কারাবাস, গোলাপফুল, হিমালয়, মধব ও পাহাড়ের প্রতি, অন্নপূর্ণার প্রতি, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, গ্যাসের আলো, কলের জল, ওকালতি, নীলকর অত্যাচার, মাইকেল ও দীনবন্ধুর মৃত্যুবিষয়ে, ডাক্তার হ্যানিম্যান সম্বন্ধে, কেশববাবু, রামকৃষ্ণ পরমহংস, রামপাল সম্বন্ধে, ভিক্টোরিয়ার প্রতি। জাতীয় সংগীত পর্যায়েও আছে। জলযুদ্ধে প্রিন্স নেপোলিয়ানের উক্তি, সম্রাট নেপোলিয়ান সিডান যুদ্ধে, কোকিল, শৈশবকাল, শিশুহাসি, নিদ্রার প্রতি, লাহোর শালিমার উদ্যান, বৃন্দাবন, জয়পুরঘাট, হস্তিনাপুর ইত্যাদি দর্শনে, আর্য-সন্তানগণের প্রতি।[৩]

এই বিপুল গীতসংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত কবিদের তালিকা দিলেই বোঝা যাবে, উনিশ শতকের বাঙলা কাব্যসংগীত বাঙলা গীতিকবিতার ইতিহাসের তুলনায় কত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এই বিষয়গুলির মধ্যে জাতীয় সংগীত এবং ব্রহ্মসংগীতের

গীতকারদের আলোচনা অন্যত্র পৃথকভাবে করা হয়েছে। সংগীতমুক্তাবলীর গীতিকারদের তালিকাও নিতান্ত কম নয়। এই সংকলনের বিবরণঅনুযায়ী সামাজিক সংগীতের গীতকারবৃন্দ হলেন—ডাঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র মিত্র, সুন্দরীমোহন দাস, অমরচন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী, হরনাথ বসু, হরিনাথ মজুমদার, গোবিন্দচন্দ্র দাস, প্যারীমোহন কবিরত্ন, রাজা মহিমারঞ্জন রায় ও হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

পৌরাণিক সংগীতের রচয়িতাদের মধ্যে এঁদের নাম পাই—হরিনাথ মজুমদার, মদন মাস্টার, দাশরথি রায়, রাধানাথ মিত্র, আনন্দচন্দ্র মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মনোমোহন বসু, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, দীনেশচরণ বসু, কেদারনাথ চক্রবর্তী, হরমোহন চট্টোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ গুপ্ত, কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস নাগচৌধুরী, কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি, রাজকৃষ্ণ রায়, দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরী, মধুসূদন, রামচন্দ্র চক্রবর্তী, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, রাধাকৃষ্ণ বৈরাগী, মুচিরাম মৃধা, মধুসূদন কিন্নর, আশুতোষ দেব, রমাপতি রায়, বনোয়ারি নাগ, জগন্নাথপ্রসাদ বসু, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, রাজা মহেন্দ্রলাল খান, প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায় যদুনাথ, শরচ্চন্দ্র সরকার, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, ও মন্নলাল মিশ্র।

ঐতিহাসিক সংগীতের কয়েকজন রচনাকারের নাম—আনন্দচন্দ্র মিত্র, মনোমোহন বসু, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, যদুনাথ দাস, রাজা মহিমারঞ্জন, দাশরথি, রবীন্দ্রনাথ, কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ, দীনেশচরণ বসু, মদন মাস্টার, কালীবাবু, হরিমোহন রায়, চন্দ্রমোহন শাপলা, হরিনাথ মজুমদার, কামিনী রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, ত্রৈলোক্যনাথ, গিরিশচন্দ্র, কালী মির্জা, ভোলানাথ চক্রবর্তী, গোবিন্দচন্দ্র রায়, রমাপতি রায়, রেবতীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, হরিনাথ সেন, মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল রায়, হরিশচন্দ্র তর্কালংকার, মহাতাবচাদ, রাজকৃষ্ণ রায়, কেদারনাথ রায়, শ্রীপতি চক্রবর্তী, কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী, কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, প্যারীমোহন কবিরত্ন, প্রমথনাথ মিত্র, কিশোরী মোহন শর্মা, যোগীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ দে, কুঞ্জবিহারী বসু, অভয়াচরণ ভট্টাচার্য, অঘোরনাথ পাঠক, শরচ্চন্দ্র সরকার, হরিপ্রসাদ দেবশর্মা, কামিনীকুমার দত্ত, মতিলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত শর্মা।

শ্যামাবিষয়ক, বাউল, বৈরাগ্যপন্থী দেহতত্ত্ববিষয়ক গানের কবিসংখ্যা উনিশ শতকে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। খ্রীস্টীয় ধর্মসংগীতের রচয়িতাদের নাম বিশেষ মেলেনি। বিবিধ সংগীতপর্যায়ে এইসব কবির নাম পাওয়া যায়—কৃষ্ণধন

বিদ্যাপতি, অমৃতলাল বসু, ধীরাজ, প্যারীমোহন কবিরত্ন, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীনারায়ণ গুপ্ত, কুঞ্জলাল নাগ, রাধানাথ মিত্র, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ দাস, রাজকুমার চক্রবর্তী, গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র, অক্ষয়কুমার বড়াল, দামোদর মুখোপাধ্যায়, হরিনাথ মজুমদার, অক্রূরচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, দীননাথ ধর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দীনবন্ধু, রাজা মহিমারঞ্জন, দ্বিজেন্দ্রলাল, কুঞ্জবিহারী দেব, ওয়াজিদ আলি সা, অমরচন্দ্র দত্ত, রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ ও যদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

২

প্রাচীন কবিদের গীতসংগ্রহে ঈশ্বর গুপ্তই সর্বপ্রথম জাতীয় অনুরাগ প্রকাশ করে সংবাদপ্রভাকরে লিখেছিলেন—"এতদ্দেশীয় যে সকল প্রাচীন কবিমহাশয়েরা বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাঁহারদিগের প্রণীত পুরাতন কবিতা ও সংগীতসকল এবং সেই পুরুষের জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়া যিনি আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন, আমরা মহোপকার স্বীকারপূর্বক যাবজ্জীবন তাঁহার স্থানে কৃতজ্ঞতাঋণে বদ্ধ রহিব এবং তাঁহাকে দেশহিতৈষী দলের প্রধান শ্রেণীমধ্যে গণ্য করিব। এই মহামঙ্গলময় ব্যাপারে ক্লেশ ও শ্রম স্বীকারজন্য যদিস্যাৎ কেহ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রত্যাশা করেন, আমরা যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব তৎপ্রদানেও বিরত হইব না। জগদীশ্বর অস্মাদিকে ধন দেন নাই, কেবল এক মন দিয়াছেন, সুতরাং ধনের দ্বারা কিছুই করিতে পারি না, শুদ্ধ মনের দ্বারা পণের ব্যাপারে যতদূর পর্যন্ত করিতে পারি তাহাই করিয়া থাকি।...[৪]

উনিশ শতকের শেষদিকে বাঙলাদেশে সংগীতসংকলনের সংখ্যা দেখে মনে হয়, গুপ্ত কবি জীবিত থাকলে গভীর তৃপ্তি ও সন্তোষ লাভ করতেন। অবশ্য তিনি যে অর্থে প্রাচীন গীতসংকলনে যত্নবান ছিলেন, উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ের গীতসংকলনগুলি সেই ধরণের কিছু গবেষণাধর্মী ঐতিহাসিক কীর্তি হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া বাঙলা গানের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাবশত সাহিত্য প্রীতির সঙ্গে ব্যবসায়িক সাফল্যই তাদের প্রকাশের নেপথ্যে সক্রিয় ছিল। তবু সেগুলির সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের একদাপ্রার্থিত নিবেদনের সূক্ষ্ম সংযোগকে অস্বীকার করা যায় না। অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়সংকলিত 'গীতরত্নমালা' এইরূপ একটি দুর্মূল্য সংকলন। ১৩০৩ বঙ্গাব্দের ১ মাঘ তারিখে লিখিত ভূমিকায় সংকলক এই সংগ্রহগ্রন্থের কৈফিয়ৎস্বরূপ জানিয়েছিলেন—

"কলিকাতা ও বটতলা অন্যান্য স্থান হইতে নানাপ্রকার বঙ্গীয় সংগীত-পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু একাধারে বিভিন্নবিষয়ক উক্ত গীতাবলীর পুস্তকের সংখ্যা অতি অল্প। শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবচরণ বসাকদ্বারা প্রকাশিত 'সংগীতসংগ্রহ', বসাক এণ্ড সন-প্রকাশিত 'বিশ্বসংগীত' এবং শ্রীযুক্ত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় দ্বারা সংগৃহীত ঢাকাযন্ত্রে মুদ্রিত 'সংগীতমুক্তাবলী' এই তিনখানি পুস্তক কিয়ৎপরিমাণে সেই অভাব নিরাকরণ করিয়াছে। একাধারে নানাবিষয়ক গীত এই তিনখানি পুস্তকেই আছে। কিন্তু আমি সাধারণের মত যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে ঐ পুস্তকগুলির গ্রন্থনপ্রণালী অনেকের অনুমোদিত নহে, রাগরাগিণীর শৃঙ্খলারক্ষা হয় নাই এবং কোন কোন গীত অযথাস্থানে সন্নিবেশিত অসম্পূর্ণ অথবা বিকৃত হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি এই 'গীতরত্নমালা' প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম।"

পূর্বতন গীতসংকলনগুলিব কোনো না কোনো অসম্পূর্ণতাই পরবর্তী গীতচয়নকদের নূতন কবে কাব্যগীতসংগ্রহের প্রেরণা হয়েছে। কিন্তু এহ ভূমিকা বা কৈফিয়ৎসত্ত্বেও আলোচ্য গীতসংকলনগুলির কোনোটাই সবাংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি, যদিচ আধুনিককালে উক্ত পর্বের ইতিহাসরচনায় সংকলগুলির প্রয়োজনীয়তা অবশ্যস্বীকার্য। 'গীতরত্নমালা'র সংকলয়িতা প্রাচীন লুপ্তপ্রায় বা অবহেলিত সংগীতসংগ্রহের জন্য গুপ্ত কবির মতই আগ্রহ প্রকাশ করে লিখেছেন—

"...বিশেষত দেবদেবীবিষয়ক ভক্তিরসের প্রাচীন গীতগুলি অমূল্য রত্ন-স্বরূপ এবং বঙ্গদেশের গৌরবের বস্তু।...আধুনিক গীত যে সমস্তই মন্দ তাহা আমি বলি না, উহাদের মধ্যে কোনো কোনো গীত উচ্চাসন পাইবার যোগ্য। তবে তাহাতে রামপ্রসাদের ভক্তি, হরু ঠাকুরের কবিত্বশক্তি, রাম বসুর বিরহ-বেদনা, নিধুবাবুর প্রেমিকতা অথবা দাশুরায়ের ভাবুকতা ও অনুপ্রাসেব ছটা দেখা যায় না। পূর্বতন কবিগণের অধিকাংশ গীতে যেরূপ রচনাচাতুর্য, রসমাধুর্য ও ভাবগাম্ভীর্য দেখা যায়, আধুনিক গীতের অধিকাংশে তাহা বিরল।"

অঘোরনাথের কাব্যগীতচয়নিকাটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত, প্রথম খণ্ডে 'পরমার্থ-তত্ত্বপ্রিয়' এবং দ্বিতীয় খণ্ডে 'প্রেমতত্ত্বপ্রিয়াদিগের উপযোগী' গান সংকলিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে দেবদেবীবিষয়ক গীত, রামপ্রসাদী, বাউল, ব্রহ্মসংগীত, প্রাচীন (দাঁড়া) কবির এবং পাঁচালির ঠাকুরানী ও সখীসংবাদবিষয়ক গীত, দাশরথি রায়ের গীতাবলী, কৃষ্ণলীলাবিষয়ক গীত, হিন্দি কলাবতী প্রভৃতি বিবিধবিষয়ক গীতের মোট সংখ্যা ২৪০৫। দ্বিতীয় খণ্ডে বাঙলা টপ্পা, কবি ও পাঁচালির বিরহ,

সখের ও পেশাদারি যাত্রা এবং রহস্যাদি বিবিধবিষয়ক আরও অনেক গান আছে। সংকলয়িতা দাবি করেছেন যে তিনি 'বিষয় ভাব ঘটনা এবং রাগিণী অনুসারে গীতগুলি' সাজিয়েছেন। তাছাড়া মোটামুটি সম্ভাব্য আকর গ্রন্থাদির সংবাদও তিনি দিয়েছেন। দেবতাবিষয়ক গানগুলির মধ্যে গনেশ-শিব-হরি-বিষয়ক গীত, হরিবিষয়ের অন্তর্গত কীর্তন ও বাউল সংগীতের কিছু কিছু তিনি শিবপুর বাউল সম্প্রদায়ের রমানাথ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে পেয়েছেন এবং অন্যান্য গান 'বিশ্বসংগীত' ও 'সংগীতমুক্তাবলী' থেকে গৃহীত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজপ্রকাশিত গ্রন্থাদি থেকেই ব্রাহ্মসংগীতগুলি প্রাপ্ত। দেবীবিষয়ক গানের (সরস্বতী, গঙ্গা, শ্যামা, রামপ্রসাদী, আগমনী, বিজয়া পর্যায়ভুক্ত গানগুলির) এবং রামপ্রসাদীর অধিকাংশ 'প্রসাদপ্রসঙ্গ' থেকে, শ্যামাবিষয়ক কতকগুলি 'সাধকসংগীত' ও 'সংগীতসাগর' থেকে গৃহীত। কৃষ্ণলীলাবিষয়ক গানগুলি নানা স্থান থেকে, প্রাচীন দাড়াকবির গানগুলি ব্যক্তিগত সূত্রে ও কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গুপ্ত রত্নোদ্ধার' থেকে, দাশরথির গীতগুলি গ্রন্থাদি থেকে এবং অন্যান্য গানগুলি নানা সূত্র থেকে সংগৃহীত। 'সংগীতরত্নমালা'র গীতকারদের সুবিস্তৃত নামতালিকা এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

অচ্যুতানন্দ গোঁসাই, অটলবিহারী বাউল, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, অমৃতলাল গুপ্ত, অমৃতলাল ভাদুড়ী, অম্বিকাচরণ গুপ্ত, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, অক্ষয়কুমার সেনগুপ্ত, আনন্দকিশোর, আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র মিত্র, আশুতোষ দেব, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র দাস, ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা, উদ্ধব দাস, উপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, উমানাথ চট্টোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ওয়াজিদ আলি সা, কমলকৃষ্ণ সিংহ (রাজা), কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, কালাচাঁদ দাস, কালিদাস ভট্টাচার্য, কালিদাস সরকার, কালীনাথ রায়, কালীপদ দাস, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, কালী মির্জা, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, কৃষ্ণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, কৃষ্ণচন্দ্র রায় (রাজা), কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য, কৃষ্ণমোহন মজুমদার, কেদারনাথ চক্রবর্তী, কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়, গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহ, গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গদাধর মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র কুণ্ডু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস চক্রবর্তী, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, গোপীমোহন সেন, গোবিনচাঁদ গোস্বামী, গোবিন্দ দাস, গোবিন্দচন্দ্র অধিকারী, গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার, গোবিন্দচন্দ্র রায়, গোঁসাই দাস, সরকার, গোঁসাইলাল, গোঁসাই সদানন্দ, গৌরমোহন রায়, গৌরমোহন সরকার,

চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায় (ন্যায়রত্ন), চুনিলাল মিত্র, জগন্নাথপ্রসাদ বসু, জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, তারকব্রহ্ম ভট্টাচার্য, তারানাথ দাস, তিনকড়ি বিশ্বাস, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, দয়ালচাঁদ মিত্র, দাশরথি রায়, দিগম্বর ভট্টাচার্য, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দিনেশচরণ বসু, দীননাথ চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, দীন বাউল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ধনকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ সরকার, নন্দকুমার রায় (দেওয়ান), নন্দলাল রায়, নন্দকিশোর মোদক, নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী, নবীনচন্দ্র দত্ত, নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নরচন্দ্র রায় (রাজা), নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, নিমাইচরণ মিত্র, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠ অধিকারী, নীলকমল হালদাব, নীলমণি ঘোষ, নীলরতন হালদার, পঞ্চানন গোস্বামী, পরাণচন্দ্র চন্দ্র, পবাণচন্দ্র মিত্র, পার্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পীতাম্বর পাইন, পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র সিংহ, প্রফুল্লচন্দ্র গাংগুলি, প্রমথনাথ গোস্বামী, প্রসন্নকুমার সরকার, প্রাণকৃষ্ণ হালদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্যারীমোহন কবিরত্ন, প্রিয়নাথ বিশ্বাস, প্রিয়নাথ মল্লিক, বাউল ফিকিরচাঁদ, বঙ্কিমচন্দ্র, বরদাচবণ গুপ্ত, ববদারঞ্জন শীল, বলাইচাঁদ গোস্বামী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, বিপ্রদাস তর্কবাগীশ, বিশ্বনাথ দে, বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, বিহারীলাল, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, বেণীমাধব দাস, ব্রজমোহন রায়, ব্রজেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানুসিংহ, ভুবনচন্দ্র বায়, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, মতিলাল রায়, মদন মাস্টাব, মদনমোহন তর্কালংকার, মধুস্থদন কান, মধুস্থদন দত্ত, মনোমোহন বসু, মহিমানাথ হালদার, রাজা মহেন্দ্রলাল খান, মহেশচন্দ্র ঘোষ, মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মোহনচাঁদ দাস, যদুনাথ দাস, যদুনাথ ভট্টাচার্য, যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ দেওয়ান, রবীন্দ্রনাথ, রমানাথ ভট্টাচার্য, রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকচন্দ্র রায়, রাখালদাস চক্রবর্তী, রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, বাজকৃষ্ণ রায়, রাজমোহন আম্বলি, রাজমোহন মদক, রাধানাথ মিত্র, রামকুমাব পত্রনবীশ, রামকৃষ্ণ রায়, রামগোপাল মুখোপাধ্যায়, রামচন্দ্র চক্রবর্তী, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচন্দ্র বসু, রামচন্দ্র ভট্টাচার্য, রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়, রামতারক সেন, রামদুলাল নন্দী, রামনাবায়ণ তর্করত্ন, রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, বামপ্রসাদ, রামমোহন, রামশংকর ভট্টাচার্য, রামসুন্দর রায়, রামসুন্দর সিংহ, রামানন্দ রায়, রুক্মিণীকান্ত ভট্টাচার্য, রূপচাঁদ পক্ষী, লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী, শম্ভুচন্দ্র রায়, শশিশেখর রায়, শ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, (রাজা) শিবচন্দ্র রায়, শিবচন্দ্র সরকার, শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (পরিব্রাজক), শ্রীধর কথক, শ্রীনাথ গোস্বামী, শ্রীশচন্দ্র রায়,

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাতকড়ি রায়, সীতানাথ মুখোপাধ্যায়, স্বরত সেন, হরচন্দ্র, স্বর্ণকুমারী দেবী, হরপ্রসাদ দীর্ঘাঙ্গী, হরিচরণ শর্মা, হরিনাথ মজুমদার, হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ, হলধর চক্রবর্তী ইত্যাদি।

৩

বাঙলা কাব্যসংগীতসংগ্রহে বৈষ্ণবচরণ বসাকের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি 'সংগীতসংগ্রহ' এবং 'বিশ্বসংগীত' নামে দুখানি গীতসংকলন প্রকাশ করেন এবং 'পরমার্থ সংগীত' (১৯২৬) নামে একটি স্বরচিত ভক্তিমূলক গানের গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। 'সংগীতসংগ্রহের' বহু গানই অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'গীতরত্নমালা'য় গ্রহণ করেছেন। বৈষ্ণবচরণ বসাক, স্বামী বিবেকানন্দের সহযোগে 'সংগীতকল্পতরু' (১৮৮৭) সম্পাদনা করেছিলেন। 'বিশ্বসংগীত' (১৩৩৪) অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে প্রকাশিত হলেও এটি মুখ্যত প্রাচীন গীতের সযত্ন সংকলন এবং সংগীতবিষয়ক কোষগ্রন্থের তুল্য[৬]। ভূমিকায় বৈষ্ণবচরণ লিখেছেন—

"অস্মদ্দেশে বর্তমান অবস্থায় সংগীতজগতে দুইটি প্রধান বিভাগ দৃষ্ট হয়। একদিকে সংগীত আয়ত্তকারী ওস্তাদগণ, সাধারণ লোকের সংগীতশিক্ষার স্থবিধা অস্থবিধার প্রতি আদৌ দৃষ্টি না করিয়া, আপনারাই সংগীতের সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হইয়া সংগীতস্থধা পান করিতেছেন। অপরদিকে. স্বরলয়বিবর্জিত কুরুচিপূর্ণ সংগীতানাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, সংগীতশাস্ত্রকে যদৃচ্ছা বিকৃত এবং বিকলাঙ্গ করিয়া, সংগীতকে অশুদ্ধ আমোদরূপে পরিগণিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। ফলতঃ একাল পর্যন্ত সংগীতসম্বন্ধে যে সমুদয় পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, সেগুলিও এই উভয়বিধ দলের উপযোগী। এদিকে যেমন সংগীতবিশারদদিগের গবেষণাপূর্ণ পুস্তকসকল সংগীতের স্থক্ষ্মতত্ত্ব আলোচনায় পরিপূরিত, অপরদিকে সেইরূপ বটতলার সরস্বতীর বরপুত্রগণেব অশুদ্ধ ভ্রমপূর্ণ গ্রন্থগুলি সংগীতশাস্ত্রের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা উৎপাদন কবিতেছে।"

সাধারণ পাঠকের স্থবিধার জন্যই বৈষ্ণবচরণ এই 'বিশ্বসংগীত' প্রকাশ করেছেন। 'বিশ্বসংগীত' নামকরণ সত্ত্বেও কয়েকটি হিন্দি-ব্রজবুলি গান ও ইংরাজি চার্চসংগীত জাতীয় সংগীত ব্যতীত এই সংকলন মুখ্যত উনিশ শতকের বাঙলা কাব্যসংগীতেরই। সম্পাদক লিখেছেন—

"ইহার দ্বিতীয় অংশে ধর্ম সমাজ, প্রেম, রহস্য প্রভৃতি যাবতীয় ভাবের

উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গীতগুলি শ্রেণীবিভাগপূর্বক যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে।' সকল সম্প্রদায়ের ও সকল ধরনেরই বিস্তর গীত যত্নসহকারে সংগৃহীত হইল।"

এই গ্রন্থের গীতসংখ্যা প্রায় সহস্র এবং গীতকারদের নাম কেবল সূচীপত্রে লিখিত। বিষয় ও গীতিকারদের নাম সন্নিবেশিত হল—

জাতীয় সংগীত পর্যায়ে—গোবিন্দচন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথ, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিস্থাভূনী (নীল আন্দোলনবিষয়ে রচিত গান), শিবনাথ শাস্ত্রী, উপেন্দ্রনাথ দাস, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভগবানচন্দ্র দাস, সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও অবিনাশচন্দ্র মিত্র।

ব্রহ্মসংগীত পর্যায়ে—সত্যেন্দ্রনাথ, বিষ্ণুরাম, রবীন্দ্রনাথ, ত্রৈলোক্যনাথ, আনন্দচন্দ্র মিত্র, গুণেন্দ্রনাথ, রামমোহন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, চিরঞ্জীব শর্মা, দ্বিজেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ, শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, দীনেশচরণ বসু, পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন মজুমদার, নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

সংকীর্তন পর্যায়ে—চিরঞ্জীব শর্মা, পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, কুঞ্জবিহারী দেব ও প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার।

শ্যামাসংগীত পর্যায়ে—বিপ্রদাস তর্কবাগীশ, কিশোরীমোহন, নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী, রামপ্রসাদ, সৈয়দ জাফর, আশুতোষ দেব, রসিকচন্দ্র রায়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, জগন্নাথপ্রসাদ বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কালী মির্জা, কমলাকান্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দাশরথি, প্যারীমোহন কবিরত্ন, কালীকণ্ঠ কাব্যতীর্থ, রাজা শ্রীশচন্দ্র রায়, কালিদাস ভট্টাচার্য, নবকিশোর মোদক, কালিদাস সরকার, মহারাজা রামকৃষ্ণ রায়, রূপচাঁদ পক্ষী, রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ, ব্রজমোহন রায়, রাখালদাস চক্রবর্তী, মহারাজা শিবচন্দ্র রায়, রামদুলাল মুন্সি, অচ্যুত গোস্বামী, শিবচন্দ্র সরকার ও তারিণী দেবী।

কৃষ্ণবিষয়ক সংগীত পর্যায়ে—দাশরথি, রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র, দেওয়ান রঘুনাথ রায়, চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়, বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, রাজা পূর্ণচন্দ্র সিংহ, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ গোস্বামী, লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী, কালীকণ্ঠ কাব্যতীর্থ, গোবিন্দ অধিকারী, ফিকিরচাঁদ, জ্ঞানানন্দ, রাখালচন্দ্র দে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দয়ালচাঁদ মিত্র, রামপতি বন্দ্যোপাধ্যায় (রমাপতি?) ও তাঁর স্ত্রী, দীনবন্ধু মিত্র, কেদারনাথ চৌধুরী, বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, কুঞ্জবিহারী বসু, শ্রীধর কথক, রবীন্দ্রনাথ ও রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁন। এই পর্যায়ের অন্তর্গত প্রভাসযজ্ঞ,

কলঙ্কভঞ্জন, কীর্তন, নন্দবিদায়, প্রভাস ও কালীয়দমন শিরোনামায় এঁদের গান সংকলিত হয়েছে—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র, রামপ্রসাদ, কুঞ্জবিহারী সেন, নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী, রাখালদাস চক্রবর্তী, অক্ষয়কুমার গুপ্ত, কেদারনাথ চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ দে, রাজকৃষ্ণ রায়, মধুসূদন কিন্নর, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, কুঞ্জবিহারী দে, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, জ্ঞানচন্দ্র বসাক, রাখালদাস শর্মা, বাসুদেব, মোহনদাস, দীনবন্ধু, রাধাকৃষ্ণ বৈরাগী[৭], কুঞ্জবিহারী দেব প্রভৃতি।

বিবিধ ধর্মসংগীত পর্যায়ে—প্যারীমোহন কবিরত্ন, চন্দ্রকান্ত ন্যায়রত্ন, বিহারীলাল চক্রবর্তী, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, দাশরথি, মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালংকার, রাখালদাস চক্রবর্তী, গিরিশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ রায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, দিগম্বর ভট্টাচার্য, রামপ্রসাদ সেন, আনন্দচন্দ্র দাস। এই অংশে খ্রীষ্টীয় ধর্মসংগীত, আল্লার উপাসনাসংগীত, বামবল্লভীদের গান, ন্যাড়ানেড়ীর গান, কর্তাভজাদের গান প্রভৃতি অজ্ঞাত কবিরচিত একাধিক গীত সংকলিত হয়েছে।

বাউল সংগীত পর্যায়ে—কালীপ্রসন্ন সিংহ, রামগোপাল, শ্রীরূপ গোঁসাই, কাঙাল অটল, ফিকিরচাঁদ, কেশব সাঁই, পঞ্চানন গোস্বামী, যাদু দাস, বিষ্ণুরাম, চন্দ্রকান্ত ন্যায়রত্ন, দীন বাউল, কাঙাল ফকির, মতিলাল রায়, রামগোপাল মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার সেন, হরিনাথ মজুমদার, কালীনারায়ণ গুপ্ত।

পরমার্থ সংগীত পর্যায়ে—অক্ষয়কুমার গুপ্ত, দাশরথি, ফিকিরচাঁদ, প্যারীমোহন কবিরত্ন, দীন বাউল, জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রামপ্রসাদ, মহতাপচাঁদ, মহেন্দ্রলাল খাঁন, দ্বিজ হরি ও হরিনাথ মজুমদার।

দেহতত্ত্ব পর্যায়ে—রামগোপাল মুখোপাধ্যায়, নন্দকুমার কবিরত্ন, বৈষ্ণবচরণ বসাক [গানে কেশবচাঁদ দরবেশ ভণিতা], ফিকিরচাঁদ।

ঠাকরুণবিষয়ক সংগীত পর্যায়ে (দক্ষযজ্ঞ ও ভগবতীর বাল্যলীলা)—মহেশচন্দ্র চক্রবর্তী, গিরিশচন্দ্র, রাধানাথ মিত্র, রামপ্রসাদ, মদন মাস্টার, গৌরমোহন রায়, দাশরথি, নরচন্দ্র শর্মা, ও রাজকৃষ্ণ রায়।

আগমনী-বিজয়া পর্যায়ে—দাশরথি, রাখালদাস চক্রবর্তী, হরিনাথ মজুমদার, কেদারনাথ চক্রবর্তী, মহেন্দ্রলাল খান, হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ গুপ্ত, রাধানাথ মিত্র ও মধুসূদন।

রামলীলা, রাবণবধ, মেঘনাদবধ পর্যায়ে—গিরিশচন্দ্র, দাশরথি, হরিশচন্দ্র তর্কালংকার, মহতাপচাঁদ, রাজকৃষ্ণ রায় ও কেদারনাথ রায়।

পৌরাণিক সংগীত পর্যায়ে (কমলে কামিনী, হরিশ্চন্দ্র, ভীষ্মের শরশয্যা, কাননে দময়ন্তী, সীতার বনবাস, সীতাহরণ, অভিমন্যুবধ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, শিবের স্তোত্র)—রাখালদাস চক্রবর্তী, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, মনোমোহন বসু, রাধানাথ মিত্র, মতিলাল রায়, গিরিশচন্দ্র, শ্রীপতি চক্রবর্তী, প্রমথনাথ মিত্র, দাশরথি ও রূপচাঁদ পক্ষী।

কবিপাঁচালি হাফআখড়াই পর্যায়ে—অধিকাংশ গানই অজ্ঞাত রচয়িতার, কবির নাম এই কটি মাত্র—ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, হরু ঠাকুর, রাম বসু, মনোমোহন বসু, রামসুন্দর রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দাশরথি ও রামচন্দ্র বসু।

প্রেমসংগীত পর্যায়ে—কুঞ্জবিহারী সেন, প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায়, রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, নিধুবাবু, গোপাল উড়ে, বিহারীলাল চক্রবর্তী, বঙ্কিমচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র সেন, ব্রজমোহন রায়, শ্রীধর কথক, রাধামোহন সেন, দ্বারকানাথ রায়, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, প্রমথনাথ মিত্র, হরীন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়, লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী, রাধানাথ মিত্র, বৈষ্ণবচরণ বসাক, মধুসূদন, জীবনকৃষ্ণ সেন, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, মদনমোহন তর্কালংকার, বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, কুঞ্জবিহারী বসু, কালীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, তারাচাঁদবাবু, ভারতচন্দ্র রায়, হরিমোহন রায়, রামনারায়ণ তর্করত্ন, স্বর্ণকুমারী দেবী, রাখালদাস চক্রবর্তী, বিনোদবিহারী দত্ত, মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়, রাধামোহন দাস, শশিশেখর রায়, কৃষ্ণকান্ত পাঠক, গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত, মধুসূদন কিন্নর।

সামাজিক সংগীত পর্যায়ে—রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বিহারীলাল চক্রবর্তী, প্যারীমোহন কবিরত্ন, দাশরথি, আনন্দচন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি, কাঁডাদাস, অমৃতলাল বসু, রামরতন ভট্টাচার্য, সুন্দরীমোহন দাস, কালীপ্রসন্ন সিংহ, কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী, জ্ঞানচন্দ্র বসাক, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, দুর্মুখ নন্দী, মনোমোহন বসু ও বৈষ্ণবচরণ বসাক। এই পর্যায়ে গানগুলির বিষয়গত শ্রেণীও আছে; যেমন—কৌলীন্য প্রথা, সামাজিক কপটতা, বাল্য-বিবাহ, বাবুগিরি, ভণ্ডামি, কন্যাদায়, ঘোর কলি, বিবাহের পণ, বহুবিবাহ, কলকাতা-মহিমা, কপট বক্তৃতা, উচ্চশিক্ষা, সুরাপান, ওকালতি, বৈধব্য, লাম্পট্য, কেরানি কলঙ্ক, মিউনিসিপাল কমিশনার ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক সংগীত পর্যায়ে সিরাজদৌল্লার উক্তি, চৈতন্যলীলা, তাজমহল, লক্ষ্মণসেনের প্রতি পণ্ডিতগণ, পঞ্জাবের সৈন্যদের যুদ্ধসংগীত, কানপুরের হত্যাকাণ্ড, পৃথ্বীরাজের প্রতি সংযুক্তা, দিল্লির দরবাব প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে। গীতিকারদের নাম—বাজা মহিমারঞ্জন রায়, চাঁদগোপাল গোস্বামী গিরিশচন্দ্র, গোবিন্দ গোঁসাই. গোবিন্দচন্দ্র বায়. জ্যোতিবিন্দ্রনাথ[৮], স্বরূপচাঁদ গোঁসাই ও কালীচরণ ঘোষ।

ব্যক্তিবিষয়ক সংগীত পর্যায়ে বিদ্যাসাগর. কালীপ্রসন্ন সিংহ, দ্বাবকানাথ মিত্র, রামমোহন. স্বর্ণময়ী. দীনবন্ধু. কেশবচন্দ্র সেন, মধুসূদন, রিপন, রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে স্মৃতিসংগীত আছে। তাছাড়া একটি ভিক্টোরিয়াপ্রশস্তি এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযেব বিলাত থেকে প্রত্যাগমন উপলক্ষে ও 'এলোকেশীর স্বামী নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর দ্বীপান্তর গমনকালে' দুটি গান আছে। এগুলিব রচয়িতাদেব মধ্যে আছেন—প্যারীমোহন কবিবত্ন, সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু, দীননাথ অধ্যেতা, গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়. রাধামোহন দাস. হেমচন্দ্র, গিবিশচন্দ্র ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুব।

ঘটনা পর্ব ও উৎসবসংগীত পর্যায়ে কয়েকটি গান আছে। এগুলির বিষয় পৌষপার্বণ, কলকাতাব কলের জল ও গ্যাসের আলো, কোনো অসতীর স্বামী-সম্পত্তিলাভ, নীলকবদের অত্যাচার, গঙ্গার পোল, জুবিলি. টেলিগ্রাফ. রেলওয়ে, মুদ্রযন্ত্রশাসন আইন ইত্যাদি। এই বিভাগে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্যারী-মোহন কবিরত্ন, আনন্দচন্দ্র দাস, বিদ্যাভূনী. তিনকড়ি স্মৃতিরত্ন, রাধানাথ মিত্র. শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের গান সংকলিত হয়েছে।

'বিশ্বসংগীত' সংকলনখানিকে কোনোমতেই আদর্শ সংকলন বলা যায় না। এই গ্রন্থে বহু গান 'অজ্ঞাত' কবিরচিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে. অথচ পূর্বতন একাধিক গীতসংকলনে সেগুলির রচয়িতার নাম পাওয়া যায়। বিষয়বিভাগও ত্রুটিপূর্ণ এবং অবহেলাকৃত, কারণ একাধিক বিষয়ের গীত একই শ্রেণীতে স্থানান্তরিত করা যেত। দ্বিজেন্দ্রলালের দুএকটি মাত্র হাসিব গান এতে স্থান পেয়েছে এবং বহু উল্লেখযোগ্য গীতিকারেব গান বর্জিত হয়েছে। যে 'সংগীত-কল্পতরু' নামক পূর্বতন সংকলনকে ভিত্তি করে 'বিশ্বসংগীত' প্রস্তুত হয়েছে তার তুলনায় এ'টি অপকৃষ্ট সংকলন, তাতে সন্দেহ নেই। 'সংগীতকল্পতরু 'সংকলনটির আলোচনা পরে করা হবে।

৪

১৮৮১ খ্রীঃ ৩১ ডিসেম্বর তারিখসম্বলিত একটি গীতসংকলন 'সংগীত-সহস্রে'র[৯], উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'কয়েকজন গ্রন্থকারেব সম্মিলনে' স্থাপিত এই প্রকাশনসংস্থার সঙ্গে কারা যুক্ত ছিলেন জানা যায় না, কিন্তু 'সংগীত-সহস্র' নিঃসন্দেহে সেকালের বাঙলাগানের একটি পরিচ্ছন্ন ও সুনির্বাচিত সংকলন। ভূমিকাস্বরূপ এখানে বাঙলা কাব্যসংগীত সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান উক্তি আছে। গ্রন্থকারসমিতি বলেছেন—

"কবিতাই সাহিত্যের বত্নখনি, এক একটি কবিতা এক একখানি অত্যুজ্জ্বল হীরকখণ্ড। সেই কবিতা যখন স্বরলয়সংযোগে গানরূপে প্রকাশিত হয়, তখন তাহাব সমতুল দ্রব্য আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। বাঙলা সাহিত্যের কবিত্বই শ্রেষ্ঠ, বাঙলাগান আবার তাহাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। বাঙলাগানেব ন্যায় এমন মধুর ভাবময়, সুললিত গান আব কোনো ভাষায় নাই। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় যে, এমনকি আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যেও বঙ্গীয় কবিগণ গানরচনাতেই উৎকৃষ্টতা লাভ করিয়াছেন। বঙ্কিম, রবি, মনোমোহন, গিরিশ প্রভৃতি সকলেরই অন্যান্য রচনাপেক্ষা গানই শ্রেষ্ঠ।

এমন সুন্দর যে গান তাহারও দেশে আদব নাই। বাঙলার শত শত সুন্দব গান দিনদিন বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, সেই সকল অতুলনীয় গানের একটি লোপ হইলে একটি বত্ন বিলুপ্ত হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ পর্যন্ত কেহ যত্ন কবিয়া বাঙলার সমস্ত সুন্দর গান একত্রিত করিয়া তাহাদিগকে চিরস্থায়ী করিবার প্রয়াস পান নাই। যে দুইএকখানি সংগীতপুস্তক দেখা যায়, তাহার একখানিও সর্বাঙ্গসুন্দর নহে। তাই আমরা বিশেষ যত্ন ও পবিশ্রম কবিয়া এই সংগীত-সহস্র প্রকাশ কবিয়াছি। বাঙলাব প্রাচীন ও আধুনিক শ্রেষ্ঠ গীত সমস্ত আমরা ইহাতে সন্নিবেশিত করিবাব চেষ্টা পাইয়াছি। প্রাচীন গানগুলি সংগ্রহ করিবাব জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছি

বাঙলার প্রধান গীতরচয়িতাগণকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়, এক কবি, অপর সাধক। কবিগণ প্রধানত প্রেমের গান বা শ্রীমতী রাধার প্রেমের গান রচনা করিয়াছেন। সাধকগণ প্রধানত শ্যামাসংগীতই রচিয়াছেন। আমাদের এই পুস্তকে কাজে কাজেই প্রেমের গান ও শ্যামাসংগীত অধিক দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু এ সম্বন্ধেও দুইএকটি কথা বলা আবশ্যক,— আজকাল দেশে রুচিব বড়ই প্রাদুর্ভাব, এমন অনেকে আছেন যাঁহারা প্রেমের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করিতে অনিচ্ছুক। অনেকে আবার রাধার প্রেমের কথা মুখে

জানেন না। বাঙলায় সর্বোৎকৃষ্ট কবিত্বই প্রেমের গানে সমৃদ্ধ, এমন প্রেমকে পরিত্যাগ করিলে বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অলংকার সকল নষ্ট করা হয়, আর শ্রীমতী রাধার প্রেম,—যে প্রেমের জন্য চৈতন্যের ন্যায় মহাপণ্ডিত ও মহাজ্ঞানী উন্মত্ত হইয়াছিলেন, যে প্রেমে এখনও ভারতবর্ষের অর্ধেক লোক পাগল, তাহা বাদ দিলে ভারতবর্ষের রহিল কী? তবে যে সকল গানে কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা হইবার সম্ভাবনা, আমরা বিশেষ যত্ন ও সতর্কতার সহিত সে সকল গান পরিত্যাগ করিয়াছি। অনেকে আবার শ্যামাসংগীতগুলিকে সাকার উপাসনার গান বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখেন, এই সকল গান সাকার কি নিরাকার উপাসনার গান, তাহা অনুগ্রহ করিয়া তাঁহারা একবার এইগুলি পাঠ করিয়া দেখুন। এরূপ ঈশ্বরপ্রেমের গান, ভক্ত হৃদয়ের এরূপ ভাবব্যঞ্জক গান আর কোন ভাষায় নাই।"

'সংগীত-সহস্রে'র সংকলনের প্রধান ত্রুটি অসম্পূর্ণ নির্ঘণ্ট—সমস্ত গানের গীতিকারদের নাম এতে সংগৃহীত হয়নি। তবে এর সূচীপত্রটি বিষয়বিভাগের বৈচিত্র্যের নির্দেশ দেয়। যেমন সাধারণ প্রেম, কৃষ্ণপ্রেম, শ্যামাপ্রেম, ও ঈশ্বরপ্রেম এই চারভাগে প্রধানত গ্রন্থটি বিভক্ত, নানাবিধ পর্যায়ে আরও কিছু গান আছে। সাধারণ প্রেমের উপবিভাগ—বসন্ত, আবেগ, বিরহ ও সম্ভাষণ। কৃষ্ণপ্রেম গানগুলি বৃন্দাবন, সখীগণ, শ্রীমতী রাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই চতুষ্পর্যায়ে শ্রেণীবিভক্ত। শ্যামাপ্রেমের কৈলাস, শ্যামা ও ব্রহ্ম এই তিন বিভাগে অনেকে আপত্তি করতে পারেন। ঈশ্বরপ্রেমকে 'জ্ঞানের গান', 'প্রাণের গান', 'ভাবের গান' ও 'সংকীর্তন' এইভাগে পৃথকীকৃত করা হয়েছে। 'নানাবিধ' বিভাগে পৌরাণিক, সামাজিক, জাতীয়, রহস্য, নানা ভাষায়, সর্বশ্রেণীর লুপ্ত সংগীত ও পরে প্রাপ্ত—এইভাবে গানগুলি সন্নিবেশিত।

'বাঙালির গান' নামক গত শতকের একটি বহুমূল্য ও গুরুত্বপূর্ণ কাব্যসংগীত সংগ্রহের কথা ইতিপূর্বে একাধিকবার আলোচিত হয়েছে। ১৩১২ সালে প্রকাশিত বঙ্গবাসী পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং 'অনুসন্ধান' পত্রিকার সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ীসম্পাদিত 'বাঙালির গান' উনিশ-বিশ শতকের সংগীত-সংকলনগুলির মধ্যে নানাকারণে শ্রেষ্ঠ[২০]। এই গ্রন্থের ভূমিকায় ভারতীয় সংগীতশাস্ত্র ও বাঙলা সংগীতের ঐতিহাসিক বিবর্তনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। সম্পাদক বহু যত্ন শ্রম ও অধ্যবসায়ে প্রাচীন গীতকারদের জীবনী ও গীত সংগ্রহ করে লিখেছেন—

"বঙ্গসাহিত্যের সুরম্য উদ্যানে অসংখ্য সংগীতকুসুম প্রস্ফুটিত আছে।

বেলা মল্লিকা যুঁই জাতি যুথী গোলাপ গন্ধরাজ—সৌরভে সে উদ্যান আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে; অন্যত্র পলাশ কিংশুক অপরাজিতা জবা স্থলপদ্ম প্রভৃতি,—উদ্যান আলো করিয়া রহিয়াছে, আবার উদ্যানবৃতিপার্শ্বে, ঘেঁটু আকন্দ চিতা কালিকা প্রভৃতিরও অভাব নাই। বাঙালির গান মাল্যরচনাব্যপদেশে এই উদ্যানে প্রবেশ করিয়া আমরা বহু পুষ্পচয়ন করিয়াছি। আমাদের অসংযত নির্বাচনদোষে যদি গোলাপের পার্শ্বে ঘেঁটু গ্রন্থন করিয়া থাকি, সে ত্রুটি সহৃদয়গণ মার্জনা করিবেন।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্যসংগীত এবং গীতিসাহিত্য আলোচনায় এই গ্রন্থটি অপরিহার্য মনে হবে। এই সংকলনে গীতকারসংখ্যা দুইশতের মত এবং সংকলিত গীতসংখ্যা পাঁচ হাজারেরও অধিক। কবিদের নামতালিকা নিম্নরূপ—

অক্ষয়চন্দ্র সরকার, অক্ষয়কুমার বড়াল, অম্বিকাচরণ গুপ্ত, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, অমৃতলাল গুপ্ত, অমৃতলাল বসু, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, আজু গোস্বামী, আনটনী সাহেব, আনন্দময় মৈত্র, আনন্দচন্দ্র মিত্র, আনন্দচন্দ্র শিরোমণি, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ওয়াজিদ আলি, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, কাঙাল ফিকিরচাঁদ (হরিনাথ), কালীনারায়ণ গুপ্ত, কালীনাথ রায়চৌধুরী, কালীপ্রসন্ন ভাদুড়ী, কালী মির্জা, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, কুঞ্জবিহারী দেব, কুমার শম্ভুচন্দ্র, কুমার নরচন্দ্র, কুমুদকান্ত বসু, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, কৃষ্ণকান্ত পাঠক, কৃষ্ণগোপাল চক্রবর্তী, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (কৃষ্ণানন্দ স্বামী), কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য, কৃষ্ণেন্দ্র রায়, কৃষ্ণনাথ রায়চৌধুরী, কৃষ্ণমোহন মজুমদার, কেষ্টা মুচি, কেশব সাঁই, কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, গদাধর মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাচরণ সরকার, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, গোঁজলা গুঁই, গোবিন্দ অধিকারী, গোপাল উড়ে, গোবিন্দমোহন বিদ্যাবিনোদবারিধি, চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র রায়, জগন্নাথপ্রসাদ বসুমল্লিক, জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়কুমার বর্ধনরায়, জগদ্বন্ধু ভদ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ঠাকুরদাস দত্ত, ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, তারাকান্ত কাব্যতীর্থ, তারাকুমার কবিরত্ন, ত্রৈলোক্যনাথ শর্মা (চিরঞ্জীব শর্মা), দয়ালচাঁদ মিত্র, দাশরথি রায়, দামোদর মুখোপাধ্যায়, দিগম্বর ভট্টাচার্য, দীননাথ ধর, দীন বাউল, দীনবন্ধু মিত্র, দীনেশচরণ বসু, দুর্গাদাস লাহিড়ী, দুর্গাদাস দে, দেওয়ান মহাশয়, দেওয়ান ব্রজকিশোর, দেওয়ান নন্দকুমার, দেওয়ান রামদুলাল, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, দ্বিজপদ

বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ধর্মানন্দ মহাভারতী, ধীরাজ, নবীনচন্দ্র সেন, নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী, নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নিত্যানন্দ বৈরাগী, নিখিলনাথ রায়, নিকুঞ্জমোহন লাহিড়ী, নিধুবাবু, নিমাইচরণ মিত্র, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, নীলু ঠাকুর, নীলমণি পাটনি, নৃসিংহদাস ভট্টাচার্য, পঞ্চানন তর্করত্ন, পাগলা কানাই, পীতাম্বর পাইন, পুলিনবিহারী লাল, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, প্যারীমোহন কবিরত্ন, প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলি, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, প্রমথনাথ সান্যাল, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বদন অধিকারী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, বিহারীলাল চক্রবর্তী, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, বিহারীলাল সরকার, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, বৈকুণ্ঠনাথ বসু, ব্রজমোহন রায়, ভবানী বেনে, ভারতচন্দ্র, ভোলা ময়রা, মতিলাল রায়, মদনমোহন তর্কালংকার, মধুকান, মনোমোহন বসু, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, মহারাজ নন্দকুমার, মহারাজ মহাতাপচন্দ্র, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন, মহারাজ রামকৃষ্ণ, মহারাজ শিবচন্দ্র, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ, মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, মুকুন্দদাস, মুন্সী বেলায়েত হোসেন, মৃত্যুঞ্জয় বসু, যজ্ঞেশ্বরী, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ ঘোষ, যদুনাথ চক্রবর্তী, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ দে, রজনীকান্ত সেন, রবীন্দ্রনাথ, রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপতি রায়, রসিকলাল চক্রবর্তী, রসিকচন্দ্র রায়, রাজকৃষ্ণ রায়, রাজমোহন আর্য্যাল, রাজা মহিমারঞ্জন রায়, রাজা রামমোহন রায়, রাজা মহেন্দ্রলাল খান, রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়, রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাধানাথ মিত্র, রাধারমণ কাব্যতীর্থ, রাধামোহন সেন, রামচন্দ্র রায়, রামজয় বাগচি, রামদাস সেন, রামনারায়ণ তর্করত্ন, রামপ্রসাদ, রামবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, রামরতন মুখোপাধ্যায়, রামলাল দাসদত্ত, রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, রাসু ও নৃসিংহ, রাম বসু, রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়, রূপচাঁদ পক্ষী, রোহিণীকুমার বিদ্যাভূষণ, লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী, ললিতমোহন সিংহ রায়, লালন সাঁই, লাল নন্দলাল, লোকা ধোপা, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, শিশিরকুমার ঘোষ, শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী, শিবনাথ শাস্ত্রী, শিবচন্দ্র সরকার, শ্রীধর কথক, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, সাতু রায় হরিশ্চন্দ্র মিত্র, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন রায়, হরু ঠাকুর, ও হারাণচন্দ্র রক্ষিত।

এই দীর্ঘ তালিকা আজ কেবল ইতিহাসের তথ্যমাত্র। এঁদের অনেকের নামই আজ বিস্মৃতির অতলগর্ভে শান্ত সমাহিত, অনেকের রচনাই সংকলনের

স্থিরপৃষ্ঠায় নির্বাক বন্দীদশা যাপন করছে। কিন্তু তাঁদের যে গানগুলি সমকালে জনপ্রিয় ছিল, দৈনন্দিন আনন্দবেদনার সঙ্গী ছিল, বহুশত মানুষের নির্জন স্মৃতির অনুষঙ্গ ছিল, সেগুলিকে আমরা আজ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারি না।

৫

বঙ্গবাসীপ্রকাশিত 'সংগীতসারসংগ্রহ' তিন খণ্ড (১৩০৬—১৩০৮) অবশ্য 'বাঙালির গানে'র পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল এবং 'বাঙালির গান' সংকলন প্রচলিত হওয়ার পরে এই সংকলনগুলির প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষ হয়ে আসে বলা যেতে পারে। চারুচন্দ্র রায়সম্পাদিত 'সংগীতসারসংগ্রহে'র তৃতীয় খণ্ডে (১৯০১) বৈষ্ণব কবিবৃন্দ ব্যতীত উনিশ শতকীয় গীতিকারদের নাম ও পদ সংকলিত হয়েছে, সেগুলি প্রায় সবই পূর্বালোচিত সংকলন গ্রন্থাদিতে আছে। এছাড়া নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়সম্পাদিত 'সংগীতসংগ্রহ' (১৮৮২) অবিনাশচন্দ্র ঘোষসম্পাদিত 'প্রীতিগীতি' (১৮৯৮), বিশেষভাবে ধর্ম ও ভক্তিমূলক এবং প্রেমের গানের দুই বৃহৎ সংকলন। প্রসন্নকুমার সেনসংকলিত ভক্তিমূলক গানের বৃহৎ সংকলন 'বিবিধ ধর্মসংগীত' (১৯০৭) ও ব্রাহ্মসমাজকর্তৃক বহু ব্রহ্মগীত-সংকলনকেও গীতসংকলনের ইতিহাসে বিশেষ স্থান দেওয়া যেতে পারে। স্বদেশী গানের সংকলনগুলিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিষয়গত এই গীত-সংকলনগুলির কথা কাব্যসংগীতের বিষয়বিচারকালে আলোচিত হবে।

বাঙলা সংগীতসংকলন গ্রন্থাদির ইতিহাসরচনার সম্ভাব্য উপকরণগুলি ক্রমশ অবলুপ্ত এবং অব্যবহার ও অমনোযোগিতাবশত জীর্ণ হয়ে পড়ছে। বাঙলা কাব্যসংগীতের উল্লেখযোগ্য যতগুলি সংকলন ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাওয়া যায় সেগুলির পুনর্মুদ্রণ ও বিস্তারিত আলোচনা গবেষণা না হলে অচিরেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাবে। আমাদের আলোচনায় কয়েকখানি সংকলনের গুরুত্ব বিচার করে তার সূচীপত্র ও কবিদের নামতালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে মাত্র। বিভিন্ন কাব্য-সংকলনে সমকালীন আরো বহু ক্ষুদ্র-বৃহৎ সংকলনের নাম পাওয়া গেছে, কিন্তু সেই গ্রন্থগুলির উপযুক্ত সন্ধান মেলেনি, অথবা যথেষ্ট অনুসন্ধান করা হয়নি। এই প্রসঙ্গে প্রাচীনতম একটি কাব্যসংকলন হিসাবে কৃষ্ণানন্দ ব্যাসের 'সংগীতরাগকল্পদ্রুম' গ্রন্থখানির উল্লেখ করা যায়।[১১] কৃষ্ণানন্দ ব্যাসের জন্ম খ্রীঃ ১৭৯৪।৯৫ এবং আনুমানিক খ্রীস্টাব্দে ১৮৪২ রাগকল্পদ্রুমের সূচনা হয়। গ্রন্থে প্রাপ্ত তারিখ অনুযায়ী জানা যায়, 'বাঙলা ভাষায় রঙিন গান' পর্যায়ের সংকলিত অংশ সমাপ্ত হয়েছিল 'সন ১২৫২ সাল সংবত ১৯০২ শুক্ল চতুর্দশী

তারিখ ২৯ মাঘ'। তিনি বত্রিশ বৎসব কাল উত্তর ও দক্ষিণ ভারত পর্যটন করে ভারতীয় সংগীতের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এবং সর্বভারতীয় ভাষার গান সংগ্রহ করেছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রপ্রদত্ত একটি তথ্যে জানা যায় যে, রাগসাগরের ইচ্ছা ছিল তিনি রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুমের মত সাত খণ্ডে এই রাগকল্পদ্রুম প্রকাশ কববেন, শেষ পর্যন্ত চার খণ্ডের বেশি পারেননি। নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন—

"ভারতীয় সংগীতসাহিত্যে এই রাগকল্পদ্রুমের মত বৃহৎ গ্রন্থ আর আছে কি না। জানি না, শুনিও নাই। রাগসাগরের সময় ভারতের সকল ধনী গৃহস্থের গৃহে যথেষ্ট সংগীতের চর্চা প্রচলিত ছিল, বিশেষত এই কলিকাতায় এমন বডলোকের বাটি ছিল না, যেখানে উপযুক্ত সংগীতচর্চা না হইত, সংগীতচর্চাব সঙ্গে অনেক বডলোক নানা বিষয়ে অনেক গান বচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ এক্ষণে বিলুপ্ত হইলেও রাগসাগরের কৃপায় তাঁহাব বাগকল্পদ্রুমেব বঙ্গাংশে কয়েকজনের মাত্র সন্ধান পাইতেছি। অনেকেই মহাত্মা বামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেব ব্রহ্মসংগীত শুনিয়া থাকিবেন, নিধুবাবুর প্রেমবিষয়ক গীতও অনেকে শুনিয়াছেন, এই রাগকল্পদ্রুমে উক্ত মহাত্মাগণেব বচিত বহু অপ্রকাশিত গান ত আছেই, তদ্ব্যতীত এখন অপ্রচলিত হইলেও এই গ্রন্থে কলিকাতার তৎকালেব প্রসিদ্ধ ধনকুবের আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু), মহারাজ নবকৃষ্ণের পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণ দেব, ৺গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺আনন্দনারায়ণ ঘোষ, ৺কালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়, ৺শিবচন্দ্র সবকার প্রভৃতিব বচিত বহু গান পাইতেছি।"

সুতরাং রাগকল্পদ্রুমকে বাঙলা কাব্যসংগীতের প্রাচীনতম সংকলনের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। এই গ্রন্থে 'নির্গুণ গান' শিরোনামায় দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ, রামমোহন ও যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কয়েকজনের কিছু ভক্তিধর্মাত্মক কিন্তু মুখ্যত কাব্যগুণহীন ব্রহ্মগীত সংকলিত হয়েছে। তাছাড়া আছে রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের নগবকীর্তন ও কৃষ্ণভক্তিব গান, আনন্দনারায়ণ ঘোষের অনুরূপ কৃষ্ণ ও শ্যামাবিষয়ক গান। এইগুলি বিশেষত্ববর্জিত। আনন্দনারায়ণ ঘোষের গান পরবর্তী কোনো গীতসংকলনে নেই, যদিও পরবর্তীকালের বহু গতানুগতিক গীতের তুলনায় তাঁর কাব্যগীতগুলি অপেক্ষাকৃত সুরচিত। যেমন—

আইল সাধের উমা আমার সদনে
যে আছে মনের সাধ পুরাব এক্ষণে।

হেরি তনয়ার মুখ দূরে গেল সব দুখ
আনন্দের নাই সীমা গৌরী শুভদরশনে ॥
স্নেহেতে ধরিয়া কোলে ভাসিল নয়নজলে
বলে রানী জননী ভুলে ছিলে কেমনে।
এতদিনে আমি ধন্যা পাইলাম উমা কন্যা
আর না পাঠাব কভু তব নিকেতনে ॥
ভাগ্য কি কহিব আর ভগবতী গৃহে যার
হবে কি তারে আর আসিতে ত্রিভুবনে।
অতএব হয় বোধ এবার বুঝি জন্মশোধ
জগদম্বা অম্বা বলে ডাকে বিধু বদনে ॥
মহামায়ার আগমনে ত্রিলোক পুলক মনে
মহামায়ায় মুগ্ধ রানী মোহ যায় ক্ষণে ক্ষণে
আনন্দ-বিনয়বাণী শুন গো মেনকারানী
বরণ করিয়া লও অভয়া-ভবনে ॥

আশুতোষ দেবের আগমনী গানগুলি এবং অন্যান্য ভক্তিগীতিগুলিও সুরচিত পরিচ্ছন্ন। তাঁর প্রেমের গান 'প্রীতিগীতি'তে অনেকগুলিই সংকলিত হয়েছে। আশুতোষের প্রণয়সংগীতগুলি রামনিধির গানগুলির মত কবিত্বপূর্ণ। শিবচন্দ্র দাসসরকারের গানের বিষয় কখনো শ্যামা, কখনো শ্রীকৃষ্ণের মীনরূপদর্শন, হোলি, কৃষ্ণের নৃসিংহরূপ দর্শন, আগমনী, দশমহাবিদ্যারূপ বর্ণনা। এগুলিও সুলিখিত। কালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের গান 'বাঙালির গানে' অনুপস্থিত, শিবচন্দ্র রায়ও পরবর্তী সংকলনে দুষ্প্রাপ্য নাম। কালিদাসের শ্যামাবিষয়ক গানগুলির পদে ভণিতা আছে। সেগুলি ছাড়া নানা তত্ত্বমুখী গান, গঙ্গাস্তব, বিজয়া ও প্রেমসংগীত তাঁর নামে পাওয়া যায়। দুই একটি গানে মৃত্যুচেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। শিবচন্দ্র রায়ের গান ভক্তিবিষয়ক।

সংগীতরাগকল্পদ্রুমে কেবল এঁদের গানই সংকলিত হয়নি, তৎকালীন একাধিক বাঙলা সংগীতসংকলনেরও নাম পাওয়া যায় যেগুলি আজ সম্পূর্ণ লুপ্তস্মৃতি মাত্র। যেমন, কৃষ্ণগীতাবলী—অজ্ঞাত রচিত, আনন্দনারায়ণ ঘোষরচিত গীতাবলী, আশুতোষ দেবের গীতাবলী, কালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের গীতাবলী, কালিদাস মিরজার গীতাবলী, রামনিধি গুপ্তের গীতাবলী [গীতরত্ন ?], শিবচন্দ্র সরকারের গীতাবলী, রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের নগরকীর্তন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রহ্মসংগীত, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রহ্মসংগীত ইত্যাদি। অবশ্য এগুলির

সবই সংগীতগ্রন্থ কিনা সন্দেহের অবকাশ আছে। দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রহ্মসংগীতের' উল্লেখ ইতিপূর্বে কোথায় মেলেনি, যদিও দেবেন্দ্রনাথরচিত বিচ্ছিন্ন ব্রহ্মসংগীতগুলি পরবর্তী ব্রহ্মসংগীতসংকলনে অথবা কাব্যসংগীতসংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পূর্বে যে 'সংগীতকল্পতরু' সংকলনের উল্লেখ করা হয়েছে[১২] সেটি সংকলন করেছিলেন বৈষ্ণবচরণ বসাক ও নরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি. এ. [পরে স্বামী বিবেকানন্দ নামে বিখ্যাত]। এটি ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানির সংগীত-সংগ্রহ ও সংগীতশাস্ত্রবিষয়ক তথ্যপূর্ণ উপক্রমণিকা অংশই, ঈষৎ পরিবর্তিত করে পরবর্তীকালে বৈষ্ণবচরণ বসাক তাঁর 'বিশ্বসংগীত' সংকলনে গ্রহণ করেছিলেন। ভূমিকায় বৈষ্ণবচরণ লিখেছেন—

'সংগীতশাস্ত্র' সম্বন্ধে যদিও ভূরী ভূরী পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু নানারূপ বাদ্যশিক্ষা, সংগীতশিক্ষা, আলাপ ও বিবিধ সংগীতসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়সহ একাধারে নানাদেশীয় প্রাচীন এবং আধুনিক কবিগণের গাথা⋯ সমাবেশিত এরূপ সর্বসাধারণের মনোরঞ্জনকারী [পুস্তক] অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংগীতকল্পতরু আজ সেই অভাব পূরণের জন্য জনসমাজে প্রকাশিত হইল।

প্রায় এক বৎসর অতীত হইল ইহার সংকলনকার্য আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এ মহাশয় প্রথমতঃ ইহার অধিকাংশ সংগ্রহ করেন, কিন্তু পরিশেষে তিনি নানা অনিবার্য কারণে অবসর না পাওয়ায় ইহা শেষ করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য আমিই ইহার অবশিষ্টাংশ পূরণ করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করিলাম। কিন্তু কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না।" (ভূমিকার তারিখ ভাদ্র ১২৯৪ সাল কলিকাতা)।

কেউ কেউ মনে করেন যে, সংগীতকল্পতরুর সংগীতশাস্ত্রবিষয়ক ভূমিকা এবং সংকলিত সংগীতগুলির চয়ন তেইশ বৎসরবয়স্ক সেদিনের তরুণ বিবেকানন্দের, যিনি তখনি কলকাতার যুবসমাজে গীতবাদ্যবিদ্ এবং সুগায়করূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে বৈষ্ণবচরণ বিবেকানন্দের কৃতিত্বকে আত্মসাৎ করে নেন। এই গীতিসংকলনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত, ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে বাঙলা সংগীতসংকলনের যথেষ্ট ঐতিহ্য ছিল না। দ্বিতীয়ত, এই গ্রন্থের বহু গান সংকলয়িতা স্বয়ং গীতকার বা গীতস্রষ্টাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন—গ্রন্থ থেকে নয়। তৃতীয়ত গিরিশচন্দ্রের দুএকটি নাট্যসংগীত, যদুভট্ট-রচিত দুএকটি ব্রহ্মসংগীত ও কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত বিবেকানন্দের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেই গানগুলিও সংকলয়িতা এখানে যথাযথ

সংকলন করেছেন। চতুর্থত, রাধামোহন সেনের সংগীতশাস্ত্রবিষয়ক আলোচনা 'সংগীততরঙ্গ' (১৮১৮), কৃষ্ণানন্দ ব্যাসের 'সংগীত-রাগকল্পদ্রুম' (১৮৪৬), ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর 'সংগীতসার' (১৮৬৯), ও কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গীতসূত্রসার' (১৮৮৫)—মাত্র এই কখানি সংগীত-বিজ্ঞানগ্রন্থই তখন প্রকাশিত হয়েছিল। এই দিক থেকে সংগীতের ঔপপত্তিক আলোচনার দুঃসাহসের জন্য স্বামীজী অবশ্যই প্রশংসার্হ। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাংগীতিক গবেষণাও তখন পর্যন্ত বিশেষ প্রকাশিত হয়নি। অবশ্য তরুণ নরেন্দ্রনাথ শৌরীন্দ্রমোহনের সংগীতানুরাগে ও সংগীতবিষয়ে পাণ্ডিত্যের সংবাদ রাখতেন। সেইজন্য এই আলোচনায় শৌরীন্দ্রমোহনের প্রতিও তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।[১৩]

গীতসংকলন পর্যায়ে এই যুগেব আর একখানি উল্লেখযোগ্য চয়নিকাব প্রসঙ্গ দিয়ে বর্তমান আলোচনার সমাপ্তি টানা হচ্ছে। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়সংকলিত ও সম্পাদিত 'সংগীতকোষ' উনিশ শতকের উপান্তভাগেব একখানে সুবৃহৎ গীতসংকলনগ্রন্থ।[১৪] এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩০৬) সম্পর্কে জনৈক আধুনিক সমালোচক লিখেছেন, "বারশত আশি পৃষ্ঠার এই গ্রন্থ সে যুগের নানা বিষয়েব বহু গান (৪০১৬) সংরক্ষিত হইয়াছে। ইহাব অনেক গান বহুপূর্বেই অচলিত হইয়া গিয়াছে এবং সাহিত্যের ঐতিহাসিক ছাড়া অন্য কাহারও কাছে এইসব পুরাতন গানের মূল্যও অল্প।[১৫] প্রথম সংস্করণে "বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত 'লক্ষ্মী ও সরস্বতী' প্রভৃতিব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকিশোর রায় গুণসাগর মহাশয়বিরচিত 'সংগীতমাহাত্ম্য' শীর্ষক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধটি" সন্নিবেশিত হয়েছে। এই ভূমিকায় চন্দ্রকিশোর রায়মহাশয় মানবসভ্যতার ইতিহাসে সংগীতের অনিবচনীয় মাধুর্যের উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে গীতিকারদের নাম সূচীপত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং সংগীতগুলি নিম্নরূপ বিষয়ানুযায়ী শ্রেণীবিভক্ত—প্রেমের গান, বিরহের গান, প্রেম —কৃষ্ণপ্রেম বৃন্দাবন, সখীসংগীত, রাধাসংগীত, শ্রীকৃষ্ণ, কৈলাস শ্যামাপ্রেম, শ্যামা, ব্রহ্ম, প্রেম—ঈশ্বরপ্রেম (জ্ঞানের গান, প্রাণের গান, ভাবের গান) সংকীর্তন, পৌরাণিক নানাবিধ সংগীত, প্রাচীন পদাবলী, সামাজিক সংগীত, জাতীয় সংগীত, রহস্যসংগীত, নানা ভাষাসংগীত (সংস্কৃত, ব্রজবুলি, পারসি, উর্দু, পাঞ্জাব, গুজরাটি ইত্যাদি), সর্বশ্রেণীর গীত, (টপ্পা, খেয়াল পাঁচালি, কর্তাভজার গান, আকড়াই গীত, গ্রাম্যগীত), লুপ্ত সংগীত, কীর্তন, কবি, হাফআকড়াই, পুনরায় প্রণয়সংগীত (বিরহ, মিলন পূর্বরাগ, স্বামী স্ত্রী অশ্রুজল), মহাজন পদাবলী, তেলেনা, কর্তাভজন, ভারতসংগীত, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি পর্যায়ের পুনরাবৃত্তি।

এই গ্রন্থে ৪৬টি খ্রীস্টসংগীত আছে। এই গ্রন্থের বিষয়বিভাগরীতি পূর্ববর্তী 'সংগীত-সহস্র' (১৮৯১) গ্রন্থের আদর্শে করা হয়েছে।

১। "ভাষণাবলী—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্যসম্মেলনে সংগীতশাখার সভাপতির ভাষণ,

২। ভারতীয় সংগীতমুক্তাবলী/প্রথম ভাগ/অর্থাৎ ভারতের জাতীয় সামাজিক পৌরাণিক/ ঐতিহাসিক ধর্ম ও বিবিধ বিষয়ব/গীতসংগ্রহ/প্রসিদ্ধ রচয়িতাগণের সংক্ষেপ পরিচয়সহ/[তৃতীয় সংস্করণ](সংশোধিত পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত)/"গানাৎ পরতরো নহি"।/ঋষিবাক্য/শ্রীনবকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত/কলিকাতা/২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট ভিক্টোরিয়া প্রেসে/শ্রীতারিণীচরণ আস দ্বারা মুদ্রিত/বংগাব্দ ১৩০০। খ্রীঃ অব্দ ১৮৯৩।/মূল্য ২ টাকা মাত্র।" তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ হয় ১২৯১ সালের শেষভাগে। "বঙ্গভাষাতে সংগীত-মুক্তাবলীর ন্যায় সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনকারী বিবিধ রসযুক্ত উৎকৃষ্ট সংগীত একত্র সংগৃহীত" হওয়ায় এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল, এর সংস্করণই তার প্রমাণ। ১২৯২ বঙ্গাব্দে এর দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়, তাতে প্রায় ৭০০টি প্রণয়সংগীত, গ্রাম্যসংগীত ও রহস্যসংগীত ছিল। তৃতীয় সংস্করণের প্রথম ভাগে প্রায় ১৬০০ গান আছে। প্রখ্যাত সংগীতবিশারদ মহারাজ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর লিখেছিলেন, "বঙ্গীয় কবিগণকে চিরজীবী করাই আপনার উদ্দেশ্য।"

৩। ভারতীয় সংগীতমুক্তাবলী-নির্দেশিত এই বিষয়বিন্যাস অনুকরণে সমকালীন আর একজন গীতসংগ্রহকার লিখেছিলেন—"বিষয় ভাব ঘটনা এবং রাগিণী অনুসারে গীতগুলি সাজানোই সংগ্রাহকের প্রধান ও কর্তব্য কর্ম"– গীতরত্নমালা, অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় (১৩০৩)

৪। সংবাদ প্রভাকর। শনিবার ১ শ্রাবণ ১২৬১ (১৫ জুলাই ১৮৫৪)

৬। "বিশ্বসংগীত/সংগীত-সাহিত্য-রসানভিজ্ঞঃ খ্যাতঃ পশুঃ পুচ্ছবিষাণহীনঃ।/ কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রং কাব্যং গীতেন হন্যতে। /ভূতপূর্ব 'বঙ্গভূমি' পত্রিকার সম্পাদক/শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক/ সম্পাদিত/বসাক এণ্ড সন কলিকাতা/১৩৩৪/মূল্য দেড় টাকা/ (বাঁধা দুই টাকা)।" এই গ্রন্থে সংগীতের ইতিহাস, বর্তমান অবস্থা, ধ্বনির বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, তাল-মাত্রা-লয়-রাগিরাগিণী, কণ্ঠ-সাধনা, ধ্রুপদ-খেয়াল-টপ্পা, বেহালা তানপুরা হারমোনিয়াম প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র, বিবিধ সাংগীতিক সম্প্রদায়, কনসার্ট, যাত্রা, রামায়ণ-পাঁচালি, কীর্তন-কথকতা, তবলার বোল ও ঠেকা, স্বরলিপি-শিক্ষা, নৃত্য রাগরাগিণীর ধ্যান ও প্রতিমূর্তি, গায়ক ও কবিজীবনী প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে

৭। 'বৃন্দাবনবিলাসিনী রাই আমাদের' গোবিন্দ অধিকারীর এই বিখ্যাত গানটি রাধাকৃষ্ণ বৈরাগীর নামে এই গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। অথচ 'সংগীতকল্পতরু'তে গানটি গোবিন্দ অধিকারীর নামেই আছে

৮। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নামে 'পাঞ্জাবের সৈন্যগণের সমরগান' হিসাবে 'একসূত্রে গাঁথিয়াছি সহস্রটি মন' সংকলিত

৯। "সংগীত সহস্র ৬৫। ২নং বিডন স্ট্রিট, কলিকাতা / গ্রন্থকার সমিতি হইতে / প্রকাশিত / কলিকাতা / ১০৮ নং বারাণসী ঘোষের স্ট্রিট / ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়ট প্রেসে / শ্রীনবীনচন্দ্র পাল দ্বারা মুদ্রিত / ১৮৯১—৩১ ডিসেম্বর

১০। "বাঙ্গালীর গান / (প্রত্যেক গীত রচয়িতাব জীবনী / বা পরিচয়সহ) / ভূতপূর্ব 'অনুসন্ধান' সম্পাদক / শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী-সম্পাদিত। / কলিকাতা, ৩৮।২, ভবানীচবণ দত্তের ষ্ট্রিট,—বঙ্গবাসী ইলেক্‌ট্রো মেসিন প্রেসে / শ্রীনটবর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও / প্রকাশিত / সন ১৩১১ সাল। / মূল্য ৫ টাকা মাত্র।"

১১। প্রথম প্রকাশ ১৮৪৩, সাহিত্যপবিষদ সংস্করণ ১৯১৬। পূর্বতন সংস্কবণেব আখ্যাপত্র জাতীয় গ্রন্থাগারে বক্ষিত গ্রন্থে লুপ্ত। নূতন সংস্করণেব আখ্যাপত্রটি এইরূপ—সংগীত/বাগকল্পদ্রুম/ ভাবতীয় প্রাচীন সংগীত শাস্ত্রালোচনা / ও সংস্কৃত হিন্দি গুজবাতী মবাঠী কর্ণাটী তৈলঙ্গী তামিল বাঙলা উড়িয়া আববা/পাবস্য পেগুয়ান ইংবাজি ও রাজপুতানার নানা প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত নানা সুবেব প্রাচীন গান সংগ্রহ/কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব বাগসাগব বিবচিত/(বঙ্গাংশ বা তৃতীয় খণ্ড) / নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যাবিদ্যার্ণব কর্তৃক সংশোধিত খ্রীঃ ১৯১৬

১২। সংগীতকল্পতক/অর্থাৎ/নানাবিধ বাদ্যাদিশিক্ষা, স্বরলিপি ও সংগীত সম্বন্ধে/বিস্তব শিক্ষাপ্রদ বিষয়সহ জাতীয, ধর্ম / বিষয়ক, পৌবাণিক, ঐতিহাসিক,/সামাজিক, প্রণয, বিবিধ/এবং নানাবিষয়ক/ গীতসংগ্রহ/শ্রীনবেন্দ্রনাথ দত্ত, বি. এ./ও/শ্রীবৈষ্ণবচবণ বসাক/কর্তৃক সংগৃহীত/১১৮ নং অপার চিৎপুব বোড কলিকাতা,/'আর্যপুস্তকালয' হইতে / শ্রীচণ্ডীচবণ বসাক কর্তৃক/প্রকাশিত…"

১৩। এই গ্রন্থটি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনাব জন্য দ্রষ্টব্য 'সংগীতসাধনায বিবেকানন্দ ও সংগীতকল্পতরু'—দিলীপকুমাব মুখোপাধ্যায (১৯৬৩)

১৪। "সংগীতকোষ/প্রধান প্রধান কবি ও গীতবচযিতৃগণ বিরচিত/চাবি সহস্র সংগীত/ শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। /২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে/শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যাযেব কর্তৃক প্রকাশিত। /কলিকাতা। /৯৬ নং বীডন ষ্ট্রীট, নূতন কলিকাতা যন্ত্রে/শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বাবা মুদ্রিত।" এই গ্রন্থেব প্রথম সংস্কবণ ১৩০৩ এবং দ্বিতীয় সংস্কবণ ১৩০৬ সালে প্রকাশিত হয

১৫। খ্যাতিসংগীত—ববীন্দ্রকুমাব দাশগুপ্ত, দেশ ২১ বর্ষ ৩২ সংখ্যা

উনিশ শতকের কাব্যসংগীত : প্রেমসংগীত

১

If we listen patiently at the closed door which shuts from us the first scenes of the humanity's childhood, we fancy that amidst the muffled cries and murmurs, we can hear the repetition of some such sound as answers to our own word 'Love'.[১]

উনবিংশ শতাব্দীর গীতধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য তার গীতরূপপদ্ধতি নয়, তার কাব্যবস্তু বা গীতবিষয়। এই প্রথম সংগীত আপনার স্বরসর্বস্বতার আবরণ থেকে বেরিয়ে এসে ব্যক্তিতন্ত্রসমৃদ্ধ জগৎ থেকে উপকরণসংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছে। সেই উপকরণের মধ্যে প্রেম এক অনিবার্য প্রধান আকর্ষণ। বৈষ্ণব কবিতার প্রেম-ঐশ্বর্য বাঙলা সাহিত্যের বহিরঙ্গন অধিকার করে ছিল দীর্ঘকাল। মঙ্গলকাব্যে বা অনুবাদ সাহিত্যে সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক মানুষের ইতিহাস আছে—ব্যক্তিমনের সূক্ষ্মস্বাধীন গতিবিধির মানচিত্র নেই। মধ্যযুগের শেষভাগে ময়মনসিংহগীতিকা পূর্ববঙ্গগীতিকাগুলিতে নিয়তির অন্ধ বিধাননিরপেক্ষ সমাজমানসের প্রণয়চিত্র আঁকা আছে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যে নরনারীর দেহঘটিত যে যোগাযোগ, সেখানে হৃদয়ঘটিত ব্যাপার বিলাসকলার চাতুর্যে হারিয়ে গেছে। সেইজন্য আঠারো শতকের কবিওয়ালারা যখন নরনারীর পারস্পরিক হৃদয়বৃত্তির সম্পর্ক অবলম্বন করে গানরচনা করতে সুরু করলেন, তাদের প্রধান অনুসরণ ক্ষেত্র রইল বৈষ্ণব কবিতা। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়গীতিকেই তারা সংস্কার করে নতুন ব্যাখ্যানসহযোগে গান বাধতে লাগলেন। ক্রমশ রাধাকৃষ্ণপ্রসঙ্গ কবিগানের রীতিতে পরিণত হল, রাধাকৃষ্ণের প্রথাগৃহীত নামের পিছনে আঠারো-উনিশ শতকের নাগরিক জীবনের প্রেমচেতনাই কবিসংগীতগুলিকে অল্পবিস্তর প্রভাবিত করল। নিধুবাবুও মৌলিক প্রেমকে নিয়েই গান রচনা করলেন, পৌরাণিক প্রেমের প্রকরণ-প্রযুক্তি কিছুই ব্যবহার করলেন না। প্রেমের সূক্ষ্ম বিচিত্র গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে গানের সুরে নিধুবাবু তাকে রূপায়িত করলেন। "প্রেমের বিষয় যাহা কিছু বলিবার আছে নিধুবাবু প্রায় তাহা বলিতে বাকি রাখেন নাই।"[২] এই নতুন শিল্পরীতির বাহন হিসাবে তিনি টপ্পার সুর ব্যবহার করেছেন। গভীর-অগভীর, লঘু-গুরু, আশা-হতাশা, প্রেমের বিষয়বিন্যাসে যত বৈচিত্র্যই থাকুক, প্রেমসংগীতের রোমান্টিকতাকে বহন করার শ্রেষ্ঠ উপকরণ হিসাবে টপ্পার আবির্ভাব এই যুগে অপরিহার্য ছিল।

উনিশ শতকের প্রেমের গানগুলিতে একটি হতাশা, দুঃখের বেদনা, বঞ্চনার হাহাকার, সামাজিক বাধানিষেধের প্রতি একটি সকাতর বিদ্রূপভঙ্গি জড়িয়ে আছে। রাধাকে বঞ্চনা করে লম্পট কৃষ্ণের পলায়নপ্রবৃত্তি কেবল কবিসংগীতেই নয়, অনেক গানেরই কাব্যপ্রেরণা সঞ্চার করেছে বোধ করি ঐ কারণেই। এই শতকের সমাজজীবনে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধ যত প্রবল হতে চেষ্টা করেছে, নিয়ম ও সংস্কারের পাষাণপ্রাচীরে তার বন্ধনও ততই দুর্বিষহ এবং দুর্বার হয়ে উঠেছে। ময়রা মুচি থেকে বস্থ-ঠাকুর, নিম্নহিন্দু থেকে বর্ণহিন্দু গায়কের দলে কোনো ভেদ নেই, বৈষম্য নেই, কারণ সকলেই এক দুঃখের ও অভিজ্ঞতার অংশীদার। উনিশ শতকের বিপুল মৌনবাক্ সংগীতের মধ্যেই সেকালের সমাজজীবনের সেই অবরুদ্ধ হৃদয়বেদনার ইতিহাস নিহিত আছে। সমাজশৃঙ্খলা যত শৃঙ্খল হয়ে হৃদয়বৃত্তিকে লাঞ্ছিত করেছে, গানের সংখ্যা তত বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ তখনো ছোটগল্প-উপন্যাস বা গীতিকাব্যরীতির সার্থক আবির্ভাব ঘটেনি। তাছাড়া গানের মধ্য দিয়েই মনের কথাটি সহজে ব্যক্ত করা যায়, সুরের সাহায্যে কথাকে আরও তীব্র গভীর তাৎপর্যবহ করে তোলা যায়। গানের আবেদন এইজন্য শ্রোতার চিত্তে সরাসরি পৌঁছে যায়। সেই শ্রোতা ধনীদরিদ্র ইতরভদ্র সকলেই।

গত শতকের প্রেমসংগীতের আলোচনায় 'প্রীতিগীতি'[৩] নামক একটি সংকলন গ্রন্থের উল্লেখ প্রায় অপরিহার্য। উনিশ শতকের শেষ দশকে প্রকাশিত (১৮৯৮) এই প্রেমকবিতা ও গানের সংকলনে বৈষ্ণব পদাবলীর অন্তর্ভুক্তি সত্ত্বেও উনিশ শতকের কবিদের সংগীতগুলিই মুখ্যত সংকলিত। যে বিপুল যুগচেতনা নরনারীর স্বাধীন সম্পর্কনিরূপণে সমগ্র সাহিত্যকে শিহরিত কম্পিত করে তুলেছিল, 'প্রীতিগীতি' সেই চেতনারই ফলশ্রুতি। প্রেমবৃত্তির প্রতি এমন গভীর শ্রদ্ধা, বাঙলা কাব্যসংগীতের প্রতি এহেন সুনিবিড় প্রত্যয় প্রকাশের জন্য সংকলয়িতা অবিনাশচন্দ্র ঘোষ বাঙলা সংগীতের ইতিহাসে অবশ্যই একটি বিশিষ্ট মর্যাদা লাভের অধিকারী। সংকলনকার এই গ্রন্থে সংকলিত শত শত গানকে প্রেমের অসংখ্য সম্ভাব্য সূক্ষ্মতম বিষয়বিভাগে সজ্জিত করেছেন এবং সেই বিষয়বিভাগে তাঁর কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 'প্রীতিপ্রশংসা' অথবা 'নারীপ্রশংসা', 'অবিস্মৃত প্রেম' এবং 'প্রেম ভাঙিলে কী আর হয়' প্রভৃতি বিষয়নির্দেশের দ্বারা এই গ্রন্থে বিদ্যাপতি থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত গীতকারদের রচিত কাব্যসংগীত ভাবসাদৃশ্যে পরস্পর চয়িত হয়েছে। ফলে একই বিষয়বিভাগে নিধুবাবু হরুঠাকুর শ্রীধর কথকের পাশে রবীন্দ্রনাথের গানের উপস্থিতি প্রমাণ করে, বাঙলা গানের

ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের স্থান ধারাবাবিকভাবে এঁদেরই পাশে। রবীন্দ্রনাথ বাঙলা কাব্যসংগীতের ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করেই সংগীতের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন, অপেক্ষাকৃত পুরাতন এই সংকলনগুলি তার অন্যতম প্রমাণ।

'প্রীতিগীতি'র অবতরণিকায় সম্পাদক বলেছেন যে, হৃদয়ের সকল ভাবই কাব্যের উপাদান, কিন্তু প্রেমেব মত সর্বসাময়িক ও বিশ্বজনীন ভাব আব নেই। এই প্রসঙ্গে জনৈক কবির উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন, যেখানে প্রেমের ছায়া সেইখানেই সৌন্দর্য ও সংগীতের আবির্ভাব হয়। প্রেমই প্রকৃত স্পর্শমণি। সম্পাদকের ভাষায়—

"জাতীয় সংগীতে জাতীয় চরিত্র প্রতিফলিত হয়। স্পেনদেশের গ্রাম্যগীতিতে উৎকট প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে অদম্য গর্ব ও ভীষণ সমরপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। এদেশের প্রেমসংগীতে সেইরূপ বাঙালি চরিত্রের মজ্জাগত কোমলতা, প্রণয়-প্রবণতা, ভাবুকতা ও স্থিতিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ দেশের গন্ধপুষ্পে প্রায় বিলাতি ফুলের বর্ণবৈচিত্র্য লক্ষিত হয় না। অনেকগুলি বিশুদ্ধ শুভ্রবর্ণ, অনেকগুলি রজনীতে ফুটে, সকলগুলিরই হৃদয় মধুতে ভরা। এদেশের ললনাদিগের মধ্যেও সেইরূপ পাশ্চাত্ত্য চরিত্রবৈচিত্র্য লক্ষিত হয় না। স্ত্রীস্বভাবসুলভ সবলতা ও লজ্জাই ইহাদিগের ভূষণ এবং ইহাদিগের হৃদয় দয়াদাক্ষিণ্যাদির প্রাচুর্যে চিরমধুব। এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির প্রকৃতিপটও উগ্রতাবর্জিত। তাই এদেশের প্রীতিগীতি বংশীর স্বরে বাঁধা। এ সংগীত শরচ্চন্দ্রিকার ন্যায়, বসন্ত সমীরণের ন্যায়, গিরিনির্ঝরিণীর ন্যায় অতি স্নিগ্ধভাবে হৃদয়েব অন্তস্থল পর্যন্ত প্লাবিত করে।"

'প্রীতিগীতি' গ্রন্থের প্রেমের গানগুলি বিভিন্ন ভাবানুষঙ্গে সাজানো, মোট ২৪২টি শিরোনামায় বিভক্ত। শিরোনামাগুলি অত্যন্ত কৌতূহলজনক, সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতার পরিচায়ক এবং এই কারণেই একালের পাঠকদের কাছে এগুলি পেশ করা যেতে পারে—

প্রীতিপ্রশংসা	প্রেম মৃত্যুঞ্জয়
প্রেমনিন্দা	প্রেম অনন্যগতি
প্রেমের সুখদুঃখ	প্রেমে মান অপমান নাই
প্রেমপূজার উপকরণ	প্রেমে লজ্জাভয় থাকে না
প্রেমবৈচিত্র্য	প্রেমে দোষগুণ বিচার করে না
প্রণয়ের তিন গুণ	প্রেমিক দেখে শুনে মনে
প্রেম বহুরূপ	প্রেমসিন্ধুনীরে বহে নানা তরঙ্গ

প্রেম কি পায় সকলে
প্রেম অরসিকে কী বুঝিবে
প্রেম কি ভোলা যায়
মনের মিল না হইলে কি প্রেম হয়?
ব্যভিচারে কি প্রেম মিলে?
প্রেম উভয়ের যত্নসাপেক্ষ
পিরিতি লুকাইলে নাহি রয়
পরের কথায় কে করে প্রেম ত্যাগ করে?
না বুঝিয়ে পরে করে অভেদ প্রভেদ
প্রেম ভাঙ্গিলে কি আর হয়?
ভালবাসা জনমিলে কিন্তু রবে না।
যত্নে উপার্জ্জিত ধনকে কোথায় দুঃখেতে ত্যজে?
প্রিয়জনের সহিত বনবাসেও সুখ
প্রেমের বালাই লয়ে মরিতে কি সুখ হয়
যার যেরূপ ভাব তার সেইরূপ লাভ
যারে যে ভাবে সে হয় তার অনুরূপ
যে যার প্রিয় সেই তার ভাল
যে যাহারে ভালবাসে সে তাহারে তোষে
ভালবাসি যারে তার লাগি সব সয়
কোথা হতে এল প্রেম কোথাই বা যায়?
প্রেমাঙ্কুর বাড়ে কিসে?
প্রেম রহে কিসে?
প্রেমের বিকাশ
প্রেমের বন্ধন
প্রেমের পরাধীনতা
প্রেমের সার্থকতা
প্রণয়ের জয়
প্রণয়ের রাজত্ব

প্রেমবাণ
প্রেমঋণ
প্রেমতরী
পিরিতি বারণ
প্রেমপুরী
প্রেমের বন্যা
প্রেমসিন্ধু-মন্থন
সাধের বীণা
সাঁঝের রবি প্রেমের ছবি
অন্তর্দৃষ্টি প্রেম
নিরপেক্ষ প্রেম
ভালবাসার প্রতিদান
মনের মুকুর মন
উভয়ের সমবেদনা
প্রাণে প্রাণ পড়ল ধরা
পরের তরে আপন ভুলে পরের প্রাণে প্রাণ মিশাও
মধুর প্রাণের কথা প্রাণেতে রেখো না ঢাকি
না হলে আঁখির মিলন মরমকথা কেউ পাবে না
দেখিবে আপনমত আপনজনে
নিষেধ
মন বশ না হইলে বশ কে হইবে?
সংযম
প্রলোভন
প্রিয়প্রশংসা
প্রণয়িণীর তুলনা নাই
এখন আপনি লবে আপন প্রেমআশ্রয়
প্রিয়নিন্দা অসহ্য
নারীপ্রশংসা

আক্ষেপ

বাসনার বিপরীত

উভয়সংকট

বিধাতার অবিচার

হরিষে বিষাদ

আমি মরি তুমি সুখে থাক

অতৃপ্ত প্রেমের সাধ

শুধু আঁখির মিলনে কি তৃপ্তি হয় ?

এমন দেখা হওয়ার চেয়ে না দেখা ভাল

প্রেমের বিনিময়ে অনাদর কপটতা ও নিষ্ঠুরতা

আমার যে হতে চাও আগে হও আপনার

নির্বাণ অনল আর জ্বালিও না

ভয় রবে রাগ নিদয় করো না

এত আশা ভালবাসা ভুলিলে কেমনে ?

রবি ও কমলের প্রেম কি মানুষে সাজে ?

পর কি আপনার হয় ?

কুসুমে পাষাণ

তুমি যে বাস না ভাল তাহে আমি আছি ভাল

আমায় কেউ যেন ভালবাসে না

দিব না হৃদয় শুধু

বিদায়

প্রাণ বড় কি পতি বড

বিচ্ছেদ

পঞ্চতপা

বিরহিণীর মরণ নাই

এ তো রজনী নহে কালফণী

এখন বিরহানলে প্রেমানল জ্বলিয়াছে

আর কি হেরিব তারে ?

সকলি তো আছে সে কোথায় গেল ?

পলায়িত পাখি

শ্যামের গুণ সই কেন কর গান ?

যোগিনী না বিয়োগিনী ?

হর নই হে আমি যুবতী

আমারে দহিতে লাগিল সই যারা আমাতে জন্মিল

হৃদয়বাসীর দাহভয়

বিচ্ছেদ হবে জানিলে কি প্রেম করে ?

দুঃখঋণ

যাতনার দুঃখময় সুখ

আমি যে কাতর প্রাণে সে যেন শুনে না

কোকিল

মলয়ানিল

বসন্ত

বেগে আসিছে মদন সই নহে বসন্ত কখন

জীবনে আজি কি প্রথম এল বসন্ত

যৌবন গেলে আর ফিরিবে না

আশায় আর রহিব কত দিন ?

আশ্বাস

সকলই চঞ্চল সই নাথের বিরহে

চঞ্চল হইল অচঞ্চল

মিলন

হারানিধিলাভ

মুখের হাসি চাপলে কি হয় প্রাণের হাসি চোখে খেলে

প্রেমের দ্বন্দ্ব

মান

এই বিতানিত শিরোনামনির্দেশ নিঃসন্দেহে বৈচিত্র্যজনক কিন্তু সর্বাংশে সার্থক নয়। কারণ, প্রথমত, কেবল 'বিশেষ কোনো ভাব' এই এই দিক থেকেও সবগুলি শিরোনামা গৃহীত হয়নি, বিষয়বিভাগের কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই এইগুলিতে। কেবল একটি গানের একটি বাক্য বা বাক্যাংশের দ্বারাই একটি স্বতন্ত্র শাখা কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য গানে তার সমর্থন নেই। দ্বিতীয়ত, প্রেমের সঙ্গে ভগবদ্‌ভক্তির অন্তর্ভুক্তি প্রেমের লোকায়ত রূপটিকে ক্ষুণ্ণ করেছে। অবশ্য রাধাকৃষ্ণপ্রেম বাঙলা কাব্যসংগীতের একটি অপরিহার্য প্রসঙ্গ এবং ভক্তি ও লৌকিক প্রেমেব সীমান্তরেখাতেই তার অবস্থান। এই জাতীয় পদ বর্জন করা অবশ্য কোনো সংকলনকারেব পক্ষেই সম্ভব নয়। তৃতীয়ত, বহুতব নির্দেশনামা একালের পাঠকের কাছে শিরোনাম-কৈবল্য বলে মনে হবে, সুতরাং অবান্তর। এমন অনেক পর্যায় আছে যেখানে একটি বাক্য ব্যতীত প্রেমগীতিগুলিব মধ্যে কোনো ভারসাম্যই নেই। চতুর্থত, শিরোনামার সংগীত-সংকলনও চূড়ান্ত হয়নি। খণ্ডিতা বা কলহান্তরিতা পর্যায়েব অন্তর্ভুক্ত হয়নি, অথচ সেই পর্যাযেব গান হতে পারে এমন গান দুর্লভ নয়[৭]।

২

কবি মূর বলেছিলেন, But there is nothing half as sweet in life as love's young dream. প্রেম সম্পর্কে আমাদের চেতনাজাগরণেব মূলে ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং সেই স্বাতন্ত্র্যের পিছনে ছিল পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রণোদিত নবজাগৃতি। প্রণয় নামক মানববৃত্তিকে নতুন করে আবিষ্কার এবং সাহিত্যেব সবক্ষেত্রে এই প্রণয়ের মানদণ্ডপ্রয়োগই উনিশ শতকেব বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই প্রেম কেবল পুরুষনারীর পরস্পর আকর্ষণ মাত্র নয়, এই প্রেম ধনতান্ত্রিক সমাজেব ব্যক্তিত্বজাগবণের প্রথমস্ফুরিত আত্মমন্ত্র, নাবী-মর্যাদার প্রথম গায়ত্রী। উনিশ শতকের কবিদের কাছে প্রেম এসেছে স্বাধীন নির্বাচনপদ্ধতির প্রতীকরূপে। 'যে যাহারে ভালবাসে সে যাইবে তার পাশে, মদনরাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে'—ব্রজাঙ্গনার এই কাব্যোক্তি ব্যক্তিতান্ত্রিক আধুনিক মানুষেরই মর্মবাণী। তথাপি সেই স্বাধীন নির্বাচন, কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণের অধিকারঘোষণা সত্ত্বেও উনিশ শতকের সমাজ নারীর সামাজিক অধিকার স্বীকার করেনি। তাই ব্রজাঙ্গনার রাধার মুখে প্রেমের স্বাধীনতার সংজ্ঞা আছে, কিন্তু প্রয়োগ নেই। তাই শেষ পর্যন্ত তার সকাতর ক্রন্দন 'রাধিকার বেড়ি ভাঙ এ মম মিনতি'। তাই সে যুগের কাব্যনাটকসংগীতে

শেষ পর্যন্ত বড হয়ে উঠেছে ব্যর্থতার হাহাকার, নৈষ্ফল্যের রোদন, অচরিতার্থতার ট্রাজেডি, মানাভিমানের নৈরাশ্য।

উনিশ শতকের অনেক কাব্যগীতে প্রেমের প্রতি নবজাগৃতির এই শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাবটি আবিষ্কার করা যায়। প্রেম যে শেষ পর্যন্ত একটি অস্বস্তিকর দুঃখ-জনক অনুভূতি, 'all other pleasures are not worth its pains', প্রেম যে লজ্জাভয়-কুল-ধর্মভাবনার বিপর্যয়কারী, সামাজিক মানাপমানবোধ পর্যন্ত সে তুচ্ছ করে, সে কথা নিধুবাবুর প্রীতিপ্রশংসাবিষয়ক একটি গানে আভাসিত হয়েছে—

প্রেম মোর অতি প্রিয় হে, তুমি আমাবে তেজো না,
যদি রাত্রিদিন কর জ্বালাতন ভাল সে যাতনা।

প্রীতিপ্রশংসা বিভাগে জনৈক অজ্ঞাতনামা কবি প্রেমের গৌরবস্তুতি করেছেন—

হায়রে পিরিতি তোর গুণের বালাই নিয়ে মরি।
যখন যারে পাও তার কি সুখদুঃখ সব ঘুচাও
তুলে সিংহাসনে কর পথের ভিখারি।
ভাবি জন্মে যার মুখ না দেখিব আরো
আবার দেখা হলে তার সেই চরণ ধরি।

আর একটি অজ্ঞাত কবির পদে বলা হয়েছে, প্রেমগুণে এই অখিল ভুবন বাঁধা রয়েছে—বিষমবিচ্ছেদ-ঝড়েও দৃঢমূল সেই প্রেমতরুতে কম্পন সঞ্চার হয় না। নবকুমার মিত্র গেয়েছেন—

…ব্যক্ত আছে প্রেমতন্ত্রে দীক্ষা হইলে পিরিতিমন্ত্রে
খঞ্জেরই চবণ হয় অন্ধেরই নয়ন।
বোবা যদি প্রেম করে তার মুখে বাক্য সরে
বধিরে শ্রবণ করে সুমৃদুবচন।

একটি গানে দীপহীন তিমিরালয়ের সঙ্গে প্রেমহীন জীবনের সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়েছে। প্রেমবঞ্চিত জীবনে সুখ নেই, আশা নেই। প্রেমিকের কাছে শত্রু-মিত্র এক হয়ে যায়। মঙ্গলকাব্য-শক্তিগীতি-পাঁচালি কাব্যের ধারার দীর্ঘবিন্যস্ত স্তর অতিক্রম করে মাত্র কয়েক বৎসরে প্রেমবর্ণনার এই উৎসারিত উচ্ছ্বাসের প্রেরণার মূল কোথায় ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। সব গানই নিছক পূর্বানুসরণ নয়, কবির আন্তরপ্রেরণা সর্বত্রই কিছু না কিছু বর্তমান আছে। রাম বসু লিখেছিলেন—

প্রেমসুধা পান করে যে তারও নাহি থাকে খেদ
স্বপক্ষ বিপক্ষ প্রেমে শত্রুমিত্র নাহি ভেদ।

প্রেমের অস্থিরতায় কাতর হয়ে কেউ প্রেমের নিন্দাবাদে মুখর হয়েছেন—

ওলো সই জগৎজনে প্রেম যেন কেউ শেখে না
সরল প্রাণে গরল ঢেলে কেউ যেন সই মজে না।
প্রেমের মত জ্বালা দিতে কী আছে আর অবনীতে,
সাধে পড়েও প্রেমের ফাঁদে কেউ তো তবু ঠেকে না॥ (অজ্ঞাত)

প্রণয়ের এই দুঃখকর অনুভূতি, প্রণয়ের সঙ্গে অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য নানাবিধ বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা নবীনচন্দ্রের প্রেমনিন্দামূলক একটি পদে প্রাপ্তব্য—

কেন দুঃখ দিতে বিধি প্রেমনিধি গড়িল ?
বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল ?
ডুবিলে অতল জলে প্রেমরত্ন তবে মিলে
কারো ভাগ্যে মৃত্যু ফলে কারো কলঙ্ক কেবল।
বিদ্যুৎপ্রতিম প্রেম দূর হতে মনোরম
দরশন অনুপম পরশনে মৃত্যুফল।
জীবন কাননে হায়, প্রেম মৃগতৃষ্ণিকায়,
যে জন পাইতে চায় পাষাণে সে চাহে জল।
আজি যে করিবে প্রেম মনে ভাবিয়ে হেম,
বিচ্ছেদ অনল ক্রমে কালি হবে অশ্রুজল॥

উনিশ শতকের প্রেমের গানে তাই বিচ্ছেদের অনিবার্য যন্ত্রণা ও অনুশোচনা, সমকালীন সাহিত্যেও তাই ট্র্যাজেডির অনির্বাপ্য হাহাকার। কবিসংগীত থেকে সুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কাব্যসংগীতের প্রেমবিষয়ক বিভাগটি বিরহের নিশ্চিত বিলাপে ক্রন্দমান, মিলনের অসম্ভব প্রত্যাশায় কম্পমান, অনুতাপের ক্ষণভঙ্গুর আত্মপ্রলাপে স্পন্দমান। রাম বসুর একটি বিচ্ছেদ পদের ভাষা কবিগীতের সাধারণ বস্তুসর্বস্ব গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে—

তোমার প্রেম হতে, প্রাণ, বিচ্ছেদ আমায় ভালবেসেছে
প্রেম হল আর ফুরাল, চোখে দেখতে দেখতে গেল,
জন্মের মত বিচ্ছেদ আমার অন্তরে পশেছে।··

এইভাবেই প্রেমের বিরহতত্ত্ব গড়ে উঠেছে। চিরবিরহের মধ্য দিয়ে মানসমিলনের সান্ত্বনার বাণী রচনা করেছেন কবিরা—

পিরিতি পরমসুখ সেই সে জানে
বিরহে না বহে নীর যাহার নয়নে। (নিধুবাবু)

কালী মির্জা গেয়েছেন, 'ভালবাসা হলে কি হয় প্রেমে সুখোদয়' ? এই

বিচ্ছেদবেদনায় কাতর জনৈক কবি প্রণয়প্রতিমার অভিনব আরাধনাসংগীত রচনা করেছেন—

> পূজিব পিরিতি প্রেমপ্রতিমা করি নির্মাণ
> অলংকার দিব তাহে যত আছে অপমান।
> গঞ্জনার করি ডালি কলঙ্কে পুরি অঞ্জলি
> বিচ্ছেদ তায় দিব বলি দক্ষিণা করিব প্রাণ ॥[৫]

অবশ্য মনে রাখতে হবে উনিশ শতকের প্রেমচেতনার মধ্য দিয়ে যে যুগদৃষ্টি, আধুনিকতা, ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই ফুটে উঠুক না কেন, কয়েকজন যুগপ্রতিনিধির উপলব্ধি ব্যতীত অন্যান্য অধিকাংশ রচয়িতার প্রীতিগীতি একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি, একঘেয়ে প্রকাশভঙ্গিতে ক্লিষ্ট, উপমা-উৎপ্রেক্ষার একজাতীয় পুনরুক্তিতে ভাবাক্রান্ত। প্রীতিবিষয়ক সংগীতরচনা যে নিতান্ত প্রথায় পরিণত হয়েছিল, অখ্যাত সাধারণ অজস্র গীতকারের পদবাহুল্য তার প্রমাণ। প্রণয় নামক বৈদ্যুতিক উপলব্ধি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অঙ্গীভূত ছিল—সকলের সম্পর্কেই একথা হয়ত বলা যায় না। প্রেমের দিব্যমুহূর্ত অত্যন্ত বিরল, প্রণয় অতর্কিতে অপ্রত্যাশিত ভাবে মানবজীবন ধন্য করে, সকলকে করে না, এই বক্তব্য একটি অজ্ঞাত রচয়িতার কাব্যগীতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে—

> সেই প্রেম কি চাইলে মিলে?
> সেই প্রেম আপনি উদয় হয় শুভযোগ হলে।
> হয় ভাবেরই উদয় সেই ভাবে ডুবে রইতে হয়
> তবে দয়া হয় সময় হলে।
> নইলে পাওয়া ভার দৌড়াদৌড়ি সার
> কনকধারী গোঁসাই বাউল বলে।...

কিন্তু নিন্দা বা প্রশংসার গান শুধু প্রেমের চারিত্র্য নির্ণয় করে না, উনিশ শতকের প্রেমসংগীতের সর্বত্র একটি অসামাজিকতা জড়িত আছে। সর্বত্রই যেন নিরুপায় অব্যক্ত অসহায়তা, অবিশ্বাসী মনোভাব, বিদ্রূপাত্মক অবহেলা লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিগত প্রেমের ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য সামগ্রিকভাবে প্রায় সকল কবিকেই একাত্ম করে তুলেছে। প্রেম করার চাতুর্য অবশেষে যন্ত্রণার দহনে পরিণতি লাভ করে—এই সান্ত্বনাকে জোর করে বিশ্বাসে পরিণত করার চেষ্টা চলেছে কোথাও কোথাও। জগন্নাথপ্রসাদ বসুমল্লিক লিখেছেন. 'প্রেমরসে অবশেষে অপযশ দেশময়'; শ্রীধর কথক গেয়েছেন, 'প্রেম ভালবাসি বলে কত লোকে কত বলে'। প্রেমের পথ কণ্টকাকীর্ণ, সেই হতাশার মধ্যে

অবশ্য আশার সান্ত্বনাও কম নেই। প্রেমের জন্য যে শঙ্কাবরণ লজ্জামান-অপমানগ্রহণ, সবই যেন প্রেমপূজার উপকরণ। জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক একটি গানে কলঙ্ককে অলংকার করে তুলেছেন। লোকনিন্দা সমাজভয়কে উপেক্ষা করার দুর্দম বাসনা বহু গানে বলিষ্ঠভাষায় ধ্বনিত হয়েছে। কালিদাস গাঙ্গুলির একটি কাব্যসংগীতের মর্ম—

কী করে লোকগঞ্জনায়
যাহার দর্শনে প্রাণে সদা স্পৃহা হয় ?

অর্থাৎ হৃদয়ের অকপট অনুরাগের প্রকাশই সংসারে চরম সত্য, সমাজ-বন্ধনের জন্য মনোবৃত্তির স্বাধীনতাকে বোধ করা যায় না। শ্রীধর কথক গেয়েছেন, 'যে বলে বলুক লোকে কারো কথা শুনিব না।' কালী মির্জার ভাষায়—

একি কথার কথা, প্রেম হয়-যায় ?
ক্ষণেক যারে দেখা যায় তাহা কি ক্ষণেকে যায়
লোকের কথায় ?

সকল কবির কণ্ঠেই এই এক প্রতিবোধের ঐকতান। শ্রীধর কথকের—

পরেরই কথায় কে কোথায় কবে প্রেম ত্যেজেছে
যে জন মজেছে দুঃখ পেয়েছে সুখ জেনেছে।
সকলেতে রত তাতে অন্যের হলে সবাই তাতে,
দেখ না কেন যাতে তাতে কে না প্রেমে কেনা আছে ?

এই গানে লোকনিন্দার প্রতি শুধু উপেক্ষাই নয়, বরং লোকাপবাদেব অন্যায় ও অপবাদের অসংগতির বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত অভিমান ও অনুযোগ রযেছে। নিধুবাবুর গানেও এই সমাজদ্রোহী বিক্ষোভ গুঞ্জরিত হয়েছে—

হউক হে হউক প্রাণ যাউক আমার
খেদ নাহি তাহাতে।
তোমারে পাইলাম যদি কী করে লাজেতে ?
লোকে বলে কলঙ্কিনী হইলে কুলেতে,
আমি বলি এতদিনে আইলাম কুলেতে।

যে প্রেম সমাজবিধির দিক থেকে নিন্দনীয়, প্রেমপাত্রের সঙ্গে যে নিষিদ্ধ সম্পর্কের জন্য নারীর কুলকলঙ্ক অবধারিত, সেই কলঙ্কের মুখের উপর স্পর্ধিত কণ্ঠে 'আমি বলি এতদিনে আইলাম কুলেতে' এই উক্তি কি বিস্ময়কর মনে হয় না ?

৩

প্রেমের সামাজিক বন্ধনভীরুতার কথা বাদ দিলে ব্যক্তিগত সম্পর্কের সূক্ষ্মতাই অধিকাংশ প্রীতিগীতির অভীষ্ট। নরনারীর পারস্পরিক অনুরাগ ও তার বিবিধ দুঃখ দৈন্য সাময়িক বিচ্ছেদের বেদনা কিংবা চিরবিরহের অনিবার্য কাতরতা অজস্র গানের প্রেরণা সঞ্চার করেছে। প্রেমের অন্ধ আকর্ষণের কাছে ধর্মভেদ লুপ্ত হয়ে গেছে, মহারাজ হয়েও মহাতাবচন্দ্রের কণ্ঠে তাই শুনি এই আত্মসমর্পণের গান—

প্রাণ যারে চাহে সদা দোষেতে তারো কি করে
সতত অস্থির প্রাণ না হেরিয়া হয় যারে।
নীচ কিংবা উচ্চজাতি কুৎসিত কি রূপবতী
মন হয় যার প্রতি এ সব নাহি বিচাবে।

গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর পালাভুক্ত সংলাপধর্মী গানগুলি স্বতন্ত্র কাব্য-গীতরূপেই জনপ্রিয় হয়েছিল। সেইগুলি সম্ভবত অপরের বচনা, কিন্তু গোপাল উড়ের নামেই প্রচলিত। এইরূপ একটি গানের ভাষায় অবিস্মৃত প্রেমের স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

ভোলা যায় কি কথার কথা মন যে মনে গাঁথা
শুকাইলে তরুবর ছাড়ে কি জড়িত লতা?
হলে পরে বারিহীন থাকিতে কি পারে মীন,
ছেড়ে কভু নবঘন থাকে কি বিজলী লতা?

প্রেমের গানে নিরপেক্ষ প্রেম অনেকখানি স্থান ব্যাপ্ত কবে আছে। শ্রীধব কথকের নামে প্রসিদ্ধ গান—

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে
আমার স্বভাব এই তোমা বই জানিনে।
বিধুমুখে মধুর হাসি আমি বড ভালবাসি
তাই তোমারে দেখতে আসি দেখা দিতে আসিনে।

আর একজন অজ্ঞাতপরিচয় কবির গানে প্রতিদান-প্রত্যাশাহীনতাকেই প্রেমের লক্ষণ বলে ঘোষণা করা হয়েছে—

ভাল বাস না বাস
আমি তো বাসিব ভাল যাবত জীবন আশ
যথায় তথায় থাকি তোমাবিনে নহি সুখী
বধিলে বধিতে পার রাখিলে তোমার যশ॥

প্রিয়জনের সুখকামনায় কবি নিজের প্রেমকে উজাড় করে দিতে চান—

যদি নাহি ভালবাস   দুঃখ নাহি ভাবি তাহে
সেই মম তুষ্টিকর   তুমি তুষ্ট থাক যাহে ॥

নিরপেক্ষ প্রেম পর্যায়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গীত উল্লেখযোগ্য—

নিতান্ত না রইতে পেরে দেখতে এলেম আপনি
দেখ বা না দেখ আমায় দেখিব ও মুখখানি।
মনে করি আসিব না এমুখ আর দেখাব না
না দেখিলে প্রাণ কাঁদে কেন যে তা নাহি জানি।
এসেছি দিব না ব্যথা তুলিব না কোনো কথা
সাধিব না কাঁদিব না যাব এখনি।
যেথায় আছ সেথায় যাক আর কাছে যাব নাকো,
চোখের দেখা দেখে যাব দেখেই যাব অমনি।

এর পাশে রবীন্দ্রনাথের 'আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে' কিংবা 'আমার পরাণ যাহা চায়' এবং 'আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি' প্রভৃতি গানগুলিকে মনে পড়বে। উনিশ শতকের এই প্রীতিগীতির ঐতিহ্য অধিগ্রহণ করেই একালের শ্রেষ্ঠ কাব্যসংগীতকার রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। প্রীতিগীতি-সংকলয়িতা রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে তাই নিরপেক্ষ প্রেম শিরোনামারই অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

এ পর্যন্ত প্রেমের গানগুলিতে প্রেমপ্রকাশের একটি অনাড়ম্বর নিরলংকার পৌরুষ দেখা গেছে। মনের আবেগকে যথাযথ প্রকাশ করার দিকেই কবির দৃষ্টি, তাই কবিতার বাহ্যরূপের প্রতি কাব্যসংগীতে কিছুটা উদাসীনতা থাকে। টপ্পা জাতীয় গান চার থেকে ছয় চরণের মধ্যে সম্পূর্ণ বলে উচ্ছ্বসিত বাক্‌বিস্তারের সুযোগ এখানে সীমাবদ্ধ এবং সংগীতের বিশিষ্ট আঙ্গিকে শৃঙ্খলিত থাকার জন্য উপমারূপকব্যবহারেও সেকালের কবিরা যথেচ্ছ স্বাধীনতা গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু সুরের সংযোগিতায় হৃদয়ের গভীর বেদনা বা মনোভাবকে তাঁরা বিনা ভূমিকায় সহজভঙ্গিতে অনর্গল করেছেন। প্রথাবদ্ধ রূপক-প্রতীক-চিত্রকল্পের ব্যবহারে কাব্যসংগীতকারদের কুণ্ঠা জাগেনি, কারণ কবিতার পাঠকের চেয়ে গানের শ্রোতা আরও সাধারণ মানুষ, হয়ত বা সাধারণ স্তরের সর্বপ্রকার নরনারীর কাছে সর্বগ্রাহ্য রূপকের মাধ্যমেই মনোবৃত্তি ও মানসভাবনাকে অমোঘ করে তোলা যাবে, এই তাঁদের বিশ্বাস ছিল। তাই বিচ্ছেদ-ঝড়ে প্রেমতরুর অবিচলতা, পিরিতিহীন জীবন ও দীপহীন তিমিরালয়ের অভিন্নত্ব, প্রেমাগ্নির অনির্বাণ শিখা, চাতক-বর্ষার সম্বন্ধে, চাঁদ ও চকোরের রূপক—এই ছিল প্রেম-

গীতিকার সাধারণ ব্যবহৃত রূপক। তারাকুমার কবিরত্ন প্রেমকে মৃগনাভির গন্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন একটি গানে। নিধুবাবু তাঁর প্রেমাস্পদকে মৃগনয়নী বলে সম্বোধন করেছেন। যদুনাথ ঘোষ প্রেমকে এক অমূল্য নিধির সঙ্গে উপমিত করেছেন, যা কলঙ্ককুপিত ফণীশিরে অবস্থিত। যদি কোনো দুঃসাহসী সেই সর্পশির থেকে প্রেমরত্ন হরণ করতে যায় তবে গঞ্জনাগরলে তার জীবন দুর্বিষহ ও বিষময় হয়ে উঠবে, বিচ্ছেদশরে তার প্রাণসংশয় হবে! তবু আশা মহৌষধি, যদি সে বাঁচাতে পারে। এই জাতের জড়িতকল্পনা ক্লিষ্ট রূপকসর্বস্ব আর একটি প্রেমগানের উদাহরণ—

প্রেমনগরে রাই মহাজন তস্য খাতক শ্রীহরি
কস্য কর্জপত্র লিখে দিয়েছেন বংশীধারী।
খৎ দেখালে হবে বা কী ওয়াশিল শূন্য বাকির বাকি,
সম্ভাবন তার আছে বা কী কেবল বাঁশের বাঁশরি।
পরিশোধের কথা আছে দিবে ধড়াচূড়া বেচে
তস্য খতে লেখা আছে ইসাদী অষ্ট মঞ্জরী।

সমকালীন গানের আর একটি বিশেষ প্রবণতা ছিল অনুপ্রাসবাহুল্য, অর্থজটিলতা ও ভাবের কষ্টকল্পনা, শব্দতত্ত্বে গুরুভারতা। প্রবণ্য প্রত্যেকের গানেই কিছু না কিছু ব্যতিক্রম আছে, আবার প্রত্যেকের গানেই এই ধরনের ত্রুটিও প্রায় অনিবার্য। নিধুবাবুর এই গানটি চিত্রাঙ্কনে অভিরাম—

কে ও যায় চাহিতে চাহিতে
ধীর গমন অতি হাসিতে হাসিতে।
যতক্ষণ যায় দেখা না পারি সরিতে
আঁখি মোর অনিমিখ হেরিতে হেরিতে।

একই ভাব কালী মির্জার গানে শব্দতত্ত্বে পরিণত হয়েছে—

অন্তরে অন্তর তারে করিব কেমনে সই
মনে নাহি মনে করে তাহার মন্তর বই।
যদি হয় কথান্তর নাহি হয় মতান্তর
আঁখি ঝুরে নিরন্তর যদি দুরন্তর রই।

তরীর রূপক একাধিক কবির কাছে প্রিয় ছিল, এমন কি রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনায়ও উনিশ শতকীয় প্রেমসংগীতের তরীটি স্বর্ণমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। প্রেমকে তরীর সঙ্গে অভেদ কল্পনা করে বঙ্কিমচন্দ্র একটি প্রেমরূপক কাব্যগীতি রচনা করেছিলেন, বাণীভঙ্গিমায় যা সুললিত—

সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে
কে আছে কাণ্ডারী হেন কে যাইবে সঙ্গে ?
ভাসল তরী সকালবেলা ভাবিলাম এ জলখেলা
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।
এখন, গগনে গরজে ঘন বহে খর সমীরণ
কূল ত্যজি এলেম কেন মরিতে আতঙ্কে ?
মনে করি কূলে ফিরি বাহি তরী ধীরি ধীরি
কূলেতে কণ্টকতরু বেষ্টিত ভুজঙ্গে।
যাহারে কাণ্ডারী করি সাজাইয়া দিনু তরী
সে কভু দিল না পদ তরণীর অঙ্গে।

বঙ্কিমচন্দ্রের আরও একটি গানে এই তরণীপ্রীতি দেখা যায়—

সিন্ধুকূলে রই নূতন তরী বই
পারে তোরা কে যাইবি গো ?
নূতন ডিঙায় নূতন মাঝি
পারে তোরা কে যাইবি গো ?······
ঐ দেখ বয় মধুব মলয়
এই বেলা কে যাইবি গো ?
তুলে দিব পাল না ছাড়িব হাল
সুখের পারে কে যাইবি গো ?······

১৩০০ সালে প্রকাশিত 'গানের বহি'র অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথের এই গানটি ভাষায়, সুরের ভঙ্গিতে ওই পুরাতন প্রেমসংগীতেব আবহকেই মনে করিয়ে দেয়—

ওগো তোরা কে যাবি পারে
আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদীকিনারে।···

গিরিশচন্দ্রের একটি গানেও এই তরীর উৎপ্রেক্ষা ব্যবহৃত হয়েছে—

আমার এই সাধের তরী প্রেমিক বিনে নিইনি কারে
যে প্রেম জানে না চডতে মানা, ডোবে তরী একটু ভারে।···

উনিশ শতকের প্রেমসংগীতে প্রকৃতির কোনো বিশিষ্ট ভূমিকা আমাদের চোখে পড়ে না। বিহারীলালের কাব্যে প্রকৃতিনিসর্গ রোমান্টিক কবির কল্পনায় নিষ্প্রাণ বৃক্ষলতা মাত্র নয়, চেতনাসম্পন্ন মানবপ্রতিবেশী অথবা সখ্যসত্তায় উন্নীত এবং বিহারীলাল-পরবর্তী রোমান্টিক গীতিকবিরা মানব ও ঈশ্বরের মত প্রকৃতিকেও

গীতিকবিতার একটি প্রধান বিষয় করে তুললেন। কিন্তু তথাপি সমকালীন বাঙলা কাব্যসংগীতে প্রকৃতি প্রেমের মত বৃহৎ স্থান অধিকার করেনি, অন্তত রবীন্দ্রনাথের পূর্বে। রবীন্দ্রনাথের গানেই প্রেম ও প্রকৃতি সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের জীবনে ঘনীভূত পটভূমিকারূপে স্থাপিত হয়েছে। তবে পদাবলীর প্রকৃতিচেতনা, বর্ষা ও বসন্তের অতিশয়িত বর্ণনা রোমান্টিক যুগের সংগীতকারদের কিছুটা প্রভাবিত করেছিল। কয়েকজন শিক্ষিত গীতিরচয়িতা ইংরাজি কাব্যের রোমান্টিক পর্বের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। তাই ইউরোপীয় কাব্যের নিসর্গপ্রীতি ও রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি কয়েকটি গানে উঁকি মেরে গেছে। মহাকবি হোমার মানুষের মনোভাব ও অনুভূতির গভীরতার উপমা আহরণ করেছিলেন প্রকৃতির গোপন-থেকে। ফারসি গানে প্রকৃতিবন্দনাকে শোভন করে তুলেছিলেন কবি জামী, ফেরদৌসি, হাফিজ, ওমর খৈয়াম প্রভৃতি কবিরা। উনিশ শতকের কবি ও গীতিকার রাজকৃষ্ণ রায়েব একটি কাব্যসংগীতে প্রকৃতি সম্পর্কে নূতন যুগসচেতন মনোভাব পাওয়া গেল—

প্রেম যদি সই শিখতে হয়   মানুষের কাছে নয়,
সাঁঝের রবি প্রেমেব ছবি   প্রেমের আলো আকাশময়।
ঐ রবি সই প্রেমের খেলা   খেলছে কেমন সাঁঝের বেলা
আধেক আঁধার আধেক আলো   কমলবালা চেয়ে রয়।
দূরে দুজনে তবুও কেমন   প্রাণে প্রেমের তুফান বয়।

নবযৌবনাগমকে তরঙ্গিত কলনাদিনী নদীর সঙ্গে উপমিত করে বঙ্কিমচন্দ্র একটি কাব্যসমৃদ্ধ গান উপহার দিয়েছেন—

এ যৌবনজলতরঙ্গ রোধিবে কে…
জলেতে তুফান হয়েছে
আমার নূতন তরী ভাসল সুখে
মাঝিতে হাল ধরেছে।
ভেঙে বালির বাঁধ পুরাই মনের সাধ
জোয়ার গাঙে জল ছুটেছে,   রাখিবে কে।…

প্রকৃতির পটভূমিকায় জনৈক অজ্ঞাতনামা কবি প্রেমের রোমান্টিক পটক্ষেপণ করেছেন—

জাগি রহে চাঁদ আকাশে যখন   সারাটি রজনী
শ্রান্ত জগৎ ঘুমে অচেতন   সারাটি রজনী ;
অতি ধীরে ধীরে হৃদে কি লাগিয়া

মধুময় ভাব উঠে কি জাগিয়া　　　সারাটি রজনী ;
ঘুমায়ে তোমারে দেখি গো স্বপন　　　সারাটি রজনী ,
জাগিয়া তোমার দেখি গো বদন　　　সারাটি রজনী !
ত্যজিবে যখন দেহ ধূলিময়　　　তখন কি সখি তোমার হৃদয়
আমার ঘুমের শয়ন পরে
ভ্রমিয়া বেড়াবে প্রণয়ভরে　　　সারাটি রজনী !

৪

প্রেমের জন্ম নরনারীর হৃদয়ে এবং প্রেমে মুখ্য ভূমিকা নারীর। উনিশ শতকের অধিকাংশ গানেই স্বাধীনভাবে নারীর স্বতন্ত্র মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে। নাবী সংসারে গৃহলক্ষ্মী, প্রেমে মানসী, কর্মে সুনিপুণা। কোনো কোনো কবি ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা-অপব্যয়কে যেমন নারীনিন্দায় পর্যবসিত করেছেন, তেমনি কেউ কেউ নারীস্তবের মধ্য দিয়েই জীবনেব চরম সার্থকতা প্রচার করেছেন। নারীনিন্দামূলক অনেক গানে পুরুষের বঞ্চনা ও উপেক্ষার দিকটি সুকৌশলে অনুক্ত রয়ে গেছে। সমাজের বৈষম্য ও বন্ধনের নিগড়ে যারা চিরকাল বন্দিনী, সেইসব অন্তঃপুরিকাদের বঞ্চনার ইতিহাস তো পুরুষের অক্ষমতারই ইতিহাস। ভারতচন্দ্রের কাব্যে নারী লাস্যময়ী রঙ্গনটী, বিলাসনিপুণা লীলা-সহচবী। তাঁর বিদ্যা সুন্দরেরই রঙ্গিণী, গৃহস্থ পুববধূ নয়। কিন্তু আত্ম-পরিচয়দানপ্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র আপন স্ত্রীর যে চিত্র এঁকেছেন তা বাস্তবতর্য এবং সমাজানুগ। নারীব স্বৈরাচার স্বেচ্ছাচার ভারতচন্দ্রের কাব্যের উপাদান হলেও আদর্শ সামাজিক নারীর কল্পনাও তিনি বিস্মৃত হননি, এই গানটি তার প্রমাণ—

নয়ন অমৃতনদী সর্বদা চঞ্চল যদি
নিজপতি বিনা কভু অন্য দিকে চায় না।…
অমৃতের ধারা ভাষা পতির শ্রবণে আশা
প্রিয়সখা বিনা কভু অন্য কানে যায় না।
নতি রতি গতি মতি কেবল পতির প্রতি
ক্রোধ হলে মৌনভাব কেহ টের পায় না।

উনিশ শতকের গীতসংকলনে কবিসংগীতকার থেকে রবীন্দ্রপূর্ব গান-রচয়িতাদের নারী সম্পর্কে বিবিধ মনোভাবের পরিচয় কৌতূহলপ্রদ। কবি-সংগীতের যুগে নারী হঠাৎবাবু নাগরিক সমাজের মনোরঞ্জনের পাত্রী, পণ্যদ্রব

বিশেষ। আবার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক জাগরণ ও সমাজ-আন্দোলনের পর্ব থেকে নারী পুরুষের সমানাধিকারে ও স্বাধীন ব্যক্তিত্বের দাবিতে সাহিত্যের অন্তর্ভূত ও নূতন মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত। অবশ্য নবস্ফুট ব্যক্তিত্ব নারীকে স্বাধীন নির্বাচনে স্বেচ্ছাবৃত প্রেমার্ত মনোনয়নের দ্বারা গ্রহণেও পুরোপুরি সামাজিক সমর্থন পায়নি। কারণ স্বাধীন নির্বাচন ও প্রেম সামাজিক সংস্কারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেনি। সুতরাং এই জটিল পরস্পরবিরোধী অবস্থার মধ্যে বাঙলা কাব্যসংগীতে নারী কখনো প্রশংসার স্বর্ণাঙ্গুরীয় পরেছে, কখনো ভর্ৎসনার কলঙ্কটীকা এঁকেছে ললাটে। তবু নারী যে উপেক্ষণীয় নয়, বাঙলা সংগীত-নাটক-কাব্য-উপন্যাসে তার ভূমিকা যে ক্রমবর্ধমান, ইতিহাস তার সমর্থন জানাবে। দীননাথ ধর একটি গানে সংসারজীবনে নারীকেই শান্তি ও সান্ত্বনার আশ্রয়রূপে ঘোষণা করেছেন—

রোগশোকভরা ধরাতে কী দুঃখ কভু ধরিত ?
রমণী মহৌষধি যদি না থাকিত।
কী করে রোগযাতনা আপদবিপদ নানা
প্রেমময়ী নারী যদি বামে হয় বিরাজিত।
সে কি শোকানলে ডরে যেবা সদা হৃদে ধরে
মমতাগঠিত নারী স্নেহপূরিত।
দীনতা কী করে তার ? আঁধার কুটিরে যার
লক্ষ্মীরূপা নারীরত্ন অযত্নেতে শোভিত।
এ জীবন মোরমরু বিনে এই সুখতরু
জানি না এ দগ্ধচিত কোথা আব জুড়াইত।
ভাবের উদ্বেগ এত না জানি কোথায় রহিত
নারী-বিধুমুখ যদি নাহি তাহে উদিত।

অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পিতা গঙ্গাচরণ সরকারের একটি নারী-নৈবেদ্যসংগীত—

রমণি তোমার গুণে সুখময় এ সংসার
জগৎমোহিনী তুমি জগতের অলংকার।
তুমি যদি এ জগতে বিধুমুখে না হাসিতে
শশীশূন্য নিশিসম হত সব অন্ধকার।
তুমি ধনি যেই নরে নাহি হের প্রেমভরে
নরপতি হয় যদি বৃথাই জনম তার।

রাজকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত আর একটি নারীস্তুতিগীতি—

সার নারী ভুবনে রমণীরতন
ছার জীবন বিনে সে ধন।
শরম-মাখানো হেরিলে সরল নয়ন,
নাহি আর সম্পদে থাকে আকিঞ্চন,
জগজনশিরোভূষণ···
নারী সব সুখনিদান।

নারীত্বের সার্থকতা বিহারীলালের গানে আরও স্পষ্টভাষায় উদ্‌গীত হয়েছে। বিহারীলালের রোমান্টিক গীতিকবিকল্পনায় কাব্যলক্ষ্মী ও কবিমানসী যেমন এক হয়ে গেছে, তাঁর সংগীতকল্পনায়ও মানসী এবং গৃহলক্ষ্মী, উর্বশী ও নারায়ণী এক হয়ে গেছেন। সারদামঙ্গলের এই গীতটি তার উদাহরণ—

কী মধুর মনোহর মূরতি তোমার।
সদা যেন হাসিতেছে আলয় আমার!
সদা যেন ঘরে ঘরে / কমলা বিরাজ করে,
ঘরে ঘরে দেববীণা বাজে সারদার।
মরুময় ধরাতল তুমি শুভ শতদল,
করিতেছ ঢলঢল সম্মুখে আমার!
ক্ষুধাতৃষ্ণা দূরে রাখি / ভোর হয়ে বসে থাকি,
নয়ন পরাণ ভরে দেখি অনিবার!
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী, / আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোক গে এ বসুমতী যার খুশি তার!

কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনভুক্ত ধনতান্ত্রিক সমাজে এই দৃষ্টি অবশ্যই আদর্শ-বাদীর, সত্যকার বাস্তবানুগ দৃষ্টি হল নারীর পণ্যমূল্যনিরূপণে। সমাজে নারীকে নিয়ে ব্যবসা আঠারো-উনিশ শতকে বেশ তীব্র হয়ে উঠেছিল, সেকালের নকশা-প্রহসন-আলাল-হুতোমে তার ছবি আছে। কবিসংগীতের রাধা সেই সমাজের নির্যাতিত রমণীর ম্লান পাণ্ডুর নায়িকা। রাম বসুর গানে অভিজাত সমাজের নারীঘটিত মনোভাবই প্রতিফলিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে—

নারী মিলতে যেমন ভুলাতে তেমন
দুই দিকে তৎপর
মজায়ে পরে চায় না ফিরে আপনি হয় অন্তর।

তাই নারীপ্রশংসার উদারতাকে আচ্ছন্ন করে রাম বসুর নারীনিন্দা কবির

অনড় বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে—'আর নারীরে করিনে প্রত্যয়, নারীর নাইকো কিছু ধর্মভয়'। যদুনাথ ঘোষের কণ্ঠে আরও তিক্ততা—

বল না ললনা কেন কর এত ছলনা লো
পরের কথা বলতে পার আপনার কথা বল না লো।
চভুবে ভুলাতে পার পাথরে গলাতে পার
মুনির মন টলাতে পার কিন্তু তুমি টল না লো!

আর একটি গানে তিনি বলেছেন—

গুণ কী আছে বল রমণী ডাকিনীকুলে
অনুকূলের অবাধ্য হল পরিণত প্রতিকূলে।
বিবাদেব মূলাধার কিছু নাহি সুবিচাব
পদানত হলে তাব মনের কথা কয় না ভুলে।

অজ্ঞাতনামা জনৈক কবিব কণ্ঠে—

কে বলে সরলা নারী চাতুরী তাব সমুদায়
মর্মভেদী কর্ম করে ধর্মপথ নাহি চায়।…

বিশিষ্ট গীতিকার রাধামোহন সেন আক্ষেপ করেছেন এই বলে—

পুরুষ যেমন পারে নারী কি তেমন
সদা এক সনে নহে প্রাণ প্রেম আলাপন।
নিদর্শন অলিকূলে নাহি বসে এক ফুলে
নবপ্রেম নিতি নিতি নূতন যতন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষরচিত গান—

রমণীব মুখের হাসি গরলরাশি সুধা ক্ষরে
সে হাসি প্রেমের ফাঁসি সাধ করে প্রাণ গলায় পরে।…

ছলনাময়ী নারীর চিরন্তন চলচ্চিত্ততা সাহিত্যে নতুন কথা নয়, 'Frailty, thy name is woman'—এই সুরেই এইগুলি বাঁধা। কিন্তু নারীর ভালবাসার মূল্যবোধও এই পর্বেই নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই পুরুষের বঞ্চনার কথাও এই যুগের গীতিকাররা উপেক্ষা করেননি। নারীর তুলনায় পুরুষের চারিত্রিক দুর্বলতার কথা প্রাগুক্ত যদুনাথ ঘোষেব ভাষাতেও স্বীকৃত হয়েছে—

ভালবাসা হলে কি আর ভোলা যায় প্রাণসজনি?
পুরুষে ভুলিতে পারে ভুলে না রমণী।
অবলা সরলা অতি পুরুষ পাষাণমতি
গোপনে করে পিরিতি মজায় কুলের কামিনী।

এ যেন শেক্‌স্‌পিয়ারের 'মাচ্‌ এ্যাডু এ্যাবাউট নাথিং' নাটকের গানের ভাষা—

Sigh no more Ladies, sigh no more,
Men were deceivers ever,
One foot in sea and one on shore
To one thing constant never.

উনিশ শতকের কাব্যসংগীতের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ মনের স্বাধীনতা, চিত্তস্বেচ্ছাচারিতা, ব্যক্তিত্বের স্বাধীন স্ফুরণ। তাই 'মন' 'প্রাণ' প্রভৃতি শব্দের প্রভূত ব্যবহার মনের নিষেধহীন আচরণকেই নির্দেশিত করে। এই 'মন' অবশ্যই আধুনিক মানুষের মন। এই মনের জন্যই বিহারীলালের আবির্ভাবের পূর্বেই বাঙলা কাব্যসংগীতে গীতিকবিতার মন্ময়তার সঞ্চার ঘটেছে। নিধুবাবুর গানেই প্রথম এই বারণহীন মনের মানচিত্রটি পাই—

মিছে অনুযোগ সই লো করিছ কী কারণে
কি করিতে পারে মন মত্ত বারণে বারণে।
আমার বশ এখন নহে সে দুরন্ত মন
বুঝালে সে নাহি বুঝে তারে পারিবে কেমনে ?

আপনার নৈয়ায়িক ও নৈতিক অনুশাসন থেকে ভালবাসার হাওয়ায় হারিয়ে-যাওয়া মনের গান নিধুবাবুর 'মনঃপুর হতে আমার হারায়েছে মন' বাঙলা কাব্যসংগীতের একটি উৎকৃষ্ট রচনা। এই গানটি সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রেমনিবেদনের অকৃত্রিম সারল্যে, প্রকাশভঙ্গির স্বাভাবিক আন্তরিকতায় সে যুগের শ্রেষ্ঠ প্রণয়গীতকার নিধুবাবু। নিধুবাবুর প্রেমসংগীতগুলির পশ্চাতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কোনো ছায়াপাত থাকুক বা না থাকুক নিধুবাবুর গান তখনকার জনমন হরণ করে নিয়েছিল, প্রেমপ্রবণ যুবচেতনা বিশেষ করে নিধুবাবুর গানে প্রকাশের বাণী লাভ করেছিল। সেকালের সমালোচকের ভাষায় 'প্রেমের বিষয় যাহা কিছু বলিবার আছে নিধুবাবু তাহা প্রায় বলিতে বাকি রাখেন নাই'[৬]—অত্যন্ত সত্য। হয়ত সূক্ষ্ম রুচিবিলাসিত মার্জিত চোখে সেগুলির অকুণ্ঠ প্রকাশভঙ্গি পীড়া দিতে পারে, কিন্তু—

মনেতে বুঝিয়া দেখ না দেখিয়া তব মুখ
রহা যাবে কেন প্রাণ ?
দেখ না, কাঁদিতে হয় হলে অদর্শন,

দরশনে পুলকিত প্রফুল্ল বদন।
সকল রতন হতে মন তুমিও তা জান।

দেখা-না দেখায়-মেশা বিদ্যুল্লতা নায়িকার এই রোমান্টিক মূর্তি সেদিন অভিনব ছিল।

৫

সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য থেকে সুরু করে জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস অতিক্রম করে, আধুনিক কাল পর্যন্ত এলে দেখা যাবে পূর্বরাগ প্রেমগীতিকার একটি অভিন্ন অংশ, উনিশ শতকের গানেও তার ব্যতিক্রম নেই। প্রীতিগীতি গ্রন্থে পূর্বরাগ নামে একটি শ্রেণী থাকলেও অন্যান্য বহু শ্রেণীগত গানকেও বস্তুত পূর্বরাগ-বিষয়ক বলে চিহ্নিত করা যায়। নিধুবাবু, হরু ঠাকুর, রাম বসু, কালী মির্জা, কালিদাস গাঙ্গুলি, শিবচন্দ্র রায়, আশুতোষ দেব, জগন্নাথপ্রসাদ বসুমল্লিক, শ্রীধর কথক, যদুনাথ ঘোষ, দীনবন্ধু মিত্র, যদুনাথ সর্বাধিকারী, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, গিরিশচন্দ্র কুণ্ডু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, হরিমোহন রায়, রামচন্দ্র চক্রবর্তী—পূর্বরাগের কবিসংখ্যা অনেক। তবে এই শ্রেণীর অনেকগুলি গান প্রধানত গতানুগতিক, পদাবলীর অনুচিকীর্ষাক্লিষ্ট। এগুলির মধ্যে ধারাবাহিকতা যতটা আছে, কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির স্পর্শ ততটা নেই। পদাবলীর পূর্বরাগ বৈষ্ণবধর্মের গূঢ় আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ ছিল, কিন্তু আধুনিক কালের পূর্বরাগ অধ্যাত্মস্পর্শবিরহিত রূপবাসনা মাত্র। পূর্বরাগ যেখানে একপক্ষের রূপব্যাকুলতায় অন্যপক্ষের নিরাসক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানে কোনো সামাজিক মূল্য নেই। কারণ উভয়পক্ষের স্বীকৃতিব্যতীত প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। উভয়পক্ষের স্বীকৃতি থাকলে তাকে আবার ঠিক পূর্বরাগ বলারও অর্থ নেই। তৎসত্ত্বেও আমাদের প্রেমসংগীতে পূর্বরাগের স্থান আছে। নিছক কাব্যরীতি হিসাবে রবীন্দ্রনাথও পূর্বরাগের গান রচনা করেছেন। নিধুবাবুর একটি গানে পূর্বরাগের নায়িকা যেন কবির অন্তর্নিবাসিনীর বহিঃপ্রকাশরূপে দেখা দিয়েছে—

ধীরে ধীরে দেখ চায় ফিরে ফিরে
কেমনে আমারে বল যাইতে ঘরে।
যে ছিল অন্তরে মোর বাহ্যে দেখি তারে
নয়ন অন্তর হলে পুনঃ সে অন্তরে।

পদাবলীর পূর্বরাগ জগন্নাথপ্রসাদ বসুমল্লিকের একটি পদে নূতন বাক্স্পন্দে ছন্দোসংগীতে মনোরম হয়ে উঠেছে—

আঁখির মিলনে সখি	বল দেখি একি রঙ্গ
আলসে অবশ হলে	তবু নাহি অঙ্গসঙ্গ।
বিধুমুখ তরতর	হৃদিপদ্ম থরথর।
প্রেমনীর ঝরঝর	স্থির নয়ন কুরঙ্গ।
ভাবভরে গরগর	প্রেমজ্বরে জরজর
স্মরশরে দরদর	নাচিছে ভুজঙ্গভুজঙ্গ।
গদগদ প্রেমভরে	ডগমগ রসতরে
মুখে স্বর না নিঃসরে	প্রায় পিঞ্জরবিহঙ্গ।

শ্রীধর কথকের রচনায় গতানুগতিকতা থাকলেও অল্পকথায় আধুনিক নায়িকার আশাহীন পূর্বরাগের ছবিটি পাই—

আর তো যাব না লো সই যমুনারই কূলে
ভরিয়ে এনেছি কুম্ভ নয়নসলিলে।
যে হেরিলাম রূপ তার গৃহে আসা হল ভার
নাম নাহি জানি তার সে থাকে গোকুলে।

গিরিশচন্দ্রের দু-একটি গানে স্নিগ্ধতা ও লাবণ্য আছে, অন্যান্য গান প্রথাবদ্ধ। একটি নামহারা কবির গানের জনপ্রিয় দুই পংক্তি—

কী দিব কী দিব রে প্রাণ মনে করি আমি
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন আমার তুমি।

কয়েকটি প্রেমের গানের রূপবর্ণনা, বিশেষত নারীরূপবর্ণনার ভাষা নিতান্ত গতানুগতিক, শাস্ত্রীয় রূপবর্ণনার পৌনঃপুনিকতায় পূর্ণ। এরই মধ্যে একটি পদে আশুতোষ দেব নারীর রূপকে সরোবরের সঙ্গে তুলনা করেছেন—

অনুপম সরোবর তুমি হে তরুণী
সৃজিল কোথায় বসি বিধি কে বাখানি।
কণ্টকময় মৃণাল তব বাহু সুকোমল
জলজে কিঞ্চিৎ মধু প্রচুর ও বদনে ধনি।
অমল লাবণ্য নীরে সোপান নিতম্ববর
চঞ্চল আঁখি সফর কুন্তল শৈবাল জিনি।

প্রীতিগীতির এই বিপুল সৃষ্টি ও কবিসংখ্যা থেকে সহজেই প্রমাণিত হয় উনিশ শতকের বাঙলা দেশে রোমান্টিক কাব্যসংগীত কী বিপুল বিস্তার ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এঁদের মধ্যে নিধুবাবুর দানই যে অগ্রগণ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নিধুবাবুর পরবর্তী কবিদের মধ্যে শ্রীধর, হরু ঠাকুর, কালী

মির্জার ভূমিকাও প্রেমসংগীতের ইতিহাসে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। হারাণচন্দ্র রক্ষিত তাঁর 'ভিক্টোরীয় যুগের বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থে মন্তব্য করেছিলেন—

"স্ত্রীপুরুষের বিরহমিলন পূর্বরাগ প্রভৃতির মানঅভিমানের সূক্ষ্ম হৃদয়কথা লইয়া সংগীতরচনা,—এবং সে সংগীতে বিশেষ গুণপনাপ্রকাশ, বোধহয় এই প্রথম। অধিক কি, আজিও—বঙ্গসাহিত্যের এই বর্তমান যুগেও, এক শ্রীধর কথক ব্যতীত নিধুর টপ্পার সহিত কাহারো তুলনাও হইতে পারে না।...আজিও কেহ রবীন্দ্র-গিরিশ বা বঙ্কিমের কোনো বিরহগীত গাহিলে নিধুকেই মনে পড়ে।" (১৪৩ পৃঃ)

কবিসংগীতের মধ্য দিয়েই প্রেমের প্রসঙ্গ বাঙলা গানে প্রথম প্রবেশ করেছিল এবং নিধুবাবুই সর্বপ্রথম কবিসংগীতের অন্যান্য অনুষঙ্গ বাদ দিয়ে কেবল বিশুদ্ধ ব্যক্তিপ্রণয়ের রীতিতে প্রেমগীত রচনা করেছিলেন। কবিগানে রাধাকৃষ্ণের নাম আরোপিত হলেও প্রেমের ভূমিকা যে রাধাকৃষ্ণনিরপেক্ষ হয়ে উঠেছিল, রাসু-নৃসিংহের নামে প্রচলিত এই পদাংশ তার প্রমাণ—

বিরহ

কহ সখি কিছু প্রেমেরই কথা
ঘুচাও আমার মনের ব্যথা,
করিলে শ্রবণ হয় দিব্যজ্ঞান
হেন প্রেমধন উপজে কোথা।

কবিসংগীতের এই 'বিরহ' পদাবলীর অপভ্রংশ মাত্র নয়, এই বিরহ আধুনিক নাগরিক মনের প্রণয়ব্যর্থতা, সামাজিক চিত্তবৃত্তি বিশেষ। রাম বসুর বিরহ 'এক সময়ে সর্বত্র গীত হইত'। রাম বসুর একটি সুবিখ্যাত বিবহপদ উদ্ধৃত করলেই দেখা যাবে এই বিরহ বস্তুত বিদেশযাত্রার অদর্শনজনিত মাথুরবিরহ নয়, সামাজিক বা অন্য কোনো কারণে নায়ক-নায়িকার মিলনের ব্যর্থতা ও তজ্জনিত আক্ষেপ মাত্র—

দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ বদন ঢেকে যেও না,
তোমায় ভালবাসি তাই চোখের দেখা দেখতে চাই.
কিছু কাল থাক থাক বলে ধরে রাখব না।
শুধু দেখা দিলে তোমার মান যাবে না,
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভাল,
গেল গেল বিচ্ছেদে প্রাণ আমারই গেল,

তোমার পরের প্রতি নির্ভর আমি তো ভাবিনে পর,
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না।
কথা কও একবার কথা কও, তোল ও বিধুবদন,
পিরিতি ভেঙেছে ভেঙেছে তায় লজ্জা কী ?
এমন তো প্রেম ভাঙাভাঙি অনেকের দেখি
আমাব কপালে নাই সুখ, বিধাতা হল বিমুখ
আমি সাগর সেঁচেও মাণিক পেলাম না।[৭]

বিরহ-সংগীতরচনায় রাম বসু নিধুবাবু বা শ্রীধর কথক যে যথার্থই পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। প্রেমের অনিবার্য ফলশ্রুতি যে বিরহ, সমাজের এই নির্মম নিয়তি মেনে নিয়েই উনিশ শতকে কবিরা বিরহকে কাব্য-গৌরবমণ্ডিত কবেছিলেন। সেই গৌববায়িত বিরহের একটি অমব কাব্যগীত নিধুবাবুর রচনা বলে পরিচিত—

তবে প্রেমে কী সুখ হত
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিত।
প্রেমসাগবের জল, হইত যদি শীতল,
বিচ্ছেদ-বাড়বানল যদি তাহে না থাকিত ?
কিংশুক পুষ্প সুঘ্রাণে কেতকী কণ্টকহীনে
ফুল ফুটিত চন্দনে ইক্ষুতে ফল ফলিত ?[৮]

রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের ছদ্মবেশে লৌকিক প্রেমচেতনাই যে কবিগানের সর্বাঙ্গে প্রবেশ করেছিল, হরু ঠাকুবরচিত একটি গানে তাব উদাহরণ—

চিতেন। সই হেরি ধাবাপথ থাকয়ে যেমতি তৃষিত চাতকজনা
আমি সেইমত হয়ে আছি পথ চেয়ে মানসে কবি সেরূপ ভাবনা।
অন্তরা। হায় কী হবে সজনি যায় যে রজনী কেন চক্রপাণি এখনো
না এলো এ কুঞ্জে কোথা সুখ ভুঞ্জে রহিল না জানি কারণও।
পরচিতেন। বিগলিত পত্রে চমকিত চিত্তে হোতেছে, স্থির মানে না।
যেন এল এল হরি হেন জ্ঞান করি না এল মুরারি পাই যাতনা।
অন্তরা। সই রবিকিরণেব প্রায় হিমকব এ তনু আমারো দহিছে
শিখিপিকবর অঙ্গে মোর সব বজ্রাঘাতসম বাজিছে।
পরচিতেন। সই করিয়ে সংকেত করি কেন এত করিলেকো প্রবঞ্চনা
আমি বরঞ্চ গরল ভকি সেও ভাল কি ফল বিফলে কালযাপনা।

অন্তরা। সই দেখ নিজ করে প্রাণপণ করে গাঁথিলাম এ কুসুমহার
একি নিরানন্দ বিনে সে গোবিন্দ হেনমালা গলে দিব কার।

পদাবলীর অনুষঙ্গ, জয়দেবের ধ্বনি সত্ত্বেও এই গানের বাণী অস্ফুট গীতিকাব্যের ঝংকার বহন করে আছে। এর লৌকিক উপমাপ্রয়োগ, বিস্ময়কর ষণ্মাত্রিক ধ্বনিপ্রধান ছন্দ (যার প্রয়োগ বিহারীলালের পূর্বে আশ্চর্যজনক-তো বটেই), আধ্যাত্মিকতাহীন তত্ত্ববিমুক্ত মানবিক আবেদন, সাধারণ নারীর প্রণয়াতুরতাই একে বৈষ্ণব কবিতা থেকে আধুনিক মানুষের জীবনবেদে প্রতিষ্ঠিত করেছে। উদ্ধৃত পদের শেষ চরণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে' (কড়ি ও কোমল) গানের এই চরণদ্বয়ের সাদৃশ্য সহজ-লক্ষণীয়—

আমি যদি গাঁথি গান অথির পরাণ সে গান শুনাব কারে আর
আমি যদি গাঁথি মালা লয়ে ফুলডালা কাহারে পরাব ফুলহার।

৬

উনিশ শতকের প্রেমসংগীতগুলি তাই আধুনিক সমাজের ব্যক্তিতান্ত্রিক মানুষের হৃদয় অরণ্যের আলোছায়া, যার ছবি অষ্টাদশ শতকের সাহিত্যে ছিল না। এই প্রথম সমাজবদ্ধ মানুষের চিত্তগহ্বর থেকে একক প্রাণের ক্রন্দন শোনা গেল, এই প্রথম কবির যৌবনস্বপ্নে বিশ্বের আকাশ-বাতাস মর্মাতুর হয়ে উঠল। নিধুবাবু থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙলা কাব্যসংগীতের যে বিপুল অংশ প্রীতিগীতি নামে চিহ্নিত হয়ে জনহীন নির্দিষ্ট দ্বীপের মত প্রাচীন সাহিত্যের জীর্ণ পৃষ্ঠায় আত্মগুপ্ত হয়ে আছে, সেইগুলি আমাদের সাহিত্যের এক অলিখিত অধ্যায়ের দুর্মূল্য নথিপত্র। সাহিত্যের ইতিহাসে কাব্যসংগীতের আলোচনা এ পর্যন্ত বর্জিত অথবা অবহেলিত হয়েছে, কিন্তু গীতিকাব্যের তুলনায় কাব্যসংগীতের উপযোগিতা কম নয়। একটি বিদেশী সংগীতসংকলনের সংকলয়িতার ভাষা উদ্ধার করে বলা যায়—

The history of nations is embalmed in their ballads, the records of humanity's emotional development live in its songs. From its literature a people learns and confirms its character, and from his lyrics a poet listens only to the throbbing of his own heart.[১]

আধুনিক বঙ্গের দীক্ষাগুরু রামমোহনের আবির্ভাবের পূর্বেই নিধুবাবুর প্রেমসংগীত, কবিওয়ালাদের সখীসংবাদ-বিরহ, শ্রীধর কথকের প্রেমকবিতা

নাগরিক সমাজের নিকট সুপরিচিত হয়েছিল। এই প্রেমসংগীতের উত্তরাধিকারেই উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশকে বিহারীলালের আবির্ভাব ঘটেছে, এই প্রীতিগীতির ধারাতেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা। ভাবতে অবাক লাগে, রোমান্টিক গীতিকবিতা শব্দটির সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় কত পূর্বে নিধুবাবু গেয়েছিলেন—

তুমি কি জানিবে আমার মন
মন আপনারে আপনি জানে না।

দুর্জ্ঞেয় মনের এই রহস্যনিকেতনে বাঙলা কাব্যকে নিধুবাবুই প্রথম আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যখন বিহারীলাল সম্পর্কে লেখেন —'ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না—কিন্তু আমি সেই প্রথম বাঙলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম'—তখন সেই ইতিহাসের যুক্তিতেই কবির 'নিজের সুর' শোনাবাব কবিহিসাবে নিধুবাবুর নাম বিহারীলালের পূর্বেই স্থাপন করতে হয়। ববং বিহারীলাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তিগুলিকেই রামনিধি গুপ্ত সম্পর্কে নূতন করে প্রয়োগ করার প্রলোভন জাগে। নিধুবাবু যখন টপ্পার সুরে গীতিকবিতা বচনা করে চলেছিলেন তখনও, সেই প্রত্যুষেও, অধিক লোক জাগেনি, সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কূজিত হয়ে ওঠেনি। সেই উষালোকে নিধুবাবুই যথার্থ 'ভোরের পাখি'। তিনিও 'যুদ্ধবর্ণনাসংকুল মহাকাব্য' লেখেননি, 'উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা' বা 'পৌরাণিক উপাখ্যান' রচনা করেননি, তিনিও যথার্থই 'নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন'। একথা ঠিক রোমান্টিকতার সার্বভৌম লক্ষণগুলি বিহারীলালে যেমন, নিধুবাবুর গানে সেইরকম করে ফুটে ওঠেনি। নিসর্গবিশ্বের জন্য ব্যাকুলতা, অসীমের দুরাকাঙ্ক্ষা, বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের তৃষ্ণা, দূরবর্তী সুখেব জন্য লুব্ধকামনা, 'অসীম স্বাধীনতার জন্য অভ্রভেদী ক্রন্দন', ছন্দোসংগীত, ইত্যাদি যে অপরূপ শব্দগুলি রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের কবিত্ব ও কবিধর্ম সম্পর্কে প্রয়োগ করেছেন, নিধুবাবুর ক্ষেত্রে সেইগুলি প্রতিহত হয়ে আসবে। কিন্তু প্রেমের সূক্ষ্ম বেদনা, নরনারার ভালবাসার অন্তহীন ব্যাকুলতা ও বিরহের আত্মবশ্যতাবিহীন চিত্তের দুর্জ্ঞেয় রহস্য, নারীর প্রেয়সী মূর্তির অন্তরালে চিররহস্যময়ীব অনুভব— এই সব দিক থেকে নিধুবাবুর গানগুলির বক্তব্য কোনোমতেই প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের অনুবৃত্তি নয়, নূতন কালের কণ্ঠস্বর মাত্র।

উনিশ শতকের কাব্যসংগীতকারগণ সকলেই প্রেমের গানে তাই নিধুবাবুর উত্তরসাধক। রোমান্টিক কবির পূর্বসংস্কারবশত নিধুবাবুই প্রথম ঘোষণা করেছিলেন—

তবে প্রেমে কী সুখ হত
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিত ?

এই অনিবার্য বিরহচেতনা থেকেই কবিগানের ছদ্মবেশে রাম বসু আধুনিক ব্যক্তিমনের বিরহবিষাদকে ভাষা দিয়েছেন। রাম বসুর 'বিরহ'-গানের জনপ্রিয়তা বোধ হয় অনেকখানি সেইকারণেই। এই বিরহকেই প্রকাশ করলেন শ্রীধর কথক—

যাবত জীবন রবে কারেও ভালবাসিব না
ভালবেসে এই হল, ভালবাসা কী লাঞ্ছনা।
আমি ভালবাসি যারে সে কভু ভাবে না মোরে
তবে কেন তারই তরে নিয়ত পাই এ যন্ত্রণা।
ভালবাসা ভুলে যাব মনেরে বুঝাইব
পৃথিবীতে আর যেন কেউ কারেও ভালবাসে না।

কী গভীর আত্মবৈকল্যে, হৃদয়ব্যাকুলতায়, প্রেমের কস্তুরীগন্ধলুব্ধ হরিণীর মত আরণ্য-দিকভ্রান্তিতে একালের প্রথম গীতিকবির এই রক্তনিভ ক্ষতবক্ষ কাব্যসংগীত উৎসারিত হয়েছে—

মনঃপুর হতে আমার হারায়েছে মন
কাহারে কহিব কারে দোষ দিব নিলে কোন জন ?
না বলে কেমনে রব বলে বল কী করিব
তোমা বিনে আর সেখানে কাহার গমনাগমন ?
অন্যের অগমনীয় স্থান সে স্থান নিশ্চয়
ইথে অনুমান এই হয় প্রাণ তুমি সে কারণ।
যদি তাহে থাকে ফল লয়েছ করেছ ভাল
নাহি চাহি আমি যদি প্রাণ, তুমি করহ যতন। (নিধুবাবু)

বাঙলা কবিতায় মনের এই একেশ্বর সর্বাধিনায়কত্ব-প্রতিষ্ঠাতেই নিধুবাবুর চূড়ান্ত আধুনিকতা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি তাঁর প্রেমিকার কাছে এই বলে আত্মসমর্পণ করেছেন—

আর কি দিব তোমারে সঁপিয়াছি মন
মনের অধিক আর কী আছে রতন।
ইহার অধিক আর থাকে যদি জ্ঞান
তাহা দিতে নহি আমি কাতর কখন।

মধুসূদন নিধুবাবুর অর্ধশতাব্দী পরে বাঙলা কাব্যসাহিত্যে আবির্ভূত হয়ে

ঘোষণা করেছিলেন, 'যে যাহারে ভালবাসে সে যাইবে তার পাশে'। একালের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পক্ষ থেকে উচ্চারিত এই বাণীকে আধুনিক সাহিত্যের অভ্রান্ত দিগ্‌দর্শনীরূপে গণ্য করা হয়। ভালবাসার তীব্রতাই স্বেচ্ছানির্বাচিত প্রণয়ভাজনকে আপনার নিকটবর্তী করে তোলে, ব্যক্তির প্রেমের ঐকান্তিকতাই সর্ববন্ধন মোচন করে, এই বিদ্রোহী ঘোষণা কিন্তু আমরা নিধুবাবুর গানেই প্রথম ধ্বনিত হতে শুনি। তিনিই প্রথম মানব-প্রণয়কে গৌরবান্বিত করে গেয়েছেন—

যে যারে ভালবাসে সে তারে ভালবাসে না কে বলে,
তার সাক্ষী চাতকিনী তৃষ্ণায় ব্যাকুল
নীরদ যেমন তোষে ধারাজলে।

কেবল প্রেমের বিষন্নপরিণাম নৈরাশ্যই নয়, আত্মিক বলের অনিবার্য আশাবাদও নিধুবাবুর প্রেমের গানে শুনতে পাওয়া যায়। প্রেমিকের আত্মদানকে তিনি প্রণয়ের গৌববরৃদ্ধি বলে ঘোষণা করেছেন—

মনের যে আশা যদি তাহা না পূরিত
তবে কি পরাণ কেহ রাখিতে পারিত?
দেখ না চাতকী ঘন, দিবানিশি করে ধ্যান,
বারিদানে তোষে তারে না রাখে তৃষিত।
তার সাক্ষী প্রদীপ পতঙ্গআশ্রিত,
হইবে আগেতে দেখ হয় প্রজ্বলিত
তার আশা পুরাইতে পতঙ্গ পুলকচিতে
আপনি জ্বালায় তাতে রাখিতে পিরীত।

এই কারণে নিধুবাবুর অসংখ্য গীতের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম অদৃশ্য কিন্তু অনুভববেদ্য ভাবসূত্র আছে। সেইগুলি একই প্রেমিকচিত্ততাপে কবোষ্ণ, একই মানসপ্রিয়ার নামে উৎসর্গিত। মানবহৃদয়ের বিচিত্র বৃত্তি ও মানাভিমান, মিলনবিরহ ও রূপব্যাকুলতা, সুখদুঃখ-হাসিকান্নার শতধারায় সেই কবিপ্রিয়াই যেন এই সংগীতগুলিকে উচ্ছ্বসিত করে তুলেছে। কখনো আন্দোলনযুক্ত উদাস টপ্পার সুরে নিঃসীম রূপব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে—

তারে ভুলিব কেমনে
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপন জেনে।
আর কি সে রূপ ভুলি প্রেমতুলি করে তুলি
হৃদয়ে রেখেছি লিখে অতি যতনে।...
সে দিন ভুলিব তারে যে দিনে লবে শমনে।

আমৃত্যু-উদাসিনী প্রেমিকার বিরহস্মৃতিদীপ বক্ষোদেউলে বহন করার এই নিবিড় প্রতিজ্ঞা নিঃসন্দেহে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের নায়ক সুন্দর বিদ্যার জন্যও করতে পারত না। কিন্তু এই রূপব্যাকুলতা আধুনিক কবির সৌন্দর্যচেতনা থেকে উৎসারিত বলেই হরিশ্চন্দ্র মিত্রের গানে পাই—

ভুলিব তারে কেমনে
রয়েছে বিম্বিত হয়ে যে জন দর্পণে।
আমি ভাবি আর তারে ভাবিব না বারে বারে
তবু মন অনুক্ষণ ভাবে শুধু সেই জনে।
মন নয় মনের মত সে হল পরানুগত,
বুঝাই যত অবিরত, মন তাহা নাহি মানে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুরূপ গান মনে পড়ে—

না জানি কী গুণ ধরে মুখখানি তোমার
যত দেখি তত সাধ দেখিতে আবার।
একদৃষ্টে চেয়ে রই মনে মনে হারা হই,
তবুও পলক নাহি নয়নে আমার।

প্রিয়জনের প্রতি ব্যবহারে মনের অবাধ্য দুবোধ আচরণের কথা নিধুবাবুর অনেকগুলি গানের বিষয়। যেমন, একটি গানে তিনি গেয়েছেন—

আমি কী করিব সই শুন আমার মন-বারণ শুনে না বারণ
এত যে জলয় তবু না বুঝে বুঝালে নীত, বিপরীত করে জ্ঞান।

ছন্দোভ্রষ্ট শিথিলবাক্ এই চরণদুটি সুরের পাখায় ভর দিয়ে মনের দুর্জ্ঞেয়তার কথা কী আকুল হাহাকারে জানিয়ে দেয়। প্রেমের অবিস্মরণীয়তার কথা এমন করে কে এর আগে ঘোষণা করেছেন—

তাহারে কি ভুলিতে পারি যাহারে আমি সঁপিলাম মন
দেখিতে যার বদন, অতি কাতর নয়ন
শুনিতে বচনসুধা শ্রবণ তেমন।
দেখিলাম কত মত নাহি দেখি তার মত, সে জন এমন,
যদি তার বিরহেতে সতত হয় জ্বলিতে
জ্বলিতে জ্বলিতে হবে নির্বাণ কখন।

মনে রাখতে হবে উনিশ শতকের প্রথম থেকে মধ্যভাগের মধ্যেই নিধুবাবুর গানগুলি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং এরই মধ্যে তাঁর 'গীতরত্ন' নামক গীতসংকলনের একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। নিধুবাবুর গানের

প্রেরণাতেই অন্যান্য গীতকারের আবির্ভাব ঘটে এবং কবি-তর্জা-আখড়াই প্রভৃতি গীতিরীতিতেও এই ব্যক্তিতান্ত্রিক প্রেমসংগীতের প্রভাব পড়ে। সে কালে সংগীতের, বিশেষত এই ধরনের গোষ্ঠীনিরপেক্ষ একক কণ্ঠের নিঃসীম বেদনার গান জনপ্রিয় হওয়া কঠিন ছিল, তথাপি 'বিনা স্বদেশীভাষা মিটে কি আশা'র কবির গান রামমোহনকে পর্যন্ত স্পর্শ করেছিল বলে শোনা যায়। 'বঙ্গীয় সংগীতরত্নমালা'য় উদ্‌ধৃত নিধুবাবুর 'পিরিতি রতন' গানখানি মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' নাটকেও উদ্‌ধৃত হয়েছে—নিধুবাবুর জনপ্রিয়তার যা প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ইতিপূর্বে প্রেমের গানের আলোচনায় সামাজিক কলঙ্ক-লোকগঞ্জনা-মানাপমানের প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যাপারেও নিধুবাবুই পথিকৃৎ। তিনিই সর্বপ্রথম প্রেমকে সামাজিক বিধিবিধান শাস্ত্রীয় আনুগত্য লোক-সংস্কারের ঊর্ধ্বে তুলে ধরে স্বাধীন মানব মানবীর প্রণয়ানুরাগের জয়ঘোষণা করেছেন। একটি গানের ভাষা—'পিরিতি কি হয় যায় কাহার কথায়'? আর একটি গান—

মান-অপমান কিছু কোর না মনে
সকলি সহিতে হয় সময়ের গুণে।
পিরিতি এমন ধন করিতে হয় যতন
ধৈরজ ধরিতে হয় উচিত এখানে।

নিধুবাবু যে প্রতিবাদের নির্ঝরমুখ থেকে উপল সরিয়ে দিয়েছেন, পরবর্তী কবিরা সেই প্রতিবাদকে কলস্বনা জলকল্লোলে পরিণত করেছেন। শ্রীধর কথকের কণ্ঠে তাই আমরা শুনতে পেয়েছি—

হায় কী লাঞ্ছনা কী গঞ্জনা ভেবে তো প্রাণ বাঁচে না
যে গেছে তার প্রেম গেছে,
আমার তো পিরিতি গেল না।
কবার নয় কব কার কাছে, যে দুখে ভাসায়ে গেছে,
আমার মনেতে সে যে বিনা সুতে গাঁথা আছে।
পিরিতের যে রীতি আছে, তার মতন সে করে গেছে,
চিহ্নমাত্র রেখে গেছে লোকে কলঙ্কঘোষণা।

এই কলঙ্ককে অলংকার বলে ঘোষণা করেছেন জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক—

…সবে বলে কলঙ্কিত কুল চাঁদের হরিণী
আমি কিন্তু মনে জানি কলঙ্ক সে অলংকার।

'লোকে কয় গেল কূল, মূলেতে হল নির্মূল
আমি ভাবি এল কূল ছিল অকূল পাথার।

এবং ভাবা নিধুবাবুর 'হউক হে হউক প্রাণ বাড়িক আমার গানের স্পর্ধিত অন্তিম চরণটিকে অনিবার্যভাবে মনে করায়।' মহারাজ মহতাবচন্দ্র পর্যন্ত এই হৃদয়বৃত্তির আনুকূল্যে সামাজিক সংস্কার-পরিত্যাগের অকুণ্ঠ ঘোষণা করেছেন—

প্রাণ যারে চাহে সদা দোষেতে তারও কি করে
সতত অস্থির প্রাণ না হেরিয়া হয় যারে।
নীচ কিংবা উচ্চ জাতি কুৎসিত কি রূপবতী,
মন হয় যার প্রতি এসব নাহি বিচারে।

জনৈক কালিদাস গঙ্গোপাধ্যায় গেয়েছেন—

কী করে লোকগঞ্জনে,
যাহার দর্শনে প্রাণে সদা স্পৃহা হয়?

শ্রীধর কথকের একাধিক গানে এই সংকীর্ণ লোকাপবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত। একটি গানে তিনি সংক্ষেপে ঘোষণা করেছেন—'যে বলে বলুক লোকে' কারো কথা শুনিব না।' অন্যত্র একটি গানে লোকনিন্দার প্রতি শুধু উপেক্ষা নেই, বরং লোকাপবাদের অন্যায় অসংগতির বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত অভিমানও আছে—পরেরই কথায় কে কোথায় কার প্রেম ত্যেজেছে? কালী মির্জার উক্তিও প্রসঙ্গত স্মর্তব্য—

একি কথার কথা প্রেম হয় যায়?
ক্ষণেক যারে দেখা যায় তাহা কি যায়
লোকের কথায়?

শ্রীধর কথকের আরও একটি গান স্মরণ করা যায়—

প্রেম ভালবাসি বলে কত লোকে কত বলে।
এখন এমন হল আরও আছে কী কপালে।
শুন গো সখী সম্পত্তি মতন হয়েছি প্রতী,
এই কি প্রণয়ের রীতি যন্ত্রণা দেয় মিলনকালে?

এই গানে প্রচ্ছন্ন এক লঘু কটাক্ষ কালান্তরের চিত্তকেও স্পর্শ করে।' সামাজিক অপযশকে অবশ্য কাব্যের দৃঢ়তায় অগ্রাহ্য করা যায়, কিন্তু সংসারে সেইগুলি জ্বালাময় হয়েই দেখা দেয়।' এত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও নিধুবাবু নৈরাশ্যবাদী কবি নন, তাঁর পরবর্তী গীতকারেরাও কেউ মিলন-ব্যর্থতাকেই একমাত্র ট্রাজেডি বলে ঘোষণা করেননি। তাই শেষ পর্যন্ত নিধুবাবুর প্রীতিগীতি প্রণয়নিবেদনের চিরন্তন

আকৃতিতে, দর্শনের অনিবার্য উৎকণ্ঠায়, সন্দিগ্ধ মনের সদাশঙ্কিত বন্ধনাকাঙ্ক্ষায় বিহ্বল, কখনো ক্ষণমিলনে পুলকিত—

এতদিন পরে নিভিল আমার মনের অনল সখী
দেখ যতদিন ছিল তুইজ্ঞান, সতত ঝুরিত আঁখি।

কখনো মানসমিলনে নিরুদ্বিগ্ন—

আমি তো তাহারই সই যে জানে আমার মন,
অযতনে কে কোথায় কারে সঁপে প্রাণ।
মন রাখিবারে মন করে এক মন,
মনেতে মনেতে তবে হয় লো মিলন।

সামাজিক মিলনবিচ্ছেদের প্রসঙ্গব্যতীত প্রেমের স্মৃতিবেদনায় অনেকগুলি গান একটি গভীর রোমান্টিক আবেদন সৃষ্টি করে। জনৈক অজ্ঞাত কবির একটি কাব্যসংগীতে প্রেমকে স্মৃতিপটে অক্ষয় করে তোলা হয়েছে—

ভুলেছি তাহারে তায় ভালবাসা ভুলিনে,
তাহারই যে ভালবাসা পাসরিতে পারিনে।
যে দিকে নয়ন ধায় হেরি ভালবাসাময়
এতে যদি ভোলা হয় তবে ভুলেছি সে ধনে।
সে মুখ তার মনে হলে ভাসে হৃদি আঁখিজলে
ভুলেছি তারে কে বলে সে রয়েছে প্রাণে প্রাণে।

প্রকাশচারুত্বে, অবিস্মৃত প্রেমের অকুণ্ঠ ঘোষণায় এই কাব্যসংগীতটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গোপাল উড়ের নামে প্রচলিত এবং পূর্বোল্লিখিত আর একটি গানও এই প্রসঙ্গে মনে করা যায়—

ভোলা যায় কি কথার কথা মন যে মনে গাঁথা
শুকাইলে তরুবর ছাড়ে কি জড়িত লতা ?

প্রেমের এই অবিস্মরণীয়তা অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একটি গানে যথার্থ গীতিকবিতা হয়ে উঠেছে—যদিও তার রচনারীতি ও ভাবভঙ্গি পূর্ববর্তী নিধুবাবু-শ্রীধর-কবিসংগীতের মতই—

কেনই বা ভুলিব তোমায় কে ভুলে হৃদয়ধনে
শূন্য হৃদয় লয়ে কী সুখে বাঁচিব প্রাণে ?
আশাতে নিরাশা বলে তোমারে কি যাব ভুলে,
সে তো নয়রে ভালবাসা সুখ আশা সংগোপনে।
রাখিব না সুখ-আশা চাহিব না ভালবাসা,

ভালবেসেই ভাল রব মনে মনে।
প্রেমের প্রতিমাখানি দলিত হৃদয়ে আনি
জীবন অঞ্জলি দিয়ে পূজিব অতি যতনে।

এই সঙ্গে দুঃসহ অথচ অনিবার্য, তীব্রদাহময় কিন্তু অপরিত্যাজ্য প্রেমের কয়েকটি স্বরচিত গান চোখে পড়ে। যেমন কালী মির্জার রচনা—

বাসনার কী বাসনা তবু তারে ভালবাসে
ভানু লক্ষান্তরে থাকে কমল সলিলে ভাসে।
চক্রবাক চক্রবাকী কি সুখে তাহারা সুখী
নিশিতে বিচ্ছেদ দেখি, কেহ নাহি কারো পাশে।

স্বর্ণকুমারী দেবীর একটি স্বরচিত কাব্যসংগীত—

এ জনমের মত সুখ ফুরায়ে গিয়াছে সখী
এখন তবুও হৃদে জ্বলিছে দুরাশা একী।
জানি এ অভাগীভালে সুখ নাই কোনো কালে,
দুরন্ত পিপাসা তবু থামিবার নহে দেখি।
এত যে যতন করি এ অগ্নি নিভাতে নারি,
প্রেমের এ দাবানল জ্বলে উঠে থাকি থাকি।
জনম আমার শুধু সহিতে যাতনা
জীবন ফুরায়ে এল আঁখিজল ফুরাল না।

তারাকুমার কবিরত্ন প্রেমকে মৃগনাভির সঙ্গে তুলনা করেছেন—

যাহার উপরে যার মনের প্রণয়
সে ভাব কিছুতে তার ঢাকা নাহি রয়।
মৃগনাভি শত বস্ত্রে কর আচ্ছাদন
গন্ধ তার কিছুতেই রবে না গোপন।

উনিশ শতকের প্রেমসংগীত শতজলধোদবেগ নদীর মত, সামান্য কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে এই প্রণয়রহস্যধারার পরিচয় দেওয়া যায় না। অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে নিধুবাবুর যৌবনে রচিত গানে এই প্রণয়সংগীতের সূচনা, রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানে এর পূর্ণ পরিণতি। এরই মধ্যে বাঙলা কবিতায় ঈশ্বর গুপ্ত-রঙ্গলাল-মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছে, কিন্তু তাঁদের কাব্যের তথ্যভারাতিরেক, সুলভ রসিকতা, পৌরাণিক প্রসঙ্গ, ধ্রুপদী গাম্ভীর্য, বীররসের আস্ফালন, মহাকাব্যিক ওজস্বিতা, দেশপ্রেম অথবা হিন্দুধর্মের সংস্কার—কোনোখানেই গীতিকবির অন্তরঙ্গ নিভৃত মনের স্বগতোক্তি বিশেষ ছিল না।

নিধুবাবুর প্রণয়সংগীতগুলি স্বরনির্ভর হওয়ার জন্য স্বতন্ত্র কবিতারূপে স্বাবলম্বী হতে পারেনি। তাই কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে নিধুবাবু উপেক্ষিত হয়েই রইলেন। তাছাড়া বিহারীলালের আবির্ভাবের পর থেকে কাব্যসংগীত ও স্বরনিরপেক্ষ কবিতা পরস্পরের বিপরীত পথে চলতে সুরু করেছে। কালক্রমে কবিতাই দৃঢ়মূল হয়েছে, স্বর হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির কণ্ঠহীন অসীমতায়। স্বরহারা কথা মুখ লুকিয়েছে সংকলনের ধূসর জীর্ণপৃষ্ঠ গহ্বরে। অথচ একথা নিশ্চিত বিশ্বাসে বলা যায়, বাঙলা গীতিকবিতার সার্থক সূচনা এই প্রেমসংগীতগুলির মধ্যেই—এই নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, রাম বসু, কালী মির্জার গীতপ্রাণ রচনাগুলিতেই প্রাপ্তব্য।

১। Introduction, Canterbury Collection of English Love Lyrics—Percy Hulburd.

২। 'প্রীতিগীতি'র অবতরণিকায় সম্পাদকের মন্তব্য

৩। "প্রীতিগীতি/বা/বিদ্যাপতির সময় হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত/রচিত প্রায় সার্ধ দ্বিসহস্র উৎকৃষ্ট প্রেমসংগীতসংগ্রহ/অবিনাশচন্দ্র ঘোষ এম. এ. বি. এল./কর্তৃক সংগৃহীত।" আখ্যাপত্রে মেঘদূতের 'উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য' শ্লোকটি এবং 'পিরিতি না জানে সখী' নিধুবাবুর এই গানটি মুদ্রিত। ১৩০৫ সালে প্রকাশিত হয়। মূল্য ২ টাকা

৪। একথা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার্য যে উনিশ শতকীয় প্রেমসংগীত সম্পর্কে সুস্থ ঐতিহাসিক দৃষ্টির অভাবে অনেকেই এর বিকৃত অংশকেই সত্য বলে ধারণা করেছিলেন। জেম্‌স্ লঙ তাঁর 'ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগে' এইসব 'পপুলারসং' প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন—

"The Bengali songs do not inculcate the love of wine or like the Scotch, the love of war, but are devoted to Venus and the popular-deities; they are filthy and polluting···songs are in abundance on love subjects, as the Bichar Sar Samgita 1832, Samgitarasa Madhuri 1844, pp 214, the Gitaratna by Ram Nidhi: the Samgitabali, pp 133, by the Raja of Burdwan, Rasik Tarangini, tr by Madan Mohan Tarkalankar, fragments of erotic poems on love."

৫। 'গীতাবলী বা রামনিধি গুপ্তের যাবতীয় গীতসংগ্রহ' (বৈষ্ণবচরণ বসাক সম্পাদিত, ২য় সং, ১৩০৩, বটতলা) গানটি নিধুবাবুর নামে আছে ঈষৎ পাঠান্তরসহ

৬। প্রীতিগীতি—অবতরণিকা

৭। গানটি সম্পর্কে 'ভিকটোরীয় যুগের বাঙলা সাহিত্য' রচয়িতা হারাণচন্দ্র রক্ষিত লিখেছেন—"নিরাশ প্রণয়ের কী গভীর মর্মভেদিনী উক্তি, রমণীহৃদয়ের এ কাতরতা, ভালবাসার এ গভীরতা, যে কবি এমন সরল স্বাভাবিকভাবে আড়ম্বরহীন ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন, তাঁহার কবিত্বশক্তি অস্বীকার করা আর ছাইচাপা আগুনের অস্তিত্ব উড়াইয়া দেওয়া সমান কথা।"

'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'রচয়িতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় গানটির ১০ম-১১শ ছত্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন—"ইহা নায়িকার বিষম শ্লেষ-উক্তি। ইহার অপেক্ষা নায়ককে দু ঘা মারা বরং ভাল।"

৮। ঈষৎ পাঠান্তরসহ গানটি হারাণচন্দ্র রক্ষিতের পূর্বোক্ত গ্রন্থে শ্রীধর কথকের নামে আছে

৯। Canterbury Collection of English Love Lyrics, Introduction—Percy Hulberd.

উনিশ শতকের কাব্যসংগীত : নাট্যসংগীত

১

উনিশ শতকের কাব্যসংগীতসম্পদের একটি বিশিষ্ট শাখা নাট্যসংগীতরূপে বিকশিত হয়েছিল। বাঙলা নাটকের যথার্থ প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা গত শতাব্দীর সপ্তম-অষ্টম দশকের পূর্বে হয়নি, কিন্তু বাঙলা কাব্যগীত আরও পূর্ব থেকেই আপন স্বাতন্ত্র্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। সুতরাং নাট্যসাহিত্য যখন নূতন করে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মনোরঞ্জনের কাজে আত্মনিয়োগ করল তখন বাঙলা সংগীতের বহুশাখায়িত ঐতিহ্য স্বভাবতই তাকে অভাবনীয় সাহায্য করল। নাটকে সংগীতের ব্যবহার বাঙলার প্রাচীন লোকনাট্য-যাত্রা ইত্যাদিতে ছিল অবাধ। পাশ্চাত্ত্য নাট্যকলার আদর্শে বাঙলা নাটক গড়ে উঠলেও সংগীতের প্রতি বাঙালির সহজাত প্রীতি ও আকর্ষণবশত প্রাচীন যাত্রার মত সংগীতও নতুন কালের নাট্যসাহিত্যকে আকর্ষণ করল। মধুসূদন-দীনবন্ধু নাটকে গান ব্যবহার করেছিলেন মুখ্যত নাট্যপ্রয়োজনে, গৌণত নাট্যরীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে। উনিশ শতকের সপ্তম দশকের মধ্যে সংগীতবহুল গীতাভিনয়কে জনপ্রিয় করে তুললেন উমেশচন্দ্র মিত্র, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিমোহন কর্মকার, তিনকড়ি ঘোষাল, হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রভৃতি। তারপর গীতাভিনয়ের আসরে এলেন ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র দাস দে, তিনকড়ি বিশ্বাস, ব্রজমোহন রায়, মতিলাল রায়, ধর্মদাস রায়, দ্বারকানাথ সরকার, ঈশ্বরচন্দ্র সরকার, শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজনাথ দে। এঁরা কেউ ছিলেন দলের অধিকারী, কেউ স্বয়ং নাট্যকার-গীতিকার। কিন্তু গীতাভিনয়কে একটি সুঠাম শৈলীতে পরিণত করতে পেরেছিলেন সম্ভবত মনোমোহন বসু। তারপর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতারণ সান্যাল, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, রাধানাথ মিত্র, কুঞ্জবিহারী বসু, বৈকুণ্ঠনাথ বসু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে গীতাভিনয়, অপেরা, সংগীতবহুল নাটক ক্রমশ একটি নিজস্ব ভঙ্গিতে ক্রমবর্ধমান হয়েছে। বাঙলা কাব্যসংগীত-সংকলনগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক-পৌরাণিক-ভক্তিমূলক-সামাজিক পর্যায়ে যে সব গান আছে তার অধিকাংশই হয়ত সমকালীন নাটকের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিভিন্ন কাব্যগীতচয়নিকায় বহু নাট্যসংগীত সংকলিত হয়েছে, আবার বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সেকালের নাট্যগীতগুলির কিছু স্বতন্ত্র সংকলনেরও সন্ধান মেলে। যেমন—

১। মনোমোহন-গীতাবলী—মনোমোহন বসু (১৮৮৭)
২। গিরিশ-গীতাবলী—অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত (১৯০৮).
৩। আলিবাবার গানের স্বরলিপি (১৯০৮)
৪। থিয়েটার সংগীত—করুণাকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২১)
৫। বৃহৎ থিয়েটার সংগীত—অধরচন্দ্র চক্রবর্তী (১৯২১)
৬। রিজিয়ার স্বরলিপি—মনোমোহন রায় (১৯২২)

বাঙলা নাট্যসাহিত্য পুরাতন যাত্রাভিনয়ের ধারাবাহিক উত্তরাধিকার না বিদেশী নাট্যাভিনয়ের উপলব্ধি—এই বিতর্ক থাকলেও, বাঙলা নাটক যে প্রথমাবধি সংগীতবহুল এবং সেই সংগীতব্যবহার যে সংঘাতমূলক ইংরাজি নাট্যকলার অনুকৃতি নয়, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ডক্টর সুকুমার সেনের অভিমত শিরোধার্য করে বলা যায়—"বাঙলা নাটকের উদ্ভব প্রাচীন যাত্রা হইতে হয় নাই, সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটকের মিলিত আদর্শেই বাঙলা নাটকের উৎপত্তি। কিন্তু একটি বিষয়ে বাঙলা নাটক প্রাচীন যাত্রার কাছে ঋণী। বাঙলা নাটকে গানের অপরিহার্যতা পুরানো যাত্রা হইতেই আসিয়াছে।"[১] আধুনিক নাট্যরীতি একদিনেই বাঙলা সাহিত্যে গড়ে ওঠেনি। বিদেশী নাটকের আনুগত্য স্বীকার করেও নাট্যকারগণ যেমন অনেক নাটকেই সংস্কৃত নাটকের সূত্রধর নান্দী প্রস্তাবনা ব্যবহার করেছেন, তেমনি সংগীতের যত্রতত্র প্রয়োগ করে প্রাচীন রীতির স্বাদও সহিষ্ণুভাবে সাধারণ যাত্রাপ্রিয় দর্শকদের বিতরণ করেছেন। বিদেশী আদর্শে নাটক লেখার পরও যাত্রাভিনয় ও যাত্রারচনার ধারায় ছেদ পড়েনি, পরন্তু মনোমোহন বসুর মত নাট্যকার যাত্রাকে বাঙলা নাটকের আইনসম্মত স্বত্বাধিকারী ঘোষণা করে যান। রামনারায়ণ তর্করত্নের একটি নাট্যভূমিকা থেকে পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শ-প্রণোদিত নাট্যকলার সঙ্গে যাত্রানাটকের গানের সাঙ্গীকরণের মনোভাবটি ধরা পড়ে—

"যদিচ যাত্রার প্রতি আমাদিগেরও অসীম অশ্রদ্ধা আছে, তথাপি এককালে সংগীতমাত্র উচ্ছেদ করা অভিমত কখনই নহে। প্রত্যুত নাটক অভিনয়ে সংগীত-সম্পর্ক নিতান্ত পরিবর্জিত হইলে তাহাতে রস ও সৌন্দর্যের বিশেষ হানির সম্ভাবনা।"[২]

'কীর্তিবিলাস' এবং 'ভদ্রার্জুনকে'ই (১৮৫২) আধুনিক কালের প্রথম মৌলিক ও বিদেশী আদর্শপ্রভাবিত বাঙলা নাটক বলা হয়ে থাকে। 'কীর্তিবিলাস' ইংরাজি ট্রাজেডির আদর্শে রচিত প্রথম নাটক বলে নাট্যকার দাবি করেছিলেন। এতেও গান আছে, যদিও ভূমিকায় গীতবহুল যাত্রারীতিকে তিরস্কার করা

হয়েছে। এমন কি, তারাচরণ শিকদার পর্যন্ত 'ভদ্রার্জুন' নাটকে গান বর্জন করেননি এবং ভূমিকায় তিনিও যাত্রাপদ্ধতির প্রতি কটাক্ষ করেছেন এই বলে যে, "এদেশে নাটকের ক্রিয়াসকল রচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সংগীতদ্বারা ব্যক্ত করে।" বস্তুত মধুসূদনের প্রহসনদ্বয় এবং অনুরূপ কয়েকটি প্রহসনাত্মক রঙ্গব্যঙ্গ রচনাব্যতীত উনবিংশ শতকের অধিকাংশ নাটকই গীতগ্রথিত। শেক্‌স্‌পিয়রের অনুবাদ নাটকেও মূলের সঙ্গে অতিরিক্ত যোজনাসহ দেশীয় রীতিতে বহু গান যুক্ত করা প্রথায় পরিণত হয়েছিল। রো-র 'দি ফেয়ার পেনিটেন্ট'-এর অনুবাদ 'অনুতাপিনী নবকামিনী' নাটকের প্রারম্ভে হিন্দু পৌরাণিক ভক্তিগীতি পর্যন্ত অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে।

শিক্ষিত সমাজে যাত্রার প্রতি বৈরাগ্য উপজাত হওয়ার ফলে প্রাচীন যাত্রা-প্রণালীকে আধুনিক থিয়েটারি ঢঙে সংস্কৃত করে জনপ্রিয় করার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে। সেই সূত্রেই কাব্যসংগীত নাট্য-সাহিত্যের কণ্ঠহার হতে পেরেছিল। বিদ্যাসুন্দর পালা শিক্ষিত সমাজে আদরণীয় হয়েছিল তার সংগীতের মনোহারিতার জন্যই। পাঁচালি-টপ্পা-আখড়াই-হাফ-আখড়াই-ঢপকীর্তনের সুরে যাত্রার আসর তখন দোদুল্যমান—থিয়েটারি অভিনয় পদ্ধতি সাজপোষাক কনসার্টে তার প্রাচীনতা অনেকটাই অপসারিত—সুতরাং কাহিনী কিংবা পরিবেশনার ধারানুগতিক সংস্কার সত্ত্বেও যাত্রার প্রভাব একদিক দিয়ে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল। এরই মধ্যে মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) নতুন এক গীতাভিনয়ের প্রবর্তন করলেন, যাত্রার সঙ্গে নাটকের মেলবন্ধন ঘটিয়ে নাটককে লোকায়ত সংস্কৃতির পীঠস্থানে পরিণত করলেন। 'শখের থিয়েটার' 'শখের যাত্রা কম্পানি'র মধ্যে ভেদরেখা অদৃশ্যপ্রায় হতে লাগল, একই নাটক দুই ক্ষেত্রেই সমাদৃত হল। যাত্রা কেবল কৃষ্ণভক্তি-রামভক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না, তাতে জীবনের বাস্তবতা এল, নাটকের কারুণ্য এল, সংলাপে আধুনিক সাহিত্যধর্মিতার স্পর্শ পাওয়া গেল। নাটকও কেবল সংঘাতমূলক কাহিনী হয়ে রইল না, সেখানে ভক্তির সংগীতে এল যাত্রার লোকায়ত গীতশ্রী, এল কথকতা ও ভাবাবেগ।[৩] মনোমোহন বসু একই নাটককে যুগপৎ মঞ্চোপযোগী এবং যাত্রা-গীতাভিনয়োপযোগী উভয়রূপ দান করেন। অন্যান্য পালারচয়িতারাও প্রচলিত নাটককে গীতাভিনয়ে পরিণত করতে সুরু করেন। মৌলিক গীতাভিনয়পালায় সাহিত্যভারতী পূর্ণ হয়ে উঠল। বিদ্যাসুন্দর নলদময়ন্তী হরিশ্চন্দ্র-প্রভৃতি পৌরাণিক পালাগুলির অসাধারণ

লোকপ্রিয়তা অর্জন করার মূলে ছিল এই গানের বেগ। মনোমোহন 'সতী' (১৮৭৩) নাটকের ভূমিকায় লেখেন—

"ইউরোপে নাটক কাব্যে গান অল্পই থাকে, আমাদের তথাবিধ গ্রন্থে গীতাধিক্য প্রয়োজন। ইটি জাতীয় রুচিভেদে স্বাভাবিক। যে দেশের বেদ অবধি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ধারাপাত পাঠ পর্যন্ত স্বরসংশোধন ভিন্ন সাধিত হয় না, যে দেশের অপর সাধারণ জনগণ লোকের হীনাবস্থায়ও যাত্রা কবি পাঁচালি দল ও হাফ-আখড়াই কীর্তন তর্জা ভজন প্রভৃতি নিত্য নতুন সংগীতামোদে আবহমান ঘোর আমোদী—সে দেশের দৃশ্যকাব্য যে সংগীতাত্মক হইবে, ইহা বিচিত্র কী?"

অবশ্য, নাটক ও গীতাভিনয়ের এই সমীকরণপ্রয়াস সর্বত্র প্রশংসিত হয়নি। মনোমোহনের পূর্বে কালিদাস সান্যালের 'নলদময়ন্তী' নাটকের অভিনয় হয়েছিল গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীপরিচালিত বাগবাজার নাট্যসমাজের উদ্যোগে ১৮৬৪ সালে। ১৮৬৮ সালে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে তিনকড়ি ঘোষাল[8] স্বসম্পাদিত 'নবপ্রবন্ধ' পত্রিকার ফাল্গুন ১২৭৪ সংখ্যার সমালোচনা প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে' তা উদ্ধৃত করেছেন। তিনকড়ি ঘোষাল লিখেছিলেন—

"...আমরা শুনিয়াছিলাম যে, এই নলদময়ন্তী গীতাভিনয়রূপে অভিনীত হইয়াছিল, সেইজন্যই ইহাতে বোধ হয়, গান এত অধিক। কিন্তু যখন ইহাকে নাটক নাম দিয়া মুদ্রিত করা হইয়াছে, তখন ইহাতে এত গান দেওয়া কোনক্রমেই বিধেয় হয় নাই।...গ্রন্থকারের এটি বিবেচনা করা উচিত, এবং জানাও কর্তব্য যে, নাটক ও গীতাভিনয় উভয় এক সামগ্রী নহে, উহারা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ।"

নাটক ও গীতাভিনয় বস্তুত পৃথক হলেও স্বরূপত এই পার্থক্যকে অনেকেই দূরীভূত করতে পেরেছিলেন। উনিশ শতকের ষষ্ঠ-অষ্টম দশকের মধ্যে একই বিষয়ের নাটক ও গীতাভিনয় পালার সংখ্যা যথেষ্ট ছিল। মনোমোহন স্বয়ং তাঁর 'হরিশ্চন্দ্র' নাটককে গীতাভিনয়ে রূপান্তরিত করেছিলেন। তাই 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের গানসংখ্যা আট, কিন্তু গীতাভিনয়ে ষোলটি। কিন্তু 'পার্থপরাজয়ে' এসে মনোমোহন নাটক ও গীতাভিনয়ে কোনো ভেদরেখা রাখলেন না। এই নাটকের গীতসংখ্যা ঊনত্রিশটি।

গীতাভিনয় বা অপেরাজাতীয় রচনায় বাঙলা নাট্যসংগীতের নবজন্ম হলেও উনিশ শতকের প্রথম দিকের যাত্রাভিনয়ের মধ্যেও সংগীতব্যবহারের নতুনত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীনরীতির যাত্রার স্থূলতাকে সংগীতের দ্বারা

অপনোদিত করার এই প্রচেষ্টার ইতিহাস এখনও অলিখিত রয়েছে বলে মনে হয়। ১৮২২ খ্রীস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি (১৪ মাঘ ১২২৮) 'সমাচারদর্পণে' যে 'কলিরাজার যাত্রা'র বর্ণনা আছে, তাও ঠিক প্রাচীন যাত্রার নয়— 'কলিকাতাতে এক নূতন যাত্রা প্রকাশ হইয়াছে'—নূতনত্বের অন্যতম কারণ, সংবাদদাতার মতে, এর গানগুলি; কারণ এতে সঙ-জাতীয় চরিত্রগুলি 'একত্র মিলিত হইয়া বিবিধ বেশবিন্যাস বিলাস হাস্যরহস্যসম্বলিত অঙ্গভঙ্গপুরঃসর নর্ত্তন কোকিলাদি স্বর ন্যক্কৃত মধুর স্বরে গান নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদন' করে শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করেন। 'সমাচারদর্পণ' ঠিকই অনুমান করেছিলেন যে, "ক্রমে ক্রমে ঐ যাত্রার অনেক প্রকার পরিপাটী হইতে পারে।"[৫] 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' থেকে জানা যায়, ১৮২২ খ্রীস্টাব্দের ৬ জুলাই (২৩ আষাঢ় ১২২৯) শনিবার ভবানীপুরে গঙ্গারাম মুখোপাধ্যায়ের গৃহে যে নলদময়ন্তীর যাত্রা হয়েছিল, তার সংগীতগুলির উৎকর্ষের মূলে ছিল রাম বসুর রচনা। এরও বহু বছর পরে, অপেরা-সূচনার পূর্বে, ১৮৪৯ সালের ৩০ মার্চ (১৮ চৈত্র ১২৫৫) 'সম্বাদভাস্করে' 'নন্দবিদায়' যাত্রার বিবরণে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছিলেন যে, ঐ যাত্রার "গীতসকলের মধ্যে প্রচুর কবিতাশক্তির প্রকাশ আছে, বোধ করি বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহার মধ্যে মহাকবি নিধুবাবুর টপ্পার সমান অনেক হইবে, প্রায় তাবৎ গীত হাফ আখড়াইয়ের খেয়াল কীর্ত্তনের এবং টপ্পার সুরেতে গাহনা হইবাতে অতিশয় মিষ্ট এবং সুশ্রাব্য হইয়াছিল।"[৬] ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে (১৭৮০ শকাব্দ, মাঘ) রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' এই নতুন যাত্রার প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই যাত্রার প্রভাব শিক্ষিত মনে স্থায়ী হতে পারল না। কেবল সংগীতের আকর্ষণেই একটি মৃতরীতিকে উজ্জীবিত করা গেল না। ১৮৬৫ সালের ১৬ নভেম্বর সংবাদপ্রভাকরে মন্তব্য করা হয়, "প্রচলিত যাত্রাগুলির প্রতি যথার্থ সংগীতপ্রিয় ব্যক্তিগণের নিদারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। রঙ্গভূমি করিয়া নাটকের অভিনয় করা অধিক ব্যয়সাধ্য বিবেচনায় কলিকাতার কয়েকজন শিক্ষিত যুবক সামান্যতঃ তৎপ্রণালীতে গীতাভিনয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।" 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার মতে, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শকুন্তলা' বাঙলায় রচিত প্রথম 'গীতাভিনয়' বা 'অপেরা'।[৭] কালিদাস সান্যালের 'নলদময়ন্তী' তিনকড়ি ঘোষালের 'সাবিত্রী-সত্যবান' গীতাভিনয়, মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' নাটকের গীতাভিনয়-রূপান্তর, হরিমোহন কর্মকারের 'জানকীবিলাপ', ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়কর্তৃক মেঘনাদবধের গীতাভিনয়রূপ—এই সকল

গীতবহুল অপেরা দু-এক বৎসরের মধ্যেই বাঙলা নাট্যসংগীতকে একটি বিশিষ্ট শ্রেণীতে পরিণত করে তুলল। হরিমোহন কর্মকার এই গীতাভিনয়কে 'গীতিকা' নাম দিয়েছিলেন। তাঁর 'মানিনী' গীতাভিনয়ের (১৮৭৫) ভূমিকায় উল্লিখিত হয়েছে—

"'অপারা' অর্থাৎ বিশুদ্ধ গীতিকা, এ পর্যন্ত কেহই প্রণয়ন করেন নাই। বহুদিবস হইল আমি জানকীবিলাপ নামে একখানি গীতিকা রচনা করি। স্বর্গীয় বাবু শ্যামাচরণ মল্লিক মহাশয় নিজব্যয়ে সমধিক উৎসাহের সহিত উক্ত গীতিকার অভিনয় করিয়াছিলেন। ফলতঃ তৎকালে জানকীবিলাপখানি কথঞ্চিৎ 'অপারা'র আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল। প্রায় দশ বারো বৎসর অতীত হইল, উক্ত গীতিকার অভিনয়ে আর কেহই যত্নবান হন নাই। ১২৮১ সালের আশ্বিন মাসে, প্রধান জাতীয় নাট্যশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন নিউগী—'সতী কি কলঙ্কিনী' নামে একখানি গীতিকার অভিনয় করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেখানিও 'জানকীবিলাপে'র কথঞ্চিৎ আদর্শস্বরূপ। তথায় ভুবনবাবুকে শতশত ধন্যবাদ প্রদান করি যে, তিনি গীতিকার অভিনয়ে সমধিক যত্নবান হইয়াছিলেন। 'সতী কি কলঙ্কিনী' যদিও বিশুদ্ধ 'অপারা' নহে, তথাচ অভিনয় মন্দ হয় নাই, দর্শকগণের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।"৮

বাঙলা ভাষায় এই জাতীয় গীতবহুল অপেরার ইতিহাসে হরিমোহন ছাড়া অন্যান্য কয়েকজন গীতাভিনয়-প্রবর্তকের নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী অপেরাস্রষ্টাদের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র শর্মা, তিনকড়ি ঘোষাল, যাদবচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শ্রীশচন্দ্র রায়, হরিনাথ মজুমদার, নন্দলাল রায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, যদুগোপাল বসু, ভুবনকৃষ্ণ মিত্র, রাজকৃষ্ণ রায় এবং আরও অজস্র নাট্যকারের নাম আছে সাহিত্যের ইতিহাসে। এঁদের সকলের রচনাই আদর্শ অপেরা হয়ে ওঠেনি, কারও রচনায় যাত্রার প্রভাবই গভীরতর, কিন্তু সংগীতরচনা ও ব্যবহারে এঁদের মধ্যে সমধর্মিতা বিদ্যমান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-স্বর্ণকুমারীর অপেরা আধুনিক গীতিনাট্যের দিকে এগিয়ে এসেছিল, তাঁরা 'অপেরা' শব্দে তাঁদের গীতিনাট্যের পরিচয় কখনোই প্রদান করেননি, কিংবা 'গীতাভিনয়' শব্দও প্রয়োগ করেননি। কিন্তু মনোমোহনের রচনার নাম ছিল 'গীতাভিনয়'। হরিমোহনের মানিনীর ভূমিকায় উল্লিখিত 'সতী কি কলঙ্কিনী'র রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এগুলিকে বলেছেন 'গীতিকা' বা 'নাট্যরাসক' বা 'গ্র্যাণ্ড অপেরা', অতুলকৃষ্ণ মিত্র নাম দিয়েছিলেন 'অপেরাটিক ড্রামা'। তাছাড়া 'অপেরা কমিক' ও 'অপেরা বুফ' নামে আরো দুই জাতের হাস্যরসাত্মক অপেরা

প্রচলিত ছিল বলে ডঃ সুকুমার সেন জানিয়েছেন (বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ২৯৩)। এগুলির বাঙলা প্রতিশব্দ মেলেনি। উনিশ শতকের শেষভাগে প্রকাশিত গীতসংকলন 'সংগীতমুক্তাবলী', 'সংগীত-সহস্র', 'সংগীতসারসংগ্রহ', 'বাঙালির গান' 'প্রীতিগীতি' প্রভৃতির মধ্যে এই সব নাট্যপালার বহু গান কাব্যসংগীতরূপে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যাত্রা-পাচালি-গীতাভিনয়ের ভক্তিমূলক গানগুলি ভারতীয় সংগীতমুক্তাবলীর 'পৌরাণিক'-সংগীত অধ্যায়ে সংকলিত হয়েছে। উক্ত গানগুলি সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছিলেন—

Nothing that has been composed in our language can excel these songs in pathos and tenderness.[৯]

এঁদের মধ্যে কাব্যসংগীতের বৈশিষ্ট্যরক্ষায় মনোমোহনই সার্থক পুরুষ। ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য মনোমোহন গুরুর মতই ছিলেন স্বভাবকবিত্বের অধিকারী, সহজ সাংবাদিক, পাঁচালি-কবিগান প্রমুখ লোকায়ত গীতধারায় আপ্লুত ও তৎসহ নাট্যরসজ্ঞ। সুতরাং তাঁর হাতে নাট্যসংগীত প্রায় গণসংগীতে পরিণত হল, অভিনয়ের সীমা ছাড়িয়ে তা বৃহত্তর সমাজজীবনের সবস্তরের মানুষের কাছে প্রীতিলাভ করল। মনোমোহন-গীতাবলী (১৮৮৭) প্রকাশকালে প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন—"...মনোমোহনবাবুর গান—আজ বলিয়া নয় দীর্ঘকাল ধরিয়া বিবিধ আকারে বিবিধ প্রকারে প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গসমাজের মনোমোহন করিয়া আসিতেছে—বহুবাজারের রঙ্গভূমিতে যাঁহার গান শুনিয়া গিয়া স্বর্গীয় বুধপ্রবর গুণগ্রাহী দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সোমপ্রকাশে এমন ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, 'আহা! কী মনোহর গানই শুনিলাম—যেমন ভাব তেমনি রচনা, তেমনি সুর তেমনি গাহনা! ইত্যাদি'। পাথুরিয়াঘাটায় বাবু যদুনাথ মল্লিক মহাশয়ের ভবনে যাঁহার সঙ্গীসম্বাদ শুনিয়া হাফআখড়াইয়ের প্রকাণ্ড সভামধ্যেই বড়বাজারের ধনীপ্রবর (যিনি নিজে সুকবি ও সুভাবুক) ভোলানাথ মল্লিক মহাশয়ের গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা পতিত হইতে দেখা গিয়াছিল এবং যাঁহার উত্তরী কবিগানশ্রবণে স্বর্গগত পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রকাশ্য সভাস্থলেই মনোমোহন বাবুকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দিয়া স্বীয় তুষ্টি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই সুপরিচিত কবিবরের গীতিমালা মাতৃভাষার গলদেশে পরাইতে কুণ্ঠিতই বা হইব কেন"?[১০]

২

রামনিধি গুপ্ত, রাধামোহন সেন, কালীপ্রসাদ ঘোষ বা দাশরথি রায় আধুনিক বাঙলা সংগীতের এই কজন পথিকৃৎ নাট্যরচনায় অংশগ্রহণ করেননি। কিন্তু আধুনিক বাঙলা কবিতার প্রবর্তক ও সংগীতরচয়িতা ঈশ্বর গুপ্ত সংস্কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয়ের যে বাঙলা অনুবাদ করেন সেটি আড়ম্বরের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। অভিনয় ব্যর্থ হয়, কিন্তু গুপ্তকবিরচিত কয়েকটি নাট্যসংগীত প্রশংসিত হয়েছিল। 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' থেকে জানতে পারি, মনোমোহন বসু তাঁর একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন—"প্রসিদ্ধ কবি বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের দ্বারা অনেক বড় বড় লোক প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক বাঙলায় রচনা করাইয়া লইলেন। কিন্তু তাহার গানগুলি যত উত্তম হইল, কথোপকথন তেমন সৌকর্যসাধক হইল না"।[১১] গুপ্তকবির অনূদিত প্রবোধচন্দ্রোদয়ের নাম 'বোধেন্দুবিকাস'। এই নাটকের দুটি গান 'দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে রাত পোহানো ভার' এবং 'ও কথা আর বোল না আর বোল না বলছ বঁধু কিসের ঝোঁকে' বহুকাল পর্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।

মধুসূদন তাঁর বিভিন্ন নাটকে যে সকল প্রয়োজনগত সংগীত সংযোজিত করেছিলেন সেগুলি তৎকালীন প্রীতিগীতির সুরে বাঁধা, বিশেষ করে নিধুবাবু শ্রীধর কথক রাম বসুর গানের তুলনায় সেগুলিকে উন্নত শ্রেণীর বলা যায় না। তাঁর নাটকের যে কটি গান 'বাঙালির গানে' সংকলিত হয়েছে সেগুলি মুখ্যত নিধুবাবু শ্রীধরের রচনারীতিতেই রচিত, মধুসূদনের স্বকীয়তার পরিচয় সেগুলিতে নেই। কয়েকটি গানে ছন্দের নতুনত্ব আছে। মধুসূদন ও রামনারায়ণ উভয়ের নাটকের কয়েকটি গানে সংস্কৃত রীতি বিশেষভাবে নজরে পড়ে। কুলীনকুল-সর্বস্বের একটি নটীর গান—

চূত মুকুলকুল চঞ্চলদলিকুল
গুণগুণ গুঞ্জন গানে
মদকল কোকিল কলরবসংকুল
রঞ্জিত বাদনতানে।
রতিপতি নর্তন বিরস বিকর্তন
শুভ ঋতুরাজ সমাজে
নব নব কুসুমিত বিপিন সুবাসিত
ধীর সমীর বিরাজে।

এবং শর্মিষ্ঠার একটি নটীর গান—

উদয় হইল সখি সরস বসন্ত।...
পিককুলকূজিত ভৃঙ্গ বিগুঞ্জিত
রঞ্জিত কুঞ্জ নিতান্ত।
যত বিরহিণীগণ মন্মথ তাড়ন
তাপিত তনু বিনে কান্ত॥

উভয়ের গানেই জয়দেবের রচনারীতির সুস্পষ্ট প্রভাব আছে। পরবর্তী গীতিকারদের রচনায় এই সংস্কৃত প্রভাব সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়েছে এবং উনিশ শতকীয় বাঙলা কাব্যসংগীতের রূপরীতিরই প্রাধান্য ঘটেছে। এমন কি, সংস্কৃত অনুবাদের গীতাভিনয়েও বাঙলা গানের বৈশিষ্ট্যই রক্ষিত হয়েছে। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বর আশুতোষ দেবের গৃহে মণিমোহন সরকারের যে মহাশ্বেতা নাটকের (বাণভট্টের কাদম্বরী অবলম্বনে) অভিনয় হয়, সেই সম্পর্কে জনৈক দর্শক 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহে' একটি পত্র লিখে জানান যে, "স্থানে স্থানে সংগীতগুলিন উৎকৃষ্টরূপে রচিত হইয়াছে।"[২] হরিমোহন কর্মকারের 'রত্নাবলী (১৮৬৫), অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শকুন্তলা গীতাভিনয়' (১৮৬৫), দ্বিজ তনযার 'উবর্শী নাটক' (১৮৬৬), তিনকড়ি ঘোষালের 'সাবিত্রীসত্যবান' (১৮৬৭), ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'মেঘনাদবধ নাটক' (১৮৬৭), মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক নাটক' (১৮৬৭), 'প্রণয়পরীক্ষা' (১৮৬৯), হরিশ্চন্দ্র মিত্রের 'আগমনী' (১৮৭০), ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রভাসমিলন নাটক' (১৮৭০)—প্রত্যেকটির গানগুলি প্রাচীন কবিসংগীত-তর্জা-আখড়াই-টপ্পাজাতীয় গানের আঙ্গিকেই রচিত। মতিলাল রায়, রাজকৃষ্ণ রায়, ব্রজমোহন রায় ও মনোমোহন বসু—এঁরা সকলেই ছিলেন সচেতন গীতিকার, প্রত্যেকেই তাঁদের সংগীতগুলিকে পাঁচালি-কীর্তন-টপ্পার আদর্শে গড়ে তুলেছিলেন বলেই তাঁদের গীতাভিনয় জনপ্রিয় হয়েছিল। হরিশ্চন্দ্র মিত্র সেকালের নামী গীতিকার ছিলেন। তাঁর 'আগমনী' পালার গান বহু গীতসংকলনেই উদ্ধৃত হয়েছে। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' (১৮৭৮) পালায় গোপাল উড়ের জনধন্য গানগুলিকেই ব্যবহার করেছিলেন।' ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 'প্রভাসমিলনে কীর্তনাঙ্গ ঢপগান ব্যবহার করেছেন। রাজকৃষ্ণ রায়ের গান অত্যন্ত লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কালিদাস সান্যালের 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয়ে (১৮৮১) 'কয়েকটি ভাল গান আছে' বলে ডঃ সুকুমার সেন জানিয়েছেন।

মনোমোহন বসুর গানগুলি একদিকে যেমন ছন্দকৌশলে স্তবকবন্ধে গুপ্তকবির

দ্বারা প্রভাবিত, অন্যদিকে সুরে ও ভঙ্গিতে প্রাচীন বাঙলা কাব্যগীতের উত্তরাধিকার। তাঁর নাট্যসংগীতগুলি নাটকের গভীর সুভাষিত প্রয়োজন থেকে উৎসারিত নয়, গানের স্থূল আয়োজনরূপেই সেগুলির ব্যবহার। সেইজন্য অধিকাংশ গানের প্রয়োগ ঘটেছে সংস্কৃত নাট্যরীতি বা যাত্রার মত নটনটীজাতীয় চরিত্রের মুখে। 'রামাভিষেক' নাটকে নটের গান, নটীর গান, নটনটীকর্তৃক সূচনা গান এই প্রাচীন রীতিরই উত্তরাংশীদার। অবশ্য 'সীতা' নাটকের সখীর গান, বন্দীদের গান, নগরবাসীদের গান, কৌশল্যার গান সেই তুলনায় অধিকতর নাট্যগত। হিন্দুমেলায় জনপ্রিয় দেশাত্মবোধক প্রেরণায় রচিত কিছু গানও মনোমোহন এই সব পৌরাণিক গীতাভিনয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 'প্রণয়-পরীক্ষা'র নট, বেদেনী, বয়স্য চরিত্রের গানগুলি রচনারীতির দিক থেকে প্রাচীন, কিন্তু কবিত্বের ছোঁওয়ায় সুখপাঠ্য। 'সতী' নাটকে মোট দশটি গান আছে। এগুলির মধ্যে নন্দীর গান, পদ্মের প্রতি অপ্সরার গান, নারদের মুখে শিববন্দনা, জয়াবিজয়ার পার্বতীবন্দনা, বন্দীদের গান, কিন্নরের গান গতানুগতিক। হরিশ্চন্দ্রের গানগুলি গানের তুলনায় কাব্যের আঙ্গিকে লেখা। যেমন বন্দীদের গানখানি যেন ঈশ্বর গুপ্ত-হেমচন্দ্রের কবিতা—

> হলো সুমঙ্গল বল জয় জয় রে
> নিরাশার ভয়ংকর ঘনঘোর আড়ম্বর
> অন্ধকার হল দূর আর কিবা ভয় রে।
> মেঘমুক্ত দীপ্ত ছবি হরিশ্চন্দ্র আর্য রবি
> বামে শৈব্যা ছায়াদেবী কিবা শোভাময় রে।
> ধর্মহেতু রাজ্যহারা, নিজেদেহ পুত্র দারা,
> দাসত্বে অর্পণ-করা কার প্রাণে সয় রে।
> আর্যভূমে বহু আর দেখায়েছে ভুজবীর্য!
> কিন্তু হেন ধর্মশৌর্য আর দৃষ্ট নয় রে!

এই 'হরিশ্চন্দ্র গীতাভিনয়' সম্পর্কে প্রকাশকের বিবরণী থেকে জানা যায়—"গান শুনিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীতে বিশেষ প্রশংসাধ্বনি উঠিয়াছিল, যেমন গান তেমনি সুর তেমনি গাওয়া তেমনি অভিনয়।" 'হরিশ্চন্দ্র' থেকেই মনোমোহন গীতাভিনয় ও নাটককে দুই রীতিতে বিভক্ত করে দিলেন। সাধারণত গীতাভিনয়ে নাটকের তুলনায় গীতসংখ্যা দ্বিগুণিত হত, যেমন হয়েছে 'হরিশ্চন্দ্রে'। কেবল গীতাভিনয়ের জন্য মনোমোহন কখনও অজস্র গান লিখে দিয়েছেন, কাহিনীরচনা হয়ে ওঠেনি, সংলাপঅংশ অপরে লিখে দিয়েছেন—এমনও ঘটেছে। এসবই মনোমোহনের

সংগীতরচনার জনপ্রিয়তার প্রমাণ। যেমন 'যদুবংশধ্বংস' (১৮৭৮) গীতাভিনয়-সূত্রে মনোমোহন-গীতাবলীর প্রকাশক লিখেছেন—

"এই গীতাভিনয়ের গানগুলি কয়েক বৎসর হইল ভবানীপুরের শৌখিন ভদ্র সম্প্রদায়ের নিমিত্ত মনোমোহনবাবু রচনা করিয়া দেন। ইহার কথোপকথনপালা অন্যে প্রণয়ন করিয়াছিলেন।"

এই গীতাভিনয়ের ছাব্বিশটি গান মনোমোহনের রচনা, গদ্যাংশ রচনা করেছিলেন হরচন্দ্র দেব। মোটামুটি নাট্যবিষয়ক ছোটছোট দৃশ্য ঘটনাবর্ত চরিত্র ভেবে নিয়ে অনায়াসে গান লেখা মনোমোহনের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল। 'পার্থপরাজয়' নাটকে মোট উনত্রিশটি গান আছে। মনোমোহনের একটি গানে উনিশ শতকের বিবাহিত নারীজীবনের একজাতীয় দুঃসহ অবস্থার পরিচিত চিত্র আছে। পাঁচালি-কাবিগানরচনাতেও মনোমোহন কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। বাঙলা নাট্যসংগীতের উৎকর্ষবিধানে মনোমোহন বসুর ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইতিপূর্বে 'সতী' নাটকের ভূমিকায় নাট্যসংগীত সম্পর্কে মনোমোহনের মূল্যবান মন্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই বিষয়ে মনোমোহন কত গভীরভাবে চিন্তা করতেন, তার আর একটি প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর কলকাতায় জাতীয় নাট্যশালাস্থাপনের সাংবৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এইরূপ একটি সভায় ('ন্যাশনাল থিয়েটারের সভা চিৎপুর রোডে মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে হয়') মনোমোহন বসু বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন—

"আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, নাট্যাভিনয়ে গানের বড় আবশ্যক করে না। ইউরোপীয় রঙ্গভূমিতে নাটকাভিনয়কালে গানের অভাব দেখিয়াই তাঁহারা এই সংস্কারের বশতাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ যে ইউরোপ নহে, ইউরোপীয় সমাজ ও স্বদেশীয় সমাজ যে বিস্তর বিভিন্ন, ইউরোপীয় রুচি ও দেশীয় রুচি যে সম্যক স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। যে দেশে সকল সময়ে সকল স্থানে সকল কর্মেই গান নইলে চলে না—আনন্দের কার্য দূরে থাকুক, মুমূর্ষু ব্যক্তিকে গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাইবার সময়েও সুস্বরের সঙ্গে হরিনামসংকীর্তন যে দেশের দীর্ঘকালের প্রথা—যে দেশে কালোয়াতি গান সকলে বুঝিতে পারে না বলিয়া অপর সাধারণের তৃপ্তির নিমিত্ত যাত্রা কবি পাঁচালি মরিচা তর্জা ভজন কীর্তন ঢপ আখড়াই হাফ্‌আখড়াই পদাবলী বাউলের গান প্রভৃতি বহু বহু প্রকার গীতিকাব্যের প্রচলন—অধিক কি, যে দেশে দিনভিকারী ও

রাতভিকারীরাও গান না গাইলে বেশি ভিক্ষা পায় না, সে দেশের হাড়ে হাড়ে যে সংগীতের রস প্রবিষ্ট হইয়া আছে, তাহাও কি আবার অন্য উপায়ে বুঝাইয়া দিতে হইবে? যাত্রাওয়ালারা স্বভাবের ঘাড ভাঙিয়া অপ্রাকৃত সং রং ঢং ইত্যাদি তামাসা দেখাইবার পরেও সহস্র সহস্র লোকের যে এতদূর চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থ হয় সে কি শুদ্ধ দেশস্থ লোকের অনভিজ্ঞতা ও গুণগ্রহণের অক্ষমতাপ্রযুক্ত? কদাচ নহে। স্বভাবের বৈপরীত্যে মনুষ্যলোকে যে যাহা করিবে, তাহা সভ্য অসভ্য শিক্ষিত অশিক্ষিত মনুষ্যমাত্রেরই ভাল লাগিবে না; তবে যে যাত্রাওয়ালারা সুসিদ্ধ হয়, তাহার কারণ কেবল তাহাদের গান ভিন্ন আর কিছুই না! যাত্রার দোষের মধ্যে স্থান কাল ও চরিত্রসম্বন্ধে স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি না রাখা, ও পক্ষে আবাব বর্তমান অনেক নাট্যাভিনয়ের মধ্যেও গানের অসংগতি বা অপকর্ষতাই একটা মহদ্দোষ। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় এই বোধ হয় যে. অভিনেতৃরা অধুনা যেরূপ অভিনয়ের নিমিত্ত যত্ন পান, তৎসঙ্গে গানের পারিপাট্যসাধনার্থ যদি তদ্রূপ মনোযোগী হইতে পারেন, তবে নিশ্চয় তাঁহাদের অভিনয়দর্শনসময়ে শ্রোতা ও দর্শকমণ্ডলী এককালে মোহে অভিভূত হইয়া গলিয়া যাইবেন! আমি এমন বলিতেছি না যে, যাত্রাওয়ালারা যেমন কথায় কথায়, অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্তৃতার পর কেবলই গানের আধিক্য করিয়া থাকে, নাটকেও তদ্রূপ হউক। আমার অভিপ্রায় এই যে, স্বভাবোক্তির পর যেখানে যেখানে গান খাটিতে পারে, তাহা উক্ত স্বাভাবিক নিয়মে সংখ্যায় যতই কেন হউক না, ফলতঃ যে কয়টি গান হইবে, সে কয়টি যেন উত্তমরূপে গাওয়া হয়। ফল কথা, আমরা মধ্যস্থ মানুষ; আমরা চাই দেশে পূর্বে যাহা ছিল, তাহার ধ্বংস না করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও। আমরা চাই, সেই যাত্রার গান সংখ্যায় কমাইয়া ও গাইবার প্রণালীকে শোধিত করিয়া নাটকের স্বভাবানুযায়ী কথোপকথনাদি বিবৃত হউক। এরূপে কোনো কোনো অভিনেতৃসম্প্রদায় যে কৃতকার্য হইয়াছেন তাহাও দেখা গিয়াছে। ভরসা করি. জাতীয় নাট্যসমাজ সর্বাগ্রে এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া যে মীমাংসায় উপনীত হইবেন, সেই মীমাংসানুসারে অনুষ্ঠান করিয়া এ বিষয়ের অঙ্গরাগ বাড়াইয়া তুলেন।" (বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে উদ্ধৃত পৃ ১৬৭) [১৩]

বাঙলা নাটকে সংগীতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মনোমোহনের এই বিশ্লেষণ ঐতিহ্যসমর্থিত এবং মনোমোহনের জনপ্রিয়তার ইঙ্গিতও এইখানেই নিহিত। যাঁদের উদ্দেশে মনোমোহন এই অনুরোধ করেছিলেন, তাঁরা এই প্রস্তাব পালন

না করলেও অন্তত একজন নাট্যকার মনোমোহনের প্রদর্শিত সূত্রেই বাঙলা নাট্যসাহিত্যে যুগান্তর এনেছিলেন। তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

বাঙলা নাট্যসংগীতের ইতিহাসে রাজকৃষ্ণ ও গিরিশচন্দ্র দুজনেই অক্লান্ত গীতিকার ছিলেন। দুজনের নাটক-গীতাভিনয়ের সংখ্যা যেমন যথেষ্ট, সেগুলিতে অনর্গল গীতযোজনায় এঁরা যুগপৎ মনোমোহনপন্থী, দুজনের কবিত্বশক্তিই ছিল সহজাত স্বভাবস্থ এবং দুজনেই পাঁচালি, হাফআখড়াই টপ্পার সুরে মুগ্ধ ছিলেন। দুজনের গীতরচনাই কেবল নাট্যবস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এঁদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র নাট্যসংগীতের জন্য বস্তুতই কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁর প্রতি নাটককেই তিনি গীতহারভূষিত করেছেন এবং গানের লোকায়ত সুরে দর্শক-শ্রোতৃমণ্ডলীকে তিনি পরিতৃপ্ত করেছিলেন। ১৩১২ সালের মধ্যে প্রকাশিত 'বাঙালির গানে'ই গিরিশচন্দ্রের গীতসংখ্যা সাড়ে তিনশতের অধিক, এরপর তাঁর সারস্বত জীবন আরও অন্তত ছয়-সাত বৎসর সকর্মক ছিল। গিরিশচন্দ্রের নাট্যসংগীতগুলি প্রধানত ভক্তিসংগীত, বিশেষ করে পৌরাণিক নাটকের দেবদেবীবন্দনা এবং প্রেমসংগীত। রাধাকৃষ্ণ এবং হরপার্বতী গিরিশচন্দ্রের গানে বহুব্যবহৃত—কখনও ভক্তিগীতে, কখনো প্রেমসংগীতে। তাছাড়া চৈতন্যবন্দনাও তাঁর গানে আছে। দেশাত্মবোধক গানের সংখ্যা সেই তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। আর এক ধরনের সামাজিক গীতেও তাঁর দক্ষতা ছিল—এইগুলি এক বা একাধিক নাট্যচরিত্রের দ্বারা রসিকতাসৃষ্টির জন্য রচিত। প্রচলিত সহজবোধ্য বাঙলা ভাষা, কথ্য বাঙলার শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ, ইতর গ্রাম্য শব্দ বা বাগ্ধারা ব্যবহারে গিরিশচন্দ্রের জুড়ি ছিল না। রাজকৃষ্ণের মত তিনিও ব্রজবুলি এবং হিন্দি ভাষায় গান লিখেছেন। গিরিশচন্দ্রের গানের গুণগ্রাহী জনৈক সমালোচকের অভিমত উদ্ধার করছি—

"ঘোর অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাইলে যেমন সে আলোক সহ্য করা যায় না, বাঙলার প্রাণেও ঠিক ইউরোপ হইতে যে আলোক সহসা বর্ষিত হইল তাহা সহ্য হইল না।⋯ ঈশ্বর গুপ্তের লেখার কোনোখানেই তাহা মিলে না। মাইকেলের অশেষ ক্ষমতা সত্ত্বেও তাঁহার ব্রজাঙ্গনা সেই পর্দার কাছেও পৌঁছতে পারে নাই, ব্রজ কবিতার শুধু নিতান্ত বাহিরের জিনিস লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন মাত্র। সুরেন্দ্র মজুমদারের মহিলা, বিহারীলালের বঙ্গসুন্দরী সারদামঙ্গল আমাদের আদরের সামগ্রী সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাদের কবিতাতেও সেই সুর সেইভাবে জাগে নাই।⋯⋯একমাত্র গিরিশচন্দ্র সেই গানের ধারা ও

ভাবের আভাসকে কবিওয়ালাদের পদানুকরণ করিয়া কতক পরিমাণে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন।[১৪] (মাঘ-ফাল্গুন ১৩২৯ সংখ্যা আনন্দসংগীত পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত)

এই প্রশস্তিবাচক সমালোচনা বস্তুত গিরিশচন্দ্রের কাব্যসংগীতগুলির সীমাবদ্ধতাই প্রমাণ করছে। কাব্যগীতে গিরিশচন্দ্র প্রাচীনতর যুগেরই ধারারক্ষী, কবিওয়ালাদেরই উত্তরাধিকার ও মার্জিত সংস্করণ। তাঁর অগণ্য নাট্যগীতে কবিসংগীতের মত সখীসংবাদ বিরহের পদ যেমন দেখা যায়, তেমনি আগমনী বিজয়া শ্যামাসংগীত গোষ্ঠ রাসলীলাজাতীয় পদেরও অভাব নেই, কয়েকখানি হাফআখড়াই গানও তিনি রচনা করেছিলেন। 'বাঙালির গানে' গিরিশচন্দ্রের জীবনীপ্রসঙ্গে লেখা হয়েছে—

"বাগবাজারে ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে হাফআকডাইয়ের গান রচনায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যশোকীর্তন ও সংবর্ধনা দেখিয়া গিবিশচন্দ্রের মনে কবি হইবার ইচ্ছা বলবতী হয়। তখন হইতেই তিনি কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন।"

এই কবিত্বশক্তির প্রকাশ তাঁর সংগীতগুলির মধ্যেই নিহিত। তাঁর অনেক গানে কবিত্বের স্পর্শ থাকলেও মোটের উপর আধুনিক কাব্যসংগীতেব সর্বতোভদ্র গুণ এগুলিতে অনুপস্থিত। তাঁর অধিকাংশ গানকে নাটকের স্থান-কাল থেকে উৎপাটিত করে আনলে স্বতন্ত্রভাবে সেগুলির কোনো মূল্যই থাকে না। অনেক গানের ভাষাই কলকাতার নিম্ন শ্রেণীর বাগ্‌ধারাশ্রিত, তাই ছন্দও সেগুলিতে চটুল, হসন্তবহুল শব্দের ব্যবহারে ছড়াজাতীয়। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং সুরকার ছিলেন না, অপরের সুর তাঁর গানগুলির জনপ্রিয়তার কারণ। স্বয়ং সুরকার হলে হয়ত গীতিকার হিসাবে তাঁর কবিত্ব আরও স্থায়ী হত।

পূর্বেই বলা হয়েছে গিরিশচন্দ্র দূরদর্শী নট ও নাট্যকার ছিলেন। নাটককে দর্শকদের রুচি ও চাহিদার অনুকূল করলে এবং জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, পৌরাণিক বিশ্বাস ও ভক্তিপ্রাণতার সজীব হৃৎস্পন্দনকে নাটকে রূপায়িত করলে তবেই বঙ্গনাট্যশালা পুনর্জীবিত হয়ে উঠবে, একথা তিনি শুধু বিশ্বাসই করেননি, প্রমাণ করেছেন। নাটকের শিল্পোৎকর্ষের চেয়ে এই জন-রুচিসন্তোষের জন্যই তিনি বাংলা সংগীতের ঐতিহ্যকে নাটকে যুক্ত করে দিয়েছিলেন। মনোমোহনের মতই তিনি টপ্পা-আখড়াই-পাঁচালি-যাত্রা-কবিগানের লঘুগুরু সংগীতসম্পদকে তাঁর নাট্যগীতের অঙ্গশোভাবর্ধনে প্রয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সেই অনুযায়ীই নাটকের ভাষা রচনা

করেছিলেন। তাঁর নাট্যসংগীতের মধ্যে চৈতন্যলীলা এবং বুদ্ধদেবচরিতের গান শিক্ষিত অশিক্ষিত দেশবাসীকে অভিভূত করেছিল। ১৮৮৪ সালের আগস্টে ও ১৮৮৫ সালের সেপ্টেম্বরে দুটি নাটকের অভিনয় সুরু হয়েছিল। চৈতন্যলীলার অভিনয় ও সংগীত এক কথায় সেদিনের নাগরিক জীবনে বিপ্লব এনে দিয়েছিল—স্বয়ং পরমহংসদেব এই নাটকের অভিনয় দেখতে এসেছিলেন এবং সেকালের প্রসিদ্ধ নটী বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করেছিলেন—এসব সংবাদ এখন কিংবদন্তী। চৈতন্যলীলার অনুপম সংগীতগুলি সেদিনের আর এক দিব্যজ্যোতির্ময় তরুণকে মুগ্ধ করেছিল—তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। এই সম্পর্কে বিবেকানন্দের জীবনচরিতকার লিখছেন—

"—'রাধা বই আর নাইকো আমার রাধা বলে বাজাই বাঁশি/মানের দায়ে সেজে যোগী মেখেছি গায়ে ভস্মরাশি।/ কুঞ্জে কুঞ্জে কেঁদে কেঁদে রাধা নামে বেড়াই সেধে/যে মুখে বলে রাধে তারে বল ভালবাসি'—
রাত্রে বাড়িতে নরেন্দ্রনাথ এই গানটি প্রাণের ভিতর থেকে নিজেদের অবস্থা প্রতিবিম্বিত হইতেছে, সেই উল্লেখ করিয়া অতি মধুর স্বরে গাহিতেন। গানের প্রত্যেক ভাব প্রত্যেক শব্দটি শ্রোতার গাত্র বিদ্ধ করিয়া অন্তর পর্যন্ত প্রবেশ করিত।·· ··নরেন্দ্রনাথ আর একটি চৈতন্যবিষয়ক গান গাহিতেন এবং তাহার দু চক্ষে অনবরত অশ্রু বিগলিত হইত—তুমি দ্বারে দ্বারে নাকি কেঁদেছ/কত পাষণ্ড হৃদয় কত কথা কয়/তবু নাকি প্রেম যেচেছ।"

(মহেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ ৮১-৮৩)

বুদ্ধদেবচরিতের 'জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই' গানটিও রচনাগুণে এবং স্নিগ্ধমধুর সুরের স্পর্শে অসাধারণ জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রায় প্রতিটি পরবর্তী কাব্যগীতসংকলনেই এই গানটি আছে। গানটি রামকৃষ্ণদেবের প্রিয় সংগীতগুলির অন্যতম। গিরিশচন্দ্রের জীবনীকার লিখেছেন –

"এই নাটকের (বুদ্ধদেবচরিত) 'জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই কোথা হতে আমি কোথা ভেসে যাই' বৈরাগ্যপূর্ণ গীতটি গিরিশচন্দ্রকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। গানখানি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরমপ্রিয় ছিল। এই গীতখানি গাহিতে গাহিতে বিবেকানন্দ স্বামী আত্মহারা হইয়া যাইতেন।" (অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—গিরিশচন্দ্র)

৩

উনিশ শতকের নাট্যসংগীতগুলির সবই যে সংশ্লিষ্ট নাট্যকারদেরই রচনা, এমন মনে করার কারণ নেই। কবিওয়ালা হাফআখড়াই-গায়করা অপরের বেঁধে দেওয়া গানে সুর করতেন। ক্রমে নাটকের গানও অভিজ্ঞ গীতিকারদের দিয়ে অনায়াসে লিখিয়ে নেওয়া হতে লাগল। কারণ নাট্যকারমাত্রই কবিপ্রতিভা-সম্পন্ন ছিলেন না। তাছাড়া নাটক-রচনাকালে গানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়নি, নাট্যাভিনয়কালে সংগীতের প্রয়োজনে নতুন করে গান লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ নাট্যকারই যেমন গানের সুরের জন্য অপরের উপর নির্ভরশীল ছিলেন, তেমনি গীত-রচনাতেও পরের সাহায্য নিয়েছেন। তবে কোন নাটকের গান কোন গীতিকাররচিত, যে বিষয়ে মুদ্রিত নাটকগুলিতে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কুলীনকুলসর্বস্বের অভিনয় উপলক্ষে এই নাটকের জন্য রূপচাঁদ পক্ষী কিছু নতুন গান রচনা করে দিয়েছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখেছেন—

"মহা ধুমধামে চুঁচুঁড়ায় কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের অভিনয় হইল…প্রসিদ্ধ গায়ক এবং গাথক রূপচাঁদ পক্ষী আসিয়া গান বাঁধিয়া দিলেন, তালিম দিলেন ; একদিন নিজে গাহিয়াও দিলেন। নাটকের নটীর গান হাটেবাজারে গীত হইতে লাগিল—'অধিনীরে গুণমণি পড়েছে কি মনে হে' ?"[১৫]

মধুসূদন পদ্মাবতী নাটকে নিধুবাবুর একটি জনপ্রিয় টপ্পা ব্যবহার করেছেন, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। রামনারায়ণ তর্করত্নের রত্নাবলী নাটকের গান লিখেছিলেন গুরুদয়াল চৌধুরী, মালতীমাধবের গীতকার ছিলেন বনোয়ারিলাল রায়। রামনারায়ণের নাট্যরচনার প্রযোজক ছিল জোড়া-সাঁকোর ঠাকুরবাড়ি—বাঙলা সংগীতে যাদের উৎসাহ এবং সুশিক্ষা এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। সুতরাং নাট্যসংগীতের জন্য স্বতন্ত্রভাবে সচেতনতা রামনারায়ণ তাঁর পৃষ্ঠপোষকদের কাছেই পেয়েছিলেন বলে মনে হয়। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন, মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকের ছটি গানের মধ্যে অন্তত একটি রামনারায়ণের হওয়া সম্ভব। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনেক নাটকের বহু গান যে অপরের রচনা তার প্রমাণ আছে। রবীন্দ্রনাথ অক্ষয় চৌধুরীর গান তিনি যত্রতত্র ব্যবহার করেছেন। জাতীয়তাবোধক জনপ্রিয় সংগীতগুলি নাটকে ব্যবহার করা এক সময়ে রেওয়াজ ছিল। হিন্দুমেলার 'মলিনমুখচন্দ্রমা', 'মিলে সব ভারতসন্তান' প্রভৃতি গান একাধিক নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে। উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবাবিবাহ নাটকের একটি প্রাচীন অভিনয় সম্পর্কে সংবাদপ্রভাকর

থেকে জানা যায় যে, "এই অভিনয়ের সংগীতসকল আমাদের পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ্ রায় মহোদয়ের দ্বারা রচিত হয়।······হাটখোলাস্থ গায়ক শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকাপ্রসাদ দত্ত মহাশয় এই সকল গীতের স্বরযোজনা করেন।"[১৬]

প্রথম জীবনে অপরের নাট্যরচনায় সংগীতরচনার দ্বারাই গিরিশচন্দ্রের সাহিত্যিক-জীবনের সূচনা হয়। পরবর্তীকালে এই কারণেই তাঁর নিজের নাটকে সংগীতের এত বহুলতা। তাঁর অভিনয়জীবনের একেবারে প্রথমদিকে মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা, দীনবন্ধুর সধবার একাদশী ও লীলাবতীর জন্য অনেকগুলি সংগীত রচনা করতে হয়।[১৭] লীলাবতীর জন্য রচিত দুটি গীত ('হরশংকর শশিশেখর পিনাকী' এবং 'বসেছিল বঁধু হেঁসেলের কোণে') পরে গিরিশচন্দ্রের লক্ষ্মণবর্জন ও বিল্বমঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। চুঁচুড়ায় লীলাবতীর অভিনয়কালে এই নাটকের জন্য অপরের গান রচনার আর একটি বিবরণ আছে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'পিতাপুত্রে'—

"·এই অভিনয়রঙ্গে (১৮৭২ খ্রী, ৩০ মার্চ) ৭।৮টি গান ছিল, দুই একটি আমার কৃত, আর অনেকগুলি সঞ্জীববাবুর রচিত। তাহার একটি উল্লেখ করা আবশ্যক। এক সময়ে এই গানটি আমি বৈদ্যনাথ বহরমপুর নাটোর কলিকাতা এবং আমাদের অঞ্চলে সমানে গাহিতে শুনিয়াছি।"[১৮]

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের হামির (১৮৮১) নাটকের গানগুলি গিরিশচন্দ্রের। কুঞ্জবিহারী বসুর কাঞ্চনকুসুম বা গোলেবকাওয়ালির (১৮৮১) গান কাশীশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের লেখা।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত বাঙলা নাট্যসংগীতের সমৃদ্ধির মূলে ছিলেন গিরিশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল। এই কয়েক দশকে নাটকের এবং নাট্যশালার সংখ্যাও বেড়েছে, অভিনয়ের জনপ্রিয়তাও তদনুরূপ। সুতরাং বাঙলায় কাব্যসংগীত প্রধানত নাটক ও নাটকাভিনয়কে অবলম্বন করেই আপনার জনপ্রীতি অক্ষুণ্ণ রেখেছে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষের দিকে প্রকাশিত কয়েকটি বৃহৎ নাট্যসংগীত-সংকলন[১৮] থেকেই গত যুগের জনপ্রিয় নাটক ও নাট্যসংগীতগুলির মোটামুটি একপ্রকার পরিচয় পাওয়া যাবে। করুণাকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর সম্পাদিত 'থিয়েটার সংগীতে'র ভূমিকায় লিখেছিলেন—

"সংগীতের আদর চিরকালই আছে, আর চিরকালই থাকিবে। জগতে এমন কোনো দেশ বা এমন কোনো জাতি নাই, যেখানে সংগীতবিদ্যার চর্চা

নাই।……এই রোগশোক-তাপময় সংসারে সংগীত সত্যই একটি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান।……বাঙলার বড ভাগ্য যে, বাঙলা ভাষা সংগীতের পক্ষে বড়ই উপযোগী। মনে হয় বাঙলা ভাষা যেন সংগীতেরই ভাষা।……তাই বঙ্গদেশে কবিহৃদয় হইতে সংগীত যেন স্বতঃই নির্গত হইয়া নিয়তই সর্বসাধারণের তৃপ্তিসাধন করিতেছে। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কবিগণ কতভাবে যে সংগীত রচনা করিয়া বাঙালির সংগীতপ্রীতির পরিচয় প্রদান করিতেছেন তাহার সংখ্যা নাই।……সংগীতের আদর দিন দিনই বাড়িতেছে, সংগীতসংখ্যাও যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, লোকের প্রাণে সংগীতস্পৃহাও ততই বলবতী হইতেছে। নানাবিধ সংগীতপুস্তক ও বিভিন্ন কবিগণের সংগীতাবলী বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইতেছে। কেহ কেহ নূতন পুরাতন বিবিধ সংগীত একত্রে প্রকাশিত করিতেও চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু এত অধিক সংগীত আছে, যাহা একসঙ্গে প্রকাশ করিবার চেষ্টা অসম্ভব। সেইজন্য কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের নাটক হইতে জনপ্রিয় মাধুর্যময় সুন্দর সুন্দর গানসমূহ একত্রে প্রকাশ করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। নাটকের গানগুলিই সাধারণের নিকট অধিক প্রিয়……"

এই গ্রন্থে যে নাটকের জনপ্রিয় সংগীতগুলি সংকলিত হয়েছে তার তালিকা—

১ম খণ্ড	বিল্বমঙ্গল	গিরিশচন্দ্র (১৮৮৮)
	জয়দেব	হরিপদ চট্টোপাধ্যায় (১৯১২)
	জনা	গিরিশচন্দ্র (১৮৯৩)
	চৈতন্যলীলা	„ (.৮৮৪)
	বুদ্ধদেবচরিত	„ (১৮৮৫)
	প্রভাসমিলন	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৭)
	পাণ্ডবগৌরব	গিরিশচন্দ্র (১৯০০)
	প্রহ্লাদচরিত	রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৮৪)
	নরমেধ যজ্ঞ	„ (১৮৯১)
	জন্মাষ্টমী	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৯)
	শ্রীকৃষ্ণ	অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৯৯)
	চতুরালী	রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৯৬)
	নন্দবিদায়	অতুলকৃষ্ণ মিত্র (১৮৮৫)
	শিবরাত্রি	অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৯৬)
২য় খণ্ড	মিশরকুমারী	বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত (১৯.৯)

	ছিন্নহার	অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৯২০)
	কুহকী	দেবেন্দ্রনাথ বসু (১৯১৯)
	উর্বশী	অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৯১৯)
	হীরার নথ	দাশরথি মুখোপাধ্যায় (১৯১৯)
	প্রতাপসিংহ	দ্বিজেন্দ্রলাল (১৯০৫)
	দেবলা দেবী	নিশিকান্ত বসু রায় (১৯১৮)
	রাজা ও রানী	রবীন্দ্রনাথ (১৮৮৯)
	ফুলশয্যা	ক্ষীরোদপ্রসাদ (১৮৯৪)
	রিজিয়া	মনোমোহন রায় (১৯০৩)
	চন্দ্রগুপ্ত	দ্বিজেন্দ্রলাল (৯১১)
	শর্মিষ্ঠা	মধুসূদন (১৮৫৯)
	কল্যাণী	হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮)
	রানা দুর্গাবতী	হরিপদ মুখোপাধ্যায় (১৯০৯)
	পৃথ্বীরাজ	মনোমোহন গোস্বামী (১৯০৫)
	বিষাদ	গিরিশচন্দ্র (১৮৮৮)
	পূর্ণচন্দ্র	গিরিশচন্দ্র (১৮৮৮)
৩য় খণ্ড	আলিবাবা	ক্ষীরোদপ্রসাদ (১৮৯৭)
	আবু হোসেন	গিরিশচন্দ্র (১৮৯৩)
	সাজাহান	দ্বিজেন্দ্রলাল (১৯১০)
	প্রমোদরঞ্জন	ক্ষীরোদপ্রসাদ (১৮৯৮)
	মেবারপতন	দ্বিজেন্দ্রলাল (১৯০৮)
	বাজীরাও	মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১১)
	রেশমী রুমাল	মনোজমোহন বসু (১৯২০)
	তরুবালা	অমৃতলাল বসু (১৮৯০)
	রঘুবীর	ক্ষীরোদপ্রসাদ (১৯০৩)
৪র্থ খণ্ড	কৃপণের ধন	অমৃতলাল (১৯০০)
	শাস্তি কি শান্তি	গিরিশচন্দ্র (১৯০৭)
	রাতকানা	নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১৭)
	লয়লা মজনু	রাজকৃষ্ণ (১৮৯১)
	হীরে মালিনী	,, (১৮৯১)
	আলাদিন	গিরিশচন্দ্র (১৮৭৮)

	রাজা বসন্ত রায়	(কেদারনাথ চৌধুরী কর্তৃক বউ-ঠাকুরানীর হাট নাট্যীকৃত)
	দেবী চৌধুরানী	(অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক নাট্যীকৃত)
৭ম খণ্ড	কণ্ঠহার	দাশরথি মুখোপাধ্যায় (১৯১৫)
	পরদেশী	পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় (১৯১৯)
	খাসদখল	অমৃতলাল (১৯১১)
	সিংহলবিজয়	দ্বিজেন্দ্রলাল (১৯ ৫)
	সোরাব-রুস্তম	,, (১৯০৮)
	আনন্দবিদায়	,, (১৯ ২)
	দুর্গাদাস	,, (১৯০৬)
	বঙ্গে বর্গী	নিশিকান্ত বসু রায় (১৯২২)
	বরুণা	ক্ষীরোদপ্রসাদ (১৯০৮)
	পিয়ারে নজর	পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় (১৯১৭)
	পদ্মিনী	ক্ষীরোদপ্রসাদ (১৯০৬)

এতগুলি খ্যাত-অখ্যাত নাট্যকারের নাটক থেকে জনপ্রিয় সংগীতগুলি সংকলন করে সম্পাদক কাব্যসংগীতপ্রিয় শ্রোতাদের রসরুচি ও কাব্য-গ্রাহিতারই পরিচয় রক্ষা করেছেন। অবশ্য আধুনিক পাঠকের বিচারে আলোচ্য নাটকের সংগীতগুলি সবই উৎকৃষ্ট কাব্যগীত হয়ে উঠেছে কিনা গভীর সন্দেহের বিষয়। সংগীতের জনপ্রিয়তা বহুলাংশে সুরারোপের উপর নির্ভর করে। সুতরাং সুষ্ঠুসুরের সহযোগিতাতেই বহু গান জনপ্রিয়তাধন্য হয়েছিল তাতে দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু গানের বিষয়ের অবদানও সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় নয়। রাজকৃষ্ণ-গিরিশচন্দ্রের হাতে বাঙলা পৌরাণিক নাটক উনিশ শতকের শেষভাগে অত্যন্ত সমাদর অর্জন করেছিল, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্তিধর্মের পটভূমিকায় কলকাতার নাট্যামোদী সমাজে যে একটি ভক্তিরস-প্রবণতা ছড়িয়ে পড়েছিল, আলোচ্য গীতসংকলনে পৌরাণিক নাটকের বাহুল্য ও ভক্তিবিষয়ক গানগুলির সংখ্যা থেকেই তা বোঝা যায়। কৃষ্ণলীলা বৃন্দাবন-লীলা ব্রজলীলা বাঙলা পৌরাণিক নাটকের একটি পরমাদৃত বিষয়ে পরিণত হয়েছিল, চৈতন্যলীলার গীত-ভক্তিভাবান্দোলনে গিরিশচন্দ্র নাগরিক জীবনকে অভিভূত করে দিয়েছিলেন। সুতরাং এই সকল কারণেই বৈষ্ণব অনুষঙ্গবিজড়িত, আধুনিক ভঙ্গিতে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদের অনুরূপ কাব্যসংগীত রচনার জোয়ার এসেছিল। বিল্বমঙ্গল (গিরিশচন্দ্র), জয়দেব (হরিপদ চট্টোপাধ্যায়), জনা

(গিরিশচন্দ্র), প্রহ্লাদচরিত্র (রাজকৃষ্ণ রায়), চতুরালী (রাজকৃষ্ণ), নন্দবিদায় (অতুলকৃষ্ণ মিত্র), প্রভাসমিলন (বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়), চৈতন্যলীলা (গিরিশচন্দ্র), জন্মাষ্টমী (বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়), শ্রীকৃষ্ণ (অমরেন্দ্রনাথ দত্ত) প্রভৃতি নাটকের জনপ্রিয় গানগুলি সবই পদাবলীর বিষয় বা ভাবাবলম্বনে রচিত। সেই সঙ্গে ত্রিশূলেশ্বর-মহাদেব-হরবন্দনাও বাঙলা নাটকে ভাল করেই প্রবেশ করেছে। অবশ্য এই ধরনের দেবদেবীবন্দনা মধুসূদন-রাম-নারায়ণ-মনোমোহনের নাটক-গীতাভিনয়েও পাওয়া যায়। তবে গিরিশচন্দ্রই প্রচুর পরিমাণে বৈষ্ণবীয় ভাবের গান রচনা করেছেন। এই সকল গানের পিছনে জনরুচির চাহিদাই নাট্যকার-গীতকারদের প্রেরণা ছিল। স্বভাবধর্মভীরু কোমল গীতরসপিপাসু অসাম্প্রদায়িক ও সহজ-ভাবালু দর্শক-শ্রোতার সমাদরই এই জাতীয় গানের সৃষ্টি ও প্রসারের ঐতিহাসিক মূল্য নির্ধারণের নিরিখ হওয়া উচিত। এমন কি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবানুষঙ্গে অনেকগুলি গান রচনা করেন এবং সেইগুলির সাহায্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বসন্তলীলা (১৯০০) নামে একটি গীতিনাট্য প্রস্তুত করেছিলেন।

অধরচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সংগৃহীত 'বৃহৎ থিয়েটার সংগীতে' অর্ধশত বাঙলা নাটক থেকে গৃহীত কয়েক শত জনপ্রিয় নাট্যসংগীত আছে। নাট্যকার ও তাঁদের নাটকগুলির নাম —

১ম খণ্ড	দেবলা দেবী	নিশিকান্ত বসু রায় (১৯১৮)
	কিন্নরী	ক্ষীরোদপ্রসাদ (১৯১১)
	পানিপথ	অতুলানন্দ রায় (১৯১৭)
	মোগলপাঠান	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১৬)
	কণ্ঠহার	দাশরথি মুখোপাধ্যায় (১৯১৫)
	বংবাহার	যতীন্দ্রনাথ পাল (১৯১৮)
	পরদেশী	পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১৯)
	রাতকানা	নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১৭)
	রামানুজ	অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৯১৬)
	চিতোরোদ্ধার	প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (১৯১৮)
	জয়পরাজয়	(১৯১৮)
	ঝকমারি	গিরিশচন্দ্র (? অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯১১)
	জয়দেব	হরিপদ চট্টোপাধ্যায় (১৯১২)

	ওথেলো	দেবেন্দ্রনাথ বসু (?)
	গুরুদক্ষিণা	মনোমোহন বসু (? দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৯০৭)
	সওদাগর	ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১৫)
	মুখের মত	নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১৯)
২য় খণ্ড	ক্ষত্রবীর	ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১৪)
	কুরুক্ষেত্র	নারায়ণচন্দ্র বসু (?)
	অহল্যাবাঈ	মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১৪)
	চন্দ্রগুপ্ত	দ্বিজেন্দ্রলাল (১৯১১)
	তপোবন	গিরিশচন্দ্র (১৯১১)
	মগধ-সিংহাসন	হরনাথ বসু (১৯০৯)
	খাসদখল	অমৃতলাল (১৯১১)
	পলিন	ক্ষীরোদপ্রসাদ (১৯১০)
	বিজিয়া	মনোমোহন রায় (১৯০৩)
	আলিবাবা	ক্ষীরোদপ্রসাদ (১৮৯৭)
	আবু হোসেন	গিরিশচন্দ্র (১৮৯৩)
	জনা	„ (১৮৯৩)
৩য় খণ্ড	আহেরিয়া	ক্ষীরোদপ্রসাদ (১৯১৩)
	আনন্দবিদায়	দ্বিজেন্দ্রলাল (১৯১২)
	নুরজাহান	„
	কল্যাণী	হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮)
	কৃপণের ধন	অমৃতলাল (১৯০০)
	শাস্তি কি শান্তি	গিরিশচন্দ্র (১৯০৭)
	মেবার-পতন	দ্বিজেন্দ্রলাল (১৯০৮)
	রংরাজ	অতুলকৃষ্ণ মিত্র (১৯০৯)
	সাজাহান	দ্বিজেন্দ্রলাল (১৯১০)
	বাজীরাও	মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১১)
	সোরাব-রুস্তম	দ্বিজেন্দ্রলাল (১৯০৮)
৪র্থ খণ্ড	রঘুবীর	ক্ষীরোদপ্রসাদ (১৯০৩)
	যৎকিঞ্চিৎ	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৯০৮)
	রানী দুর্গাবতী	হরিপদ মুখোপাধ্যায় (১৯০৯)

প্রতাপসিংহ	দ্বিজেন্দ্রলাল (১৯০৫)
শিবরাত্রি	অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৯৬)
শংকরাচার্য	গিরিশচন্দ্র (১৯১০)
বলিদান	,, (১৯০৫)
উর্বশী	অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৯১৯)
হীবার নখ	দাশরথি মুখোপাধ্যায় (১৯১৯)

উনবিংশ শতাব্দীর নাট্যসংগীতের ধারা বিংশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত একই রীতিপদ্ধতিতে সঞ্চরমান ছিল বলে অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের অনেকগুলি নাটকও আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সময়কালের দিক থেকে এই শতকের হলেও এইগুলি মূলত রস ও রুচির দিক থেকে গত শতাব্দের অনুবৃত্তি তাতে সন্দেহ নেই। দ্বিজেন্দ্রলালই সাধারণভাবে মঞ্চনাটকের সংগীতের বিশিষ্টতাকে আশ্চর্যভাবে বদলে দিয়েছিলেন, যদিও রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংগীত এই ব্যাপারে দ্বিজেন্দ্রলালের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। আবার দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসংগীতের প্রভাব তাঁর সমকালীন সমস্ত নাট্যসংগীতের উপরই অল্পবিস্তর লক্ষ্য করা যায়।

৪

উনিশ ও বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের নাট্যসংগীতে গতানুগতিক প্রেমানুরাগ, চপলচটুল সখীদের লাস্যগীত, মানাভিমান-প্রকাশের প্রথাবদ্ধ রীতিই প্রাধান্য লাভ করেছে। এদের ভিতর গীতিপ্রতিভার অভাব থাকলেও নাট্যপ্রয়োজন চরিতার্থ করা এবং সুরের মাধুর্যে জনপ্রিয় হওয়ার উপাদান ছিল। ব্যঙ্গরস ও পরিহাস, হাস্য প্রাসাঘাতপ্রধান ছন্দ, আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার নজরুলের বহুপূর্বেই বাঙলা কাব্যসংগীতে প্রবেশ করেছিল, এই তথ্যটি মনে রাখার মত। মুসলমানি অন্দরমহলের বিলাসবৈভব, আদব-কায়দা, হারেমসুন্দরীদের অপসৃয়মাণ ওড়নার ফাঁকে প্রেমকটাক্ষবিতরণ, পুরসুন্দরীদের নূপুরনিক্কণ ও মঞ্জীরধ্বনির সঙ্গে সহচরী সখীদের বিলোলতরল নৃত্যগীত বাঙলা নাট্যসংগীতের এই পর্বের একটি প্রধান অংশ জুড়ে আছে। ওমরখৈয়াম হাফেজের সুরে সুর মিলিয়ে গীতিকারগণ কাব্যসংগীতে যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংগীতের সঙ্গে তার পার্থক্য অনেক। নিশিকান্ত বসু রায় রচিত জনপ্রিয় দেবলা দেবী নাটকের দুটি গান এখানে উদ্ধারযোগ্য —

আমার বিবি
ও তার রূপের চোটে রোশনি জ্বলে
কোথায় লাগে পটের ছবি।
জানির গলা এমনি মিঠে কথা কয় মধুর ছিটে,
কোয়েলা ঘাড় তোলে না, রা কাড়ে না,
কে জানে সে বাসা ছেড়ে কোন কবরে থাকে পাখি।
রুমালে আতর মেখে মিশি দাঁতে সুরমা চোখে
খোঁপাতে জড়িয়ে মালা ছড়িয়ে আলা
চলে জানি ঠাটঠমকে
ও তার গুণের কথা কবতে ব্যক্ত হার মেনে যায় হাফেজ কবি।

নাট্যপরিবেশ-বহির্ভূত করে বিচার করলে এই ধরনের কাব্যসংগীতের মূল্য অনেকখানি কমে যায়। তাছাড়া আলোকিত বর্ণোজ্জ্বল মঞ্চে, মঞ্জীরনিক্কণ-ধ্বনির সঙ্গে আবিষ্ট সংগীতের সহযোগে, সুকণ্ঠী গায়কগায়িকার পরিবেশনগুণে এই গানগুলি যে অনায়াসে শ্রোতৃবর্গের মনোহরণ করতে সক্ষম হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। এই প্রকার আর একটি উক্ত নাটক থেকে—

ঝনরন ঝনরন পিয়ালা বাজে
রুনুঝুন রুনুঝুন মঞ্জীর বাজে।
বেণুবীণা ঘন বাজে মৃদঙ্গ
হৃদয়ে উঠিছে তানতরঙ্গ
আও আও পিয়ারি নাচি ঘুরি ফিরি
হেলই দুলই সারি সারি সারি,
হানি শর আঁখিশর ভুলায়ে প্রণয় ঝড়
পিয়াসী প্রেমিক হৃদয়মাঝে।

প্রেমতত্ত্ব এই পর্বের নাট্যসংগীতের একটি প্রিয় বিষয়, কারণ প্রেমই রোমান্টিক নাটকের মুখ্য আকর্ষণ। দ্বন্দ্বসংঘাত মানাভিমান অশ্রুজল ভুলবোঝা ও ভুলভাঙার মধ্য দিয়ে নাটকীয়তা জমে ওঠে, আর তারই মধ্যে সুরের মাধুর্য বিকিরণ করে নাট্যকারগণ দর্শক ও শ্রোতাদের নাট্যব্যতিরিক্ত আনন্দ-প্রমোদের অংশ দান করেন। প্রেমতত্ত্ব-বিষয়ক গানগুলি কিন্তু প্রায়শই মৌলিকতাবর্জিত। 'প্রীতিগীতি' নামক প্রেমসংগীতের সুবৃহৎ সংকলনে বহু শত প্রেমসংগীতের তুলনায় এই নাট্যসংগীতগুলি নতুন ভাবধারা প্রচার করতে পারেনি। যেমন, নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাতকানা নাটকের একটি গান—

প্রেমফাঁদে পড়ে কেঁদে শেষে হয় সারা
প্রেমের কেমন এ ধারা।
কত সুখের ছবি জাগে, তাদের নয়নের আগে
প্রেম করে যারা ;
চোখে চাওয়া তখন বিষম দায়
গলাতে চাইলে পা কেবল জড়ায়
প্রাণভরা কথা মুখে না জুয়ায়
অন্তর হলে বয় আঁখিধারা।...

উনিশ শতকের প্রেমসংগীতের তুলনায় এই গানগুলির প্রকাশভঙ্গি হয়ত পৃথক কিন্তু বক্তব্যের দিক থেকে প্রায় একই ধরনের। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরদেশী নামক নাটকের একটি গান—

প্রেমে যদি হবে সুখী বোঝ আগে প্রেমটা কী
নইলে মুখোমুখি গলা ধরি বসি কাঁদলে হবে কী ?
প্রেম যদি করতে চাও আপন প্রাণ বিলিয়ে দাও
নইলে সাধো কাঁদো পায়ে ধরো বুঝবে শেষে সব ফাঁকি।
ঘৃণা লজ্জা ভয় তিনটি থাকতে নয়
পাগল সেজে আকাশ পানে চাইলে কিবা হয়।
প্রেম খাঁটি সোনা খাদ মেশে না চলে না তায় বুজরুকি।
যে জন যারে চায় পায় কি সে তায়
ধরি ধার করে ফিরে ধরতে না পারে
যখন মনে প্রাণে বাঁধন পড়ে তখন প্রেম এসে দেয় উঁকি।

আর একটি গানে রবীন্দ্রনাথের মায়ার খেলার ধ্বনি শোনা যায়—

রূপের লাগিয়া বেসো নাকো ভাল
ভালবেসে সুখ পাবে না পাবে না
রূপমদনেশা ছুটে গেলে প্রাণে মিলনেতে সুখ হবে না হবে না।
যৌবন হেরিয়ে যদি ভালবাসা সে যে নিমিষের না পুরিবে আশা,
যৌবন ফুরাবে ভালবাসা যাবে বাঞ্ছিত ফিরে চাবে না চাবে না।
ধনবিনিময়ে প্রেমের কামনা সে ত নহে প্রেম প্রেমের ছলনা,
শুধু প্রাণবিনিময়ে ভালবাসাবাসি ধন দিলে প্রেম মিলে না মিলে না॥

কিন্তু কয়েকটি প্রেমের গানে কাব্যধর্মিতার সুস্পষ্ট প্রকাশ আছে। যেমন, দেবলা দেবী নাটক থেকে একটি গান—

প্রেমের এই ধারা
বিরহে মর্মদাহন মিলনে আত্মহারা
এই চোখে চোখে দুটি আছে বসে
এই পথ চেয়ে বসে কার আশে ;
এই কনক-উজ্জল-বরণী হেরে নির্মল কিবা ধরণী
মেঘ ওঠে এই হৃদয়াকাশে প্রবল ধারা নয়নে বরিষে
হেরে তিমিরবরণী ধরা।
এই ফুলের ভূষণ করি আভরণ
আপনি আপন মুগ্ধ,
এই ছিঁড়ে ফুলমালা বলে বড জ্বালা
করিছে হৃদয় দগ্ধ।
এই মলয় পরশে শিহরে হরষে
আবেশে বিভোর দৃষ্টি,
এই বেশভূষা টেনে ফেলে দেয় দূরে
সমীরে গরল বৃষ্টি ;
এই রক্তিম অধরে হাসিব রেখাটি
এই ঘৃণিত নয়নে ভীষণ ভ্রূকুটি
যেন পাগলিনীপারা॥

অতুলানন্দ রায়ের পানিপথ নাটক থেকে প্রেম সম্পর্কে আর একটি গান—

না হলে আপনহারা প্রেম কি মেলে
পবশে হৃদয়বসে সুধা উথলে।
প্রেম দেয় ধরা যাবে তারে থাকে কোথায় কয় না কারে
ধরে সে যে ধরতে পারে আপন ভুলে।
প্রেম কভু না থাকে বশে আসে যদি আপনি আসে
প্রেম সরল প্রাণ ভালবাসে।
বোঝে না সে বুঝব বলে।

কয়েকটি গানে প্রেমের বাহ্যিক উল্লাস, সুখানুভাবের অন্তঃশায়ী নীরব বেদনা, প্রেমিকের ক্ষণতৃপ্ত ঔদাস্য ও প্রেমপাত্রীর প্রতি বৈপরীত্যমূলক মনোভাব, প্রেমিকের মনোরঞ্জনের জন্য প্রেমিকেব বেদনাগোপনপূর্বক কটাক্ষপ্রযত্ন ইত্যাদি মনোভাবের চারুপ্রকাশ ঘটেছে—নাটকের বাইরেও এইগুলি কাব্যসংগীতরূপে সুখপাঠ্য। যেমন, দেবলা দেবী নাটকের আর একটি গান—

তবে ফুটাও অধরে হাসি
প্রাণহীনা মোরা শুষ্ক তটিনী পরম সুখস্রোতে ভাসি।
অতিবেদনায় নয়নে অশ্রু যদিও ছুটিতে চায়
নিবারি সে বারি চারু কটাক্ষ হানিতে হইবে তায়,
শ্রান্ত ক্লান্ত চরণ যদি ঢলিয়া পড়ে আবেশে
মোরা, তথাপি গাইব তথাপি নাচিব মাতিব সবে হরষে।
মোদের, হৃদয়-উৎস চিরনিরুদ্ধ তবু মোরা ভালবাসি।
মোরা, দুদিনের তরে বিশ্বমাঝারে ফুটিয়াছি যেন ফুল
তোমরা সোহাগে তুলে নিয়ে বুকে কহিছ 'নাহিক তুল'।
কাল, বাসি হব যবে দূরে ফেলে দিবে নয়ন ফিরাবে চরণে দলিবে
হবে, হাসিরূপগান সব অবসান ধূলাতে যাইব মিশি।

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী কবি হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর চিতোরোদ্ধার নাটকে কয়েকটি উৎকৃষ্ট কাব্যসংগীত আছে[১৭]। প্রেমতত্ত্বের একটি গান অবশ্য পুরাতন যুগের কাব্যগীতেরই প্রতিধ্বনি—

বাধা পেলে জ্বলে আরও   এইত প্রেমের ধারা
সরমে মরমে শেষে   আপনি আপন হারা।
নিরাশে পিয়াসা বাড়ে   ছাড়ালে প্রেম না ছাড়ে
কাঁদিতে কাঁদিতে শুধু   জীবন জনম সারা।

ঐ নাটকের আর একটি প্রেমের গানে প্রকৃতির পটভূমিকায় রোমান্টিক কবিমনের আধুনিক স্পর্শ পাওয়া যায়—

আমার পরাণখানি লুট হয়েছে   সে এক ফাগুন মাসে
যখন কুসুম দেশে পড়ে সাড়া   ফুলের জোয়ার আসে।
যখন ভরা চাঁদের ভরা শোভায়   স্বর্গ গলে ধরা ডোবায়,
বাতাস যখন আকাশময়   বেড়ায় হাহুতাশে।...

নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখের মত নাটকের আর একটি জনপ্রিয় প্রেম-সংগীত—

মন কি ভুলে মুখের কথায়   প্রেমিক হৃদয় চোখে ভাসে,
নয়নে মিললে নয়ন   আপনি বদন মুচকে হাসে।
সোহাগভরা দেখলে আঁখি   বুঝতে কি আর থাকে বাকি
প্রাণে প্রাণে হয় মাখামাখি—
লুকান মরম কথা   নীরবভাবে নয়ন ভাষে।

প্রেমতত্ত্ব-প্রকাশের এই প্রথাগত রীতিটি দ্বিজেন্দ্রলালের গানেও লক্ষণীয়। মেবারপতন নাটকের একটি অনুরূপ গান উদ্ধৃত করে প্রেমিকবিষয়ক নাট্যগীতি-গুলির পরিশিষ্ট টানা যেতে পারে—

প্রেমে নর আপনি হারায় প্রেমে পর আপনি হয়
আদানে প্রেম হয়নাকো হীন, দানে প্রেমের হয় না ক্ষয়।
প্রেমে রবিশশী উঠে প্রেমে কুঞ্জে কুসুম ফুটে,
বনে বনে মলয়সনে পাখি গাহে প্রেমের জয়।
সাগর মিলে আকাশতলে আকাশ মিলে সাগরজলে
প্রেমে কঠিন পাষাণ গলে প্রেমে নদী উজান বয়।
স্বর্গ মর্তে আসে নেমে মর্ত স্বর্গে উঠে প্রেমে
প্রেমের গান গগনভরা প্রেমের কিরণ ভুবনময়।

নিধুবাবু হরুঠাকুরের প্রীতিগীতির তুলনায় অবশ্য এ গান অনেক বেশি কাব্যসৌরভময়, গভীরতায় সীমাস্পর্শী এবং রোমান্টিক কবিমনের হিরণ্ময় দ্যুতিতে উদ্ভাসিত হয়েছে।

৫

বাঙলা নাটকের একটি গরিষ্ঠ অংশ দেশগৌরবদীপ্ত এবং স্বদেশমনস্ক সংগীতে সমৃদ্ধ। হিন্দুমেলার যুগ থেকেই দেশপ্রেমাত্মক জনপ্রিয় গানগুলি ইতিহাসাশ্রিত নাটকে বাঙালির স্বদেশচেতনা-সঞ্জীবনের কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা' (১৮৭৩) নামক রূপকনাট্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ-রচিত 'মলিনমুখচন্দ্রমা ভারত তোমারই' এবং সত্যেন্দ্রনাথ-রচিত 'মিলে সব ভারতসন্তান' গান দুটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল[২০]। মহেন্দ্রলাল বসুর[২১] চিতোর রাজসতী পদ্মিনী (১৮৭৫) নাটকেও এই দুটি জাতীয় সংগীত এবং রঙ্গলালের 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়' গানগুলি আছে। ১৮৭৫ সালের ৩ জুলাই 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় এই নাটকের অভিনয়ের যে বিবরণ আছে, তাতে দেখা যায়, নাট্যসমাপ্তিতে জনপ্রিয় অভিনেত্রী যাদুমণি 'ভারত-সংগীত' গানটি গেয়েছিলেন। হরিমোহন ভট্টাচার্যের সমরে কামিনী (১৮৭৫) নাটকেও হিন্দুমেলার প্রাগুক্ত গানগুটি আছে। হিন্দুমেলায় জনধন্য জাতীয়-গীত-রচনাকারী মনোমোহনের 'সতী' ও 'প্রণয়পরীক্ষা' নাটকেও এই সব স্বদেশ-ভাবব্যঞ্জক গান স্থান পেয়েছে, ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। অমৃতলাল বসুর 'নবজীবন' (১৯০১) নাটকেও 'মলিনমুখচন্দ্রমা' 'মিলে সব ভারতসন্তান' এবং

রবীন্দ্রনাথের 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' গান তিনটি আছে। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে নাট্যাভিনয়ের উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারি হলে এই জাতীয় ভাবোচ্ছ্বাস সাময়িকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে বাঙলা স্বদেশপ্রেমাত্মক নাটক ও নাট্যসংগীত পুনরায় উজ্জীবন লাভ করে। অতুলানন্দ রায়ের পানিপথ নাটকের একটু জনপ্রিয় দেশাত্মগীত—

ধন্য মোদের হিন্দুস্থান।
ধর্মঅর্থ মোক্ষকাম চতুর্বর্গধাম হিন্দুস্থান
বীরপ্রসবিনী ত্রিদিববাঞ্ছিত
জ্যোতিস্থরঞ্জিত ষড়ঋতুশোভিত হিন্দুস্থান।
সকল ভারতময় উঠে আজি এর জয়
মরতে দেবতা তুমি হে নরপ্রধান।…

চিতোরোদ্ধার নাটকে প্রমথনাথের একটি সুরচিত অনুত্তেজিত স্নিগ্ধ দেশ-প্রীতির গান অবশ্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করে—

ওগো আমার মাটির স্বর্গ মাথায় রাখি তোমার চরণ
হও না মাটি সোনা খাঁটি তুমি আমার জীবন মরণ।
আলোয় নেয়ে তোমার ক্ষেতে সবুজ হরষ ওঠে মেতে
তোমার রূপে ভুবন আলো ওগো আমার কালোবরণ।
আছে তোমার অতীত উজ্জ্বল আছে তোমার সাধনের বল,
তোমার বুদ্ধি তোমার সিদ্ধি কাহার সাধ্য করে বারণ? …

স্বদেশপ্রেমাত্মক এবং অন্যান্য কাব্যসংগীতে দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙলা নাটকের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে যুগান্তর এনেছিলেন, সুতরাং দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক নাট্যসংগীতে দ্বিজেন্দ্রপ্রভাব গভীরভাবেই পড়েছিল। গিরিশচন্দ্রের সিরাজদৌল্লা এবং দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতাপসিংহ উভয় নাটকই বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের পটভূমিকায় অভিনীত হয় এবং দুই নাটকের অভিনয়রীতি ও সংগীত পরবর্তী বাঙলা নাটকে প্রবলভাবে সঞ্চারিত হয়। তাঁর যে কোনও নাটকেই মোটা-মুটি প্রেমবিষয়ক দেশপ্রীতিমূলক এবং পরিহাস-ভাবমূলক—এই তিনজাতীয় গান অল্পবিস্তর থাকে। এর মধ্যে, প্রেমসংগীতের তুলনায় দেশাত্মবোধক ও জাতীয়তাবাদমূলক গানগুলির ভাষা-ছন্দ-সুরে দ্বিজেন্দ্রলালের এমন একটি মৌলিকতা প্রকাশ পেয়েছে যা অন্যত্র দুর্লভ। প্রতাপসিংহ (দ্বিজেন্দ্র-রচনাসংগ্রহে রাণা প্রতাপ সিংহ, স্টারে রাণা প্রতাপ নামে প্রথম অভিনীত)

নাটকের এই গানটি দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত 'হাস্য শুধু আমার সখা' কবিতাটিকে মনে করিয়ে দেয়—

সুখের কথা বোল না আর বুঝেছি সুখ কেবল ফাঁকি।
দুঃখে আছি, আছি ভাল, দুঃখেই আমি ভাল থাকি।
দুঃখ আমার প্রাণের সখা, সুখ দিয়ে যান চোখের দেখা
দুদণ্ডের হাসি হেসে, মৌখিক ভদ্রতা রাখি।
দয়া করে মোর ঘরে সুখ পায়ের ধূলা ঝাড়েন যবে
চোখের বারি চেপে রেখে মুখের হাসি হাসতে হবে ;
চোখে বারি দেখলে পরে, সুখ চলে যান বিরাগভরে
দুঃখ তখন কোলে ধরে আদর করে মুছায় আঁখি।

প্রতাপসিংহ নাটকেই দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত 'এ কি দীপমালা পরি হাসিছে রূপসী এ মহানগরী সাজি' এবং 'ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণজয় গাথা' গান দুটি আছে। এই জাতীয় ভাবোদ্দীপক গান নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালই প্রথম ব্যবহার করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সমকালীন ও পরবর্তী নাটকে স্বভাবতই এর প্রভূত অনুসরণ ঘটেছে। যেমন নিশিকান্ত বসু রায়ের দেবলা দেবীতে এই গানটি অবিসংবাদিতভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের 'ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে'র অনুরূপ—

চল চল সবে সমরক্ষেত্রে জননী আজ্ঞা তোর
মত্ত চিত্ত করিছে নৃত্য মাতিব সমরে ঘোর।
উচ্চশির নত, গর্বমান হত,
নৃপতি মোদের শত্রুকরগত
রাজভক্ত কেবা বীরপুত্র বটে,
যে যেথায় আছ এসো সবে ছুটে,
ভীমবলে সবে ভল্লঅসি করে
ঝাঁপায়ে পড়িব বিপক্ষ মাঝারে
অর্জিত মান বর্জিত প্রাণ রাখিব রাজারে মোর।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোগলপাঠান নাটকের সবকটি গানই দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যসংগীতের আদর্শে রচিত। যেমন একটি প্রেমের গান—

আমরা প্রেমের ভিখারিনি
বিয়োগে মিলনে কুটিরভবনে তোমাদের অনুগামিনী
আমরা, প্রখর রবির কিরণপারা
মোরা, বরিষার মেঘ ঢালিগো অমিয়ধারা,.

আমরা, আঁধারে ভ্রমি হয়ে দিশাহারা

মোরা আলো ধরে ডাকি এস পথহারা

কত সাধিয়ে কত কাঁদিয়ে শেষে ভুলায়ে সবারে পথে আনি।

রিজিয়া নাটকে মনোমোহন রায়ের একটি কাব্যসংগীতে সৌন্দর্যের স্পর্শ আছে, যা দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে মনে করিয়ে দেয়। রিজিয়া নাটকটি স্কটের কেনিলওয়ার্থ অবলম্বনে রচিত। কাব্যসংগীতটির অংশবিশেষ সংকলিত হল—

এস হে সখা হৃদয়ে আঁকা

দেখ হে আসিয়া মুরতি তোমার।

তুমি নয়নশোভন অঞ্জন আমার তুমি হৃদয়রঞ্জন কুসুমহার।

তুমি মাধুরী রাতে পাপিয়াতে তুমি শারদ প্রাতে বাঁশির গান।

তুমি লজ্জাবিজড়িত নববঁধুব বুকে আধমুকুলিত প্রেমপিপাসা।...

দেবলা দেবী নাটকের একটি ভক্তিগীত গানের পরিচিত আঙ্গিক পরিত্যাগ করে একটি সুরচিত কাব্যসংগীতের মর্যাদালাভ করেছে। পূর্বযুগের মনোমোহন-গিরিশচন্দ্রের গানের সঙ্গে এর পার্থক্য স্বতই চোখে পড়ে—

আমি চাহি না হইতে এ বিশ্বজগতে

বিরাট বিপুল বিস্ময় মহান।

কর মোরে ধন্য সৃজিয়ে নগণ্য

যাহে জীব লভয়ে কল্যাণ। হে ভগবান॥

আমি চাহি না হইতে অনন্ত জলধি

লবণাক্ত বারি নাহিক অবধি;

কর মোরে ক্ষুদ্র নির্মল কূপ

স্নিগ্ধ হবে জীব বারি করি পান। হে ভগবান॥

আমি চাহি না হইতে বিরাট হিমাদ্রি

উর্দ্ধশীর্ষ নভোবক্ষোভেদী

কর মোরে সমতলভূমি

শস্য লভি জীব ধরিবে পরাণ। হে ভগবান॥

আমি চাহি না হইতে মহান মহীরুহ

যোজনবিস্তৃত বিশালদেহ

কর মোরে ক্ষুদ্র বংশদণ্ড

দণ্ড করি অন্ধ করিবে প্রয়াণ। হে ভগবান॥

দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দোসংগীত ও কাব্যাদর্শের সার্থক অনুকরণ হিসাবে সুরেন্দ্রনাথের মোগলপাঠান নাটক থেকে একটি গান—

ভেঙে গেছে মোর সোনার স্বপন ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার
আজি হৃদয় ভরিয়া উঠিছে কেবল মরণ ভেদি হাহাকার
যেদিকে তাকাই শুধু নাই নাই সকলি গিয়াছে চলিয়া
আছে বাকি শুধু জীর্ণ স্মৃতিটুক তাই লয়ে মরি কাঁদিয়া।
টুটে গেছে আশা মিছে কেন আশা ফিরে আসা আশা নাহিক আর।

বাঙলা নাট্যসংগীতে হাস্যপরিহাসমূলক চটুল লঘুসুরের বহু গান উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে জমে উঠেছিল। মনোজমোহন বসুর 'রেশমী রুমাল' থেকে উদ্ধৃত এই গানটি অমৃতলাল-গিরিশচন্দ্রের গত শতকের পরিহাসভাবাত্মক গানগুলির অনুরূপ—

গানের মত গাই যদি একটা গান
শুনলে পরে ভুলবে নাকো জন্মকালা হবে কান।
কালোয়াতি তালের চোটে ব্রহ্মবন্ধ উঠবে ফুটে
খিল ধরবে বুকে পেটে পালাই-পালাই করবে প্রাণ।
ধরলে পরে টপ্পা খেয়াল ভাববে বুঝি ডাকছে শেয়াল
আবার রাসভ-রাগে পাইলে ধ্রুপদ রজক হবেন আগুয়ান।
দিলে পরে সিটকিরি ই-ই, মাথার ভিতর করবে রি-রি-রি,
আবার ধমক মেরে গমক দিলেই ভবলীলা অবসান।

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের নন্দবিদায়ের প্যারডি হিসাবে রচিত [illegible] আনন্দবিদায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-গ্লানিতে উপচিত ছিল বলে বাঙালি শিক্ষিত সমাজে এর প্রচার ঘটেনি। কিন্তু আনন্দবিদায়ের প্যারডি ও হাসির গানগুলি স্বতন্ত্রভাবে জনপ্রিয় ছিল। আনন্দ-বিদায়ের গানগুলির তালিকা এখানে দেওয়া হল—

১. দুঃখের কথা বলব কত ছেলেটা বিগড়েছে কাকা
২. এখনো তারে চোখে দেখিনি শুধু কাব্য পড়েছি
৩. দেখে যা দেখে যা লো তোরা
৪. সে আসে ধেয়ে এন. ডি. ঘোষের মেয়ে
৫. সে যে শক্ত ভারি খুড়ো
৬. জাগ জাগরে নেপাল
৭. হেলে দুলে গোঠে চল গোঠবিহারী

৮. আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি তুমি লিজার মাফিক
৯. মনে কর শেষের সেদিন ভয়ংকর ছাঁদ
১০. তোমারই তুলনা তুমি চাঁদ অকর্মার ধাড় এবং সখি শ্যাম না এল
১১. কৃষ্ণ বলে, আমার রাধে বদন তুলে চাও
১২. বিভব সম্পদ ধন নাহি চাই
১৩. কেন যামিনী না যেতে জাগালে না
১৪. আয় রে আয় কবিবরের সঙ্গে যাবি কে কে আয়
১৫. ওরে রে রে নেপাল আমার কলিকাতায়
১৬. আহা ভেবো না আহা ভেবো না
১৭. ওরে শ্যাম বংশীধারী (চট্টগ্রামবিহারী)
১৮. আয়রে ভাই আয় চলে আয় চটপট
১৯. মার মার মার ধর ধর ধর কাট কাট কাট
২০. জয় জয় জয় জয় জয় জয় নেপালচন্দ্র ভাট
২১. আর তো চাটগাঁয় যাব না ভাই
২২. আয়রে ফিরে আয়রে বাবা
২৩. আমি আর কি যেতে পারি বাবা
২৪. আজ চল চল চট্টগ্রামে পুনর্বার
২৫. মোলাম মোলাম সখি একা হল পরমাদ
২৬. নিপট কপট তুহুঁ শ্যাম আবে

আধুনিক ধনতন্ত্রশাসিত সমাজে টাকার ভূমিকা নিয়ে অনেকগুলি পরিহাস-মূলক নাট্যসংগীত পাওয়া যাচ্ছে। বৈকুণ্ঠনাথ বসুর 'পৌরাণিক পঞ্চরং' থেকে একটি গান[২২]—

লক্ষ্মী। যার ধন নাই তার নিধন ভাল এই ধনের সংসারে
ধনে কেনে সকল সুখ ধনে মূকের ফোটে মুখ
যার ধন নাই তার দেখে নারে মুখ দারাসুত পরিবারে।
ধন দুর্বলের বল হয়, ধন হয়কে করে নয়,
ধনে কুরূপকে স্বরূপ করে নির্গুণকে গুণময়
আবার ধনের জোরে হায়রে হায়রে
যুধিষ্ঠির হয় জোচ্চোরে।
ধনে হয় নির্দোষী দণ্ডিত, কত ষণ্ডে হয় পণ্ডিত,
কত অকালকুষ্মাণ্ড হয় উপাধিমণ্ডিত,

ধনে খুনে পায় প্রাণ আছে রে প্রমাণ

ফাঁসির আসামী দ্বীপান্তরে।

প্রেমধন অধিকারীর [২৩] চন্দ্রবিলাস নাটক (১৮৬৬) থেকে বাউলসুরে রচিত এই শ্রেণীর একটি গান—

কিনা বল হয় টাকায়

হেন কাজ নাইকো ধবায় টাকায় যা না সাধা যায়।

টাকাতে হাসায় কাঁদায় ভেলকি লাগায় সব কথায়।

টাকার জোরে আর কি বল বাঘের বাপের শ্রাদ্ধ হয়

থাকলে টাকা সবাই মানে নইলে কেবা কথা কয়।

পরের ছেলে টাকা পেলে বাবা বলতে আগে চায়।

টাকার তরে সবাই পাগল হায়রে টাকা হায়রে হায়।

অতুলানন্দ রায় তাঁর ঐতিহাসিক নাটক পানিপথে আধুনিক মুদ্রা-অর্থনীতির বিষয়-সংকটকে গানে প্রকাশ করেছেন—

টাকা টাকা টাকা

তোমার শুভ্রবরণ চক্রগমন তোমাবিনা সব ফাঁকা।

যারে তুমি হও প্রসন্ন ধাবায় সে গণ্যমান্য

হোক না কেন বুদ্ধিশূন্য

লোকে করে ধন্য ধন্য বলে পণ্ডিতের কী ভাবমাখা।

আবার যারে তুমি হও বিমুখ দুনিয়াতে তার কোথা সুখ!

মাগ বোঝে না প্রাণের দুখ ভূত বলে পুত চায় না মুখ

ভাবে বৃথা ভবে প্রাণ রাখা।

নানা সাজে দুনিয়ামাঝে পেতে কুহকফাঁদ

কী খেলা খেল রূপচাঁদ;

দানধর্মে ক্রিয়াকর্মে কারে বা মাতাও

বিলাসে রঙ্গরসে আহা কারে বা ডুবাও

কোথা বাধিয়ে লড়াই রক্তস্রোতে মেদিনী ভাসাও

কোথা বা সন্ধি চেলে শান্তি ঢেলে ঘুরাচ্ছ সংসারচাকা।......

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সওদাগর নাটকের একটি গানও একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি মাত্র—

টাকা টাকা টাকা তুমি আছ জগৎ চেয়ে

সূর্যি আঁধার তোমার কাছে তুমি মিষ্টি মধুর চেয়ে।

নেইকো টাকা যার তাতে কিছুই নেইকো সার
তার জাতকুলমান জ্ঞানের বড়াই সবই ফক্কিকার ;—
হয় হাড়ি ডোমও পূজ্য সবার—টাকা তোমায় পেয়ে
সইয়ের বউয়ের বকুলফুলও টাকায় আপন হয়…

৬

বাঙলা নাট্যসংগীতের সাধারণ বিবর্তনধারায় রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংগীতগুলির প্রভাব দূরপ্রসারী ও সূক্ষ্ম, কিন্তু প্রত্যক্ষগোচর নয়। রবীন্দ্রসংগীতের সৌকুমার্য, কাব্যগর্ভ ব্যঞ্জনা, সুরের নিজস্ব আবেদন সাধারণজনরুচির কাছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত তীব্র ছিল না। তাছাড়া কাব্যপাঠক বা শিক্ষিত সমাজের তুলনায় নাট্যদর্শকের রুচি অধিকতর স্থূল ও সাধারণস্তরের একথা অস্বীকার করা যায় না। সেইজন্য বাঙলা নাট্যসংগীত কিছুটা স্থূলতার পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে, সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের দিকে যায়নি। এই কারণেই বাল্মীকিপ্রতিভা, মায়ার খেলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সেকালে গৃহীত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের গান জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গীতিনাট্যে ব্যবহৃত হয়েছে, ভারতীয় সংগীতসমাজে অভিনীত হয়েছে, কিন্তু পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে নিত্য-অভিনীত নাটকে বহুব্যবহৃত হয়নি। বরং দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসংগীতের আদর্শ অন্যান্য গীতিকারদের দ্বারা তদপেক্ষা বেশি অনুসৃত হয়েছে। অবশ্য বাঙলা রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি গান কয়েকবারই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং সেইসূত্রে কিছু রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংগীতও অন্যান্য নাট্যসংগীতের মত জনপ্রিয় হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্রের অন্যতম নাট্য-সহযোগী কেদারনাথ চৌধুরী। 'রাজা বসন্ত রায়' নামে পরিচিত এই নাটকের অভিনয় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয় হয়েছিল[২৪] এবং ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ডে লিখেছেন যে এই অভিনয়ের জন্যই রবীন্দ্রনাথের গান সাধারণের মধ্যে প্রথম ছড়িয়ে পড়ে। রাজা বসন্ত রায় নাটকে রবীন্দ্রনাথের এই গানগুলি ছিল—বঁধুয়া অসময়ে কেনহে প্রকাশ, আজ তোমারে দেখতে এলেম, মলিন মুখে ফুটুক হাসি, হাসিরে পায়ে ধরে রাখিবি, সারা বরষ দেখিনে মা, ওরে যেতে হবে আর দেরি নাই, আমার যাবার সময় হল, মা আমি তোর কী করেছি, আমিই শুধু রইনু বাকি, আর কি আমি ছাড়ব তোরে। কয়েকটি গান অবশ্য গীতিবিতানে নেই, কেবল বউঠাকুরানীর হাটেই আছে এবং অন্যান্য কিছু গান কবি পরবর্তীকালে প্রায়শ্চিত্ত নাটকে গ্রহণ

করেছেন। প্রবীণ অভিনেতা স্বর্গীয় রাধামাধব কর বসন্ত রায়ের ভূমিকায় সুমধুর সংগীতে দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলেন বলে অবিনাশচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থে জানিয়েছেন।

বাঙলা নাট্যসংগীতের পরিচ্ছন্নতায়, কাব্যসম্পদে, ছন্দের পরিপাটী ব্যবহারে অনেক নাট্যকারের উপরই রবীন্দ্রসংগীতের প্রভাব পড়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। মনোমোহন রায়ের রিজিয়া নাটকের গানগুলি জনপ্রিয় হয়েছিল তার কবিত্বসৌকুমার্যের গুণেই। রিজিয়া নাটকের একটি কাব্যগীতি রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের গানগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়—

সে কেন আমার পানে ফিরে ফিরে চেয়ে গেল
কী যেন কী তার মরমকথা নয়নকোণে কয়ে গেল।
সরমে মূরছি আঁখি চুরি করে ছবি দেখি
বসন্ত বাতাসে যেন প্রাণের মাঝে বয়ে গেল।
যত ফুল যত্ন করে তুলেছিনু সাঁঝের বেলা
আঁচলে রহিল বাঁধা মালা গাঁথা রয়ে গেল।

একটি বিরহবিষাদের গীতেও রবীন্দ্রসংগীতের মৃদুপ্রভাব লক্ষ্য করা যায়—

যদি পরাণে না জাগে আকুল পিয়াসা
বঁধু হে শুধু দেখা দিতে আসা এস না
ভালবেসে যদি দুঃখ পাও সখা
তোমার পায়ে ধরি ! আমায় ভালবেস না।
আমি একলা বসিয়ে সারাটি দিন
চেয়ে রব ঐ পথের পানে
আমি সারাটি রজনী রহিব জাগিয়ে
চাঁদও জাগিবে আমার সনে।
তুমি যাহা চাও সখা ! দিব ফিরাইয়ে—
শুধু স্মৃতিটুকু ফিরে চেও না॥

আধুনিক যুগের ঔপন্যাসিক-নাট্যকার মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অহল্যাবাঈ' নাটকের একটি গান স্পষ্টই রবীন্দ্রসংগীতের বাণীতে চিহ্নিত—

তোমায় হৃদয়ে রাখিব যতনে
এস এস সখা হৃদিমাঝে আঁকা এস এ হৃদয়ভবনে।
সখা তুমি ধাতা তুমি ভগবান,

অন্ধজনে দেহ আলো মৃতজনে দেহ প্রাণ,—
তুমি করুণাকণামৃতসিন্ধু ঢাল ইন্দুকিরণ ভবনে।……

ভারতী-পর্বের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের অনেকগুলি নাটক রঙ্গমঞ্চে সাফল্যলাভ করেছিল এবং নাট্যসংগীত-রচনাতেও সৌরীন্দ্রমোহন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর যৎকিঞ্চিৎ নাটকের একটি গানে মায়ার খেলার কাব্যগীতের প্রভাব—

দে লো সখী পরায়ে গলে সুরভিকুসুম মালা
বিভূতি মাখায়ে দে লো সারা দেহে জুড়ায় প্রাণেরই জ্বালা।
কারে যেন চাই জানিনাকো তারে
এ আসে সে আসে সে-তো আসে না রে,
মনোমত বিধি মিলাল না রে কেমনে কাটাব বেলা।

অন্যান্য নাট্যকারদের নাটকে ইতিপূর্বে স্বরচিত সংগীত ছাড়াও প্রাচীন শ্যামাসংগীত বা পদাবলীর ভগ্নাংশ দেখা গেছে। সৌরীন্দ্রমোহন তাঁর নাটকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংগীতও ব্যবহার করেছেন। যৎকিঞ্চিৎ নাটকে 'এখনো তারে চোখে দেখিনি' গানটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাছাড়া 'সখী আমারই দুয়ারে কেন আসিল নিশিভোরে যোগী ভিখারি' গানটির কয়েক পংক্তিও এতে আছে।

বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্তের মিশরকুমারী নাটকখানি বাঙলা নাট্যসংগীতের ইতিহাসে একটি অধ্যায়বদলের ক্রোশাঙ্ক। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত গানগুলি নাট্যসংগীতের কাব্যধর্মিতাকে স্থূল গতানুগতিকতা ও অভ্যস্ত পৌনঃপুনিকতা থেকে উৎকৃষ্ট কবিত্বময় চারু প্রকাশে ও ছন্দের সৌষ্ঠবে উন্নীত করেছে, তাছাড়া গানের ব্যবহারিক প্রয়োজনকে স্বীকার করেও স্বয়ংসম্পূর্ণ কাব্যসংগীত রচনার চেষ্টা করেছে। যে কোনো উপলক্ষে একটি রাধাকৃষ্ণলীলার গান বা শ্যামাবিষয়ক ভক্তিগীতি বা সখীদের সকৌতুক প্রণয়চতুরতার কটাক্ষসংগীত অথবা নর্তকীদের লাস্যগীতের পরিবর্তে ব্যক্তিগত প্রেমপ্রকাশের ভাবাবেগপূর্ণ সংগীতের আবেদন যে অনেক গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, নাটকের গানগুলি তারই প্রমাণ। যেমন—

আমার এ হিয়াখানি তোমার চরণতলে বিছায়ে
দিয়েছি পথের মাঝে,
জীবনে মরণে সখা আমি যে তোমারই
জীবন সঁপেছি তব কাজে।

আমার নয়নকোণে কাল কাজলের রেখা
ধুয়ে যায় নয়নজলে,
নিতি আসে নিশীথিনী ঘুমের পসরা লয়ে
নিতি ফিরে যায় বিফলে।
দিনযামিনী মোর পূজায় কাটিয়া যায়
ধেয়ানে তোমার বাণী বাজে
ভুবন ভরিয়া মোর গগন ছাপিয়া গো
তোমারই রূপের জ্যোতি রাজে।

এই জাতীয় গানে নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য ও নাট্য-সংগীতের প্রভাব আছে। এ যেন কবিতাকেই সংগীত করে তোলা, ইতিহাসের স্থানকালপাত্রকে অতিক্রম করে আধুনিক কবিমনের রোমান্টিক সৌন্দর্যাভিসার—

সে কোনখানে, কোন পরাণের মাঝখানে
শত বসন্ত ছিল ঘুমন্ত জেগেছে তোমার আবাহনে।
জোছনা লুটায় চরণে, পরিমল মাখি গায় মঙ্গল দখিনে।
সোহাগে বহিয়া যায় সখা কোনখানে,
চিরবাঞ্ছিত স্বপনের ছবি দেখেছ সে কার নয়নে?
খুলেছ কুসুমলতার বাঁধন ভুলেছ বঁধু কেমনে?

ছন্দের ও স্তবকবিন্যাসের দিক থেকে গান এখন কবিতার কাছাকাছি এসেছে, প্রচলিত গীতভঙ্গির রীতি অন্ধভাবে সে অনুকরণ করে না। মিশরকুমারীর আর একটি কাব্যগীতি থেকে তার উদাহরণ দ্রষ্টব্য—

সে যে মম মধুমাখা ভুল
তরুণ অরুণরাগে সদা জাগে মম আঁখির আগে
আমার সে বিভব অতুল।
বেদনায় গলে যায় প্রাণ,
অশ্রু নামিয়া আসে রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাসে
ভেঙে বুক হয় শতখান,
তবু পথপানে চাই তবু হাসি গাহি গান,
পুলকে বেড়িয়া রাখি স্মৃতি সে মাধুরীমাখা
পোড়া প্রাণ পিয়াসে আকুল,
সে মোর মধুমাখা ভুল, আমার বিভব অতুল।

বাঙলা নাট্যসংগীতে রাজকৃষ্ণ-মনোমোহন-গিরিশচন্দ্রের পর্ব শেষ হয়ে গেছে,

এই গানগুলি তারই পরিচয়বাহী। এখন গানের ভাষায় কবিতার লাবণ্য, সুরেও রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলালের রোমান্টিক আবেগ স্পষ্টতর। তাই অমৃতলাল বসুর মত অপেক্ষাকৃত প্রাচীনপন্থী নাট্যকারও খাসদখল নাটকের জন্য এই কাব্যগীতটি রচনা করেছেন—

কবিতাকুমারী এস ধীরি ধীরি আমার কুঞ্জকুটির মাঝে
সাজাব তোমার ছন্দগন্ধহারে কাকলিকূজিতা কথার সাজে।
পাষাণপ্রতিমা ভাস্করের করে বহ্নিবায়ু জল তরে আয়ু হরে
তুমি কর অবিনাশী নরযশোরাশি মহতের কাজে।
শোকাকুল ভুলি তুমি গো হাসাও চঞ্চল চপলে কাঁদায়ে ভাসাও,
বিবাহবরণে তোমার চরণে মৃদুল মঞ্জীর বাজে;
তুমি ফুটাও লো বোল লুটিয়ে বঁধুর মধুর লাজে।

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ছিন্নহার নাটকের একটি গান রবীন্দ্রসংগীতের রীতিটিকে অনিবার্যভাবে স্মরণে আনে—

শোনাব নতুন সুরে গান
অনেকদিনের ব্যথায়-ভরা ব্যাকুল-করা তান।
বইবে হাওয়া নিছক দক্ষিণে
ছুটবে কুসুম ছুটবে সুবাস রঙিন ফাগুনে,
চাঁদনিরাতে পাপিয়ার ডাকে উঠবে মেতে প্রাণ,
আকুল ধরা আপনহারা সুখের লহর বইবে উজান।

তৎসত্ত্বেও একথা বলা যেতে পারে যে বাঙলা নাট্যসংগীতের সাধারণ প্রবণতা দুঃখজনক। মুষ্টিমেয় কয়েকজন আধুনিক নাট্যকারের সুরচিত কাব্য-সংগীতের তুলনায় লঘু প্রমোদাত্মক রুচিবিকৃত গানের জনপ্রিয়তা গত কয়েক দশক পূর্বেও বাঙলা মঞ্চকে আচ্ছন্ন করেছিল। গিরিশচন্দ্রের আবুহোসেন ক্ষীরোদপ্রসাদের আলিবাবা-র হাল্‌কা সুর দীর্ঘকাল বাঙালি শ্রোতার কাছে অবিমিশ্র আনন্দের জোগান দিয়ে এসেছে। চটুল গানের জনপ্রিয়তার দিক থেকে আলিবাবা এই শতকের বিদ্যাসুন্দর[২৫]। ক্ষীরোদপ্রসাদের অন্যান্য নাট্য-গীতগুলি অবশ্য কাব্যগুণে সমৃদ্ধ ও ভাবময়, নাট্যগত হলেও স্বতন্ত্র কবিতারূপে সুলিখিত। ক্ষীরোদপ্রসাদের কাব্যসংগীতগুলিতে যুগপৎ গিরিশযুগ ও রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলালের যুগের প্রভাব আছে। তাঁর কিন্নরী নাটকের কুড়িটি গান, পলিন নাটকের ষোলটি গান, আহেরিয়া নাটকের সাতটি গান, আলিবাবা নাটকের ছত্রিশটি গান ও রঘুবীর নাটকের চারটি গান জনপ্রিয়

হয়েছিল। পাত্রপাত্রীর যুগলসংগীত, কথোপকথনের ভঙ্গিতে গান ও বিজাতীয় ভাষাব্যবহার তাঁর কোনো কোনো গানের লোকপ্রীতির হেতু। আলিবাবা নাটকের প্রভাবে বাঙলা নাট্যসংগীতে ঐ জাতীয় অসংখ্য বিকৃত গীত রচিত হয়েছিল, যেগুলির ভাষা হিন্দিবাঙলামিশ্রিত, ছন্দ শ্বাসাঘাতপ্রধান, আড়খেমটা তালে ও হাল্কা সুরে আশ্রিত। এই জাতীয় গানের কিছু উদাহরণ পাওয়া যাবে পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের পরদেশী নাটকে।

বিংশ শতকের থিয়েটারসংগীত বা নাট্যসংগীত গ্রামোফোন রেকর্ড[২৬] ও চলচ্চিত্রের সহায়তায় আধুনিক বাঙলা গানের বিচিত্র-বিপুল ইতিহাসের পথে এগিয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই অগ্রগতি কাব্যের লাবণ্যমসৃণ পথে ঘটেনি, রুচিহীনতার ও প্রথাবদ্ধতার সংকীর্ণ পথ ধরে কাব্যসংগীতের একটি ধারা আজ লোকদৃষ্টির বাইরে হারিয়ে গেছে। সম্ভবত এই জাতীয় গান সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথ একবার মন্তব্য করেছিলেন—

"আমাদের শিল্পসংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা আমরা হারাইয়াছি। আমাদের জীবনের সঙ্গে তাহার যোগ নিতান্তই ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে।......আমাদের ঘরে ঘরে গ্রামোফোনে যে সকল সুর বাজিতেছে, থিয়েটার হইতে যে সকল গান শিখিতেছি, তাহা শুনিলেই বুঝিতে পারিব আমাদের চিত্তের দারিদ্র্যে কদর্যতা যে কেবল প্রকাশমান হইয়া পড়িয়াছে তাহা নহে, সেই কদর্যতাকেই আমরা অঙ্গের ভূষণ বলিয়া ধারণ করিতেছি।"[২৭]

অবশ্য বিলাতে বসে বিদেশী ঐকতানবাদন ও পাশ্চাত্য বিশ্ববিখ্যাত সুরের পরিমণ্ডলে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য আমাদের তৎকালীন নাট্যসংগীত ও অনতিঅতীত কাব্যসংগীতের প্রতি সুবিচার করেনি। কারণ কবির ভাষা স্মরণ করেই বলা যায় যে 'সস্তা খেলো জিনিসকে কেহ একেবারে পৃথিবী হইতে বিদায় করিতে পারে না।' তারই ভিতর দিয়ে বিবর্তনের পথরচনা হতে থাকে। গত শতকের মধ্যভাগ থেকে এই শতকের গোড়ার দিকের ঈষৎ-আলোচিত নাট্যসংগীতগুলির অধিকাংশই আজ বিস্মৃতির রুদ্ধপটে আত্মগোপন করেছে। নাট্যগ্রন্থের বিবর্ণ পৃষ্ঠায় তাদের মৌন মুদ্রিত কাটদষ্ট বাণীতে আর সুর ধ্বনিত হয় না, অপ্সরা-কিন্নরীদের নূপুরমঞ্জীর বেজে ওঠে না, ছন্দে ছন্দে বাদ্যযন্ত্রে কনসার্টের ঐকতান শোনা যায় না। এমন কি কোনো সংকলনগ্রন্থেও এই গানগুলি ধরে রাখার সযত্ন প্রয়াস নেই। অথচ বাঙলা কাব্যসংগীতের ধারাটিকে টপ্পা তর্জা আখড়াইয়ের বিকৃতরুচি আসর থেকে ভদ্র শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চিত্তমণ্ডলীতে এরাই প্রবাহিত করে দিয়েছিল। অসংখ্য নাটকের

সংখ্যাতীত গানে প্রতিভার পরিচয় দেওয়া দ্বিজেন্দ্রলাল-রবীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, কিন্তু ওষধি প্রতিভার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এই নাট্যসংগীতগুলি পৌনঃপুনিকতায় ক্লান্ত। আধুনিক চারুশীলিত মার্জিত মনের কাছে পুনরুক্তি, একই ধরনের ভাষা ও ছন্দের নিরর্থক আবৃত্তি এবং সর্বোপরি প্রায় একই নাট্য পরিস্থিতির দ্বারা চিহ্নিত। তবু এদের মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব ছিল না। সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে কবিরা অলংকারের চমক, প্রকাশভঙ্গির মৌলিকতা, নতুন করে কিছু প্রকাশ করার অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। তাছাড়া নাটকের নানা প্রয়োজনে চরিত্রের মধ্যে গানের ব্যবহারের দ্বারা তাঁরা কাব্যসংগীতের ব্যবহারিকতার সীমাও প্রসারিত করেছেন. রোমান্টিক ভাবোচ্ছ্বাস ব্যতীত মনোভাবপ্রকাশের সর্ববিধ ক্ষেত্রেই কাব্যসংগীত রচনার সুস্থ ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন। এইজন্যও বাঙলা কাব্যগীতের ইতিহাসে এই নাট্যসংগীত ও তার রচয়িতাদের স্থান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হবে।

১। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (৩য় সং)

২। রত্নাবলীর ভূমিকা, ডঃ সুকুমার সেনের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (৩য় সং), পৃঃ ৩৬ পাদটীকায় উদ্ধৃত

৩। "রত্নাবলী গীতাভিনয় [হরিমোহন কর্মকার] যেমন যাত্রাপালার দিকে আগাইয়া গেল জানকীবিলাপ [হরিমোহন] তেমনি যাত্রা নাটকের কাছাকাছি উঠিয়া আসিল।"—প্রাগুক্ত গ্রন্থ

৪। এঁর 'সাবিত্রীসত্যবান গীতাভিনয়' (১৮৬৭) গানের জন্য প্রসিদ্ধ হয়েছিল

৫। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৮

৬। তদেব, পৃ ১০

৭। "··The songs are appropriate and exquisite···We hope the opera will supersede the degenerate Jattra." May 22, 1865, তদেব, পৃষ্ঠা ৮৮-তে উদ্ধৃত

৮। ডঃ সুকুমার সেনের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড (৩য় সং) উদ্ধৃত। প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য 'অপেরা'—ভারতকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪

৯। 'ভারতীয় সংগীতমুক্তাবলী'র ভূমিকাংশে উদ্ধৃত

১০। সম্পাদককর্তৃক সংকলিত গীতসংকলন হলেও এতে মনোমোহন-রচিত 'হাফআখড়াই সংগীতসংগ্রামের ইতিহাস' বিষয়ে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ আছে। 'উনিশ শতকের কাব্যসংগীত: 'গীতরূপ-বৈচিত্র্য' অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে

১১। মনোমোহন সম্পাদিত 'মধ্যস্থ' পত্র, পৌষ ১২৮০

১২। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ ৩৫

১৩। মধ্যস্থ পত্র, পৌষ ১২৮০ সংখ্যায় বক্তৃতাটি প্রকাশিত হয়

১৪। বাঙলার গীতিকবিতা—চিত্তরঞ্জন দাশ। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চিত্তরঞ্জন গিরিশচন্দ্রের গানের ধারা ও ভাবের আভাসের মধ্যে বাঙলার প্রাচীন যে ঐতিহ্য লক্ষ্য

করে পুলকিত হয়েছিলেন, তার পিছনে গিরিশচন্দ্রের গানের বাণী যতটা দায়ী সুর তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু গিরিশচন্দ্র তাঁর গানে নিজে সুর দিতেন না। গিরিশচন্দ্রের বহু জনপ্রিয় গানের সুর দিয়েছিলেন শশিভূষণ কর্মকার, রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, রামতারণ সান্যাল প্রমুখ একাধিক সুরকার। বীণাবাদিনী শ্রাবণ ১৩০৫ ১ম সংখ্যা ২য় ভাগে 'লৌকিক থিয়েটারের গান' শিরোনামায় 'যে ধরতে পারে ধরা দি গো তারে' গানটির স্বরলিপি মুদ্রিত হয়েছে। সুরকার শশিভূষণ কর্মকার। বীণাবাদিনী পৌষ ১৩০৫ সংখ্যায় 'লৌকিক গান' শিরোনামায় গিরিশচন্দ্রের 'সাগরকূলে বসিয়া বিরলে হেরিব লহরীমালা' গানটির স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে। সুরকার বেণীবাবু। এই বেণীবাবু ছিলেন সংগীতাচার্য বেণীমাধব রায়চৌধুরী। বিবেকানন্দও প্রথম জীবনে তাঁর ছাত্র ছিলেন। ইনি চৈতন্যলীলাও সুরকার

প্রথম পরিচ্ছেদ পাদটীকা ১০ দ্রষ্টব্য

১৫। পিতাপুত্র—অক্ষয়চন্দ্র সরকার ; হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সংকলিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের অন্তর্গত

১৬। সংবাদ প্রভাকর—১৪মে, ১৮৫৯। 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে' পুনরুদ্ধৃত

১৭। বাঙলা নাটকের ইতিবৃত্ত—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (১৩৫৪)। পৃ ১৪৯

১৮। থিয়েটার সংগীত / ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম খণ্ডে সম্পূর্ণ। শ্রীকরুণাকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত, প্রাপ্তিস্থান বেঙ্গল লাইব্রেরী। ৮নং গুরু ওস্তাগরের লেন, দর্জিপাড়া, কলিকাতা। ১ম সংস্করণের তারিখ ১৩১৮, ২য় সংস্করণ ২০ শ্রাবণ ১৩৩০

বৃহৎ থিয়েটার সংগীত / ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ খণ্ডে সম্পূর্ণ / শ্রীঅধরচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত, ১৩২৬

১৯। প্রমথনাথের অন্যান্য কাব্যসংগীত সংকলিত হয়েছে 'গান' নামক গ্রন্থে (১৯০২)। এই গানগুলি স্বরলিপিসহ মুদ্রিত, প্রমথনাথ স্বয়ং সুরকার। উনবিংশ শতাব্দীর দেশাত্মবোধক সংগীতের আলোচনায় প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর কয়েকটি স্বদেশপ্রেমাত্মক গানের উল্লেখ আছে

২০। কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সে যুগের একজন দক্ষ অভিনেতা ছিলেন। ভারতমাতা রূপক নাট্যটি ('দৃশ্য কাব্য') ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল বলে অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "সাধারণে বিষয়টি বড় এপ্রিসিয়েট করলে। ভারতমাতার কখানা প্রচলিত গান ছিল। সেগুলার আদর খুব বেড়ে গেল।" হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত রচিত 'বাঙলা নাটকের ইতিবৃত্ত' থেকে জানা যায়, এই রূপকনাট্যটি শিশিরকুমার ঘোষের একটি কবিতা অবলম্বনে রচিত। কিরণচন্দ্রের লেখা কয়েকখানি দেশপ্রীতিমূলক সংগীত বৈষ্ণবচরণ বসাক ও নরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত সংগীতকল্পতরুতে প্রথম স্থান পেয়েছিল, পরে অন্যান্য সংকলন গ্রন্থেও সেগুলি দেখা যায়

২১। মহেন্দ্রলাল বসু সেকালের জনপ্রিয় চরিত্রাভিনেতাও ছিলেন

২২। সংগীতসার সংগ্রহ ৩য় খণ্ড (১৯০১) থেকে। সম্পাদক চারুচন্দ্র রায়, বঙ্গবাসী প্রকাশিত

২৩। ডঃ সুকুমার সেনের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ডে উদ্ধৃত

২৪। প্রথম অভিনয় ১৮৮৬, জুলাই ৩ (২০ আষাঢ় ১২৯৩)। ১৯০১ সালের ৬ই এপ্রিল মিনার্ভায় পুনরাভিনীত

২৫। ক্ষীরোদপ্রসাদের আলিবাবার প্রথম সুরকার পূর্ণচন্দ্র ঘোষ

২৬। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কী ধরনের রেকর্ডসংগীত প্রচলিত ছিল তার নমুনা পাওয়া যাবে 'ফনোর গান' (১৯১২) এবং 'রেকর্ড কাকলী' (১৯১৭) গ্রন্থ দুটি থেকে। "সচিত্র / ফনোর গান / কুণ্ডু এণ্ড কোম্পানী / টেলার্স এণ্ড ফনো সাপ্লায়ার্স / মূল্য কাগজে বাঁধাই ১ টাকা মাত্র / বিলাতি বাঁধাই ১।॰ পাঁচ সিকা মাত্র।"

"রেকর্ড কাকলী / শ্রীজিতেন্দ্রকুমার রায / সম্পাদক / মূল্য ১।॰ পাঁচ সিকা।"

২৭। পথের সঞ্চয় গ্রন্থের 'সংগীত' প্রবন্ধ (অগ্রহায়ণ ১৩১৯)

উনিশ শতকের কাব্যসংগীত : ব্রহ্মসংগীত

১

বাঙলা কাব্যসংগীতের ইতিহাসে ব্রহ্মসংগীতের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাহ্মধর্ম, ব্রহ্মোপাসনা, ব্রহ্মচিন্তাকে অন্তর্মুখী নিবিড় ও প্রাণময় করার জন্যই ব্রহ্মসংগীতের সৃষ্টি।) বাঙলাদেশে ব্রাহ্ম-ধর্মান্দোলনের পুরোহিত রামমোহন স্বয়ং ব্রহ্মসংগীতেরও প্রবর্তয়িতা।[১] বাঙলা গানে তত্ত্বগীতি বা ভক্তিগীতির ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। সেই অধ্যাত্ম তত্ত্বচেতনাকেও ধর্মীয় বিভেদবুদ্ধি ও পৌত্তলিকতার স্থূলতা থেকে মুক্ত করে, নিরাকার নিরঞ্জন ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে গানের সুরে ব্যক্তিমনের আগ্রহে বিগলিত করাই ব্রহ্মসংগীতের উদ্দেশ্য।' রামমোহন স্বয়ং সংগীতপ্রিয় ছিলেন, সংগীতকে কেবল অবকাশরঞ্জন বিদ্যা মনে করতেন না, জীবনের গভীর সাধনার সঙ্গে গানকে মিলিয়ে নিতে পারার শিক্ষা তাঁর ছিল। ঈশ্বরচিন্তা ও ব্রহ্মতত্ত্বালোচনার নীরসতার মধ্যে সরসতা আনার জন্য তিনি সংগীতকে বেছে নিয়েছিলেন। তা ছাড়া রামমোহনের আবির্ভাবকাল বাঙলা-দেশে সংগীতের শারদোৎসব পর্ব। কবিগান-আখড়াই-টপ্পা, তর্জা-যাত্রা পাঁচালি-অধ্যুষিত বাঙলাদেশের অধিকাংশ গীতরূপ এই সময়েই তীব্রভাবে জনপ্রিয়। রামমোহন স্বয়ং টপ্পারচয়িতা কালী মির্জার কাছে গান শিখতেন বলে জনশ্রুতি আছে।[২] রামমোহন নিশ্চয়ই সেকালের অধিকাংশ গীতরূপের কুরুচি, শ্রীহীনতা, কোলাহল ও নিম্নশ্রেণীর বিষয়বস্তুর দ্বারা পীড়িত হয়েছিলেন। সুতরাং ব্রহ্মসংগীত রচনার পশ্চাতে বাঙলা সংগীতের রুচি-সংস্কারও তাঁকে অনুপ্রাণিত করে থাকতে পারে। শাক্তগীতের অহেতুক ভক্তিতারল্য ও পৌত্তলিক মাতৃরূপবর্ণনা, পদাবলীর গ্রাম্য নারীসুলভ সখীসংবাদ ও মানভঞ্জন যে তাঁকে বিরক্ত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি গৌড়ীয় ব্যাকরণ লিখেছিলেন, তাঁর ব্রহ্মবিষয়ক গীত রচনার মূলে একই উদ্দেশ্য কাজ করতে চেয়েছিল—অর্থাৎ সংস্কার। রামমোহনের হাতেই প্রথম বাঙলা গান কেবল বৈরাগ্য ও নিরাসক্ত ঈশ্বরভক্তি প্রচার করল। রামমোহনের যে সব শিষ্য-ভক্ত তাঁর প্রবর্তিত ধর্মসংস্কারকে নির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় প্রণালীতে প্রচার করার দায়িত্ব নিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন গীতসংস্কৃতিবান পুরুষ এবং বাঙলা সংগীতের সৌভাগ্যবশত তাঁরা এমন পরিবার, বন্ধুমণ্ডলী, পরিবেশ ও পরিস্থিতির সহায়তা লাভ করেছিলেন, যার ফলে ব্রাহ্মধর্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে একটি সাংগীতিক ঐতিহ্য অনায়াসে গড়ে উঠতে পারল। রামমোহনের কালে এবং রামমোহনের

কাছে সংগীত ছিল ব্যক্তিগত চিত্তনিবিষ্টতার উপায় মাত্র। জনৈক ভক্ত ব্রাহ্ম লিখেছেন—"তাঁহার সময়ে বেদবাক্যে ঈশ্বরের স্তুতিপাঠ হইত, গায়ত্রী মন্ত্রে তাঁহার ধ্যান হইত, এবং বৈরাগ্যসূচক সংগীতে তাঁহার প্রতি নির্ভরের ভাব বর্ষিত করা হইত।"[২]

পরবর্তীকালে ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে সংগীত অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত হল। ব্রাহ্মধর্মের মত পৌরাণিক-ঐতিহ্যহীন মননসর্বস্ব, বিশুদ্ধ বুদ্ধিপ্রধান ধর্মচর্চা সংগীতের সহায়তা না পেলে নিতান্তই শুষ্ক প্রাণহীন আলোচনাসর্বস্ব হয়ে উঠত। বাঙলা কাব্যসংগীত ইতিমধ্যে শাখায় প্রশাখায় লতায়িত হয়ে উঠেছে, ধনীর প্রাসাদ-কুঞ্জ-মণ্ডপ থেকে দরিদ্রের পর্ণকুটির পর্যন্ত সর্বত্রই সংগীতস্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত। রামগতি ন্যায়রত্ন বাঙলা সাহিত্যের যে পর্বকে 'গানের যুগ' বলেছিলেন তারই মধ্যে রামমোহনের ব্রহ্মসভা স্থাপিত হয়েছে, বন্ধু ও ভক্ত-মণ্ডলীর মধ্যে এই নতুন ধর্মচেতনা ধীরে ধীরে রামমোহনের ব্যক্তিত্ব-প্রভাবে সঞ্চারিত হচ্ছে। এই সময়ে সংগীতকে কোনমতেই অপাংক্তেয় রাখা যেত না। তাই ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রহ্মসংগীত যুগ্ম কিশলয়ের মত একই বৃন্তে মুকুলিত হয়ে উঠল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এসে দেখি তারই অঙ্কুর অম্বরপ্রসারিত মহীরুহের মত শতপত্রশাখে আন্দোলিত হয়েছে।

ব্রহ্মসংগীতের ভাণ্ডার সুবিপুল এবং বাঙলা কাব্যসংগীতের ঐতিহ্য ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী গীতকারদের হাতে এক নতুন ইতিহাস রচনা করেছে। কত খ্যাতঅখ্যাত কবি এই সংগীতসমুদ্রে স্বরধারা মিশিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। তাঁরা সকলেই ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন না, কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনাগীত-রচনার সুমহতী প্রেরণা যুগচিত্তে সঞ্চারিত হয়েছিল। তাই জয়গোপাল গুপ্ত-লিখিত নিধুবাবুর কবিজীবনী পাঠে জানা যায়, প্রেমসংগীতকার নিধুবাবু পর্যন্ত একটি ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছিলেন—

"ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব-উপাচার্য উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ মহোদয় একদিবস রামনিধিবাবুকে আদেশ করিলেন, মহাশয় একটি ব্রহ্মসংগীত রচনা করিয়া শ্রবণ করাইতে হইবে, সেই অনুরোধে বাবু তৎক্ষণাৎ কিঞ্চিৎ মৌন থাকিয়া এই গীত রচনা করিয়া শুনাইলেন, যথা—

রাগ বেহাগ তাল আড়া

পরম ব্রহ্ম তৎপরাৎপর পরমেশ্বর
নিরঞ্জন নিরাময় নির্বিশেষ সদাশ্রয়
আপনা আপনি হেতু বিভু বিশ্বধর ॥

বিদ্যাবাগীশ মহোদয় এই গীত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন, বাবু তুমি সাধু,তোমার অসাধারণ ক্ষমতা-দৃষ্টে আমারা চমৎকৃত হইয়াছি, কারণ এ প্রকার গীত পূর্বে কখনও রচনা করেন নাই, তাহাতে হঠাৎ এমন রচনা শুনা যায় নাই, যাহা হউক এই গীত দেওয়ানজীকে অর্থাৎ রামমোহন রায় মহাশয়কে দেখাইয়া ব্রাহ্মসমাজ গান করাইব, এই কথাবার্তার পর কোন বিশেষ রোগাক্রান্ত হইয়া এতন্মায়াময় সংসার পরিহারকরত ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিলেন এ কারণ অনুমান হইতেছে এ গীত সমাজের গীতে ভুক্ত হয় নাই অপ্রকাশ রহিয়াছে।"[৩]

এই গানের ভাষায় বিশেষত্ব নেই, হয়ত টপ্পার সুরেই এই গান বেঁধেছিলেন তিনি। নিধুবাবুর এই গান ব্রহ্মগীত-সংকলনে না থাকলেও তাঁর টপ্পা গানের সুর ব্রহ্মসংগীতে যথেষ্ট প্রবেশ করেছিল। মধুসূদনের জীবনীপাঠে জানা যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মধুসূদনকে একটি ব্রহ্মসংগীত রচনা করতে অনুরোধ করেন, মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' তারই ফল।[৪] ব্রহ্মসংগীত ১০ম সংস্করণের ভূমিকায় লিখিত হয়েছে—

"সংগীতরচয়িতাদের গানে নামের তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, কত বিভিন্ন শ্রেণীর এবং কত অধিক সংখ্যক ব্যক্তির চেষ্টা এই শুভকার্যে নিযুক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মসংগীত-রচনাকারিগণের সকলের সহিত যে ব্রাহ্মসমাজের তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল বা এখনও আছে এমন নহে। অথচ তাঁহাদের চেষ্টাদ্বারা ব্রাহ্মসমাজের সংগীতসম্পত্তি পরিপুষ্ট হইয়াছে। এতদ্দ্বারা বিধাতার আশ্চর্য বিধাতৃত্ব ও মহিমাই প্রকাশ পাইয়াছে।"[৫]

ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের কাছে তাই সংগীতের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। গানের সুরকে তাঁরা জীবনের গভীরে গ্রহণ করেছিলেন। সংগীতের মধ্য দিয়েই তাঁরা বিশ্ব ভুবনকে দেখেছেন, চিনেছেন ও জেনেছেন। পৌত্তলিক হিন্দুধর্মে শাস্ত্রীয় মন্ত্রের যে ভূমিকা, ব্রাহ্মধর্মব্রতীর কাছে গানের স্থান সেইরূপ। ব্রাহ্মসমাজের ধর্মাচরণের প্রতি স্তরে গানের আসনখানি শ্রদ্ধার সঙ্গে পাতা আছে। ব্রহ্মসংগীতসংকলনে যেখানে 'ব্রাহ্মধর্মের মূল সত্য' লিপিবদ্ধ আছে সেখানে উপাসনার বিধাননির্দেশে বলা হয়েছে—

"উপাসনার জন্য অনুকূল স্থানে সকলে সমবেত হইলে সর্বাগ্রে পরব্রহ্মে মন সমাধান করিবার জন্য উপাসকগণ যত্নবান হইবেন। তাহাতে চিত্ত সমাধানের অনুকূল উদ্বোধন-সূচক একটি সংগীত হইলে নিম্নলিখিতভাবে উপাসনার উদ্বোধন হইবে…।

"তৎপরে আরাধনাসূচক একটি সংগীত হইবে, সংগীত হইলে সকলে সমস্বরে নিম্নলিখিত ব্রহ্মস্বরূপ আবৃত্তি করিবেন, ও তদনুসারে আরাধনা হইবে।

"আরাধনার পর সকলে নিস্তব্ধ হইয়া কিছুকাল ধ্যান করিবেন এবং ধ্যানের শেষে সমস্বরে নিম্নলিখিত প্রার্থনা করিবেন।...প্রার্থনান্তে প্রার্থনাসূচক সংগীত হইবে।..."

ব্রাহ্মধর্মের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত, উপাসনা প্রার্থনা—সবই সংগীতের দ্বারা গ্রথিত। তাই কোনো ব্রহ্মসংগীতসংকলনের কীর্তন-পদাবলীর রসপর্যায়ের মত, ভক্তের জন্য গীতকাল নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মসংগীত সমগ্রভাবে বাঙলা গানকেই অধিকার করেছে, তাই এই গানে সাম্প্রদায়িকতা কম। বাঙলা শ্যামাবিষয়ক পদও যেমন ভক্তির আন্তরিকতায় ব্রহ্মসংগীতের তালিকার অন্তর্ভুক্ত, তেমনি দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসংগীত 'ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' এই গানও ব্রহ্মসংগীতসংকলনভুক্ত। অবশ্য অধিকাংশ ব্রাহ্মসমাজপ্রচলিত গান কবিত্বে দীন, একই ধরনের ভাবপ্রকাশে ও ভক্তির প্রথাগত বহির্মুখিতায় একঘেয়ে। বাঙলাদেশে যত ব্রহ্মসংগীত রচিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি বাদ দিলে তার মধ্যে উচ্চাঙ্গের কাব্যসংগীতের সংখ্যা তাই অঙ্গুলিমেয়। উনিশ শতকের প্রেমসংগীত বা শ্যামাবিষয়ক রচনার বিপুল তালিকায় যেমন কেবলই গতানুগতিক ক্লান্ত ক্লিষ্ট পৌনঃপুনিকতা, একই ধরনের আবেগপ্রকাশের বৈচিত্র্য-হীনতা, বাঙলা ব্রহ্মসংগীতগুলির মধ্যেও ভক্তিভাবের প্রকাশে সেই প্রথাবদ্ধতারই রূপ। ব্রহ্মের গুণকীর্তন, সৃষ্টিপ্রকরণ, ব্রহ্মচিন্তনে আত্মিক উন্নতির মহিমা-প্রকাশই এগুলির মুখ্য প্রসার্য। বারবার 'ব্রহ্ম' শব্দের ব্যবহার, 'প্রাণারাম' 'চিদানন্দ' 'পতিতপাবন' প্রভৃতি ব্যবহারজীর্ণ প্রয়োগ প্রেমের মহিমাপ্রচার, নামমাহাত্ম্য, প্রভাতকালীন ব্রহ্মসচেতনতার আহ্বান এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীতের অন্ধ অনুকরণ উনিশ ও বিশ শতকের ব্রহ্মগীতগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তবে ব্রহ্মসংগীতে শ্যামাবিষয়ক পদও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তাই কবি যেখানে ঈশ্বরকে মাতৃশব্দে সম্বোধন করেছেন, সেই বাৎসল্যকাতরতার মধ্যে একটি জীবনরসের সজীব স্পর্শ আছে।

১

"রাজা রামমোহন রায় ধর্মমন্দিরে সংঘ-উপাসনার প্রবর্তক; মন্দিরে উচ্চাঙ্গের তালমান-লয়সংযোগে গানের প্রবর্তন তিনিই করেন। রাজার আরব্ধ কার্য দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা উজ্জীবিত হয়; তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে উৎকৃষ্ট

সংগীতের ব্যবস্থা করেন। ব্রহ্মসংগীত তিনি স্বয়ং রচনা করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ, নানা রকম হিন্দি গান হইতে স্থর আহরণ করিয়া বা হিন্দি ভাঙিয়া ব্রহ্মসংগীত রচনায় প্রবৃত্ত হন। রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে ভগবদ্‌বিষয়ক সংগীতরচনার আদর্শ তাঁহারা স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন"।[৬]

রাজা রামমোহন ব্রহ্মসংগীতের প্রবর্তন করেছিলেন প্রধানত সংগীতের প্রতি শিল্পীমনের প্রবণতাবশত এবং চিত্ততন্ময়তার উপায় হিসাবে। কিন্তু তা ছাড়াও অন্য উদ্দেশ্য ছিল। সম্ভবত তিনি খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের গির্জাগীত বা চার্চ মিউজিকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।[৭] রামমোহনের সংগীতরচনার মধ্যে তাঁর ভগবদ্ভক্তি ও ব্রহ্মচেতনার যে আভাস আছে, তাঁর সমকালীন ও পরবর্তী গীতকারদের রচনায় তাই প্রতিফলিত হয়েছে। স্বভাবতই ব্রহ্মসংগীতের সেই প্রাথমিক স্তরে প্রয়োজনগত পরিবেশন ও স্থরকে অতিক্রম করে গানের কথা প্রধান হয়ে উঠতে পারেনি। নীরস ঈশ্বরতত্ত্ব, নির্গুণ ব্রহ্মের অচিন্ত্য মহিমা, অব্যক্ত ব্রহ্মের অপার শক্তিলীলা, মনের চঞ্চলতা পরিহারের আহ্বান, আসন্ন মৃত্যুর অনিবার্য পটভূমিকায় ঐহিক জীবনের বিষয়তৃষ্ণাপরিহার, জীবনের অনিত্যতার উপলব্ধি—এই ধরনের প্রথাগত প্রসঙ্গকে কাব্যসংগীত করে তোলা নিতান্তই দুঃসাধ্য—এমন কি রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনেব ব্রহ্মসংগীতগুলি সম্পর্কেও এই সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করা যায়। রামমোহন স্বয়ং অনেকগুলি ব্রহ্মগীত রচনা করেছিলেন এবং তাঁর সহকর্মী বন্ধু ও অনুরাগীরাও কিছু কিছু ব্রহ্মগীত রচনা করেন। এই ধরনের গানের একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল —'একমেবাদ্বিতীয়ম্ বা ব্রহ্মবিষয়ক গীতসমূহ'।[৮] এই গ্রন্থে বাঙলা-সংস্কৃত মিলিয়ে মোট ৭২টি ব্রহ্মসংগীত আছে, তানলয়রাগিণীর উল্লেখসহ।· অনেকগুলি গান বাঙলা-সংস্কৃত মিশ্র: কয়েকটি গানের শেষে রচয়িতার কেবল আদ্যক্ষব আছে, যেমন কৃ, ম (কৃষ্ণমোহন মজুমদার), নী. ঘো (নীলমণি ঘোষ), নী. হা (নীলরতন হালদার), কা. রা. (কালীনাথ রায়), নি. মি (নিমাইচবণ মিত্র), ভৈ. দ (ভৈরবচন্দ্র দত্ত), গৌ. স (গৌরমোহন সরকার)। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সংকলিত 'সংগীতসংগ্রহে'[৯] এঁদের পদ উদ্ধৃত হয়েছে এবং এঁরা সকলেই রামমোহনের বন্ধু বলে উল্লিখিত হয়েছে। সাহিত্যপরিষৎ গ্রন্থাগারে বিদ্যাসাগর-সংগ্রহে জনৈক নীলরতন হালদার রচিত 'কবিতারত্নাকর' নামে একটি গ্রন্থ আছে (শাস্ত্রীয় শ্লোকানুবাদ), সম্ভবত এঁরই রচনা। অন্যান্য গীতিকারদের পৃথক কাব্যসংগীত অন্যত্র পাওয়া যায়নি। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' নামক সংকলনের সবকটি গানই পারমার্থিক, বিষয়তৃষ্ণ জীবের প্রতি

সাবধানবাণী, সম্ভোগপিপাসু জীবনের কাছে পারত্রিক মুক্তিপথপ্রদর্শনের ইঙ্গিতে পূর্ণ। অধিকাংশ গানই যেন মোহমুদ্গরের অনুবাদ, অধিকাংশই রিপুদুষ্ট মনের প্রতি জ্ঞানী বিবেকবান সংযমের সতর্ক সম্বোধন। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত 'সংগীতসংগ্রহ' (১৮৮২) সংকলনের ভূমিকায় বাঙলা গানের ইতিহাসে ব্রহ্মসংগীতের স্থান ও ভূমিকা বিষয়ে সুনিশ্চিত অভিমত পাওয়া যায়। সম্পাদক লিখেছেন—

'সংগীত জাতীয় সাহিত্যের আভরণ ও জাতীয় চরিত্র সমুন্নত করিবার অমোঘ উপায়স্বরূপ। চিত্তপ্রসাদলাভ ও প্রচারের এমন সহজ উপায় আর নাই। ব্রাহ্মধর্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে বিশুদ্ধ ব্রহ্মসংগীত প্রচলিত হইয়াছে। এইক্ষণে বঙ্গদেশে বোধহয় এমন পল্লী নাই, যেখানে ব্রাহ্মধর্ম-প্রতিপাদ্য প্রেমভক্তি ও বৈরাগ্যের উচ্ছ্বাসপূর্ণ সংগীত দুই একটিও কেহ না জানে। অতএব বঙ্গভূমি এই সম্পদের জন্য ব্রাহ্মসমাজের [নিকট] ঋণগ্রস্ত। অনেকগুলি ব্রহ্মসংগীত এমন উন্নতভাব ও সুকবিত্বপূর্ণ যে, উহাদিগকে বঙ্গসাহিত্যের কণ্ঠমালা বলিয়া নির্দেশ করিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাজর্ষি রামমোহন রায় ও তাঁহার কতিপয় বন্ধু প্রথমত বিশুদ্ধ ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন। তৎপরে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংগীতসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। মহাত্মা রামমোহন রায় ও তদীয় কতিপয় বন্ধুরচিত অনেকগুলি গীত এমন ঐন্দ্রজালিক শক্তিবিশিষ্ট যে শ্রবণমাত্র পাষণ্ডেরও চিত্ত ভগবদ্ভক্তিতে বিগলিত ও পরকাল ও পরমার্থচিন্তায় আকুল হইয়া উঠে। তৎপরে সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মার রচিত কতকগুলি গীতের মধ্যেও যেন ভাবুকতা, চিন্তাশীলতা ও মাধুর্য মূর্তিমান হইয়া ক্রীড়া করিতেছে। কিন্তু এ সকল উৎকৃষ্ট সংগীত—বঙ্গসাহিত্যের এতগুলি মূল্যবান সামগ্রী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কতকগুলি বা খনিমধ্যস্থ মণির মতো অন্ধকারে লুক্কায়িতপ্রায় রহিয়াছে। অতি অল্পলোকই উহাদের অনুসন্ধান পাইতে পারে। এই সকল উৎকৃষ্ট গীত একত্র করিয়া সাধারণ্যে উপস্থিত করা এই সংগীতসংগ্রহের উদ্দেশ্য"।[১০]

এই ভূমিকায় আরো বলা হয়েছিল—

"সংগীতসংগ্রহের আর একটি উদ্দেশ্য আছে। এই সমুদায় উপাদেয় সংগীত যাঁহাদিগের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, মানসিক চিন্তা এবং ধর্মসাধনের ফলস্বরূপ সাহিত্যসমাজে তাঁহাদিগের অনেকেই পরিচিত নহেন। গায়কেরা গান করিয়া মুগ্ধ ও উপকৃত হয় বটে, কিন্তু সংগীতরচয়িতার নাম জানে না। কোথাও বা

একের রচিত গান অন্যের নামে পরিচিত। ইহা অতি দুঃখ ও লজ্জার বিষয় সন্দেহ নাই। এই অভাব বিদূরিত করাই আমাদিগের অপর প্রধান উদ্দেশ্য।[১১]

রামমোহন রায়ের পর যে সমুদয় সংগীত প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আদি ব্রাহ্মসমাজের গানগুলি উচ্চভাব এবং রাগরাগিণীর জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

ভারতবর্ষীয় সমাজদ্বারা সাধারণের উপযোগী যে সকল সংগীত প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, হরলাল রায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত গীতসমূহ অতি উপাদেয়। এতদ্ভিন্ন বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, কুঞ্জবিহারী দেব, বিষ্ণুরঞ্জন [বিষ্ণুরাম ?] চট্টোপাধ্যায় এবং পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় যে সকল সংগীত রচনা করিয়াছেন তাহাও ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ আদরণীয়।

পূর্ব বাঙলা হইতে প্রথমতঃ মৃত বাবু অমৃতলাল গুপ্ত দ্বারা ব্রহ্মসংগীত প্রকাশিত হয়। তৎপর সুবিখ্যাত কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, বান্ধব-সম্পাদক বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ, বাবু আদিনাথ দাস, হেলেনা কাব্য রচয়িতা কবিবর বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র, বাবু মদনমোহন মিত্র, বরিশাল সমাজের আচার্য বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার, কুমারখালিনিবাসী বাবু হরিনাথ মজুমদার, শ্রীহট্টনিবাসী বাবু সুন্দরীমোহন দাস, বগুড়ার বাবু কিশোরীলাল রায়, ঢাকার বাবু প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার ও বাবু দুর্গানাথ রায় প্রভৃতির দ্বারা অনেকগুলি সুভাবপূর্ণ সংগীত রচিত হইয়াছে।

গত পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু সুন্দরীমোহন দাস, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, গগনচন্দ্র হোম এবং দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি দ্বারাও অনেক উৎকৃষ্ট সংগীত প্রকাশিত হইয়াছে।”··

নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের এই ভূমিকা থেকে ব্রহ্মসংগীতের ব্যাপক জনপ্রিয়তার যে পরিচয় পাওয়া যায়, সমকালীন সংগীতসংকলনগুলি তারই প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য বহন করে। ব্রহ্মসংগীত আদি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রথম উৎসারিত হলেও কালক্রমে আদি ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর সমাজের নিকটই সমান সমাদর লাভ করেছে। একই ব্রহ্মসংগীত আদি ও নববিধান উভয় সমাজের সংগীতরূপেই সমাদৃত হয়েছে। ধর্মাচরণের সাম্প্রদায়িকতা অন্তত সংগীতের উপর তীব্র স্পর্শকাতর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে *বিকৃতাচারী বিপথগামী স্বধর্মভ্রষ্ট ব্রাহ্মদের ডাক দিয়ে* রাজনারায়ণ বসু একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন—“এই আদি ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী

সংস্থাপিত হয়।…যে সকল ব্রহ্মসংগীত চিত্তকে দ্রবীভূত করে ও স্বর্গীয় সুখে মনকে অবগাহন করায় সে সকল প্রথম আদি ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা রচিত হয় ·।”[১]

কিন্তু তৎসত্ত্বেও ব্রহ্মসংগীত রচনার গৌরব কেবল আদি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত 'ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্তন'[১৩] গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপনে দেখি—

“আমাদের সংগীতসকল সাধারণ্যে যেরূপ সমাদরে পরিগৃহীত হইয়া থাকে, তদ্দর্শনে বিবিধভাব ও মতের সংগীত রচনা করিয়া প্রচার করিতে ইচ্ছা হয়। সকল সম্প্রদায়ের লোকই ইহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।… অবস্থাবিশেষ এক একটি সংগীত এক একজন ধর্মাচার্যের কার্য করিতে পারে ·· ছন্দোবন্ধে রচিত শ্লোক স্তোত্র গীতিমাল্য কীর্তন যেমন করিয়া জাতিসাধারণের প্রকৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পুরুষানুক্রমে চলিয়া যায়, সাধারণ হৃদয়গ্রাহী এমন আর কিছুই নাই।”

বাঙলা ব্রহ্মসংগীতেব আলোচনায় তাই সকল সমাজের সংকলিত গানই বিবেচ্য হওয়া উচিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের 'কার্যনির্বাহক সভার অনুমত্যনুসারে' প্রকাশিত 'ব্রহ্মসংগীতের' ১০ম সংস্করণের (ব্রহ্মাব্দ ৯২) ভূমিকায় এই স্বীকৃতি আছে—

“আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসংগীত, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসংগীত, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'গান', 'গীতাঞ্জলি', পরলোকগত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয়ের 'গীতাবত্নাবলী', 'পথের সম্বল', পরলোকগত রজনীকান্ত সেন মহাশয় প্রণীত 'সংগীতহার', শ্রীযুক্ত কালীনাথ ঘোষ মহাশয় প্রণীত 'ব্রহ্ম-সংগীতাবলী', পরলোকগত প্রসন্নকুমার সেন মহাশয়েব সংকলিত 'বিবিধ ধর্ম-সংগীত' হইতে এবং অন্যান্য অনেক সদাশয় ব্যক্তির রচিত উৎকৃষ্ট সংগীত ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।”

উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ গীতকার ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছেন, আবার মুখ্যত যাঁরা ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছেন তাঁদের রচিত অন্য বিষয়ের গানও দুর্লভ নয়। ফলে ব্রহ্মসংগীতের কবিতালিকা স্বভাবতই দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'সংগীতসংগ্রহে' যাঁদের গান সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁদের নাম—ভোলানাথ চক্রবর্তী (মেদিনীপুর), গৌরমোহন সরকার, রামমোহন, নীলমণি ঘোষ, কৃষ্ণমোহন মজুমদার, নীলরতন হালদার, কালীনাথ রায় (টাকি), নিমাইচরণ মিত্র, ভৈরবচন্দ্র দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরদেব চট্টোপাধ্যায়, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, প্যারীচাঁদ মিত্র, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী,

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় (বহরমপুর), নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমৃতলাল গুপ্ত (মানিকগঞ্জ, ঢাকা) ঈশ্বরচন্দ্র সেন (ঢাকা), গুরুপ্রসাদ ভৌমিক, (ঢাকা), কালীনারায়ণ গুপ্ত, সুন্দরীমোহন দাস (শ্রীহট্ট), আদিনাথ দাস (কালীগঞ্জ. ঢাকা) কালীপ্রসন্ন ঘোষ (ঢাকা), রাজকুমার ভট্টাচার্য (ইদিলপুর), প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার (ঢাকা), অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, মদনমোহন মিত্র (ঢাকা, 'কবিতাকদম্ব' লেখক), আনন্দচরণ মিত্র, দীনেশচরণ বসু ('কবিতাকাহিনী' গ্রন্থকার), গোবিন্দচন্দ্র রায়, কৃষ্ণজীবন সাহা (রামপুর বোয়ালিয়া), হরলাল রায়, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, হরিনাথ মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীনাথ রায়, দ্বারকানাথ গুপ্ত (বিক্রমপুর), পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় (জামালপুর), বরদাকান্ত সেন (বিক্রমপুর), শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী (লাহোর), বৈদ্যনাথ কর্মকার (জঙ্গলবাড়ি, ময়মনসিংহ), কৃষ্ণচন্দ্র দে (ঢাকা ছাত্রসমাজ), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ত্রৈলোকনাথ চক্রবর্তী (দার্জিলিং), শিবনাথ শাস্ত্রী, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, হরিমোহন চৌধুরী (ঢাকা), যদুনাথ চক্রবর্তী, হরিনাথ গুপ্ত (শান্তিপুর), রজনীকান্ত ঘোষ (ঢাকা), গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত (ঢাকা) ইত্যাদি।

নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ভারতীয় সংগীতমুক্তাবলী'তে এ ছাড়া আরও কয়েকজন ব্রহ্মগীতরচয়িতার নাম আছে—শিশিরকুমার ঘোষ, কৃষ্ণচন্দ্র রায়, দুর্গানাথ রায়, জগবন্ধু সেন, বসন্তকুমার ঘোষ, ক্ষেত্রমোহন শেঠ, হেমন্তকুমার ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রাজকুমার বিদ্যারত্ন, কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়, গগনচন্দ্র হোম, রাজা মহিমারঞ্জন রায়, রাজা মহাতাপচাঁদ, রাধাগোবিন্দ দত্ত, কিশোরীলাল রায়, মনোরঞ্জন গুহ, ইন্দুভূষণ রায়, প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, চণ্ডীকিশোর কুশারী, ব্রজলাল গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদি।

নববিধান ব্রাহ্মসমাজ-প্রকাশিত 'ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্তন'[১৪] গ্রন্থের দ্বাদশ সংস্করণের ভূমিকাটি ব্রহ্মসংগীতের ইতিহাস আলোচনার পক্ষে মূল্যবান। এই ভূমিকায় (১৪ জানুয়ারি ১৯৩৩) আছে—

"এই সংস্করণে সংগীতাচার্য ভাই ত্রৈলোক্যনাথের 'গীতাবলী', ও 'পথের সম্বল'-এর প্রায় সমস্ত সংগীত, ভাই দুর্গানাথ রায়, ভাই কালীশংকর দাস কবিরাজ, ভাই মহিমচন্দ্র সেন, ভাই কালীনাথ ঘোষ, ইহুদিবংশোদ্ভব নববিধানের ভক্ত ডঃ রুবেন, সত্যদাস, কুঞ্জবিহারী দেব, ভক্ত হরিসুন্দর বসু, ভক্ত সাধক শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন, ভক্তকবি স্বর্গীয়

রজনীকান্ত সেন, স্বর্গীয় পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি মহাশয়গণের অনেকগুলি সুললিত সংগীত এবং রবীন্দ্রনাথের ১৫০টি বিশিষ্ট সংগীত সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

' ব্রহ্মসংগীত দেশের প্রভূত উপকার করিয়াছে। দেশের মধ্যে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। দেশের মধ্যে সুরুচি ও সুভাবের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আজকাল সংগীতরসজ্ঞ সর্বসাধারণের মুখে প্রায়ই ব্রহ্মসংগীত শ্রুত হওয়া যায়। ব্রহ্মসংগীতের মন্ত্রসুধারসে কত প্রাণ শক্তি, শান্তি, তৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব করিয়াছে ও করিতেছে। ব্রহ্মসংগীত যত দেশময় ছড়াইয়া পড়িবে ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।'

ব্রহ্মসংগীতগুলি ব্রাহ্মসমাজের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস। ব্রাহ্মসমাজে যখন যে ভাবের সাধনা বা প্রাবল্য দেখা গিয়াছে, সংগীতগুলিতে তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। ব্রহ্মের বিভিন্ন স্বরূপ সাধন এবং সুনীতি, পাপবোধ, অনুতাপ, বৈরাগ্য, নির্বাণ, ভক্তি, ব্যাকুলতা, অনুরাগ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাব-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে তৎতদভাবোপযোগী সংগীত রচিত হইয়াছে। এক একটি সংগীত ভক্ত সাধকের জীবনভরা সাধনা ও সিদ্ধির পরিপক্ক ফল। ব্রাহ্মসমাজের সাধনতত্ত্বের জলন্ত ইতিহাস ইহাতে বর্তমান। ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হইতে নববিধানযুগ পর্যন্ত যে সকল সংগীত রচিত হইয়াছে, তাহা ধারাবাহিকরূপে মনোযোগের সহিত অনুশীলন করিলে ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মধর্মের ও নববিধান সাধনের গূঢ়তত্ত্ব পূর্ণভাবে লাভ করা যায়।

ব্রাহ্মসমাজে যখন ভক্তির ভাব আসে এবং তৎপ্রসঙ্গে যখন পরলোকতত্ত্ব প্রকাশিত হয়, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, এইভাবের নূতন যে সকল সংগীত রচিত হয়, তাহার অধিকাংশই সংগীতাচার্য ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের রচিত। তাঁহাব তদানীন্তন সংগীতগুলি মধুর ভক্তিরসে ও পরলোক-তত্ত্বে পরিপূর্ণ; এবং তাহা দৈবালোকের ফলস্বরূপ। সেগুলি মুমুক্ষু সাধকগণের সাধনপথে অগ্রসর হইবার পক্ষে এবং ইহলোকে থাকিয়া পরলোকতত্ত্বলাভের ও পরলোকের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। দৈবপ্রেরণায় রচিত তাঁহার সংগীতগুলির কোনো অংশ পরিবর্তিত হইয়া যাহাতে বিকলাঙ্গ না হয়, তজ্জন্য তিনি বড়ই উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এবং তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন, অবস্থাবিশেষে এরূপ এক একটি সংগীত এক একজন ধর্ম-প্রচারকের কাজ করে।"…

নববিধান ব্রাহ্মসমাজ-প্রকাশিত 'ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্তন' নামক গ্রন্থে যাঁদের পদ সংকলিত হয়েছে তাঁদের নামতালিকা[১৫]—

চণ্ডীচরণ গুহ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কান্তকুমার চৌধুরী, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, কালীনাথ ঘোষ, বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, পুলকচন্দ্র সিংহ, কৃষ্ণচন্দ্র রায়, মনোমোহন চক্রবর্তী, বসন্তকুমার ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কৈলাসচন্দ্র সেন, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, যোগীন্দ্রনাথ দাস, ইন্দুভূষণ রায়, কাশীচন্দ্র ঘোষাল, মহারানী সুনীতি দেবী, পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়, হরিনাথ মজুমদার, কুঞ্জবিহারী দেব, অতুলপ্রসাদ সেন, কালীশংকর কবিরাজ, হরিসুন্দর বসু, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, সত্যশরণ গুপ্ত, দুর্গানাথ রায়, দয়ালচন্দ্র ঘোষ, রজনীকান্ত সেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিনয়ভূষণ সরকার, আমোদিনী দেবী, মহারাজ মহাতাপচাঁদ, নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কৃষ্ণদাস বাউল, অবিনাশচন্দ্র দাস, অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহ, প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার, আদিনাথ দাস, নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ মল্লিক, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, হরদেব চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দুর্গানারায়ণ চৌধুরী, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র মিত্র, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কামিনী রায়, শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, মহারানী সুচারু দেবী, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, হরলাল রায়, হেমন্তকুমার ঘোষ, প্রসন্নকুমার সেন, দেবেন্দ্রনাথ, নিত্যগোপাল গোস্বামী, নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ, শিবনাথ শাস্ত্রী, নীলমণি চক্রবর্তী, গণেশপ্রসাদ, শিশিরকুমার ঘোষ, প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার, অমৃতলাল গুপ্ত, কৃষ্ণচন্দ্র রায়, ভগবানচন্দ্র দাস, মনোমতধন দে, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র দাস, গোবিন্দচন্দ্র রায়, নীলরতন হালদার, নবতারিণী সেন, সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত, নির্মলচন্দ্র বড়াল, রামমোহন রায়, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, কমলাকান্ত, গগনচন্দ্র হোম, জগবন্ধু সেন, বেবতীমোহন সেন, দাশু রায়, ভোলানাথ অধিকারী প্রভৃতি।

পূর্বেই বলা হয়েছে এবং তালিকা থেকেও আপাতদৃশ্যমান যে ব্রহ্মসংগীত-সংকলনে উদ্ধৃত পদের কবিরা সকলেই ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন না। কিন্তু তত্ত্ব ও ভক্তিধর্মের অপৌত্তলিক মনোভাব যাঁদের জনপ্রিয় গীতে প্রকাশ পেয়েছে, তাঁদের গান ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীগণ সমাদরপূর্বক গ্রহণ করেছিলেন। তাই রামপ্রসাদের সাধনোৎকণ্ঠা, কমলাকান্তের মাতৃনামকাতরতা, দাশরথি রায়ের পাঁচালির অন্তর্গত পৌরাণিক ভক্তিবাদও অপেক্ষাকৃত অসাম্প্রদায়িকতার গুণে ব্রহ্মসংগীত-চয়নিকাভুক্ত হয়েছে। বস্তুত সংগীতের বিষয়ই ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্যক্তিদের উদ্দিষ্ট ছিল, রচয়িতা নয়; তাই প্রথমাবধি ব্রাহ্মধর্মানুষ্ঠানে সামাজিক

উৎসবে গেয় গানগুলির কবিপরিচয় সংগ্রহ করার চেষ্টা ঘটেনি। এইভাবে গানের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজপ্রকাশিত 'ব্রহ্মসংগীত' নামক সংকলনের অষ্টম সংস্করণ পর্যন্ত রচয়িতাদের নাম ছিল না, অথচ 'ইতিহাসের দিক হইতে বিচার করিলে এ কার্যটিতে আর উপেক্ষা করা উচিত হয় না'—এই যুক্তিতে নবম সংস্করণ 'ব্রহ্মসংগীত' গ্রন্থে গীতকারদের নামসংকলনের প্রথম চেষ্টা হয়। এই সংকলনে 'ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্তন' গ্রন্থের কবিদের নাম তো ছিলই তা ছাড়া এই নামগুলি নূতন—

কৃষ্ণচন্দ্র রায়, গিরিধর রায়, চন্দ্রনাথ দাস, কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায়, ইন্দুবালা ঘোষাল, উমেশচন্দ্র দত্ত, হরিমোহন ঘোষাল, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অমৃতলাল গুপ্ত, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, সুরেশচন্দ্র সরকার, নবেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র রায়, সিতাংশুমোহন রায়, চঞ্চলা ঘোষ, রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দিরা দেবী, নরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবসিন্ধু দত্ত, হরিশচন্দ্র দত্ত, সীতানাথ দত্ত, শ্রীনাথ চন্দ, প্রেমচাঁদ গুপ্ত, অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য, হিমাংশুমোহন রায়, চন্দ্রনাথ দাস, রামকানাই দত্ত, অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়, ব্রজলাল গঙ্গোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, নেপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, প্রিয়ম্বদা দেবী, হরিচরণ রায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, সতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কেদারনাথ কুলভি, গুরুদাস চক্রবর্তী, রাধাগোবিন্দ দত্ত, ঠাকুরদাস সেন, রামকুমার বিদ্যারত্ন, হেমলতা দেবী, কালীনারায়ণ গুপ্ত, সুরেন্দ্রবিজয় দে, বিধুমুখী দেবী, হরদেব, নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দুর্গানারায়ণ চৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, রাধিকানাথ রায়, মাতঙ্গী চট্টোপাধ্যায় রাজেন্দ্রকুমার গুপ্ত, কালীপ্রসন্ন পণ্ডিত, কিশোরীলাল রায়, সুন্দর সিংহ, নিকুঞ্জমোহন লাহিড়ী, মধুসূদন রাও, হরলাল রায়, গুরুচরণ মহলানবিশ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, নিত্যগোপাল গোস্বামী, অন্নদা গুপ্তজায়া, প্রতিভা দেবী, ললিতমোহন দাস, পুণ্যদাপ্রসাদ সরকার, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, গঙ্গাধর, সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৌদামিনী দেবী, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসাদ রায়, কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, হরিমোহন ঘোষাল, নগেন্দ্রনাথ বসু, যদুভট্ট ইত্যাদি।

বলাবাহুল্য, এই তালিকাও সম্পূর্ণ নয়। 'বাঙালির গান' ও 'সংগীত সারসংগ্রহে' এই তালিকাবহির্ভূত আরো বহু ব্রহ্মসংগীতকারের সন্ধান পাওয়া যায়। অজ্ঞাতনাম অসংখ্য কবির কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। ব্রহ্মসংগীতের

ব্যক্তিগত গীতসংকলনেরও অভাব ছিল না। ব্রহ্মসংগীতকাররূপে পরিচিত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'সংগীতরসতরঙ্গিণী'[১৬] নামক ব্রহ্মসংগীতচয়নে লিখেছেন—

"আমার সাধ্যমত কথঞ্চিৎ, আত্মজ্ঞাননির্ণয় ব্রহ্মতত্ত্ব বৈরাগ্যোদয় প্রভৃতি নানাভাবে সংঘটিত এবং লৌকিক অলৌকিক আধ্যাত্মিক বিবিধ বিষয়াত্মক রাগিণী স্বর ও তালমান ইত্যাদি সংযোজিত অত্র সংগীতসংকলন রসতরঙ্গিণী পুস্তকে প্রকটিত হইল।"…

দ্বারকানাথের গ্রন্থভুক্ত রচনাগুলির সব অন্যান্য ব্রহ্মসংগীতসংকলনে নেই। এই পুস্তকের গানগুলি আত্মতত্ত্ববিষয়ক, ব্রহ্মবিষয়ক, বা সাকার নিরাকার উপাসনার সমালোচনামূলক। অধিকাংশ গানের ভণিতায় কবির নাম আছে, রচনাভঙ্গি বিশেষত্বহীন। ব্রহ্মসংগীত-সংকলনের অন্যান্য উদাহরণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম—নববিধান-ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত 'বিধানসংগীত' (১৯১৮), 'ব্রহ্মসংগীতচয়নিকা', গরীবের গান'[১৭], সরলাদেবীকৃত 'শতগান'[১৮], কাঙালীচরণ সেনকৃত 'ব্রহ্মসংগীতস্বরলিপি' (চার খণ্ড)[১৯], নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজের 'নববিধান গীতশতক'[২০], গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'সাত্ত্বিক সংগীত-মালা' (১৯২৪), গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরীর 'সংগীতপুষ্পাঞ্জলি' (১৯১২), কালীনাথ ঘোষের 'ব্রহ্মসংগীতাবলী', 'অনুষ্ঠানসংগীত' (১৯১৮), 'নামসুধা', কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের 'পরিব্রাজকের সংগীত' (১৯১১), কনকচন্দ্র সিংহের 'বিধানগীতিমালা' (১৯১৬, নরেন্দ্রনাথ দত্ত ও বৈষ্ণবচরণ বসাক সম্পাদক সংগীতকল্পতরু' (১৮৮৭), প্যারীচাঁদ মিত্রের 'গীতাঙ্কুর' (১৮৪১), প্যারীমোহন কবিরত্নের 'গীতাবলী' (১৯০১), মনোমোহন চক্রবর্তীর 'কীর্তন ও বন্দনা', 'সংগীত ও সংকীর্তন', প্রসন্নকুমার সেনের 'বিবিধ ধর্মসংগীত' (১৯০৭), পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়ের 'সংগীতহার', আদি ব্রাহ্মসমাজের 'ব্রহ্মসংগীত', রজনীকান্ত সেনের 'বাণী' ও 'কল্যাণী', অতুলপ্রসাদ সেনের 'গীতিগুচ্ছ', 'কয়েকটি গান', 'কাকলি', 'পুলিনবিহারী হাণ্ডের 'পুলিনগীতি' (১৯০১) ইত্যাদি। বাঙলা ব্রহ্মসংগীতের বিবর্তনধারা অনুসন্ধানের পক্ষে এই উপকরণগুলি যথাসম্ভব সহায়ক হতে পারে।

৩

'প্রীতিগীতি' নামক প্রাগালোচিত সুবিখ্যাত প্রেমসংগীতসংকলনে প্রেমসংগীতের যে সব সূক্ষ্ম বিষয়গত পর্যায় বিন্যাস করা হয়েছিল, পরবর্তী একাধিক সংগীত-সংকলনে নানা জাতীয় গানের বিন্যাসে তার অনুকরণের প্রয়াস দেখা যায়।

ব্রহ্মসংগীতগুলি বিশেষভাবে ব্রাহ্মসমাজের আনুষ্ঠানিক গান হিসাবেই রচিত হয়েছিল, তাই এই জাতীয় সংকলনেও সংগীতের নানা পর্যায় শ্রেণী ও বিষয়-নির্দেশ কৌতূহলের উদ্রেক করে। পূর্বেই বলা হয়েছে, ব্রাহ্মসমাজের ধর্মানুষ্ঠানে সংগীতকে একটি অপরিহার্য ভূমিকা দান করা হয়েছিল।[২১] ঠাকুর পরিবারের অধিকাংশ স্বনামধন্য ব্যক্তির এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের অজস্র ব্রহ্মসংগীত মাঘোৎসব উপলক্ষেই রচিত। তা ছাড়া ব্রাহ্মসমাজের আচার-অনুষ্ঠানগুলি শাস্ত্রাচারের গুহ্য প্রণালী ও জটিল প্রক্রিয়া থেকে মুক্ত হয়ে সুস্থ মানবিক আবেদনসম্পন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। এই কারণে ব্রহ্মসংগীতে বিষয়নির্দেশের বৈষয়িক প্রয়োজন ছিল। 'ব্রহ্মসংগীত' নামক সুপরিচিত সংকলনে (১০ম সংস্করণে) গানের বিষয়বিভাগ—উদ্বোধন ও উপদেশ, আরাধনা ও কৃতজ্ঞতা, প্রার্থনা ও অনুতাপ, নিবেদন ও সংকল্প, বিবিধ (উৎসবসংগীত), রাত্রি, নববর্ষ ও বর্ষশেষ, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, পারিবারিক প্রার্থনা, জাতীয় সংগীত, প্রেম-পরিবার, স্বামীস্ত্রীর প্রার্থনা, অন্তিম কাল, বালকবালিকার সংগীত (জন্মোৎসব, জাতকর্ম ও নামকরণ), উদ্বাহসংগীত, শ্রাদ্ধ ও মৃত ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা, দীক্ষা, স্বভাবসংগীত। এ ছাড়া ব্রাহ্মসমাজের এক জাতীয় নিজস্ব সংকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলীর যুগোপযোগী পরিবর্তন নগরসংকীর্তন, ঊষাকীর্তন, সাধারণ কীর্তন প্রভৃতিও আছে।

'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার অনুমত্যনুসারে' এবং ব্রাহ্মসংবৎ ৪৯।১০ মাঘ তারিখে প্রকাশিত 'ব্রহ্মসংগীত'-সংকলনের এই বিষয়গত তালিকা দীর্ঘতর। উক্ত গ্রন্থে সম্পাদক গানগুলিকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত ও উপযুক্তভাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। যেমন—

১ম অধ্যায়, 'উদ্বোধন ও উপদেশ' বিভাগে—প্রভাতে ঈশ্বরস্মরণ, সায়ংকালে ঈশ্বরস্মরণ, ব্রহ্মোপাসনার আহ্বান, ঈশ্বর অতীন্দ্রিয়, ঈশ্বর বাক্যের অতীত, অনিত্যতা, তীর্থযাত্রীর প্রতি, সান্ত্বনা, শুষ্কজ্ঞানের নিষ্ফলতা, ব্রহ্মসেবা, সত্যের সংগ্রাম, সত্যের প্রতিষ্ঠা, বৈরাগ্য, ব্রহ্মনিকেতনে যাত্রা, ব্রহ্মসাধন কষ্টসাধ্য, উদ্দীপনা ও উৎসব (মোট ৭৮টি গান)। ২য় অধ্যায়ে 'আরাধনা ও মহিমা-কীর্তন' বিভাগের (মোট গীতসংখ্যা ৫৮টি) সূক্ষ্ম বিষয়বিভাগ—প্রভাতস্তোত্র, মহিমাগান, ভজন, স্বরূপ, ঈশ্বরই সর্বস্ব, ঈশ্বর অতীন্দ্রিয়, ঈশ্বরে প্রেম, ঈশ্বরের দয়া, ঈশ্বরের উদারতত্ত্ব, ঈশ্বরের বিধাতৃতত্ত্ব, ঈশ্বরের সৌন্দর্য, বহির্জগতে ঈশ্বরের শোভা, স্বভাবের আরতি, সর্বত্র ঈশ্বরের প্রকাশ, অনন্ত আকাশ ঈশ্বরের সত্তা, ঈশ্বর গুরু ও পরিত্রাতা, ঈশ্বরই একমাত্র শরণ্য নির্ভরসূচক, ঈশ্বরদর্শনে আনন্দ,

ঈশ্বর সহবাসে সুখ ও সম্বন্ধ ইত্যাদি। ৩য় অধ্যায়ে 'কৃতজ্ঞতা ও দয়া স্মরণ' পর্যায়ে (মোট গান ১৯টি) বিন্যস্ত বিষয়—কৃতজ্ঞতা ও দয়াস্মরণ এবং ঈশ্বরদর্শন। ৪র্থ অধ্যায়ের মূল বিষয়—'প্রার্থনা', (গীতসংখ্যা সর্বাধিক, মোট ১৫৮টি)। এই পর্যায়ের গানগুলি এইরূপ সূক্ষ্ম বিষয়নির্দেশে সাজানো—ঈশ্বরদর্শন ও সহবাস, ঈশ্বরদর্শন ও প্রেমোপহার, ঈশ্বরবিরহ, হৃদয়াবির্ভাব—স্ত্রীলোকের উক্তি, প্রেম ও শান্তি, প্রেম, আত্মসমর্পণ, হৃদয়ে আবির্ভাব ও পরিত্রাণ, অনুগ্রহ প্রার্থনা, সংসারের আকর্ষণ ও যন্ত্রণা, অনুতাপ, বিষয় অতৃপ্তি ও ঈশ্বরসহবাস, ঈশ্বর-সম্মিলন, দুঃখ যন্ত্রণাময় দর্শন, আশ্রয়ভিক্ষা, মগ্নভাব, হৃদয়ধর্ম, পরিত্রাণ, শান্ত প্রেম ও পরিত্রাণ, সর্বাঙ্গীণ উন্নতি, অন্তিমকালের জন্য প্রার্থনা, হৃদয়ে আবির্ভাব ও দর্শন, আশ্রয় ও দর্শন, কঠোর হৃদয়ে প্রেমসঞ্চার, প্রেমসহিত ঈশ্বরপূজা, সহবাস, ঈশ্বরের মহত্ত্ব ও মনুষ্যের ক্ষুদ্রত্ব, দর্শনের আনন্দ, প্রেমশান্তির ও অনুষ্ঠানের জন্য প্রার্থনা, নির্ভর, ঈশ্বরের প্রকোপ, প্রসাদভিক্ষা ও মহিমাকীর্তন, প্রসাদভিক্ষা ও অনুগ্রহ প্রার্থনা, ঈশ্বর সর্বস্ব, অনুতাপ ও সংসারযন্ত্রণা, নির্ভর ও পূজার ইচ্ছা, আদেশপালনার্থ বলপ্রার্থনা, শান্তি, বলপ্রার্থনা, ঈশ্বরদর্শন ও শান্তি, ঈশ্বরবিরহ অনুতাপ, ঈশ্বরবিরহ নিজের ক্ষুদ্রত্ব, অনুগ্রহভিক্ষা, জগতে প্রেমপ্রচার, প্রচারকার্যে গমনকালে প্রার্থনা, ঈশ্বরের ন্যায়বিচার, পাপ হইতে মুক্তি, উৎসবে প্রার্থনা ও দেশহিতৈষীর প্রার্থনা। ৫ম অধ্যায়ে বিবিধ গান, (সংখ্যা ২৯টি)—দর্শনে আনন্দ, অনন্তধাম, ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া গৌরব, ঈশ্বর সর্বস্ব, অপবিত্র মনে ঈশ্বরপূজা, প্রেমোপহার, সকলি ঈশ্বরের, আত্মসমর্পণ, মনুষ্যের অপরাধ অপেক্ষা ঈশ্বরের দয়া অধিক, লৌকিক প্রার্থনার নিষ্ফলতা, পরলোকে ঈশ্বরের দয়া, প্রেমের নিকট সংসার তুচ্ছ, ঈশ্বর প্রেমিকার ভাব, ঈশ্বরপ্রেমের মাহাত্ম্য, ঈশ্বরের দয়া ও প্রেম, ডাকিলেই তাঁহাকে পায়, বিপদ ও কষ্টে নির্ভর, সত্যাশ্রিতের ভাব, মৃত্যুতে নির্ভয় অমৃতনিকেতন, হৃদয়ে ঈশ্বরের আবির্ভাব, উৎসব, সম্প্রদায়নির্বিশেষে ঈশ্বরোপাসনা। এই তালিকা সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখি, বিভিন্ন পর্যায়ের পুনরুক্তি ঘটেছে, প্রতি অধ্যায়ের পার্থক্যও স্পষ্ট নয়। এই শ্রেণীবিভাগ অবশ্য কেবল সূচীপত্রেই পৃথকভাবে নির্দেশিত হয়েছে; গ্রন্থে অধ্যায় ব্যতীত অন্য কোন বিভাগ নেই। তথাপি এই শ্রেণী-বিন্যাস অসম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ হলেও সম্পাদকের সূক্ষ্ম গীতিরসবোধ, ব্রহ্মসংগীতে অধিকার, বিশ্লেষণক্ষমতা ও গভীর অনুসন্ধিৎসার পরিচায়ক।

নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংগীতসংগ্রহে'ও (১২৮৯) সংকলিত গানগুলির শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে, যথা—উপদেশসংগীত ; প্রার্থনা, আরাধনা

কৃতজ্ঞতা ও মহিমাপ্রতিপাদক সংগীত; সংসারের অনিত্যতা ও মৃত্যুবিষয়ক সংগীত; প্রভাতসংগীত; স্বভাবসংগীত অর্থাৎ প্রকৃতিতে ঈশ্বরের মহিমাদর্শন; সন্ধ্যা ও রজনীসংগীত; ব্রহ্মোৎসবসংগীত। 'ভারতীয় সংগীতমুক্তাবলী'তে (১৩০০) নবকান্ত পঞ্চম অধ্যায়ে সংকলিত ব্রহ্মসংগীতগুলিতেও শ্রেণীবিন্যাস করেছেন—প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের উপদেশসূচকগীত, উদ্বোধন বা বোধনসংগীত, প্রভাতসংগীত, সন্ধ্যা ও রজনীসংগীত, স্বভাবসংগীত (তরুর প্রতি, হিমালয়দর্শনে, পর্বত সিন্ধু পল্লী চন্দ্র সূর্য নদী পূষণ ইত্যাদির প্রতি), সংসারের অনিত্যতা-বিষয়ক, ঈশ্বরের মাতৃভাবসূচক, আরাধনা ও কৃতজ্ঞতাসূচক, অনুতাপ ও প্রার্থনা-প্রতিপাদক, আশা ও উৎসাহসূচক, ভজন ও বন্দনা, ব্রহ্মোৎসবসংগীত, অনুষ্ঠান-সংগীত (জন্ম মৃত্যু বিবাহ শ্রাদ্ধ গৃহপ্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা, ধর্মদীক্ষা, বর্ষশেষ বা নববর্ষ সংগীত), পিতৃমাতৃস্নেহসম্বন্ধীয় গীত, হিন্দি, মহারাষ্ট্রীয় গুজরাটি ওড়িশা ও সংস্কৃত ভাষায় ব্রহ্মসংগীত, নানক, কবীর ও তুলসীদাসের গীত, ব্রহ্মসংকীর্তন প্রভৃতি।

ব্রহ্মসংগীতের (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত) দ্বাদশ সংস্করণে এই বিষয়-নির্দেশ আরও নতুন রূপ ধারণ করেছে। যেমন, প্রথম অধ্যায় 'উদ্বোধন' পর্যায়ে ব্রহ্মচিন্তা ও ব্রহ্মপূজায় আহ্বান, (উষায় প্রভাতে সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে), তাঁহাকে ভুলিও না, শান্তিলাভের জন্য তাঁহার কাছে চল, শান্ত হও, মগ্ন হও, তাঁহার নাম গান কর, ঈশ্বরের স্বরূপ মহিমা করুণা, অভয় আশ্বাস আনন্দ ইত্যাদি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'আরাধনা ধ্যান ও বন্দনা' পর্যায়কে প্রভাতপূজার আয়োজন, ঈশ্বরের বিবিধ স্বরূপের সমাবেশ ও তুমি সত্য তুমি স্রষ্টা, তোমার বিচিত্র প্রকাশ, তুমি জ্ঞান তুমি প্রাণ তুমি বিধাতা, তুমি ধ্রুবতারা, তুমি অনন্ত, তুমি আনন্দ, অমৃত শান্তি, তুমি করুণাময় তুমি প্রেমময়, তুমি মা, তুমি পরম আত্মীয়, সর্বস্ব, তুমি এক, তুমি পুণ্যময়, পরিত্রাতা, তুমি সুন্দর, ধ্যান, উপাসনাশেষ, বন্দনা, প্রণাম ইত্যাদি উপপর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। ব্রহ্মসংগীতের একাদশ সংস্করণের ভূমিকায় বা বিজ্ঞাপনে সম্পাদক লিখেছিলেন—[২২]

"বিষয়সূচীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে পাঠক নিশ্চয় ইহা অনুভব করিয়া সুখী হইবেন যে ব্রহ্মসংগীতের গানের মধ্যে সংসারের সম্বন্ধে প্রতিযোগের ও বিরাগের ভাব ক্রমশ বিরল হইয়া আসিতেছে। অপরদিকে ঈশ্বরের করুণা প্রেম ও সৌন্দর্যের অনুভূতি, তৎপ্রসূত আনন্দ, ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর, প্রফুল্লচিত্তে দুঃখ ও সংগ্রামবরণ প্রভৃতি ভাবের গানের সংখ্যা বড়ই কম। পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর সেবা করিয়া ধন্য হইব, একটু অধিক মিলন ও সুন্দর করিয়া রাখিয়া

যাইব, জীবনে ঈশ্বরের আদেশ পালনে আপনাকে অতন্দ্রিতভাবে নিয়োগ করিব, পাপত্যাগে দৃঢ়সংকল্প হইব—এই সকল ভাবের গান এখনও অধিক রচিত হয় নাই। অনুতাপের ভাবটি অধিকাংশ গানে বেদনা ও বিলাপের আকারেই প্রকাশিত হইতেছে; অতি অল্পসংখ্যক সংগীতে তাহা আশা উদ্যম ও সংকল্পের আকার গ্রহণ করিয়াছে। তৎপরে ইহাও বিবেচ্য যে, ধর্মজীবনে সত্যতার সাধনবিষয়ে সহায়তা করিতে হইলে সংগীতের ভাষা অনাড়ম্বর, স্পষ্ট ও সরল হওয়া আবশ্যক।"

ব্রহ্মসংগীতের বিষয়নির্দেশ সাধারণ পাঠক ও ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ভক্তের কাছে কী কারণে মূল্যবান ও প্রয়োজনীয়, এই ভূমিকা তা প্রমাণ করবে।

৪

ব্রহ্মসংগীত নামটি রামমোহনই প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর জীবিত-কালের মধ্যেই তাঁর নিজের লেখা বাঙলা ভাষায় রচিত কয়েকটি গান এবং অন্যান্য সহচর-বন্ধুদের রচিত গান প্রায় শত সংখ্যায় উপনীত হয়েছিল। অনুষ্ঠানে ধর্মালোচনায় ভক্তিমূলক গীতযোজনার যে ঐতিহ্য রামমোহন প্রবর্তিত করেছিলেন, তা শতাব্দীকালের মধ্যেই সমগ্র বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র (১৮২৮ খ্রীস্টাব্দ ২০ আগস্ট) বুধবার ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উপসনায় রামমোহনের তিনটি গান পরিবেশিত হয়—দুটি সংস্কৃত, একটি বাঙলা। বাঙলা গানটি হল 'ভাব সেই একে'। এইভাবে গানের নৈবেদ্যে অনুষ্ঠানের অর্ঘ্যসজ্জায় নৈপুণ্য ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে—সেই ব্যাপারেও ব্রাহ্মসমাজই অগ্রণী। উনিশ শতকের নাগরিক জীবনে বিবাহ থেকে শ্রাদ্ধ, স্মৃতিতর্পণ থেকে গৃহপ্রতিষ্ঠা, দেশপ্রেম থেকে উপনয়ন, অন্নপ্রাশন ও মৃত্যুবেদনা—সর্বকার্যেই অনুকূল সংগীত সুরচিত সুবিহিত সুর-মূর্ছনায় অনুষ্ঠানকে পূর্ণতা দান করেছে। জনৈক ভক্ত ব্রহ্মসাধকের এই মন্তব্য তাই নিতান্ত অতিশয়োক্তি ছিল না যে, "ব্রহ্মসংগীত নিরাশার আশা, কাঙালের অমূল্য রতন, ধনীর স্থায়ী সম্পদ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, শোকাতুরের শান্তিবারি, রোগীর অমোঘ ঔষধ। ভগবৎ সংগীতের মত এমন সর্বৌষধি আর নাই"।[২৩] একমাত্র ব্রহ্মোপাসকের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল সেদিন অসাম্প্রদায়িক মোহমুক্ত চিত্তে সর্বপ্রকার ধর্মসম্প্রদায়ের সংগীত থেকে গীত-নির্বাচন করে আপনাদের ধর্মোৎসবগুলিকে সুরসমৃদ্ধ করে তোলা। তাই ব্রহ্মসংগীতের ডালি দ্রুত বৃদ্ধি

পেয়েছে এবং বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীতরচনার প্রেরণা অব্রাহ্মীয় গীতিকারদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। ব্রাহ্মধর্মপ্রচারোদ্দেশ্যে নগরকীর্তনের প্রয়োজনীয়তা এবং ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও নূতন দলসৃষ্টিও নূতন নূতন গান সৃষ্টির ব্যাপারে সহায়ক হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। দ্বাদশ সংস্করণ 'ব্রহ্মসংগীতে' প্রদত্ত তথ্য ও অন্যান্য গ্রন্থ-পুস্তিকা-সংবাদ-সূত্রে জানা যায় যে, ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের পূজাবকাশে তিনজন ব্রাহ্ম তরুণ কর্মী 'প্রধানত গানের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম প্রচারোদ্দেশ্যে' বর্ধমান জেলার গুসকরা ও তন্নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রামে অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'পুরবাসিরে তোরা যাবি যদি' প্রভৃতি কয়েকটি সংগীত গেয়ে বেড়াতেন। কথিত আছে কলকাতায় ফিরে আসার পর তাঁদের সম্বর্ধনার জন্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার 'কে আমারে ডাক বিদেশী সাধু' গানটি রচনা করেন। 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' সংস্থাপনের পর অনুমানিক ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উক্ত দুই সমাজের জন্য পৃথকভাবে ব্রহ্মসংগীত রচনার ধারা প্রবর্তন করলেন। কেশবচন্দ্র-বিজয়কৃষ্ণের প্রভাবে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে যেমন বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদ প্রবেশ করল, তেমনি এল গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সম্প্রদায়-সংগীত কীর্তনের দুরতিক্রমণীয় প্রভাব। ১৮৬৭ সালের ৫ অক্টোবর ব্রাহ্মসমাজে বিজয়কৃষ্ণের লেখা ব্রহ্মসংকীর্তন পরিবেশিত হয়। ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারি অর্থাৎ ১১ই মাঘ মাঘোৎসবের দিন ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তিস্থাপনদিবসে ব্রাহ্মসমাজের প্রথম নগরসংকীর্তন গীত হয় ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের রচনা 'তোরা আয়রে ভাই'। পরবৎসরও একই দিনে মন্দির-প্রতিষ্ঠাকালে নতুন সংকীর্তন গীত হয়েছিল। এইভাবে নগরসংকীর্তনের রচনা ও প্রচার বৃদ্ধি পেল এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে বৈষ্ণবীয় ভক্তিধর্মের প্রভাব না এলেও কীর্তনের তরঙ্গ এসে লাগল। ১৮৮১ সালের ২২শে জানুয়ারি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নগরসংকীর্তন ব্যবহার তারই প্রমাণ। ভারতবর্ষীয় অথবা সাধারণ, যে কোনো ব্রাহ্মসমাজের গীতসংকলনেই নগর-সংকীর্তনের ছড়াছড়ি। রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনা নগরসংকীর্তনের স্থূলতাকে সম্ভবত সহ্য করতে পারেনি। তাই এই ঐতিহ্য উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পথ ধর্ম-সংগীতগুলির কাছে [illegible] হয়ে গেছে। সংগীতকে এই ব্যক্তিগত আবেগের দ্বারা গ্রহণ করার শিক্ষা [illegible] দেবেন্দ্রনাথের জীবন থেকেই সংক্রামিত। সংগীতের ভক্তি ও মুক্তির আনন্দ, শক্তির ব্যঞ্জনা, সুরের উল্লাস [illegible] তত্ত্বসাধনা [illegible] মহাত্মার

কবিপ্রাণের গভীরে প্রবেশ করেছিল। তাঁর আত্মস্মৃতি থেকে জানতে পারি হিমালয়ভ্রমণকালে গভীর রাতে 'যোগী জাগে' গানটি গাইতে তাঁর কী পুলক সঞ্চারিত হত। আশ্চর্য কাব্যগর্ভ ব্রহ্মসংগীত রচনার জন্য তরুণ রবীন্দ্রনাথকে যে তিনি পুরস্কৃত করেছিলেন, সে সংবাদ সুবিদিত। পরিবারে সংগীতস্রোতের প্রবাহ তিনিই এনে দিয়েছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুষ্ঠানকে গানে গানে ভরিয়ে তোলার শিল্পের রূপকার হিসাবে তাঁর নাম অবশ্যই স্মরণযোগ্য হয়ে থাকবে। কবির জীবনস্মৃতি থেকে যখন শ্রীকণ্ঠ সিংহের এই গীতমত্ত রূপটির বর্ণনা পড়ি—"ইনি আমার পিতার ভক্তবন্ধু ছিলেন। ইঁহারই দেওয়া হিন্দিগান হইতে ভাঙা একটি ব্রহ্মসংগীত আছে—'অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে—ভুল না রে তায়।' এই গানটি তিনি পিতৃদেবকে শোনাইতে শোনাইতে আবেগে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাড়াইতেন। সেতারে ঘন ঘন ঝংকার দিয়া একবার বলিতেন—'অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে'—আবার পালটাইয়া লইয়া তাঁহার মুখের সম্মুখে হাত নাড়িয়া বলিতেন—'অন্তরতর অন্তরতম তুমি যে'।"—তখন শ্রীকণ্ঠ সিংহের সঙ্গে মহর্ষিদেবের সংগীতমুগ্ধ গীতাবিষ্ট মূর্তিটি পাঠকের কল্পনায় প্রোদ্ভাসিত হয়। রামমোহনের মতো মহর্ষিদেবও সংস্কৃত স্তোত্র রচনা করেছেন—বাঙলা ব্রহ্মসংগীতও রচনা করেছেন। তাঁর প্রদীপ-শিখাকেই রবীন্দ্রনাথ আরও শতশিখায় প্রোজ্জ্বল করে নিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মসংগীতের সুরের দিকটিরও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে। ব্রহ্মসংগীতের বিপুল সংগ্রহতালিকায় যত অসংখ্য গীতকার আছেন, তাঁরা সকলেই সুরকার ছিলেন না বলাই বাহুল্য। এমন কি রামমোহনের সকল গান রামমোহনের দ্বারাই সুরার্পিত, এরও কোনো সমর্থন মেলে না। রামমোহনের পৃষ্ঠপোষকতা ও আশ্রয়ে ব্রাহ্মসমাজে যে সব গায়কদের নিযুক্ত করা হত, সম্ভবত তাঁরাই সেই গানগুলির উপর সুরযোজনা করতেন। ব্রাহ্মসমাজে নিজস্ব সর্বসময়ের জন্য গায়ক নিযুক্ত রাখা তখন থেকেই রেওয়াজে দাড়ায়। রবীন্দ্রনাথ যে বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে গান শিক্ষা করেছিলেন, তিনি দীর্ঘকাল আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক ছিলেন। কারো কারো ধারণা, 'আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে প্রকাশিত 'ব্রহ্মসংগীত' গ্রন্থের ষষ্ঠ ভাগ পর্যন্ত উপনিষদ প্রায় সকল গানের সুর তিনিই দিয়েছিলেন।'[২৭] রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সংগীতশিক্ষাগুরু যদুভট্ট এবং ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম গায়ক শ্যামপ্রসাদ প্রভৃতি সুরযোজনা করতেন। তাঁদের সংগীতসাধনা ছিল ধ্রুপদী আদর্শের, খাণ্ডারবাণী মার্গসংগীতের। তাই ব্রহ্মসংগীতও বিশুদ্ধ ক্লাসিকাল আদর্শেই গড়ে উঠেছিল। অথচ বাঙলায়

তৎকালীন সংগীতজগত তখন কবিগান-আখড়াই-টপ্পার সুরে কম্পমান ছিল। ব্রহ্মসংগীতে সে সব সুর এসেছে উনিশ শতকের শেষ দিকে।

সুতরাং ভারতীয় মার্গ বা রাগসংগীত যে বাঙলা ব্রহ্মগীতকে প্রভূত পরিমাণে পুষ্ট করেছিল সন্দেহ নেই। তানসেনী ঘরানার শিল্পী বাহাদুরসেনকে বাঙলাদেশে এনেছিলেন বিষ্ণুপুরের মল্লবংশীয় রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ। এই বাহাদুর-সেনের শিষ্যবর্গ রামশংকর ভট্টাচার্য, গদাধর চক্রবর্তী এবং তাঁর শিষ্যদের হাতে ব্রহ্মসংগীত সমৃদ্ধ হয়েছে, কারণ বহু ব্রহ্মসংগীতে তাঁরা সুরারোপ করেছিলেন। কেশবলাল চক্রবর্তী, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, অনন্তলাল গোস্বামী, রাধিকা গোস্বামী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নামগুলিও অপেক্ষাকৃত পরবর্তী-কালে ব্রহ্মসংগীতের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট। হিন্দিগান ভেঙে বাঙলাগান রচনা করা, বিশেষ করে ব্রহ্মসংগীত রচনা করা, ঠাকুর-পরিবারের প্রতিটি তরুণ স্রষ্টার কাছে ছিল নেশার মতো। রবীন্দ্রনাথের মধ্য-যৌবনকাল পর্যন্ত রচিত রবীন্দ্রসংগীত এইভাবে মার্গসংগীতের দ্বারা সমৃদ্ধ এবং প্রতি বৎসর মাঘোৎসব ও একাধিক ধর্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে রচিত অন্যান্য ব্রহ্মসংগীতগুলি সবই প্রায় হিন্দিভাঙা গান। অধ্যাপক রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে লিখেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ, "আনুমানিক ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে সংগীতাচার্য রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ও শ্যামসুন্দর মিত্রের সংস্পর্শে আসেন। ইহাদের নিকট বহুসংখ্যক ধ্রুপদ ও খেয়াল সংগ্রহ করিয়া তাহার অনুকরণে ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ রচিত ধর্মসংগীতের মূল হিন্দি-গানের অধিকাংশই রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত সংগীতমঞ্জরী ও গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত সংগীত-চন্দ্রিকা গ্রন্থে প্রকাশিত আছে। এতদ্ব্যতীত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রণীত কণ্ঠকৌমুদী ও কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গীতসূত্রসার গ্রন্থে কিছু কিছু মূল গান প্রকাশিত আছে।"[২০]

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতেই এইভাবে হিন্দিগান বাঙলা ভাষায় রূপান্তরিত হতে শুরু করেছিল। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গাও হে তাঁহার নাম রচিত যাঁর বিশ্বধাম' পরবর্তীকালে উৎকৃষ্ট ধর্মসংগীতরূপে পরিচিত। ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী লিখেছেন—

"আদি ব্রাহ্মসমাজের সংগীত সকল প্রকার হিন্দিসুরের একটি রত্নাকর বিশেষ, তা মন্থন করলে হেন হিন্দি রাগতাল নেই যা পাওয়া যায় না। এবং তার দ্বাদশ ভাগের প্রথম তিনভাগ বাদ দিলে শেষ নয় ভাগের অধিকাংশ গানই

বোধ হয় রবীন্দ্ররচিত। স্বদেশের ভাণ্ডারে এই সংগীত ব্রাহ্মসমাজের একটি অপূর্ব এবং অক্ষয় দান যার যথার্থ মূল্য কালে নিরূপিত হবে।"২৬

কালে হিন্দি রাগরাগিণীর পাশে বাঙলা লোকসংগীত বাউল-সারিগানের সুর, মধুকানের সুর, কীর্তনের সুর, জনপ্রিয় একাধিক গানের সুর গ্রহণ করে অনায়াসে ব্রহ্মসংগীত রচিত হতে থাকে। ব্রহ্মসংগীত ১০ম সংস্করণের সূচীপত্রে দেখা যায়, এমন কি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ইচ্ছা হয় সর্ব ভুলে, ছাড়ি মহা-কোলাহলে' গানটি ক্ষেত্রমোন শেঠের 'আহা আর কোথা যাব তোমারে ছাড়িয়ে' গানের সুরের উপর রচিত। এর উপর মহীশূরি গুজরাটি প্রভৃতি প্রাদেশিক সুরের সাহায্যেও রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মসংগীতের ভাণ্ডার পূর্ণ করেছেন। বিদেশী ধর্ম-সংগীতের প্রভাবও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। এইভাবে শতাব্দীকালের মধ্যে ব্রহ্মসংগীত যথার্থই এক সর্বসংগীতের মিলনমহাসমুদ্রে পরিণত হয়েছে এবং বাঙলা কাব্য-সংগীতের পরিণতি ও ভবিষ্যৎকে অনাগতকালের অসীম সম্ভাবনায় মুক্তি দিয়েছে।

৫

তথাপি ব্রহ্মসংগীতসংকলনের অজস্র গানের দিকে তাকালে একটি কথা স্পষ্ট মনে হয় যে, ব্রহ্মসংগীত রচনা অত্যন্ত সাধারণ ব্যক্তির পক্ষেও অত্যন্ত অক্লেশসাধ্য স্বচ্ছন্দ অনায়াস ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। আপনার পাপতাপ দূর করার জন্য করুণাময় প্রেমময় ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রার্থনা, কাতর অনুনয় আত্মনিবেদন প্রভৃতি একঘেয়ে প্রকাশভঙ্গি তো ছিলই, তাছাড়া অধিকাংশ রচয়িতাই সুরকার ছিলেন না, কোনো অভিনব সুশ্রাব্য সুরের সাহায্যও তাঁরা পাননি। জনপ্রিয় সুরের হুবহু অনুকরণে গান লিখবার জন্য অনেকের কাব্যাংশ দুর্বল, ছন্দ পীড়িত এবং প্রকাশরীতি ব্যাহত হয়েছে।

ব্রাহ্মধর্মের মূল কথা নিরাকার উপাসনা ও সত্যধর্ম পালন। হিন্দুদের পৌত্তলিক উপাসনার সঙ্গে তার যে বিরোধই থাকুক না কেন, ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্যে কোন বিরোধ নেই। কিন্তু ব্রহ্মসংগীতগুলিতে ব্রহ্মের মহিমা প্রকাশে ভক্তের আতিশয্য চূড়ান্ত হয়েছে। তাই মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের মতই এই ধর্মসংগীতগুলি [স্বধর্ম-মাহাত্ম্যখ্যাপন ও পরধর্মবর্জনের মনোভাবে পর্যবসিত হয়েছে। ভক্তির সরল গভীর ব্যক্তিগত আন্তরিকতার বদলে একপ্রকার গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কোথাও। যেমন জনৈক অজ্ঞাত কবিরচিত এই পিতৃমহিমাগীতে—

পরম সুখে রয়েছি   পিতার কাছে আছি
আমার এখন কিসের ভয় ?
যখন পিতায় ছেড়ে থাকি   তখনি যে দেখি
চারিদিকে আপদবিপদময়।
এখন অনলের সাধ্য   নাহি পোড়াইতে
সাগরের সাধ্য নাহি ডুবাইতে,
কাছে থাকিতে নাহি পর্বতের   সাধ্য আঘাত করিতে
প্রতিকূল বায়ু অনুকূলে বয়। ··

ঈশ্বরকে পিতা বলে সম্বোধন করা শাস্ত্রসম্মত হতে পারে, কিন্তু কাব্যসম্মত হয়ে ওঠে না।—অধিকাংশ ব্রহ্মসংগীতের পিতৃঘটিত পদগুলি তাই কবিত্বে পীড়াদায়ক মনে হয়। রবীন্দ্রনাথও প্রথম জীবনে পিতৃনামে বহু গান রচনা করিয়াছিলেন যেগুলি আন্তরিকতাহীন। কিন্তু কালক্রমে ব্রহ্মসংগীতে উদারতা প্রবেশ করেছে এবং ঈশ্বরকে পিতার বদলে মাতৃসম্বোধনে অভিহিত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে নববিধান ব্রাহ্মসমাজের গীতসংকলনের এই মন্তব্যগুলি স্মরণীয়—

"ব্রাহ্মসমাজের সাধনার মধ্যে যখন আমরা প্রবেশ করি তখন দেখিতে পাই ভক্তিভাবের সঞ্চার ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, ব্রাহ্মসমাজে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মকে হরি মা দুর্গা লক্ষ্মী প্রভৃতি ভক্তিসূচক নামে সম্বোধন আরম্ভ হয় এবং সংগীতের মধ্যেও এই সকল নাম প্রবিষ্ট হইতে থাকে। নিরাকার ভাবের এই সকল ভক্তিরসাত্মক সুমিষ্ট নামের ব্যবহার দ্বারা, কেমন সুন্দরভাবে ভগবানের সান্নিধ্য ও মধুর সঙ্গ উপভোগ করা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত অনেক নববিধান সাধকের জীবনে দেখা গিয়াছে। নববিধান যুগেই ব্রহ্মসংগীত এ বিষয়ে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। নববিধান সংগীত সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের ভক্তিপথাশ্রয়ী বিশিষ্ট ব্যক্তি এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, 'নববিধান সংগীতেই ব্রহ্মতত্ত্ব বিকাশের উচ্চতম অবস্থা প্রকাশিত এবং ভগবানের সহিত অচ্ছেদ্য নিরবচ্ছিন্ন যোগ সর্বপ্রথম পরিস্ফুট'।" (ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্তন)

ব্রহ্মসংগীতে মাতৃ-সম্বোধনাত্মক গানের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্যই 'ভারতীয় সংগীত-মুক্তাবলী'তে ব্রহ্মসংগীত পর্যায়ে 'ঈশ্বরের মাতৃভাবসূচক সংগীত' নামে একটি পৃথক উপবিভাগ যোগ করা হয়েছে। এতে দীনেশচরণ বসু, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, যদুনাথ চক্রবর্তী, শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি গীতরচয়িতার গান সংকলিত হয়েছে। অনেক গানে মাতৃসম্বোধন শেষ পর্যন্ত দেশাত্মবোধক গানে পরিণত হয়েছে, তাই অনেক ব্রহ্মসংগীতসংকলনে স্বদেশবিষয়ক গানও ব্রহ্মসংগীতরূপে

পরিচিত ও নির্দেশিত। রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত 'জনগনমনঅধিনায়ক' গানটি প্রথম গীত হয় ১৯১১ সালে কলকাতা কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে (২৭ ডিসেম্বর), তারপর মাঘ ১৩১৮ সংখ্যায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তাতে গানের শিরোনাম ছিল 'ভারতবিধাতা' এবং নিচে লেখা ছিল 'ব্রহ্মসংগীত। ২৫ জানুয়ারি ১৯১২ তারিখে জোড়াসাঁকোয় মাঘোৎসব উপলক্ষেও এটি গীত হয়েছিল। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের একটি গানের উদ্দিষ্ট ব্রহ্মময়ী, জননী না মাতৃভূমি, সহসা নিশ্চিত করে বলা যায় না—

মা আমাদের আমরা মায়ের আদরের ধন
তাঁর প্রেমে বাঁধা সব বঙ্গবাসিগণ।
ভ্রাতৃপ্রেম মহোৎসবে প্রাণে প্রাণে মিলে সবে
গাও ভীম রবে জয়। বন্দেমাতরম্।

সুতরাং ব্রহ্মসংগীতে মাতৃসম্বোধন, মাতৃআবাহনা, মাতৃবন্দনা ক্রমশই বেড়ে চলেছিল। প্রসন্নকুমার সেন-সংকলিত 'বিবিধ ধর্মসংগীতে'র (১৩১৪) ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্তন অংশের সূচনায়[27] তাই একটি সংস্কৃত ব্রহ্মস্তোত্রের পর মাতৃস্তোত্রও সংযোজিত হয়েছে। ব্রহ্মসংগীতে মাতৃব্যাকুল কয়েকটি ছত্রের উদাহরণ সংকলন করা যেতে পারে। জনৈক কাশীনাথ ঘোষ লিখেছেন—

খোল মা প্রকৃতি খোল মা দুয়ার কর আবরণ উন্মোচন
তোমার মন্দিরে তোমার ঈশ্বরে করিব অর্চন বন্দন।
লহরে লহরে তুলিয়া তান গাইছে বিহগ তাঁর গুণগান,
শুনিয়া সে গান ভেসে যায় প্রাণ আর কি মানে বারণ॥

এ গান কেবল শাস্ত্রীয় ব্রহ্মসংগীত নয়, এর মধ্যে আধুনিক বুদ্ধিগ্রাহ্য মনের স্পর্শ আছে। আসলে ব্রহ্মসংগীত শিক্ষিত চারুশীলিত মার্জিত মনের সৃষ্টি, স্বভাবকবির কাব্যগীতি নয়। শ্যামাসংগীত, কবিসংগীত, উমাসংগীত সাধারণের সম্পত্তি, কিন্তু ব্রহ্মসংগীত কেবল বুদ্ধিজীবী আধুনিক সমাজমনের ভিতরই সীমাবদ্ধ। শক্তিগীতি পদাবলীর কবি বিশ্বজননীকে মা বলে ডাকেন—সেই জননী আদ্যাশক্তি মহামায়া জগতপালিকা ত্রিগুণাত্মিকা। কিন্তু ব্রহ্মসংগীতকার প্রাগুক্ত পদটিতে মা বলেছেন কেবল প্রকৃতিকে। সেই প্রকৃতি তথা বিশ্বরূপের মধ্য দিয়ে কবির আধুনিকতা সুস্পষ্ট। এই অসাম্প্রদায়িক মাতৃচেতনাই রবীন্দ্রনাথের 'জননী তোমার করুণ চরণখানি' এবং 'তিমিরদুয়ার খোল' গানগুলিতে কৃতার্থ হয়েছে। তবে ব্রহ্মসংগীতে মাতৃআহ্বান যে প্রথাগত ধর্মভাবনার বাহন হয়নি একথা বলা

যায় না। অনেক গানেই মাতৃশব্দের ব্যবহার কেবল পিতৃশব্দের বিকল্পমাত্র। যেমন কাশীচন্দ্র ঘোষালের এই পদটি—

আজি মধুর প্রভাতকালে মিলিয়ে সকলে
প্রীতি-অঞ্জলি দিব মায়ের চরণকমলে।
আজি শুনিয়ে মায়ের মধুর আহ্বান
তাঁহার চরণে সঁপবে মন-প্রাণ,
ভক্তিরসে গলে মা মা মা মা বলে
চল যাই মায়ের কোলে।·· ···

এই সকল গানে মাতৃসমীপবর্তী হওয়ার আহ্বান ভক্তের কাছে সাম্প্রদায়িক আহ্বান মাত্র। সমগোষ্ঠীভুক্তির সংকেতমন্ত্রে যেন বিভিন্ন ব্যক্তিকে একত্র করা হয়েছে—

চল চল ভাই মায়ের কাছে যাই ভাই ভাই মিলে
মোদের কে আছে সংসারে দয়াময়ী বিনে? (কাশীচন্দ্র ঘোষাল)

আমি একমুখে মায়ের গুণ বলি কেমনে
আর কোন মা আছে এমন করে পালিতে জানে? (শিবনাথ শাস্ত্রী)

মা আছে আর আমি আছি ভাবনা কি আর আমার
আমি মায়ের হাতে খাই পরি
মা লয়েছে সকল ভার। (মনোমোহন চক্রবর্তী)

অবশ্য শিক্ষিত বুদ্ধিবাদীর সৃষ্ট বলে ব্রহ্মসংগীতে কবিত্বের স্বাভাবিক উৎসার কম। তবে সচেতন বাক্‌নির্মিতি ও ছন্দোকুশলতা এতে কিছু দেখা যায়। লক্ষণীয়, বাঙলা কাব্যসংগীত ধীরে ধীরে গানের অভ্যস্ত ছন্দ ত্যাগ করে ভাবপ্রকাশের অনুকূল, আত্মগত ভাবনার অনুকূল, কবিতার স্বাভাবিক ছন্দকে গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছে। এই ছন্দের স্বাধীনতা ও গীতিরচয়িতার স্বাতন্ত্র্য ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের একটি গীতে প্রাপব্য। এতে সুস্পষ্টভাবে মাত্রিক ধ্বনিপ্রধান ছন্দের সংগীতমাধুর্য ফুটে উঠেছে, গানটি যথার্থই সচেতনভাবে আধুনিক কাব্যসংগীতের মর্যাদালাভের যোগ্য—

চিনি না জানি না বুঝি না তাঁহারে তথাপি তাঁহারে চাই
সজ্ঞানে অজ্ঞানে পরাণের টানে তাঁর পানে ছুটে যাই।
দিগন্তপ্রসার অনন্ত আঁধার আর কোথা কিছু নাই
তাহার ভিতরে মৃদু মধুস্বরে কে ডাকে শুনিতে পাই।···
আছেন জননী এই মাত্র জানি আর কোন জ্ঞান নাই।······

ছন্দের এই কাব্যধর্মিতা আর এক কবির গানে সুখপাঠ্য—

ভাইবোনে মিলে আয়রে সকলে গড়িব ভুবন নূতন করে
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেমেতে মিলায়ে গড়িব ভুবন নূতন করে।
দুখের রজনী হবে অবসান পাইবে ভুবন নবীন পরাণ
গাইবে এবার আনন্দের গান গড়িব ভুবন নূতন করে।

(অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য)

এই গানগুলিতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংগীতের প্রভাব পড়েছে। কিন্তু বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়ের একটি গানে বাউলের সুরে রচিত ভক্তিবাদ কেবল কাব্যধর্মিতার জন্যই ব্রহ্মসংগীতের অন্তর্গত হয়েছে, অন্যথায় এটি একটি উৎকৃষ্ট অসাম্প্রদায়িক ভক্তিসংগীত—

আমার মন ভুলালে যে কোথা আছে সে?
সে দেখে আমি দেখিনে ফিরে যাই আশেপাশে।
পেলাম পেলাম দেখলাম তাঁরে এই সে বলে ধরি যাঁরে
বুঝি সে নয় সে হলে পরে আর কি মন ফিরে আসে।
বল দেখি রে তরুলতা আমার জগজ্জীবন আছেন কোথা,
তোরা পেয়ে বুঝি কসনে কথা তাই তোদের কুসুম হাসে?
বলরে বল বিহঙ্গকুল তোরা কার প্রেমে হয়ে আকুল
থেকে থেকে ডেকে ডেকে উড়ে যাস কার উদ্দেশে?

বিষ্ণুরামের 'যিনি মহারাজা বিশ্ব যাঁর প্রজা' 'বাঙালির গানে' উদ্ধৃত আছে। এইটিও জনপ্রিয় উৎকৃষ্ট কাব্যগীতির নিদর্শন। সুন্দরীমোহন দাসের অনুরূপ একটি গানও একালের কাব্য পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না—

তুমি আমার প্রভাতকুসুমগন্ধ
বিগহ মধুরকণ্ঠ তুমি বিশ্বগীত ছন্দ।
তরুণ অরুণজ্যোতি তুমি স্নিগ্ধ মলয়মন্দ
শিশিরধৌত কান্তি তুমি হৃদয়ে চিদানন্দ।
স্নেহরঞ্জিত বদন তুমি প্রণয়হাসিত নয়ন
তুমি বিশ্বপ্রেম-মধুপূরিত ভক্ত হৃদরবিন্দ।

রবীন্দ্রনাথের 'প্রথম আদি তব শক্তি আদি পরমোজ্জ্বল জ্যোতি' গানটির পূর্বাভাস পাওয়া যায় সত্যেন্দ্রনাথের একটি ব্রহ্মসংগীতে—

প্রথম কারণ আদিকবি শোভন তব বিশ্বছবি
তটিনী নির্ঝর ভূধর সাগর সব কি সুন্দর নেহারি।

রবিচন্দ্রদীপ জ্বলে তারকা মুকুতা ফলে
সুরভিকুসুম কুঞ্জকানন আহা কেমন মনোহারী।
বর্ণিবার কী শক্তি দিশি দিশি সৌন্দর্য ভাতি
যুগে যুগে জীব অগণন মহিমা তব করে কীর্তন
ভাবে মগন নরনারী ॥

৬

পূর্বেই বলা হয়েছে, ব্রহ্মসংগীত রচনার মধ্যপর্বে, ঠাকুরবাড়ির কবিপ্রতিভার আগ্রহাতিশয্যে, বহুতর হিন্দিগানের সুরে বাঙলায় ব্রহ্মসংগীত রচনার একটি বিপুল ও মহতী প্রেরণা দেখা দিয়েছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও অজস্র ব্রহ্মসংগীত হিন্দিগান ভেঙে রচনা করেছেন। গানরচনার উদ্দীপনাই ছিল প্রবল, তাই কবিত্বের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ বাধাহীন হতে পারেনি। এইজন্য ব্রহ্মসংগীতের মধ্যে অনেকখানি অংশ একই ধরনের পুনরুক্তি, ভক্তিপ্রকাশের সহধর্মা গতানুগতিকতায় ক্লিষ্টবাক্। যে ভক্তির আবেগ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাঙালি কবিদের শক্তিগীতিপদাবলীতে প্রণোদিত করেছিল, ব্রাহ্মধর্মের ভক্তি তা থেকে পৃথক, এ ভক্তি সচেষ্ট, বুদ্ধিগ্রাহ্য, মস্তিষ্কপ্রসূত। সুতরাং ব্রহ্মসংগীতের ভাণ্ডার সচেতনভাবে বহুঐতিহ্য ও প্রথা দিয়ে গড়ে তুলতে হয়েছে—তাই এই জাতীয় গানের নিজস্ব একটি ধারা ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ওঠেনি। এ কথা সত্য যে, ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ও ব্রাহ্মসমাজে যে সকল দোষ প্রবেশ করেছিল, শত শত ব্রহ্মসংগীতেও সেইগুলি প্রবেশ করেছিল। রাজনারায়ণ বসু ব্রহ্মগীতে 'চরণ' প্রভৃতি পৌত্তলিক শব্দের বিরুদ্ধে আপত্তি করে গেলেন।[২৮] 'ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্তন' পুস্তক থেকে তিনি একটি সংগীত দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধার করেছিলেন—

পিতা গো একবার হও হে উদয়
করজোড়ে করি নিবেদন,
দাঁড়াও একবার বক্ষস্থলে
চরণ ধুই হে চক্ষের জলে
লুটাইয়া পদতলে সফল করি জীবন ?……

এই গানখানি উদ্ধৃত করে রাজনারায়ণ বলেন—"এই গীতে কতকটা কালী ঠাকুরাণীর ন্যায় বেশে নূতন একরকম পৌরাণিক দেবতা সাজানো হইয়াছে। আর এক গীতে লিখা আছে—

আহা কি অপরূপ হেরি নয়নে
মিলে বন্ধুগণে প্রীতিফুল্ল হৃদয়ে
ভক্তিকমল লয়ে
করেন অঞ্জলিদান বিভু চরণে।
তরুণ ভানুকিরণে প্রভাত সমীরণে
মেদিনী অনুরঞ্জিত নবজীবনে।
প্রকৃতি মধুবস্বরে ব্রহ্মনাম গান করে
আনন্দে মগন হয়ে পিতার প্রেমে।
উৎসবমন্দিরে আজ
বিশ্বপতি ধর্মরাজ করেন বিরাজ রাজসিংহাসনে।
স্নেহময়ী মাতা হয়ে পুত্রকন্যাগণে লয়ে
বসেছেন আনন্দময়ী আনন্দধামে।
নিমন্ত্রণ করি সবে   এনেছেন মা মহোৎসবে
বিতরিতে প্রেমান্ন ক্ষুধিত জনে ॥

—এই গীতে দিব্য অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী সাজানো হইয়াছে।" রাজনারায়ণ বসুর মত রক্ষণশীল ব্রাহ্মের কাছে যে মাতৃনাম বা মাতৃরূপক ব্রাহ্ম আদর্শের পরিপন্থী ও ত্রুটিপূর্ণ, পরবর্তী কবিরা তাই নির্বিচারে গ্রহণ করেছেন। আবার রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গও ব্রহ্মসংগীতে কেন থাকবে, এই নিয়েও পরবর্তীকালে কিছু সমালোচনা হয়েছে। তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে এইরূপ মন্তব্য পাই [২৯]—

"নববিধানীরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমগান করেন, ভক্তিকাতর প্রধান আচার্যগণ এই কথা বলাতে 'সন্‌ডে মিরার' [Sunday Mirror] তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, নববিধানীরা কখন রাধাকৃষ্ণের প্রেমগান করিয়া বেড়ান না। আমরা নিম্নে যে নববিধান সংগীতটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠক দেখিবেন, এ সংগীত গান করাকে রাধাকৃষ্ণের প্রেমগান বলা যায় কিনা—

সিন্ধু ভৈরবী আড়াঠেকা

বাজাও বিবেকবংশী হরিহে নিঃশ্বাস পবনে
ভুলাও মোহন স্বরে মনোবৃত্তি সখীগণে।
ভক্তিযমুনাকূলে   প্রীতিকদম্বমূলে
বিহর আনন্দে সদা হৃদয় রাধিকাসনে।
নব নব বেশ ধরি   ওহে রসময় হরি
দেখাও রূপমাধুরী নিত্য চিত্তবৃন্দাবনে।

নানারসে কর কেলি   ভক্তবৃন্দ সঙ্গে মেলি
বাজাও মুরলী সুধারবে মধু কুঞ্জবনে।
যে ধ্বনি করি শ্রবণ   শ্রীচৈতন্য অচেতন,
ঈশ মূষা শাক্যজন আদি যত দেবগণে।

—পাঠক দেখুন, এই গীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমসম্পর্কীয় সকলই রহিয়াছে—'বৃন্দাবণ', 'সখীগন', 'বংশী', তাহার 'মোহন স্বর', 'যমুনাকূল', 'কদম্বমূল', 'কুঞ্জবন', 'কেলি', 'বিহার', ইত্যাদি। এই সংগীতটি রূপকচ্ছলে রাধাকৃষ্ণের প্রেমগীত বটে, কিন্তু ভারতের ইতিহাস দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া আমরা বলিতেছি যে, অচিরাৎ রাধাকৃষ্ণের রূপকার্থ না থাকিয়া রাধাকৃষ্ণই থাকিবে।"

অপৌত্তলিক ব্রহ্মোপাসনায় রাধাকৃষ্ণের রূপমূর্তির ধ্যান নিষিদ্ধ হলেও বাঙালির অসাম্প্রদায়িক সহিষ্ণু ও উদার ধর্মচেতনায় যেমন শ্যাম ও শ্যামায় অদ্বৈতকরণ ঘটেছে, তেমনি ব্রহ্ম ও বৃন্দাবনের মধ্যেও বস্তুত তীব্র বিরোধ গড়ে ওঠেনি—তত্ত্ববোধিনীর সতর্কতা সত্ত্বেও না। রবীন্দ্রনাথও তাঁর কবিজীবনের সূচনা থেকে রাধাকৃষ্ণের রূপকল্প ব্যবহার করেছেন. ব্রহ্মসংগীতে না করলেও অন্যান্য সংগীতের ক্ষেত্রে অন্তত তাঁর এই স্পর্শকাতর মনোভাব ছিল না। তা ছাড়া ব্রহ্মসংগীতের বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য রামপ্রসাদী ও কীর্তনের সুর গ্রহণ করা যায়, নামসংকীর্তন প্রবর্তন করা যায়, কেবল রাধাকৃষ্ণ বংশী বৃন্দাবন ব্যবহার করলেই ব্রহ্মোপাসনা দূষিত হবে? বলা বাহুল্য এই আচারনিষ্ঠ সংস্কারবাদ থেকে সামগ্রিকভাবে ব্রহ্মসংগীত মুক্ত থেকেছে।

রামমোহনের ব্রহ্মসংগীতগুলি ছিল সংসারীমনের বৈরাগ্যসংগীত, বিষয়কর্মদাস চিত্তের কাছে পারত্রিক মুক্তির জন্য ব্যগ্রতাসৃষ্টির গীতপ্রয়াস। শুষ্ক কঠোর জ্ঞানবাদী বৈরাগ্যপ্রচারই সেগুলির ধর্ম। ভয়ংকর শেষের সেদিনের অশরীরী শিহরণসঞ্চার, ষড়রিপুর দুঃসহপীড়ন, কাল-ধীবরের করাল জালবিস্তার—এই সকল তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ প্রথম যুগের ব্রহ্মসংগীতগুলিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কিন্তু কালক্রমে ব্রাহ্মধর্মের রূপ বদলাল, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি এল, প্রেম এল। ব্রহ্মসংগীতেও এল জীবনাসক্তি, প্রকৃতিপ্রীতি ও বিশ্বচেতনা। সত্যেন্দ্রনাথ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীতগুলি সূক্ষ্মভাবে পাঠ করলেই তার প্রমাণ মেলে। ব্রহ্মসংগীতের সম্পূর্ণ একটি সংকলন, গীতিকারদের পূর্ণ তালিকা ও তাঁদের সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহ করে ব্রহ্মসংগীতের ধারাবাহিক বিবর্তনের ইতিহাস রচনার প্রয়োজন আছে।

১। "মির্জা মহাশয়ের সমীপে সংগীতশিক্ষা সময়ে মহাত্মা রামমোহনের হৃদয়ে অদ্বৈতবাদিতার বীজ প্রথমে রোপিত হয়।" গীতলহরী—অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

২। "ধর্মপ্রচারক ও মহাত্মা রামমোহন রায়'—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৮০৮ শকাব্দ (১২৯০)

৩। গীতরত্ন (২য় সংস্করণ) ১২৬০

৪। মধুস্মৃতি—নগেন্দ্রনাথ সোম

৫। ব্রহ্মসংগীত, ১০ম সংস্করণ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহক সভার অনুমত্যনুসারে প্রকাশিত, ব্রহ্মাব্দ ৯২। [ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির তালিকাভুক্তির তারিখ ১৮ জুলাই, ১৯২৩]

৬। রবীন্দ্রজীবনী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ২৭

৭। "ব্রাহ্মসমাজের Church music বা খ্রীষ্টীয় যাজনসংগীতের অনুকরণে ব্রহ্মসংগীত নামে একশ্রেণীর ভাগবতী গীত গাওয়া হইত। এই ভাগবতী গীতিরচনার সূত্রপাত করেন স্বয়ং রাজা রামমোহন।" রবীন্দ্রসংগীত পরিমণ্ডল—জয়দেব রায়

৮। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্ বা ব্রহ্মবিষয়ক গীতসমূহ/যাহা ব্রাহ্মসমাজে উপাসনাকালীন সংগীত হয়/তত্ত্ববোধিনী সভা/২ আশ্বিন ১৭৭৫ শক/কলিকাতা/তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইল।" প্রভাতকুমার রবীন্দ্রজীবনীর পূর্বোক্ত মন্তব্যের পাদটীকায় লিখেছেন, "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্ম যুবসমিতি কর্তৃক প্রকাশিত 'ব্রহ্মসংগীত' গ্রন্থে রাজা রামমোহন রায়, তাঁহার অনুবর্তী ও বন্ধুগণ কর্তৃক রচিত কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে সাপ্তাহিক আরাধনাকালীন গীতের সংখ্যা ১০৪টি।"

১০। অবশ্য ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে 'ব্রহ্মসংগীত' নামক একটি গীতসংগ্রহ ১৮০০ শকাব্দে অর্থাৎ নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সংকলন প্রকাশের ৭।৫ বৎসর পূর্বেই প্রকাশিত হয়। সেই সংগ্রহের তুলনায় নবকান্তের সংগ্রহ আরও উন্নত ও প্রণালীবদ্ধ। সর্বোপরি নবকান্ত কবিদের নাম সংগ্রহ করেছিলেন। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ভারতীয় সংগীতমুক্তাবলী'তেও (তৃতীয় সং ১৮৯৩) ৫৩ ব্রহ্মসংগীত সংকলিত হয়েছে (নবকান্ত স্বয়ং ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন, পরে দ্বিজেন্দ্রলাল ঠাকুরের পুত্রের সঙ্গে এঁর কন্যার বিবাহ হয়)। এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখযোগ্য যে, কৃষ্ণানন্দ ব্যাসের 'সংগীতকল্পদ্রুম' 'নির্গুণ গান' পর্যায়ে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান সংকলিত হয়েছিল। ব্রহ্মসংগীত-সংকলনের এই প্রয়াস আদি ব্রাহ্মসমাজের পূর্ববর্তী ঘটনা

৯। ব্রহ্মসংগীত সংগ্রহ/প্রথম ভাগ/শ্রীনবকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত/ইস্ট বেঙ্গল প্রেস—সন ঢাকা/১২৮৯। ১০ই মাঘ/ ১ম সংস্করণ/শ্রীনবীনচন্দ্র দে প্রিণ্টার/প্রকাশকের নিকট প্রাপ্তব্য/মূল্য দশ আনা।'

১১। 'ভারতীয় সংগীতমুক্তাবলী'র ভূমিকায় নবকান্ত তাই সগৌরবে বলেছেন—"ব্রহ্মসংগীত-গুলির রচয়িতার নাম আমরা সর্বপ্রথম প্রকাশ করি।"

১২। 'ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের বর্তমান আধ্যাত্মিক অভাব,' রাজনারায়ণ বসু দ্বারা অভিব্যক্ত, কলিকাতা চৈত্র ১৭৯৬ শকাব্দ

১৩। 'ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্তন/(দ্বিতীয় ভাগ)/ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ।/পঞ্চাশোত্তম মহোৎসব।/তদেব রম্যং রুচিরং...ইত্যাদি ভাগবতোক্ত শ্লোক/কলিকাতা/৬নং কলেজ স্কোয়ার, ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে/শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত/শকাব্দ ১৮০১/১০ই মাঘ।"

১৪। ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্তন। ত্রয়োদশ সংস্করণ, ব্রহ্মাব্দ ১২৯, শকাব্দ ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ ১৯৫৮।

১৫। "এস্থানে দুঃখের সহিত ইহাও বলিতে হইতেছে, নূতন গানের স্থান করিবার জন্য, পূর্ব পূর্ব সংস্করণের কতকগুলি পুরাতন গান, যাহা আজকাল সাধারণত ব্যবহৃত বা গীত হয় না, পরিত্যাগ করিতে হইল।" (ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্তন, ১২শ সংস্করণের ভূমিকা)

১৬। সংগীতরসতরঙ্গিণীর আখ্যাপত্রটি এইরূপ—"ওঁ তৎসৎ/ব্রহ্মবিষয়ক সংগীত।/রসতরঙ্গিণী নাম গ্রন্থ।/সামবেদানুকরণম/উপক্রমণিকা।/…দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়/প্রণীত।/শ্রীশ্রীরামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়/প্রকাশিত/সন ১৩০১ সাল।'

১৭। "গরীবের গান/ (ধর্মনীতি ও মাদক নিবারণাদি বিষয়ক)/১৮৮২ শক (১৯০০)/ হাবড়া/নববিধান ব্রাহ্মসমাজ।' (ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে উৎসর্গ করা)

১৮। শতগান (১৯০০) "Hundred songs by celebrated composers set to Indian music."

১৯। ব্রহ্মসংগীত স্বরলিপি (৪ খণ্ড)—আদি ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত জনপ্রিয় গানের স্বরলিপি পুস্তক (১৯৫৫)

২০। নববিধান ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত জনপ্রিয় একশোটি গানের স্বরলিপি (১৯৬০), স্বর-লিপিকার সত্যভূষণ গুপ্ত

২১। "ব্রাহ্মসমাজের আবহাওয়ায় জন্মলাভ করিয়া আমরা বাল্যকাল হইতে বহুবিধ সংগীত শুনিয়া আসিতেছি, কারণ সকল প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠানে এবং জ্ঞানভক্তিসমন্বিত উপাসনায় গানই প্রধান উপকরণ"—শেফালিকা শেঠ (রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গে)

২২। ব্রহ্মসংগীত—১১শ সংস্করণের বিজ্ঞাপন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংগীতপ্রকাশ-কমিটির সম্পাদক, শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী লিখিত, ডিসেম্বর ১৯৩১

২৩। কাঙালীচরণ সেন—ব্রহ্মসংগীত স্বরলিপি, চতুর্থ খণ্ড, ভূমিকা

২৪। জয়দেব রায়—রবীন্দ্র সংগীতপরিমণ্ডল। অবশ্য এই তথ্য সন্দেহাতীত নয়। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য—"এগারো বৎসর বয়সে বিষ্ণুচন্দ্র রামমোহনপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন এবং ১৮৩০ হইতে ১৮৯৭ পর্যন্ত সমাজের গায়করূপে সাপ্তাহিক অধিবেশনে একটি দিনের জন্যও অনুপস্থিত হন নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজের সংগীত গ্রন্থের … গানের মধ্যে ২৫০টি গানে বিষ্ণুচন্দ্র সুর সংযোগ করেন বলিয়া অনুমান।" রবীন্দ্রজীবনী ৪র্থ খণ্ড সংযোজন (১৩৬৭)। প্রভাতকুমার এক্ষেত্রে অনুমানের উপরই নির্ভর করেছেন, প্রমাণের উপর নয়। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য 'রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংগীতগুরু'—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, দেশ বৈশাখ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮২

২৫। 'ভারতীয় উচ্চাঙ্গসংগীতে রবীন্দ্রনাথের দান'—রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শেফালিকা শেঠ-রচিত 'রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ

২৬। 'সংগীতে রবীন্দ্রনাথ' জয়ন্তী উৎসর্গ—ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য—"round about this time a totallly different atmosphere pervaded this family atmosphere at Jarasanko, viz., that of our Hindusthani or what is now called classical music. Maharshi Devendranath Tagore was a great patron of this school and many were the master singers who visited his house. The poet himself has described how he and his brothers, *tanpura* slung on shoulder, used to go and take lessons from these masters. Though the poet never formally registered himself as the disciple of any

preceptor by tying the coloured thread round his wrist, as was the prevailing custom—yet he naturally imbibed the spirit of Hindusthani music from the surrounding air and sky and earth. Among these master singers may be mentioned the names of Jadu Bhatta, Moulabuksh, and Bishnuram Chakrabarti of his boyhood days, and later on, Radhika Goswami of Bishanupur. He also received some singing lessons in childhood from the music-mad Srikantha Sinha of Raipur"—Songs of Rabindranath Tagore by Indira Devi Chawdhurani, from Centenary Number, Rabindranath Tagore. Sangeet Natak Akademi

২৭। এই গ্রন্থে 'ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্তন' অংশে মোট ৯১৭টি গান আছে

২৮। 'ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের বর্তমান আধ্যাত্মিক অভাব'—রাজনারায়ণ বসুর দ্বারা অভিব্যক্ত

২৯। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮০৩ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা, নববিধান প্রবন্ধের পাদটীকা, পৃঃ ১৫১

বাঙলা কাব্যসংগীত : দেশাত্মবোধক গীতি

১

বাঙলা কাব্যসংগীতের ইতিহাসে দেশাত্মবোধক সংগীতের স্থান উল্লেখযোগ্য, যদিও কোনো বিশেষ কালপর্বে এই পর্যায়কে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। ইংরাজ শাসনের দ্বিতীয়ার্ধের অন্তত এক শতাব্দী বাঙালির স্বদেশচেতনা তার শিল্প-সাহিত্য সংগীতে অজস্র প্রাণস্পন্দিত ধারায় প্রবাহিত হয়েছে এবং আজও, এই স্বাধীন ভারতবর্ষেও এর ক্ষান্তি নেই। বিভিন্ন ঘটনায়, রাজনৈতিক সংক্ষোভে, উত্তেজনায়, আঘাতে, প্রতিবাদে এই স্বদেশচেতনা কখনও উত্তাল হয়ে উঠেছে, কখনও এর বেগ বনান্তরালে প্রবাহিত ক্ষীণস্রোতা নদীর মত নিঃশব্দ-সঞ্চারী, কিন্তু অবিচ্ছিন্ন থেকে গেছে। যে কোনো দেশের সংগীতের ইতিহাসেই স্বদেশ-চেতনার একটি অপ্রমেয় ভূমিকা আছে। মানুষের যে কটি হৃদয়বৃত্তি শিল্প ও ললিতকলাকে প্রবুদ্ধ করে, স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশপ্রীতি তাদের অন্যতম। বিশেষত ঔপনিবেশিক শাসনভুক্ত দেশগুলিতে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের নব-জাগৃতির ইতিহাসে স্বদেশচেতনার স্থান ঐতিহাসিক। সর্বজনীন মানবতার প্রথম পর্বই হল দেশকেন্দ্রিকতা। যে গানে বা কাব্যগীতে স্বদেশের প্রতি বন্দনা ও অনুরাগ জ্ঞাপন করা হয় তাকেই স্বদেশী গান বলা যেতে পারে। এই অনুরাগ-প্রকাশ বৈষ্ণবীয় মানের মত সহেতুক বা নির্হেতুক। কখনও স্বদেশের সৌন্দর্যে-ঐশ্বর্যে, ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক মাহাত্ম্যে পুলকিত হয়ে, কখনও তার দুঃখে দারিদ্র্যে ব্যথিত হয়ে এই চেতনা জন্মাতে পারে। সমকালীন কোনো ঘটনা এই চেতনা উদ্বুদ্ধ করতে পারে, অথবা চিরস্মরণীয় মাতৃভূমিকে বহির্ঘটনা-নিরপেক্ষভাবেও স্মরণ করতে বাধা নেই। স্বাদেশিকতা সচরাচর গানকে আশ্রয় করে বেশি কারণ মানবমনে গানের প্রভাব সমধিক। স্বদেশের ভৌগোলিক সীমা, তার ইতিহাস-ঐতিহ্য, মানবিকতার উত্তরাধিকার ও প্রাকৃতিক সম্পদ এই সব নিয়েই স্বদেশের সংজ্ঞা গড়ে ওঠে। আর জনকল্যাণ, দেশমাহাত্ম্য উপলব্ধি, আত্মোৎসর্গের আহ্বান, কর্তব্যবুদ্ধির জাগরণ, আত্মস্বাতন্ত্র্য, দেশের দুর্গতদের জন্য ঈশ্বরের কাছে মাঙ্গলিকপ্রার্থনা সবই স্বাদেশিকতার অন্তর্ভুক্ত। স্বদেশপ্রেমের প্রথম যুগ ইতিহাসচেতনা ও আত্ম-গৌরবে মোহান্ধ, পরবর্তী যুগ মিশ্র প্রকৃতির। স্বদেশচেতনা কখনও অবজ্ঞাতের পুনরুদ্ধারে অভিনিবিষ্ট হয়। সেই সূত্রে লোকসংগীতের সুর দেশাত্মবোধক গানে গুরুত্ব ও প্রাধান্য পেয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভৌগোলিক অঞ্চলের

প্রতি অতিলৌকিক সৌন্দর্য-আরোপ স্বদেশবোধক কবিমনের একটি অত্যাগ্রহী লক্ষণ। বাঙলা দেশাত্মবোধক কাব্যসংগীতে নিম্নলিখিত বিষয়বিভাগ পাওয়া যায়।

১. সর্বজনীন মানবতার মাহাত্ম্য ও দৈবী কল্যাণকামনা ২. ভারত-সংগীত ৩. বঙ্গসংগীত ৪. প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যবন্দনা ৫. ঐতিহাসিক ঘটনার গৌরবস্মৃতি ৬. জন্মধন্যতা প্রচার ৭. পরাধীনতার জন্য ক্ষোভপ্রকাশ এবং পূর্বগৌরবলুপ্তির জন্য লজ্জা নৈরাশ্য ও জাগরণের মৃদু আহ্বান ৮ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আত্মপ্রকাশ ৯. ঐকশক্তির মাহাত্ম্য ১০. একক আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস ১১. সমসাময়িক ঘটনাশ্রিতগান ১২. বাঙলা ভাষা-বিষয়ক।

বাঙলা ভাষায় লেখা দেশাত্মবোধক গানে তিন জাতীয় সুর প্রচলিত আছে—রাগরাগিণী-ভিত্তিক মিশ্র সুর, লোকসংগীতাশ্রিত সুর, বিদেশী সুর বা ব্যাণ্ডের সুর।

২

বাঙলদেশে স্বদেশপ্রেমাপন্ন সংগীতের সূত্রপাত করে থেকে, নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। জাতীয়তাবোধ-জাগরণের প্রথম দিকে বাঙালি কবির সাংগীতিক চেতনা যথোচিত বিকাশ লাভ করেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে লেখা হয়েছিল, এমন কোনও দেশাত্মবোধক গানের সন্ধান পাওয়া যায় না। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙলা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যসংগীতকার নিধুবাবু জীবিত ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রেমমনস্তত্ত্বের সুনিপুণ রূপকার ছিলেন, স্বদেশচেতনার নয়। তবে আধুনিকতার প্রথম লক্ষণ যে ব্যক্তিত্ববোধ তা বাঙলা ভাষাকে কন্দ্র করে নিধুবাবুর মনেই প্রথম স্ফুরিত হয়েছিল। মাতৃভাষার মহিমা নিধুবাবুই সর্বপ্রথম উচ্চারণ করেছিলেন—

নানান দেশের নানান ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা।
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা॥

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত বাঙলা স্বদেশী গানের বীজ সন্ধান করেছেন পূর্ব যুগের শক্তি-উপাসক কবিদের মাতৃসাধনার মধ্যে—

"কংগ্রেস-আন্দোলনের আরম্ভের সঙ্গে ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের

আরম্ভ নয়। ইহার প্রস্তুতি চলিতেছিল অনেকদিন পূর্ব হইতেই। বাঙলা দেশে দেখিতে পাই, এই ক্ষেত্রপ্রস্তুতি চলিতেছিল সাহিত্য ও সংগীতের মাধ্যমে।... ...

বাঙলা দেশ মাতৃপূজার দেশ, দেশকে এখানে প্রথম হইতেই চৈতন্যময়ী প্রেমময়ী দেবী বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। পৌরাণিক মাতৃপূজা এবং নবদীক্ষায় লব্ধ দেশমাতৃকার পূজা এখানে অবাধে মিলিয়া মিশিয়া একেবারে এক হইয়া গিয়াছে"।[৩]

কিন্তু মাতৃসাধনার সঙ্গে দেশবন্দনার মিশ্রণ হিন্দুমেলার পূর্বেই ঘটেছিল, এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়নি। তবে, প্রথম যুগে দেশভক্তির সঙ্গে ঐশীভক্তির নিবিড় সম্পর্ক ছিল। বিশ্বসৃষ্টির কারুকৃতের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের ভঙ্গিটি পরবর্তীকালে মাতৃভূমির স্রষ্টার উপর আরোপিত হয়েছে। রামমোহনই এদেশে জাতীয় জাগরণের পুরোধা এবং ভারতবর্ষে প্রথম সমাজ-আন্দোলনের সূচনাকারী।[৪] তিনি বাঙলায় প্রথম ব্রহ্মগীতকার। তাঁর ব্রহ্মভক্তির মধ্যে পরবর্তী দেশভক্তির গুঞ্জন শ্রুতিগোচর হয়। স্বদেশ শব্দটি তাঁর ব্রহ্মসংগীতেই প্রথম পেয়েছি—

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি
তোমার রচনামধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি।[৫]

উনিশ শতকের মধ্যভাগে সংঘটিত সিপাহি বিদ্রোহে বাঙালি বুদ্ধিজীবীর জাগরণ ঘটেনি, বাঙলা সাহিত্যে তাই সিপাহি বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই। সিপাহি বিদ্রোহে ভারতের বহুস্থানে অজস্র লোকসংগীত রচিত হয়েছিল, যদিও তার কোনো নিদর্শন রক্ষিত হয়নি। বাঙলাদেশেও এই ধরনের লোকগীত রচিত হয়ে থাকবে, কারণ তিতুমিরের উপর রচিত একটি গ্রাম্য গীত 'নারকেল বেড়ে গাঁয়েতে' 'বাঙালীর গান' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। (এই প্রসঙ্গে ১৩১২ সালে ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত রজনীকান্ত পণ্ডিত সম্পাদিত 'স্বদেশী পল্লী-সংগীত' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য)।

সংবাদপ্রভাকরে ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশপ্রেমপ্রচার এবং মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি অতন্দ্র অনুরাগের ঘোষণা, রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান', রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহ ও দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে দেশভক্তির উদ্দীপক রচনাপ্রকাশ, বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন, হিন্দুমেলা, জাতীয় নাট্যশালা স্থাপন, 'নীলদর্পণের' অনুবাদ প্রকাশ ও অভিনয় প্রভৃতি বিচিত্র-বিবিধ ঘটনায় আমাদের স্বদেশচেতনার ইতিহাস উনিশ শতকের

দ্বিতীয়ার্ধে স্পন্দিত হয়ে উঠেছিল। এর মধ্যে হিন্দুমেলাই সেই বৃহত্তম ঘটনা, বাঙলা দেশাত্মবোধক সংগীতের ইতিহাসে যার প্রভাব সর্বাগ্রগণ্য।[৬] হিন্দু-মেলাকে কেন্দ্র করে স্বদেশের বাণীমূর্তি সংগীতে মূর্ছিত হয়ে উঠেছিল এবং এই ব্যাপারে ঠাকুরবাড়ির কৃতিত্বও কম ছিল না। হিন্দুমেলার গোড়ার দিকে গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় নামে জনৈক গীতকার অজস্র গান রচনা ও স্বরারোপ করে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। সমসাময়িক ঘটনা ছিল তাঁর গানের প্রধান প্রেরণা।[৭] গঙ্গাধরের স্বদেশানুরাগ-ঘটিত গানের নামকরণ ও বিষয় এইরূপ— কংগ্রেস, পুরুষার্থ উপার্জনে স্বদেশবাসিগণের উক্তি, ব্রিটেনের প্রতি ভারত-ভূমির উক্তি, প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের ভারত আগমন, মহারানী স্বর্ণময়ী, বিদ্যাসাগর ইত্যাদি। সেই যুগের জাতীয়তাবোধ ছিল মিশ্র প্রকৃতির, অনেকাংশেই অনসূয় অথবা অনুনয়সূচক ও সম্ভ্রমাত্মক। গঙ্গাধর ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রিটিশ-সেবক, অথচ স্বদেশানুরাগী। এই মিশ্র ও বিপ্রতীপ মনোভাব দীর্ঘকাল আমাদের স্বদেশচেতনাকে আশ্রয় করেছিল, সংগীতেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত ব্রিটিশ-প্রশস্তি রচনা করেছেন। সেইজন্য গঙ্গাধরও একদিকে পুরুষার্থ-উপার্জনে দেশবাসীকে প্রবুদ্ধ করেছেন, অন্যদিকে লর্ড রিপনের স্বরাজশাসনের গুণগান করেছেন। তিনিই প্রথম God Save Our gracious Queen অর্থাৎ ভিক্টোরিয়ার প্রশস্তিগীতির বঙ্গানুবাদ করেন। এর পূর্বে কেউ বিদেশী জাতীয় সংগীতের অনুবাদ করেছিলেন বলে জানা যায় না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই নিয়ে প্রভূত পরিশ্রম করেছিলেন। বিদেশী জাতীয় সংগীতের যে বিশেষ চারিত্র্য ও সর্বজনসমাদৃত রূপ, তার অনুবাদপ্রিয়তা এদেশের গীতকারদের মনে অনুরূপ জাতীয় গীতরচনায় প্রণোদিত করেছিল, সন্দেহ নেই।

জাতীয় সংগীত রচনার প্রথম সার্থক প্রয়াস দেখা যায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে। ১৮৬৭ সালে হিন্দুমেলাকে তিনি উপহার দিয়েছিলেন—

মিলে সব ভারতসন্তান একতান মন প্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন স্থান
কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান।
ফলবতী বসুমতী স্রোতাবতী পুণ্যবতী
শতখনি রত্নের নিধান।
হোক ভারতের জয় জয় ভারতের জয়

গাও ভারতের জয় কী ভয় কী ভয়
গাও ভারতের জয় ॥

এই গানে স্পষ্টত জাতীয় সংগীতের লক্ষণগুলি ফুটে উঠেছে। এর পর্বান্তরে আছে ভারতের শাশ্বতী গৌরবিণী নারীর মহিমাকীর্তি, পুরাণ ইতিহাসের দৃষ্টান্ত উদ্ধার, সনাতন ভারতবর্ষের মাহাত্ম্যকথার উদাহরণপরম্পরা। বহুকাল পর্যন্ত দেশাত্মবোধক কাব্যগীতে এই লক্ষণগুলিই অনুসৃত হয়ে এসেছিল। হিন্দুমেলাকে কেন্দ্র করে ঠাকুরবাড়িতে সংগীতের চর্চা হয় সর্বাধিক। দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, কিশোর রবীন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ একযোগে গান রচনা করতেন। তার মধ্যে গুণেন্দ্রনাথের 'লজ্জায় ভারতযশ গাইব কী করে' গানটি রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল। ঠাকুরবাড়ির বাইরেও খ্যাত-অখ্যাত কবিদের হাতে স্বদেশী গীতের প্রবাহটি অক্ষুণ্ণ ছিল।

হিন্দুমেলার বক্তা, কবি, নাট্যকার, যাত্রা-থিয়েটার-পাঁচালি কবিগান হাফ-আখড়াই বাউল সংকীর্তন প্রভৃতি সর্বপ্রকার গীতরচনায় পারদর্শী, মধ্যস্থ পত্রের সম্পাদক, 'রামাভিষেক' নাটকের রচয়িতা কবি মনোমোহন বসু ভৈরবীতে গান বাঁধলেন—

দিনের দিন সবে দীন হয়ে পরাধীন
অন্নাভাবে শীর্ণ চিন্তাজ্বরে জীর্ণ
অপমানে তনু ক্ষীণ।
সে সাহসবীর্য নাহি আর্যভূমে
পূর্ব গর্ব সর্ব খর্ব হল ক্রমে
চন্দ্র সূর্য বংশ অগৌরবে ভ্রমে
লজ্জারাহুমুখে লীন।...
ছুঁইসুতো পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে
দিয়াশালাই কাঠি তাও আসে পোতে
প্রদীপটি জ্বালিতে খেতে শুতে যেতে
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন ॥[৮]

মনোমোহন সম্পর্কে জনৈক সমালোচক একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

"নাট্যরচনার ন্যায় সংগীতরচনায়ও মনোমোহনের অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। তাঁহার সংগীতগুলির অধিকাংশই দেশহিতমূলক। মনোমোহন নিজে যে অত্যন্ত দেশবৎসল ছিলেন তাঁহার রচিত সংগীতাদি হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্তমানে এদেশে যে স্বদেশীয়তার লক্ষণ দেখা দিয়াছে, তাহার সূত্রপাত

মনোমোহনের সময় হইতেই আরম্ভ হয়। ঐ সময় কলিকাতার ঠাকুরবাবুদের প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেলা এ বিষয়ের প্রধান সহায় হইয়াছিল। মনোমোহনের রচিত 'দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ সংগীতটি ঐ হিন্দুমেলায়ই সর্বপ্রথম গীত হয়।'[৯] মনোমোহনের অনেক গীতেই পরাধীনতার আত্মগ্লানি সমসায়িক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঘোষিত হয়েছে। বিবিধ করভার স্থাপনে ইংরাজ রাজশক্তি ভারতবাসার জীবন কী পরিমাণে দুর্বিষহ করে তুলেছে, বিভাস একতালায় তার গান শুনি মনোমোহনের কণ্ঠে—

নরবর-নাগেশ্বর-শাসন কী ভয়ংকর।
দে কর দে কর রব নিরন্তর—করের দায়ে অঙ্গ জরজর॥
সিন্ধুবারি যথা শুষে দিনকর, শোণিত শোষণ করে শত কর
করদাহে নরনিকর কাতর রাজা নয় যেন বৈশ্বানর॥

স্থলে-জলে, যানবাহন-পশু-শ্রমিক-আয়-ব্যয়-লবণ-মাদকদ্রব্য সকলের উপর নির্মম কর আরোপের জন্য মনোমোহন 'নীচাশয় এম্নি রাজ্যেশ্বর' বাক্য ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হননি। বাউল সুরে রচিত 'কোথায় মা ভিক্টোরিয়া দেখ আসিয়া ইণ্ডিয়া তোর চলছে কেমন' সুদীর্ঘ কাব্যগীতি। ব্রিটিশ শাসনের স্বেচ্ছাচারিতা, নানাবিধ দমননীতি, কৃষ্ণবর্ণ ভারতবাসীর প্রতি বিচারের নামে প্রহসন, গণতন্ত্রের সমাধি, অর্থনীতিগত শোষণ, প্রভৃতি বহুবিধ দুর্গতির প্রতি দয়াময়ী ভিক্টোরিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যশিষ্য লিখেছেন—

হয় কি না হয় সত্য কথা এসে হেথা
একবার কর মা নিজে দর্শন,
নয় তো কেউ তোর বিশ্বাসী দেখুক আসি
গুপ্তভাবে করে ভ্রমণ॥
কমিশন বসাস নে মা, তায় কাঁপে গা,
লোক ভুলাবার ফাঁদ কমিশন
আমরা তোর দুঃখী সন্তান কর পরিত্রাণ
অভয় দে মা ধরি চরণ॥

মনোমোহনের আর একটি গানে দেশের যান্ত্রিক বিদ্যায় উন্নতির জন্য আত্মশ্লাঘার বদলে নৈরাশ্যের সুর শোনা যায়, কারণ এই উন্নতি সবই বিদেশী-সাধিত, স্বদেশবাসীর দ্বারা কৃত নয়। নিবিড় দেশপ্রেমের সঙ্গে কঠিন বিদ্রূপে একদা মনোমোহন বাঙলা দেশাত্মবোধক সংগীতের যে সুস্থ ও উদ্দীপিত ঐতিহ্য

সৃষ্টি করেছিলেন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তা পুষ্ট ও পল্লবিত হয়ে উঠেছিল। বাঙলা দেশাত্মবোধক সংগীতের ইতিহাসে মনোমোহন একটি সার্থক নাম।

১৮৭৬ থেকে ১৯২১-২২ সাল পর্যন্ত বাঙলা দেশাত্মবোধক কাব্যসংগীতের যে সকল সংকলন প্রকাশিত হয়েছে সেইগুলি অবলম্বন করেই বাঙলা কাব্যগীতির এই ধারাটির গতিপ্রকৃতির একটি মানচিত্র অঙ্কন করা যায়।[১০] বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেই বাঙলাদেশ সর্বপ্রথম জাতীয়চেতনায়, পরাধীনতার বেদনায়, দেশপ্রেমের গভীরতায় উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। সেই সঙ্গে বাঙলা গানে স্বদেশপ্রেম প্রচারের একটি প্লাবন এসেছিল, স্বদেশী সংগীতসংকলনে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল বৃহৎ বঙ্গভূমি। তার পূর্বে স্বদেশচেতনাশ্রিত গানের সংকলন পৃথকভাবে সামান্যই হয়েছিল। দেশানুরক্তিমূলক গানের সংকলনের প্রবলতা আবার নতুন করে দেখা দিয়েছিল ১৯২১-২২ সালে বাঙলাদেশে যখন গান্ধির স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেতৃত্ব এসেছে, দেশবন্ধুর স্বরাজব্রতের যুগ চলেছে। এই পর্বে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ও তৎপূর্ববর্তী স্বদেশী গানের পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রচারের চেষ্টা দেখা দিয়েছিল। বিভিন্ন প্রকার স্বদেশী আন্দোলনের কর্মীদের প্রেরণাদানের দিকেই সেকালের এই জাতীয় গীতসংকলনগুলির লক্ষ্য ছিল, যথার্থ সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিক প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে গীতসংকলন প্রকাশিত হয়নি। তাই সেকালের বহু ক্ষুদ্র স্বল্পপৃষ্ঠার ও স্বল্প মূল্যের গীতসংকলনের সন্ধান আজ বিশেষ পাওয়া যায় না। ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে ভারত-চীন সীমান্তবিরোধের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশে যে স্বাদেশিকতার নতুন করে উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল, তারই অনুপ্রেরণায় হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য মাতৃবন্দনা নামে একটি বৃহৎ গীতসংকলন প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে সংকলয়িতা ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাঙলা ভাষার প্রকাশিত স্বদেশী সংগীতের কয়েকখানি আকরগ্রন্থের তালিকা দিয়েছেন। সেইগুলি যথাক্রমে—

জাতীয় সংগীত	দ্বারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৭৬
ভারতীয় সংগীত মুক্তাবলী	নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৫
স্বরলিপি-গীতিকা	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৯৭
শতগান	সরলাদেবী ১৯০০
সংগীত-সারসংগ্রহ	হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ১৯০১
বাঙলার গান	উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১৯০৫
জাতীয় রাখীসংগীত	নব্যভারত সমিতি ১৯০৫
বন্দে মাতরম	যোগীন্দ্রনাথ সরকার ১৯০৫

বাঙালীর গান	দুর্গাদাস লাহিড়ী ১৯০৬
জাতীয় সংগীত	উপেন্দ্রনাথ দাস ১৯০৬
স্বদেশগাথা	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৯০৬
সোনার বাঙলা	সান্যাল এণ্ড কোং ১৯০৬
মাতৃগাথা ১ম	হেমচন্দ্র সেন ১৯০৭
স্বদেশী সংগীত	নরেন্দ্রকুমার শীল, ১৯০৭
স্বদেশ সংগীত	যোগেন্দ্রনাথ শর্মা ১৯০৭
স্বদেশধূলি	পরেশচন্দ্র চৌধুরী ১৯১৯
আবাহন	বিজয়লক্ষ্মী দেবী ১৯২০ রংপুর
স্বদেশী সংগীত	বিপিনচন্দ্র চক্রবর্তী ১৯২১ বরিশাল
স্বরাজ সংগীত	সুধা দেব ১৯২১ আসাম
উপেন্দ্রসংগীত	উপেন্দ্রমোহন ঘোষাল ১৯২১ ঢাকা
জাতীয় সংগীত	সরোজিনী দেবী ১৯২২ বরিশাল
জাতীয় সংগীত	রেণুপ্রভা দেবী ১৯২২ ঢাকা
জাতীয় সংগীত	বিজয়কুমার চক্রবর্তী ১৯২৩
মুক্তিবাণী	অমরেশ কাঞ্জিলাল ১৯২৩
জাতীয় সংগীত	অক্ষয়কুমার রায় ১৯৩৮
স্বদেশী কবিতা	প্রভাত বসু ১৯৪০
মুক্তির গান	সতীশচন্দ্র সামন্ত ১৯৪০
জাতীয় শিল্পী পরিষদ	অরুণ সরকার ১৯৪২
অভ্যুদয়	কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ ১৯৪৬
স্বদেশ সংগীত	মুরারি দে ১৯৪৯
মাতৃমন্ত্র	কালীচরণ ঘোষ ১৯৬৩

বলা বাহুল্য এই তালিকা অসম্পূর্ণ। এই তালিকার মধ্যে দুই ধরনের সংকলন আছে ব্যক্তিগত গীতসংগ্রহ এবং সংকলন। (ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতেও কয়েকটি স্বদেশী গানের সংকলন আছে, কিন্তু সেগুলির বিস্তৃত পরিচয় নেওয়া সম্ভব হয়নি)। এছাড়াও জাতীয় সংগীতসংকলনগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আমাদের সংযোজিত নিম্নোক্ত তালিকা—

ভারতগান	রাজকৃষ্ণ রায় ১৮৭৯
জাতীয় উচ্ছ্বাস	জলধর সেন ১৮৭৯
স্বদেশী পল্লীসংগীত	রজনীকান্ত পণ্ডিত ১৯০৫

মাতৃপুজা	এইচ, বসু ১৯০৬
হুংকার	হীরালাল সেনগুপ্ত ১৯০৯
বন্দনা	নলিনীরঞ্জন সরকার ১৯০৯
গান	বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি, বরিশাল ১৯২০
মাতৃমন্ত্র	.৯২০
মায়ের বোধন	১৯২০
মায়ের বাণী	১৯২০
স্বদেশ গীতি	হরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ১৯২০
আমার বই	১৯২০
অর্ঘ্য	অরুণচন্দ্র গুহ ১৯২১
স্বদেশগাথা	অবিনাশ সরকাব ১৯২১
অঞ্জলি	চিন্তাহরণ চট্টোপাধ্যায় ১৯২১
স্বরাজ সংগীত	১৯২১
স্বরাজ সংগীত	বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯২১
স্বরাজ সংগীত ১ম	১৯২১ ঢাকা
দেশের গান	অক্ষয়শংকর দাশগুপ্ত ১৯২১
আনন্দলহরী	হরেন্দ্রকুমার দাস ১৯২২
জাতীয় সংগীত	১৯২২
স্বদেশী গান	অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য ১৯২২
পূজার মন্ত্র	যতীন্দ্রনাথ নিয়োগী ১৯২৩
দেশের গীত	বিপিনচন্দ্র সরকার ১৯২৩
স্বরাজচিন্তা	কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় ১৯২৫
সাধনসংগীত	দুর্গামোহন সেন ১৯২৫
ভারতের স্বদেশী গান	কমল রায়চৌধুরী ১৯৫২
ফ্যাসিস্টবিরোধী জাতীয় সংগীত	হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
রুদ্রবীণা	প্রতিমা বসু ও সাধনা বসু

মাত্র অর্ধ শতকের কিছু বেশি সময়ে অর্ধশতকের বেশি এই দেশপ্রীতিমূলক কাব্যগীতের সংকলন বাস্তবিকই বিস্ময়কর, জাতীয় আন্দোলনে সংগীতের দুর্নিবার প্রভাবের পরিচায়ক।

৩

পূর্বেই বলা হয়েছে আমাদের স্বদেশী গানের গীতসংকলনগুলি সাহিত্যিক উদ্দেশ্যে সংকলিত হয়নি। তাই সংকলনের কোনো ঐতিহাসিক সূত্র বা নির্বাচন পদ্ধতি, ভূমিকা বা উপলক্ষ থেকে সেকালের জাতীয় আন্দোলনের কোনো রেখাচিত্র পুরোপুরি পাওয়া যায় না। উপেন্দ্রনাথ দাস তাঁর 'জাতীয় সংগীত' নামক সংকলনের (প্রথম প্রকাশ ৩০ আশ্বিন ১৩১৩, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০ ফাল্গুন ১৩১৪) ভূমিকায় লিখেছিলেন—

"...অতীতের আঁধার গহ্বরে মাতৃপূজার যে মহামন্ত্রধ্বনি নিবদ্ধ ছিল, মাতৃবন্দনার যে প্রাণোন্মাদিনী সংগীতধারা সঞ্চিত ছিল, আজ সুপ্তি-স্তনীরব প্রথম প্রভাতে সেই মন্ত্রধ্বনি দীপ্ত গগনে গম্ভীর হুংকারে বাজিয়া দিগদিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।"

অরুণচন্দ্র গুহ প্রকাশিত 'অর্ঘ্য' (প্রকাশক সরস্বতী লাইব্রেরি, ২য় সং ১৩২৮) বা 'স্বরাজ্য সংগীত' গ্রন্থের সূচনায় আছে রবীন্দ্রনাথের কয়েকচরণ কবিতা, 'বাঙলার মাটি বাঙলার জল' গানটি এবং নিম্নবর্তী অনুচ্ছেদ—

"মনে রাখিতে হইবে আজ স্বদেশের স্বদেশীয়তা আমাদের কাছে যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে ইহা রাজার কোনো প্রসাদ বা অপ্রসাদে নির্ভর করে না, কোন আইন পাশ হউক বা না হউক, বিলাতের লোক আমাদের করুণোক্তিতে কর্ণপাত করুক বা না করুক, আমার স্বদেশ আমার চিরন্তন স্বদেশ, আমার পিতৃ-পিতামহের স্বদেশ, আমাব সন্তানসন্ততির স্বদেশ, আমার প্রাণদাতা শক্তিদাতা সম্পদদাতা স্বদেশ। কোন মিথ্যা আশ্বাসে ভুলিও না, কাহারও মুখের কথায় ইহাকে বিকাইতে পারিবে না; একবার যে হস্তে ইহার স্পর্শ উপলব্ধি কবিয়াছি সে হস্তকে ভিক্ষাপাত্র বহনে আর নিযুক্ত করিব না, সে হস্ত মাতৃসেবার জন্য সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করিলাম। আজ আমরা প্রস্তুত হইয়াছি—যে পথ কণ্টক-সঙ্কুল সেই পথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। আজ যাত্রারম্ভে এখনও মেঘেব গর্জন শোনা যায় নাই বলিয়া সমস্তটাকে যেন খেলা বলিয়া মনে না করি। যদি বিদ্যুত চকিত হইতে থাকে, বজ্র ধ্বনিত হইয়া উঠে, তবে তোমরা ফিরিয়ো না, ফিরিয়ো না; দুর্যোগের রক্তচক্ষুকে ভয় করিয়া তোমাদের পৌরুষকে জগৎসমক্ষে অপমানিত করিয়ো না। বাধার সম্ভাবনা জানিয়াই চলিতে হইবে, দুঃখকে স্বীকার করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে, অতি বিবেচকের ভীত পরামর্শে নিজেকে দুর্বল করিয়ো না। যখন বিধাতার ঝড় আসে বন্যা আসে, তখন সংহত বেশে আসে না, কিন্তু প্রয়োজন বলিয়াই আসে, তাহা ভালোমন্দ লাভক্ষতি দুইই

লইয়া আসে। যখন বৃহৎ উদ্যোগে সমস্ত দেশের চিত্ত বহুকাল নিরুদ্যমের পর প্রথম প্রবৃত্ত হয়, তখন সে নিতান্ত শান্তভাবে বিজ্ঞভাবে, বিবেচকভাবে বিনীতভাবে প্রবৃত্ত হয় না। শক্তির প্রথম জাগরণে মত্ততা থাকেই—তাহার বেগ তাহার দুঃখ তাহার ক্ষতি আমাদের সকলকেই সহ্য করিতে হইবে—সেই সমুদ্রমন্থনের বিষ ও অমৃত উভয়কেই আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।"

বলাবাহুল্য এ ভূমিকা সংগীতের নয়, দেশপ্রেমেরই। এছাড়া অনেকগুলি ব্যক্তিগত বা সামগ্রিক সংকলনে ব্যক্তিগত কয়েকটি ভূমিকা আছে। 'রাখী-সংগীত' গ্রন্থের ভূমিকায় প্রকাশক লিখেছিলেন—[১২]

"১৩১২ সালের বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদকালীন বঙ্গবাসী, ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কৃপালাভে বঞ্চিত হইলে যে গভীর মর্মবেদনায় কাতর হইয়াছিলেন, এবং সমগ্র ভারতবর্ষ বিপন্ন শোকসন্তপ্ত বঙ্গভ্রাতাগণের কাতর মর্মবেদনায় অভিভূত হইয়া সমবেদনা প্রকাশ করেছিলেন, এবং ৩০শে আশ্বিন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদনে শোকপরিচ্ছদ ধারণ করিয়া হিন্দু মুসলমান জৈন খ্রীস্টান ভ্রাতাগন পরস্পরের হস্তে ভ্রাতৃসম্মিলনসূচক রাখীবন্ধন করিয়া সমগ্র বঙ্গভূমিতে যে সকল জাতীয় সংগীত করিয়াছিলেন, তাহা স্বদেশভক্ত ভ্রাতৃগণের নিত্য আলোচনা করিবার নিমিত্ত এই স্মরণীয় গীতাবলী সংগ্রহ করিয়া মুদ্রাঙ্কন করিলাম। এবং এই পুস্তিকার মূল্যের স্বরূপ যে এক আনা লওয়া হইবে, তাহা অবৈতনিক সারস্বত বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হইবে।"

খ্যাতনামা সমালোচক ও পত্রপত্রিকার লেখক সখারাম গণেশ দেউস্কর[১৩] যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংকলিত 'বন্দে মাতরমে'র একটি মনোজ্ঞ ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। এই ভূমিকায় দেউস্কর ভারতবর্ষের জাতীয়তাস্ফুরণের পটভূমি বিশ্লেষণ করে প্রাচীন ভারতে, বিশেষত মুসলমান শাসনে আমাদের স্বদেশ-চিন্তা-উদ্দীপনের অভাবের হেতু ও বর্তমান রাজনৈতিক বিক্ষোভের কারণগুলি নির্দেশ করেছেন। তিনি লিখেছিলেন—

"আজকাল পাশ্চাত্য দেশে পেট্রিয়টিজম্ বলিলে যাহা বুঝায় আমাদের দেশে তাহা পূর্বে কখনও ছিল না। কারণ বর্তমান কালের পেট্রিয়টিজমের বা স্বদেশ-প্রীতির প্রয়োজন সেকালে ছিল না।... ইংরাজের আমলে আমাদের অন্য উন্নতি যতই হউক, ভারতবর্ষের উপর আমাদের যে জন্মস্বত্ব ছিল তাহা আমরা ক্রমেই হারাইতেছি। এখন দেশবাসীর পক্ষে দেশের উচ্চপদ লাভের পথ সংকুচিত হইতেছে, দেশের ধনধান্য পরে ভোগ করিতেছে, শিল্পী আর শিল্পকৌশল প্রকাশের অবকাশ পাইতেছে না, প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ প্রতিভাবিকাশের

উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইতেছেন না, বলবানের বল প্রকাশের সুযোগ লোপ পাইয়াছে, কৃষকের বহুযত্নে উৎপাদিত শস্য বিদেশীর উদরজ্বালা নিবারণ করিতেছে, দেশ দিন দিন নিরন্ন ও নির্ধন হইয়া উঠিতেছে ; এক কথায় আমরা 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হইয়াছি। এইরূপ চারিদিক হইতে স্বদেশকে হারাইতে বসিয়া আমাদের এখন স্বদেশের প্রতি একটা টান জন্মিয়াছে। আমরা হৃদয়ে স্বদেশের প্রতি প্রীতি অনুভব করিতেছি।.....

সংগীতের শক্তি অসীম। গানাৎ পরতরং নহি। সংগীতে মানবের চিত্তবৃত্তিনিচয় একতান হয় ও অসীম শক্তি লাভ করে। সংগীতের মোহিনী-শক্তি তড়িৎপ্রবাহের ন্যায় মুমূর্ষু সমাজশরীরে নবপ্রাণের সঞ্চার করে। জাতীয় সংগীত ভিন্ন জাতীয় চিত্তের অবসাদ দূরীভূত হয় না, জাতীয়ভাব যথোচিত বলবেগ লাভ করে না।..."

৪

নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ভারতীয় সংগীত মুক্তাবলী'তে 'জাতীয় সংগীত' অধ্যায়ে দেশাত্মবোধক সংগীতরচয়িতা হিসাবে এমন কয়েকটি নাম পাওয়া যায়, পরবর্তী সংকলনে যেগুলি অনুপস্থিত। এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ ১৩০০ [১৮৯৩] সালে প্রকাশিত হয়, সুতরাং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বেই হিন্দুমেলা, ভারতীয় জাতীয় মহাসভাস্থাপন, ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা, আনন্দমঠ-প্রকাশ প্রভৃতি ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে স্বদেশপ্রেমের যে উদ্দীপ্ত চেতনা সঞ্চারিত হয়েছিল, সেই পটভূমিতেই এই গানগুলি রচিত। এই গ্রন্থে অবিনাশচন্দ্র মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত, আনন্দচন্দ্র মিত্র, উপেন্দ্রনাথ দাস, কামিনী রায়, কালীচরণ ঘোষ, কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কেদারনাথ ঘোষ, গণেন্দ্রনাথ, গোবিন্দচন্দ্র দাস, গোবিন্দচন্দ্র রায়, দীননাথ ধর, দীনেশচরণ বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, রবীন্দ্রনাথ, রাজকৃষ্ণ রায়, রাধানাথ মিত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু, ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কবিদের এবং কয়েকটি অজ্ঞাত রচয়িতার গান আছে। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জাতীয় সংগীত' ব্যতীত দেশাত্মবোধক গানের এত প্রাচীন সংকলন আর চোখে পড়ে না। এই গ্রন্থের জাতীয় সংগীতগুলিকে 'উদ্দীপনা' ও 'শোচনা' দুই পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। এই ধরনের

বিষয়বিভাগও প্রাচীন অন্য কোনো সংকলনে দেশাত্মবোধক সংগীতের ক্ষেত্রে দেখা যায় না।[১৪]

'ভারতীয় সংগীত মুক্তাবলীর' অনেকগুলি গানেই ভারতজননীর একটি রোরুদ্যমানা অশ্রুবিবশ মূর্তি এঁকেছেন একাধিক কবি। অনেকগুলি স্বদেশ-ভাবাতুর কাব্যসংগীতে সমকালীন ঘটনার স্মৃতি নিহিত আছে। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় 'জাতীয় মহাসমিতি'র অধিবেশন উপলক্ষে সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু যে কীর্তনটি রচনা করেছিলেন, ইতিহাসের দিক থেকে তার মূল্য আছে—

কে আছিস দেখসে এসে কেমন শোভা হয়েছে
আজ দেশবিদেশের সবাই এসে আলো করে বসেছে।
কারো নাইক জাতিকুলের অভিমান
ওরে কোল দিয়েছে হিন্দু মুসলমান।
একটি গানে একটি তানে সবাই বীণা সেধেছে,
আজ ভারতবাসী মায়ের নামে মহাযজ্ঞে মেতেছে।...

অজ্ঞাতনামা আর একজন কবি 'ভারতসভার' উৎসব উপলক্ষে কীর্তনের সুরে গেয়েছিলেন -

আয় আয় ভাই আয়রে সবে
কোটি প্রাণ খুলে কোটি তান তুলে
কাঁপায়ে গগন কাঁপায়ে ভুবন
জয় জন্মভূমি জয় জয় রবে।...

দিল্লি দরবার উপলক্ষে দীননাথ ধর লিখেছিলেন 'আজি কিসের এদিন? করহ চিন্তন ভারতসন্ততিগণ।' কালীচরণ ঘোষ ঐ একই উপলক্ষে লিখেছেন, 'কেন গো আনন্দে আজি সকলে মেতেছে।' ১২৮৬ সালের মুদ্রাশাসন আইন সম্পর্কে 'ছিল গো ভারত তব একই অধিকার' গানটি রচনা করেছিলেন শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়। অশ্বিনীকুমার দত্ত নব্যবঙ্গের কদাচার বিষয়ে গান রচনা করেছিলেন, 'ওরে ভাই কিসের লেগে দিনে দিনে এমন হলে।'

'সংগীত মুক্তাবলী'তে দ্বিজেন্দ্রলালের অনেকগুলি স্বদেশীগান আছে যেগুলি পরবর্তী কালে প্রায় অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। যথা—

জয়জয়ন্তী একতাল

মনোমোহন মুরতি আজি মা তোমার
মলিন হেরিতে মাগো পারি না যে আর।...

সিন্ধুভৈরবী একতালা

কাঁদরে কাঁদরে আর্য কাঁদ অবিরল
শুকাবে জীবননদী শুকাবে না আঁখিজল।...

কেন ভাগীরথী হাসিয়ে হাসিয়ে
নাচিয়ে নাচিয়ে চলিয়ে যাওগো।...

৫

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত গীতসংকলনগুলিতে আমাদের তৎকালীন স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় উদ্দীপনার শোণিতকম্পনের ইতিহাস আজও নিহিত রয়েছে। এই সময়কার দেশব্যাপ্ত উত্তেজনার মূলে সংগীতের অবদান ছিল সর্বাধিক। সেই সংগীতের মধ্যবর্তী প্রেরণা ছিল রবীন্দ্রনাথের গান, তাছাড়া দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদ বাঙলার দুই শ্রেষ্ঠ সংগীতরচয়িতার গানগুলিও এই সময়েই সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সংগীত যেমন বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনকে গতিদান করেছিল, তেমনি এই আন্দোলনও বাঙলার কাব্যসংগীতকে দিল অসীম উদ্দীপনা, দীর্ঘস্থায়ী জনপ্রিয়তা, বৃহৎ বঙ্গব্যাপ্ত প্রচার ও বঙ্গভাষীমাত্রের মনে সংগীতের প্রতি অপার আগ্রহ। বাঙলা কাব্যগীতের রীতিনীতি গতিপ্রকৃতি অঙ্গসৌষ্ঠব অনিবার্যভাবে উন্নত ও পরিশীলিত, বিপ্লবের স্পর্শে সজীব ও সম্পন্ন হয়ে উঠল। বিশেষ করে লোকগীতের স্বরপ্রেরণা এবং রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য সংগীতের সর্বাত্মক প্রেরণাও সাধারণভাবে এই সময়কার বাঙলা কাব্যগীতগুলিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

বঙ্গবিভাগঘটিত উদ্‌যোগ ও বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে বাঙলাদেশে ছোট বড় অনেকগুলি গীতসংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল, তার কয়েকটি নাম উল্লিখিত হয়েছে। এইগুলির মধ্যে জলধর সেনের 'জাতীয় উচ্ছ্বাস' সুসম্পাদিত এবং পরিচ্ছন্ন সংকলন। এতে একশতটি তৎকালীন জনপ্রিয় গান আছে—কয়েকটি অজ্ঞাতরচয়িতার ও কয়েকটি অধুনা-দুষ্প্রাপ্য। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত অধিকাংশ সংকলনের একটি সাধারণ লক্ষণ হল, রবীন্দ্রনাথের গীতপ্রাধান্য এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' এই গীতমন্ত্রের দ্বারা গ্রন্থসূচনা। জলধর সেনের সংকলনেও রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই প্রাধান্য লাভ করেছেন, তারপর অন্যান্য জনপ্রিয় গানের রচয়িতারা স্থান পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের গানগুলির শিরোদেশে বিষয়নামও উল্লিখিত। যেমন 'বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি', 'মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি'

যথাক্রমে 'দ্বিধা' ও 'মাতৃগৃহ' শব্দের দ্বারা চিহ্নিত। এই গ্রন্থে মধুসূদনের 'রেখো মা দাসেরে মনে' স্বরসহ উল্লিখিত আছে (পূরবী একতালা)। সম্ভবত এই যুগেই কবিতাটির কবোষ্ণ স্বদেশানুরক্তি কোনো উৎসাহী সুরকারকে কবিতাটির গীতরূপায়ণের জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের[১৫] দুটি গানও জলধর সেন সংগ্রহ করেছেন। যেমন—

মাবোঝা ঢিমে তেতালা

নয়ন জলে গেঁথে মালা পরাব দুখিনী মায়
ভক্তিকমল-কলি দিব মায়ের রাঙা পায়।
শিখ হৃদি উচ্চশিক্ষা মাতৃমন্ত্রে লহ দীক্ষা
ত্যজ স্বার্থ মাগি ভিক্ষা রই জননী সেবায়।

দেশমাতৃকা ও শক্তিকালিকা ইতিপূর্বে অনেক সাধকের কাছে একাকার হয়ে গেছে, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। গিরিশচন্দ্রের গানে তারই সার্থক প্রতিচ্ছবি—

মালকোষ ঝাঁপতাল

জাগো শ্যামা জন্মদে
প্রসীদ প্রসন্নময়ি বর দে মা বরদে।
তনয়ে হৃদয়ে ধরি উঠ মা শোক পাশরি
শুভ দে গো শুভংকরী মাগি পদ-কোকনদে।
পোহাল যামিনী ঘোরা উঠ গো জননী ত্বরা
হেরি মুখ দুখহরা ভাসিব আনন্দহ্রদে॥

জলধর সেনের 'জাতীয় উচ্ছ্বাস' গ্রন্থে অজ্ঞাত কবির কয়েকটি গান আছে, যেগুলি সমকালে পরিচিত ছিল, কিন্তু উত্তেজিত লোকপ্রিয়তায় তাদের রচয়িতা-পরিচয় হারিয়ে গেছে। অন্যান্য গানের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রীর দুটি রচনা উল্লেখযোগ্য—

গভীর রজনী ডুবেছে ধরণী জাগরে জাগরে সাধের লেখনী
প্রাণপ্রিয় ভাই ভারতসন্তান জাগরে সকলে শোন করি গান।
ভারতের গতি ভারতনিয়তি ভেবে আজ কেন উথলিল প্রাণ
কার কথা ভাবি কোন দিক দেখি সব অন্ধকার যে দিক নিরখি
কোটি কোটি লোক অজ্ঞান-আঁধারে চিরমগ্ন যেন আছে কারাগারে
দারিদ্র্য ভাবনা অসহ্য যাতনা শোণিত শুষিছে তাদের সংসারে,
নির্বাক হইয়া কাঁদে পরস্পরে ইত্যাদি

রজনীর অন্ধকারে দুখিনী ভারতজননীর এই বিলাপদশা শিবনাথ শাস্ত্রীরই লেখা 'আজি শচীমাতা কেন চমকিলে' বিখ্যাত এই গানের কথা মনে করিয়ে দেয়। ললিত রাগে আড়াতালে রচিত আর একটি গানেও কবি রজনীর রূপকে ভারতজননীর বিলাপিত রূপটি দেখেছেন—

কালরাত্রি পোহাইল উদিল সুখতপন
আর কি ভারতযুবা রবে ঘুমে অচেতন
দুখশোক যার ঘরে সে কি গো ঘুমাতে পারে,
আর কি উচিত কভু থাকে ঘুমে অচেতন ;
অধীনতা-কারাগারে অজ্ঞানতা-অন্ধকারে
কোটি কোটি নারীনরে উঠে কর দরশন ॥

বঙ্গভঙ্গ ঘটনাকে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ দেশবরেণ্য স্বদেশপ্রেমিক জাতীয় নেতৃবৃন্দ সেদিন যে রাখীবন্ধন উৎসব প্রবর্তন করেছিলেন, মিলন-সৌভ্রাত্রজনক সেই ঘটনাটি বাঙলা স্বদেশী সংগীতে বিপুল প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। রবীন্দ্রনাথই সেই উৎসবের মণিবন্ধে পরিয়েছিলেন তাঁর অনুপম সংগীতের বাঙা রাখী—

বাঙলার মাটি বাঙলার জল
বাঙলার বায়ু বাঙলার ফল…

এই সংগীত কেবল সাময়িকতার প্রকোষ্ঠে বন্দী হয়ে থাকেনি, বাঙলার শাশ্বত মহিমা চিরন্তন গৌরবে ভূষিত হয়েছে এই গানের গভীর প্রীতিমন্ত্রে। এই রাখীসংগীতকে অভিনন্দন জানিয়ে হেমচন্দ্র লিখেছিলেন—

জীবন সার্থক আজিরে আমার
এ রাখীবন্ধন ভারত মাঝার
দেখিনু নয়নে—দেখিনু রে আজ
অভেদ ভারত চিরমনোরথ
পুরাবার তরে চলিল।

(দ্রঃ মাতৃমন্ত্র কালীচরণ ঘোষ ১৯৬২)

রাখীবন্ধন উৎসব উপলক্ষে রচিত একটি গানের সংকলনের নাম 'রাখী-সংগীত', '৩০শে আশ্বিন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদকালীন গীত' গানের এই সংকলনটি কলকাতার নব্যভারত সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত হয় (এই গ্রন্থে প্রকাশকের ভূমিকার উল্লেখ পূর্বে দ্রষ্টব্য)। এটি ৩৫ পৃষ্ঠার গ্রন্থ, তার মধ্যে অধিকাংশ গানই সমকালীন অন্যান্য চয়নিকায় প্রাপ্তব্য, কয়েকটি গান অবশ্য অন্যত্র অপ্রাপ্য

এবং অধিকাংশ গানেই গীতকারের নাম নেই। অবশ্য এর প্রকাশক নব্যভারত সমিতিকর্তৃক গেয় গানগুলির রচনাকারের নাম আছে। 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' গানটির শিরোদেশে লিখিত আছে 'বঙ্গীয় বালকসমিতি' এবং অন্তে কার্যাধ্যক্ষ শ্রীজগৎমোহন রায়চৌধুরী এই নামটি কেন আছে অনুমান করা দুঃসাধ্য। অপরিচিত গানগুলির ভাষা ছন্দ দুর্বল। সাময়িকতার উত্তেজনা ব্যতীত সেগুলির অন্য কোনো মূল্য নেই। যেমন 'কালীঘাট আর্যভাণ্ডার হইতে প্রকাশিত' একটি গীত—

উদিল সুখপ্রভাত আজি বঙ্গের গগনে
জাগো জাগো জনে জনে লভিয়া নব জীবনে।
ভুলি স্বার্থভেদজ্ঞান এসো হিন্দু মুসলমান
করহ প্রতিষ্ঠা প্রাণ মাতদেহে সযতনে।...

শ্যামবাজার ভারতসন্তান সমিতির জন্য গান রচনা করেছিলেন প্রসিদ্ধ নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—

মিছে মায়াভ্রমে ভুলো না
তব সঙ্গে শকতি চলে
তোমারে ধরে আদর করে, বলে নাহিরে তব তুলনা
ঘুমের ঘোরে ছিলে এতদিন দেখেছ আপনে দীনহীন,
যদি এলে নবজীবনে, আর তারে চরণে ঠেলো না॥

রবীন্দ্রনাথ সরলা দেবী রজনীকান্ত প্রমুখ কবিদের খ্যাতবাক্ রচনা ব্যতীত এই গ্রন্থের কবিনামহীন গীতগুলি অবশ্য সবই রাখীসংগীত নয়—'বন্দে মাতৃভূমি', 'তোরা আয়রে তোরা আয়রে', 'বন্দে মাতরম্ বলি গাও', 'শরণ্যে শ্রীপদে এ ঘোর বিপদে', 'হের আর্যভাষী ত্যজিয়ে তামসী', 'হায় কি দুর্দিন আজিকার দিন পড়িল অশনি বঙ্গের মাথায়', 'আপন মায়েরে চিনেছি এবার', 'হিন্দু মুসলমান হয়ে একপ্রাণ', 'রামরহিম সবই একাকার', 'ওরা জোর করে দেয় দিক না বঙ্গ বলিদান', 'এস মা ভারতমাতা হও বঙ্গে অধিষ্ঠান', 'চলরে চল সবে ভারতসন্তান', 'দীন অনাথ ডাকে দয়া কর মা জননী', 'আজ মিলেছে মায়ের নামে', 'আজি কি নূতন হেরি সমগ্র ভারত নিয়ে', 'এস সবে মিলে মোরা বঙ্গমাতার সেবক হই', 'ওই তামসী নিশি ঘেরিল রে' (রচয়িতা ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), 'জেগেছে কি জগন্মাতা ঘুম হতে এতদিনে', 'লভেছি জনম কোন মহাকালে', 'চল সবে চল ভাই কাঁদিতে কাঁদিতে যাই' (রচনাকার রণেন্দ্রনাথ) ইত্যাদি। যোগীন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত 'বন্দেমাতরম্'[১৬] সংকলনেও কয়েকটি রাখীসংগীত আছে।[১৭]

এই পর্বে সংকলিত আর একটি গ্রন্থ শ্রীনরেন্দ্রকুমার শীল কর্তৃক সংগৃহীত 'স্বদেশী সংগীত' ১৩১৪ সালে প্রকাশিত হয়। সংকলন উচ্চাঙ্গের নয় কিন্তু গানের সংখ্যা যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ খ্যাতনাম কবিদের পরিচিত গানগুলি ছাড়া এই গ্রন্থে প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ('শুভদিনে শুভক্ষণে গাহ আজি জয়', 'নম বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনী যুগে যুগে জননী লোকপালিনী', 'তুই মা মোদের জগত আলো'), বিজয়চন্দ্র মজুমদার ('জাগো জাগো ভারতমাতা', 'যাব না আর যাব না ভিক্ষা নিতে পরের দ্বারে'), কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ('এই দ্বারদেশে এসেছে ভিখারি কহ কৃপা করি কী দিবে তাহারে', 'চলেছে জাহ্নবী সাগরসন্ধানে', 'সেই ত রয়েছে মা তুমি', 'নবীন এ অনুরাগ রাখ রাখ মনে রাখ', 'এস দেশের অভাব ঘুচাও দেশে'), গিরিজাকুমার বসু ('ঘুচাতে তোমার দৈন্য আজি মা সন্তান তব জেগেছে'), রমণীমোহন ঘোষ ('সকরুণ মায়ের আহ্বান'), সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ('ওঠরে ওঠরে তোরা হিন্দুমুসলমান সকলে ভাই'), রাজকৃষ্ণ রায় ('মন বসে না দেশের হিতে'), সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু ('কে আছিস দেখসে এসে কেমন শোভা হয়েছে'), চারুচন্দ্র রায় ('আজ সোনার বাঙলায় সোনার সাজ কে আনিল রে'), অমৃতলাল বসু ('ওরা জোর করে দেয় দিক না বঙ্গ বলিদান'), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ('স্বদেশ আমার নাহি করি দরশন তোমাসম বঙ্গভূমি নয়নরঞ্জন'), রাজা মহিমারঞ্জন রায় ('বৃথায় জনম আমার অন্ন নাই খেতে ঘরে'—প্রত্যক্ষত স্বদেশী গান নয়), সুরেশ-চন্দ্র দাশগুপ্ত ('দ্বিতীয় শুভক্ষণে স্নেহপরিপূর্ণ মনে ললাটেতে ফোঁটা তব দিনু আজি ভাই'), বিনোদবিহারী রায় ('ঘুমাইয়া কেহ থেক না থেক না'), সতীশচন্দ্র রায় ('এই বেলা ভাই চিনে নাও আপন'), চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ঘর ছেড়ে আর যাসনে কোথাও ভাই'), প্রমুখ খ্যাত-অখ্যাত কবিদের অনেকগুলি গান আছে। অশ্বিনীকুমার দত্তের কয়েকটি গানও ('ওরে ভাই কিসের লেগে দিনে দিনে এমন হলে', 'আয়রে আয়রে ভারতবাসী আয় সবে মিলে প্রণমি ভারত-মাতার চরণ-কমলে'), এতে পাওয়া যায়। হিন্দুমেলার নামহীন দুএকটি গান 'আসি ভারতভূমে একবার দেখে যাও আর্যগণ', 'প্রাণ কাঁদে বলিতে ভারতের বিবরণ', বেলেঘাটা দরিদ্রভাণ্ডারের নামে চিহ্নিত একটি গান 'আয় রে বঙ্গবাসী মিলি সকলে', কলিকাতা ছাত্রসমাজের গান 'হে বঙ্গজননী স্বর্ণপ্রসবিনী আর মাগো তুমি কেঁদ না' রচনার দিক থেকে সাধারণ হলেও ঐতিহাসিক দিক থেকে উল্লেখযোগ্য।

৬

উপেন্দ্রনাথ দাস সংকলিত 'জাতীয় সংগীতে' সমকালীন এবং বিশেষভাবে পূর্ববর্তী যুগের প্রায় শতাধিক কাব্যসংগীত হয়েছে। তার মধ্যে আবার দুটি ইংরাজি ভাষায় রচিত—একটি ফরাসি দেশের আর একটি মার্কিন দেশের জাতীয় কাব্যগীত। জাতীয় সংগীতের মৌল প্রেরণা ছিল স্বাজাত্যবোধ ও দেশপ্রেম, ভারতভূমির বন্ধনমোচনের সংকল্প ও স্বরাজব্রত। সেই কারণেই পরাধীন দেশের দেশাত্মবোধক কর্মপ্রয়াস ও শিল্প সাহিত্য সংগীত মুখ্যত সচেতন-ভাবে ইংরাজবিরোধী আন্দোলনেই পর্যবসিত হয়েছিল। অথচ নীতির দিক থেকে ইংরাজ রাষ্ট্রশক্তি বাঙালির বিরোধী পক্ষ হলেও ইংরাজের দেশভক্তির উপর উনিশ শতকের দেশবাসীর বিদ্রূপ ছিল না।[১৮] তাই ভারতীয় স্বদেশপ্রেম কেবল ইংরাজি সাহিত্যই নয়, প্রতীচ্য সংগীত থেকেও প্রেরণা সংগ্রহ করেছে। ইংরাজি সাহিত্যের বিখ্যাত বহু কবিতা যেমন করে জনপ্রিয় সংগীতে পরিণত হয়েছিল, তেমনি করেই বাঙলা স্বদেশপ্রেমের কবিতার উপর সুরারোপ করে তাদের গান করে তোলার চেষ্টা দেখা যায়। শেলীর দুটি বিখ্যাত কবিতা স্বরযোজনায় জনপ্রিয় সংগীতে পরিণত হয়েছিল[১৯]—

Rise like lions after slumber
In unvanquishable number,
Shake your chains to earth like dew
Which in sleep had fallen on you,
Ye are many, they are few.

(The True Freedom, From The Masque of Anarchy)

The seed ye sow, another reaps ;
The wealth ye find, another keeps ;
The robes ye weave, another wears ;
The arms ye forge, another bears.
Sow seed, but let no tyrant reap ;
Find wealth—let no imposter heap ;
Weave robes, let not the idle wear ;
Forge arms—in your defence to bear.

(To the Men of England.)

য়ুরোপের প্রতিটি ভাষায় দেশের স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপকারী বৈদেশিক শক্তি ও শত্রুর বিরুদ্ধে যুগে যুগে গর্জে-ওঠা কবিকণ্ঠ ভাষায় সুরে উদ্দীপনায় কাব্যসংহতি লাভ করেছে। সেই তুলনায় এ দেশে স্বাধীনতা-আন্দোলনের

উদ্‌যোগ-আয়োজন য়ুরোপের বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে ঘন ঘন যুদ্ধঘোষণা হয়ে ওঠেনি। আমাদের গানে তাই স্বাধীনতা অপহৃত হওয়ার বেদনা, ক্লিন্ন নৈরাশ্য, আর পশ্চিমের গানে স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার শতকায় সমবেত প্রতিরোধ গর্জন। আমাদের গানে পরাধীনতার ম্লান মেঘচ্ছায়ে দেশমাতৃকার বিষণ্ণ মূর্তি, সে দেশের গানে অশৃঙ্খলিতা জননীর গরীয়সী মূর্তি। আমাদের কাব্যগীতি একান্তই কাব্যগীতি, পেলব সৌন্দর্যে এলায়িত, সর্বদা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সমরসংগীত নয়। তাই আমাদের স্বাধীনতাকামনার কাব্যসংগীত আর য়ুরোপ-আমেরিকার যুদ্ধসংগীত এক পংক্তিভুক্ত হতে পারে না। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের উদ্দীপনার কবি মুকুন্দদাস বা নজরুলের সঙ্গে তাই ইংরাজি সমরসংগীত-রচয়িতা Ebenzer Elliot কিংবা Robert Nicoll-এর সাদৃশ্য নেই। বাঙলাদেশের স্বদেশী গানে পরাধীনতার গ্লানি একদিক দিয়ে স্বদেশভূমির সৌন্দর্য-মাধুর্য-মাহাত্ম্যে ঢাকা পড়েছে। বিদেশী দেশপ্রেমের সংগীত প্রত্যক্ষ সংগ্রামের হাতিয়ার নিয়ে রক্তের আমন্ত্রণ—

> Base oppressors, leave your slumbers,
> Listen to a nation's cry.
> (J. A. Leatherland. 1812)
>
> Day like our souls, is fiercely dark ;
> What then ? 'Tis day !
> We sleep no more ; the cock crows hark
> To arms ! away !
> (Ebenzer Elliot. 1781—1849)

এর তুলনায় বাঙলা গানে মাধুর্যের ভাগই অধিক, বলিষ্ঠতার ঐতিহ্য সেখানে কম। নজরুলের 'কারার ঐ লৌহকপাট' জাতীয় গান শতাব্দীতে কদাচিৎ রচিত হয়।

এই সূত্রে দু একটি বিদেশী জাতীয় সংগীতের উল্লেখ করা যেতে পারে। ফ্রান্সের জাতীয় সংগীত 'লা মার্সেই' বিশ্ববিখ্যাত গান। ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দের ২৪ এপ্রিল দেড় হাজার লোক এই গান গেয়ে মার্সেই থেকে প্যারিসের দিকে এসেছিল। রগেট দ্য লিলে তার মাত্র বছর তিন আগে এই উদ্দীপনাময়ী গানটি রচনা করেছিলেন—

> Rise up ye children of our fatherland
> Days of glories now behold,
> See the blood-stained flag of oppression

Yet again the tyrants uphold.
Do you not see like raging water
Fierce soldiers are gathering round ?
They come to seize like ruthless hounds
And to slay your sons and daughters.
To arms Comrades !
Forward citizens !
March on March on
Till their vile blood be flowing over the land.

এই ধরনের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রেরণা অবশ্য কোনোদিনই বাঙলাদেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে ঘটেনি। এমন কি ১৮৭১ সালে কবি পটিয়ের রচিত এবং প্যারিসে ফ্রেঞ্চ কমিউনে প্রথমে গীত ও পরে 'কমিউনিস্ট ইণ্টার্ন্যাশনাল' বা 'আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের গান' নামে পরিচিত এই গানটির সঙ্গেও কোনো বাঙলা গানের তুলনা হয় না—

Arise prisoners of starvation
Arise ye wretched of the earth,
For justice thunders condemnation
And a new worl l is in the birth.
Then away with all your superstition,
Servile masses arise arise,
We'll change forthwith old conditions
And spurn the dust to win the prize.
Then comrades come rally
And last fight let us face,
The Internationale
Unites the human race.

স্মরণযোগ্য যে 'জাগো অনশনবন্দী' নামে নজরুল এই গানের বঙ্গানুবাদ রচনা করেছিলেন।

৭

হিন্দুমেলার সময় থেকেই কাব্যে-সংগীতে-নাটকে ভারতজননীর একটি কল্পমূর্তি বর্ণাঢ্য হয়ে উঠেছিল। বন্দে মাতরম্ সংগীতে বঙ্কিমচন্দ্র যে মাতৃমূর্তি রচনা করেছিলেন, আমাদের পৌরাণিক দুর্গা দশপ্রহরণধারিণীর সঙ্গে তা একাত্ম হয়ে যায়। পরবর্তী ভারতজননী মুখ্যত পরাধীনতা-শৃঙ্খলে-বন্দিনী

রোরুদ্যমানা অশ্রুময়ী নারী। এই ভারতবন্দিনীকে চরিত্ররূপে সৃষ্টি করে নাটক পর্যন্ত রচিত হয়েছিল।[২০] হিন্দুমেলার অধিকাংশ কবি তাঁদের নবজাগ্রত দেশ-প্রেম ও মাতৃকাতরতার রঙ দিয়ে এই জননী মূর্তিটিকে গাঢবর্ণে এঁকেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের 'মলিনমুখচন্দ্রমা ভারত তোমারই' সম্ভবত দেশজননীর শোকাহত বিবশবিহ্বল রূপের প্রথম সার্থক বর্ণনা, তাই গানটি একাধিক নাটকে ব্যবহৃত হয়েছিল। কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতযবন' নাটকের একটি গানেও এই দুঃখিনী ভারতজননীর ছবিটি এখানে উদ্ধারযোগ্য—

দেখিলাম এক নারী নগেন্দ্রকন্দরে বসি
রাহুভয়ে শশী যেন ভূতলে পড়িছে খসি।
আলুলায়িতকেশা ছিন্নভিন্ন মলিনবেশা
আহা মরি কী দুর্দশা স্বর্ণবর্ণ যেন মসী।
বলে ধনী হা বিধাতা! হয়ে ভারতবীরেন্দ্র-মাতা
বিজাতি বিপক্ষ হাতে হইলাম লাঞ্ছিত।
হায় পুত্র হয়ে মাতৃদুঃখ কেন না নাশিছ আসি।
অতঃপর জানিলাম তিনি সাধারণের জননী
ভারত-স্বাধীনতা-ধনী অশ্রুমুখী দিবানিশি।

কাফি-খং সুরতালে রচিত রাধানাথ মিত্রের একটি তৎকাল-প্রচলিত গানে ভারতজননীর এই অশ্রুগলিত বর্ণনাটিও প্রাগুক্ত গানের মতই—

কে তুমি বিজনে বসি কপোলে রাখিয়া কর
কি তাপে তাপিত তনু নয়নে ঝরে নির্ঝর।
যেন নভচ্যুত শশী কাননে পড়েছে খসি
অথবা বিজলী-রাশি ত্যজে জলদনিকর।
এমন কণ্টকবনে এমন অমূল্য ধনে
কে রেখেছে সংগোপনে হয়ে কঠিন অন্তর।
চিনেছি চিনেছি মরি এ যে ভারতসুন্দরী
দুঃখিনী করেছে অরি কাঁদিয়ে ভেঙেছে স্বর॥

আনন্দচন্দ্র মিত্রও একটি গানে রোদনাক্রান্তা জননীকে দর্শন করার জন্য ভারতবাসীকে আহ্বান করেছেন—

কোথায় রহিলে সব ভারতভূষণ
একবার এসে দুঃখিনীরে কর দরশন।...

'ভারতীয় সংগীত মুক্তাবলী'তে উদ্ধৃত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্নের একটি গানে ক্রন্দমানা ভারতমাতার ছবিটি এই রকম—

ভারতজননী মলিনবদনী
অশ্রুজল মুখে শোকশেল বুকে
কাঁদেন ভারতদুঃখে দিবসরজনী।
ভারতশ্মশানে সঞ্চারিত প্রাণে
সাধেন কি শক্তিধ্যানে মৃত সঞ্জীবনী।
যদি পুনঃ জাগে সে দীপকরাগে
নির্জীব ভারতে হবে পুনঃ জয়ধ্বনি ॥

দ্বারকানাথ সেকালের খ্যাতনামা গীতকার ছিলেন। তাঁর 'নির্বাণ আশার দীপ সব অন্ধকার' গানটি 'জরাজীর্ণতাগ্রস্ত ভগ্নাশা ভারতসন্তানের হৃদয়োচ্ছ্বাস'-রূপে উল্লিখিত। 'ভারতদুঃখিনী আমি হতভাগ্যা পরাধিনী' গানটিতে ভারত-জননীর নৈরাশ্যকে গৃহান্তঃপুরবাসিনী ভারতীয় নারীর দুর্ভাগ্যের সঙ্গে একাত্ম করে দেওয়া হয়েছে। হিন্দুমেলায় প্রচলিত অজ্ঞাতকবির 'আমি ভারতভূমে একবার দেখে যাও আর্যগণ' এবং 'প্রাণ কাঁদে বলিতে ভারতের বিবরণ' গান দুটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

এই সূত্রে দেশজননীর অন্যান্য গীতচিত্রগুলির কথাও স্মরণীয়। বেহাগ রাগে একটি মাতৃআবাহন রচনা করেছেন স্বামী প্রজ্ঞানন্দ—

কে আছ মায়ের মুখপানে চেয়ে
এস কে কেঁদেছ নীরবে ;
মার মুখ চেয়ে আত্মবলি দিয়ে
সে মুখ উজ্জ্বল করিবে।

জননীর রূপমূর্তি বর্ণনার চেয়ে গানে মাতৃনামমহিমাই বেশি করে চোখে পড়ে। আঠেরো-উনিশ শতকের শ্যামাসংগীতের সঙ্গেও বাঙলার স্বদেশ-প্রেমাত্মক গান এই সময় থেকে একাকার হয়ে যায়। জনৈক রামচন্দ্র দাস 'তিমিরে ধীরে ধীরে' (?) গানের সুরে একটি জাতীয় গাথা লিখেছেন, এতে মুক্তিকাময়া স্বদেশভূমি ও শ্যামাজননীর একাত্মতা স্থাপিত হয়েছে। এটি মাতৃ-নামমহিমার একটি স্নিগ্ধ গীতি—

আমরা সব মায়ের ছেলে মাকে পেলে কাকে ডরাই
আকাশেতে মনের সাধে মায়ের নামের নিশান উড়াই।
বঙ্গভূমি আমাদের মা, জগতে নাহি তুলনা,

লোকে করে ধনের গর্ব, আমরা করি মায়ের বড়াই।
মায়ের শস্যে জীবন ধরি মায়ের জলে তৃষ্ণা হরি
মায়ের নামে মায়ের প্রেমে মায়ের কোলে নেচে বেড়াই।
মায়ের কোলে যবে থাকি কিছুতে ভয় নাহি রাখি
মা মা বলে অবহেলে বিপদবাধা সকল এড়াই।
মা আমাদের অগ্নিময়ী মায়ের নামে বিশ্বজয়ী
আমরা সবে মিলে মিশে দেশে দেশে আগুন ছড়াই ॥

বরিশালের প্রসিদ্ধ জননায়ক অশ্বিনীকুমারও শক্তিতন্ত্র এবং স্বদেশমন্ত্রকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। খাম্বাজ পোস্তায় এই গানটি দ্রষ্টব্য—

শ্মশান তো ভালোবাসিস মা গো
তবে কেন ছেড়ে গেলি
এত বড় বিকট শ্মশান এ জগতে কোথা পেলি ?
দেখসে হেথা কী হয়েছে ত্রিশ কোটি শব পড়ে আছে,
কত ভূত বেতাল নাচে রঙ্গে ভঙ্গে করে কেলি। ··

এই শক্তিরূপিণী চণ্ডিকারূপিণী স্বদেশজননীর প্রতি বিপিনচন্দ্রের একটি আবাহনগীত—

উব মা বাহুতে শক্তিরূপিণী
উর মা হৃদয়ে ও রণরঙ্গিণী,
রিপুকুলমাঝে সন্তান লয়ে
দাঁড়া মা হৃদয়রমা।

কালীপ্রসন্নের অনুরূপ কণ্ঠও প্রসঙ্গত উদ্ধারযোগ্য—

দণ্ড দিতে চণ্ডমুণ্ডে এস চণ্ডি যুগান্তরে···
এ যুগে আবার মা গো ! দুর্গতি নাশিতে জাগো,
এসে নিজে রক্তবীজে নাশ সেই মূর্তি ধরে।···

মানিকতলা বাগানে বোমা আবিষ্কারের ফলে অসমাপ্ত সাধনা স্মরণ করে ক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন—

না হইতে মাগো বোধন তোমার
ভেঙেছে রাক্ষস মঙ্গলঘট ;
জাগো রণচণ্ডী জাগো মা আমার।···

ময়মনসিংহে কিশোরদের উপর পুলিশের অত্যাচারের প্রতিশোধ কামনা করে হরিশচন্দ্র চক্রবর্তী একটি গানে 'শ্মশানের কালী'কে আবাহন জানিয়ে-

ছিলেন।[২১] এই মাতৃসাধনায় মুসলমান কবি মুনসি কায়কোবাদের কণ্ঠও অকৃত্রিম অনুরাগে মিশে গেছে—

ক্ষমা করো মা বঙ্গভূমি ক্ষমা করো মা হৃদয় খুলে,
আমি যে তোর অবোধ ছেলে লবি নে মা কোলে তুলে,
অদৃষ্টের ঘোর নিপীড়নে কতই দুঃখ রইল মনে;
তোরই স্নেহ তোরই আদর সবই যে মা গেছি ভুলে।
তোর কথা মোর মনে হলে ভাসি আমি নয়নজলে,
পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াই পথে ঘাটে নদীর কূলে॥

একমাত্র মুসলমানকবি রচিত একটি মাত্র দেশাত্মবোধক কাব্যগীতটি ছাড়া সমকালীন কোনো সংকলনে অন্য কোন মুসলমান বাঙালি কবির গীত মেলেনি।[২২]

কয়েকটি গানে জন্মভূমির ভৌগোলিক সৌন্দর্যের বন্দনার কথাও পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'নম জন্মভূমি শ্যামাঙ্গিনী', কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের 'সেই ত রয়েছ মা তুমি', কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'জননি জন্মভূমি স্বর্গ তুমি মহীতলে' গানগুলি অন্যত্র উল্লিখিত হয়েছে। রজনীকান্ত সেনের এই পর্যায়ের কয়েকটি স্বরচিত কাব্যগীতের উল্লেখ করা যায়—

তব চরণ-নিম্নে উৎসবময়ী শ্যামধরণী সরসা
ঊর্ধ্বে চাহ অগণিত মণিরঞ্জিত নভ নীলাঞ্চলা
সৌম্যমধুর দিব্যাঙ্গনা শান্ত কুশলদরশা
দূরে হের চন্দ্রকিরণউদ্ভাসিত গঙ্গা
নৃত্যপুলক গীতিমুখর কলুষহরতরঙ্গা;
ধায় মত্তহরষে সাগরপদপরশে
কূলে কূলে করি পরিবেশন মঙ্গলময় বরষা।...

রজনীকান্তের একটি গানে সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব অত্যন্ত তীব্রভাবে এবং পীড়াদায়কভাবে শ্রুতিকে আঘাত করে—

কোন দেশের উত্তরের সীমায়
ধরার মাঝে শ্রেষ্ঠ গিরি?
কোন দেশের আর তিন পাশেতে
রয়েছে সমুদ্র ঘিরি?
কোথায় শ্যামল মাঠে ফলে
থোকা থোকা সোনার ধান

সে আমাদের সোনার ভারত
আমাদেরই হিন্দুস্থান ॥

স্বদেশের জন্য আত্মবিসর্জনের সুর কয়েকটি গানে প্রবলভাবে অনুভূত হয়। ১৩০৯ কার্তিক বঙ্গদর্শনের 'মা ভৈঃ' নামক সুবিখ্যাত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"তুমি দেশকে যথার্থ ভালোবাস তাহার চরম পরীক্ষা তুমি দেশের জন্য মরিতে পার কিনা।" যেন এই বাণীকেই সংগীতে বরণ করে কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত লিখেছিলেন—

বিশ্বময়ী মায়ের পূজা মায়ে দিবেন বর
এ পূজায় চাই মুণ্ড ডালি আয়রে নারীনর।...

সরলা দেবীর 'খাটিবি আয়' গানটি এই সূত্রে স্মর্তব্য। বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কয়েকটি গানে স্বদেশের জন্য আত্মবিসর্জনের জ্বালাময় আহ্বান আছে। যেমন—

আয় আজি আয় মরিবি কে,
পিষিতে অস্থি শুষিতে রুধির
নিশীথ শ্মশানে পিশাচ অধীর
থাকিতে তন্ত্র সাধনমন্ত্র
প্রেতভয়ে ছি ছি ডরিবি কে?
মরার মতন না লভি মরণ
সাধকের মত মরিবি কে?
অসুরনিধনে কিসের তরাস
পশুর নিনাদে তোরা কি ডরাস?
না গণি বিজন কানন ভীষণ
বিষম বিপদ বরিবি কে?
নিঠুর অরি সংহার করি
বীরের মতন মরিবি কে,
উঠেছে সিন্ধু মথিয়া তুফান,
ছুটিছে উর্মি পরশি বিমান
সাহসেতে ভর করি সে সাগর
হাসিমুখে তোরা তরিবি কে?
হউক ভগ্ন জলধিমগ্ন
তবু তরী বাহি মরিবি কে?

বিজয়চন্দ্র 'এ জগতে যদি বাঁচিবি' গানে দুর্বল দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছেন এই আত্মদান-প্রেরণায়—

ওরে অক্ষম ওরে দুর্বল বীর বিক্রম কর সম্বল
যদি জীবনধারণে বাসনা,
ওরে অধম চপল ঘৃণ্য নিজ সংযম বল ভিন্ন
কহ আছে কি অন্য সাধনা ॥

এই আত্মোৎসর্গের মহতী প্রেরণায় রোমান্টিক সৌন্দর্যমুগ্ধ প্রকৃতিপ্রেমিক কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীও লিখে ফেলেছিলেন একটি বাউল গান—

ওরে খ্যাপা যদি প্রাণ দিতে চাস এই বেলা তুই দিয়ে দে না,
ওরে মায়ের তরে প্রাণটি দিবার এমন সুযোগ আর হবে না।
যখন দুদিন আগে দুদিন পরে তফাৎ মাত্র এই
তখন অমূল্য এই মানবজনম বৃথা দিতে নেই ,—
ওরে খ্যাপা, মায়ের দেওয়া, এ ছার জীবন দেরে মায়ের তরে ;
অমর জীবন পাবি রে ভাই জগৎমায়ের ঘরে
কি দিয়েছিস লিখবে যখন পরকালের খাতা
তখন তোরই দানে হবে আলো বইয়ের প্রথম পাতা ॥

যোগেন্দ্রনাথ শর্মা কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের ছদ্মনাম। এই নামে তিনি 'স্বদেশসংগীত' নামে একটি দেশাত্মবোধক গানের সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন। কালীপ্রসন্ন সম্পর্কে দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'এ নেশান ইন মেকিং' গ্রন্থে লিখেছিলেন—

Kavya Visarad had a fine musical talent. He himself could not sing, but he composed songs of exquisite beauty, which were sung at the Swadeshi meetings and never failed to produce a profound impression.

ইতিপূর্বে কালীপ্রসন্নের যে কয়টি গানের উল্লেখ করা হয়েছে, তাছাড়াও স্বসংকলিত স্বদেশসংগীতে কালীপ্রসন্নের কয়েকটি অধুনা-বিস্মৃত গান গাওয়া যায়। একটি গানে কবি সমকালীন অন্যান্য গীতকারদের মত বঙ্গীয় বাণিজ্যের পরাজিত দুর্দশার জন্য হাহুতাশ করেছেন তাঁর প্রিয় বাউল সুরে—

ভাই সব দেখ চেয়ে বাজার ছেয়ে
আসতেছে মাল বিদেশ হতে
আমাদের বেচাকেনা পাওনাদেনা
অভাবমোচন পরের হাতে।·····

হায়রে নিজের দেশে যায় না অভাব
অশন বসন সব বিলাতে
ছেড়ে পরের ঠাকুর ঘরের কুকুর
ইচ্ছা করে মাথায় নিতে।
বিশারদ ছাড়তে নারে কেঁদে মরে
কার্য সারে কোন মতে।

আর একটি বাউলসুরাশ্রিত, সুরচিত ও জনধন্য স্বদেশসংগীত—

ঐ যে জগৎ জাগে স্বদেশ-অনুরাগে
কে আর ব্যবচ্ছিন্ন বঙ্গ ভিন্ন নিদ্রামগ্ন দিবাভাগে?
ভাঙবে না কি এ কালনিদ্রা রইবে কি ভাব যুগে যুগে?
পেয়ে পরের প্রসাদ যায় কি বিষাদ
এ অবসাদ কোন বিয়োগে?
থাকতে অঙ্গ পঙ্গু বঙ্গ দাগা বুলায় পরের দাগে
করে গৃহশূন্য পরের জন্য লক্ষ্মীপুত্র ভিক্ষা মাগে।......

কয়েকটি গানে 'করালী' এই ছদ্মনাম পাওয়া যায়।[২৩] করালী-রচিত একটি গানের উদাহরণ—

আছিস কোন উল্লাসে?
সদাই বিদেশী জোঁক রক্ত চোষে। .....
অস্থিচর্ম হল রে সার
রক্ত নাহি রক্তকোষে
এখন বাঁচতে চেলে ফেল সে জোঁক
বয়কট চুনা মুখে ঘসে।......

৮

এ পর্যন্ত আলোচিত দেশাত্মবোধক কাব্যগীতি-সংকলনের অন্তর্গত আরও কয়েকজন কবির আলোচনা করা হচ্ছে। দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র, গিরীন্দ্রনাথের পুত্র গণেন্দ্রনাথ হিন্দুমেলায় দেশাত্মবোধক কাব্যগীতি লিখে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সশ্রদ্ধচিত্তে অনেকবার বহুপ্রসঙ্গে তাঁর নামোল্লেখ করেছেন। কেবল ঠাকুরবাড়িতেই নয়, বাঙলাদেশে স্বাদেশিকতা প্রচারের তিনি অন্যতম পুরোধা ছিলেন এবং সংগীতের মধ্য দিয়েই যে দেশমাতৃকার শ্রেষ্ঠ ধ্যান সম্ভব, এ বোধও তাঁর চিত্তে ঐতিহাসিকভাবে সংক্রামিত হয়েছিল।

তাঁর পূজাসংগীত ও স্বদেশী সংগীত উভয়ই রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছিল, রবীন্দ্রসংগীত-জিজ্ঞাসুর কাছে এ তথ্যও অপরিজ্ঞাত নয়। বাহার যৎ-এ রচিত তাঁর একটি বিখ্যাত গান—

লজ্জায় ভারতযশ গাইব কী করে
লুটিতেছে পরে এই রত্নের আকরে।
সাধিলে রত্ন পাই তাহাতে যতন নাই
হারাই আমোদে মাতি অবহেলা করে।
দেশান্তর জগজন ভুঞ্জে ভারতের ধন,
এ দেশের ধন হায় বিদেশীর তরে।
আমরা সকলে হেথা হেলা করি নিজ মাতা
মায়ের কোলের ধন নিয়ে যায় পরে॥

ঠাকুর ও পরিবারের অন্যান্য কবি-গীতকারদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের খাম্বাজ আড়াঠেকায় রচিত একটি গীত প্রথম কালের দেশগৌরবাত্মক রচনাগুলির অন্যতম—

মিলে সব ভারতসন্তান একতান মনপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।
হোক ভারতের জয় জয় ভারতের জয় গাও ভারতের জয়
কী ভয় কী ভয় গাও ভারতের জয়।

এই গানটি প্রাচীনতম ভারতসংগীতের অন্যতম এবং তৎকালে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' গ্রন্থের উপসংহারে বলেছেন—

"আমি দেখিতেছি যে এই জাতি পুনরায় নব যৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ধর্ম ও সভ্যতাকে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে, হিন্দুজাতির কীর্তিগরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে। এই আশাপূর্ণ হৃদয়ে ভারতের জয়োচ্চারণ করিয়া আমি অদ্য বক্তৃতা সমাপ্ত করিতেছি—

মিলে সব ভারত সন্তান একতান মনপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান…"…ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে লেখেন—"এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয়কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্মদা গোদাবরীতটে বৃক্ষে মর্মরিত হউক। পূর্বপশ্চিম-সাগরের গম্ভীর গর্জনে মন্দ্রীভূত হউক। এই

বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে সঙ্গে বাজিতে থাকুক।"
(বঙ্গদর্শন ১২৭৯ চৈত্র)

চৈত্রমেলায় প্রায় প্রতি অধিবেশনের প্রারম্ভেই এই সংগীতটি সমবেতভাবে গীত হত বলে জানা যায়।[২৪]

হিন্দুমেলার অন্যান্য জনপ্রিয় গানের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নটবেহাগ পোস্তায় রচিত 'মলিনমুখচন্দ্রিমা ভারত তোমারই', হেমচন্দ্রের ভারতসংগীত, বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়ের 'বল এই কি সেই ভারত', গোবিন্দচন্দ্র রায়ের 'কতকাল পরে বল ভারত রে', মনোমোহন বসুর 'দিনের দিন সবে দীন হয়ে পরাধীন' প্রভৃতি গানগুলি কালোত্তীর্ণ হয়েছিল, কারণ বিশ শতকের গোড়ার দশকেও সেইগুলি জনপ্রিয় ছিল। স্বদেশবিষয়ক কবিতা ও সংগীতে হেমচন্দ্রের নাম গুরুত্বপূর্ণ। হেমচন্দ্রের স্বদেশবিষয়ক রচনা কম নয়—'ভারতসংগীত' (আর ঘুমাইও না দেখ চক্ষু মেলি), 'কালচক্র' (বারেক এখনও ফিরে দেখিলি না চাহিয়া), 'ভারতভিক্ষা' (যুবরাজের কলিকাতা আগমন উপলক্ষে রচিত), 'ভারতবিলাপ' (ওহে বঙ্গবাসী জান কি তোমরা) প্রভৃতি। এইগুলির মধ্যে ভারতসংগীতই সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়েছিল। শোনা যায়, এই গানে উচ্চারিত স্বদেশমন্ত্র প্রচারে রাজনৈতিক বিপদের আশঙ্কায় হেমচন্দ্র আইনানুগভাবে গীতোদ্দিষ্ট বক্তব্য ঐতিহাসিক দিক থেকে জনৈক রাজ্যভ্রষ্ট মারাঠা যুবকের জবানিতে প্রকাশ করেছিলেন, তথাপি হেমচন্দ্র রাজরোষে পড়েছিলেন। মোটের উপর ভারতসংগীত সংগীতের যোগ্যতাই লাভ করেছিল, যদিও প্রচলিত গানের তুলনায় এটি রীতিবহির্ভূত, দীর্ঘ স্তবকময় রচনা। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে এর বহু পংক্তি শতকণ্ঠানুবৃত্ত হয়েছে—

বাজরে শিঙা বাজ এই রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
        ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়,
আরব্য মিশর পারস্য তুরকি
তাতার তিব্বত অন্য কব কি
চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয়জ্ঞান
        ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।……

কাব্য হিসাবে হেমচন্দ্রের রচনা যে সমালোচনার বশীভূত, কাব্যগীতির ক্ষেত্রে তারই পুনরাবৃত্তি করা যায়। হেমচন্দ্রের দেশসংগীত তাঁর কবিতারই স্বরে আবৃত্তি মাত্র—সংগীতের মিতচরণ আয়োজনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। ভারতসংগীত খানিকটা কাহিনীহীন ব্যালাডের মত—প্রথমে আত্মজাগরণের উদ্বোধনী গীত, তারপর অতীতকালের প্রোথিত জীবনপতাকা নতুন কালের সুপবনে আন্দোলিত করার প্রচেষ্টা। মধ্যে মধ্যে তুলনামূলকভাবে কবি ভারতের আধুনিক আত্মাবমাননার প্রতি ধিক্কার জানিয়েছেন। বলা বাহুল্য দেশাত্মবোধক কাব্যসংগীতের যে বিধিবদ্ধ প্রণালী পরবর্তীকালে জনপ্রিয় হয়েছিল, হেমচন্দ্রের এই সংগীতটি তারই উৎকৃষ্ট উদাহরণ। একদা বৈদেশিক শাসনমুক্ত ভারতবর্ষের শিরোপরি রবি শশী তারা কিরণ বিকিরণ করত, সেই আর্যাবর্ত এখনও বিস্তৃত, সেই বিন্ধ্যগিরি এখনও উন্নতশীর্ষ, ভাগীরথীর জলরাশি আজও আপন উচ্ছ্বাসে প্রবাহিত, কেবল ভারতবাসী আপন শাশ্বত মহিমা দর্পবুদ্ধি হারিয়ে নিশ্চেষ্ট হতচেতন হয়ে পড়েছে। কবি তাই ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক বিবেক বা চারণের মত দেশবাসীকে সেই কীর্তিগাথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যেন নির্জন সন্ধ্যার কীর্তিধূসর অন্ধকারে তিনি এক পথচারী গায়ক—কিন্তু এখনও কেউ দ্বার খুলে বেরিয়ে আসেনি। হতমানে দুঃখে হতাশায় কবি গেয়ে উঠেছেন—

হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি
কারে বা উচ্চে ডাকিতেছি আমি
গোলামের জাতি শিখিছে গোলামি
আর কি ভারত সজীব আছে?
সজীব থাকিলে এখনি উঠিত,
বীরপদভারে মেদিনী দুলিত
ভারতের নিশা প্রভাত হইত
হায়রে সেদিন ঘুচিয়া গেছে॥

কবিতা হিসাবে এর আবেদন সীমাবদ্ধ হলেও এর ভাষা ও প্রকাশরীতির মধ্যে একটি সংগীতের আবেদন ছিল বলেই হেমচন্দ্রের রচনা কাব্যসংগীতের সীমাভুক্ত হতে পেরেছিল। হিন্দুমেলা এবং তার পরবর্তীকালে যে সব জাতীয় সংগীত রচিত হয়েছে, তাদের উপর হেমচন্দ্রের এই কাব্যগীতিটির প্রভাব নিতান্ত কম নয়।

দেশাত্মবোধক কাব্যগীতে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের নাম পূর্বে একাধিকবার করা হয়েছে। কালীপ্রসন্ন রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবি [২৫], হিতবাদীর

সম্পাদক, কবি ও বক্তা হিসাবে স্বনামখ্যাত। অল্পবয়সেই কবিসংগীতরচনায় শৌখিনদক্ষতা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব থেকেই তাঁর দুএকটি দেশপ্রীতিমূলক গান জনপ্রিয় হয়েছিল, সমকলীন বহু গীতগ্রন্থেই তাঁর 'বিশারদ' ভনিতাযুক্ত একাধিক গান স্থান পেয়েছে। বরিশাল কনফারেন্স উপলক্ষে তৎকালীন জননেতা মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার উপর লাঠিচালনার প্রতিবাদে কাব্যবিশারদের 'যায় যেন জীবন চলে' গানটি লোকপ্রিয় হয়েছিল। গানটি বাউল সুরে রচিত হয়—

মাগো যায় যেন জীবন চলে
শুধু জগৎমাঝে তোমার কাজে বন্দেমাতরম্ বলে।
যখন মুদে নয়ন করব শয়ন শমনের সেই শেষ জালে
তখন সবই আমার হবে আঁধার স্থান দিও মা ওই কোলে।
আমার মান অপমান সবই সমান দলুক না চরণতলে
যদি সইতে পারি মায়ের পীড়ন মানুষ হব কোন কালে?
আমায় বেত মেরে কি মা ভোলাবে আমি কি মার সেই ছেলে?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি কে পালাবে মা ফেলে।
আমি ধন্য হব মায়ের জন্য লাঞ্ছনাদি সহিলে
ওদের বেত্রাঘাতে কারাগারে ফাঁসিকাঠে ঝুলিলে।
যে মার কলে নাচি শস্যে বাঁচি তৃষ্ণা জুড়াই যার জলে
বল লাঞ্ছনার ভয় কার কোথা রয় সে মায়ের নাম স্মরিলে?
বিশারদ কয় বিনা কষ্টে সুখ হবে না ভূতলে,
সেতো অধম হয়ে সইতে রাজি উত্তমে চেও মুখ তুলে ॥[২৬]

কালীপ্রসন্নের আর একটি গানে প্রসন্ন মাতৃমমতা সাময়িকতার ধূলি-কীর্ণ বাস্তবকে অতিক্রম করে গেছে। মাতৃভূমির ভৌগোলিক ঐশ্বর্য, মৃন্ময় বিভূতি ও অধঃপতিত সন্তানের প্রতি কবোষ্ণ উদ্দীপনা এই গানটির অন্বিষ্ট—

স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান,
যাহার সলিলে মন্দাকিনী চলে অনিলে মলয় সদা বহমান।
নন্দনকাননে কিবা শোভাহার বনরাজিকান্তি অতুল তাহার
ফলশস্য তার সুধার আধার স্বর্গ হতে সে যে মহাগরীয়ান।
এ দেহ তোমার তারই মাটি হতে হয়েছে সৃজিত পোষিত তাহাতে
মাটি হয়ে পুনঃ মিশিব তাহাতে ভবলীলা যবে হবে অবসান।

কংসকারাগারে দৈবকীর মত বক্ষেতে পাষাণ লৌহশৃঙ্খলিত
মাতৃভূমি তব রয়েছে পতিত পরিচয় তুমি তাঁহারই সন্তান।
প্রকৃত সন্তান জেনো সেইজন নিজ দেহপ্রাণ দিয়ে বিসর্জন
যে করিবে মার দুঃখবিমোচন হবে তার মাতৃঋণ প্রতিদান॥

কালীপ্রসন্নের সব গান অবশ্য কাব্যসমৃদ্ধ নয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে স্বদেশী দ্রব্যপ্রচারের স্বপক্ষে কালীপ্রসন্ন কয়েকটি গান রচনা করেন। স্বদেশী শিল্পের জন্য উৎসাহসঞ্চার ও ঘরে ঘরে দেশীপণ্যদ্রব্যের ব্যবহারবৃদ্ধির জন্য পথে পথে প্রচারসভার উদ্দেশ্যে কালীপ্রসন্ন কয়েকটি নগরসংগীত রচনা করে দিয়েছিলেন। এইরূপ একটি পথপ্রচারগীতি সে যুগের রাজনৈতিক মনোভাবের বাস্তব আলেখ্য হিসাবে এ কালে স্মরণীয়—

এই দ্বারদেশে এসেছে ভিখারি
কহ কৃপা করি কী দিব তায়
স্বদেশসেবক এ সব যাচক
বঞ্চিত কোর না করুণাকণায়॥
চারুকারুকার্য তব পরিজ্ঞাত
স্বদেশসম্ভূত শিল্পকৃষিজাত
সে সব সন্ধান করিলে প্রদান
করিব প্রচার তোমারই কৃপায়।
প্রতিবেশী শিল্পী যদি কেহ থাকে
কহ কী উপায়ে পালিব তাহাকে
কী ধন সে জন করে উপার্জন
কিসে পারিবে সে প্রতিযোগিতায়।
এই ভিক্ষা চাই সদনে তোমার
স্বদেশের বস্তু কর ব্যবহার,
বিদেশীয় কিছু কোরো না গ্রহণ,
যদি তুল্য তার দেশে পাওয়া যায়।
বলে বিশারদ, এই ভিক্ষা দাও
কোরো না বিমুখ মুখ তুলে চাও
স্বদেশের ধন স্বদেশে রক্ষণ,
না করিলে বল কী হবে উপায়।

এই ধরনের মাতৃবন্দনার আর একটি গান—

সেই ত রয়েছ মা তুমি
ফুলে ফুলে স্বশোভিত শ্যামা জন্মভূমি।
শিরোপরি গিরিবর সেই শুভ্র কলেবর
পদতলে সেই সিন্ধু আছে অনুগামী।

নরেন্দ্রকুমার শীল-সংগৃহীত স্বদেশী গীতসংকলন 'স্বদেশী সংগীতে' (১৩১৪) কালীপ্রসন্নের একাধিক গান সংকলিত হয়েছে।

পথপ্রচারের প্রয়োজনে রচিত গানে কবিত্ব আশা করা যায় না, তবু রবীন্দ্রনাথ যে সমকালীন আন্দোলনের গৈরিক পথে একতারায় স্বর তুলে রচনা করেছিলেন 'বাঙলার মাটি বাঙলার জল', 'আমার সোনার বাঙলা', সেই আন্দোলনেই কালীপ্রসন্ন তাঁর গানে প্রমাণ করেছিলেন স্বদেশীয় কাঁচামালে কিরূপে ব্রিটেনের পণ্যব্যবসায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে, এবং দেশীয় শিল্পকে কিভাবে রক্ষা করা যেতে পারে। তারই উপদেশাত্মক গান—

ধুতি চাদর ম্যাঞ্চেস্টারের চেয়ে দেখ সব সর্বনেশে
ভরে জাহাজগুলো তোদের তুলো
তোরাই কিনিস সেই জিনিসে।
যাদের তুলো তাদের দিয়ে
লাভ নিয়ে যায় সব বিদেশে।
চিনি গুড় আর মধু ফেলে
লোফস্যুগারের মজি রসে,
আছে গোয়াল-পোরা বকনা গাভী
কৌটোতে দুধ তবু আসে।

মূঢ়দৃষ্টি-স্ফুটনের এত সগীতপ্রয়াস সত্ত্বেও কালীপ্রসন্ন তাই কাব্যসংগীতের ইতিহাসে অপাংক্তেয় নাম বলে মনে হবে। বিদ্রোহ বিক্ষোভ প্রেম যে নিবিড় আবেগে সংগীত হয়ে ওঠে, সেই সপ্রতিভ আবেগ কালীপ্রসন্নের ছিল না বলেই কাব্যগীতের ইতিহাসে তিনি বাক্‌সর্বস্ব গন্থকার মাত্র।

আনন্দচন্দ্র মিত্র মুখ্যত নারীজাগরণ, নারীসমাজের জাতীয় দুর্গতির কথাই অনেকগুলি গানে প্রকাশ করেছিলেন। 'বাঙ্গালীর গানে'র সম্পাদকের ভাষায়, "ইহার রচিত 'ভারত শ্মশানমাঝে আমি রে বিধবা বালা' গীতটি সর্বজন-পরিচিত"। আনন্দচন্দ্রের তিনটি দেশাত্মবোধক গান—

ঝিঁঝিট খাম্বাজ ঠুংরি

কত প্রিয়তম কে বুঝিতে পাবে
সুখ জন্মভূমি জননীসমা রে।
শ্যামল সুন্দর মনচিত্তহর
প্রীতিপূর্ণিতরূপ অনুপম রে।
কিবা দূরদেশে কিবা স্বপ্নাবেশে
হেরি ঐ মূরতি সুখস্পর্শমণি
বিরাজিত যে সুখ রত্নাকবে ॥···

গভীর মমতা ও হৃদ্য দেশাত্মবোধে আলোচ্য রচনাটি উৎকৃষ্ট কাব্যসংগীত হয়ে উঠেছে। আনন্দচন্দ্রের পরবর্তী দুটি গান—

বিভাস ঝাঁপতাল

উঠ উঠ উঠ সবে ভারতসন্তানগণ
থেকো না থেকো না আর মোহনিদ্রায় অচেতন।···

খাম্বাজ আড়া

চেয়ে দেখ দেখ ওহে ভারতসন্তানগণ
জননী জনমভূমি চিরবিষাদে মগন।
হারাইয়া রত্নাসন অরণ্যে করে ভ্রমণ,
অনাদরে অত্যাচারে নীরবে করে রোদন
অজ্ঞানতা অধীনতা, পাপতাপ দরিদ্রতা
শত শত চিতানলে ভারতে করে দাহন ॥···

আনন্দচন্দ্রেব গানগুলিতে ভারতভূমির পরাধীনতার জন্য যে নৈরাশ্য ব্যথা ও আর্তনাদ সে যুগে ফুটে উঠেছিল, তারই বিপরীত মনোভাব লক্ষ্য করা যায় গীতিনাট্যাবলী-বচয়িতা রাধানাথ মিত্রের একটি গানে। খাম্বাজ একতালায় তিনি ভারতকীর্তনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন—

ভারত যশকীর্তন করিয়ে কাটাব এ ছার জীবন
বেদবীণা লয়ে করে স্বদেশী বিদেশী ঘরে
গাইব করুণ স্বরে করেছি মনন।
উদয়-অচল-শিরে গহন বনমাঝারে
গাইব সাগরতীরে যখন তখন।
বনের বিহঙ্গ ধরে শিখাব যতন করে
গাইবে মধুর স্বরে ছাইয়া গগন।

আর একটি গানে ভারতবন্দনা করেছেন কবি—

ভারতভূমিসমান আছে তবে কোন স্থান।
ভারতের গুণ গান সবে মিলি গাও রে।
ভারতে যে ধন পাই কোথা তাহা নাহি পাই
অতুলনা এক ঠাঁই দেখিতে না পাও রে।
যে ধনে হয়ে অভাব ভারতের এই ভাব,
করি তাহা অনুভব তাহারে মিলাও রে।
অধীনতা-অপমানে দুঃখিনী ব্যথিতা প্রাণে
জননীর মুখপানে বারেক না চাও রে ॥···

আগেই বলা হয়েছে যে ব্রহ্মসংগীত ভক্তিসংগীত ও বিবিধ সংগীতরচয়িতা বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় উনিশ শতকের শেষভাগে কয়েকটি দেশাত্মবোধক গান উপহার দিয়েছিলেন। 'এই কি সে দেশ সেই আর্যভূমি' গানে আর্য-অধ্যুষিত পুরাণ-বর্ণিত ভারতবর্ষের অতীত মাহাত্ম্যের সঙ্গে বর্তমান ভারতের তুলনা করে কবি বেদনা বোধ করেছেন। 'পোড়া দেশের কথা বলতে ব্যথা পাই' গানেও অন্নহীন ইংরাজি শিক্ষায় অভ্যস্ত কিন্তু নীতিভ্রষ্ট স্বদেশের জন্য কবির অনুতাপ। তাঁর আর একটি ভারতবিলাপ—

বল এই কি সেই ভারত। বল এই সেই ভারত হে।
যে ভারতবৃক্ষে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ
ফলেছিল সুশোভিত কত।···

—কিন্তু কোথাও পরাধীনতার গ্লানি তীব্র হয়ে ওঠেনি। তবে প্রাচীন গৌরবোজ্জ্বল ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনাসূত্রে স্বদেশবাসিগণের চিত্তে সূক্ষ্ম গ্লানি-বোধ জাগানো ও স্বাধীনতার উপযুক্ত করে তোলার পরোক্ষ প্রয়াস এক জাতীয় গানে প্রায়ই চোখে পড়ে। কাঙাল ফিকিরচাঁদ বাউল সুরে বিষ্ণুরামের মতই ভারতবিলাপ রচনা করেছেন—

একি সেই আর্যস্থান আর্য সন্তান
ও যার তপোবলে যোগবলে কাঁপিত দেবতার প্রাণ।
সদা ও যার হেরে বীর্যবল স্বর্গ মর্ত রসাতল
সভয়ে কাঁপিত গিরি সাগরের জল,
দিগ্‌দিগন্তরে শূন্য ভরে উড়িত নিশান,
ও যার শিল্প আর বিজ্ঞান
যোগতত্ত্ব আত্মজ্ঞান করেছিল পৃথিবীর একদিন চক্ষু দান ॥

এই হতাশায় বিলাপ প্রসিদ্ধ কবি-নাট্যকার-গীতিকার রাজকৃষ্ণ রায়ের গানেও—

ঝিঁঝিট আড়াঠেকা

ভারতীয় আর্যনাম এখনও ধরায়
আর্যের শোণিত আজও আছে কি শিরায়।
তা যদি থাকিত তবে এ দশা কেন রে হবে,
কেন বা ভাসিতে হবে নয়নধারায়।
আর্যনামে পরিচয় দিবার এ কাল নয়,
অনার্য অধম এবে ভারতবাসী
আর্যত্ব যাহাতে রবে ভারতে তা নাহি এবে,
মুখে আর্যনাম ভানে গৌরব কোথায়॥

রাজকৃষ্ণের আরও দুটি গানে এই পরাধীনতাজনিত আত্মনৈরাশ্য প্রক্ষিপ্ত হয়েছে—

কি গাইব আজি হায় কি আছে ভারতে আর?
হু হু করে প্রাণমন ধু ধু করে চারিধারে।
যে দিকে ফিরাই আঁখি অনিমেষে চেয়ে থাকি
শূন্যময় সব দেখি শূন্যে রব হাহাকার। ·····

পরবর্তী গানটিও এইরূপ ঘনাভূত বেদনায় বিষণ্ণ—

দিবস বিগত তবুও ভারত
নহিল বিগত দুখ তোমার?
রজনী আইল আবার ছাইল
শোকের উচ্ছ্বাস মুখ তোমার।

জাতীয় সংগীতের অন্যতম সংকলনকার উপেন্দ্রনাথ দাসের একটি নৈরাশ্য-মূলক গানও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

হায় কি তামসী নিশি ভারতমুখ ঢাকিল
সোনার ভারত আহা ঘোর বিষাদে ডুবিল।
শোকসাগরে ভাসি ভারত মা দিবানিশি
স্মরি পূর্ব যশোরাশি কাঁদিতেছে অবিরল;
কে এখন নিবারিবে জননীর অশ্রুজল॥ ··

তোটক ছন্দে রচিত খাম্বাজ ঠুংরি সুরে গোবিন্দচন্দ্র রায়ের 'কত কাল পরে

বল ভারত রে' বহু বিখ্যাত স্বদেশমুখ্য কাব্যগীতি, সে যুগের প্রায় গীতসংকলনেই স্থান পেয়েছে। এ গানের পংক্তিগুলি দোষেগুণে, কাব্যসম্পদে ও বিসদৃশ তথ্যসমাবেশে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলেও সামগ্রিকভাবে ছন্দবিন্যাসে একটি সাংগীতিক আবেদন জাগায়—

কত কাল পরে বল ভারত রে
দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে।...
নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে
পর দাসখতে সমুদায় দিলে।
পর হাতে দিয়ে ধনরত্ন সুখে
বহ লৌহবিনির্মিতহার বুকে।
পর ভাষণ আসন আনন রে
পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে।
পর দীপশিখা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।...
নিজ অন্ন পরে করপণ্য দিলে
পরি- বর্তে ধনে দুর্ভিক্ষ নিলে।
হলে চাকরি সার যথায় তথায়
অপ- মান সদায় কথায় কথায়।...

৯

বাঙলা স্বদেশভাবাত্মক কাব্যসংগীতগুলির উপর বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের প্রেরণা ছিল অসামান্য। প্রাচীন ও আধুনিক দেশাত্মবোধক গীত-সংকলনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বন্দে মাতরম্ গানটি সর্বপ্রথম স্থান পেয়েছে। এই গানের প্রতিটি ছত্রে বাঙালির স্বদেশবন্দনার নিবিড়তা কম্পমান, এই কাব্যসংগীতের প্রতি শব্দে স্বাধীনতা-আন্দোলনের আরক্ত দিনগুলির বিস্ময়-বিষাদ-বীর্যজড়িত ইতিহাসের স্মৃতি নিহিত[২৭]। এই গানে দশপ্রহরণধারিণী প্রতিমার সঙ্গে দেশমাতৃকার যে অভেদত্ব স্থাপিত হয়েছিল, পরবর্তী কয়েক দশকের মাতৃমন্ত্র সেই প্রতিমারই চরণে উৎসৃষ্ট বিল্বপত্র। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের জাতীয় কাব্যসংগীতগুলি প্রায় একই পদ্ধতির অনুসারী। ভারতবর্ষ কিংবা বঙ্গভূমির সুশ্যামাঙ্গ কমকান্তিকে দেবীপ্রতিমারূপে দর্শন করে কবিরা তার বোধনমন্ত্র রচনা করেছেন। তারপর জল-ফল-শস্য-ভূষিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের

প্রশস্তি করেছেন, প্রসঙ্গক্রমে তার বিগত মহিমার ও সাম্প্রতিক দারিদ্র্যের, হতচেতন লাঞ্ছনার ও অপমানের উল্লেখ করেছেন এবং পরিশেষে আসন্ন ভবিষ্যতের জয়গান করেছেন। রবীন্দ্রনাথে এসে সর্বপ্রথম আমরা এই প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি।

সরলা দেবীর একটি কাব্যসংগীতে দেশমাতৃকার বন্দনা বন্দে মাতরম্-এরই যেন বিতানিত ভাষ্য—

অতীতগৌরববাহিনি মম বাণি! গাহ আজি হিন্দুস্থান!
মহাসভা উন্মাদিনি মম বাণি। গাহ আজি হিন্দুস্থান!
কর বিক্রম-বিভব-যশ-সৌরভ পূরিত সেই নামগান!
বঙ্গবিহার-উৎকল-মাদ্রাজ-মারাঠা-গুর্জর-পাঞ্জাব-রাজপুতান
হিন্দু পার্শি জৈন ইসাই শিখ মুসলমান!
গাও সকল কণ্ঠে সকল ভাষে নমো হিন্দুস্থান!
(হিন্দু গায়কগণ) হর হর হর জয় হিন্দুস্থান!
(পার্শি গায়কগণ) দাদার হোরমজদ্ হিন্দুস্থান
(মুসলমান গায়কগণ) ইলালি আকবর হিন্দুস্থান।……
মিলাও দুঃখে সৌখ্যে সখ্যে লক্ষ্য কায়মনঃপ্রাণ।
(ইসাই গায়কগণ) জয় জীহোবা হিন্দুস্থান!
(হিন্দু জৈন প্রভৃতি গায়কগণ) জয় জয় ব্রাহ্মণ হিন্দুস্থান।
(সকলে) নমো হিন্দুস্থান!

আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেও যে দেশমাতৃকার নামে জাতীয় সংহতি সৃষ্টি করা যায়, মহাভারতীয় এই ইতিহাস-নির্দেশ এই গানের বাণীতেই প্রথম ফুটে উঠেছে। এ গানের সমবেত কণ্ঠের পরিকল্পনা বাঙলা দেশগৌরবী কাব্যসংগীতের ইতিহাসে তাই অভিনব মনে হয়। এই গানটি প্রথম গীত হয়েছিল কলকাতায় অনুষ্ঠিত ১৯০১ সালের জাতীয় কংগ্রেসের ১৭শ অধিবেশনে। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন যথার্থই বলেছেন, 'এই গানে রবীন্দ্রনাথকৃত জনগণমন গানের পূর্বাভাস সুস্পষ্ট।'[২৮]

রবীন্দ্রনাথের সংগীতসাধনার ইতিহাসে সরলা দেবীর ভূমিকার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সরলা দেবীর স্বামী রামভুজ দত্তচৌধুরী স্বয়ং জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনের গায়কদের অন্যতম ছিলেন বলে তৎকালীন পত্রপত্রিকা থেকে সংবাদ পাওয়া যায়। সরলা দেবী রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সুরারোপিত বন্দে মাতরম্ সংগীতের দ্বিতীয় স্তবকে সুর সংযোজনা করে সেটি সম্পূর্ণ করে তোলেন।

সরলা দেবীর মিশ্র খাম্বাজ সুরে আর একটি জনপ্রিয় গান রবীন্দ্রনাথের 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী'র মতই স্নিগ্ধ ভারতবন্দনা—

বন্দি তোমায় ভারতজননি বিদ্যামুকুটধারিণি,
বরপুত্রের তপঅর্জিত গৌরবমণিমালিনি।
কোটিসন্তান আঁখিতর্পণ হৃদিআনন্দকারিণি—
মরি বিদ্যামুকুটধারিণি।
যুগযুগান্ত তিমির অন্তে হাস মা কমলবরণি।
আশার আলোকে ফুল্লহৃদয়ে আবার শোভিছে ধরণী।
নবজীবনের পসরা বাহিয়া
আসিছে কালের তরণী হাস মা কমলবরণি।
এসেছে বিদ্যা আসিবে ঋদ্ধি শৌর্যবার্যশালিনি।
আবার তোমায় দেখিব জননী সুখে দশদিকপালিনী
অপমানক্ষত জুড়াইব মাতঃ খর্পরকরবালিনি।
শৌর্যবীর্যশালিনি।[২৯]

কেবল মুগ্ধ সৌন্দর্যময়ী দেশবন্দনা রচনা নয়, কর্মে-উত্তেজনায়-আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এই অসামান্যা মহিলা আত্মবলিদানের আহ্বানও জানিয়েছেন—

খাটিবি আয়,
জননীরে আজি রাখিতে সকলে মরিবি আয়।
যে শোণিত ওরা লয়েছে শুষিয়া
পুরা তাহা আজি নিজ লহু দিয়া;
মাতৃদ্রোহীর প্রায়শ্চিত্ত মানিব তায়।

সমকালীন অন্যান্য মহিলা কবিদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ও কামিনী রায়ের নাম বিভিন্ন সংকলনে বিধৃত হয়েছে। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রধানত প্রেমসংগীত রচনা করলেও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জাতীয় সংগীত' সংকলনে স্বর্ণকুমারীর কয়েকখানি দেশাত্মবোধক গান ('ধরণি গো মানবজনম', 'বড় সাধ বড় আশা', 'বল ভাই বল', 'তবু তারা হাসে,' 'ফুরায়েছে হাসি সব' ইত্যাদি) আছে। স্বর্ণকুমারীর একটি গানে স্বদেশী দ্রব্যগ্রহণের সংকল্প ঘোষিত হয়েছে—

শতকণ্ঠে কর গান জননীর পূতনাম
মায়ের রাখিব মান—লয়েছি এ মহাব্রত।

আর না করিব ভিক্ষা স্বনির্ভর এই শিক্ষা
এই মন্ত্র এই দীক্ষা এই জপ অবিরত।
সাক্ষী তুমি মহাশূন্য না লব বিদেশী পণ্য
ঘুচাব মায়ের দৈন্য করিলাম এ শপথ।
পরি ছিন্ন দেশী সাজ মানি ধন্য ধন্য আজ
মায়ের দীনতা লাজ হবে দূর পরাহত,
এই আমাদের ধর্ম এই জীবনের কর্ম
এই বস্ত্র এই বর্ম এই আমাদের মুক্তিপথ।
নমো নম বঙ্গভূমি মোদের জননী তুমি
তোমার চরণে তুমি নরনারী মোরা যত॥

কামিনী রায়ের একটি প্রসাদগুণযুক্ত কাব্যসংগীত অনেকগুলি সংকলনেই পাওয়া যায়—

তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন শুনে যা আমার আশার কথা
আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে তবুও প্রাণের ঘুচেছে ব্যথা।
এই নিবিড় নীরব আঁধারের তলে ভাসিতে ভাসিতে নয়নের জলে
কী জানি কখন কী মোহন বলে ঘুমায়ে ক্ষণেক পড়িনু হেথা।
আমি শুনিনু জাহ্নবী-যমুনার তীরে পুণ্য দেবস্তুতি উঠিতেছে ধীরে
কৃষ্ণা গোদাবরী নর্মদা কাবেরী পঞ্চনদ কূলে একই প্রথা।
আর দেখিনু যতেক ভারতসন্তান একতায় বলী জ্ঞানে গরীয়ান
আসিছে যেন গো তেজ-মূর্তিমান অতীত সুদিনে আসিত যথা।
ঘরে ভারতরমণী সাজাইছে ডালি বীর শিশুকুল দেয় করতালি
মিলি যতবালা গাথি জয়মালা গাইছে উল্লাসে বিজয়গাথা॥

এছাড়া কামিনী রায়ের 'যেইদিন ও চরণে দিনু ডালি এ জীবন' একাধিক প্রাচীন গীতসংকলনে উদধৃত হয়েছে, যদিও সংগীত অপেক্ষা কবিতারূপেই এটি স্মরণীয়। গিরীন্দ্রমোহিনীর একটি রাখীসংগীত যোগীন্দ্রনাথের 'বন্দে মাতরম্' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। গিরীন্দ্রমোহিনীর একটি মাতৃস্তোত্র ভাষার মাধুর্যে মাতৃবন্দনার কমনীয়তায় এখনও আমাদের চিত্ত প্রসন্ন করে—

নমো নম জননী অশেষগুণধারিণী।
নিত্য সরসা চিত্ত-হরষা রৌদ্রকনকবরণী।
শস্যশ্যামলা কুন্দধবলা অম্বুমেখলাধারিণী।
নিত্য নবীনা চিত্তদ্রাবিণী সপ্তস্বরসুভাষিণী।

তুঙ্গহৃদয়া দিকবলয়া স্নিগ্ধমলয়শ্বাসিনী।
দীপ্তিপ্রোজ্জলা চন্দ্রকুণ্ডলা অব্জবিলোললোচনী।
স্রোতমধুরা নীরক্ষীরধারা সন্তাপ-জরা-নাশিনী।
পল্লীশোভনা মল্লীভরণা দ্রুত চামরধারিণী।
লক্ষপ্রসূতা মোক্ষজ্ঞানদা অযুতসুতশালিনী।
কৃত্যকুশলা চিত্তবহুলা চিত্তবেদনহারিণী
জয়দে জয়দায়িনী॥

বন্দে মাতরম্ গানের ভাববস্তুর মত 'বন্দে মাতরম্' শব্দটিও বাঙালির স্বদেশচৈতন্যের ইতিহাসে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।[৩০] বক্তৃতায় প্রবন্ধে সংগীতে এই শব্দটি ছিল অপরিহার্য—এই স্বল্পাক্ষর ধ্বনিস্পন্দে দেশপ্রেম সেদিন তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছিল। ২১ শে কার্তিক ১৩২২, বঙ্গব্যবচ্ছেদের একমাস পরে বাগবাজারে পশুপতি বসুর ভবনে বিজয়াসম্মিলনী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তার উপসংহারে এই 'বন্দে মাতরম্' শব্দের অবিস্মরণীয় প্রভাব আশ্চর্য উদাত্ত ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে—

"হে বন্ধুগণ, আজ আমাদের বিজয়া সম্মিলনের দিনে হৃদয়কে একবার আমাদের এই বাঙলাদেশের সর্বত্র প্রেরণ কর। উত্তরে হিমাচলের পাদমূল হইতে দক্ষিণে তরঙ্গমুখর সমুদ্রকূল পর্যন্ত, নদীজালজড়িত পূর্বসীমান্ত হইতে শৈলমালাবন্ধুর পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত চিত্তকে প্রসারিত কর। যে চাষি চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে, তাহাকে সম্ভাষণ কর—যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠগৃহে এতক্ষণে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, শঙ্খমুখরিত দেবালয়ে যে পূজার্থী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর। আজ সায়াহ্নে গঙ্গার শাখাপ্রশাখা বাহিয়া ব্রহ্মপুত্রের কূলউপকূল দিয়া একবার বাঙলাদেশের পূর্বে পশ্চিমে আপন অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করিয়া দাও—আজ বাঙলাদেশের সমস্ত ছায়াতরুনিবিড় গ্রামগুলির উপর এতক্ষণে যে শারদ আকাশে একাদশীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্নাধারা ঢালিয়া দিয়াছে, সেই নিস্তব্ধ শুচিরুচির সন্ধ্যাকাশে তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের 'বন্দে মাতরম্' গীতধ্বনি এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাক।"

রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে পরিচিত 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' (প্রথম প্রকাশ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রমে, ১২৮৬ সাল) গানটিতে কবি এই সময়েই 'বন্দে মাতরম্' শব্দটি যোজনা করেন। বন্দে মাতরম্ ধুয়াযুক্ত গানটি

স্বরলিপিসহ জ্যোতিরিন্দ্রনাথসম্পাদিত সংগীতপ্রকাশিকার ১৩১২ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। জনৈক অজ্ঞাত কবির একটি গান প্রসঙ্গত স্মরণীয়—

আমরা গাব সবে বন্দে মাতরম্
মরলে পরে অমর হব পাব স্বর্গ অনুপম।
ছিনু ঘুমঘোরে সুখশয়নে
কে যেন ও সুধা ঢালিল কানে
অমনি মরমে পশিল জাগাইয়া
তুলিল ঘুচাইল চিত্তভ্রম ॥ .....

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের পূর্বে উল্লিখিত একখানি জনপ্রিয় গানেও এই বন্দে মাতরম্ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়—

মা গো যায় যেন জীবন চলে
শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে বন্দে মাতরম্ বলে।...

অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে মুকুন্দদাসের কয়েকটি জনপ্রিয় গানেও বন্দে মাতরম্ শব্দের বহুল প্রয়োগ ঘটেছে। তাঁর পল্লীসেবা যাত্রার একাধিক গানে এই শব্দটি আছে। যথা,

জাগো ভারতবাসী রে, কত ঘুমে রবে রে
বল সবে হয়ে একমন বন্দে মারতম্।

অথবা, আর একটি গান—ভারতসন্তান নিয়ে মায়ের নাম
হও আগুয়ান নাচবে এ প্রাণ
নাম মধুরম্
বন্দে মাতরম্ ॥

অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাঙলা দেশাত্মবোধক কাব্যগীতে আরও বিপুলভাবে বন্দে মাতরম্ শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

১০

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমসাময়িক এবং পরবর্তী আরও কয়েকজন গীতিকারের মধ্যে প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, কামিনীকুমার ভট্টাচার্য, কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও বিজয়চন্দ্র মজুমদার কাব্যগীত রচনায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত কবি ও গীতিকার ছিলেন, তাঁর সংগীতে নিবিড় দেশপ্রেম সাময়িকতার ঊর্ধ্বচারী ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। বন্দে মাতরম্ সংগীতে শারদীয়া দেবীপ্রতিমাকে স্বদেশমাতৃকার সঙ্গে একাত্ম করে দেওয়ার যে পদ্ধতির কথা

পূর্বে বলা হয়েছে, প্রমথনাথের কয়েকটি গানে তার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রমথনাথ রামপ্রসাদের শ্যামাকে দেশমাতার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন—

তুই মা মোদের জগৎ-আলো
সুখে দুখে হাসিমুখে আঁধারে দীপ তুমিই জ্বালো।
মা বলে মা ডাকলে তোরে
সারাটি প্রাণ ওঠে ভরে
বেসেছি মা তোরেই ভাল,
তোরেই যেন বাসি ভালো।…

অনুমান করা অসংগত নয়, প্রমথনাথের কাব্যগুলিতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের স্পন্দন লেগেছিল।[৩১] তাই সেগুলির বাণী ভাব ও প্রকাশসৌষ্ঠবে সমকালীন সংগীতকার রবীন্দ্রনাথ-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যগীতির প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। যেমন কাফি খাম্বাজ ঝাঁপতালে রচিত এই সুন্দর কাব্যগীতিটি—

হরিৎ বসনপরা গগন চুমি স্বরগভূমি
চরণে চুমি ধরা।
মরমতল বিদ্ধ করি দিতেছ মরি শুভ বিতরি
ধনধান্য ভরা।
আঁধার রাতি তোমার বাতি পাথারে আলো-করা
পুলকিতচিত সোহাগে যে মাগো
দেবতাসম শিয়রে মম কী লাগি জাগো,
শ্যামলহিয়া সঞ্চারিত উথলে গীত অতি ললিত
তোমারই দুঃখহরা
অযুত ঘরে ভকতি ভরে পূজিত তব ভরা॥

'বাঙ্গালীর গানে' প্রমথনাথের আরও কয়েকটি উৎকৃষ্ট স্বদেশবন্দনাগীত আছে। কোনোটি বঙ্গভূমির মহিমা-গৌরবে ঘনকণ্ঠ, কোনোটি মিলনানন্দে মুখরিতবাক্। যেমন মিশ্র বারোঁয়ায়—

নমঃ বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনী
যুগে যুগে জননী লোকপালিনী।
সুদূর নীলাম্বরপ্রান্ত সঙ্গে
নীলিমা তব মিশিতেছে রঙ্গে,
চুমি পদধূলি বহে নদীগুলি
রূপসী শ্রেয়সী হিতকারিণী॥…

মিশ্র খাম্বাজে রচিত একটি মিলনসংগীত—

> শুভদিনে শুভক্ষণে গাহ আজি জয়
> গাহ জয় গাহ জয় মাতৃভূমির জয়।
> জন্মভূমির জয় স্বর্ণভূমির জয়
> পুণ্যভূমির জয়, মাতৃভূমিব জয়।...

পূর্ববঙ্গের বিদ্যাসাগর নামে পরিচিত, বান্ধবসম্পাদক, প্রবন্ধকার, বহুভাষাবিদ্ চিন্তাশীল লেখক কালীপ্রসন্ন ঘোষ কবি ছিলেন না, কিন্তু অনেকগুলি দেশাত্মবোধক গান লিখেছেন। 'বাঙ্গালীর গান' সংকলনে তাঁর ১৪৭টি গানের মধ্যে তিনটি স্বদেশী গান এবং অনেকগুলি দেশাত্মবোধক গীতসংকলনেই গানগুলি উদ্ধৃত হয়েছিল। 'ভারতীয় সংগীত মুক্তাবলী'তে তাঁর একটি ভারতসংগীত সংকলিত হয়েছে—

> গাও রে ভারতসংগীত সবে প্রাণ ভরে
> ভারতীর আরতিতে ভক্তিপূত বীণা-করে।
> মিলি আজ প্রাণে প্রাণে জনমতীর্থস্থানে
> জননীর নামগানে ভাস আনন্দসাগরে॥

উপেন্দ্রনাথ দাস তাঁর 'জাতীয় সংগীতে' কালীপ্রসন্নের যে গানটি উদ্ধৃত করেছেন, সেটিতে স্বদেশপ্রীতির সঙ্গে স্নিগ্ধ ভক্তি মিশ্রিত হয়ে এক প্রশান্ত কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে—

> জননী জন্মভূমি স্বর্গ তুমি মহীতলে
> পূজিব পা দুখানি আজি মোরা অশ্রুজলে।
> আমরা অভাজন জানি না মা কেমন
> তবু মা পালিয়েছ অন্নজলে রাখি কোলে।
> নাহি মা অঙ্গে বস্ত্র, সম্বল অশ্রুজল
> দিব তাই ভক্তিফুলে শ্যামল পদকমলে
> হৃদয়ের ছিন্নতারে ডাকি আজ মা তোমারে
> হৃদয়ে ভাত তুমি ফুল্ল শ্বেতশতদলে॥

'সংগীতসারসংগ্রহে'ও কালীপ্রসন্নের এই গানগুলি স্থান পেয়েছে। তাছাড়া নটবেহাগ সুরে তাঁর 'নীরবে ভারতে কেন ভারতীর বীণা' এবং কাফিসুরে রচিত 'উর গো বাণী বীণাপাণি উর গো কমলকাননে' এই গান দুটি ভারতীর আরাধনামূলক হলেও ভারতজননীর আবাহনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে।

কামিনীকুমার ভট্টাচার্যের নাম বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তী বাঙলাদেশে

অন্যতম বলিষ্ঠ জাতীয় সংগীতের রচয়িতা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। তাঁর পূরবী মিশ্র একতালায় রচিত এই গান বহু বৎসর পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ছিল বলে জানা যায়—৩২

শাসন-সংযত কণ্ঠ জননি! গাহিতে পারি না গান,
তাই মরম-বেদন লুকাই মরমে আঁধারে ঢাকি মা প্রাণ।
সহি প্রতিদিন কোটি অত্যাচার কোটি পদাঘাত কোটি অবিচার,
তবু হাসিমুখে বলি বারবার সুখী কেবা আর মোদের সমান?…
শোষণে শূন্য কমলাভাণ্ডার গৃহে গৃহে মর্মভেদী হাহাকার,
যে বলে এ কথা অপরাধ তার, হায় হায় একি কঠোর বিধান!
না জানি জননি! কতদিন আর নীরবে সহিব হেন অত্যাচার,
উঠিবে কি কভু বাজিয়া আবার স্বাধীন ভারতে বিজয়বিষাণ?

কখনও কবি নির্জীব ভারতবাসীকে শক্তিমন্ত্রে উজ্জীবিত করার জন্য এবং অত্যাচারীকে নিধন করার জন্য অভিনব ভঙ্গিতে আহ্বান করেছেন নবযুগের চক্রধারীকে—

অবনত ভারত চাহে তোমারে এস সুদর্শনধারী মুরারি
নবীনতন্ত্রে নবীন মন্ত্রে কর দীক্ষিত ভারতনরনারী॥…

একটি জাগরণগীতে কামিনীকুমার মাতৃমন্দিরে সমাগত সম্মিলিত দেশবাসীর নামে ভারতজননীর দৈন্যদশা দূরীকরণের আহ্বান জানিয়েছেন—

জাগো ওগো কাঙালিনী জননী
তব কুটিরদ্বারে আজি মিলিত সন্তানগণ,
দেশদেশান্তরে করি অনুসন্ধান কুসুমচন্দন
এনেছি জননী পূজিতে তব চরণ,
মঙ্গলমন্ত্রে হিন্দু মুসলমান বিস্মৃত গর্ব ভেদঅভিমান
নব আশা পুলকিত প্রাণ।
দেহি নবশিক্ষা নবদীক্ষা জননি! মেলি মুদিত নয়ন
কর আশিস তুমি পুণ্যপাণি শুনাও নন্দনে তব অভয়বাণী…
পুলক উৎসবে হোক পরিপূরিত তব দীন ভবন॥

বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একদা যে ক্ষণস্থায়ী আপোষমূলক মনোভাব, ইংরেজ রাজশক্তির সঙ্গে যে আবেদন-নিবেদনের গ্লানিজনক ব্যাপার গড়ে উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথের 'তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ' গানটির অন্তরালে নিহিত সেই নেপথ্য বিবরণ অনেকেরই জানা আছে। সেই মনোভাবের

বিরুদ্ধে কামিনীকুমারও ভৈরবী মিশ্র ঠুংরির সুরে এই গান রচনা করে তাঁর নির্ভীক স্বদেশপ্রীতির পরিচয় দান করেছেন--

সোনার স্বপনমোহে ভুলিও না ভাই সাধন।
এ যে আলেয়ার আলো মায়ামরীচিকা আশ্বাসঢাকা ছলনা।
ওদের রুদ্ধ দুয়ারে করি করাঘাত পেয়েছ কবে বেদনা
ওরা বুঝিল কি তব ধর্মকাহিনী বুঝিল কি তব যাতনা ?
ওরা ঘৃণা করে মোদের বর্ণ মোদের আহ্বানে বধির কর্ণ
তুচ্ছ ফুৎকারে দেয় ভেঙেচুরে সকল সঞ্চিত কামনা।
ওরা মোদের দৈন্যে করি পরিহাস কেড়ে নিতে চায় মুখের গ্রাস ;
তবু যুক্ত করে ওদের দুয়ারে কেন নিত্য নিষ্ফল যাচনা ?
এখন আপনার পানে ফিরাও নয়ন, জাগাও আপন শক্তি,
পরের চরণ না করি লেহন, কর আপনার মায়েরে ভক্তি।
তবে জাগিবে নবীন রঙ্গে নবজীবন নববঙ্গে,
বিশ্ব কাঁপিয়ে উঠিবে বাজিয়া রুদ্র বিজয়বাজনা॥

কামিনীকুমার হিন্দিতেও দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছিলেন।[৩৩]

১১

এইবার সংক্ষেপে সমকালীন অপ্রধান গীতিকারদের কয়েকটি দেশাত্মবোধক কাব্যসংগীত ও বিবিধ প্রসঙ্গের উল্লেখ করা যেতে পারে। সামাজিক গার্হস্থ্য উপন্যাসের লেখক, আর্যদর্শনের সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাহানা ঝাঁপতালে একটি সংগীতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তী বাঙলাদেশে যে স্বদেশী দ্রব্য নির্মাণ ও ব্যবহারের জাতীয় প্রেরণা লক্ষ্য করেছিলেন, তাঁরই মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাবলম্বিতা ও রাষ্ট্রীয় মুক্তির ব্যাপক স্বপ্ন দেখেছেন—

দুখনিশি প্রভাতিল উদিল সুখতপন
থেকো নাকো আর কেহ ঘুমঘোরে অচেতন।
স্বদেশী স্বদেশী রব ঐ শুনহে নিরন্তর
একতায় প্রাণ মাতায় এতো নয় স্বপন।
যাহা আশা করি নাই স্বচক্ষে দেখেছি তাই
ভাই ভাই এক ঠাঁই হিন্দু মুসলমান মিলন।
উড়ায়ে কালপতাকা চলছে যেন একতা
মার অঙ্গচ্ছেদে আজ পুত্রের কাঁদিছে প্রাণ।

একি সামান্য হুজুগ না আনিবে সত্যযুগ
জয় ভারতের জয় রবে পুরিবে ভুবন ॥

বঙ্গভাষার প্রতি সুনিবিড় মমতাও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমকালীন কয়েকটি গানে লক্ষ্য করা যায়। মাতৃভাষার প্রতি নিধুবাবু আমাদের গর্ব প্রথম উদ্‌বোধিত করার পর এই বিষয়ে কবিতায় ঈশ্বর গুপ্ত বাঙালির চৈতন্য উদ্রেক করেছিলেন। গদ্যে মাতৃভাষার প্রতি সে যুগের অনেক দেশনায়কই গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন, কিন্তু সংগীতে বিশেষ নয়। আনন্দচন্দ্র মিত্র বঙ্গভাষা বিষয়ে একটি গান রচনা করেছিলেন—

একাকী কাননে বসি কে তুমি বল রমণী
স্বভাবসুন্দর অতি নবরসে রসবতী
শত কোটি চন্দ্র জিনি প্রভাময় মুখখানি।
নাহি কোনো অলংকার মণিমুক্তা চন্দ্রহার
লাবণ্য তবু অপার বনফুলে সুশোভিনী
বিষাদে মলিনবেশ বল কি ভাবিছ বসে
নয়নজলে যাও ভেসে কোন দুঃখে বিনোদিনী
ছাড় ঐ জীর্ণ বাঁশি ত্বরা লহ মাল্য অসি
আমি যাহা ভালবাসি সাজ রণবিলাসিনী।
পথিক বলে মাতৃভাষা, হায় তোমার এ দুর্দশা
কত দিনে মনের আশা পূর্ণ হবে নাহি জানি ॥

পরবর্তী কালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত 'জননী বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান' এবং অতুলপ্রসাদ সেনের 'মোদের গরব মোদের আশা আ-মরি বাংলা ভাষা' গান দুটিও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। প্রহসনকার অমৃতলাল বসু সংগীতকার হিসাবে পরিচিত না হলেও যে জাতীয় ভাবোচ্ছ্বাসে এই শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলার বহু মনীষী সাহিত্যিক স্বদেশসংগীত লিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, সেই উদ্বেল উচ্ছ্বাসে তিনিও বঙ্গব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে এই গানটি রচনা করেছিলেন—

ওরা জোর করে দেয় দিক না বঙ্গ বলিদান
আমরা রব অন্তরঙ্গ এক অঙ্গে মনের সঙ্গে মিশিয়ে প্রাণ।
আমরা জাত বাঙালি প্রেমকাঙালি
ভাবছিস তোরা মন ভাঙালি
তা নয় জালিয়ে আগুন করে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলি প্রাণের টান ॥

বস্তুত বঙ্গচ্ছেদ-বেদনা বাঙালির জাতীয় জীবনে সেদিন মহৎ উপকার করেছিল। অন্তত এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সর্বস্তরের দেশবাসী নববলে বলীয়ান ও ঐক্য-মন্ত্রে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। তাই বিশ শতকের প্রথম দশকের বঙ্গীয় জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "সংঘশক্তির জাগরণ ও আত্মশক্তির উদ্বোধন হইতেছে এ যুগের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য"[৩৪]। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনই[৩৫] প্রধানত তার প্রেরণা ছিল সন্দেহ নেই। মাতৃঅঙ্গের ব্যবচ্ছেদ রোধ করার সর্ববল সংগ্রামে বাঙালি সমস্ত সংকীর্ণ বর্ণভেদ বৃত্তিবৈষম্য বিস্মৃত হয়ে অন্তত সাময়িকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, জাতীয় শিল্প-সংস্কৃতি-বাণিজ্য-ব্যবসায় নতুন মূল্য নিয়ে দেখা দিয়েছিল, আমাদের স্বদেশচেতনা দৃঢ়ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাঙলার তৎকালীন কাব্যসংগীতগুলি সেই স্বর্ণপ্রসূ উত্তেজনার স্মারক হয়ে আজ জীর্ণ পাণ্ডুর সংকলনগুলিতে নিমীলিত রয়েছে। সে যুগের যাবতীয় পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধে-বক্তৃতায়-আলোচনায়-সংগীতে জাতীয়তা স্বাদেশিকতা নেশান স্বরাজ প্রভৃতি শব্দ গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' (১৯০৪), বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথের 'দেশের কথা' (১৩১১ শ্রাবণ), 'স্বদেশী সমাজ' (১৩১১ ভাদ্র), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' (বঙ্গদর্শন ১৩১২ পৌষ) এই পর্যায়ের কতকগুলি বিশিষ্ট রচনা। সখারাম দেউস্কর তাঁর 'দেশের কথা' গ্রন্থে ইংরাজ আমলে দেশীয় বাণিজ্যের যে বিপুল সর্বনাশ সাধিত হয়েছে তার আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ করেন এবং ইতিপূর্বে উদ্ধৃত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের গানে তারই পুনর্বিবৃতি লক্ষ্য করি। মনোমোহন বসু তাঁর বহু গীতেই বিদেশী যন্ত্রবিদ্যায় উন্নতির প্রতি কটাক্ষ করে স্বদেশীয় বাণিজ্যসমৃদ্ধির ঘোষণা জানিয়েছিলেন। দেশী শিল্পের ধ্বংস ও বিদেশী শিল্পের প্রসারে যাঁরা ত্রস্ত করেছিলেন, তাঁদের সেই শঙ্কা ও স্বদেশী শিল্প-পুনরুজ্জীবনের আশাবাদ মনোমোহনের কণ্ঠে বারবার উদ্‌গীত হয়েছে—

> তাঁতী কর্মকার করে হাহাকার
> সুতা জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার
> দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় না আর
> হল দেশের কী দুর্দিন।……
> ছুঁচ সুতা পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে
> দিয়াশালাই কাঠি তাও আসে পোতে
> প্রদীপটি জ্বালিতে খেতে শুতে যেতে
> কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।[৩৬]

বঙ্গবিভাগ আইন পাশ হওয়ার পর থেকেই বিদেশী দ্রব্য বর্জনের প্রবণতা সংক্রামক ব্যাধির মত দেশের সর্বত্র আগ্নেয় উত্তেজনায় ছড়িয়ে পড়ে। সেকালের স্বদেশী গানগুলি এই কর্মযজ্ঞের ইন্ধন ছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যিনি বয়কটকে মনে প্রাণে কোনদিনই সর্বাত্মকভাবে সমর্থন করেননি, তিনি তাঁর 'আমার সোনার বাঙলা' গানে লিখেছিলেন, 'আমি পরের ঘরে কিনব না আর ভূষণ বলে গলার ফাঁসি'। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর অপূর্বপরিকল্পিত 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'য় এই বর্জন-উৎসবের শাস্ত্রীয় বিধিনির্দেশ করলেন --

"প্রতি বৎসর আশ্বিনে বঙ্গবিভাগের দিনে বঙ্গের গৃহিণীগণ বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। সেদিন অরন্ধন। দেবসেবা ও রোগীর ও শিশুর সেবা ব্যতীত অন্য উপলক্ষে গৃহে উনুন জ্বলিবে না। ফলমূল চিড়ামুড়ি অথবা পূর্বদিনের রাঁধাভাত ভোজন চলিবে।

পরিবারস্থ নারীগণ যথারীতি ঘটস্থাপন করিয়া ঘটের পার্শ্বে উপবেশন করিবেন। বিধবারা ললাটে চন্দন ও সধবারা সিন্দূর লইবেন। হরীতকী বা সুপারি হাতে লইয়া বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনিবেন। কথাশেষে বালকেরা শঙ্খধ্বনি করিলে পর ঘটে প্রণাম করিবেন। প্রণামান্তে বামহস্তের (বালকেরা দক্ষিণ হস্তের) প্রকোষ্ঠে স্বদেশী কার্পাসের বা রেশমের হরিদ্রারঞ্জিত সূত্রে পরস্পর রাখী বাঁধিয়া দিবেন। রাখীবন্ধনের সময় শঙ্খধ্বনি হইবে। তৎপরে পাটালি প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। সংবৎসরকাল যথাসাধ্য বিদেশী বিশেষত বিলাতী দ্রব্য বর্জন করিবেন। সাধ্যপক্ষে প্রতিদিন গৃহকর্ম আরম্ভের পূর্বে লক্ষ্মীর ঘটে মুষ্টিভিক্ষা রাখিবেন এবং মাসান্তে বা বৎসরান্তে উহা কোনোরূপ মায়ের কাজে বিনিয়োগ করিবেন।"

রবীন্দ্রনাথের 'বাঙলার মাটি বাঙলার জল' সংগীত ছিল এই অনুষ্ঠানের মন্ত্রগীত, আর এর প্রতিজ্ঞা ছিল এইরূপ—

"মা লক্ষ্মী কৃপা কর। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেব না। শাঁখা থাকতে চুড়ি পরব না। ঘরের থাকতে পরের নেব না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করব না। ভিক্ষার ধন হাতে তুলব না। মোটা অন্ন ভোজন করব। মোটা বসন অঙ্গে নেব। মোটা ভূষণ আভরণ করব। পড়শীকে খাইয়ে নিজে খাব। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক। মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোক। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় থাকুন।"

৭ই আগস্ট থেকে দেশের সর্বত্র সুরু হল বয়কট[৩৭] বিদেশী দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় বর্জন এবং স্বদেশী শিল্পদ্রব্যের ফেরি ও স্বদেশী সংগীত গেয়ে বেড়ানো।

রামেন্দ্রসুন্দরের বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথার গীতরূপ দিলেন রজনীকান্ত সেন তাঁর এই সংকীর্তনে—

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই
দীনদুখিনী মা যে তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই।
সেই মোটা সুতোর সঙ্গে মায়ের অপার স্নেহ দেখতে পাই ;
আমরা এমনি পাষাণ তাই ফেলে অই পরের দোরে ভিক্ষা চাই।
ওইও দুঃখী মায়ের ঘরে তোদের সবার প্রচুর অন্ন নাই ;
তবু তাই বেচে কাঁচ সাবান মোজা কিনে করলি ঘর বোঝাই।
আয়রে আমার মায়ের নামে এই প্রতিজ্ঞা করব ভাই,
পরের জিনিস কিনবো না যদি মায়েব ঘরে জিনিস পাই॥

রজনীকান্তের স্বদেশী গান রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ গানগুলিব মত কাব্যধর্মে সুচারু নয়—মোটামুটি তিনি স্থূল গণচেতনাকে আন্তরিকতার দ্বারা স্পর্শ করেছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর থেকে আমাদের দেশে স্বদেশী চেতনার ক্রমবর্ধমান প্রসার, বিদেশী দ্রব্যবর্জনের সংকল্প, জাতীয় শিল্পের পুনরুদ্‌বোধন, স্বদেশী দ্রব্যব্যবহারের উৎসাহবৃদ্ধি ইত্যাদি ব্যাপারেই তাঁর গানগুলি নিবেদিত। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড' নিতান্তই উদ্দেশ্যমূলক ও প্রচারোপলক্ষে বচিত। তবু এই সকল গানের জনপ্রিয়তায় প্রমাণিত হয়, রজনীকান্ত তাঁর সুর ও ছন্দের দ্বারা সাধারণের দ্বারে উপনীত হয়েছিলেন। তিনি সে যুগেব চারণ কবির ভূমিকায় বাঙলার তাঁতশিল্পীদের স্বয়ংনির্ভর এবং কর্তব্যসচেতন করতে চেয়েছিলেন—

রে তাঁতী ভাই একটা কথা মন দিয়ে শুনিস।
ঘরের তাঁত যে কটা আছে রে তোরা স্ত্রী পুরুষে বুনিস।
এবার যে ভাই তোদের পালা ঘরে বসে কযে মাকু চালা,
ওদের কলের কাপড় বিশ হবে রে না হয় তোদের হবে উনিশ।
তোদের সেই পুরনো তাঁতে কাপড় বুনে দিবি নিজের হাতে ;
আমরা মাথায় করে নিয়ে যাব রে, টাকা ঘরে গুনিস।

এই আহ্বানে কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনও উদাসীন থাকেননি। তাঁর একটি গানের উদাহরণ—

হিন্দু মুসলমান হয়ে এক প্রাণ
এস পুজি মার চরণ দুখানি,
মর্মে বাজে ব্যথা জন্মভূমি মাতা
আমাদের দোষে আজ কাঙালিনি।...

বর্ষশস্যে হয় ত্রিবর্ষ যাপন
বর্ষে বর্ষে তায় দুর্ভিক্ষ পীড়ন
কারে বা বলিব কে বুঝে বেদন
কেহ নাই আর বিনা কাত্যায়নী।

এই দীর্ঘ সংগীতের মধ্য দিয়ে দেবেন্দ্রনাথ বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথাই প্রচার করেছেন—

ব্রতের নিয়ম শুন দিয়া মন
'একতা সংযম অতি প্রয়োজন,
স্বদেশ-বাণিজ্যে উন্নতিসাধন'
ভুল না একথা মূল মন্ত্র জানি।
স্বদেশী দ্রব্যেতে জীবনযাপন
প্রতি জনে কর প্রতিজ্ঞা এখন
প্রতি ঘরে ঘরে লহ সমাদরে
স্বদেশীয় দ্রব্য উপাদেয় মানি।

একথা অবশ্যই সত্য যে বাঙলার তাঁতশিল্প বয়নবস্ত্রাদি যে পরিমাণে সেদিন বাঙালির অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিল, তার চেয়ে বেশি স্থান পেয়েছিল কাব্যসংগীতে। বিজয়চন্দ্র মজুমদার গাইলেন—

যাব না আর যাব না ভিক্ষে নিতে পরের দোরে
আছে যা অশনবসন তাই খাব তাই থাকবে পরে ॥···

নাট্যকার-গীতিকার গিরিশচন্দ্রের একটি সহযোগী কণ্ঠ বিপুল ভিড়েও হারিয়ে যাবার নয়—

স্বদেশী কাপড় নিতে পেছিয়ো না ভাই দু পাই দিতে
হার হবে না যাবে জিতে দেশের টাকা যাবে রয়ে।
ভয় করো না চড়া দরে শস্তা হবে দুদিন পরে
তাঁত বসেছে ঘরে ঘরে শস্তা কাপড় দেবে বয়ে।

সেদিন কবিরাই যেন স্বয়ং কাঁধে স্বদেশী বস্ত্রের বোঝা নিয়ে পথে বেরিয়েছিলেন। অনুরূপ উদ্দেশ্যে ভ্রাম্যমাণ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রেরণা দানের উপলক্ষেই যে এগুলি লেখা হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। গিরিজাকুমার বসুর একটি গানের অংশ—

হউক মলিন তবু চিরদিন অভিমান-মদ ভুলিয়া
তোমারই বসনে ঘুচাইব লাজ নত শিরে লব তুলিয়া।

অজ্ঞাত একটি কবিকণ্ঠ এই স্বদেশী বস্ত্রকে অঙ্গাবরণ করার জন্য গৃহলক্ষ্মীদের নিকট সর্বাগ্রে মিনতি জানিয়েছেন। অন্তঃপুরচারিণীরা যেন এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন—

মোটা দেশী বস্ত্রে আচ্ছাদিয়া
কাঙালিনী বেশে করিব পণ……
ছুঁইব না আর বিলাতি বিলাস
পরিব না আর বিলাতি সাজ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বপ্নময়ী নাটকে সংযোজিত রবীন্দ্রনাথের কৈশোর রচনা 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' গানটি জনপ্রিয় হয়েছিল। এই গানটির সুর অবলম্বনে জনৈক সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন—

ওঠ রে ওঠ রে ওঠ রে তোরা
হিন্দু মুসলমান সকলে ভাই,…
রাজদ্বারে আর নাহি প্রতিকার
আপনার পায়ে দাঁড়া রে ভাই।
নগরে নগরে জ্বাল রে আগুন
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ,
বিলাতি জিনিসে কর পদাঘাত,
মায়ের দুর্দশা ঘুচা রে ভাই ॥…

১২

দেশাত্মবোধক গীতসংকলনগুলির অবশ্য মধ্যে সুরাশ্রিত নয় এমন রচনারও অভাব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সরলাদেবী দ্বিজেন্দ্রলালের মত সে যুগে সকলেই যুগপৎ যৌথ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না, সুতরাং গানের সুরের জন্য তাঁদের পরনির্ভরশীল হতেই হত। অবশ্য সুরের গুণে রচনার জনপ্রিয়তা নিশ্চিন্ত হলেও অধিকাংশ রচনা কাব্যধর্মে কবিনামেই জীবিত আছে, তাঁদের সুরকারদের নাম হারিয়ে গেছে। হিন্দুমেলায় যে সব গান জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, সেইগুলির অধিকাংশই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি বা তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গায়কদের দ্বারাই সুরারোপিত হয়েছিল, এমন মনে করার কারণ আছে। ঠাকুরপরিবারের কবিবৃন্দের নিজস্ব সাংগীতিক প্রতিভা ছিল। অন্যান্য কবিদের মধ্যেও কেউ কেউ স্বরচিত গানে সুরারোপ করার অধিকারী ছিলেন, যেমন প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, কাঙাল ফিকিরচাঁদ। কিন্তু বেশির ভাগ

ক্ষেত্রে কবি ও সুরকার পৃথক ব্যক্তি ছিলেন বলেই বিশ্বাস। কত বিস্মৃতনাম সুরস্রষ্টা সেকালে স্মরণীয় কাব্যপংক্তি সুরের জাদুতেই জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। রঙ্গলালের 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়', হেমচন্দ্রের ভারতসংগীত—এগুলি অপরের দ্বারাই সুরারোপিত হয়েছিল। সরলা দেবীর একটি প্রবন্ধে জানা যায়, হেমচন্দ্রের ভারতসংগীতে সুর দিয়েছিলেন কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।[৩৮] রবীন্দ্রনাথ ও সরলাদেবী উভয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ গানে সুর দিয়েছিলেন। ঠাকুর পরিবারের বহু গানেই হয়ত এঁদের সুর আছে। তবে সত্যেন্দ্রনাথের 'মিলে সব ভারতসন্তান' গানটিতে রবীন্দ্রনাথ সুর দিয়েছিলেন বলে অনেকের যে ধারণা আছে, তা ভ্রমাত্মক।[৩৯] কারণ ১২৭৯ চৈত্রের বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র এই গানের প্রশংসা করেছিলেন, পূর্বেই বলা হয়েছে। তখন রবীন্দ্রনাথ মাত্র এগারো বৎসরের বালক। এই গানের সুর যে রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত নয়, ইন্দিরা দেবীও সে কথা বলেছেন।[৪০]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমকালীন সংগীতগ্রন্থগুলিতে এমন অনেকগুলি কবিতা আছে যেগুলি যথার্থই সুরারোপিত হয়ে গানে পরিণত হয়েছিল কিনা সন্দেহের বিষয়। ইতিপূর্বে উল্লিখিত যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'বন্দেমাতরম্' নামক সংকলনে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত কবিতাগুলি গান হিসাবে গ্রন্থভুক্ত কিন্তু এগুলির সুরসংযোজনার কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই—

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—রাখীসংগীত (কি আনন্দ আজ ভারতভুবনে)
গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী—রাখীবন্ধন (আজিকার দিনে স্মরিয়া মায়ের মুখ)
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—জন্মভূমি (ইন্দ্রের অমরাবতী ভোগেতে না হয় মতি)
মধুসূদন দত্ত—আমরা (আকাশ পরশি গিরি)[৪১]
গিরীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—ভারতবর্ষ (বিরাট কিরীট হিমানি আবরি)
যোগীন্দ্রনাথ বসু—ভারতবর্ষের মানচিত্র (শিক্ষক। দেখ বৎস। সম্মুখেতে প্রসারিত তব)

রবীন্দ্রনাথ—শরৎ (আজি কি তোমার মধুর মুরতি), ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ (যে তোমারে দূরে রাখি)

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—শারদগীতি (আজি সুজলা সুফলা)

নবীনচন্দ্র সেন—কুলাঙ্গার (আর্য আজি এ ভারতে), হায় মা (হায় মা ভারতভূমি)

রজনীকান্ত—জন্মভূমি (শ্যামল শস্যভরা)

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কালচক্র (বারেক এখনও ফিরে দেখিবি না চাহিয়া)

ভারতী পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত অজ্ঞাত কবির রচনা—স্বদেশের প্রতি (হে মোর স্বদেশ)

শিবনাথ শাস্ত্রী—উৎসর্গ (অরুণ উদিল জাগিল অবনী), গভীর নিশীথে (গভীর রজনী ডুবেছে ধরণী)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—উৎসাহ অনল (জ্বালাও ভারতহৃদে উৎসাহ অনল)

দীনেশচরণ বসু—বীণা (বাজরে গম্ভীরে বীণা একবার)

হেমচন্দ্র—ভারতভিক্ষা ('যুবরাজের কলিকাতা আগমন উপলক্ষে রচিত')

রবীন্দ্রনাথ—নববর্ষের গান (হে ভারত আজি তোমার সভায়)

স্থ [?]—উপনয়ন (আজি ভগ্ন দেবালয়ে)

কামিনী রায়—মা আমার (যেইদিন ও চরণে), আশার স্বপন (তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন)

রমণীমোহন ঘোষ—আহ্বান (ওই শোন ওই শোন সকরুণ মায়ের আহ্বান)

বিজয়চন্দ্র মজুমদার—প্রভাত (আবৃত নভ নিবিড় ঘনে)

রমণীমোহন ঘোষ—আশ্রয় (সন্ধ্যা আসিছে মন্দ চরণে)

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—সন্ধিক্ষণ (এতদিনে এতদিনে বুঝেছে বাঙালি)

গিরিজাকুমার বসু—উদ্বোধন (ঘুচাতে তোমার দৈন্য আজি মা)

যোগীন্দ্রনাথ বসু—ব্রতধারণ (যুগান্তের পাপভার ঘুচিয়াছে এইবার)

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়—আশীর্বাণী (লভি অক্ষয় আয়ু)

অজ্ঞাতনামা—নারীর পণ (কে কি আনিয়াছে বলগো ভগিনী)

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী—(চিরমাতা তুমি যদি হতে ব্যর্থ মরুভূ ঊষর)

রমণীমোহন ঘোষ—সুপ্রভাত (হয়েছে রে শেষ নিবিড় তিমির পুঞ্জিত)

গীতরূপে পূর্বপ্রসঙ্গে আলোচিত হলেও অনেকগুলি রচনা যে বিশুদ্ধ কবিতা তাতে সন্দেহ নেই। জলধর সেন সংকলিত 'জাতীয় উচ্ছ্বাস' গ্রন্থেও রবীন্দ্রনাথের 'শরৎ' এবং 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' কবিতা দুটি স্থান পেয়েছে, যদিও গান বলে এইগুলি পরিচিত নয়। 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' কল্পনার অন্তর্গত কবিতা কিন্তু 'জাতীয় উচ্ছ্বাস' বা 'বন্দে মাতরম' সংকলনে এর যে পাঠ প্রকাশিত হয়েছে, তা ঈষৎ সংক্ষেপিত। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের একাধিক জাতীয় সংগীতসংকলনেও গানটি পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' গানরূপে নিম্নলিখিত গানের সংকলনগুলিতে আছে—

মাতৃপূজা—এইচ বসু (১৩১২)

স্বদেশী সংগীত—নরেন্দ্রকুমার শীল (১৩১৪)

স্বরাজ সংগীত—মডেল লাইব্রেরি, ময়মনসিংহ (১৯২১)

মায়ের বোধন—ময়মনসিংহ (১৯২১)

মাতৃমন্ত্র ময়মনসিংহ (১৯২১)

সরলা দেবীর 'শতগান' (প্রথম সংস্করণ ১৯০০, তৃতীয় সংস্করণ ১৯২৩) স্বরলিপিগ্রন্থে প্রদত্ত তথ্যে অনেক ভুল থাকলেও এই বইটির সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, 'অতীতগৌরব-বাহিনি মম বাণী' সরলা দেবীর এই গানটিতে রচয়িত্রী স্বয়ং সুর দিয়েছিলেন। 'বন্দি তোমায় ভারতজননী'ও সরলা দেবীর সুরে সমৃদ্ধ। গোবিন্দচন্দ্র রায়ের 'কতকাল পরে বল ভারত রে' প্রচলিত সুরে রচিত। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং তাঁর 'মলিনমুখচন্দ্রমা' গানের সুরকার। স্বর্ণকুমারীর জাতীয় গীত 'কি আলোকজ্যোতি আঁধার মাঝারে' রবীন্দ্রনাথের 'একি অন্ধকার এ ভারতভূমি'র সুরে রচিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'চলরে চল সবে ভারতসন্তান' গানটিও প্রচলিত সুরে রচিত।

১৩

বাঙলা দেশাত্মবোধক গানের পরবর্তী অধ্যায় ১৯২১-২২ সালে, অসহযোগ আন্দোলনের পর্বে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের তুলনায় এই যুগের স্বদেশপ্রেম আরও উত্তেজক, বহুমুখী, সংগ্রামী, বহুনেতৃত্ব-নির্ভর এবং জটিল, ফলে এই সময় থেকে বাঙলা স্বদেশপ্রেমের গানেও নানা কণ্ঠ নানা সুর মিশেছে। আন্দোলন শহর থেকে গ্রামে জনপদে ছড়িয়ে পড়েছে, দমননীতি দুর্বারতর হয়েছে, সমবেত কণ্ঠ হয়েছে উত্তালতর। মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে ভারতব্যাপ্ত অসহযোগিতার নীতি ও আন্দোলন বাঙলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলকে পর্যন্ত বিচলিত করেছে। দেশাত্মবোধক কাব্যসংগীতের এই পর্বে প্রাপ্ত গীতসংকলনের সংখ্যা তাই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালীন সংখ্যার চেয়ে বেশি। তবে এই পর্বের দেশপ্রেমী সংগীতের আলোচনায় দুটি তথ্য মনে রাখা দরকার। প্রথমত, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বে বা সমকালে যে সব স্বদেশী গান জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, এই যুগে সেইগুলিই নতুন করে পুনঃপ্রচারিত হয়েছে এবং অনেকগুলি এই সময় থেকেই বাঙালির কণ্ঠে চিরপ্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। দ্বিতীয়ত, এই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথ আন্দোলনের পথ ত্যাগ করে কাব্যসাধনার স্বতন্ত্র আত্মনিষ্ঠ জগতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। সুতরাং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মত অসহযোগ আন্দোলন আশ্চর্য রবীন্দ্রসংগীতে ধন্য ও কৃতার্থ হয়ে ওঠেনি। সাধারণভাবে এই যুগে প্রচুর পরিমাণে স্বদেশপ্রেমের গান রচিত হয়েছে, কিন্তু তাতে তুলনামূলক ভাবে

কাব্যসম্পদ পূর্ব যুগের তুলনায় ঈষৎ ন্যূন। তবে এই পর্ব থেকেই আমরা দুজন শ্রেষ্ঠ কাব্যগীতকারকে পেয়েছি, যাঁদের অবদান দেশাত্মবোধক সংগীতের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলালের পরবর্তী অধ্যায়ে অবশ্য ধার্য—তাঁরা হলেন নজরুল ও মুকুন্দদাস।

১৯২০ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত দেশাত্মবোধক সংগীতের একাধিক সংকলনের দিকে চোখ বোলালেই এই পর্বের স্বদেশী গান তথা আন্দোলনের চারিত্র্য মোটামুটি বোঝা যাবে। অধিকাংশ গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল সাময়িক প্রয়োজনে, সাহিত্যিক প্রয়োজনে নয়। তাই তাদের সযত্নে গ্রন্থগারেও রক্ষা করার চেষ্টা হয়নি। গ্রামের যুবক সম্মিলনে, শহরের গুপ্ত আন্দোলনকারীদের নিভৃত আলাপেই অনেকগুলি সংকলনের পরমায়ু নিঃশেষ হয়ে গেছে। অনেক মন্দকবিযশঃপ্রার্থীর ক্ষীণকায় গীতসংকলনও এই জাতীয় সংগীতের ইতিহাসের একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করে আছে, স্বদেশী সংগীতের ইতিহাসে যেগুলির কোনো গুরুত্ব নেই। এই পর্বের গান মোটামুটি পূর্বযুগের স্বদেশীগীতেরই প্রতিধ্বনি, ভাষায় বক্তব্যে স্বরে প্রায় একই ধরনের। তবে বিশেষভাবে গান্ধিজির উল্লেখ, অন্যান্য দেশনায়কদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, চরকার মাহাত্ম্যঘোষণা, স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রতিজ্ঞা, স্বরাজলাভের সাধনা, এই সকল বিষয়ের নতুন অন্তর্ভুক্তি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কলকাতা ছাড়া পূর্ববঙ্গের ঢাকা ময়মনসিংহ বরিশাল জাতীয় আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, সেইসব অঞ্চল থেকেও বহু গীতসংকলন প্রকাশিত হয়েছে। অধিকাংশ সংকলনেই কিছু জনপ্রিয় গানের সঙ্গে স্থানীয় কিছু গান অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এই পর্বের গানগুলিতে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যরচনার প্রয়াস বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

জাতীয় আন্দোলনে বরিশালের একটি গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা ইতিহাসে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত আছে। বরিশাল কনফারেন্স উপলক্ষে মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতার উপর পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে একদা কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ তাঁর বিখ্যাত স্বদেশগীতি 'যায় যাবে জীবন চলে' রচনা করেছিলেন। তাছাড়া এই প্রসঙ্গেই 'জাগো জাগো বরিশাল--তোমার সমুখে আজি পরীক্ষা বিশাল' গানটি রচিত হয়েছিল[৪২]। দেশপ্রেমিক কবি মুকুন্দদাসের কর্মভূমি, বহু শহীদের আত্মদানে পবিত্র, বহু জননেতা ও দেশনায়কের দৃপ্ত সংগ্রামক্ষেত্র এই বরিশাল থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি স্বদেশভাবাত্মক গীত সংকলনের উল্লেখ করছি। শ্রীবিপিনচন্দ্র চক্রবর্তী প্রকাশিত 'স্বদেশী সংগীত' (১৩২৮) বরিশালের ভোলা

নামক স্থান থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের নামপত্রে মুদ্রিত ছিল এই দুই পংক্তি—

জগৎমাঝারে শ্রেষ্ঠ তীর্থ আমাদের এই দেশ,
শান্ত স্নিগ্ধ আননে যাহার নাহিক আঁধার লেশ।

এই গ্রন্থে পনেরোটি জনপ্রিয় গান আছে, রচয়িতার নাম সর্বত্র নেই, পাঠও অভ্রান্ত নয়। গানগুলি যথাক্রমে—'উঠগো ভারতলক্ষ্মী'; 'আজি মায়ের ডাকে মিলে যাব হিন্দু মুসলমান' (রচয়িতা—সরোজকুমার কাহালী, শান্তিসেনা—ভোলা); 'জগৎমাঝারে শ্রেষ্ঠ তীর্থ আমাদের এই দেশ', 'জাগ গো জাগ জননী ওমা শ্যামা'; 'আজি বিদায় দেরে যাই চলিয়া' (স্থানীয় গীত), 'বঙ্গবাসী জাগিয়ে আর ঘুমায়ো না'; 'মেরা সোনেকা হিন্দুস্থান'; 'আমরা রাজধানীর ছেলে ভিখারি আজ হয়েছি'; 'জয় গান্ধি বল ভাই আর কোনো ভয় নাই'; 'বন্দে মাতরম্ আল্লা হো আকবর সবকা মুখে বল জী', 'দয়াল হে এই করেছ ভাল' (রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গানটির পাঠ ঈষৎ বিকৃতভাবে দেশপ্রেমাত্মক গান রূপে প্রচলিত হয়েছিল), 'চলরে চলরে চলরে ও ভাই জীবন-আহবে চল'; 'হে ভগবান হে ভগবান চাহিনা হইতে এ বিশ্বমহীতে বিশাল বিপুল বিস্ময় মহান'; 'বল বল বল সবে', 'হও ধরমেতে ধীর'।

১৩২৭ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির বরিশাল অধিবেশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'গান' নামক একটি ক্ষুদ্রকায় সংকলনে ছখানি জাতীয় গীত অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বরিশাল স্বরাজ আশ্রম থেকে প্রকাশিত 'অঞ্জলি' বা 'স্বরাজ সংগীত' (প্রকাশক চিন্তাহরণ চট্টোপাধ্যায়, আশ্বিন ১৩২৮) গ্রন্থের গীতগুলি যথাক্রমে—বন্দি তোমারে ভারতজননী (সরলা দেবী), স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে (গোবিন্দ-চন্দ্র দাস), অবনত ভারত চাহে তোমারে (কামিনীকুমার ভট্টাচার্য), এসেছে ভারতে নবজাগরণ এবং বল ভাই মেতে গাই বন্দে মাতরম্ (মুকুন্দদাস), কে আছ মায়ের মুখপানে চেয়ে (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) মোরা সত্যের পরে মন, একলা চলরে, তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে (রবীন্দ্রনাথ), মায়ের নামে সকল সব পাব দেব-আশীবাদ (মনোমোহন চক্রবর্তী), আয় মা শক্তি মুক্তিদাত্রী (রামচন্দ্র দাস), ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে (রবীন্দ্রনাথ), বঙ্গ আমার জননী আমার (দ্বিজেন্দ্রলাল), চলরে চলরে চলরে ও ভাই জীবন-আহবে চল (মনোমোহন চক্রবর্তী), নিয়েছ যে ব্রত পালনে বিরত (চন্দ্রনাথ দাস), মাগো যায় যাবে জীবন চলে (কাব্যবিশারদ), মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় (রজনীকান্ত), উঠগো ভারতলক্ষ্মী (অতুলপ্রসাদ)।

বরিশাল থেকে প্রকাশিত কয়েকটি ব্যক্তিগত সংকলনগ্রন্থের নাম করা যায়—শ্রীমতী সরোজিনী দেবী প্রণীত 'জাতীয় সংগীত' (বৈশাখ ১৩২৯), শ্রীকুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় কৃত 'স্বরাজচিন্তা' (১৩৩২ সন), শ্রীবসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 'স্বরাজ সংগীত' (১৩২৮) এবং মুকুন্দলাল দাস প্রকাশিত 'গান' (১৩২৪)। শেষোক্তটিতে অবশ্য অনেকগুলি ভক্তিসংগীতও আছে। সরোজিনী দেবীর গ্রন্থটির আখ্যাপত্রে 'ভারতমাতার অযোগ্য নির্মাল্য' 'মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধিজির উদ্দেশ্যে—এই অযোগ্য উপহার অর্পিত হইল' এইরূপ মুদ্রিত আছে। শ্রীমতী সরোজিনীর গানগুলি মন্দকবিত্বের নিদর্শন না হলেও বিশেষত্ব-বর্জিত। অধিকাংশ গানই সমকালীন ঘটনা ও দেশনায়কদের নামে চিহ্নিত। মহাত্মা গান্ধিকে সম্বোধন করে, কখনও চিত্তরঞ্জন দাশের নামে বা অন্যান্য তৎকালীন দেশনেতাদের নিয়ে রচিত গানগুলিতে সুরতালের উল্লেখ নেই, সে যুগের কিছু বিখ্যাত গানের সুরেও দুএকটি গান বাঁধা। সমসাময়িক কোনো সংকলনে সরোজিনী দেবীর গান চোখে পড়েনি। বসন্তকুমারের স্বরাজসংগীতে চোদ্দটি উপদেশাত্মক স্বরচিত সংগীত আছে, সুরতালের নির্দেশ নেই। কুঞ্জবিহারীর 'স্বরাজ চিন্তা' বা 'Reflections on Swaraj' ঠিক জাতীয় সংগীতকাব্য নয়। এর ভূমিকায় কবি বলেছিলেন—

"অন্তঃস্বরাজই (ইন্দ্রিয়গণের উপর আধিপত্যলাভ বা জিতেন্দ্রিয়তা) সর্বেপ্সিত সুখশান্তির একমাত্র মুখ্যতম উপায়। ইন্দ্রিয়সংযমে সুখশান্তির একমাত্র নিদান সত্ত্বগুণ বা ধর্মভাব সমুদিত হইতে থাকিয়া অন্তঃস্থজ্ঞান (তন্ত্রোক্তা কুণ্ডলিনী শক্তি) ভাসাইয়া ওঠায় বহিঃস্থ জ্ঞান টানিয়া আনে। সত্ত্বগুণ বা ধর্মভাবের ক্ষীণতা বা অভাববশত আমরা একেবারে জ্ঞানহারা হইয়াছি।···বর্তমানে আমরা বাঞ্ছিত স্বরাজ পাওয়ার যোগ্য নহি।"

এই গ্রন্থের গানগুলি সেই সত্ত্বগুণ আত্মসংযম চিত্তশুদ্ধির গান। ভক্তি-বিষয়ক গীতরূপেই এইগুলির মূল্য, রচনা গতানুগতিক, সুরতালের উল্লেখ আছে। মুকুন্দদাসের 'গান' সংকলনে অন্যান্য গীতকার রচিত কয়েকটি ভক্তিসংগীত থাকলেও মুকুন্দদাসের স্বরচিত অনেকগুলি দেশাত্মবোধক গানও আছে।

১৪

ময়মনসিংহ থেকেও অনেকগুলি গীতসংকলন প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনটি স্বদেশী গানের সংকলন -'স্বরাজসংগীত', 'মায়ের বাণী', 'মাতৃমন্ত্র' ও 'মায়ের বোধন'[৪৩]। 'স্বরাজসংগীতে'র প্রচ্ছদে অশ্বিনীকুমার দত্তের

প্রতিকৃতি মুদ্রিত আছে, এবং এতে জনপ্রিয় ১৪টি বিভিন্ন কবির জাতীয় গীত আছে। বইটি জনপ্রিয় হয়েছিল, ১৯২২ সালের মধ্যে এর চতুর্থ সংস্করণের সন্ধান মেলে। চতুর্থ সংস্করণে দ্বিজেন্দ্রলালের 'জ্বালাও ভারতহৃদে উৎসাহ অনল' গানটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'মায়ের বাণী' সংকলনের ভূমিকায় প্রকাশকের নিবেদন ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। এই সংকলনে বিপিনচন্দ্র পালের একটি গান আছে—

আমরা চাহি না তব শিক্ষা, মোরা পেয়েছি নব দীক্ষা,
(এই নবীন যুগের নবীন মন্ত্রে) (এই বন্দে মাতরম্ মন্ত্রে)
(যার বর্ণে বর্ণে তড়িৎ ছুটে)
ঘুম পাড়ানো এই মন্ত্র, ভাব-তারানো এই তন্ত্র ;
বল-ভাঙানো এই যন্ত্র—
(আমরা চাই না চাই না চাই না হে
এযে শিক্ষা নয় শুধু ভিক্ষা)
আমরা শিখিব আপন শাস্ত্র পরিব নিজ বস্ত্র
ধরিব আত্ম অস্ত্র—করিতে আপন রক্ষা ॥

'মায়ের বোধন' ও 'মাতৃমন্ত্রে' যথাক্রমে ১৬টি ও ১৫টি জনপ্রিয় জাতীয় সংগীত আছে।

ব্যক্তিগত কয়েকটি গীতসংকলনের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'আনন্দলহরী' —স্বদেশপ্রেমপূর্ণ কবিতা ও গানের ক্ষুদ্র সংকলন, রচয়িতা ও প্রকাশক হরেন্দ্র-কুমার দাস[৪৪]। টাঙাইলনিবাসী কবি ভূমিকায় জানিয়েছেন যে পরমার্থ-বিষয়ক আরও বহু সংগীত তিনি অর্থাভাবে প্রকাশ করতে পারছেন না। এই গ্রন্থের আখ্যাপত্রে 'বন্দে মাতরম্' ও 'জয় মহাত্মা গান্ধির জয়' এইরূপ মুদ্রিত আছে। পুস্তিকাটি স্বদেশপ্রেমিক জনৈক মুসলমান জমিদারের মাতৃসমা সাধ্বী পত্নীর করকমলে উৎসর্গিত। এর রচনা গতানুগতিক, বিশেষত্বহীন, সুরতালের উল্লেখসহ। সম্ভবত সুরকার ও গীতিকার স্বয়ং কবিই। অধিকাংশ গানই সমকালীন বিষয় নিয়ে রচিত এবং অনেকগুলিই গান্ধিপ্রশস্তি। টাঙাইল জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযতীন্দ্রমোহন নিয়োগী প্রণীত 'পূজার মন্ত্র' (১৯২৩) সংকলনে যে স্বরচিত গানগুলি আছে, সেগুলি প্রচলিত গানের সুরে রচিত ও বিশেষত্বহীন—অনুচিকীর্ষা ও গতানুগতিকতায় চিহ্নিত।

সংগীতাচার্য অবিনাশচন্দ্র সরকারের 'স্বদেশগাথা (২১ চৈত্র ১৩২৮) অসহযোগ আন্দোলনের দেশব্যাপী উত্তেজনার পটভূমিতেই সংকলিত। ময়মনসিংহ

থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গানগুলিতে বিশেষত্ব নেই, কেবল অভ্যস্ত প্রকাশভঙ্গি ও পরানুচিকীর্ষা দৃশ্যমান। 'সংগীতাচার্য' হয়েও কবি বহু গানে রবীন্দ্রনাথের সুব যথাযথ গ্রহণ কবেছেন, ভাষাও অনুকৃতপ্রায়। রবীন্দ্রনাথের 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী'র সুরে লিখিত এই গানটি উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হল—

অয়ি বিশ্বমনবিনোদিনী
অভ্রমেখলা শৈলশুভ্রকিরীটিনী স্মিতবৃ স্থমমালিনী ॥…
প্রথম জাগরণ জ্ঞানরবিকরে
প্রথম আলাপ বীণা মধুর ঝংকারে,
প্রথম নিরূপিত আত্মবিচারে
ব্রহ্মজ্ঞান মহাজ্ঞান বাণী ॥…

অবিনাশচন্দ্র এইরূপ রজনীকান্তের 'তব চরণ নিম্নে' এবং 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানের সুরে, দ্বিজেন্দ্রলালের 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' গানের সুরেও গান বেঁধেছিলেন।

অন্যান্য স্থান থেকে প্রকাশিত কয়েকটি সংকলনের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় গানের সংকলন হিসাবে উল্লেখযোগ্য ১৯০৫ সালে প্রকাশিত দুর্গামোহন সেন সংকলিত 'সাধন সংগীত', ১৯২১ সালের পূর্বে প্রকাশিত হরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ সংকলিত 'স্বদেশ গীতি', ১৯২০ সালে প্রকাশিত 'আমার বই'[৭৫] এবং অরুণচন্দ্র গুহ প্রকাশিত 'অর্ঘ্য' (২য় সং ১৩২৮)। ব্যক্তিগত সংকলন গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখনীয়—অমরেশ কাঞ্জিলালের 'মুক্তিবাণী' ১৯২৩, অক্ষয়কুমার দাশগুপ্তের 'দেশের গান' ১৩২৮, অক্ষয়শংকর ভট্টাচার্যের 'স্বদেশী গান' ১৩২৯। সুদূর আসাম থেকেও একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছি।—শুধা দেব রচিত 'স্বরাজসংগীত'[৭৬]। 'সাধনসংগীতে'র কয়েকটি গান বহুখ্যাত, কয়েকটি নামহীন, কিছু অখ্যাতনামা কবির রচনা সাময়িক ঘটনার সঙ্গে জড়িত। রবীন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন, সরলা দেবী, নজরুল, রজনীকান্ত ও মুকুন্দদাসের কয়েকটি সুপ্রচারিত গান ছাড়াও জনৈক সুরেশ ঘোষের কয়েকটি গান আছে—ইনি বরিশালের সমকালীন গীতিকার ছিলেন। লোকমান্য তিলকের উপর একটি গান রচনা করেছেন নরেন্দ্রনাথ দাস এম. এ. মহাশয়। হরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের 'স্বদেশগীতি' সংকলনের গানগুলিতে কবিনাম নেই তবে নতুন গানও কিছু নেই। 'আমার বই' নামক গীতসংকলনে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জনপরিচিত কবির কতিপয় প্রচলিত দেশাত্মবাচক গীত ব্যতীত অধিকাংশ গানই অজ্ঞাতনামা বা অপরিচিত রচয়িতার। সেগুলির

কাব্যমূল্য প্রায়শই অকিঞ্চিৎকর। জনৈক শেখ করিম হিন্দু মুসলমানের ঐক্যমন্ত্র প্রচার করেছেন—

ভাইয়ে ভাইয়ে বিসংবাদে ভেঙ না একতা বল
বিদেশী এক জাদুমন্ত্রে রে কেন হলি রে পাগল।
এক পুকুরে করি স্নান এক পুকুরের খাই জল
একই দেশে বসত করি একই গাছের খাই ফল।
আমি হিন্দু তুমি মুসলমান সবাই তো বাঙালির দল।
একই সূত্রে গাঁথা মোরা একই ভাণ্ডে অন্নজল।
আমি তোমার তুমি আমার সুখে দুঃখে বাহুবল,
রাত পোহালে দেখাদেখি না দেখিলে হই চঞ্চল।
তোমার আমার গৃহবাদে দেশটা যাবে রসাতল
তোমার আমার বিবাদ রাখা বিদেশীর ভাই এই কৌশল॥

এই আশ্চর্য সত্যদৃষ্টিসম্পন্ন কবির পরিচয় আমাদের সাহিত্য-ইতিহাস থেকে হারিয়ে গেছে। 'আমার বই' সংকলনের গানগুলি প্রভূ্যত লোকসংগীত-জাতীয় —সমকালীন কোনো সংকলনে লোকজীবন-ঘনিষ্ঠ এরূপ গান বিশেষ চোখে পড়েনি। যেমন অজ্ঞাত কোনো লোককবির রচনা—

স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন ভাব জেগে উঠল সবার প্রাণে
ব্রিটিশ নামে সিংহ আঁকা চারিদিগে তার শাখাপ্রশাখা
চক্ষু মেলে চাইলে পরে দেখবি রে সব ফাঁকা।
সিংহের দক্ষিণ পাওটি 'এডোকেশন'
অপর পাওটি ব্রিটিশ শাসন,
পিছের পায়ে ভারত-শোষণ মোদের রক্ত নেয় টেনে।
সিংহের ল্যাজের কথা বলব কত
রায়বাহাদুর রায়সাহেব যত
কুকুর বিড়াল পশুর মত আছেন ল্যাজ গুটে।
ল্যাজটি হল দেশের সেরা দেশের দিগে চায় না তারা
সাথে অন্ধ হয়ে তারা কেবল দাদার দিগে ধুয়া টানে।...
'গান্ধির ত্যাগের বড়ি করে সম্বল ব্রিটিশ সিংহ কর দুর্বল
ঐ ল্যাজের দফা রফা কর দেশের কল্যাণে॥

'অর্ঘ্য' দেশাত্মবোধক গানের একটি উৎকৃষ্ট সংকলন এবং ইতিপূর্বে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই সংকলনে স্বদেশী যুগের ছোটবড় প্রায় সকল

গীতরচয়িতাদের পরিচিত গানগুলিই স্থান পেয়েছে। তাঁদের ভিতর কেবল রামচন্দ্র দাশগুপ্ত (সোনার ভারত হলরে শ্মশান), ভূষণ দাস (আর আমরা পরের মাকে), শশিকান্ত (জাগ ভারতবাসীরে কত ঘুমে রবে রে), সুন্দরীমোহন দাস (আমরা চাই না তব শিক্ষা এবং আবার লইয়া রথ) এবং মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (আমি মরণ আজিকে বরণ করিব)—এঁদের কবিতা পূর্ববর্তী কোনো সংকলনে বিশেষ চোখে পড়েনি।

একক কাব্যসংকলনে অমরেশ কাঞ্জিলালের 'মুক্তিবাণী'র গানগুলি ভাষা ও সুরে হেমচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র রায়ের কবিতারই অনুকরণ, মৌলিকতা নেই। দেশমাতৃকার ভৌগোলিক মহিমা, অতীত কীর্তি, চিন্ময় রূপের বন্দনাই অধিকাংশ গানের বিষয়। অক্ষয়কুমার দাশগুপ্তের 'দেশের গান'গুলি তৎসাময়িক ঘটনার প্রেক্ষিতে রচিত। গান্ধিপ্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন, চরকানীতি, দেশবন্ধুর স্বরাজ আন্দোলন ও কারাবরণ, বন্দে মাতরম্ উদ্দীপন মন্ত্রে বিদেশী দ্রব্য বর্জনের সংকল্পঘোষণা এইগুলিতে দ্রষ্টব্য। ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে গান্ধিজির আবির্ভাব এক অসামান্য ঘটনা। বাঙালি কবির গভীর হৃদয়রক্তরাগে সেই অসামান্যতা উৎকীর্ণ হয়েছে নশ্বর কালপৃষ্ঠায়—সম্ভবত ভারতীয় ভাষার মধ্যে বাঙলাতেই মাহাত্মা গান্ধির উপর প্রথম কাব্যসংগীত অসংখ্য রচিত হয়েছে। অক্ষয়কুমার গান্ধিপ্রশস্তি করে গান করেছেন—

ধন্য হইল ভারতবর্ষ তাঁহার চরণপরশে
দুস্থ ভারত উঠিল জাগিয়া মুছিয়া বেদনা অশ্রুনীর।
মায়ের চরণে করি সমর্পণ সকল স্বার্থ সুখ
স্বেচ্ছায় শিরে নিয়েছে বরিয়া সকল দৈন্য দুখ।
দিল সঞ্জীবতা জাগায়ে ভারতে কী এক মোহন মন্ত্রে।
কী নব পুলকে আলোকিত করে আজ উদিত ভারতে গান্ধিবীর॥

গান্ধিজির কারাবরণে কবি রচনা করেছিলেন এই সংগীতটি—

তাঁর কারাগারে হয় কি গো স্থান
হের ভারতের ঘরে প্রেমময় মূর্তিমান।
লোহার বাঁধনে কিগো সে দেবতা বাঁধা রয়
অযুত প্রেমশিকলে হের বাঁধা সে হৃদয়
সে পারে কি কাঁদায়ে যেতে এমন নিঠুর হতে
ভারতবাসীর সে যে জন্মভূমির প্রাণ।

সে যে নন্দনবনজাত পারিজাত ফুলহার
করুণা করিয়ে দেওয়া বিধাতার উপহার ;
সে যে শান্তির অবতার সুখে দুঃখে নির্বিকার,
মরণভয়রহিত পতিত জাতির প্রাণ ॥
উজল স্বদেশপ্রেমে সদা দীপ্ত যে হৃদয়,
কারাতিমির তার কিবা শাস্তি কিবা ভয়,
ওগো যেখানে বিরাজ তুমি তোমার নির্দেশবাণী
মাথা নত করে লব এ দেহে থাকিতে প্রাণ ॥

অরবিন্দের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তিবাচক কবিতাটির কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে।

অক্ষয়শংকব ভট্টাচার্যের 'স্বদেশী গানে'র রচনাগুলিও গতানুগতিক, ভাষা ও সুরে দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বারা প্রভাবিত। কয়েকটি গান দ্বিজেন্দ্রলালের সুরেই গেয় হওয়াব নির্দেশ দিয়েছেন কবি। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানে বাউল সুরের প্রবর্তনের পর ১৬।১৭ বছর কেটে গেছে, কিন্তু এই সুরে দেশচেতনাময় গান রচনার জনপ্রিয়তা কমেনি। যেমন অক্ষয়শংকরের দুটি 'স্বদেশী বাউল' সংগীত—

এ দেশের কি আছে তুলনা জগতে ঘুরে দেখ না,
সোনার ভারত যে দেশের নাম,
হেথা আসি ঐ বিদেশীর পুরে মনস্কাম ;
সাগর বয়ে যায় রে নিয়ে এদেশেব রূপা সোনা ॥···

একটি 'চরখার গান'—

ও ভাই বল দেখি চরখা হাতে কল্লে তোমার লজ্জা কী ?
তোমার ধরম করম সব গিয়াছে নেংটা হল বউমা কি ?
দু মন পাটের টাকায় দুখান কাপড় না হয়,
শীতে কাঁপে মনস্তাপে স্বদেশী সবায়
এ দুঃখ দূর করিতে চরখা নিতে বৃথা মনে ভাব কি ?

১৫

বিংশ শতকের স্বদেশী কাব্যসংগীতের ইতিহাসে চারণকবি মুকুন্দদাসের নাম রক্ত দিয়ে লিখিত আছে। তাঁর পিতৃদত্ত নাম যজ্ঞেশ্বর দে, কিন্তু মুকুন্দদাস নামেই তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি চিরস্মরণীয়। কবির প্রথম আবির্ভাব ঘটে ঢাকায়,

দেশগৌরবী নেতা ও গীতিকার অশ্বিনীকুমারের সঙ্গলাভ করে কবি স্বদেশী প্রচার স্থরু করেন এবং যাত্রাভিনয়কে কেন্দ্র করে জনপ্রিয় সংগীত প্রচার করতে থাকেন।[৪৭] 'মাতৃপূজা', 'পথ', 'সাথী', 'পল্লীসেবা', 'সমাজ', 'ব্রহ্মচারিণী', ও 'কর্মক্ষেত্র' এইগুলি তাঁর জনধন্য যাত্রা। 'মাতৃপূজা'র বিদ্রোহাত্মক বক্তব্য ও তার একটি গান—

আমি দশহাজার প্রাণ যদি পেতাম
তবে ফিরিঙ্গি বণিকের গৌরব রবি অতল জলে ডুবিয়ে দিতাম।
শোন সব ভাই স্বদেশী হিন্দু মোসলিম ভারতবাসী

মুকুন্দরামকে বিদেশী কারাগার আড়াই বৎসরের জন্ম আতিথ্য দান করেছিল। "বরিশালের উপকণ্ঠে কালীমন্দিরকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার সকল স্বপ্ন সকল সাধনা মূর্ত হইয়াছিল। জাতীয় সংগঠন সফল করিবার উদ্দেশ্য তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন আনন্দময়ী আশ্রম"।[৪৮] মুখ্যাত স্বদেশী গানেই দেশবাসীকে উত্তেজিত করলেও মুকুন্দরাম তাঁর যাত্রার জন্য আরও অসংখ্য গান রচনা করেছিলেন। শক্তি ও ভক্তি, দাস্য ও হাস্য, প্রেম ও দেশপ্রেম—কোনো ক্ষেত্রেই তাঁর গীতপ্রতিভা বাধিত হয়নি। মুকুন্দদাসের কবিত্বশক্তি তাঁর গানের বাক্‌বন্ধনে, ছন্দের শৃঙ্খলায়, মিলের সুপটু বিন্যাসে, আন্তরিকতায় ও সর্বোপরি সুরের বলিষ্ঠতায় প্রকাশিত। তবে তিনি ছিলেন স্বয়ং শক্তিউপাসক, তাই অশ্বিনীকুমারের মত তিনিও শক্তিসাধনার সঙ্গে মাতৃভক্তি ও দেশপূজাকে মিশিয়ে দিয়েছেন। তাঁর 'দীনতারিণী পতিতপাবনী অধমতারিণী তুই শ্যামা মা' গানে কবি গেয়েছেন—

এ ঘোরা রজনী আর পোহাবে না সবই হয়েছে শব মা;
সে শবোপরি এসে দাড়া ত্রিনয়না ভ্রামরী ভবানী ভৈরবী ভীষণা।
আজ নাচ মা।
ত্রিশ কোটি শবোপরি নাচ মা আজ
তাথৈ তাথৈ থৈ ধিন ধিন ধিনা।
রাতুলচরণ পরশ পাইয়া ত্রিশকোটি মরা উঠিবে বাঁচিয়া
দেখলে মায়ের শ্রী উঠিবে শিহরি কাঁদিয়া উঠিবে প্রাণ;
তখন কোটি কণ্ঠ মিলে একবার হুংকারিলে
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে
তবেই সিদ্ধি হবে মা
ভারতের চির আকাঙ্ক্ষিত স্বরাজসাধনা॥

মুকুন্দদাসের পূর্বেই অনেক কবির ধ্যানদৃষ্টিতে লোলহাস্তরুধিরা ভয়ংকরী দেবীর উপর স্বদেশজননীর উদ্দীপনাদায়িনী মূর্তিটি একাকার হয়ে যায়। মুকুন্দদাসের বহু গানেও শ্যামা ও দেশমাতৃকা একাত্ম হয়েছেন। একটি গানে শাক্ত পদাবলীর মাতৃনামমহিমার মত মুকুন্দদাস জননী-জন্মভূমির নামমহিমা একই সুরে প্রচার করেছেন—

মায়ের নামের ডঙ্কা দিয়ে চল রে শঙ্কা যাবে দূরে
শুনিসনে কালের ভেরী আজ উঠছে বেজে আজব সুরে।
রেখে দে রে পুঁটলি-বাঁধা আর তোদের কাগজে কাঁদা
ধরে দে মা নামের সারি দীপকরাগে ভারত জুড়ে।......

অশ্বিনীকুমার একটি গানে শ্মশানীভূত ভারতভূমিকে শ্মশানবিলাসিনী শ্যামাজননীর উপযুক্ত আবাহনস্থান বলে ঘোষণা করেছিলেন। গুরুর সেই আদর্শেই মুকুন্দদাস গেয়েছেন—

আয় মা তারিণী করালবদনী
ডাকিনী যোগিনী সব নিয়ে আয়
শ্মশানবাসিনী শ্মশানরঙ্গিণী
ভারতশ্মশানে নাচবি গো আয়।

স্বদেশী আন্দোলনে বিদেশী দ্রব্যবর্জন-মহোৎসবে বরিশালের কবি মনোমোহন চক্রবর্তীর 'ছেড়ে দাও কাঁচের চুড়ি বঙ্গনারী' গানটিকে মুকুন্দদাসই জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। অন্যান্য বহু স্বদেশীগানও তিনি তাঁর যাত্রায় নির্বিচারে গ্রহণ করেছেন। মনোমোহনের গানটি মুকুন্দদাসের নামেই বহু সংকলনে ভ্রান্তিবশত অন্তর্ভূক্ত হয়েছে, এবং সেটি রচনারীতিতে মুকুন্দদাসের গানগুলিকেই বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। মনোমোহন চক্রবর্তীর গানটি মুকুন্দদাসের 'কর্মক্ষেত্র' যাত্রার শেষ দৃশ্যে আছে—

ছেড়ে দাও কাঁচের চুড়ি বঙ্গনারী কভু হাতে আর পরো না
জাগো গো ও জননী ও ভগিনী মোহের ঘুমে আর থেকো না
কাঁচের মায়াতে ভুলে শঙ্খ ফেলে কলঙ্ক হাতে পরো না
তোমরা যে গৃহলক্ষ্মী ধর্মসাক্ষী জগৎ ভরে আছে জানা
চটকদার কাঁচের বালা ফুলের মালা তোমাদেব অঙ্গে শোভে না।
নাই বা থাক মনের মতন স্বর্ণভূষণ তাতেও যে দুঃখ দেখি না
সিঁথিতে সিন্দুব ধরি বঙ্গনারী জগতে সতী শোভনা।

বলিতে লজ্জা করে প্রাণ বিদরে কোটি টাকার কম হবে না
পুঁতি কাঁচ ঝুঠা মুক্তায় এই বাঙলায় নেয় বিদেশে কেউ জানে না।
ঐ শোন বঙ্গমাতা শুধান কথা জাগো আমার মাতা কন্যা
তোমা সব করিলে পণ মায়ের এ ধন বিদেশে উড়ে যাবে না।
আমি যে অভাগিনী কাঙালিনী দুবেলা অন্ন জোটে না
কি ছিলেম কি হইলাম কোথায় এলাম মা যে তোরা ভাবিলি না।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক ও তৎপরবর্তী কালে সংকলিত অধিকাংশ স্বদেশভাবপূর্ণ গীতচয়নগ্রন্থে মুকুন্দদাস একটি অপরিহার্য নাম। তাঁর অনেকগুলি দীপ্ত গীতই কালের বিস্মৃতি অস্বীকার করে এ যুগে এসে পৌঁছেছে। যেমন—

সাবধান সাবধান
এসেছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড রুদ্রদীপ্ত মূর্তিমান।
ওই শোন তার গরজে কম্বু অম্বুধি যথা উছলে
প্রলয়ঝঞ্ঝা ইরম্মদে মৃত্যুভীষণ কল্লোলে
হুংকারে তার গভীর মন্দ্র কাঁপায় মেদিনী তারকাচন্দ্র
বিদরে আকাশ স্তব্ধ বাতাস শিহরি উঠিছে জগৎখান।
ভ্রূকুটিকুটিল রক্তনেত্রে চিত্রভানু উছলে
উঠিছে কিরীট গরিমাদীপ্ত ভেদিয়া সূর্যমণ্ডলে
অগণিত করে ঝলসে কৃপাণ তপ্তরক্ত করিয়া পান।
বলদর্পিত চরণ-আঘাতে ত্রিভুবন ভীত কম্পমান
ত্রিভুবন জুড়ি বিরাট দেহ ভেবেছ কি আর পালাবে কেহ
এখনও চরণে শরণ লহ নতুবা নাহিরে পরিত্রাণ।

মুকুন্দদাস স্বভাবকবি, অযত্নকৃত চেষ্টাহীন স্বাচ্ছন্দ্যেই তাঁর প্রতিভা বাণী ও সুরে উচ্ছলিত হয়ে উঠেছিল। নজরুলের মতই তিনি উচ্চকণ্ঠ, বিদ্রোহী, আবার নজরুলের মতই মাতৃসাধক। উভয় কবিই রাজরোষে বন্দী হয়েছিলেন। নজরুলের মতই মুকুন্দদাস নারীবন্দনা ও নারীজাগরণের প্রেরণা দিয়েছেন—

মায়ের ডাকে সব জেগেছে যে যার কাজে লেগে গেছে,
তোমরাই মায়ের জাতি বসে থাকবে কি নীরবে।
শক্তিস্বরূপিণী যারা এ দুর্দিনে কেন তারা
ভোগবিলাসে মজে মৃতপ্রায় পড়ে রবে।

মুকুন্দদাস বাঙলা দেশাত্মবোধের গানের শ্রেষ্ঠ চারণ কবি।

১। "সংগীতে মানবের চিত্তবৃত্তিনিচয় একতান হয় ও অসীম শক্তিলাভ করে। সংগীতের মোহিনী শক্তি তড়িৎপ্রবাহের ন্যায় মুমূর্ষু সমাজশরীরে নব প্রাণের সঞ্চার করে। জাতীয় সংগীত ভিন্ন জাতীয় চিত্তের অবসাদ দূরীভূত হয় না, জাতীয় ভাব যথোচিত বলবেগ লাভ করে না" —সখারাম গণেশ দেউস্কর, যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংকলিত 'বন্দে মাতরম্' (১৯০৬) গ্রন্থের ভূমিকা

২। "একই কবিতাতে বিভিন্ন ভাবের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। ভারত ও বঙ্গজননীর রূপ ও অতীতগৌরব, কর্তব্যে প্রেরণা ও উদ্দীপনা, আত্মপ্রস্তুতি ও আত্মাহুতি এবং শক্তির আবাহন—যথাক্রমে স্থান গ্রহণ করিয়াছে।"—কালীচরণ ঘোষ-সম্পাদিত 'মাতৃমন্ত্র' (১৯৬১) গ্রন্থের ভূমিকা

৩। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'মাতৃবন্দনা' (১৯৬৩) গ্রন্থের ভূমিকা

৪। "RamMohan Ray stands before us not only as the founder of the Brahmo Samaj, but really as the father of modern Indian Nationalism,—" Brahmo Samaj and the Battle of Swaraj in India by Bipin Chandra Pal. p.8.

৫। একমেবাদ্বিতীয়ম্ (ব্রহ্মবিষয়ক গীতসমূহ)—রামমোহন রায় (১৮২৩)

৬। 'a society for the promotion of National felling among the educated natives of Bengal'—হিন্দুমেলার পরিচয়পত্রে রাজনারায়ণ বসুর মন্তব্য। রাজনারায়ণ বসু "শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা-সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব" করে এক বক্তৃতা করেন, সেটি ১৭৮৮ শকাব্দে (খ্রীঃ ১৮৬৬) ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। "এই প্রস্তাব হইতেই হিন্দুমেলার উৎপত্তি হয়।" এই বক্তৃতার দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল সংগীতবিদ্যালয় স্থাপন করার। "এই সভা একটি হিন্দু তৌর্যত্রিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহার ছাত্রগণকে এরূপ সংগীত ও শিক্ষা দিবেন যদ্দ্বারা নীতিগর্ভ উপদেশ প্রদত্ত হয় এবং অন্তঃকরণে দেশহিতৈষিতা ও সমরানুরাগের সঞ্চার হইতে পারে" (বিবিধ প্রবন্ধ—রাজনারায়ণ বসু)। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাইপ্রবাস' গ্রন্থে লিখেছেন যে নবগোপাল মিত্র ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরই এর প্রথম উদ্যোক্তা, তাছাড়া রাজনারায়ণ জ্যোতিরিন্দ্র প্রভৃতিও ছিলেন। ১২৭৩ সালের চৈত্রসংক্রান্তির দিন বেলগাছিয়ায় এই মেলার উদ্বোধন হয়। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাঙলা গান', শারাপদ পাল, বিশ্ববীণা, ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

৭। গীতহার—গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৪)। গঙ্গাধরের মৃত্যু উপলক্ষে Reis and Rayyet পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়—Poetry and partiotism breathe through every line he has written.

৮। মনোমোহন বসুর 'হরিশচন্দ্র' নাটকে গানটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে

৯। 'মনোমোহন বসু'—শ্রীকান্তিচন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রবাসী বৈশাখ ১৩১৯, পৃ ১০০, ১২শ ভাগ, ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা

১০। "প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত স্বাধীনতাসংগ্রামে প্রেরণা ও উদ্দীপনা জাগিয়েছে প্রবীণ ও নবীন, প্রখ্যাত বহু কবির রচিত অসংখ্য কবিতা ও গান। সেই দুর্লভ কবিকীর্তিগুলি আমাদের অভিশপ্ত নিপীড়িত জাতীয় জীবনের অন্তর্গূঢ় দুঃখবেদনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার গীতিময় ইতিহাস, দেশের সাহিত্যভাণ্ডারেরও এগুলি অমূল্য সম্পদ।"—সাধনা বসু ও প্রতিমা বসু, 'রুদ্রবীণা'র (স্বদেশী গান ও কবিতাসংকলন) 'নিবেদন', ১৩৫৩

১১। ১৯২২ সালে ময়মনসিংহ থেকে শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত 'মায়ের বাণী' নামক ক্ষুদ্র একটি গীতসংকলনে প্রকাশক নিবেদন করেছেন—"সংগীত মানবহৃদয়ে উন্মাদনা সৃজন করিয়া দেয়, যাহা শত বক্তৃতায়ও করিতে পারে না। দেশের বর্তমান দুর্দিনে লোকের প্রাণে স্বদেশপ্রেম জাগাইয়া তোলার একান্ত প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাই দেশের প্রসিদ্ধ সংগীতরচয়িতাদের রচিত কয়েকটি জাতীয় গান লোকসম্মুখে উপস্থিত করিলাম।"

১২। "জাতীয় রাখীসংগীত। / (৩০শে আশ্বিন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদকালীন গীত) / ১৪।৪ জেলিয়াটোলা স্ট্রিট / নবভারতসমিতি হইতে প্রকাশিত / কলিকাতা ১০৮ নং বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট 'পেট্রিয়ট প্রেসে' / শ্রীনারায়ণচন্দ্র পাল দ্বারা মুদ্রিত"

১৩। জাতিতে মারাঠী কিন্তু বঙ্গভাষার লেখক (১৮৬৯—১৯১২), হিতবাদীর সহসম্পাদক ও পরে সম্পাদক, সাধনা, সাহিত্য ও তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকার লেখক, ইতিহাস-গবেষণামূলক কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা, জাতীয়তাবাদী। তাঁর 'দেশের কথা' বইটি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। মহারাষ্ট্রে তিলকপ্রবর্তিত শিবাজী-উৎসবকে বাঙালাদেশে তিনিই জনপ্রিয় করেন

১৪। কালীচরণ ঘোষের 'মাতৃমন্ত্র' গ্রন্থে (১৯৬৩) 'ব্যথা', 'আক্ষেপ', 'রাখী', 'একতা', 'আত্মনির্ভরতা', 'প্রতিবাদ', 'নারীজাগরণ', 'মাতৃমূর্তি', 'শক্তিআবাহন', প্রভৃতি বিষয়বিভাগ করা হয়েছে

১৫। গিরিশচন্দ্র অন্য নাট্যকারের নাটকের জন্যও গান বেঁধেছিলেন, যেমন, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের হামির (১৮৮১) নাটকের গানগুলি গিরিশচন্দ্রের রচনা

১৬। "বন্দে মাতরম / শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার সংকলিত। / (চতুর্থ সংস্করণ) / সিটিবুক সোসাইটি / ৬৪ নং কলেজ স্ট্রীট—কলিকাতা / ১৯০৬ / মূল্য ছয় আনা।" ১৯ মার্চ ১৯০৬ তারিখে গ্রন্থটির চতুর্থ সংস্করণ বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। ভূমিকা থেকে জানতে পারি, 'সুখের বিষয়···পুস্তকখানি স্বদেশী কাগজেই মুদ্রিত···।' এই গ্রন্থে সমকালীন বিখ্যাত গানগুলি ছাড়া দেশাত্মবোধক বহু কবিতাও সংকলিত হয়েছে

১৭। অবশ্য একথা বলাই বাহুল্য যে রাখীবন্ধন উৎসবের শ্রেষ্ঠ সংগীত রবীন্দ্রনাথের 'বাঙলার মাটি বাঙলার জল' প্রায় সব সংকলনেরই অন্তর্ভুক্ত। শীনরেন্দ্রকুমার শীল সংকলিত 'স্বদেশী সংগীতে' (১৯০৭) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর একটি রাখীসংগীত আছে—"আজিকার দিনে স্মরিয়া মায়ের মুখ / ভরিব বিষাদে বাঁধিনু মঙ্গলরাখী"। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'বন্দে মাতরম'-এর সাক্ষ্যে মনে হয় এটি কবিতা, সুরারোপিত হয়নি। হেমচন্দ্রের 'কি আনন্দ আজ ভারতভুবনে' এটিও রাখীসংগীতরূপে গৃহীত, কিন্তু মনে হয় এটিকেও সুরারোপিত করা হয়নি

১৮। এই মনোভাবের একটি নমুনা প্রাচীন পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত হল। আর্যদর্শন পত্রিকায় যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ স্বজাতিপ্রেম স্বদেশানুরাগ' নামক একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন—"ইংলণ্ড! শুনিয়াছি তোমার অনন্ত ঐশ্বর্য। একবার চক্ষু বুজিয়া সেই অনন্ত ঐশ্বর্যের কিয়দংশ তোমার অসংখ্য প্রজার উদার শিক্ষায় বিন্যস্ত কর, উদার শিক্ষাবিধান দ্বারা তোমার বিংশতি কোটি প্রজাকে স্বদেশহিতব্রতে দীক্ষিত কর। তাহাদিগকে স্বদেশহিতব্রতে জীবনকে পূর্ণাহুতি দিতে শিক্ষা দাও, স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে শিক্ষা দাও; স্বদেশের জন্য ও স্বজাতির জন্য আত্ম ভুলিতে শিক্ষা দাও; স্বদেশের জন্য স্বদেশের রুধির বিন্দু বিন্দু

করিয়া বিসর্জন দিতে শিক্ষা দাও; পিতা যেমন শিশু সন্তানকে হাঁটিতে শেখায়, তেমনি ধীরে ধীরে আমাদিগকে স্বাধীনতার পথে লইয়া চল, যখন আমাদিগকে স্বাধীনভাবে চলিতে সমর্থ দেখিবে তখ আমাদিগকে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাবলম্বন প্রদান কর; তোমার জ্যেষ্ঠের সন্ততিগণকে পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠাপিত কর।"—হৃদয়োচ্ছ্বাস বা ভারতবিষয়ক প্রবন্ধাবলী, ১২ই মাঘ ১২৮৭

শিক্ষিত বাঙালির তৎকালীন এই মনোভাবের মানচিত্রটি রবীন্দ্রনাথের ইংরাজিতে লেখা জীবনস্মৃতি থেকে দেখা যেতে পারে—

This great literary tradition has come down to us from the revolution period. We felt its power in Wordsworth's sonnets about human liberty we glorified it even in the immature production of Shelley, written in the enthusiasm of his youth, when he declared against the tyranny of priest-crafts and preached the overthrow of all despotisms through the power of suffering bravely endured. All this fired our youthful imaginations. We believed with all our simple faith that even if we rebelled against foreign rule, we should have the sympathy of the west on our side in wishing us to gain our freedom.

১৯। Songs of Freedom: Canterbury Poets Series, Ed. by H. S Salt.

২০। কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ভারতমাতা (১৮৭৩), ভারতযবন (১৮৭৪), মনোরঞ্জন গুহ—ভারতবন্দিনী (বরিশাল ১৮৭৬); হারাণচন্দ্র ঘোষ—ভারতীতরঙ্গিনী (১২৮২)। দ্রষ্টব্য সুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ডে নাটক ১৮৭২-১৯১২ অধ্যায়ে এই জাতীয় বহু নাট্যনিবন্ধের নাম দ্রষ্টব্য

২১। কালীচরণ ঘোষ—মাতৃমন্ত্র দ্রষ্টব্য

২২। অবশ্য আনিসুজ্জামান তাঁর 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৪) সমকালীন কিছু বিস্মৃতপ্রায় মুসলমান কবির দেশাত্মবোধক কবিতা ও গানের উল্লেখ করেছেন

২৩। "মনে হয় ইনি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়; কারণ 'করালী' নামে অর্ধসাপ্তাহিক পত্রিকা ব্রহ্মবান্ধব কিছুদিন সম্পাদনা করেন। আর সে সময়ে ইংরেজবিদ্বেষজনিত মনোভাবের জন্য তাঁর ভাষায় যে স্থূলতা আসে 'করালী'র গানের ভাষার সঙ্গে তার মিল আছে।"—ডঃ সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—স্বদেশী আন্দোলন ও বাঙলা সাহিত্য (১৩৬৭)

২৪। "এই মেলার প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনের উদ্বোধন হত 'গাও ভারতের জয়' গানটি দিয়ে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় মুক্তির ইতিহাসে এর স্থান সুনির্দিষ্ট। কেন না এই গানটিই নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় সংগীত আখ্যা লাভের অধিকারী। বন্দে মাতরম রচিত হয় তার বহু বৎসর পরে।"—প্রবোধচন্দ্র সেন—ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত

২৫। জন্ম ১২৬৮, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, মৃত্যু ১৯০৭। কালীপ্রসন্নের গান প্রকৃতপক্ষে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকেই খ্যাতিলাভ করে। চারুচন্দ্র রায় কর্তৃক সম্পাদিত 'সংগীতসার-সংগ্রহের' (১৩০৮) তৃতীয় খণ্ডে কালীপ্রসন্নের গান সংকলিত হয়নি। কালীপ্রসন্ন সম্পর্কে ইতিপূর্বে আরো মন্তব্য করা হয়েছে

২৬। "বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলনে বন্দে মাতরম্ বলার জন্য চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতার পিঠে অবিরাম পুলিশের লাঠি পড়তে থাকে। তাঁকে যতবার পুকুরে চুবানো হয় তিনি ততবারই বন্দেমাতরম্ বলে ওঠেন।...এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করেই উপরোক্ত 'মা গো যায় যেন জীবন চলে' গানটি রচিত হয় এবং সেই প্রতিবাদে আর একটি অজ্ঞাত লেখকের গানও সেই সময়ে গাওয়া হত—

আমরা গাব সব বন্দেমাতরম্
মরলে পরে অমর হব পাব স্বর্গ অনুপম।
ভেবেছ কি লাঠির ঘায় মা বলা মোদের ভুলাবি হায়
তোমাদের বেআইনি হুকুম নাহি মানি
চোখ রাঙানি ডরাই কম।'

—'সংগীতে দেশাত্মবোধ, কাব্যসাহিত্যের ধারা—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (১৩৬৩)

২৭। 'একদা বন্দেমাতরম্ ছিল আমাদের জাতীয় সংগীত—এই গানকে বীজমন্ত্ররূপে কণ্ঠে ধারণ করিয়াই জাতি স্বাধীনতার সংগ্রাম করিয়াছে। জেলে, যন্ত্রণায়, ফাঁসিকাষ্ঠে হাজারে হাজারে দেশভক্ত প্রাণ দিয়াছেন, সেই মাতৃপূজায় এই গানই স্বাধীনতার প্রাণবাণীরূপে বরাবর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের এই গীতও ছিল সর্বভারতীয় সংগীত—কংগ্রেসও ইহাকেই জাতীয় সংগীতরূপে গ্রহণ এবং অনুমোদন করিয়াছিলেন।" যুগান্তর, ১৬শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫, প্রবোধচন্দ্র সেনের ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত গ্রন্থের পরিশিষ্টে উদ্ধৃত। 'বন্দেমাতরম' গানটি সম্পর্কে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় লেখা হয়েছে—During BankimChandra's lifetime the Bande Mataram, though its dangerous tendency was recognized, was not used as a party war-cry. it was not raised, for instance, during the Ilbert Bill agitation, nor by the students who flocked round the court during the trial of Surendranath Banerjee in 1883. It has, however, obtained an evil notoriety in the agitation that followed the partition of Bengal. That Bankim himself foresaw or desired any such use of it, is impossible to believe. Circumstances have made the Bande Mataram the most famous and the most widespread in its effects of Bankim Chandra's literary works—এটি রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখা। ১১শ সংস্করণ Vol VI পৃ ৯-১০ দ্রষ্টব্য

২৮। ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত (১৩৪৯)

২৯। সরলা দেবীকৃত 'শতগান' স্বরলিপিগ্রন্থে এই গানের পরিচয় দেওয়া হয়েছে—"বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে কলিকাতার সংগীতসমাজ হইতে সম্মান ও অর্ঘ্য প্রদত্ত হয়। এই সংগীতটি তদুপলক্ষে রচিত।" দ্র বন্দনা, ভারতী ফাল্গুন ১৩০৯

৩০। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে 'গ্যারিবল্ডির জীবনবৃত্তে'র উদ্বোধনীর শেষে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখেছিলেন—"এসো, আর দেরি করিও না। সময় আসিয়াছে। গগন বিদারিয়া গাও বন্দেমাতরম। স্বদেশানুরাগ ভগবদ্ভক্তির সহিত মিশ্রিত হইয়া ভারতে আবার নবযুগের উৎপত্তি করুক।" শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সম্পাদনায় বন্দেমাতরম্ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন।

ডঃ সুন্দরীমোহন দাস লিখেছিলেন—'এই নবীন যুগের নবীন মন্ত্র ঐ বন্দে মাতরম্ যার বর্ণে বর্ণে তড়িৎ ছুটে।' প্রমথনাথ দত্ত লিখেছিলেন—'নব আনন্দে গাও রে ছন্দে বন্দে মাতরম্।'

৩১। প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'গান' গ্রন্থটির উৎসর্গপত্রে ১৩০৯ সালের উল্লেখ আছে। হরিতবসন পরা ইত্যাদি পরবর্তী গানগুলি 'গানে' সংকলিত হয়েছে

৩২। দ্র মাতৃবন্দনা—হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ ১২৯, পাদটীকা

৩৩। দ্র মুক্তির গান—সতীশচন্দ্র সামন্ত (১৯৪০)

৩৪। রবীন্দ্রজীবনী—২য় খণ্ড, পৃ ১০৮, (১৩৫৫, ২য় সংস্করণ)

৩৫। ১৯০৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর (১৭ অগ্রহায়ণ ১৩১০) ক্যালকাটা গেজেটে বঙ্গবিভাগের সরকারি ঘোষণা প্রকাশিত হয়। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর (৩০ আশ্বিন ১৩১২) বঙ্গচ্ছেদ আইন পাশ হয়, সেই দিনটি স্মরণ করেই রাখীবন্ধন উৎসবের সূচনা। ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লিতে পঞ্চম জর্জের অভিষেকানুষ্ঠানে বঙ্গচ্ছেদ রহিত ঘোষণা প্রচার করা হয়। কৃষ্ণকুমার মিত্র সঞ্জীবনী পত্রিকায় বিলাতী দ্রব্য বয়কট বা বর্জনের কথা ঘোষণা করেন

৩৬। মনোমোহনের 'সতী' নাটকের অন্তর্গত গান

৩৭। অবশ্য ঠিক বিদেশী দ্রব্যবর্জনের ব্যাপার না হলেও, স্বদেশী শিল্পবাণিজ্যের দুরবস্থার কথা বাঙলা গানে আরও অন্তত তিরিশ বৎসর পূর্বেই প্রচারিত হয়েছিল। ঠাকুরবাড়ির এক বিদ্বজ্জন-সমাগমসভার বর্ণনা উপলক্ষে তৎকালীন একটি পত্রিকায় একটি তথ্য পাই। 'ভারতসংস্কারক' পত্রের ২৪ এপ্রিল ১৮৭৪ (১১ বৈশাখ, শুক্রবার) সংখ্যার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত একটি সংবাদে বিদ্বজ্জন-সমাগমের প্রথম অধিবেশনের অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির মধ্যে প্যারীমোহন কবিরত্নের কয়েকটি গানের উল্লেখ আছে। প্রথমে তিনি জাস্টিস দ্বারকানাথ মিত্রের প্রশস্তিবাচক একটি গান গেয়ে—"তৎপরে স্বয়ং আর একটি শ্রুতিমধুর গান করিলেন, তাহাতে বিলাতী দ্রব্যের সহিত এদেশীয় দ্রব্যের বিনিময়ে ভারতের সর্বনাশ হইল বলিয়া ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট ক্রন্দন করা হইতেছে।' (সেকালের কথা—প্রবাসী ১৩৪০ জ্যৈষ্ঠে পুনর্মুদ্রিত এবং দ্রষ্টব্য গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী ১৭শ খণ্ড, পৃ ৪৭৮, ১৩৬১ সংস্করণ)

৩৮। গানের ভিতর দেশদর্শন—সরলা দেবী। গীতবিতান বার্ষিকী ১৩৫০

৩৯। শতগান—সরলা দেবী। দ্র রবীন্দ্রগীতিজিজ্ঞাসা—গীতবিতান বার্ষিকী ১৩৫০

৪০। এই গানটি সম্পর্কে একটি নূতন সংবাদ পাওয়া গেছে। জনৈক সংগীতঐতিহাসিক লিখেছেন--

Originally this was sung in Rāga Khāmbaj by Vishnu Chakravarty, the renowned Ustad of the house of Tagores and also widely known in the cultural society of Calcutta, Afterwards it was sung to a different tune in the Great National Theatre.—Rajveswar Mitra. History of Bengal 1751—1905 (C. U., 'Song Chapter.) কিন্তু এই তথ্য কোন্ সূত্রে সংগৃহীত তার উল্লেখ করা হয়নি

৪১। শ্রীনরেন্দ্রকুমার শীল সম্পাদিত স্বদেশী সংগীতের (১৯০৭) সাক্ষ্যে জানা যায় মধুসূদনের 'রেখো মা দাসেরে মনে' (পূরবী একতলা) কবিতাটিও গানে পরিণত হয়েছিল

৪২। মাতৃমন্ত্র—কালীচরণ ঘোষ (১৯৬২)

৪৩। "স্বরাজসংগীত—প্রথম ভাগ / মডেল লাইব্রেরি, ঢাকা—ময়মনসিংহ ২য় সংস্করণ / মূল্য পাঁচ পয়সা।" বেঙ্গল লাইব্রেরির গ্রন্থভুক্তির তারিখ ৫ ডিসেম্বর ১৯২১

মায়ের বাণী—প্রকাশক সুনীলকুমার ঘোষ। মূল্য এক আনা। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি-ভুক্তির তারিখ ৪ ডিসেম্বর ১৯২২

মাতৃমন্ত্র / "প্রবোধন পুস্তিকাবলী / (সংখ্যা ১) / মাতৃমন্ত্র (প্রসিদ্ধ কবিগণের স্বদেশ ও সংগীত) / প্রকাশক / শ্রীঅমূল্যচন্দ্র অধিকারী / ময়মনসিংহ"—বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগের তারিখ ১৪ এপ্রিল ১৯২১

মায়ের বোধন—বিজ্ঞাপন দেখে জানা যায় এটি বোধন সিরিজের দ্বিতীয় বই, প্রথম পুস্তকের নাম ছিল 'মায়ের ডাক'। ("পাঞ্জাবের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিষয় ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে)।" 'অসহযোগীদিগকে উচ্চহারে কমিশন' দেবার কথাও এতে ঘোষিত হয়েছে। প্রকাশক শৈলেশচন্দ্র মিত্র, মূল্য ।০ আনা। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকাভুক্তির তারিখ ৬মে ১৯২১

৪৪। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকাভুক্তির তারিখ ১৮ এপ্রিল ১৯২৪

৪৫। নামপত্রটি এইরূপ—"শ্রীকালীশরণং মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশে। শ্রী···আমার বই দেশপ্রতিম দেশবন্ধু/শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের/শ্রীচরণে ভক্তিভরে/'আমার বই', অর্পিত হইল।"

৪৬। "স্বরাজ সংগীত / সুধার গান / প্রথম সংস্করণ / লেখক—শ্রীসুধাংশুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় / নওগাঁ আসাম।" প্রচ্ছদপত্রে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রতিকৃতি, বেঙ্গল লাইব্রেরির গ্রন্থতালিকায় অন্তর্ভুক্তির তারিখ ৪ মার্চ ১৯২২

৪৭। মুকুন্দদাসের জন্ম ১২৮৫ ঢাকা বিক্রমপুর, মৃত্যু ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১

৪৮। মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী (১৯৫১) বসুমতী সংস্করণ, ভূমিকা

কাব্যসংগীতে বিষয়বৈচিত্র্য

নিধুবাবুর হাতে বাঙলা কাব্যসংগীত যখন প্রথম আত্মস্বাতন্ত্র্য অর্জন করল এবং স্বাধীন প্রেমস্ফুরণের মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগের হৃদ্‌স্পন্দন শোনা গেল, তখনও বাঙলা কাব্যের চিন্ময়ত আকাশে ঐশীলীলার ত্রিপদীমাহাত্ম্য, পূজার্ঘ্য-সংগ্রহের দৈব দৌরাত্ম্য, পাঁচালি-কীর্তনের একঘেয়েমি নিঃশেষ হয়নি। অবশ্য শক্তিউপাসনার নামে একই সময়ে নতুন এক প্রকার ভক্তিসর্বস্ব, মাতৃস্নেহকাতর, সর্বসমর্পিত ঐকান্তিকতায় রুদ্ধকণ্ঠ ও ব্যক্তিগত আবেদনে অভিনব কাব্যসংগীতের প্রবর্তন ঘটেছে। ক্রমশ উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে কবিসংগীত-আখড়াই-তর্জা-যাত্রা মিলেমিশে বাঙলা কাব্যগীতের ধারাটিকে স্পষ্ট ও পুষ্ট করে তুলল, টপ্‌পার প্রণয়চারিতা বহুবিচিত্র বিষয়-প্রসঙ্গে আপনাকে প্রসারিত করে দিল। শিক্ষিত মানুষের জ্ঞানের সীমাবৃদ্ধি তার সাংস্কৃতিক জীবনের সীমাকেও প্রসারিত করে। আধুনিক বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত সমাজ যতই প্রসারিত হয়েছে তার কাব্যসংগীতের বিষয়ের গণ্ডীও ততই দিগন্তপ্রসারী হয়েছে। তাই যাত্রাভিনয় কেবল রামভক্তি বা কৃষ্ণ-ভক্তির মধ্যেই সীমায়িত হয়ে থাকেনি, বৃহৎ পৌরাণিক ভাণ্ডার তার কাছে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। দাশরথি রায় পাঁচালির জন্য পুরাণের আনাচে কানাচে ঘুরে এমন সব অপাংক্তেয় বিষয় সঞ্চয় করেছেন, যেগুলি এতাবৎ কোনো সাহিত্যেই স্থান পায়নি। এমন কি কালক্রমে সমসাময়িক ঘটনা—স্ত্রীশিক্ষা বিধবাবিবাহ প্রভৃতিও পাঁচালির বিষয়ভুক্ত হয়েছে। কবিসংগীতের ডালিতে শুধু সখীসম্বাদ বিরহ আগমনী রইল না, তাতেও সমকালীন সমাজ ও ঘটনাবলী উঁকি দিয়ে গেল। উনিশ শতাব্দীর মধ্যে বাঙলা কাব্যসংগীতে প্রেম স্বদেশ মানবিক ব্যাপার ছাড়া আরও কত রকমের বিষয়বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়, যে কোনো সংকলনগ্রন্থ থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রেমসংগীত স্বদেশসংগীত পর্যায়ে এই দুই বিষয়ের কাব্যগীতি ও গীতকারদের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অন্যান্য পর্যায়গুলির আলোচনা যথাসম্ভব করা যাক।

বাঙলা কাব্যসংগীতগুলির যে সংকলনগ্রন্থাদির আলোচনা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে করা হয়েছে তার অধিকাংশগুলিতেই সামাজিক সংগীত নামে একটি বিষয় আছে। সাধারণত সমাজঘটিত ব্যাপার, সমকালীন ঘটনা, ব্যক্তি, আন্দোলন বা প্রসঙ্গ অবলম্বনে রচিত গানগুলি এই পর্যায়ে সংকলিত হয়েছে। সাময়িকতাই যেহেতু এই জাতীয় সংগীতের প্রেরণা, এই শ্রেণীর গানে কাব্যধর্ম

প্রায়শই যথেষ্ট পরিমাণে থাকে না। বিদ্রূপ বা কৌতুকউৎপাদনের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য সারস্বতসিদ্ধির শর্তকে অলঙ্ঘনীয়ভাবে মেনে নিতে পারে না। যে বিক্ষুব্ধ কিংবা উত্তেজিত আন্দোলনের পটে একদা সেইগুলি উপজাত হয়েছিল, আমরা আজ তা থেকে বহুদূরে এসেছি এবং বহুলাংশে সেই ঘটনা-ভূমিটিও স্মৃতিলোকে নির্বাসিত হয়ে গেছে। সেইজন্য আধুনিক দৃষ্টি ও বিচারের মানদণ্ডে এই প্রকার গানের ঠিক পরীক্ষা হতে পারে না। আলোচনার সুবিধার জন্য বিষয়বৈচিত্র্যপূর্ণ গানগুলিকে কয়েকটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা, উনিশ শতকীয় গানে নারীপ্রসঙ্গ, কৌতুক ও বিদ্রূপমূলক গান, কোনো বিশেষ ব্যক্তিআশ্রিত ও স্মৃতিবিষয়ক গান বা 'খ্যাতি সংগীত', অন্যান্য সমসাময়িক ঘটনাশ্রিত গান ও ঋতুসংগীত।

ক. 'ছিঁড়ে নিয়ে কোমল কলি কণ্টকে গাঁথিল মালা'

বাঙলা প্রেমসংগীতের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যুগজীবনের নারীর স্বাতন্ত্র্য ও আত্মমর্যাদা, স্বাধীনতা ও প্রেমের মহিমাকে কবিরা কতভাবে ব্যক্ত করেছেন। নারীচরিত্রের প্রতি সংশয়, নারীর কুলদ্রোহিতার সফেন বর্ণনাও তৎকালীন কাব্যসংগীতে অনুপস্থিত নয়। সাধারণভাবে বলা যায়, বাঙলা গানে নারীর বেদনাবিদ্ধ রূপেরই প্রাধান্য। ছিন্নবৃন্ত নারীকুসুম সংসারকণ্টকে বিদ্ধ হয়ে রক্তসুরভিত যে মাল্যে গ্রথিত হয়, বাঙালি কবিরা তারই উপর অশ্রুপাত করেছেন। সমাজে নারীর বন্দিনী মূর্তি, বৈধব্য দশা, কৌলীন্য প্রথার অত্যাচারে পীড়িতা নারী, পণপ্রথার পীড়নে বিবাহসংকটে পতিত নারী—এই সকল বিষয় নিয়ে বহু গান রচিত হয়েছে। নারীর সামাজিক মূল্যবোধ সাহিত্যে ও শিল্পে স্বীকৃত হলেও বাস্তবে যে প্রগতি ধিক্কৃত, তারই লাঞ্ছিত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে-থাকা নারীর জন্য অনেকগুলি গানে গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন আনন্দচন্দ্র মিত্র, বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি ও প্যারীমোহন কবিরত্ন। 'ভারত নারীর দশা ভাবিতে প্রাণ বিদরে' গানে আনন্দচন্দ্র মিত্র বৈধব্যের প্রতি আন্তরিক সহৃদয়তা ব্যক্ত করেছেন। অপমানিত নারীত্বের প্রতি সহমর্মিতা আনন্দচন্দ্রের এই গানেও প্রাপ্তব্য—

ভারতশ্মশান মাঝে আমি রে বিধবা বালা
বিষের মুরতি করে বিধি আমায় পাঠাইলা।…

বিবাহ কি তাও জানিনে, কেবল মাত্র পড়ে মনে
অনিচ্ছাতে শৈশবেতে খেলেছি এক দুঃখের খেলা
মাতাপিতা নিদয় হয়ে পরের হাতে সঁপে দিয়ে
ছিঁড়ে নিয়ে কোমল কলি কণ্টকে গাঁথিল মালা।

আনন্দচন্দ্রের মাতৃভাষাবিষয়ক একটি বিখ্যাত কাব্যসংগীতে জননী বঙ্গভাষাকে দুঃখিনী বঙ্গরমণীর প্রতীকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। গানটি ('একাকী কাননে বসি কে তুমি বল রমণী') স্বদেশী গানের আলোচনায় উদ্‌ধৃত হয়েছে। আনন্দচন্দ্রের অনেকগুলি সুপরিচিত গানেই স্বদেশের দৈন্যা-বস্থার জন্য অশ্রুপাত করা হয়েছে। নারীর দুঃখদুর্দশার চিত্রও অধিকাংশ গানেই পুনরাবৃত্ত হয়েছে। 'কোথায় রহিল সব ভারতভূষণ', 'চেয়ে দেখ দেখ ওহে ভারত সন্তানগণ', 'সাধের ভারতভূমি ঢাকিল কি অন্ধকারে', 'মরি কিবা মূরতি ভীষণ' প্রভৃতি কাব্যসংগীতগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

ঈশ্বর গুপ্তের উন্নাসিকতা অনুসরণ করে তাঁরই মত লৌকিক ছন্দে ও ভাষায় বিবাহ ও প্রেমে অনাস্থা ও ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবের প্রশ্রয় দিয়েছেন বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়—

বর সাজিয়ে ঢোল বাজিয়ে লোক জাগিয়ে জানিয়ে যায়
আজ শ্বশুরবাড়ি সোনার বেড়ি পরিতে চলিলাম পায়।
যাবজ্জীবন কারাবাস তায় কত মনে উল্লাস
গলায় দিয়ে প্রেমের ফাঁস বেদেনী বাঁদর নাচায়।
ঠুলি দিয়ে টানায় ঘানি বার করে তেল খাওয়ায় ছানি
হাঁকায় মেরে পার পুতানি চড়ে আর পাথর চাপায়।
হতে হয় শেষ ধোপার গাধা, চড়ে চাপায় লাদার গাদা
ডাঙাশ হাঁকায় মেরে গদা ছোলা ঘাস দুটো না পায়।
ভরে না বাসনার খাদ, পেতে সাধ গগনের চাঁদ
সদাই মুখে দে দে নাদ বজ্রনাদ চেয়ে চমকায়।
কেউ করে খেদ বৌ না পেয়ে, কেউ পেয়ে দুখ বেড়ায় গেয়ে
দিল্লির লাড্ডু কেউ বা খেয়ে কেউ বা না খেয়ে পস্তায়।
জড়ায় যেই আটা-কাটিতে উড়তে যায় পড়ে মাটিতে,
জুড়াতে ভবের ভাটিতে হরিভজন বই আর নাই উপায়।

অবশ্য এই গানে পরিচয়হীন যান্ত্রিক বিবাহসম্পর্কের প্রতিই কটাক্ষপাত করা হয়েছে। কৃষ্ণধন বিদ্যাপতির অনেকগুলি গানে নারীর সামাজিক দুঃখলাঞ্ছনার জন্য যুগপৎ ধিক্কার ও বেদনা প্রকাশ পেয়েছে, অবশ্য সেই পরিমাণে কবিত্ব প্রকাশ পায়নি। কৃষ্ণধনের 'বঙ্গে একী দেখি অত্যাচার', 'ধিক রে বঙ্গসমাজ তোমায় শতবার' গান দুটি এর উদাহরণ। বাল্যবিবাহ পণপ্রথা বহুবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধিবিদ্রূপ নিয়ে উনিশ শতকের শেষ দুইতিন দশকে অনেকগুলি নকশাপ্রহসন নাটক লেখা হয়েছিল। গীতিকাররাও এই সকল গলিত সমাজব্যাধির প্রতি তাঁদের তিরস্কার ও শ্লেষ গানের ভাষায় যথাসম্ভব নিক্ষেপ করেছিলেন। 'বল্লালী তুই যা রে বাঙলা ছেড়ে', 'মনোদুঃখ কব কায়', 'আর আমার কাজ কি বিয়ের সাজ', 'যাই লো সই', 'ঐ অসুরে বড হেরে ডরে মরে', 'কুলমেয়ে কেন কান্দ গো বিরলে', 'মেল ভাঙ মেল ভাঙ কুলীন সবে', 'কার পানে বা চাবে পিতঃ', 'আয়রে আমরা কুলীন বাড়ির বিয়ে সবাই দেখতে যাই',—জনৈক রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সব কটি গানই নারীর দুঃখে উৎসর্গিত।[১] 'সংগীতসারসংগ্রহের ৩য় খণ্ডের সম্পাদক লিখেছেন—

"কুলীন ব্রাহ্মণদিগের বহুবিবাহের বিষময় ফল দর্শন করিয়া ইহার হৃদয় মর্মাহত হয়। যাহাতে বহুবিবাহ প্রথা এতদ্দেশ হইতে দূরীভূত হয় তজ্জন্য ইনি বিস্তর যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন। ইঁহার রচিত কুলীন ব্রাহ্মণকন্যার দুর্দশা সম্বন্ধীয় গীতগুলি বড়ই প্রাণস্পর্শী ও হৃদয়বিদারক।" বেদনা ও বিদ্রূপের একটি গান এখানে উদ্ধৃত করা হল—

বহুদিন পরে এসেছি চিনি নাকো শ্বশুরবাড়ি
কোনপথে যাই মা গো বিশ্বনাথ বারড়ীর বাড়ি।
যারা ছিল ছেলেপিলে তাদের হল ছেলেপিলে
বিয়ে করে গেলুম ফেলে বয়ে গেল বছর কুড়ি
বাড়ি ঘর তা নাহি চিনি কেবল শ্বশুরেরেই নামটি জানি
উত্তরেতে বাগানখানি সুপারি সব সারি সারি।
বাড়ির মধ্যে এক এক চালা
তারি মধ্যে হাঁড়ি চুলা কক্ষে নিয়ে ভিক্ষার ঝোলা
বেড়িয়ে বেড়ায় বাড়ি বাড়ি।
দ্বিজ রাসবিহারী বলে আর ত হাসি রাখতে নারি
তুমি যাকে মা বলিলে, সে বটে তোমারই নারী।

কিশোর রবীন্দ্রনাথের জল জল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের মাধ্যমে পরিচিত) গানের সুরে হরিশ্চন্দ্র মিত্র লিখেছেন—হায় হায় হায় খেদে প্রাণ যায়।

বৈধব্যদুঃখ পণপ্রথা বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সমাজ-দুর্বিপাকে নারীর দুর্গতির কথা যেসব গানে প্রকাশ পেয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই গানগুলি তথ্যসর্বস্ব-নীতিসুধা হয়েছে একথা সত্য। তথাপি একটি গভীর সমাজ-চৈতন্য-উৎসারিত বেদনাকে তাঁরা সংগীতের মধ্য দিয়ে ধরতে চেষ্টা করেছিলেন। এর জন্য অধিকাংশ কবিরা জনপ্রিয় সুরকেই গ্রহণ করেছিলেন, নতুন সুরসৃষ্টি করেননি। রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের অনেকগুলি গান কৃষ্ণকান্ত পাঠকের পাঁচালির সুরের উপর রচিত। প্যারীমোহন কবিরত্ন মধুকানের সুরে এই গান প্রচার করেছিলেন—

(হায়) বাল্যবিধবা দুঃখিনী হয়ে চিরপরাধিনী
কাঁদে শোকে দিবসযামিনী।
মলিন মুখকমল ঝরিছে নয়নের জল
রোদন মাত্র সম্বল বাণবিদ্ধ যেন কুরঙ্গিণী।
নাহি সুখ পানভোজনে বিচিত্র বসনভূষণে
পড়ে সদা ধরাসনে যেন মেঘঢাকা সৌদামিনী।
যাতনায় শরীর শীর্ণ কালিমা হয়েছে বর্ণ
বিষাদে সদা বিষণ্ণ যেন মাতঙ্গদলিত নলিনী।
একা বসিয়ে বিরলে ভাসিতেছে অশ্রুজলে
কেহ নাই ভূমণ্ডলে শুনিতে তার দুঃখের কাহিনী।
ওহে বঙ্গবাসী সবে কত আর নিদ্রা যাবে,
অবলার শোকবিলাপে পূর্ণ হল গগনমেদিনী।[২]

বিভিন্ন গীতসংকলন থেকে সমাজঘটিত অনুরূপ কাব্যগীতগুলির সন্ধান নিলে একটি স্বতন্ত্র বিপুল অধ্যায় রচনা করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি মাত্র গানের উল্লেখ করা হচ্ছে—রামনারায়ণ তর্করত্নের 'বোলোনা ঠানদিদি আর', কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তীর 'কুলীন তনয়া হয়ে অকূলে ভাসিয়া যাই', রাধানাথ মিত্রের 'এ যৌবন কেন সখি করি লো যতন আর', সুন্দরীমোহন দাসের 'চেয়ে দেখ দীনবন্ধু ভারতরমণী পানে', কৃষ্ণধন বিদ্যাপতির 'কেন হেন হীনমতি' এবং 'পাশ করা নয় বাঙালিদের নাশ করা কেবল', অমৃতলাল বসুর 'বড় বেজায়

ঘর বাড়ালে বরের বিশ্ববিদ্যালয়', গানগুলি সবই বিবাহসংস্কার পণপ্রথা কৌলীন্য ইত্যাদি কুপ্রথার প্রতি কটাক্ষপূরিত। অজ্ঞাতনামা কবিরচিত 'নিদয়া বিধাতা কেন রে আমারে', এবং 'আর কি বিয়ে হবে কপালে', গান দুটিও উল্লেখযোগ্য। আলালের ঘরের দুলাল রচয়িতা প্যারীচাঁদ মিত্র একটি কাব্যগীতে সদ্যপতিহারা বৈধব্যের একটি চিত্র অঙ্কন করেছেন—

কে গো রোদন করে
সকঙ্কণ করে মারে মস্তক উপরে।
একাকিনী চন্দ্রাননী উন্মাদিনী পাগলিনী
এ ধ্বনি কে করে ধনী পরাণ শিহরে।
সিন্দুর অঞ্জন মিশি মেঘে তড়িতের হাসি
ধারা বহে পড়ি খসি নয়নের নীরে।
এলোকেশী এলোমনা বিগত ধৈর্যবন্ধনা
শোকেতে হয়ে উন্মনা মগনা কাতরে।...

প্যারীচাঁদ যেমন অন্তঃপুরচারিণী নিভৃতবাসিনী বঙ্গরমণীদের পাঠোপযোগী সাহিত্যসৃষ্টি ও প্রচারোদ্দেশ্যে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও তেমনি অবলাবান্ধব পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। নারীহিতৈষী ব্রাহ্মসমাজভুক্ত দ্বারকানাথের অধিকাংশ গানই ভারতরমণীর চিরবদ্ধদৈন্যদশার বিরুদ্ধে মুক্তির আহ্বান। কৃষ্ণধনের নারীগীত নারীর বৈধব্যের জন্য অশ্রুপাত। দ্বারকানাথ চেয়েছিলেন নারীর সামাজিক মুক্তি। তাঁর নারীচেতনা জাতীয় আন্দোলনেরই শাখানদী মাত্র। তাই দ্বারকানাথের এই বিখ্যাত গানটি কোনো কোনো প্রাচীন কাব্য-গীতসংকলনে স্বদেশী পর্যায়ে স্থান পেয়েছে—

না জাগিলে সব ভারতললনা এ ভারত আর জাগে না জাগে না
অতএব জাগো জাগো গো ভগিনী হও বীরজায়া বীরপ্রসবিনী
শুনাও সন্তানে শুনাও তখনি বীর গুণগাথা বিক্রমকাহিনী...

মধুসূদনের কবিকল্পনায় যে বন্দিনী নারীর চিত্রকল্পটি বারবার জেগে উঠেছিল, তারই সমসাময়িক দ্বারকানাথ সংগীতে তাকে গেঁথেছেন অনুপম করে—

কী পাপে পাঠালে বিধি করে বঙ্গনারী
প্রকৃতিরঞ্জিত ছবি জনমনোহারী।
জলে স্থলে শূন্যে একা স্বরূপ লাবণ্যমাখা
এ পোড়া নয়ন আছে দেখিতে না পারি।

পিঞ্জরের পাখিসম দিবানিশি অষ্ট যাম
ঘুরে ফিরে এক ঠাঁই বারবার তা নেহারি।......

'স্মরিলে পূর্বের কথা অশ্রুজলে আঁখি ভাসে', 'নির্বাণ আশার দীপ সব অন্ধকার' 'ভারতদুঃখিনী আমি' প্রভৃতি দ্বারকানাথের এই গানগুলিও একাধিক সংকলনে দেখা যায়।

নারীর একটি বিশিষ্ট রূপ ফুটে উঠেছে বিহারীলালের কাব্যে, প্রীতিবিষয়ক গানের আলোচনায় তার উদাহরণ আছে। বিহারীলালের কবিতায় গীতি-কাব্যের আত্মস্বাতন্ত্র্য ও কবিমনের ব্যক্তিত্ব সর্বপ্রথম ঘোষিত হয়েছে, সেই সঙ্গে প্রেম ও নারীত্বের মূল্যবোধেরও চেষ্টা করা হয়েছে। বিহারীলাল বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের কবি, সাংসারিক মিলনের প্রীতিবন্ধকেই তিনি কাব্যে প্রশংসা জানিয়েছেন। তাই অসামাজিক প্রেম তাঁর রুচিকে আঘাত করেছে। অন্ধ প্রেমের উগ্রতাকে তিনি বরদাস্ত করতে পারেননি। তাঁর একটি কাবগীত এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে—

অসার প্রেমেতে ভুলে কেন হও প্রবঞ্চিত
বিপদকালে দেখিবে কে তব সুহৃদ কত।
রূপ গুণ ধন যৌবনে শ্রুতিমধুর বচনে
বিমোহিত হয় যেই সেই অতি অবোধ চিত
অদ্য যে প্রেয়সী-শোকে করাঘাত হানে বুকে,
কল্য সে বিবাহ তরে হইতেছে সুসজ্জিত।
নয়নান্তরাল হলে কে কাকে আপনার বলে
সরল হৃদয়ে ভালবেসে আনন্দিত।...

এই প্রসঙ্গে বিধবাবিবাহকেন্দ্রিক কৌতুক-পরিহাসের গানগুলি উল্লেখ্য। বিদ্যাসাগরপ্রবর্তিত বিধবাবিবাহ আন্দোলন এবং সরকারি আইন সনাতন বঙ্গসমাজের সংস্কার ও গৃহভিত্তিকে গভীরভাবেই নাড়িয়ে দিয়েছিল সন্দেহ নেই। এই ঘটনা ও বিক্ষোভ সাহিত্যের সমস্ত শাখায় আপন প্রতিক্রিয়া রেখে গেছে, সুতরাং সংগীতে তো রাখবেই। পূর্ব আলোচনায় অর্থাৎ নারীপ্রসঙ্গিত গানগুলিতে কৌলীন্যপ্রথা, বৈধব্য, বাল্যবিবাহ সম্পর্কে যে দুঃখবেদনা বা ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবের পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তা সবই বিধবাবিবাহ আন্দোলন প্রবর্তনের পরবর্তী ঘটনা। স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেমন বহু গানে সাধারণ শিক্ষিত-অশিক্ষিত উচ্চনীচ অগণিত গীতিকারের কৃতজ্ঞ শ্রদ্ধাঞ্জলি কুড়িয়েছেন, তেমনি বিধবাবিবাহ ঘটনাটিও অনেক গানের ও

গীতিকারের পরিহাসের সামগ্রী হয়ে উঠেছিল। যেমন মহেশচন্দ্র দে লিখিত একটি সুপরিচিত গানে বিদ্যাসাগরের প্রতি বিধবাদের অভিনন্দন—

সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে।
কবে হবে শুভদিন প্রকাশিবে এ আইন
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরুবে হুকুম
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম
মনের সুখে থাকব মোরা মনোমত পতি লয়ে।
এমন দিন কবে হবে বৈধব্যযন্ত্রণা যাবে
আভরণ পরিব সবে লোকে দেখবে তাই ;—
আলোচাল কাঁচকলা মালসার মুখে দিয়ে ছাই ;—
এয়ো হয়ে যাব সবে বরণডালা মাথায় লয়ে।

কিন্তু এর পাশেই অনুরূপ আর একটি গানের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে যার বিদ্রূপ ভঙ্গিটি অত্যন্ত চতুর সূক্ষ্ম ও অপ্রত্যাশিত। যথা

বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে
কবে হবে এমন দিন প্রচার হবে এ আইন
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরোবে হুকুম,
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম
সধবাদের সঙ্গে যাব বরণডালা মাথায় লয়ে।
আর কেন ভাবিস লো সই ঈশ্বর দিয়াছেন সই
এবার বুঝি ঈশ্বরেচ্ছায় পতিপ্রাপ্ত হই ;
রাধাকান্ত মনোভ্রান্ত দিলেন নাকো সই
লোকমুখে শুনে আমরা আছি লোকলাজভয়ে।
একাদশী উপসের জ্বালা কর্ণেতে লাগিত তালা
ঘুচে যাবে সে সব জ্বালা জুড়াবে জীবন
দুজনাতে পালঙ্কেতে করিব শয়ন
বিনানিয়া বাঁধব খোঁপা গুঁজিকাঠি মাথায় দিয়ে।
যেদিন হতে মহাপ্রসাদ শুনেছি ভাই এ সম্বাদ
সেদিন হতে আনন্দেতে হয় না রেতে ঘুম—
পছন্দ করেছি বর না হতে হুকুম।
ঠাকুরপোরে করব বিয়ে ঠাকুরঝিরে বলে কয়ে।

বস্তুত উনিশ শতকের কাব্যপ্রসঙ্গে নারী এক বৃহৎ স্বতন্ত্র আলোচনার অফুরন্ত প্রেরণা। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'সংগীতকোষে'র কবিপরিচয়হীন এই গানটিতে অন্য-মনস্ক স্বামীর প্রতি প্রৌঢ়-প্রেমিকার কথিত কটাক্ষটি উপভোগ্য—

যখন প্রাণ ছিলে প্রাণে কত মশলা দিতেম পানে
এখন কাছে পেলে পরে সদা কর পানে পানে।
আর কি আমার সেদিন আছে চূণের ভাঁড় শুখায়ে গেছে
তালপুকুরের নাম রয়েছে তার উবুজল নাই মাঝখানে।
খয়ের করে কেয়া ফুলে বাঁধিব সে ফুলে ফুলে
ক্রমে অঙ্গ গেল ফুলে মলেম বুঝি এত দিনে।
সুমনে সুপারি দিয়ে সুখের তরণি ভাসাইয়ে
প্রেমের বাদাম উড়াইয়ে ডুবি বিচ্ছেদ-তুফানে।
যতনে দিয়ে জোয়ান ধোনে পেয়েছিলাম তোমা-ধনে,
এখন এ নব যৌবনে হানিছে মদন পঞ্চ বাণে।
যে দিনে দিলাম দারচিনি সে হতে প্রাণ তোমায় চিনি
এখন আমি বালি তুমি চিনি চেনাচিনি নাই দুজনে।
ছোটএলাচ লয়ে সুখে দিতাম জাহ্ন তোমার মুখে
এখন দেখ না তো চেয়ে ফিরে অধীনীর পানে।
শিশিভরা কর্পূর ছিল কপালক্রমে উবে গেল,
লবঙ্গ বিবর্ণ হল গন্ধ হয়েছে জাফরানে।
যখন আমার ছিল বাহার দিয়ে থাকতাম কত বাহার
গুণগুণ করে গেয়ে বাহারে উড়ে বসতাম মধুপানে।

মনোমোহন বসুর একটি গানে উনিশ শতকীয় সমাজে বিবাহিত নারীজীবনের এক জাতীয় দুঃসহ অবস্থায় পরিচিত চিত্র পাই—

সই যে জালা সই হায়! তা কারে কই?
প্রেম তো ঘুচে গেছে, মুখের আলাপ মিছে আছে
ঘর করা সায় গোঁচেগাচে—জ্যান্তে মরা হয়ে রই।
রমণীর বল অভিমান সে বল রাখবার নাহি স্থান
যে সাধবে যে রাখবে সে মান সে তো সদা হতজ্ঞান—
কুসঙ্গে রয় কুরঙ্গে মদের হ্রদে ঢেলে প্রাণ!
সেই বিষে সব জলে গেল সর্বনেশে বুঝলে কৈ।

বিয়ের বেলা কী উল্লাস বর করেছে বি. এ. পাশ।
বাগবাগিচে বেচে বাবা দান দিলেন তাই পুরিয়ে আশ।
কে জানে সেই গুণধর সাজবে বাঁদর স্বরাদাস।
আশার গাছে তুলে পিছে কেড়ে নিলে সুখের মই।

নারীদুঃখবিষয়ক গানের ক্ষেত্রে নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের 'ভারত-নারীর দশা দেখে অশ্রু ঝরে', 'ডুবিল সোনার দেশ পাপের সাগরে', অমরচন্দ্র দত্তের 'কতদিন বল ভারতরমণী কাঁদিয়ে কাটাবে দিবসযামিনী', ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের 'মনের দুঃখ বলব কারে অনাথা বিধবা বলে কে চাহিবে দয়া করে', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'কেঁদ না রে অনাথিনী কেঁদ না কেঁদ না আর' এবং 'কে কাঁদিছ একাকিনী এ নির্জন স্থানে' এইগুলির উল্লেখমাত্র করে এই প্রসঙ্গের যবনিকা টানা যেতে পারে।

খ. "হায় রে কী হাস্যাস্পদ মনুষ্য কি চতুষ্পদ…"

উনিশ শতকের কাব্যসংগীতের বিপুলায়ত সঞ্চয়িতাগুলিতে রঙ্গব্যঙ্গ-পরিহাস-মূলক গানের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। বস্তুত ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যের বিবর্তনইতিহাসে সমগ্র কৌতুকবিদ্রূপমূলক সাহিত্যের যে ভূমিকা, হাসির গানেরও সেই একই ভূমিকা। বিদেশী সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে সনাতন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রারম্ভিক পরিচয়জনিত সংঘর্ষই বাঙালির রক্ষণশীল মানসসরোবরে কৌতুক ও ব্যঙ্গের তরঙ্গ জাগিয়েছিল। বাঙালির উৎকট বিদেশিয়ানা, অন্তঃসারশূন্য আড়ম্বর ও ভণ্ডামি, ইয়ং বেঙ্গলের দূষিতাচার, ইংরাজি শিক্ষার উগ্র অহমিকা—এই সব বিষয় নিয়ে যেমন নকশা উপন্যাস কথকতা প্রহসন গড়ে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে গানের বিষয়বস্তুতেও তার প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হয়েছে।

বাঙলা কৌতুকসংগীতে উল্লেখযোগ্য হলেন, রূপচাঁদ পক্ষী, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, গোবিন্দ অধিকারী, বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ব্রজমোহন রায়, মতিলাল রায়, অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, যদুনাথ চক্রবর্তী, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাছাড়া অজ্ঞাতনাম কবিদের রচনা তো আছেই।

বাঙলা কাব্যের আধুনিকতার ইতিহাসে প্রথম নাম ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের, যদিও

বাঙলা কাব্যসংগীতের ইতিহাসে তিনি প্রথম প্রবর্তয়িতার সম্মান পাননি। তবে কাব্যছন্দের সঙ্গে স্বরনির্ভর গীতিরচনাতে উনিশ শতকের অধিকাংশ কবিরই অনুরাগ এবং আসক্তি ছিল, গুপ্ত কবিরও ছিল। তাছাড়া ঈশ্বর গুপ্ত স্বয়ং কবি আখড়াই হাফআখড়াই দলে গান বেঁধে দিয়েছেন এবং তারই অন্তরঙ্গ যোগসূত্রে প্রাচীন বঙ্গের লুপ্তপ্রায় গীতসংগ্রহে তাঁর প্রয়াস চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঈশ্বর গুপ্তের গান প্রধানত তত্ত্ব ও পরমার্থসংগীতজাতীয়। কিন্তু কয়েকটি সংগীতে তাঁর পরিহাসধর্মী ব্যঙ্গবিদ্রূপশীল মনোবৃত্তির সন্ধান মেলে। উদাহরণ বাউল সুরে রচিত ('বাঙ্গালীর গানে'র নির্দেশে বসন্ত বাহারে রচিত) তাঁর একটি উদ্‌ভট রসের গান দীর্ঘকাল ধরে জনপ্রিয় হয়ে আছে—

দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে রাত পোহানো ভার
হল পুন্নিমেতে অমাবস্যা তের পহর অন্ধকার।
এসে বেন্দাবনে বলে গেল বামী বোষ্টমী
একাদশীর দিনে হবে জন্ম-অষ্টমী ;
কাল ভাদ্দর মাসের সাতই পোষে চড়ক পূজার দিন এবার।...
ঐ সুজ্জি মামা পূর্ব দিকে অস্তে চলে যায়
আর উত্তরদক্ষিণ কোণ থেকে আজ বাতাস লাগছে গায়,—
সেই রাজার বাড়ির টাটু ঘোড়া সিং উঠেছে দুটো তার।
ঐ কলু রামী ধোপা শামী হাসতেছে কেমন
এক বাপের পেটেতে এরা জন্মেছে কজন ;
কাল কামরূপেতে কাক মরেছে কাশীধামে হাহাকার।

ঈশ্বর গুপ্তের ঈষৎ বয়োকনিষ্ঠ এবং সমসাময়িক কবি রূপচাঁদ পক্ষী তাঁর বিচিত্র গৃহীত পদবী এবং তির্যক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা বাঙলা কাব্যে একটি স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ দাবি করেন। তাঁর অধিকাংশ গানেই সমকালীন ঘটনা বা হুজুগ বিদ্রূপের উপকরণ সংযোজনা করেছে। ইংরাজি-বাঙলা-হিন্দিমিশ্রিত ভাষায় তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রণয়বিবরণ তথা যাত্রা-পাঁচালি-আখড়াই গানের বিষয়ঘটিত রীতির প্যারডি করেছেন। যেমন একটি অনুরূপ গানের দৃষ্টান্ত—

আমারে ফ্রড করে কালিয়া ড্যাম তুই কোথায় গেলি
আই এ্যম ফর ইউ ভেরি সরি গোলডেন বডি হল কালি।...
পুওর কিরিচার মিল্‌ক্ গেরেল তাদের ব্রেস্টে মারিলি শেল
ননসেন্‌স তোর নাইক আক্কেল ব্রিচ অব কনট্রাক্ট্ করিলি।...

লম্পট শঠের কম্বচুন খুলল, মথুরাতে কিং হল.

আংকেলের প্রাণ নাশিল কুবুজায় কুঁজ পেলে ডালি।...

রূপচাঁদ পক্ষী এই ধরনের গীতরচনায় যে সুদক্ষ হয়ে উঠেছিলেন তা তাঁর লেখা 'লেট মি গো ওয়ে দ্বারী আই ভিজিট টু বংশীধারী' গানখানি শুনলেই বোঝা যায়। ঈশ্বর গুপ্ত ইংরাজিশিক্ষিত আধুনিক তরুণ সমাজের উগ্রতাকে বরদাস্ত করতে পারেননি, রূপচাঁদও বাবু নামক কপটাচারী সম্প্রদায়কে একটি গানে ব্যঙ্গচিত্রিত করেছেন—

ওরে সামাল সামাল বাস্তু ঘুঘুর পাল, বেরোল সাজিয়ে যেন পঙ্গপাল।
এরা কুহকমন্ত্র জানে বশীকরণ গুণে, লোকে টেনে এনে করে রে নাকাল।
খোসামোদি তোষামোদি আজ্ঞাকারী মধুর চাটুবাক্য বদনেতে পুরি
বাবুতোষা পেশা খাসা দোকানদারি খোনে ভাঙা রসিক চোঙা ফক্কড়গিরি
খেতে শুতে বসতে কুড়োয় কত গাল।
এই ঘুঘুবাবু কৃপা করেন যারে শনিগ্রহে তারে কী করিতে পারে
গ্রহশান্তি যাগে শনি হতে তরে ঘুঘুবাবু সাক্ষাৎ মহাকাল ;
পূজা লন ঘুঘু ষোড়শ উপচারে, ধূনার গন্ধে যেন মনসা নৃত্য করে
এদের কুমন্ত্রণায় ভিটায় ঘুঘু চরে, ধন হরে মান হরে করে নাজেহাল।...

কলকাতা শহরের যান্ত্রিক উন্নতি ও নাগরিক চেতনাবৃদ্ধির বহুবিধ লক্ষণ দেখে রূপচাঁদ 'ধন্য ধন্য কলিকাতা শহর' নামে একটি দীর্ঘপদী গান রচনা করেছিলেন। এতে অবশ্য শ্লেষের তুলনায় বর্ণনাবাহুল্য ঘটেছে এবং রক্ষণশীলতায় ঈষৎ বিস্বাদ। অবশ্য কখনো কখনো ক্লিষ্ট শব্দচাতুর্যের ফাঁক দিয়ে তাঁর প্রগতিশীল মানবিকতার সন্ধান মেলে। কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতা কন্যাবিবাহের উদ্যোগে কিরূপ সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন, তারই এক কৌতুককর চিত্র এঁকে রূপচাঁদ ধনী জ্ঞানী গুণী সমাজের কাছে এ বিষয়ে চূড়ান্ত মত দাবি করেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে পাত্রের পিতা অনেক সময় পাত্রের বিদ্যাবত্তার মিথ্যা বিবরণ দিয়েও পাত্রীর পিতার সর্বনাশ সাধন করে থাকেন বলে রূপচাঁদ গানটিতে জানিয়েছেন—

জন্মে পাশ করা নয়, বওয়াটে ফেল বয়
বরের বাবা মিথ্যা কয় ধন লোভেতে।
দাতব্য পাঠশালে চিরকাল পড়ে ছেলে
বিয়ের সম্বন্ধ এলে দেন স্কুলেতে।

বিবাহে মেয়ে মারে মাল অমনি গুটিয়ে নেয় জাল
যে রাখাল সেই রাখাল পাঁচনি হাতে।...

অলংকার চায় না ইদানী কোম্পানির কাগজ রেডি মনি
বাড়ির পাট্টা সোনার গিনি চায় হাত্তে হাতে,
মেয়ের বেলা বেলতলা নিমতলা ছাদ খোলা
মরা দুগাছা সোনার বালা ছাচলা তলাতে।...

বিয়ে কর্তে টাকা চায় ছি ছি মরে যাই লজ্জায়
আর্যের কলঙ্ক রটায় আর্যাবর্তবাসীতে।—
খগপতির এই মিনতি যার যেরূপ হয় সংগতি
দেওয়া লওয়া সেই পদ্ধতি হোক ধর্মমতে।
বিবাহের ঘোর বিপদ হায় রে কী হাস্যাস্পদ
মনুষ্য কি চতুষ্পদ হল ভারতে।

মাত্র এই কয় পংক্তিতে শ্লেষ ও বিদ্রূপের অন্তরালে ছদ্মনামধারী খগপতির তথা রূপচাঁদের করুণ আন্তরিকতা ও মানবিক হৃদয়বৃত্তির সন্ধান পাওয়া যায়। যে বিবাহপদ্ধতির দ্বারা দুটি নরনারীর জীবনে এক মধুর সাংসারিক বন্ধন চিরদিনের জন্য রচিত হচ্ছে, তার নেপথ্যে অর্থগৃধ্নুতার নির্মমতাকে নির্দয়ভাবে কশাঘাত করেছেন কবি এই গানে (প্রথম পংক্তি 'আ মরি কী নাকাল কন্যার বিবাহকাল আজ কাল হচ্ছে দেশেতে') রূপচাঁদের আরও কয়েকটি গানে সভ্যতার বাহ্যাবরণে আত্মগুপ্ত দেশবাসীর একাংশের ভণ্ডামি কপটাচারের প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশ পেয়েছে—'আর্য জাতির উন্নতি আর দেখিনে' এবং 'আর্যজাতি সুনীতি বোঝে না ভাই' গান দুটি দ্রষ্টব্য।

ইয়ং বেঙ্গলের উদ্ভট আচারপ্রকার ও জীবনযাত্রা প্যারীমোহনের কৌতুক-গীতিতেও অসংগতিজনিত পরিহাসের সৃষ্টি করেছে। যেমন এই দীর্ঘ গানটির কয়েক পংক্তি—

চাঁপদাড়ি রাখা চোখে চশমা ঢাকা ভয়ানক চং চেগেছে বাঙলাতে
এ পথের পথিক নম্বরে অধিক দেখা যায় কেবল ইয়ং বেঙ্গলেতে।

প্যারীমোহনের এই গানটি রামমোহনের 'শেষের সে দিন ভয়ংকরের' ধরনে লেখা হলেও এই কাব্যগীতে আধ্যাত্মিকতা বিশেষ নেই, সমকালীন বাঙালি বাবুদের জীবনযাত্রার প্রতি কটাক্ষপাতই বেশি—

ওরে মন তোমারে আজ বাদে কাল ভবে পটল তুলতে হবে
এখন উপায় আছে ভেবে নে ভবানী ভবে।
কোথা থাকবে ঘড়ি বাড়ি পড়ে গড়াগড়ি যাবে,
গালপাটা কটা গোঁপে কে আদরে আতর মাখাবে
পোমেটম হেয়ারে দিয়ে কে চেয়ারে বসে রবে।
বিধুমুখে নিধুর টপ্‌পা গান করে কে প্রাণ জুড়াবে।
বুকের ছাতি ফুলিয়ে চাবুক মেরে কে জুড়ি হাঁকাবে
আরামে আরামে গিয়ে খুশি হয়ে খাসি খাবে।
রম টেনে রমণীসনে রমণে কে মজা নেবে
দুটি নয়ন করে রাঙা রগ টেনে কে কথা কবে।
টানা পাখা টাঙিয়ে দিয়ে বৈঠকখানায় বাতাস খাবে
ফুলের তোড়া সামনে রেখে সটকা টেনে সাধ মিটাবে।
রোগ হলে ডাক্তারে যখন নাড়ি টিপে জবাব দেবে
তখন কুইল ধরে উইল করে পরের হাতে দিতে হবে।
এখন একটি পয়সা ব্যয় কর না মহামায়ার মহোৎসবে
যখন পাঁচে পাঁচ মিশাবে তখন পাঁচ ভূতে সব লুটে খাবে।
খাটে তুলে ঘাটে যখন সুঁদরি কাঠে সাধ মিটাবে
প্যারী বলে যাবার সময় মোসাহেব কে সঙ্গে যাবে।

গোবিন্দ অধিকারীর 'বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের'—শুকসারীর দ্বন্দ্ব নামক এই ভক্তিগীতিটির জনপ্রিয়তা উনিশ শতক অতিক্রম করে এই শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রসারিত। এই গীতি-আঙ্গিকটি বহু কবিকে প্যারডি সংগীত-রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। উদাহরণস্বরূপ অক্ষয়চন্দ্র সরকারের এই প্যারডি গানটি উদ্ধৃত করা যাক—

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ রোজগারি ছেলে
সারী বলে, আমার রাধায় গয়না দেবে বলে
রোজগার কিসের লাগি?
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের চশমা শোভে নাকে
সারী বলে, আমার রাধায় খুঁটিয়ে দেখবার পাকে
নইলে পরবে কেন।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের দাড়ি দোলায়িত

সারী বলে, আমার রাধার চিরুনি চালিত
নইলে জটা হত।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের চেন ঝলমল
সারী বলে, আমার রাধার গোটেরই নকল
কেবল এপিঠ ওপিঠ।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের এলবার্ট টেরি
সারী বলে, আমার রাধার সিথির অনুকারী
টেরি পেলে কোথা। ··
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ কোম্‌ত তন্ত্র পড়ে
সারী বলে, আমার রাধার পূজা করবে বলে
কোম্‌ত রাধাতন্ত্র।···
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ লিখে নবেল নাটক
সারী বলে, তাতে রাধার গুণেরই চটক
তাই পড়ে পাঠক।···
কবি বলে, শুকসারীর বিবাদ সে অনন্ত যমুনা,
গোটা দুই কথা মাত্র দিলাম নমুনা,
বলি লাগল কেমন?

আধুনিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবনাচার ও মনোভঙ্গিকে রাধাকৃষ্ণের রূপকল্পে স্থাপিত করে অক্ষয়চন্দ্র এখানে বিশুদ্ধ কৌতুকের সৃষ্টি করেছেন। 'বিশ্বসংগীত' নামক কাব্যগীতিসংকলন (বৈষ্ণবচরণ বসাক সম্পাদিত) থেকে নিচে উদ্‌ধৃত এই পদটিতে কিন্তু কৌতুক আর বিশুদ্ধ নেই, একই বিষয়বস্তু যুগপ্রভাবে ঈষৎ বিকৃত হয়ে উঠেছে। শুকসারীর সংবাদকে অজ্ঞাতনামা কবি খেঁদাখেঁদির পালা নাম দিয়েছেন। পদটি—

ইডিন বনবিলাসিনী খেঁদি আমাদের
খেঁদি আমাদের খেঁদি আমাদের
আমরা খেঁদির খেঁদি সকলের।
শুক বলে, আমার খেঁদা কল্কি অবতার
সারী বলে, আমার খেঁদি কিম্ভূত কিমাকার
নইলে মানাবে কেন;
শুক বলে, আমার খেঁদা কেমন সাবান মাখে

সারী বলে, আমার খেঁদি পাউডারে রং ঢাকে
কোথায় সাবান লাগে।
শুক বলে, আমার খেঁদার বামে টেরি কাটা,
সারী বলে, খেঁদির মাথায় মাঝখানেতে ফাটা
সিঁতের বাহার কত?
শুক বলে, আমার খেঁদার ফ্রেঞ্চকাট হেয়ার
সারী বলে, আমার খেঁদি করে নাকো কেয়ার
কাব্‌ল্ কুঁকড়ে পড়ে।...
শুক বলে, আমার খেঁদা হ্যাটকোট পরে
সারী বলে, আমার খেঁদি আড়ঘোমটা মারে
ঘোমটার বাহার কত।...
শুক বলে, আমার খেঁদা কোর্টশিপ করে
সারী বলে, সেতো কেবল আমার খেঁদির তরে
নইলে কিসের লাগি।
শুক বলে, আমার খেঁদা বড় চাকরি করে
সারী বলে, আমার খেঁদির স্থপারিশের জোরে
খেঁদায় চেনে কে রে?
শুক বলে, আমার খেঁদা খবরের কাগজ লেখে
সারী বলে, আমার খেঁদি প্রেমের নাটক লেখে
দুয়ের কোনটি ভালো?...
শুক বলে, খেঁদাকে লোকে মিস্টার বলে ডাকে
সারী বলে, খেঁদিকে মাইডিয়ার খেঁদা ডাকে
কোনটি মধুর হল?...

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে দ্বিজেন্দ্রলালও এই শুকসারীর দ্বন্দ্বের গীতরূপটি একটি প্যারডি গানে ব্যবহার করেছেন। (দ্রষ্টব্য 'কাব্যপ্রতিধ্বনি,' চিরশ্রী বিশী চক্রবর্তী ও সুধাংশুশেখর চক্রবর্তী সম্পাদিত, এই গ্রন্থে বহু প্যারডি গান সংকলিত হয়েছে)। ঠিক এই ধরনের না হলেও, রাধাকৃষ্ণ রূপকল্প আধুনিক কবিদের হাতে কী পরিমাণ উচ্চহাস্যময় প্যারডি বার্লেস্ক ট্রাভেস্টির বিষয় হয়েছে তার একটি উদাহরণ গিরিশচন্দ্রের গান থেকে দেওয়া যেতে পারে—

রাধা। ধিনিকেষ্ট তিনি তা, তুই পায়ের ওপর দে না পা,

কৃষ্ণ। মানময়ী রাধে তুই গেলাস দুই আর হুইস্কি খা

রাধা। চাট নে বুঝি আসছে বৃন্দে সই, কালাচাঁদ হুইস্কি তোমার কই

কৃষ্ণ। বগলে এই যে বোতল প্রেমময়ী ঢালো না, তবে প্রিয়ে বাঁশরি বাজাই—

রাধা। ফেলবো কেশে দাঁড়াও মাধব হুইস্কি আগে খাই ;

কৃষ্ণ। সব খেয়ো না একটু রেখো শুকুচ্ছে আমার গলা।

পঞ্চরং প্রহসন অথবা গভীররসাত্মক নাটকে হাস্যরসসৃষ্টির জন্য গিরিশচন্দ্র অমৃতলাল ক্ষীরোদপ্রসাদ একাধিক কৌতুকগীতি রচনা করেছিলেন। কিন্তু সেইগুলি একান্তই নাট্যনিহিত, নাটকের বাইরে স্বতন্ত্র কৌতুকবিষয়ক কাব্য-গীতিরূপে তাদের কোনো সার্থকতা নেই বলে সেগুলির আলোচনা আমরা উহ্য রাখলাম। অতুলকৃষ্ণ মিত্র অমরেন্দ্রনাথ দত্তের কৌতুকগীতিও নাট্যান্তর্গত বলে তাঁদের সম্পর্কেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য।

শহর কলকাতা চিরকালই কৌতুকগীতির বিলক্ষণ উপকরণ। রূপচাঁদ পক্ষীর 'ধন্য ধন্য কলিকাতা' শহর গানে উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশকের নগরজীবন তার সমস্ত বিলাস বৈভব ও অসংগতিসহ আত্মপ্রকাশ করেছে। কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখিত হুতোম পাঁচার নক্‌শার সেই অবিস্মরণীয় পংক্তিগুলিও গানরূপে একদা জনপ্রিয় ছিল—

…হেথা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারি ঐক্যতা
যত বক্‌ বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী বদমাইসির ফাঁদ পাতা।…

আর একটি গানে হুতোম গেয়েছিলেন 'বিদায় হও মা ভগবতী এ শহরে এসো না আর।' সংগীতকোষে উদ্ধৃত এই গানটির রচয়িতার নাম অজ্ঞাত—একটি গীতসংকলনে কবির নাম আছে কেঁড়া দাস—

হদ্দমজা কলিকালে কল্লে কলকাতায়
মাগীতে চড়ল গাড়ি ফেটিং জুড়ি হাতে ছড়ি হ্যাট মাথায়।
ষষ্ঠী মাকালী আর মানে না, সেঁজুতির ঘর আর আঁকে না
আরশিতে মুখ আর দেখে না এখন কেবল ফটোগ্রাফ চায়।
এখন গাউন পরে ঘোড়ায় চড়ে, গঙ্গাস্নান তো দেছে ছেড়ে
গোসলখানায় খানসামাতে তোয়ালে দিয়ে গা মোছায়।…

এর সুর বাউলের, ভঙ্গি ঈশ্বর গুপ্তের, মনোভঙ্গি রক্ষণশীলতার। দেশের সামাজিক

জীবনের যত অসংগতি কদাচার, সভ্যতার যত সফেন গ্লানি, বিজ্ঞানের উন্নতির দীপান্তরালে যত বিকৃতির অন্ধকার—সব কিছুর কেন্দ্র এই মহানগর। সুতরাং উপন্যাসে গল্পে নাটকে প্রহসনে সংগীতে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই কলকাতা ও তার জনজীবন প্রাধান্য লাভ করবে বিচিত্র কী? নাগরিক জীবনের যত কিছু বিকৃতি ও কদাচার, স্বার্থপরতা ও অর্থলোলুপতা, প্রতারণা ও চরিত্রভ্রষ্টতা সবই এই নগরজীবনের আচ্ছাদন। প্রাচীন বাঙলা গানের একটি বৃহৎ অধ্যায় এই নগরসংস্কৃতির উপর দাঁড়িয়ে আছে, যেগুলি অবলম্বন করে আমাদের নাগরিক জীবনের বিবর্তনের একটি রেখাচিত্র রচনা করা যায়। 'পোড়া দেশের পায়ে নমস্কার'—কবিগানের পরিচিত আঙ্গিকে জনৈক লুপ্তপরিচয় কবি এইরূপ নাগরিক কপটাচারের ছবি এঁকেছেন, তারই অংশবিশেষ—

চিতেন। যাদের পাঁচিধুতি জুটত না আজ পেণ্টুলেন পরে
পেয়ে খর কোটালবান ডেকেছে চড়ার উপরে
আস্ফালনে কাঁপে মাটি রাখতে নারে অহংকার।

আস্থায়ী। সই করে দে টাকা নিয়ে শেষে নাবালক
ন্যায় অন্যায়ে কাজ কী, আইন বজায় আবশ্যক।
টাকার লোভে সকল ডোবে ধর্মাধর্ম সদাচার।

আর একজন অজ্ঞাতনামা কবি বাউলের সুরে সামাজিক অগ্রগতিকে বিদ্রূপ করেছেন—

সময় যত বসে যায় ভাই কতই শুনতে পাই
কাল-সাগরের ঢেউয়ে সদাই হাবুডুবু খাই।
নাই আর কুলবতীর লাজ, সদাই বিবিয়ানা সাজ
রান্নাবান্না ছেড়ে দিয়ে ছুঁচে দড়ি কাজ
আবার গাউন কষে দেশবিদেশে গেসে বেড়াই যাচ্ছেতাই। ..

বাবুগিরির উপর দাশরথি রায়ও বিদ্রূপগীতি রচনা করেছিলেন ('মরি কি বাবুগিরি')। আনন্দচন্দ্র মিত্রের একটিগানে জীবনের কুৎসিত ভণ্ডামি উদ্ঘাটিত হয়েছে—

অবাক কল্লে জুয়াচোরে
গেল সোনার বাঙলা ছারেখারে।
ভাল মানুষ হতভাগ্য বিজ্ঞ হয়ে অন্নে মরে।

আবার সোনার দরে রাং বিকোচ্ছে কেবল বিজ্ঞাপনের জোরে।···
কেহ হল রাজনীতিজ্ঞ দুই একটা বক্তৃতা করে,
আবার কেহ হল দেশের বন্ধু গালি দেয় ইংরেজেরে।
কেহ হল ভক্ত সাধু অকথ্য ভাণ্ডামি করে,
ওদের স্বার্থ বটে পরমার্থ, অর্থ পেলে সকলি করে।
আশ্চর্য এক দলাদলি, ক্ষুদ্র সাহিত্যের বাজারে,
তাতেই কেহ হল কবিশ্রেষ্ঠ অবিকল তর্জমা করে।

আনন্দচন্দ্রের গানের শেষ পংক্তিটি সম্ভবত বাঙলা সাহিত্যের তৎকালীন কোন তর্জমাকারী কবিশ্রেষ্ঠের প্রতি উদ্দিষ্ট, কালের ব্যবধানের সে পরিচয় হারিয়ে গেছে। দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার কপট সন্ন্যাসীদের প্রতি এই বলে ক্ষোভ ও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন—

সোজা রে সন্ন্যাসী সাজা, হওয়া সেটা বিষম ল্যাটা
অহংব্রহ্ম বল্লে কি হয়, ফল্লে বটে মানি সেটা।··

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কমলাকান্তের দপ্তরের আমার মন প্রবন্ধে মেটিরিয়াল প্রস্‌পারিটির তুলনায় মানবাত্মার হিতসাধনের অপ্রতুলতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। দুর্মুখ নন্দী নামধারী জনৈক গীতিকার এই কাব্যসংগীতে মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রতি দেশের বৈষয়িক উন্নতির জন্য অনুরূপ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেও শেষ পর্যন্ত ন্যায়নীতির ক্রমান্তর্ধানে বেদনাবোধ করেছেন—

তোমার রাজত্বে নমস্কার
মা ভিক্টোরিয়া দেবী তুমি দয়ার আধার।
পুত্রসম প্রজা পালো দিয়েছ গ্যাসের আলো
বৈদ্যুতিক আলো আরো অতি চমৎকার।
ছমাসের পথে থাকি ইচ্ছামত তত্ত্ব রাখি
নিমিষে নিমিষে শুভাশুভ সমাচার—··
জড় বিজ্ঞানের ছড়াছড়ি সভ্যতার বড় বাড়াবাড়ি
দয়া সত্য সরলতা বিশ্বাস ন্যায়পরতা
কোথা চলে গেল মন করিয়া আঁধার।···

গানটি ঈশ্বর গুপ্তের 'তত্ত্ব' কবিতাটিকে মনে পড়ায়। প্যারীমোহন কবিরত্নের বিভিন্ন প্রকার কৌতুকগীতির পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। তিনি বিভিন্ন প্রকার খাদ্যবস্তুর গুণকীর্তন করে কয়েকটি পরিহাসিক গান রচনা করেছিলেন

ঈশ্বর গুপ্তের অনুকরণে। যেমন, মৎস্য সম্পর্কে—'মাছের যতন খাসা খাবার জিনিস আর কিছু নাই ভূমণ্ডলে'। পাঁঠা এবং কলায়ের ডালও তাঁর প্রশংসা-পত্র লাভ করেছে—'যত রকম ডাল আছে এ সংসারে, কলায়ের কাছে সব শালা হারে।' তরকারির মধ্যে আলুবেগুনের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা—'আলুর সমান জিনিস কিছু নাই' এবং 'কব বেগুনের গুণ যে কত'। ব্রজমোহন রায়েরও একটি মৎস্যবিষয়ক গান পাই—'দেখ জলে দলে দলে মাছে করে খেলা।' অজ্ঞাতনামা কোন কবি লিখেছিলেন—'পাঁঠা তুমি ভাগ্যবান'।

গ. "তুমি আমার টাকা হও মা"—

আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে মুদ্রা-অর্থনীতির প্রভাবেই মানুষের জীবনে যত জটিলতা, স্বার্থসংঘাত ও ব্যক্তিসম্পর্ক নির্ধারণ, নাগরিক গীতিকবিরা এই সত্য উপলব্ধি করেছেন। সেই অর্থ অবলম্বনে সেকালে কম কৌতুকগীতি রচিত হয়নি। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ভক্তিপ্রবণ কবি কুঞ্জবিহারী দেবও সংসার জীবনে এই অর্থের দুঃখজনক পরিচয় পেয়েছিলেন, সে অভিজ্ঞতা তাঁর গানটিতে—

> টাকার মত প্রিয় বস্তু কিছুই নাই আর এ সংসারে
> তুমি আমার টাকা হও মা রাখি হৃদয়ভাণ্ডারে।
> তুমি আমার টাকা হলে রাখব সযতনে হৃদ্‌কমলে
> মা আমার সকল দুঃখ দূরে যাবে চলে ভাসব সুখের পাথারে।
> দিবানিশি কৃপণের মন পড়ে থাকে টাকায় যেমন মা,
> তেমনি আমার মন ঐ চরণতলে পড়ে থাকুক একেবারে।

নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ ক্ষীরোদপ্রসাদ-গিরিশচন্দ্রের কিছু নাট্যসংগীতের মত হিন্দিতেই একটি রূপেয়ার যুগগীতি রচনা করে ফেলেছেন—

> রূপেয়া সাফ করে জঞ্জাল
> আরে দুনিয়া ভরকে রূপেয়া সেরা মাল।
> রূপেয়াওয়ালা সবসে বড়িয়া সবসে উঁচা চাল
> রূপেয়া সাফ করে জঞ্জাল।
> রূপেয়া লেকে দুনিয়াদারি দিলদরিয়া চাল
> ঝুটা আদমি সাচ্চা হোয়ে রূপেয়াকো এ হাল। রূপেয়া··

ধর্মী কর্মী সব কোই জানি রূপেয়া কো কাঙাল.
রূপেয়া লেকে বুড্‌ঢা লেড়কা জোয়ানি হোই ছাওয়াল। রূপেয়া… ॥
হামার হামার সব কোই বলে সব কোই হোয়ে লাল,
বাহবা রূপেয়া কোইকো নেহি ইয়ে মেরে সওয়াল। রূপেয়া…

মুদ্রার অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের মানদণ্ডে অধুনা পারিবারিক সম্বন্ধ নির্ধারিত হয়, রক্তবন্ধনে স্নেহবন্ধনে নয়, প্যারীমোহন কবিরত্নের দীর্ঘচরণ এই গীত তারই বাস্তব উপলব্ধিতে জীবন্ত মনে হয়—

যার পয়সা নাই ওরে ভাই সংসারে তার মরণ ভালো,
পয়সা ভিন্ন হয় না পুণ্য মান্যগণ্য কে করে বলো।
পয়সাহীন হলে নরে লোকে তারে নিন্দা করে
প্রাণের সহোদর সমাদরে আলাপ করে না ;
বন্ধুগণে তায় না গণে, সুতাসুতে বশে থাকে না—
পিতামাতা কত না কথা, মর্মে ব্যথা দেন তার প্রবল।
নারকী নরের করে পাপ পয়সা হলে পরে
পুণ্য হয় সংসারে নরে কে না করে যশোগান—
অর্থবশে অনায়াসে সভায় বসে হয়ে মান্যমান ;
কুলে শীলে দীন হলেও কুলীন বলে তারে সকল।
দরিদ্র হইলে পতি প্রাণপ্রেয়সী রসবতী
রোষান্বিত হয়ে অতি পতির পাশে ঘেঁসে না।
সদাই বলে, বাঁচি মলে পোড়া কপালে সুখ হল না ;
পাইনে বসন পাইনে ভূষণ অনশনে চিরদিন গেল।
কত পুরুষ মেগের ভয়ে গহনা গঞ্জনা দায়ে
রেতে থাকেন বাহিরে শুয়ে চোরের মত হয়ে ভাই,—
উঠে এসে গিন্নির পাশে যদি বলে একটু আগুন চাই
(গিন্নি তামাক খাব আগুন চাই)
চাইলে আগুন হয়ে আগুন বলে গয়ার পাপ কেন এলি।
সেই পুরুষের পয়সা হলে অমনি গিন্নি ঘোমটা খুলে
কাছে এসে হেসে বলে, কর্তারে জলখাবার দেও
পিত্তি পড়ে হবে পীড়ে, যদি না খাও আমার মাথা খাও
কবি বলে ভূমণ্ডলে পয়সায় পিরীত জেনো কেবল।

বলা বাহুল্য, এই গানের সমাজসত্য ব্যবহারিক জীবনের পরীক্ষিত অভিজ্ঞতার নিকষেই জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাই কবিত্বে দীনতা থাকলেও এর সবেদন বিষন্ন কৌতুকটি আজও উপভোগ্য। প্রসঙ্গত রূপচাঁদ পক্ষীর লেখা ধনবৈপরীত্যের একটি তির্যক গীতি উদ্ধারযোগ্য—

ধনহীনে ত্রিভুবনে মান্য কে করে
ক্ষুদ্র লোকে হয় রুদ্র ধনঅহংকারে
চর্মকর্ম করা মুচি টাকার গুণে হয় সে শুচি
তার ঘরেতে মোণ্ডালুচি ব্রাহ্মণে মারে।
নাই ব্যবসাতে দোষ দিয়ে সাহস এক শ্লোক ঝাড়েন পরে,
ধনং উপার্জনং জন্যং ন দোষঃ ন দোষী করে।
কড়ি থাকলে বুড়োর বিয়ে নির্ধনী যুবা বসিয়ে থাকেন হা করে,
আইবুড়ো হয়ে চেয়ে খেয়ে পথে যান মরে।
তিথির দোষে শেষে তারে মহাপাপ ঘেরে।
জগতে মান্য টাকা, টাকায় সারে ন্যাকা ভ্যাকা,
সভ্য মেজাজ হয় বাঁকা ফুলিয়ে যান ছাতি।
টাকার জোরে ভেকে মারে হাতিকে লাথি।
থাকলে পাতি সংগতি খোঁড়া ঢোঁড়া ফোঁস করে।
পতির না থাকলে সংগতি সাধ্বী সতী রসবতী
সে বিরক্ত হয়ে অতি শয্যাত্যাগ করে।
ছলে আগুন চাইলে দ্বিগুণ তিরস্কার করে।
ফুড়ুক ফুড়ুক টানছ গুড়ুক উপায় কর্তে যমে ধরে।
ব্যাধিগ্রস্তের থাকলে রেস্ত তার নারী হয়ে শশব্যস্ত
ইচ্ছামত করতে সুস্থ বিবিধ মতে
বলে এসো জল খেতে বসো কাজ কি দেরিতে
দিয়ে আদার কুচি খাও গো লুচি
মিশ্রি দেও দুধের সরে।

রূপচাঁদের এই গানখানিই প্রাগুক্ত প্যারীমোহনের অর্থবিষয়ক কৌতুকগীতিটির অনুপ্রেরণা, তাতে সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে অপেক্ষাকৃত আধুনিক একটি গান উল্লেখ করছি—

দারুণ পয়সার কাঙাল হইলাম সংসারে
পয়সাশূন্য দেখে লোকে ঘৃণা করে আমারে।...

যখন হাতে হবে পয়সা, পয়সার আশা

ভালবাসে পরস্পরে।

প্রাণপ্রেয়সী হাসি হাসি গুমান ছেড়ে পাযে ধরে।

জগৎচন্দ্র দাসে বলে, ভূমণ্ডলে

পয়সার কাঙাল হয সকলে

পযসাহারা কপালপোড়া ভগ্নগৃহে বসত করে।[৩]

ঘ. খ্যাতিসংগীত

কালচেতনা, সমকালীন জীবন সম্পর্কে আগ্রহ, বাস্তবচেতনা ও ইতিহাসবোধ যেহেতু আধুনিক মানুষের স্বভাব, সেইজন্য এই বিশিষ্টতাগুলির দ্বারা চিহ্নিত হয়েই আধুনিক সাহিত্য নির্দিষ্টভাবে প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় সাহিত্য থেকে পৃথক হযে উঠেছে। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের সকল শাখায়, বিশেষ করে কাব্যের ক্ষেত্রে ইতিহাসচেতনা ও কালসতর্কতা অত্যন্ত তীব্র হয়েই দেখা দিয়েছিল। নীল আন্দোলন, বিধবাবিবাহ আন্দোলন প্রভৃতি উত্তাল ঘটনার জোয়ারস্রোত বাঙলা কাব্যসংগীতকে গভীরভাবেই প্লাবিত করেছে। তাছাড়া সুরাপান-নিবারণের প্রযাস, মুদ্রাযন্ত্রনিবারণে সরকারি আইন, কলকাতা শহরের উপর উল্লেখযোগ্য কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু বা শত শত অনুরূপ ঘটনায় আমাদের তৎকালীন গীতিকাররা গান বেঁধেছেন। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর সংগীতকোষে এই ধরনের গানকে বলেছিলেন 'খ্যাতি-সংগীত'। নামটি সমর্থন করে জনৈক আধুনিক সমালোচক লিখেছিলেন—"এই গানের বিষয় কোনো স্মরণীয় ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনা। ইংরাজিতে এই জাতীয গান অকেসনাল সং বলিযা পরিচিত। তবে যেসব ইংরাজি গান বা কবিতা কাহারো মৃত্যু উপলক্ষে রচিত তাহাকে ডাযার্জ বা এলিজিও বলা হয়।

সংগীতকোষের খ্যাতিসংগীত বিভাগে সংকলিত গীতসংখ্যা ষাটের বেশি এবং এগুলির কোনটাই কবিতার স্তরে উঠে নাই অর্থাৎ সুরনিরপেক্ষ ইহাদের সাহিত্যমর্যাদা একরূপ নাই বলিলেই চলে। তবু সেকালের গান হিসাবে এগুলি চিত্তাকর্ষক। যে গান পুরাতন হইয়া গিয়াছে, যাহা আর কেহ গায় না, তাহার কথা কয়টি শুনিতে মধুর না হইলেও কৌতূহলোদ্দীপক। আবার সে গান যদি অতীতের কোনো ঘটনা লইয়া রচিত হইয়া থাকে, তবে তাহার

আকর্ষণ আরও বেশি। পুরানো চিঠি বা পূর্বপুরুষের জীর্ণ অস্পষ্ট চিত্রের ন্যায় এই ধরনের গান আমাদের মর্ম স্পর্শ করে।"[৪]

সংগীতকোষের খ্যাতিসংগীতগুলিকে প্রাগুক্ত সমালোচক চার শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন—(ক) কোনো স্বনামধন্য ব্যক্তির মৃত্যুতে রচিত। যেমন পরমহংস রামকৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদন, কালীপ্রসন্ন। (খ) কোনো স্বনামধন্য জীবিত ব্যক্তির মহিমাকীর্তন। এর ভিতর মহারানী স্বর্ণময়ী, মিস মেরি কার্পেণ্টার, ভিক্টোরিয়া, কৃষ্ণদাস পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রশস্তি আছে। (গ) এই বিভাগে পড়ে কোনো সমসাময়িক ঘটনাউপলক্ষে রচিত সংগীত। যেমন জুবিলি সংগীত, নীলকরদের অত্যাচার সম্বন্ধে গান, রেলগাড়ি, গ্যাসের আলো, টেলিগ্রাফ, জলের কল প্রভৃতির উপর লেখা গান। (ঘ) কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণে রচিত গান, যেমন পুরুরবার সৈন্যগণের সমরগান, পৃথ্বীরাজের প্রতি ভারতমাতার উক্তি, মাতার প্রতি প্রিন্স্ নেপোলিয়নের উক্তি, সিডান যুদ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়নের উক্তি, হোমিওপ্যাথি-আবিষ্কারক হ্যানিমান ইত্যাদি।

উনিশ শতকের ষষ্ঠ-সপ্তম দশকে বিধবাবিবাহ আন্দোলন ও নীল আন্দোলন জাতীয় জীবনে উত্তাপ সঞ্চারিত করেছিল। বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের প্রাক্‌কালে যে সব গান রচিত হয়েছিল, ইতিপূর্বে তার উল্লেখ করা হয়েছে। দীনবন্ধুর নীলদর্পণ নাটক প্রকাশের পর সেই নাটকখানিকে কেন্দ্র করেও কয়েকখানি গানের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। দীনবন্ধু মিত্রের নামে এই গানখানি সেকালের প্রায় সব গীত-সংকলনেই দেখা যায়—

> হে নিরদয় নীলকরগণ! আর সহে না প্রাণে এ নীল দাহন।
> দাহনের সুকৌশলে শ্বেত সমাজের বলে
> লুটেছে সকল ধন কি আর আছে এখন।[৫]...

বর্ধমানাধিপতি মহতাবচাঁদের সভাগায়ক ধীরাজের নামে প্রচলিত একটি গান প্রায় লোকসংগীতের মর্যাদালাভ করেছিল। 'সংগীতকোষে'র প্রথম সংস্করণ সূচীপত্রে গানটির রচয়িতা অক্রূরচন্দ্র সেন বলা হয়েছে; ডঃ রবীন্দ্রকুমার

দাশগুপ্ত তাঁর পূর্বোল্লিখিত 'খ্যাতিসংগীত' প্রবন্ধে বলেছেন রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র। গানটির শেষে কিন্তু ধীরাজ ভণিতা আছে—

নীলদর্পণে লংসাহেব যথার্থ যা তাই লিখেছে
নীলে নীলে সব নীলে প্রজার
বল ভাই কী রেখেছে। ··

এই দীর্ঘ গানটিতে তৎকালীন নীল আন্দোলন, লংসাহেবের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ, আইনঘটিত বিবাদ ও বিচাররহস্য, বিভিন্ন শাসক ও বিচারকের স্বার্থগত মতভেদ ইত্যাদি মূল্যবান তথ্য নিহিত। কবিগানের সুরে লেখা দীনবন্ধুর এই গানটিও বিশেষ জনপ্রিয় ছিল—

নীল বানরে সোনার বাঙলা কল্লে এবার ছারখার
অসময়ে হরিশ মলো লঙের হল কারাগার।
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার,
রামসীতার কারণে সুগ্রীবে মিতাল করে বধে রাবণে,
যত সওদাগরেরা সহায় এদের, বাঁদর জুটো এডিটার।
এখন স্পষ্ট লেখা ঘুচে গেল, জজ সাহেব এক অবতার,
যত নচ্ছারের রাজত্ব হল সাধুর পক্ষে গঙ্গাপার।

এবার যথার্থ খ্যাতিসংগীত অর্থাৎ স্মৃতিমূলক গানগুলির পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। জনৈক অজ্ঞাতপরিচয় কবির একটি গান নীলদর্পণরচয়িতা দীনবন্ধুর স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত—

দীনবন্ধু! দুঃখিনী বঙ্গের ভাগ্যে এত দুঃখ লিখেছিলে—
বঙ্গের উজ্জ্বলমণি কবিকুলচূড়ামণি সেই দীনবন্ধু হায় কোথায় রহিলে।
যাহার লিপিকৌশলে দেখাইতে বঙ্গস্থলে নব নব সুনাটক বঙ্গীয় কুলে,
লেখনীকৌশলে যার প্রীতিময় সবাকার সেই দীনবন্ধু হায় শমনকোলে।
চিতনবীনা কামিনী সালংকারাতপস্বিনী ভাসে এবে অনাথিনী নয়নজলে।

মানবদরদী বিদ্যাসাগরের উপর রচিত বহুতর সংগীত আজ বিস্মৃতির গর্ভে হারিয়ে গেছে। সংকলন থেকে খুঁজে-পাওয়া কয়েকটি গানের মধ্যে প্যারীমোহন কবিরত্নের বিদ্যাসাগরপ্রশস্তিটি সংক্ষিপ্ত জীবনী-বিশেষ—

কি লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়
বহুদর্শী বিজ্ঞ পুণ্যবান প্রাজ্ঞ দয়ার সাগর সাগর দয়াময়।
ব্যুৎপন্নকেশরী শাস্ত্রসংস্কারে সমতুল্য ব্যক্তি মিলে না সংসারে
সর্বশাস্ত্রবেত্তা সুপারগ বিচারে মহাকবি কাব্যে মহোদয়।···

হেমচন্দ্রের বিদ্যাসাগর স্মৃতিগীতটি প্যারীমোহনের মত চরিত্রমাহাত্ম্য নয়, মহাপুরুষের তিরোধানে স্মৃতিবেদনায় ভারাক্রান্ত—

ফুরাল বঙ্গের লীলামাহাত্ম্য সকলি
হরিল বিদ্যাসাগরে কাল মহাবলী।
হারায়ে মা বঙ্গভূমি পুত্ররত্নে আজ
বিশীর্ণ বিমর্ষ দুঃখে বঙ্গের সমাজ।
কী মহাপরাণ লয়ে জন্মেছিল ধীর
কিবা বিদ্যা বুদ্ধিপ্রভা করুণ গভীর;
বিদ্যার সাগর খ্যাতি আরো মনোহর
বিশাল উদার চিত্ত দয়ার সাগর,
তেমন সন্তান মা গো কে আর তোমার।...

মধুসূদনের অকালবিয়োগে হেমচন্দ্র একটি শোকসংগীত রচনা করেছিলেন। বাগেশ্রীতে গেয় গানটি এইরূপ—

কে রচিবে মধুচক্র মধুকর-মধু বিনে
মধুহীন বঙ্গভূমি হইয়াছে এতদিনে।
কুহকী কল্পনাবলে কে আনিবে বঙ্গস্থলে
কুমারী কৃষ্ণকমলে মোহিতে মনে।
কে অপূর্ব তান লয়ে বীররসে মাতাইয়ে
শুনাইবে মেঘনাদে গভীর গর্জনে
বীরমদে অম্বুনাদে কে আনিবে মেঘনাদে
কাঁদিলে প্রমীলা সতী কেলি বিপিনে॥৬

লোকান্তরিত পুরুষের সৃষ্টি, তাঁর গ্রন্থাদি বা চরিত্রের নামোল্লেখ করে এই জাতীয় বিলাপগীতি রচনা করা একটি অভ্যস্ত প্রথায় পরিণত হয়েছিল বলে মনে হয়। বিদ্যাসাগর এবং মহারানী স্বর্ণময়ী সম্পর্কে গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় দুটি গান রচনা করেছিলেন। এই গানদুটি শোকগীতি নয়, প্রশস্তিগীতি। যেমন স্বর্ণময়ীর প্রতি—

দয়াময়ী স্বর্ণময়ী বঙ্গমহিলে ওগো পুণ্যশীলে
দানে দেশকুল ভালো আলো করিলে
সাধারণ উপকার করিবারে অনিবার
অমৃত বদান্য স্রোতে বঙ্গ ব্যাপিলে।...

দ্বারকানাথ মিত্র সুবিচারকরূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর বিয়োগ-ঘটনায় মর্মাহত গঙ্গাধর গেয়েছেন—

বিনায়ে বঙ্গজননী কাঁদিছে কাতরস্বরে
দ্বারকানাথেরই শোকে ব্যাকুল হয়ে অন্তরে।
কেন রে নিদয় শমন বাঙলার গৌরবতপন
অকালে চাকিলি আসি মৃত্যুমেঘাচ্ছন্ন করে।
হায় কে আর তেমন করি বিচার-আসনোপরি
বসিবে উজ্জ্বল করি সত্যের সন্ধানে—
নির্ভয়ে তেমন আর কে করিবে সুবিচার
মাপিয়ে সত্যেরই ভার ন্যায়তুলা ধরি করে।··

বস্তুত দ্বারকানাথ তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও দেশহিতৈষিতার গুণে বঙ্গজনচিত্তে আপন গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। অজ্ঞাত কবির আর একটি অনুরূপ পদে দ্বারকানাথহীন বঙ্গভূমিকে দ্বারকানাথহীন বৃন্দাবনের সঙ্গে তুলনা করা বলা হয়েছে—

অনরেবল জজ মিত্র মহাশয়—
হারায়ে দ্বারকানাথে ভারতজননী,
মণিহারা যেন সাপিনী তাপিনী রোদন করিছে মনঃদুঃখে দিবারজনী।
মলিন মুখ উজ্জ্বল যার গুণে হয়েছিল সে আলো নিবে গেল হায় রে—
শিরে করে করাঘাত, বলে, দ্বারিকানাথ মুকুটমণি আয় রে ··।

শোকস্মৃতিমূলক খ্যাতিসংগীতে অক্ষয়কুমার দত্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, কেশবচন্দ্র সেন এঁদের নামও পাওয়া যাচ্ছে একাধিক গানের বিষয়বস্তুরূপে। চন্দ্রনাথ দাস প্রতিষ্ঠিত গীতিকার ছিলেন না, ‘বাঙ্গালীর গান’ বা ‘সংগীতসারসংগ্রহে’ এর গান সংকলিত হয়নি। কিন্তু অক্ষয়কুমারের মৃত্যুস্মরণে রচিত তাঁর একটি বিষণ্ণ গীতিকবিতা ‘সংগীতকোষে’ স্থান পেয়েছে—

অক্ষয় অক্ষয়কীর্তি রাখিয়ে ভারতভূমে
ত্যজিলে অনিত্যদেহ চলি গেলে নিত্যধামে।
সাহিত্যসমাজে তব বাড়িছে কত গৌরব,
সুসভ্য নব্যভারত বাঁধা আজি তব ঋণে।
মাতৃভাষা বাঙলার নাহি ছিল অলংকার
সাজালে তাহারে কত রতন মণিকাঞ্চনে।······

কালীপ্রসন্নের দেহাবসানে প্যারীমোহন কবিরত্নের গীতিটি বিদ্যাসাগরের স্মৃতি-তর্পণের মতই গুণগরিমার তথ্যচয়িত তালিকাবয়ন মাত্র, যার অংশবিশেষ—

দেশহিতৈষী কালী সিংহ গুণগ্রাহী গুণাকর
গিয়াছেন স্বর্গধামে ত্যেজে মনুজ কলেবর।
আক্ষেপ অতি অল্পকালে গ্রাসিল করাল কালে
বিষয়চ্যুত চিন্তানলে দেহ ছিল জরজর।
এত বিখ্যাত অল্পদিনে বাঙালি মহলে আর দেখিনে
সুযশ মহীরুহ রোপন করে গিয়েছেন বিস্তর।.....

পরবর্তী অংশ সেই মহীরুহের পল্লবাদির বিবরণ। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ব্রহ্মানন্দ জীবিতকালেই অবতারের সম্মান পেয়েছিলেন। নববিধান সমাজের বহু ব্রহ্মসংগীতে ইতিপূর্বে তিনিই ব্রহ্মের বদলে পূজিত হযেছিলেন।[৭] সেই কেশবচন্দ্রের দেহান্তরে রাধানাথ মিত্র লিখেছিলেন—

কি দিব কেশব পরিচয তব ঘরে ঘরে সব জানে তোমায
বক্তৃতার ভাব নিত্য নব ভাব মানবস্বভাব মোহিত তায।
সভাস্থলে কিবা বাক্যের বিন্যাস প্রাণ সুশীতল সুমধুর ভাষ,
কত যে রূপক কত অনুপ্রাস, পুলকিত চিত তব কথায়।.....

বিদুষী ভারতপ্রেমিকা শিক্ষাপ্রাণা কুমারী কার্পেণ্টার ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে কলকাতায আগমনকালে উত্তরপাড়ায় এক বিদ্যায়তন পরিদর্শনে যান, সঙ্গে ছিভেন এটকিন্‌সন্, উড্রো এবং বিদ্যাসাগর মহাশয। সেই সময় গাড়িটি পথিমধ্যে উলটে যায এবং বিদ্যাসাগর সেই দুর্ঘটনায় যে আঘাত পেয়েছিলেন, শোনা যায় তাই তাঁর মৃত্যুর পরোক্ষ কারণ হয়েছিল। ধীরাজ রচিত এই কার্পেণ্টার-প্রশস্তিগীতে সেই ঘটনার উল্লেখ আছে—

অতি লক্ষ্মী বুদ্ধিমতী এক বিবি এসেছে,
ষাট বৎসর বয়স তবু বিবাহ না করেছে।
করে তুলেছে তোলাপাড়ি এবার নাইকো ছাড়াছাড়ি
মিস কার্পেণ্টার সকল স্কুল বেড়িয়ে এসেছে।......

দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাবরণে অজ্ঞাত কবির এই গানটিতে ইংরেজ শাসকের কপট বিচারব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরাধীন জাতির সুগভীর মর্মবেদনা ও রুদ্ধ বিক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে—

হায় কি হল রে বিচার, প্রিয়ভাই স্থরেন আজি গেল কারাগার
বলিতে বিদার হৃদয় গেল ন্যায় পরাজয়,
এ বিচার কী আইনে কয় ওহে ধর্মঅবতার।
ইংলিশম্যান প্রিয়তমে কী মন্ত্র শুনালে প্রাণে
তাতে জলে ক্রোধাগুনে আদর্শ হল প্রচার।
নাহি ক্ষমা ন্যায়বিধি বসে প্রতিশোধে যদি
কার কাছে বল কাঁদি কে করিবে স্থবিচার।
এ সাধনা কি সিদ্ধি হবে এ ভাব কি মনে তবে
নীরব ভারত রবে কাঁদিতে পারিবে আর।
বলিতে দুঃখ ফুকারি তাতে ভয় মনে করি
পাছে বা অবজ্ঞা বলি বাস হয় কারাগার।
নয়নের জলে হায় এ আগুন নিভা দায়
জলিবে সহস্র শিখায় ভারতের হৃদাগার।
এস বঙ্গবাসী চলে যেতে হয় যাব জেলে
কত দহি তুষানলে মরণের কী ভয় আর।
কোথায় প্রভু লর্ড রিপন কারে বলি এ বেদন,
দেখ মাগো ভিকটোরিয়া ভারতে কী স্থবিচার।

রাজকুমার চক্রবর্তী নামক জনৈক কবি হোমিওপ্যাথি ঔষধের প্রবর্তক হ্যানিম্যানের প্রশস্তিস্বরূপ গান রচনা করেছেন—

কেন আর হাহাকার মুছ রে নয়নজল
জুড়াবে রোগের জ্বালা ক্ষীণদেহে পাবে বল।
করিতে পাপীর গতি এসেছিলে ভাগীরথী
রোগীর যন্ত্রণানাশে নবগঙ্গা স্থশীতল।
আসিয়াছে হানিমান স্নিগ্ধ হয়েছে ভূতল,
দেশেতে আবদ্ধ নয়, এ নদী এ ধরায়—
নাহি আবিলতা লেশ ক্ষীর সম স্বাদুজল।
রোগের যন্ত্রণা হর পুষ্টিকর স্থবিমল—
এ বারি করিয়ে পান জুড়ায় তাপিত প্রাণ
জাগাও বিজয়ধ্বনি কাঁপাইয়া ভূমণ্ডল;
ধন্য হানিমান জয় জার্মেনি জনমস্থল।

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন সময়ে গিরিশচন্দ্রকে ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চকে তাঁর পুণ্যপূত চরিত্রপ্রভাবে ধন্য করেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের রামকৃষ্ণ-স্মৃতিগীতটি এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও বেদনায় করুণ রসের স্পর্শ পেয়েছে—

আমি সাধে কাঁদি

হৃদয়রঞ্জনে না হেরে নয়নে কেমনে প্রাণ বাঁধি।

বিদায় দিছি পাষাণ প্রাণে চাব কার মুখপানে

মরি ফুল্ল ফুলহারে সাজাইব কারে পোড়াবিধি হল বাদী।

ভাবে ভোরা মাতোয়ারা দুনয়নে বহে ধারা

ঢলে ঢলে নেচে কুতূহলে এস গুণনিধি সাধি।

চলে গেলে আর এলে না, জীব তো হরিনাম পেলে না,

পার পাবে না ঋণে দীনে হীনে পদে কর অপরাধী।

অপ্রধান ব্যক্তির মৃত্যুতে শোকগীত রচনার উদাহরণ পাই গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়ের 'গীতহারে' (১৮৭৪)। তিনি জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পত্নীবিয়োগ উপলক্ষে একখানি গান রচনা করেন। মহারানী ভিক্টোরিয়া বুদ্ধিজীবী বাঙালির কাছে করুণ সহৃদয়তা ও সুবিচারের প্রতিমূর্তি ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত ভিক্টোরিয়াকে উদ্দেশ করে কবিতা লিখেছিলেন যদিও তাতে কিঞ্চিৎ বিদ্রূপের সুর ছিল। দীনবন্ধু তাঁর নীলদর্পণ ভিক্টোরিয়ার নামেই সমর্পণ করে নীলকর সাহেবদের বর্বরতার অবসান কামনা করেছিলেন। 'স্বর্গীয়া রাজ রাজেশ্বরীর মৃত্যু উপলক্ষে রচিত ও বিরাট সভায় গীত' সুরট মিশ্র একতালায় বিহারীলাল সরকারের একটি রাজ্ঞীস্তব উদ্ধৃত করছি—

ফিরে বাঁধ গো তার ওগো ফিরে বাঁধ গো তার

ফিরে সুর দাও ফিরে গান গাও ফিরে তোল সুতান বীণার।

সুরে গান গাহিলে সুরে বীণা বাজিলে

যমুনায় বহিবে গো উজান আবার।

সুরে গিরি ফুটেছে সুরে স্রোতে চলেছে

ত্রিধারায় করুণার নয়ন-আসার।

ভিক্টোরিয়া স্মরণে আরও একটি গান লিখেছিলেন বিহারীলাল—

মা মা কী স্মৃতি চিহ্ন রাখিব তোমার

তুমি কীর্তিময়ী রেখেছ গো স্মৃতি আপনার।

বিশ্বভরা চন্দ্রকরে ক্ষুদ্র খদ্যোতে কী করে
তোমার মহিমা গুণের গরিমা অসীম অনন্ত দিগন্ত প্রচার।
গুণের গৌরবরাগে তোমার মূরতি জাগে
রহিবে জাগিয়ে হৃদয়ে হৃদয়ে যতদিন রবে রচনা ধরার।

যাত্রা-পাঁচালিকার নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ও খাম্বাজ রাগে ভারতেশ্বরী ভিক্‌টোরিয়ার মৃত্যুতে এই গানটি রচনা করেছিলেন—

ভারত অন্ধকার এতদিনে,
হরি হরি হরি পন্থা নাহি হেরি
ভারতেশ্বরী মা বিনে।
হায় হায় এ কী হইল দুর্দিন,
সুখময় সূর্য কালাভ্রে বিলীন,
কাতরে কাঁদিছে নবীন প্রবীণ
সবার বদন-নলিন মলিন এক্ষণে।…
বঙ্গবাসীর রাজভক্তিযুক্ত মতি
আকুলিত হিতবাদীর সংহতি
আনন্দবাজারে নিরানন্দ অতি
কাঁদেন বসুমতী কাতর বচনে।
কলিকাতা বোম্বে, মাদ্রাজ হাইকোর্টে
সর্ব জেলা কোর্টে আর পেটি কোর্টে
সর্বস্থানে শোকবহ্নি জ্বলে ওঠে
ক্রন্দনের ধূম ধাইছে গগনে।
ইংলণ্ডে কাঁদেন পার্লিয়ামেণ্ট
কলিকাতায় কাঁদেন লাট গভর্ণমেণ্ট,
সর্বস্থানে সবে হয়েছেন উৎকণ্ঠ
জ্ঞানহীন দ্বিজ নীলকণ্ঠ ভণে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষও ভিক্‌টোরিয়ার মৃত্যুতে লিখেছেন—

ও মা বঙ্গমহিলার কে আছে গো আর
রোদনধ্বনি শুনলে জননী নয়নধারা মুছাও অমনি,
কোথায় গো রাজকুলনলিনী।…
মহারানী মেদিনী আজ অনাথিনী,

কৃপাময়ী এস ফিরে, দেখ ভাসি নয়ননীরে,
তুমি তো মনের ব্যথা বুঝ অবলার ;
ভিক্‌টোরিয়া কোথা মা আমার।

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মরদেহত্যাগে বিহারীলালের তিনখানি গান সাহিত্যসম্মিলনের[৮] অধিবেশনে গীত হয়েছিল ('এ কী এ কী থেমে গেল কী মধুর একতান', 'কোথা কবি কোথা তুমি কোথা গেলে গো চলিয়ে', 'ওগো আর তুল না সে বাণী')। আর একটি গানে মধুসূদনের কবিশিষ্য হেমচন্দ্রের সঙ্গে পরধামে মধুসূদনের মিলন ঘটবে, কবি এই কল্পনা করেছেন—

জ্বালা জুড়াইবে ভোগবিরামে রাজে রাজে কবি অমরধামে
স্বর্ণসিংহাসনে যুগল মিলন মধু করে ঘন মধু বরিষণ,
হেম সে বরষে কনককিরণ কোটি ছবি ফুটে কোটি গুণগ্রামে।...

বিহারীলালের বহুগানই সাময়িকতাচিহ্নিত। ভাওয়ালাধিপতি রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুরের মৃত্যু উপলক্ষে তিনি বেঁধেছিলেন এই গানটি—

কী গান শুনাইব কী গান শুনিবে আর
কী রাগে কী তান তুলিব গো
কী সুরে বাঁধিব তার।

রবীন্দ্রনাথের বয়োজ্যেষ্ঠ বিহারীলাল সরকারের গীতিপ্রতিভা পৃথক আলোচনার উপযোগী।[৯]

ঙ. 'হায় রে সেকাল হায় রে'

বাঙলা গানে সমসাময়িক ঘটনা কী পরিমাণ মুদ্রাচিহ্ন রেখে গেছে, কালান্তরের পাঠকের কাছে তার কিছু পরিচয় তুলে ধরা যেতে পারে। এই ধরনের বিভিন্ন কাব্যগীত যে বিশেষ ঘটনার উপর লেখা, সেই সকল ঘটনার স্মৃতি হারিয়ে গানগুলি ক্রমশ আধুনিক পাঠকের কাছে নিষ্প্রভ ও নিরর্থকতায় পর্যবসিত হয়ে উঠেছে। তারই মধ্যে কয়েকটি বিষয় ও প্রসঙ্গ আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেমন জনৈক অজ্ঞাত কবি তৎকালীন পৌর-নির্বাচন সম্পর্কে এই গানটিতে কটাক্ষ করেছেন—

আজ ভোট দিয়ে কাল ওপারে যেও উঠে
বাজাব ঠোঁটে ঠোঁটে নেব-টুটে পুটে

বলি ভালোয় ভালোয় পালাও আলোয় আলোয়
নইলে মুস্কিল রোজ বসবে শীল
চাটি ভিটে মাটি, থাকবে না ঘটিবাটি
পালাতে হবে ছুটে একছুটে।

গানটি উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'সংগীতকোষ' সংকলনে আছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রদত্ত জনপ্রতিনিধিদের অন্তঃসারশূন্য মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও ছলনাকে বিদ্রূপ করে লেখা কয়েকটি ভোটগীত একাধিক সংকলনে দৃষ্ট হয়। উনিশ শতকের শেষদিকে নির্বাচন বিষয়ে কয়েকটি প্রহসনও রচিত হয়েছিল।

বিভিন্ন গীতসংকলনে মদ্যপান বিষয়ে একাধিক গানের সন্ধান পাই। বলা বাহুল্য অধিকাংশ গানের বিষয়বস্তু সুরাসক্তির কুফল বর্ণনা অর্থাৎ নীতিমূলক। অনেকগুলি মাদকনিবারণী গীতের রচয়িতা ছিলেন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত সংস্কারক ও প্রচারকগণ। এই ধরনের গানের কাব্যমূল্য বস্তুত অকিঞ্চিৎকর। উদাহরণস্বরূপ নববিধান ব্রাহ্মসমাজভুক্ত চিরঞ্জীব শর্মা ছদ্মনামে প্রখ্যাত কবি ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের এই নীতিগীতিটি—

ধরি দুটি পায় বলি গো তোমায়
ক্ষান্ত হও পিতা ত্যজ সুরাপান।
দেখ গো একবার ডুবিল সংসার
আমাদের প্রতি হয়ে কৃপাবান।…

এই প্রসঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথের লেখা 'মনোদুঃখে হৃদয় বিদরে হায় হায় রে', 'ও ভাই মজো না সুরাপানে,' 'সুরাদলনসংগ্রামে সাজ সবে বন্ধুগণে,' অজ্ঞাত কবিরচিত 'আসিয়ে মাদকদানব' এবং 'অসার [illegible] কেন কর সুরাপান', প্যারীমোহন কবিরত্নের 'খেও না খেও না ছুঁও না ছুঁও না মদ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[১০] কৃষ্ণধন বিদ্যাপতির 'ত্যজ সব জাত্যভিমান' জাতিভেদ প্রথা বিষয়ে, 'দারিদ্র্যদুঃখ দহনে দগ্ধ' গানটি দারিদ্র্যসম্পর্কে এবং 'না জানি কার পাপাচার' গানটি দুর্ভিক্ষ বিষয়ে রচিত। গানগুলি 'সংগীতকল্পতরু' প্রভৃতি সংকলনে থাকলেও 'বাঙ্গালীর গান' সংকলনে নেই। প্যারীমোহন কবিরত্ন ও আনন্দচন্দ্র দাস কলকাতার কলের জলের প্রচলন (১৮৭২) ঘটনাকে স্মরণ করে গান লিখেছেন। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাধানাথ মিত্র গ্যাসের আলো প্রচলন (১৮৫৭-৫৮) ঘটনাকে অভিনন্দিত করে গান রচনা করেছেন। সেদিনের গ্যাসের আলো আজ প্রাচীনকালের স্মৃতিচিহ্নে পর্যবসিত হলেও আলোচ্য

গানগুলিতে সেকালের বাঙালির বিস্ময় জড়িত রয়েছে। গঙ্গার পোল (১৮৭৩) নিয়ে তিনকড়ি স্মৃতিরত্নের গান, টেলিগ্রাফ সম্পর্কে রাধানাথ মিত্রের এবং রেলওয়ে সম্পর্কে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের গানগুলি পাণ্ডুর কাব্যসংকলনে শতাব্দী-অতীত নাগরিক জীবনের সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের ভগ্নস্তূপ মাত্র। মুদ্রাযন্ত্রের উপর দমননীতি আইন প্রণয়নে ক্ষুব্ধ শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন—

ছিল গো ভারত তব এক অধিকার
তাহাতেও বঞ্চিতপ্রায় হইলে এবার।
কোনরূপ উৎপীড়নে দহিলে পরাণ মনে
মুক্তকণ্ঠে স্বাধীনতা ছিল তব কাঁদিবার।
দুঃখদাবানলে দহি দুঃখের কাহিনী কহি,
একই উপায় ছিল শান্তিবারি লভিবার
এমনই কপাল তোর দুঃখ দাহে দহি ঘোর
সে ঘোর দুঃখের কথা কহিতে নারিবে আর।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার। বিদেশী শাসন সেই মৌলিক অধিকারেও যখন হস্তক্ষেপ করে, কণ্ঠরুদ্ধ নিপীড়িত জাতির মর্মজ্বালা প্রথমে এই জাতীয় ক্ষুব্ধ সংগীতে-সাহিত্যেই আত্মপ্রকাশ করে, তারপর তীব্র আন্দোলনে বিস্ফারিত হয়। মুদ্রাশাসন তথা সংবাদপত্র দমন-আইনের প্রতি উষ্মা রাধানাথ মিত্রের 'মানবকৌশলবলে জ্বলিছে অনল জলে' গানটিতেও আছে।

আনন্দচন্দ্র মিত্রের গানে বিষয়বৈচিত্র্যের সন্ধান মেলে। সংসারে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঘটনা থেকে জন্মদিবস পালন, বিবাহবার্ষিকী, মৃত্যুস্মৃতি-দিবস প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অধুনা বঙ্গসংস্কৃতির অঙ্গীভূত হলেও উনিশ শতকে মুখ্যত ব্রাহ্ম সমাজের প্রেরণায় এবং ইংরাজি সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে ধীরে ধীরে আমাদের আলোকপ্রাপ্ত রুচিসম্পন্ন পরিবারগুলিতে এই জাতীয় অনুষ্ঠান গৃহীত হতে থাকে। এই প্রকার অনুষ্ঠান উপলক্ষে আনন্দচন্দ্র কয়েকটি গান রচনা করেছিলেন। আনন্দচন্দ্র-রচিত জন্মদিবসের গানের উদাহরণ—

আয় রে ভাই সবে মিলে সবান্ধবে
আনন্দ-উৎসবে হই রে মগন।…

এই শুভদিনে এমন সময়ে এসেছিলেম ধরায় এদের লয়ে
পিতামাতা দোঁহে বিগলিত স্নেহে হয়েছিলেন রে।…
ও ভাই করি যেন তাঁতে আত্মসমর্পণ।

ব্রহ্মসংগীতসংকলনগুলিতে এই জাতীয় সামাজিক অনুষ্ঠানবিষয়ক গীত যথেষ্ট আছে। এইগুলিকে 'আনুষ্ঠানিক সংগীত' বলা যেতে পারে।

কাব্যসংগীতের বিষয়বৈচিত্র্যে গঙ্গাধরের তুলনা নেই। গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায রচিত গানগুলি পরবর্তীকালে খুব জনপ্রিয় হয়নি বলেই মনে হয়, কারণ অধিকাংশ সংকলনে তাঁর গীতসংখ্যা নামমাত্র, কিন্তু গীতহার গ্রন্থখানি থেকে কাব্যসংগীতের বিষয়বৈচিত্র্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়। যথা কংগ্রেস, পুরুষার্থ উপার্জনে স্বদেশবাসিগণের প্রতি উক্তি, ব্রিটেনের প্রতি ভারতভূমির উক্তি, বিজ্ঞান অনুশীলনবিষযক বহু সংগীত, শুক্র-গ্রহে জলীয় বাষ্পের আবিষ্কার, ভিক্টোরিয়ার জুবিলি, প্রিন্স অব ওযেলসের ভারত আগমন, বিদ্যাসাগর, মহারানী স্বর্ণময়ী, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের নিদ্রাভঙ্গ উপলক্ষে, লর্ড রিপনের স্বরাজ শাসন, লর্ড রিপনের বিদায়, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিযার সম্পাদক মিঃ জেম্‌স্‌ রুটলেজ, হিন্দু মাতৃসন্তোষার্থে সিবিলিয়ান বিহারীলাল গুপ্তের হিন্দুরীতিঅনুসারে বিবাহ করায় ধন্যবাদ ইত্যাদি। শুক্র-গ্রহে জলীয় বাষ্পের আবিষ্কার সম্পর্কিত সংবাদ পাঠ করে গঙ্গাধর বেহাগে গেযেছিলেন—

সাধিছে বিজ্ঞান বলে কী অদ্ভুত ব্যাপার
শুক্রগ্রহে আছে বারি হইল প্রকাশ তার।
এবে হয় অনুমান আছে জীববাসস্থান
ধরা ভিন্ন বিশ্বমাঝে অনন্ত প্রকার—
হবে কি কস্মিনকালে বিজ্ঞানসাধন বলে
বিবিধ জগৎবাসীর পরস্পরে সাক্ষাৎকার।

রচনারীতি ঈশ্বর গুপ্তের তুলনায় উৎকৃষ্ট নয়, কেবল ঐ অন্তিম পংক্তির ভবিষ্যবহ জিজ্ঞাসাটুকুর জন্যই শতাব্দীর এই কূলে গানটি উল্লেখযোগ্য মাত্র।

গঙ্গাধর ব্যতীত ভিক্টোরিয়ার জুবিলি উপলক্ষে আরও কয়েকজনের গান পাওয়া যায়। কালীনারায়ণ গুপ্ত লিখেছিলেন—

ধন্য মা ভারতেশ্বরী তোমার গুণে যাই মা বলিহারি
তোমার গুণের রসে ভারত ভাসে জলে যেমন ভাসে তরী।…

কুঞ্জলাল নাগ 'আজি কি কারণে ভারতগগনে উঠিছে মধুর তান' গানটি রচনা করেছিলেন ঐ একই উপলক্ষে। ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত বেহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুর্গোৎসব' নাটক থেকে গ্রাম্যকবি রচিত কুইনাইনের উপর একটি গান উদ্ধার করেছেন সাহিত্যের ঐতিহাসিক।[১১] এটি কোনো কাব্যসংকলনে না থাকলেও বিষয়ের জন্য এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য—

এসেছে যমের যম কুইনাইন
হল স্বগুণে সে শাদা গুঁড়ো অল্পকালে সব চিন।
চিরতা করিত বটে জ্বরে কিছু উপকার
সারিবে কি না সারিবে ছিল না স্থিরতা তার,
গুলঞ্চনাটার ফল ইদানীং হল বিফল
লক্ষ্মীবিলাসের লক্ষ্মী ছেড়ে গেছে অনেক কাল।

বঙ্গবাসী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা বিদ্রূপ-উপন্যাসকার যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু এবং স্বনামধন্য ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি গান 'বাঙ্গালীর গানে' সংকলিত হয়েছে, অন্যত্র চোখে পড়েনি। এগুলির বিষয় কৌতুক হলেও সবই সমকালীন ঘটনার উপর ভিত্তি করে রচিত অর্থাৎ সাংবাদিক রচনা। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাল-তলার চটি পায়ে দিয়ে যাদুঘরে প্রবেশাধিকার পাননি, এই ঘটনা স্মরণে ১৩০৮ সালের ১৫ই চৈত্র বঙ্গবাসীতে রাম বসুর বিরহ পদের প্যারডি করে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু লেখেন—

মনে রইল সখে মনোবেদনা,
যাদুঘরে যখন যায় গো সে,
তারে যেতে দিতে দিতে আর যেতে দিলে না।
সরমে মরম কথা কওয়া গেল না।
যদি সাগর হয়ে সাধিতাম গোস্পদবারিকে
নির্লজ্জ সাগর বলি হাসিত সব লোকে,
সখে ধিক থাক আমাকে ধিক থাক বিধাতাকে
এ সাগর জনম যেন আর করে না।

পঞ্চানন্দ এই ছদ্মনামে ইন্দ্রনাথের অনেকগুলি প্যারডি গান বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল সমকালীন ঘটনাই যাদের ভিত্তি। কিন্তু কালের দূরত্বে আজ সেইগুলির কোনো মূল্যই নেই।

চ. 'ছয়টি ঋতুর ফুলে ফলে ভরতে পারি ডালা'

প্রকৃতির রঙ্গশালা ষডঙ্ক ঋতুর লীলানাট্যে মুখরিত হলেও ঋতু ও প্রকৃতিচেতনা আধুনিক রোমান্টিক গীতিকবিতার লক্ষণ, প্রাচীন কাব্যে তার ব্যবহার অপ্রত্যাশিত। পদাবলীর ঋতু-প্রেক্ষিত অভিসারের ঐতিহ্যের সঙ্গে সংস্কারসূত্রে জড়িত মাত্র, সুতরাং একালের কাব্যসংগীত আলোচনায় অতদূর পর্যন্ত আমাদের যাওয়ার দরকার নেই। বাঙলা শক্তিগীতির আগমনী-বিজয়া পদগুলিই বাঙলা কাব্যসংগীতের সর্বপ্রথম ঋতুগীতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রথম কাব্যগীতবর্ণনা। বঙ্গকুটিরপ্রাঙ্গণে বর্ষাবসানে প্রথম যে শুভ্রমেঘচুম্বিত নির্মল নীলিমার স্নিগ্ধ ছায়াখানি পড়ে, প্রভাতের শীতল হাওয়ায় দূর হিমালয়ের তরুমঞ্জরী-ছোঁওয়া হাহাকার হৃদয়ে চিরব্যথার অকারণ ঢেউ ঘনিয়ে তোলে, নশ্বর শরৎ যে কয়েকদিনের উৎসবরাগিণী বাজিয়েই বিদায় নেয়, শূন্য কাননে ঝরিয়ে-দেওয়া শেফালি-সৌরভের স্বপ্নে কান্না মিশিয়ে তারই ছবি এঁকেছেন আঠারো-উনিশ শতকের বঙ্গীয় কবিবৃন্দ আগমনী-বিজয়া সংগীতে। বাঙলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব এই সোনার শরতকালেই অনুষ্ঠিত হয়। যে উৎসবের আগমনী বাজে শঙ্খশুভ্র কাশের বনে, জলভারাবনত নদীস্রোতে যে উৎসবের সোনার তরীতে প্রবাসী প্রিয়জন ঘরে ফিরে আসে, আগমনী গান সেই উৎসবের বোধন। বিজয়া সেই অকালসমাপ্ত ঋতু উৎসবের ভ্রষ্টলগ্নের দীর্ঘশ্বাস।

উনিশ শতকের বাঙলা কাব্যসংগীতে নতুন করে ঋতুচেতনা সংক্রামিত হয়েছে। শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই প্রায় বাঙলা সাহিত্যে ধীরে ধীরে রোমান্টিক কবিমনের আবির্ভাব ঘটায় এবং প্রকৃতি সম্পর্কে মানবমনের নূতন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ফলে সংগীতেও তার প্রভাব পড়তে থাকে। তাই বিভিন্ন ঋতুর উপর এই পর্বের একাধিক কবি ঋতুবন্দনা গান রচনা করেছেন দেখতে পাই। প্রাক্‌রবীন্দ্রযুগের ঋতুসংগীতগুলিতে অবশ্য ঋতুর বাহ্যিক রূপদৃশ্য বর্ণনামূলক ভাষাতেই মুখ্যত প্রকাশিত, তদতিরিক্ত সৌন্দর্য এগুলিতে আশা করা যায় না। তথাপি ঋতুচেতনা যে বাঙলা কাব্যগীতে নতুন মাত্রাযোজনা তাতে সন্দেহ নেই। 'সংগীতকল্পতরু' ও 'সংগীতকোষ' সংকলনদুটি থেকে উনিশ শতকের কয়েকটি ঋতুগীতের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে।

কবিনাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় কয়েকখানি ঋতুর গান রচনা করেছিলেন।

অধিকাংশ গানই বর্ণনাত্মক তবে সুরে ও শব্দব্যবহারে প্রতিটি গানের আবহে বিশেষ ঋতুর আমেজটি ফুটে উঠেছে। গ্রীষ্মের দাবদাহ, তপ্ত নিশ্বাস ও তৃষ্ণাতুরতা বৃন্দাবনী সারঙের সুরে এইরকম—

প্রখর তপন ইহার আসন জ্বলন্ত অনন্ত বসন।
তপ্তসমীরণ চামর বীজন রণভূ মরুভূ ভীষণ।
ধরা কাঁপে ভয়ে ইহারে দেখিয়ে নির্ঝর তটিনী যায় শুকাইযে
তরু ছাড়ি পড়ে লতিকা লুটিযে জীবের আকুল জীবন।

নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নও দুটি গ্রীষ্মের গান রচনা করেছিলেন। উভয় রচনাই গ্রীষ্মের খরতাপ রৌদ্রজ্বালার ভাবটি মোটামুটি বর্ণনামূলক রীতিতে ফুটিয়ে তুলেছে। প্রথমটি সারঙে ও দ্বিতীয়টি বিলাওলে বাঁধা, গানের প্রথমটির কযেক ছত্র—

ভানুতাপে তাপিত ধরণী
বিহগ সব হযে নীরব হরে কাল অমনি।
হইল ম্লানতর ফুল্ল ফুলদল,
সুখী কেবল নীরে নলিনী পতিসোহাগে চারুহাসিনী।
নিভৃত শীতলবনে মৃগনিকর প্রবেশ করে
কাতর স্বরে মাথার উপরে ডাকে চাতকিনী।
দহিছে চরাচর খরতর কিরণে
পথিকগণে ছায়াবিহনে বাঁচে কেমনে,
শাপে তপনে যমসম গণি।

প্রিয়নাথ মল্লিকের গ্রীষ্মের গানটি সারঙের সুরে বাঁধা, মনে হয় সারঙের মধ্য দিযে গ্রীষ্মের ক্লান্তি ও তৃষ্ণাকে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। প্রিয়নাথের গান পূর্বের গ্রীষ্মগীতগুলির মতই বর্ণনামূলক। যেমন—

ভানু কৃশানু তনু ধরিল।
দিক্‌দিগন্ত দহে নিতান্ত জলাশয় শুষিল।
হইযে ক্লান্তমন, শ্রান্ত পান্থজন পথভ্রমণ সব ত্যজিল
তরুচরণ সার করিল।
ভুলিয়ে নবতৃণ গোবৎস হরিণ ছায়াতে লীন যেন হইল
জলে মহিষদল ঝাঁপিল।
নীরব সারীশুক খুলি চঞ্চুমুখ যত শাবক জল যাচিল
দীন চাতক মেঘে ডাকিল।

কম্পিত ধরা যেন দগ্ধ হয় হেন বহ্নি বাহন করে অনিল
জল অনলসম ভাতিল।
ভীষণ হেন দিনে কে গো নারীসনে নদীপুলিনে ধীরে চলিল
হেরি নয়ন মন মোহিল।
সুরেন্দ্রশচী যেন ভূমে করে ভ্রমণ কোলে নন্দন রূপে উজ্জ্বল:
আহা কমলমুখ শুকাল।

বর্ষা চিরকালই কবিদের প্রিয় ঋতু। যদিও রবীন্দ্রনাথের পূর্বে, ঋতুসংগীতে রূপসৃষ্টিতে সাংকেতিকতা ও সৌন্দর্য-গভীরতার পরিচয় দুর্লভ। পুনরায় রাজকৃষ্ণ রায়ের মেঘ রাগে বর্ষাগীতটি উল্লেখযোগ্য—

চমকে চপলা অনলের ঝলা ঝলকি ঝলকি উঠিছে
হুড়ু হুড়ু হুড়ু দুড়ু দুড়ু দুড়ু গরজি জলদ ছুটিছে
ঝর ঝর ঝরে মেঘবারি ঝরে কড়্কড়ে বাজ পড়িছে।

আর একটি বর্ষাসংগীত গিরিশচন্দ্রের রচনাভঙ্গিকে স্মরণ করায়, যদিও 'সংগীত-কোষে' অজ্ঞাত বলে উল্লিখিত, এই পদেও বর্ষার বহিঃপ্রকৃতির রূপটিই প্রাধান্য পেয়েছে—

গভীর মেঘদল গরজে বাজে বাজে প্রাণে
থেক না থেক মা থেক না থেক না দূরে
চাহি চুমিতে মুখসরোজে চমকি চাকি চুকি
চমকি চমকি চুকি চপলা মন উতলা
নীরদ ঢালিছে ধারা তরতর ঝরঝর চমকি শিহরে বন
নয়ননীরধারা নেহার কাতর কুলিশ কঠোর কত বাজে।
বাজে বাজে না জেনে না বুঝে তোরই প্রেমে মজে।

রাজকৃষ্ণ রায়ের একটি শরতের গান ঋতুর হরিৎ মাধুরীটি ফুটিয়ে তুলেছে—

চাঁদের মুকুট শিরে যবধান্য শীষ ধরে
হরিত বসন পরে শরৎ ঋতু সাজে।
সরসে কমল ফোটে মধুলোভে অলি জোটে
মধুমক্ষী রত হল মধুচক্র কাজে।

সাধারণত হেমন্ত ও শীত সাহিত্যে অপাংক্তেয়, সংগীতেও উপেক্ষিত। তথাপি রবীন্দ্রনাথের পূর্বে কাব্যসংগীতে হেমন্ত ও শীতের মঙ্গলগান রচনা করেছেন রাজকৃষ্ণ রায়। হেমন্ত বর্ণনায় ঋতুর একটি চিত্রকল্প রচনা করেছেন কবি—

নিবিড় অরণ্য মাঝে হিমকুম্ভ লয়ে সাজে
চতুর্থ হেমন্ত ঋতু হরিত বসনে
ঝরিছে শিশিরধার গাঁথিয়ে মুকুতাহার
তৃণগলে দোলাইছে প্রকৃতি যতনে।

শীতঋতুর গানখানিও সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতময় এবং স্বরচিত—

হিমাদ্রিশিখরে হিমানী উপরে ধাও রে শীতঋতু ভীষণ হুতাশ
ক্ষীণ দিনমণি কনকনকনি শনশনশনি বহে বাতাস।
থরথরথর কাঁপে চরাচর কুহেলিকাঢাকা নীল আকাশ।

কিন্তু সেই তুলনায় হরিমোহন রায়ের বসন্ত ঋতুগীতটি আলংকারিক বর্ণনায় পর্যবসিত। যথা—

বসন্ত নিতান্ত সখী সুখকর সে জনে
যে যুবতী পতিসহ আছে সুখমিলনে
পতি যার পরবশে কে তাহারে ভালবাসে
সদা নেত্র নীরে ভাসে মদনেরই তাড়নে
প্রফুল্ল কুসুমচয় জ্ঞান হয় বিষময়
বিরহিণী কত সয় প্রাণপতি বিহনে।

অজ্ঞাতনামা কবিরচিত শীত ও হেমন্তবিষয়ক দুটি গান 'সংগীতকোষে' সংকলিত হয়েছে। দুটি রচনাই ঋতু প্রকৃতির কবিত্বময় বর্ণনা। হেমন্তের গানটি—

তোরই আশে হের বেশভূষা পরি দাঁড়ায়ে রয়েছে উষা
হেরিতে সাধ তব রঞ্জিতে অধরে
আদরে এমন দাঁড়ায়ে উষা তোরই তরে।
তোরই আশে।
প্রাণমন মম আশে বিলাসে ভাসে ভাসে
নীহারহার পরি ঝরঝর তরতর
ঝরিছে মুকুতাপাঁতি
রঞ্জিত কুসুমিত রমিত মোহিত বনরাজি
হেমন্ত হিল্লোলে হেমশীর্ষ দোলে প্রান্তরে তরঙ্গমালা
হেলাদোলা অঙ্গতরঙ্গিত হেরিতে পিয়াস বিভোলা;
কপোতকপোতী কত সোহাগে কহিছে কথা
ব্যাকুল খেলিতে ভাসিতে সমীরে হেমকিরণ মাখি সাজি;

পাখি জাগে মাতি তরুণ রাগে গাহিছে পবন কাকলি বহে,
গাহিছে পাখি অনুরাগে তোমারে ধরি
বদন রাগ হেরি নয়নে নয়ন অভিলাষে।

শীতের ক্লান্ত উদাস সন্ধ্যার পটভূমিকায় নরনারী-প্রেমের একটি বিধুর ছবি—

হের ধূসর দিশা
ধূসর ধূমরাশি নিবিড় কুয়াশা আদরে করিছে মানা
যেও না যেও না নিশা যুবক-যুবতী সাধ রহিল
রহিল তোমারই বিধুমুখ-সুধাপান তৃষা।...

গিরিশচন্দ্রের অনেকগুলি ঋতুগীতের সন্ধান মেলে, যেগুলি কবিত্বগুণে সৌন্দর্য-বর্ণনায় আধুনিক কাব্যসংগীত হয়ে উঠেছে। গ্রীষ্মের বর্ণনাটি এইরূপ—

টলে লাল রবি টলে লাল রবি
লাল তোমারই বদনছবি।
লাল আভা নয়নে গগনে লাল মেঘদল
রবি টলে টলে টলে ঢলে জলে
চাহি ফটিকজল চাতক কাতর
থাকি থাকি পাখি সকরুণ বোলে দে জল দে কত নিদয় হবি।..
চ্যুতলতিকাদল ধীরে সমীরে দোলে ডাকি কহে পাখি ছলে,
পিও পিও বারি মোহন মোহিনী হের মোহিনী মাধুরী মাধবী।

বসন্তবর্ণনাটিও গিরিশচন্দ্রের গীতপ্রতিভারই অনুরূপ—

স্বরে তোর মন মেতেছে কোকিলে ঐ কুহরে
গাঁদা গোলাপ হার গেঁথেছে চেয়ে আছে তোর অধরে।
কিশলয় কাঁপিছে মলয় তোরে কথা কয় আমোদভরে।
বয় ধীরে সৌরভবায় গা ছুঁয়ে তোর যায় আদরে।
গুঞ্জরে ঐ ভ্রমরা ফুলে টলে ধায় বিভোরে।
চায় তোরে মনবিভোরা আঁখি বিভোর তোরে হেরে।

বাঙলা কাব্যগীতে ঋতুগীতগুলি স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারেনি, কিন্তু ঋতু-সচেতনতার প্রথম উদাহরণ হিসাবেই এগুলি আমাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টি অতিক্রম করতে পারে না।

১। 'ভারতীয় সংগীতমুক্তাবলী' অনুযায়ী রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের গানগুলির বিষয় নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে। (১) 'মনোদুঃখ কব কায়'—অনূঢ়া কুলীন কন্যাগণের উক্তি। (২) 'আর আমার কাজ কি বিয়ের সাজ পরিয়ে বৃদ্ধকালে'—শিশু বরের প্রতি বৃদ্ধার উক্তি। (৩) 'যাই লো সই ঐ অম্বরে বুড় হেরে ডরে মরে'—বৃদ্ধ বরের প্রতি বালিকার উক্তি। (৪) 'কার পানে বা চাবে পিতঃ এ দুঃখিনী কুলমেয়ে'—মরণোন্মুখ পিতার প্রতি অনূঢ়া কন্যার উক্তি। (৫) 'বহুদিন পরে এসেছি চিনি না কো শ্বশুরবাড়ি'—কোন বহুবিবাহকারীর স্ত্রীকে মাতৃসম্বোধন। (৬) 'আয়গো আমরা কুলীন বাড়ির বিয়ে'—কুলীন কুমারীগণের বিবাহদর্শনে দর্শনার্থী প্রতিবেশিনীগণের উক্তি

২। 'সংগীত মুক্তাবলী'র মতে গানটি ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের রচনা, 'বিশ্বসংগীতে'র মতে প্যারীমোহনের

৩। জগৎচন্দ্র দাস—পোনা সংগীতমালা, ১৩১৮ প্রথম সং, ১৯২২ ষষ্ঠ সং চট্টগ্রাম

৪। খ্যাতিসংগীত—রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত। দেশ ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১ (২১বর্ষ ৩২ সংখ্যা) পৃ ৪১১। উপেন্দ্রনাথের 'সংগীতকোষ' প্রথম সংস্করণে (১৩০৩) 'খ্যাতিসংগীত' শব্দটি নেই, আছে ২য় সংস্করণে (১৩০৬)

৫। কোনো কোনো সংকলনে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে এই পদটি ঈষৎ পাঠান্তরসহ পাওয়া যায়—

হে নিরদয় নীলকরগণ
আর সহে না প্রাণে এ নীল দহন।
কৃষকের ধনে প্রাণে দহিলে নীল আগুনে
গুণরাশি কি কুদিনে কল্লে হেতা পদার্পণ...

তৎকাল-প্রচলিত এই গানগুলি নীলদর্পণের দ্বিতীয় সংস্করণে সংকলিত হয়েছিল, সেই জন্যই সম্ভবত কোনো কোনো গীতসংকলনকার দীনবন্ধুর নামে এগুলি প্রচার করেছেন

৬। 'বাঙ্গালা নাটকের ইতিবৃত্তে' (১৩৫৪), ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত গানটিকে গিরিশচন্দ্রের নামে সমর্পণ করেছেন

৭। হাবড়া নববিধান ব্রাহ্মসমাজ থেকে প্রকাশিত 'গরীবের গান' (১৮২২ শক) সংকলন দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থটি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে উৎসর্গ করা। এর অধিকাংশ গানই কেশব-প্রশস্তি

৮। "সাহিত্যসম্মিলন—যে সকল অবস্থাহীন বাঙালী লেখক-গ্রন্থকার সাহায্যপ্রার্থী তাঁহাদিগের সাহায্যসংকল্পে কলিকাতায় সাহিত্যসম্মিলন প্রতিষ্ঠিত হয়"—'বাঙ্গালীর গান' পৃ ৮০৬

৯। সাহিত্যসম্মিলনের অধিবেশন উপলক্ষে বিহারীলাল সরকার এই গানগুলি রচনা করেন—'মা মা আবার কিবা মধুর বীণা বাজালে', 'কেন নীরব কুঞ্জকুটির কোকিল আর নাহি গায়', 'চমকে চিকুর ঘন নিশীথ অম্বরে'। 'সাবিত্রী লাইব্রেরি'র অধিবেশন উপলক্ষে তিনি লিখেছিলেন 'যদি জেগেছ মা আর ভুল না আর ভুল না'

১০। সুরাপান নিবারণী আরও কয়েকটি গান—তোমারে যে জন করেন গ্রহণ তাহার কখন ভাল নাহি হয়—হয়নাথ বসু; বাছা বলিয়ে অকালে জীবন দিও না (ভারতমাতার উক্তি)—হরিনাথ মজুমদার; হায়রে তোদের হাতে ধরে করিরে মানা—হরিনাথ; কেমনে ভারতের পাপ সুরাস্রোত প্রবেশিল—গোবিন্দচন্দ্র দাস; বিভো কত দুঃখ দিবে আর বল—গোবিন্দচন্দ্র; সুরা ও সুরাপায়ী এই দুই পক্ষের একটি নাটকীয় সংলাপগীত—গোবিন্দচন্দ্র, ইত্যাদি।

১১। সুকুমার সেন—বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড

১২। গোস্পদ বারিকে শব্দের টীকা লেখা আছে দ্বারবান

দ্বিতীয় পর্ব ঃ রবীন্দ্রসংগীত

উচ্চ আসন না যদি রয় নামব নীচে,
ছোটো ছোটো গানগুলি এই ছড়িয়ে দিছে।
কিছু তো তার রইবে বাকি
তোমার পথের ধুলা ঢাকি,
সবগুলি কি সন্ধ্যা-হাওয়ায় যাবে ভেসে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংগীতের ভূমিকা

১

রবীন্দ্রসংগীত—মাত্র কটি অক্ষরের মধ্যে একটি অলৌকিক প্রতিভা কী বিপুল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে আছে। ভূপৃষ্ঠগভীর অঙ্গারস্তূপের সহস্র সহস্র বৎসরের চাপে যেমন একখানি হীরকখণ্ড জ্বলে ওঠে, কত লক্ষ বৎসরের তপস্যার ফলে যেমন একটি আনন্দমাধবী ফুল ফুটে ওঠে, রবীন্দ্রসংগীতকে তারই সঙ্গে তুলনা করা যায়। অলক্ষ্যের বক্ষের আঁচলে ঢাকা আনন্দচ্ছবি যেন সুর হয়ে কবির গানে ফুটে উঠেছে। দূরযুগান্তরের বসন্তকাননের একটি বেলার হাসির সঙ্গে, কোন নন্দনকাননের পথভোলা বৈরাগীর একতারার সঙ্গে তার তুলনা। রবীন্দ্রনাথের সৌবকর আমাদেব জীবনকে নানাভাবে স্পর্শ করেছে, সূর্যকরঘাতে শৈলতুষারের মত বিগলিত হয়েছে আমাদের জীবন। কিন্তু তাঁর সমস্ত সাহিত্যশাখার মধ্যে সংগীতই সেই সোনার কাঠি যার স্পর্শে ঘুমন্ত রাজকুমারী চকিতে চোখ মেলে চায়। সংগীতের প্রভাবই আমাদের জীবনে সর্বাধিক। বহুধা রবীন্দ্রপ্রতিভা কথাসাহিত্য নাটক ইতিহাস বিজ্ঞান প্রবন্ধ শিক্ষা সর্বত্র প্রসারিত হলেও শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁব একটি মাত্র পরিচয়কেই সত্য বলে স্বীকার করেছেন—তিনি কবিমাত্র। জগতের আনন্দযজ্ঞে তিনি নিমন্ত্রিত অতিথি, তৃণে-পুলকিত এই মৃন্ময় বসুন্ধরাব প্রতি তাঁর বীণার একটিমাত্র ঝংকার —'লাগল ভালো মন ভোলালো এই কথাটাই গেযে বেড়াই'। কবিজীবনের পবম বাণীটি একমাত্র সংগীতেব মধ্য দিযেই তিনি অনায়াসে বলতে পেরেছেন ; শৈশবের প্রথম ছন্দসচেতন দিনগুলি থেকে জীবনের শেষ প্রহরগুলি পর্যন্ত তিনি কাব্যলক্ষ্মীর কাছে কখনও কপটতা করেননি। সেই কাব্যলক্ষ্মী চরণ রাখেন সুরের কমলটির উপর। সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও সীমার রেণুতে অসীম অনির্বচনীয়ের চকিত রহস্যস্ফুরণ প্রত্যক্ষ ও অনুভব করাই গীতস্রষ্টারূপে তাঁর সাধ্যসাধনতত্ত্ব। বিশ্বের রহস্য তাঁর কাছে কখনও নিঃশেষ হল না। প্রেম তাঁর কাছে চিরকালই দেহের গুণ্ঠন অপসারিত করে ইন্দ্রলোকের অমৃতবারির বার্তা বহন করে এনেছে। প্রকৃতি তাঁর কাছে দূর প্রতিবেশী নয়, জীবজগৎ ও জড়প্রকৃতির মধ্য দিয়ে একই প্রাণধারার প্রবহমাণতা তিনি স্বীকার করেন। কবিজীবনের এই আদর্শ ও প্রত্যয় তাঁর সংগীতেই অন্তরঙ্গ ও নিবিড় হয়ে

বেজেছে। পৃথিবীর সৌরপরিক্রমার মধ্য দিয়ে, ঋতুর আবর্তনের মধ্য দিয়ে, মৃত্তিকার তলদেশচারী বীজের অঙ্কুরোদ্‌গমের মধ্য দিয়ে কবি তাঁর জীবন-বিবর্তনের যে রহস্য অনুভব করেন, তার সংবাদ তাঁর গানেই নিহিত। তাঁর প্রেমসংগীতে তিনি অনন্তজন্মবাহিত লীলায় বিশ্বাসী, ঋতুর গানে তিনি আষাঢের মধ্যে যুগান্তরের বর্ষণমুখরতাকে প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর গানই বর্তমানের সঙ্গে দূর অতীত ও অনাদ্যন্তকালের মধ্যে সেতু বেঁধেছে। গানের সুর দিয়ে মানবের জীর্ণবাক্যকে কবি অর্থবন্ধনমুক্ত ভাবের স্বাধীনলোকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন, ক্ষণস্থায়ী নরজন্মকে মহৎ মর্যাদা দান করেছেন। কাব্য সংগীত নাটক উপন্যাস গল্প প্রবন্ধ চিত্রকলা প্রতিটি শিল্পের সোপানের উপর চরণ রেখে তিনি এক পরম নন্দনতীর্থে উপনীত হয়েছেন যেখানে শিল্পের কোনো গোত্র নেই, কোনো সংকীর্ণ সংজ্ঞা নেই। তুচ্ছের মধ্যে পরম মূল্য আবিষ্কার, স্থূলের মধ্যে সূক্ষ্মের রাগিণী-অন্বেষণ, সামান্যের মধ্যে অসামান্যের হিরণকিরণ লাভ, রূপের পাত্রে অরূপ মধুপিপাসাই তাঁর সংগীতসাধনার চূড়ান্ত সাফল্য। নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথিবীর নিকট শেষ পর্যন্ত তাঁর কোন সৃষ্টি অবিনশ্বর হয়ে থাকবে, এই ধারণা করা সীমাবদ্ধ ভৌমগুলিক জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য, কিন্তু মনে হয় তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে তাঁর সংগীতগুলিই পূর্ণতম সৃষ্টি। জীবনের সকল আনন্দবেদনাকে স্পর্শ করে, তুচ্ছ-বৃহতের মালা গেঁথে এই গান অসীম অব্যক্তের কণ্ঠহার হয়। এই বিষয়ে চরম পরিচয় আছে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যে—

"বাঙলাদেশ গানের দেশ। বাউল ভাটিয়ালি কীর্তন কত না গানের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে এদেশে, কোনও ধারা দীর্ঘ, কোনও ধারা হ্রস্ব, কোনও ধারা চঞ্চল, কোনও ধারা মন্থর। কোনও ধারার উৎপত্তি মালভূমি থেকে, কোনও ধারা বা চিরতুষার-শিখরসঞ্জাত। এই সব সংগীতপ্রবাহের চরিতার্থতা রবীন্দ্রসংগীতে, এর মধ্যে সকলের স্বাদ পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রসংগীতে একাধারে হিমালয়ের তুষার আর তুষারগলা বারি। একদিকে আমাদের প্রাত্যহিক সামগ্রী আবার আর একদিকে প্রাত্যহিক সীমার উর্ধ্বে। শ্রেষ্ঠ শিল্পের এই লক্ষণটি রবীন্দ্রসংগীতের মর্মগত গুণ। হিমালয়ের তুষারমালার দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে আত্মবিস্মৃত দর্শকের মনে হঠাৎ প্রশ্ন জাগে, এসব কি পার্থিব জগতের অন্তর্গত না অলৌকিক জগতের ঐশ্বর্য? এ সব কি সুদীর্ঘ কার্যকারণ-মালার পরিণাম কিংবা বিধাতার অযাচিত কৃপার দৃষ্টিভিক্ষা! আদৌ এসব কেমন

করে সম্ভব হল? রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধেও এরকম বোধ হয়ে থাকে। হিমালয়ের তুষার দেখে যেমন আমরা অভিভূত হই রবীন্দ্রসংগীতেও তেমনি অভিভব সৃষ্টি করে মনের মধ্যে। ঐ সুরের গুঞ্জন শুনতে শুনতে মনে হয় যে, অদৃশ্য যবনিকা-খানা চরাচরের শেষ রহস্যকে চিরাচ্ছন্ন করে দোতুল্যমান, হঠাৎ যেন কোন বাতাসে তার একটা প্রান্ত অপসারিত হয়ে গেল, আর চোখে পড়ল আকাশের 'নক্ষত্রের অক্ষৌহিণী থেকে অরণ্যের পতঙ্গ অবধি' মহাশোভাযাত্রায় আবদ্ধ হয়ে দুর্নিরীক্ষ্য কোন এক তীর্থাভিমুখে চলেছে, তারই শেষের দিকে আমার মত অভাজনেরও একটুখানি স্থান আছে। তখন বুঝতে পারা যায় জীবনের অর্থ, সংগীতের সংগতের সকলের সঙ্গে নিজেকে একত্র দেখে মনে হয়, 'ধন্য হল ধন্য হল মানবজীবন'।"[১]

২

রবীন্দ্রসংগীতের উৎস খুঁজতে গেলে উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যসংগীতের ইতিহাসেই প্রবেশ করতে হবে। কবিগানের অবসানপর্বে বাঙলার নাগরিক জীবন তখন টপ্পা-ঢপ-যাত্রা-পাঁচালির সুরে আত্মবিহ্বল, ধ্রুপদের চর্চায় সমাহিত, অন্যদিকে শৌখিন বাউল গানের সুরে মুগ্ধ, ব্রহ্মসংগীতের নূতন আবিষ্কৃত ধারায় পুলকিত। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সংগীতের সেই নবজাগরণ পর্বেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। সংগীত ও কবিতা তখনও স্বতন্ত্র পথ ধরেনি, অর্থাৎ সুরবিহীন কবিতা রচনার ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হলেও কাব্যসংগীত রচনায় উনিশ শতকের প্রায় প্রতি কবিরই উৎসাহ ছিল। প্রাচীন বাঙলা সংগীতের সংকলন-গুলিতে যাঁদের নাম পাই তাঁরা অবিমিশ্রভাবে গীতিকার নন, বাঙলা কাব্যের ইতিহাসেও তাঁদের অনেকের নাম আছে। কবিরাই সর্বাধিক গান রচনা করেছেন, কারণ সংগীতের কাব্যরূপের সঙ্গে গীতিকবিতার পার্থক্য ছিল না। পরন্তু সুরাশ্রিত গীতিকবিতা সুরহীন গীতিকবিতা অপেক্ষা অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করে, কণ্ঠে কণ্ঠে প্লবমান হয়, শ্রবণে বিহার করে—এই উত্তেজনাও কবিদের কাব্যসংগীত রচনায় প্রণোদিত করেছে। ব্রহ্মসংগীত-রচনাকারীদের উদ্দেশ্য ঠিক গীতিকবির ছিল না। তাঁরা ধর্মপ্রেরণার বশীভূত হয়েই এই জাতীয় গান রচনা করেছিলেন। মোটের উপর কথা ও সুর, গীতিকবিতা ও সংগীত যখন বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক কালে পরস্পরের সহযোগী, তখনই সংগীতকার রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব।

প্রথম যৌবনে 'সংগীত ও ভাব' নামক একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরবর্তী সংগীতসৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি ব্যক্ত করে দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বলেন যে, ভাব প্রকাশ করাই সংগীতের মুখ্য উদ্দেশ্য, রাগরাগিণীর ক্রিয়াকলাপ বিস্তার নয়। এ উক্তি স্বভাবতই কবির, সংগীতশিক্ষার্থী বা শাস্ত্রজ্ঞের নয়। কবি লিখেছিলেন যে, গায়করা সংগীতকে যে আসন দেন, কবি তদপেক্ষা উচ্চ আসন দেন—"তাঁহারা সংগীতকে কতকগুলা চেতনাহীন জড় সুরের উপর স্থাপন করেন, আমি তাহাকে জীবন্ত অমরভাবের উপর স্থাপন করি। তাঁহারা গানের কথার উপর সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপর দাঁড় করাইতে চাই। তাঁহারা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।" (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮, 'সংগীতচিন্তা'য় সংকলিত)

বস্তুত কবিত্বই রবীন্দ্রসংগীতের মুখ্য প্রেরণা, এইজন্যই রবীন্দ্রসংগীতকে আমরা বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যসংগীতরূপে গণ্য করি। ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী 'হিন্দু সংগীত' গ্রন্থে লিখেছিলেন—'সুর বাদ দিলে কথা সংগীতের এলাকা ছাড়িয়ে কবিতার রাজ্যে গিয়ে পড়ে'। বাঙলাদেশ কবিতার দেশ বলেই এখানে সংগীতে কাব্যের প্রভাব সর্বাধিক। রবীন্দ্রসংগীতের জনৈক বিশেষজ্ঞের একটি মন্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য—

"গানের কাব্যাংশ বাঙলা গানে উপেক্ষিত নয়। রবীন্দ্রনাথের গানের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম ব্যঞ্জনা হচ্ছে গানের কথার সঙ্গে গানের সুরের অনুপম মিলনে। গানের কথাগুলি যে রসসৃষ্টি করছে গানের সুর সেই সেই কথার না বলা অনির্বচনীয় সুরের অনির্বচনীয় আকৃতির মধ্যে মুক্তি দিচ্ছে, মেলে ধরছে। গানের কথাগুলিকে গানের সুর অবজ্ঞা করে নিজের ঐশ্বর্য প্রকাশ করছে না, কিংবা কথাগুলি নিজেদের প্রাধান্য তাচ্ছিল্য করছে না। কথার ভাব ধ্বনি ও ছন্দ, সুরের ভাব ও তার ছন্দের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের গানে গানের কাব্যাংশ যে লোকে গিয়ে পৌঁছেচে, রসের সেই নন্দনলোকে সুরের মন্দাকিনী সুরের অলখ ঢেউ নিয়ে কথাগুলিকে ঘিরে বয়ে চলেছে। কবিতার রস ও সুরের রস আলাদা হলেও রবীন্দ্রনাথের গানে এই দুই রসের মিলন ঘটেছে। গানের কথা ও সুর এক হয়ে গেছে অসামান্য সৃষ্টিরসের রসায়নে।"[২]

রবীন্দ্রসংগীতের আলোচনায় এ পর্যন্ত তাঁর সুরের বৈচিত্র্য সম্পর্কেই যথোচিত

বিশ্লেষণ হয়েছে, কিন্তু সাহিত্যের দিক থেকে তাঁর কাব্যসংগীতের সামগ্রিক বিচার হয়নি। 'রবীন্দ্রসংগীত বলিতে যে অলৌকিক গীতিকবিতা বুঝায়', অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর ভাষায়[৩], সেই অলৌকিক গীতিকবিতাকে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ ও গীতিবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়নি। সাহিত্যের ইতিহাসকার রবীন্দ্রসংগীতের আলোচনায় তাই বলেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথের ভাবে এবং রূপে কবিতায় ও গানের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা সহসা নজরে পড়িবার নয়। তাই রবীন্দ্রসাহিত্যের ধারাবাহিক আলোচনায় গানের যে বিশেষ সাহিত্যিক মূল্য আছে তাহার বিচার সাধারণত কেহ করেন না"।[৪]

অবশ্য গানকে সাহিত্য হিসাবে বিচার করার বাধা আছে। সুরের সহায়তায় গান আপনার বাগ্‌বন্ধের তুচ্ছতাকে অনেক সময় অবহেলা করে, সুরের পাখাতে ভর দিয়েই গান নন্দনলোকে উড়ে যায় এ ধরনের কথা আমরা প্রায়ই ব্যবহার করে থাকি। গানের কবিত্ব আপনার দীনতাকে সুরের মধ্যে ঢেকে রাখে, এমনকি কথাসর্বস্ব বাণীময় গানের ছন্দোস্পন্দ, প্রকাশের ত্রুটি, চারুত্বের অভাব সবই তার সাংগীতিক আবেদনের সম্পূর্ণতার কাছে আত্মসমর্পণ করে। রবীন্দ্রনাথ নিজে চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় লিখেছিলেন যে, 'এই জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম করে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে। কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়। যে পাখির প্রধান বাহন পাখা, মাটির উপরে চলার সময় তার অপটুতা অনেক সময় হাস্যকর বোধ হয়।' কিন্তু সে কথা নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার গদ্যধর্মী গানগুলি সম্পর্কেই বেশি করে প্রযোজ্য। পূর্বকথিত 'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধে কবিতা ও গানের পার্থক্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আরও একটি মন্তব্য পাওয়া যায়। সেখানে কবি বলেছিলেন, "গানের কবিতা সাধারণ কবিতার সঙ্গে কেহ যেন এক তুলাদণ্ডে ওজন না করেন। সাধারণ কবিতা পড়িবার জন্য ও সংগীতের কবিতা শুনিবার জন্য। উভয়ে যদি এতখানি শ্রেণীগত প্রভেদ হইল, তবে অন্যান্য নানা ক্ষুদ্র বিষয়ে অমিল হইবার কথা। অতএব গানের কবিতা পড়িয়া বিচার না করাই উচিত। খুব ভালো কবিতাও গানের পক্ষে হয়ত খারাপ হইতে পারে এবং খুব ভালো গানও হয়ত পড়িবার পক্ষে ভালো না হইতে পারে।..... গানের কবিতা পড়া যায় না, গানের কবিতা শুনা যায়"।[৫]

সাধারণভাবে গানের কবিতা এবং গীতিকবিতার এই ভেদরেখাটি রবীন্দ্রনাথ

যথার্থ নির্দেশ করেছেন। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখেছি, বাঙলা কাব্যসংগীতের আধুনিক যুগের সূত্রপাত ঘটেছে কবিদের সংগীতরচনার দ্বারা। যে কালে সুরকাররা কবি ছিলেন না, অথচ তাঁদের সৃজ্যমান সুরের উপর কথা বসানোর জন্য উপযুক্ত কবি-সহায়কের প্রয়োজন, সে কালে সুরকে ধরে রাখার জন্য দুর্বল কথা অনিবার্যভাবে এসে গেছে। কিন্তু উনিশ শতকে বাঙলা গান আক্ষরিক অর্থেই কাব্যসংগীত হয়ে উঠেছে। নিধুবাবু স্বয়ং সুরকার ও কবি ছিলেন; পরবর্তী একাধিক কবিপ্রতিভাসম্পন্ন সুরকারও একই সঙ্গে আপনাপন রচনায় বাক্‌যোজনা ও সুরার্পণের যৌথদায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মুখ্যত কবি ও সুরকার উনিশ শতকে পৃথক হয়ে গেছেন। স্বভাবতই কবিত্বের উন্মাদনায় গান রচিত হয়েছে, সুর দেওয়া হয়েছে পরে। তাই সেকালের গীতসংকলনগুলিতে আমরা গানের যে কাব্যরূপগুলি পাই, সেগুলি সুরবিহীন অস্থিসার বলে বিলাপ করার সামগ্রী নয়। সেগুলির সুর হয়ত তাদের কাব্যরূপকে আরও ঊর্ধ্বচারী করে তুলত, তথাপি সেইগুলি অধিকাংশই সুরচিত এবং কবিত্বশক্তিসম্পন্ন। গীতিকবিতার লক্ষণই হল, এ যুগে কবিতার মধ্যে একটি অস্ফুট গীতরস সঞ্চার করা। প্রাচীন বাঙলা কাব্যসংগীতের অনেক ক্ষেত্রেই তা ঘটেছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, বিংশ শতাব্দীর সূচনা-পূর্বকালে বাঙলা কাব্যসংগীতে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অনেকের মধ্যেই লিরিক রচনার ক্ষমতা ছিল। প্যালগ্রেভ লিরিকের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছিলেন তার মূলকথা ছিল—**Lyrical has been here held essentially to imply that each poem shall turn upon some single thought, feeling or situation**—এই ভাবের একমুখী প্রকাশ, পরিস্থিতির একাগ্রতা বা একান্ত চিন্তার বাঙ্ময় রূপ দিয়েই তো গত শতকের যাবতীয় কাব্যসংগীত গড়ে উঠেছে। সুতরাং সেইগুলির সুর জানা না থাকলেও তাদের অশ্রুত গীতরস পাঠকের কানে ধ্বনিত করাই গীতিকবিতার তথা কাব্যসংগীতের উদ্দেশ্য। এই গীতধর্মী কাব্য-সংগীত রবীন্দ্রনাথের হাতে এসে অখণ্ড ধ্যান শব্দ ও সৌন্দর্যের সুষমা লাভ করল। বিহারীলালের ভাবশিষ্য, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রশ্রয়লালিত, ব্রহ্মসংগীত ও স্বদেশী সংগীতের উত্তেজক পরিবেশে প্রবর্ধিত রবীন্দ্রনাথ কাব্যসংগীতের কবিত্বময় সুচারু সুঠাম আঙ্গিকের সঙ্গে ভালোভাবেই পরিচিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ঠাকুরপরিবারে যাঁরা সংগীত রচনা করেছিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী

—এ দের কারো গীতরচনাই সুরের প্রতি অন্ধ অনুগত্যে কবিত্বচ্যুত হয়নি। পরন্তু সকলেই গীতিকবির প্রতিভায় অল্পবিস্তর সম্মানিত ও ভূষিত ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানোয় সুরসৃষ্টিকালে অক্ষয় চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়োগ করতেন কেবল পলাতক সুরগুলিকে বেঁধে রাখবার জন্যই নয়, 'জীবন্ত অমর-ভাবের উপর স্থাপন' করার জন্য। সে কাজ প্রতিভাসম্পন্ন কবি ছাড়া আর কে পারবে? এইজন্য অল্প বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথের চিত্তলোকে কাব্যসংগীতের একটি সুনিরূপিত আকৃতির সংস্কার দৃঢ়মূল হয়েছিল। হয়ত সংগীতশাস্ত্রের দিক থেকেও এই সংস্কার সমর্থন পেয়েছিল। তাঁর আবাল্যের সংগীতশিক্ষা ধ্রুপদের ঋজু কাঠিন্যেই অগ্রসর হয়েছিল যেখানে খেয়াল-ঠুংরির মত সুরের কল্পনাবিলাস অপেক্ষা বাণীর মূল্য ও গঠনের কাঠিন্য নিহিত। মোটের উপর সংগীতকার রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই কাব্যসংগীতের জন্য আপনাকে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। তৎকালীন বাঙলাদেশের অনেক গীতিকারের গানই তিনি পছন্দ করতেন এবং তাঁদের কাব্যগীতের আঙ্গিকের অনুসরণ তাঁর প্রথম জীবনের গানে পাওয়া যায়। ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে কাব্যগীতের একটি পূর্ণতার আদর্শ এল। কয়েকটি সুনিরূপিত চরণ, মিলের সুবিন্যস্ত সংস্থান, স্তবকের সুঠাম প্রয়োগে তিনি বাঙলা কাব্যসংগীতের এমন একটি স্বরূপ নির্ণয় করে দিলেন যে পরবর্তীকালের গীতিকারগণ নিষ্ঠার সঙ্গে তা অনুসরণ করে চলেছেন। রবীন্দ্রপূর্ব গীতিকারদের মধ্যে কবিপ্রতিভার অভাব না থাকলেও অনেকেই সুরের বন্ধনে গানকে ধরে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন বলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কথার প্রতি উদাসীন্য দেখিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগীতে সেই অসর্তকতা সম্পূর্ণ তিরোহিত হল, গান হয়ে উঠল যথার্থ কবিতা। তাই রবীন্দ্রনাথই বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যসংগীতকার।

৩

সুতরাং রবীন্দ্রসংগীত, সংগীত হলেও, গীতিকবিতা হিসাবেই রবীন্দ্রকাব্য-পাঠকের কাছে তাঁর কাব্যগ্রন্থাবলীর মতই সমভাবে আদরণীয়, এ বিষয়ে বিতর্ক নেই। এই বিষয়ে একাধিক বিশেষজ্ঞের সুচিন্তিত আলোচনা আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে উদ্ধার করা যেতে পারে। তাঁর গীতিধর্মী সংগীত সম্পর্কে আধুনিক কালের জনৈক কবিসমালোচক মন্তব্য করেছেন—

"রবীন্দ্রনাথের গান যে কেবল অপূর্ব সুরলহরী তা নয়, সঙ্গে সঙ্গেই অপরূপ

বাণীর ব্যঞ্জনাও বটে। অভেদাঙ্গ হরগৌরীর মত, দেহ ও আত্মার মত, একই দুই হয়েছে আর দুটিতে মিলে পুনরায় এক হয়ে উঠেছে সচকিত রসিক চিত্তের চোখের সামনে। রবীন্দ্রসংগীতে সুরের আকর্ষণেও স্তব্ধ হতে হয় আর ভাব ভাষার ব্যঞ্জনায় কথার কারুকার্যেও অভিভূত হওয়া অনিবার্য। কবিতা ও রাগ উভয়ের অর্ধনারীশ্বর সত্তা ও শ্রী যার চিত্তপটে উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে, সে যে মহাভাগ্যবান সন্দেহ নেই, কেবল এক দেশে পুলক-অপলক দৃষ্টি পড়ে যার সেও ধন্য হয়।"৬

তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রসংগীত মাত্রকেই গীতিকবিতা বলা যায় কি? কবি-ব্যক্তিত্বের মন্ময় আত্মপ্রকাশের দিক থেকে কাব্যের তুলনায় কাব্যসংগীতে গীতি-কবিতার লক্ষণ যে সর্বাধিক সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। বাঙলা কাব্যের মূল ধারা তার সংগীতপ্রবণতার জন্যই গীতিকাব্যিক, সাহিত্যের ইতিহাসে এই ধরনের মন্তব্য আমরা একাধিকবার পাঠ করেছি। বাঙলার সংগীতবহুল গীতিকাব্যধারা যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এসেই তার পূর্ণসিদ্ধি লাভ করেছে তাতেও দ্বিমত নেই। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংগীতকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হলেও বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও শিল্পবোধুনিতে রবীন্দ্রনাথের গীতধর্মী মনটি তাঁর সকল শ্রেণীর সাহিত্যেই অল্পবিস্তর প্রতিফলিত। কোনো এক প্রবীণ সমালোচক রবীন্দ্রনাথের গীতিব্যতিরিক্ত সাহিত্যের লিরিক লক্ষণ সম্পর্কে একবার মন্তব্য করেছিলেন, "কবির প্রতিমাপ্রয়োগে [বাক্‌প্রতিমা = ইমেজ] যদিও ধ্বনি-স্পর্শ-গন্ধ-দৃষ্টি সব কয়টি ইন্দ্রিয়বেদিতার পুনরাবৃত্ত প্রকাশ, তবুও ধ্বনিই প্রবল, অর্থাৎ কবির সৃজনী প্রতিভা ধ্বনিময় রূপেই প্রধানত তৃপ্তি পায়। তাঁর কাব্যে দৃশ্যময় ঘ্রাণময় স্পর্শময় প্রতিমা অতুলনীয় সৌন্দর্যবান, কিন্তু সুরেলা প্রতিমাতেই কবি-চিত্তের সহজতম ও প্রকৃষ্টতম অভিব্যক্তি"।[৭] অর্থাৎ তিনিও গীতিপ্রবণতাকেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক সত্তার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি বলেছিলেন। তাঁর ভাষায় পুনশ্চ বলা যায়, "সুরধর্মের প্রধান প্রকাশ লিরিক কাব্যে, আর লিরিক কাব্য সবজেকটিভ, মন্ময়, কবির ব্যক্তিআশ্রয়ী, আত্মমগ্ন"। এইজন্য তাকে বলতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের "গানগুলি আত্মমগ্ন রচনা, রূপকারের ব্যক্তিত্ব দ্বিধাহীন ভাবে সেখানে প্রকট।"

কিন্তু তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের কাব্যধর্ম সম্পর্কে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কুণ্ঠিত ছিলেন। তাঁর প্রথম জীবনের সংগীতরচনায় ভাবের দৈন্য সম্পর্কে তাঁর সংকোচ ছিল, সুরের প্রতি নির্ভরশীলতায় কবিতাকে কোথাও কোথাও

পরমুখাপেক্ষী হতে হয়েছে বলে তাদের স্বতন্ত্র কাব্যধর্মকে কবি অনায়াসে ঘোষণা করতে পারেননি। রবীন্দ্ররচনাবলীর (বিশ্বভারতী সংস্করণ) ভূমিকায় কবি তাঁর প্রৌঢ় বয়সে লিখেছিলেন—

"সাহিত্যরচনার মধ্যে জীবধর্ম আছে। নানা কারণে তারা সবাই একই পূর্ণতায় দেখা দেয় না। · ·মনে আছে এক সময় বিজয়া পত্রে বিপিনচন্দ্র পাল আমার রচিত গানের সমালোচনা করেছিলেন। সে সমালোচনা অনুকূল হয়নি। তিনি আমার যে সব গানকে তলব দিয়ে বিচারকক্ষে দাঁড করিয়েছিলেন তাদের মধ্যে বিস্তর ছেলেমানুষি ছিল। তাদের সাক্ষ্য সংশয় এনেছিল সমস্ত রচনার পরে। তারা সেই পরিণতি পায়নি যার জোরে গীত-সাহিত্যসভায় তারা আপনাদের লজ্জা নিবারণ করতে পারে (৩০।৬।৩৯)"।[৮]

সুরের খাতিরে কোনো কোঁনো ক্ষেত্রে যে ছন্দের শিথিলতা ঘটে এবং তা গীতিকাব্যরূপে ঈষৎ ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, এই বিষয়ে আশঙ্কা তাঁর পরবর্তী জীবনেও দেখা দিয়েছে। গীতাঞ্জলির কোনো কোনো রচনায় ছন্দের কৈফিয়ৎ প্রসঙ্গে কবি দিলীপকুমার রায়কে একবার লিখেছিলেন—

"গোড়াতেই বলে রাখা দরকার—গীতাঞ্জলিতে এমন অনেক কবিতা আছে যার ছন্দোরক্ষার বরাত দেওয়া হয়েছে গানের সুরের পরে। অতএব যে পাঠকের ছন্দের কান আছে, তিনি গানের খাতিরে এক-মাত্রা কমবেশি নিজেই দুরস্ত করে নিয়ে পড়তে পারেন, যাঁর নেই, তাঁকে ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে"।[৯]

অবশ্য এখানে বলা বাহুল্য, আলোচ্য পত্র পাঠ করলে দেখা যায় যে, দিলীপ-কুমার গীতাঞ্জলির যে কয়েকটি গানের ছন্দ সম্পর্কে কবির কাছে 'কৈফিয়ৎ' চেয়েছিলেন, সেইগুলি বস্তুতই কাব্যছন্দের দিক থেকে ত্রুটিহীন। সুতরাং সেইগুলি সম্পর্কে কবির কৈফিয়তের প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জীবনে বহু হিন্দিগান ভেঙে বাঙলা গান রচনা করেছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে সুরের কাঠামোটা পরস্ব বলে তাদের ছন্দ বা কাব্যরূপটিকে যথাযথভাবেই কবিকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। সুতরাং সেইগুলিকে নিখুঁত গীতিকবিতা হয়ত বলা যাবে না। এই ধরনের উদাহরণ মনে রেখেই বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের সংগীত মাত্রই ত্রুটিহীন গীতিকবিতা হয়ত বা নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বহুবার তাঁর সুরাশ্রিত রচনাগুলিকে মুদ্রিত করার সময় তাদের অসম্পূর্ণতার জন্য পাঠকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। চিত্রাঙ্গদার নৃত্যনাট্য সংস্করণের

ভূমিকার পুনরুক্তি বাহুল্য মাত্র, কিন্তু গীতাঞ্জলি সম্পর্কে এই ধরনের অসম্পূর্ণতার সন্দেহ অমূলক। কারণ গীতাঞ্জলি সুরবদ্ধ না জেনেও তার ইংরাজি গদ্যানুবাদ পাঠ করেই জগৎকবিসভায় রবীন্দ্রনাথের সানন্দ অভ্যর্থনা ঘটেছিল। পক্ষান্তরে নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদাতেও এমন অনেক রচনা আছে যেগুলি একেবারে হেঁটে-চলা হাস্যকর পাখি নয়, হঠাৎ উড়তে উড়তে যেন অলিন্দে এসে বসেছে। 'শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে অতল জলের আহ্বান', কিংবা 'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা' অথবা 'বিনা সাজে সাজি দেখা দিবে তুমি কবে' গানগুলি তারই দৃষ্টান্ত রূপে গণ্য হতে পারে। জনৈক আধুনিক কবিসমালোচক রবীন্দ্রসংগীতের কাব্যমূল্যবিচারের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংগীতগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।[১০] তাঁর মতে, প্রথম শ্রেণীতে পড়বে এমন গান, যেগুলি সুরের সহযোগিতা ছাড়াও সুসংবদ্ধ গীতিকবিতারূপে উপভোগ্য হতে পারে। এই ধরনের কাব্যগীতই রবীন্দ্রনাথের সংগীতসংকলনে সর্বাধিক, এই ধরনের রচনাতেই তাঁর নৈপুণ্য প্রশ্নাতীত, এইগুলিতেই তাঁর বাণীসিদ্ধি বিস্ময়কর। বস্তুত এইগুলিই চিরঅবিনশ্বর রবীন্দ্রসংগীতরূপে গণনীয়। গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালির যাবতীয় গান নিঃসন্দেহে এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। আলোচ্য শ্রেণীবিভাগের উদ্যোক্তা 'আজি শ্রাবণঘন-গহন মোহে' গীতাঞ্জলির এই গানের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, "এই কবিতা আমি অন্তহীনভাবে মনের মধ্যে আবৃত্তি করতে পারি। মানসীর যুগ থেকে যে প্রেম এবং প্রকৃতি পূজার অভিমুখে যাত্রা করেছিল তারই আশ্চর্য পরিণতি এই গীতিকাব্য। একদিকে তা বৈষ্ণব কাব্যের অনুরণনের প্রতি আমাদের সচকিত করে তোলে, আর একদিকে ছন্দ এবং চিত্রকল্পের জটিলতা মিলিয়ে এ বিষয়েও আমাদের সচেতন করে যে, বিশ শতকের একজন অসামান্য আধুনিক কবির পক্ষেই শুধু সম্ভব ছিল এ কবিতার রচনা।"

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়বে এমন গান যেগুলি বস্তুত একান্তই সুরনির্ভর। কেবল বাক্যে সেইগুলি মৃদাশ্রয়ী, একমাত্র সুরের সাহচর্যেই তারা পক্ষবান ভাবের স্বাধীন লোকে ঊর্ধ্বারোহী। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে বহু গদ্য গান রচিত হয়েছে সেইগুলি এই বিভাগের অন্তর্গত হতে পারে। 'বেদনা কী ভাষায় রে' অথবা 'যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল' প্রভৃতি গানের কথা স্মরণ আসে। প্রাগুক্ত সমালোচক 'শুভ্র প্রভাতে পূর্ব গগনে উদিল কল্যাণী শুকতারা' গানটির উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, "এই বারোটি শব্দের সমন্বয়ে রচিত গানটি দেখতে প্রায়

জাপানি হাইকুর মত। কিন্তু রচনায় চিত্রকল্প মাত্র একটি, তরুণ অরুণরশ্মি অন্ধ তামসী রজনীর কারা ভাঙছে, খুব একটা চমকে দেবার মত বলে মানা কঠিন। এই শব্দসমষ্টিকে প্রাণ দিতে পারে সুর এবং গায়িকার কণ্ঠস্বর। নৃত্যনাট্যে ব্যবহৃত বহু গান এই শ্রেণীর। সুর সেখানে ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম করে করে যায়, আর তাই সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে।"

সেইগুলিকে লেখক তৃতীয় ধরনের গান বলতে চান যেগুলি নিছক্ কবিতা হিসাবেই রচিত হযেছিল, পরে কবি তাদের সুরে বসিযে গান করে তুলেছেন। 'খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে,' 'যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ,' 'কিসের তরে অশ্রু ঝরে,' 'নহ মাতা নহ কন্যা' প্রভৃতি যে সব কবিতা সংগীতে যথাযথভাবে গৃহীত সম্ভবত সেইগুলিই এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। লেখক বলেছেন, "এ সব রচনা কবিতা হিসাবে পড়েই আমি খুশি থাকতে চাই। এদের মধ্যে এমন কোনো সাংগীতিক সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না, যা সুরবিহনে উপভোগ করা যাবে না। এসব রচনায় কবিতারই স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত।"

অবশ্য এই শেষ শ্রেণী সম্পর্কে লেখকেব মন্তব্যের সঙ্গে সকলে একমত হবেন কিনা সন্দেহ আছে। 'কৃষ্ণকলি', 'যখন পডবে না মোর পাযের চিহ্ন', 'প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায', 'হে নিরুপমা' প্রভৃতি অপরূপ কাব্যগীতগুলি সম্পর্কেও এই মনোভাব অক্ষুণ্ণ থাকে কি না এই প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়। মোটের উপর এই ধরনের শ্রেণীবিভাগের সর্বজনীনতা মেনে না নিলেও রবীন্দ্রসংগীতের কাব্যমূল্য ও গীতিধর্মিতার শ্রেণীনিরূপণের ব্যাপারে এইরূপ বিন্যাস ও শ্রেণীগত বিভাগ অনিবার্য। এই ধরনের শ্রেণীবিভাগ ইতিপূর্বে রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক প্রবোধ-চন্দ্র সেনও একটি প্রবন্ধ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রসংগীতের কথা ও সুর যেন বাগর্থের মত পরস্পরসম্পৃক্ত। তথাপি "এমন অনেক রচনা আছে যার সঙ্গে সুর যুক্ত না হলেও ভাবগৌরবের বিশেষ হানি ঘটে না, যেমন ভেঙেছে দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়, বিপদে মোরে রক্ষা কর। আবার এমন অনেক গান আছে যার সঙ্গে সুর যুক্ত না হলে কথাগুলি ঝরে-পড়া শুকনো ফুলের পাপড়ির মতই ব্যর্থ হয়ে যায়। যেমন নীলাঞ্জন ছায়া, মন মোর মেঘের সঙ্গী। কিন্তু অধিকাংশ গানেই কথা ও সুরের মিলন এমন সুষম যে কারও গৌরব অপরের চেয়ে কম নয়, উভয়েই উভযের গৌরব বৃদ্ধি করে।"[১১]

৪

রবীন্দ্রনথের গানের ভাষা আর কবিতার ভাষা কি স্বতন্ত্র? অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা তিন শ্রেণীর—বিশুদ্ধ কবিতা, গীত হওয়ার জন্য রচিত কবিতা এবং গানের বাহন কবিতা। 'পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একী সন্ন্যাসী' একটি বিশুদ্ধ কবিতা। গীতাঞ্জলির 'আমার মাথা নত করে দাও হে' গীত হওয়ার জন্য রচিত কবিতা। গানের বাহন কবিতা তাকেই বলা যায় যেখানে সুর দিতে দিতে কবিতাটি রচিত হয়েছে, সুরের প্রেরণাতেই কথাবস্তুর আবির্ভাব। কণ্ঠে যখন গানের সুর আসে, তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কথা বসানো হয়, হয়ত সেই প্রারম্ভিক বাক্‌রূপে ছন্দের সম্পূর্ণতা থাকে না। পরে দেখা গেছে তার ছন্দোগত অসম্পূর্ণতা সংশোধন করে কাব্যরূপটিকে আরো মার্জিত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সংগীতগুলির পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হলে এই প্রকার বহু উদাহরণ আবিষ্কার হবে। এই ধরনের গীতরূপ ও কাব্যরূপের মধ্যে তুলনার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। 'উদাসিনী-বেশে বিদেশিনী কে সে' গীতবিতানের এই গানটির প্রথম পাঠ এবং প্রচলিত পাঠ পাশাপাশি উদ্ধৃত করা হচ্ছে—[১২]

প্রথম পাঠ উদাসিনী সে বিদেশিনীকে নাইবা তারে জানি
মনে জাগে নব নব রাগে তারি মরীচিকা ছবিখানি।
পুবের হাওয়ায় তরীখানি তার
ভাঙা এ ঘাট কবে হলো পার,
রঙীন মেঘে আর রঙীন পালে তার
করে গেল কানাকানি।
একা আলসে গণি বসে পলাতকা যত ঢেউ।
যায় তারা যায় ফেরে না, চায় না পিছু পানে আর কেউ
জানি তার নাগাল পাব না আমার ভাবনা
শূন্যে শূন্যে কুড়ায়ে বেড়ায় বাদলের বাণী।

কবিতা হিসাবে ত্রুটিপূর্ণ, ছন্দের দিক থেকে খণ্ডিত এই খঞ্জ রচনাটি সম্ভবত সৃজ্যমান সুরের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সুরটিকেই মুখ্যরূপে গড়ে তোলার জন্য কবি কাব্যরচনায় কথাকে গৌণ রেখেছেন। কাব্যবন্ধের দিক দিয়ে রচনাটি ত্রুটিহীন বলা যায় না। এখন গীতবিতানে এর প্রচলিত পাঠটি দ্রষ্টব্য—

উদাসিনী-বেশে বিদেশিনী কে সে নাইবা তাহারে জানি,
রঙে রঙে লিখা আঁকি মরীচিকা মনে মনে ছবিখানি।
পুবের হাওয়ায় তরীখানি তার এই ভাঙা ঘাট কবে হল পার
দূর নীলিমার বক্ষে তাহার উদ্ধত বেগ হানি ॥
মুগ্ধ আলসে গনি একা বসে পলাতকা যত ঢেউ
যারা চলে যায় ফেরে না তো হায় পিছু-পানে আর কেউ।
মনে জানি, কারো নাগাল পাব না—তবু যদি মোর উদাসি ভাবনা
কোনো বাসা পায় সেই দুরাশায় গাঁথি সাহানায় বাণী ॥

এই দ্বিতীয় রচনাটি ছন্দোবন্ধে মিলবিন্যাসে পর্বস্তবকে সুসংবদ্ধ ত্রুটিহীন এবং এই রচনার উপরও স্বরারোপ করে কবি এটিকেই গীতিবিতানে স্থান দিয়েছেন। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, প্রথম রচনাটির সুর কী ছিল, কবি সেই সুরকে গ্রহণ করেই কি দ্বিতীয় কবিতাটিতে প্রয়োগ করেছেন? গানের দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ কাব্যরূপ পীড়াদায়ক বলেই কি পরে তাদের ছন্দোগত দুর্বলতার সংশোধন ঘটানো হয়েছে?

শেষ বয়সে কবি ছন্দোভ্রষ্ট গদ্যকবিতাতেও স্বরারোপ করেছিলেন, সুতরাং গদ্যভঙ্গিম বাণীকে গীতরূপে প্রচলিত করতে তাঁর দ্বিধা না থাকাই স্বাভাবিক। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে। তবু আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষা ও কবিতার ভাষার মধ্যে গভীর দুরপনেয় পার্থক্য নেই। গানরচনা ও কবিতা-রচনার মধ্যে তিনি কোনো প্রেরণাগত পার্থক্য অনুভব করেননি। কবিতার তুলনায় গানের প্রতি তাঁর দুর্বলতা সমধিক হলেও জীবনের নানা পর্বে তিনি কবিতার উপর নির্বিচার স্বরারোপ করে সেগুলিকে কাব্যসংগীতে পরিণত করেছেন। সেক্ষেত্রে সংগীতে পরিণত হওয়ার জন্য কবিতার ভাষায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। মূলত রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার সংগীতময় প্রেরণাই তাঁর কাব্যভাষা ও গীত-ভাষার সম্ভাব্য দূরত্ব অপনোদিত করেছে। কবিসমালোচক মোহিতলাল মজুমদার গীতিকবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের মূল সুরটিকে একদা সার্থকভাবে ধরার চেষ্টা করেছিলেন এই ভাবে—

"এখন বুঝি, রবীন্দ্রনাথের কল্পনাশক্তির মূলে আছে—অন্তর ও বাহির, ভাব ও বস্তু, চিন্তা ও অনুভূতির সংগতিমূলক এক অপূর্ব গীতিপ্রবণতা, ইহাতেই তাঁহার মনের মুক্তি। সেই মুক্তির আনন্দে তাঁহার কল্পনা সকল সংস্কার, সকল বিরোধ উত্তীর্ণ হইয়া এমন এক রসভূমিতে অধিষ্ঠান করে, যেখানে জীবনের

সকল অসামঞ্জস্য, বাস্তবের সকল বৈষম্য কবির প্রাণে একটা ভাবৈকরূপরিণাম রাগিণীতে সমাহিত হয়। গদ্যে হোক পদ্যে হোক—তিনি যখন যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার অন্তর্গত এই সংগীত পাঠককে আবিষ্ট করে, তাহার সমগ্র চেতনাকে সেই সর্ব সমঞ্জসকারী গীতিরাগে বিগলিত করিয়া যে ভাবদৃষ্টির অধিকারী করে তাহাতে জগতের কোনো কিছুতে উচ্চনীচ ক্ষুদ্রবৃহৎ সত্যমিথ্যার অভিমান থাকে না—একটি সুগভীর সর্বাত্মীয়তার প্রীতিকল্পনায় ধূলিও পরমবস্তু হইয়া উঠে"।[১৩]

বস্তুত এই গীতিপ্রবণতা, সংগীতাবেশ বা গীতিরাগ রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের মূলে নিহিত বলেই রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে সহজেই গানে পরিণত করা যায়, গানকে কবিতারূপে অনায়াসে পাঠ করা যায়। সুতরাং তাঁর কবিতার ভাষার সঙ্গে সংগীতের ভাষার বাহ্যিক ভেদ প্রবল নয়। মানসীপূর্ব যুগ পর্যন্ত ধ্বনিপ্রধান ছন্দে কাব্যরচনার রীতিতে অভ্যস্ত না হওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ এমনিতেই কবিতায় যুক্তাক্ষর প্রয়োগ করতেন কম। সেই পর্যায়ের গানের ভাষা ও কবিতার ভাষায় ভেদরক্ষাও কঠিন। অবশ্য সংগীতের ছন্দ সাধারণত ধ্বনিপ্রধান অথবা স্বরাঘাতপ্রধান হয়ে থাকে বলে তানপ্রধান ছন্দের শোষণশক্তি যে ধরনের যুক্তাক্ষরবহুল তৎসম শব্দ কবিতায় প্রযোগ করতে পারে, গানের ক্ষেত্রে তার ব্যবহার সংকুচিত। কিন্তু সেক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ 'ছবি' কবিতায়, কড়ি ও কোমলের 'গান রচনা' কবিতায় ('এ শুধু অলসমায়া এ শুধু মেঘের খেলা') স্বরারোপ করে, নৃত্যনাট্যের গদ্যসংলাপে সুরদান করে, শাপমোচনের কোনো গদ্যরচনায় সুরার্পণ করে গদ্যধর্মী বাক্যের সঙ্গে সংগীতের ভাষাকে একেবারে মিলিয়ে দিয়েছেন। গানের আঙ্গিক কয়েকটি নির্দিষ্ট পন্থা মেনে চলে, তার মিলবিন্যাসে কিছু প্রথাস্বীকৃতির প্রয়োজন আছে, স্তবকবন্ধেও স্বাধীনতা সংকুচিত বলে অবশ্য সংগীতের ভাষায় কবি নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা গ্রহণ করতে পারেন না। কবিতার তুলনায় সংগীতে কিছু ঐতিহ্যাশ্রিত শব্দের ব্যবহারেরও সুযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংগীতের বিপুল ভাষার ও বাক্-সম্পদে এমন কিছুর অভাব নেই যা তাঁর কাব্যেরই একমাত্র লক্ষণ বা বা উপকরণ। সমাসবদ্ধ দীর্ঘ পদের ব্যবহার, তৎসম শব্দ, যুক্তাক্ষরবহুল ধ্বনিপ্রয়োগ, গ্রাম্য বা প্রচলিত শব্দ, অপরিচিত শব্দ, এইগুলি তাঁর কবিতায় যেমন, গানেও তেমনি। তবে গানের তুলনায় প্রয়োগব্যাপ্তিহেতু কবিতায় আপেক্ষিক ব্যবহার বেশি হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু উভয়ের মধ্যে দুর্মোচ্য ব্যবধান

আছে বলে মনে হয় না। চিরমধুনিষ্যন্দ, বিষয়বিষবিকারজীর্ণ, ক্লান্ত-তড়িৎ-বধূ তন্দ্রাগতা, মৃত্যু-তরণতীর্থে কর স্নান, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, মেঘমুক্ত-সহাস্য-শশাঙ্ক-কলা, ভূতল-জল-অন্তরীক্ষ-লঙ্ঘন লঘু মায়া, তড়িৎশিখা ছুটে দিগন্ত সন্ধিযা, নিবিড-তমিস্র-বিলুপ্ত-আশা, প্রস্তরশৃঙ্খলোন্মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ, লণ্ডভণ্ড লুটিল ধুলায় অভ্রভেদী অহংকার, হেরো ক্ষুব্ধ ভয়াল বিশাল নিরাল পিযাল-তমাল-বিতানে—এই ধরনের শব্দ প্রয়োগ উনিশ শতকের কাব্যসংগীতে অকল্পনীয় ছিল। নিঃসন্দেহে সংগীত এখনো এই ধরনের ধ্বনিসম্পদ বহন করতে চায় না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানে এই প্রকার অজস্র শব্দ অকাতরে অনায়াসে ব্যবহৃত হয়েছে। তারই পাশে অত্যন্ত সাধারণ ব্যবহারিক জগতের ভাষা, মৌখিক বুলিকেও তিনি গানে প্রযোগ করেছেন। প্রায়শ্চিত্ত নাটকে ধনঞ্জয়ের এই গানের ভাষা—

> যে দিন ভবের মেয়াদ ফুরাবে ভাই, আগল যাবে সরে—
> সে দিন হাতের দড়ি, পায়ের বেড়ি, দিবি রে ছাই করে।
> সে দিন আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে ওই নাচনে নাচবে রঙ্গে—
> সকল দাহ মিটবে দাহে, ঘুচবে সব বালাই।

এগুলি রামপ্রসাদ-কমলাকান্তের লোকায়ত বাগ্‌ভঙ্গিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ভাগাইনু, ভাঙাইনু, গেনু, পেঁচি, ফাঁসি, ফাঁসিযে দিযে, যাবে চুকে, আয় রে ধেযে, লুটেপুটে, উডিয়ে নে যায়, হতভাগিনী, নিযডে—এই ধরনের শত শত প্রয়োগ গীতবিতানের পাতা থেকে অনায়াসে সঞ্চয় করা যেতে পারে।

৫

কাব্যসংগীত ও গীতিকবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছেন তাঁর গানগুলির ছন্দোরূপ নিয়ে আলোচনা করলে সে কথা স্পষ্ট হবে। ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ বাঙলা কবিতার ছন্দঃশিল্পে দীর্ঘ প্রায় অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, তার ফলে বাঙলা কাব্যশৈলী বহু শতাব্দীর পরমায়ু অর্জন করেছে, রবীন্দ্রকাব্যের ছন্দোবিজ্ঞানের আলোচনাকারী স্বতন্ত্র স্থানে তা প্রমাণ করেছেন বা করবেন। কিন্তু তাঁর বিরাট সৃষ্টি যে কয়েক শত কাব্যসংগীত, সেগুলির ছন্দেও কতখানি কাব্যকুশলতা আছে, সুরাশ্রিত বাণীকেও পঠনীয় কবিতারূপে কত হৃদ্য সুখশ্রুতিকর ধ্বনিস্পন্দে বাজানো যেতে পারে এই পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথই সার্থকভাবে করেছেন। রবীন্দ্রপূর্ব বাঙলা কাব্যসংগীতে ছন্দোবৈচিত্র্য

বিরল, ভাবাবেগই সেখানে ছিল মুখ্য। সহস্র কাব্যসংগীতের মধ্যে শতকরা দশটি কবিতা হয়ত ছন্দের দিক থেকে নৈপুণ্য অর্জন করেছিল অথবা কবিতা হিসাবে পূর্বে রচিত ও পরে স্বরারোপিত হওয়ার জন্য কিছু প্রাচীন কাব্যসংগীতকে ত্রুটিহীন ছন্দঃশিল্পের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যায়। এছাড়া অধিকাংশ কাব্যসংগীতই ছন্দচ্ছুট বললে অন্যায় হয না। অবশ্য আধুনিক-ব্যক্তিত্বনির্ভর কাব্যসংগীতের পূর্বাভাস অষ্টাদশ শতাব্দীর গীতিকার রামপ্রসাদের মধ্যেই প্রথম ধ্বনিত হযেছিল এবং 'বাংলা গানের ছন্দকে মুক্তি দিয়েছিলেন রামপ্রসাদ'—অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের এই মন্তব্য নিঃসন্দেহে কাব্যগীতের ছন্দ-সংক্রান্ত আলোচনাকে প্রশস্ত করেছে।[১৪] রামপ্রসাদের জনপ্রিয় যে কবিতা বা গানগুলির সঙ্গে সাধারণত পাঠকরা পরিচিত সেগুলি অর্ধপক্ক স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দে রচিত এইরূপ বিশ্বাস থাকলেও সমগ্র প্রসাদী পদাবলী অন্বেষণ করে দেখা যায তিনি তিন প্রকার বাঙলা ছন্দেই গান রচনা করেছিলেন, সেইখানেই তাঁর কৃতিত্ব। লোচনদাসের ধামালিতে যে স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দের প্রয়োগ ছিল রামপ্রসাদ অবশ্য সেই অনভিজাত লৌকিক ছন্দকেই গানে সর্বাধিক ব্যবহার করেন এবং সেই ছন্দই আজ পর্যন্ত বাঙলা কাব্য-সংগীতের সর্বোচ্চ বাহনরূপে ব্যবহারযোগ্যতা লাভ করেছে। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও এই লোকাযত ছন্দকে লঘু গীতিরচনায় প্রয়োগ করেছিলেন। গুপ্ত কবির পরবর্তী কবিরা এই ছন্দ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু উচ্চ ভাবের কবিতায় তেমন নয়। লঘু হালকা চালের গান রচনায স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দের ব্যবহার সমগ্র উনিশ শতকের শেষার্ধে প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দকে লঘুভাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, এই ছন্দের শতাব্দী-কালীন লঘুত্ব থেকে শাপমোচন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের হাতেই। রামপ্রসাদের গান অবশ্য লঘু হালকা চালের ভাবপ্রকাশের অঙ্গ ছিল না, কিন্তু তার মধ্যে যে বালকোচিত স্নেহকাতরতা, মান-অভিমান, অনুনয-কাতরতা, ভিক্ষা-ক্রোধ প্রভৃতি মনোভাব ছিল, তার জন্য সেই লোকাযত ছন্দই উপযোগী হয়েছিল। গভীর দার্শনিক অনুভূতি, স্তব্ধ অন্তর্নিবেশ রামপ্রসাদের হাতে পরীক্ষিত হতে পারেনি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর খেয়া গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য প্রভৃতি কাব্যের অধিকাংশ গানই এই অনভিজাত ছন্দে গেঁথে এই ছন্দে ভক্তির গাঢ়তা ও ধর্ম-ভাবের অতীন্দ্রিয়তাকে অনবদ্যভাবে রূপায়িত করতে পেরেছেন। গীতবিতানের যে কোন পৃষ্ঠা খুললেই এই লৌকিক ছন্দে কবির ভাবপ্রকাশের গভীরতার পরিচয়

পাওয়া যাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অজস্র এবং অগণ্য এই ছন্দে রচিত কাব্যসংগীত থেকে নির্বিচারে প্রত্যেক পর্যায় থেকে একটি করে গানের উল্লেখ করছি—

পূজা গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করব নিবেদন

প্রেম আসা-যাওয়ার পথের ধারে গান গেয়ে মোর কেটেছে দিন

ঋতু বজ্র-মানিক দিয়ে গাঁথা, আষাঢ় তোমার মালা
বকুলগন্ধে বন্যা এল দখিন-হাওয়ার স্রোতে

বিচিত্র কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে ডাইনে বাঁয়ে দুইহাতে

কিন্তু কেবল স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দই নয়, ধ্বনিপ্রধান এবং এমন কি তান-প্রধান ছন্দকেও সংগীতে ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কাব্যের ছন্দ-ঘটিত পরীক্ষা তাঁর সংগীতেও প্রতিফলিত হয়েছে, যার ফলে শেষ বয়সের গদ্য-কবিতাও সংগীতে অনুপ্রবেশ করেছে। এই সম্পর্কে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের আলোচনা উদ্ধার করছি—

"গদ্যের স্বাধীনতার মধ্যে কাব্যের সুষমা যদি বা প্রকাশিত হতে পারে, গান তার চিরাচরিত ছন্দ-মিলের শৃঙ্খল পরিহার করে চলবে এও কি সম্ভব ?

সুর বাদ দিয়ে গান যখন কবিতার মত করে পড়ি তখনও তার ছন্দ একেবারে নিখুঁত হবে বাঙলা গান সম্বন্ধে এ প্রত্যাশা আমাদের পক্ষে কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। যে গান কবিতা হিসেবে ভাঙাচোরা ছন্দে গাঁথা, তাকে গ্রহণ করতে আমাদের কাব্যবিলাসী মন সম্মত হয় না। দেখা যাবে যে দ্বিজেন্দ্রলাল ও নজরুল ইসলামের প্রতিটি এবং অতুলপ্রসাদের অধিকাংশ গান কবিতার ছন্দকে সম্পূর্ণ বজায় রেখে চলেছে। বলা বাহুল্য, আমাদের এ প্রত্যাশা রবীন্দ্রনাথের রাজকীয় ঐশ্বর্য অজস্রভাবে পূর্ণ করেছে। একটা সময় পর্যন্ত, আমার বিশ্বাস প্রবাহিনী পর্যন্ত, তাঁর গানগুলিতে কাব্যের ছন্দোবন্ধন শুধু যে অক্ষুণ্ণ তা নয়, রীতিমতো বিস্ময়কর। বিস্ময়কর এই কারণে যে, অনেক নতুন ছন্দ, ছন্দের অনেক নতুন ভঙ্গি কবি তাঁর গানের ভিতর দিয়েই প্রকাশ করেছেন, রবীন্দ্রসংগীত বাঙলা ছন্দের একটি বিরাট ভাণ্ডার, ছান্দসিকের অনেক উদাহরণই গীতবিতান অতি সহজে জোগান দিতে পারে। কিন্তু এইটে লক্ষ্য করতে হবে যে, তাঁর শেষ পর্যায়ের কোনো কোনো গান ছন্দমিলের অলংকৃত প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। যে আন্দোলনে তিনি গদ্যকে কাব্যের বাহন করলেন, মুখের কথার সঙ্গে মেলালেন, তার ঢেউ তাঁর সংগীতরচনাকেও স্পর্শ করেছে" [১৫]।

বস্তুত ছান্দসিকের নিকট গীতবিতান যে অশেষ কৌতূহলের উপচীয়মান ভাণ্ডার এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কাব্যসংগীতের ছন্দ ও কবিতার ছন্দের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোনো বিরোধিতা না থাকলেও সাধারণভাবে কবিতার সর্বপ্রকার ছন্দ-বৈশিষ্ট্যকেই অবশ্য নির্বিচারে সংগীতে প্রযুক্ত হতে দেখি না। তানপ্রধান ছন্দে রবীন্দ্রনাথ কত বিচিত্র ব্যবহারযোগ্য প্রয়োগপরীক্ষা ঘটিয়েছেন, কিন্তু গানের পক্ষে তানপ্রধান ছন্দ সুপ্রযুক্ত হতে পারে না। তানপ্রধান ছন্দে শোষণশক্তি থাকায় সেখানে যুক্তাক্ষর বা হলন্ত অক্ষর একমাত্রার মর্যাদা পায় কিন্তু গানে সাধারণত হলন্ত অক্ষর দুমাত্রার গণ্য করাই স্বাভাবিক। শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের মধ্যে হলন্ত অক্ষর ইচ্ছামত কম-বেশি করা যায় বলে শ্বাসপর্বে অক্ষরের অভাবজনিত ফাঁক গানের সুরের দ্বারা পূর্ণ করা যায়। পক্ষান্তরে ধ্বনিপ্রধান ছন্দে প্রতি পর্ব অক্ষরের ধ্বনিতে নিবেট বলে সুর সেখানে অবকাশের ফাঁক পায় না। তাই গানের ছন্দ হিসাবে স্বরাঘাতপ্রধানের প্রতিই কবির মনোযোগ অধিক আর ধ্বনিপ্রধান ছন্দে লিখিত কাব্যগীতির উপর সুর অর্পণ করলে তা কবিতাকে সুরে আবৃত্তি করার মত শোনায়। 'মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে', 'দুঃখেরবরষায় চক্ষের জল যেই নামল' 'কাঁপিছে দেহলতা থরথর', 'নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায় সম্বৃত অম্বর' প্রভৃতি দৃষ্টান্ত এর প্রমাণ। এইগুলির সুর প্রায় কবিতার আবৃত্তির সহায়ক। ধ্বনিপ্রধান রীতির কাব্যসংগীতে সুরের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে হলে কবিতার পর্বরীতিকে অস্বীকার করতে হয়। 'কে দিল আবার আঘাত আমার দুয়ারে' ধ্বনিপ্রধান সপ্তমাত্রিক ছন্দের কবিতা, কিন্তু সংগীতে এর ছন্দোরূপ বদলে হয়েছে অষ্টমাত্রিক পর্বের ধ্বনিপ্রধান। অর্থাৎ তার সঞ্চারীর ছন্দোলিপি হবে এইরূপ—

আ জি এ ০ | ব র ষা ০ | নি বি ড় ০ |
তি মি র ০ |
০ ঝ রো ঝ | রো ০ জ ল | জী ০ র্ণ কু |
টি ০ র ০ |
বা দ লে র | বা ০ যে ০ | প্র দী প নি |
বা ০ যে ০ |
জে গে ব সে | আ ০ ছি ০ | এ ০ কা ০ |
রে ০ ০ ০ |

স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দে সুরবিহারের যথেচ্ছ স্বাধীনতা নিলেও তার পাঠ্য পর্বরূপ বিশেষ আহত হয় না। যেমন 'তোমায় আমায় মিলন হবে বলে আলোয় আকাশ ভরা' এই চরণটি গানে হয়েছে—

তো ০ ০ | মা ০ য | আ ০ ০ | মা ০ য় |
মি ল ন | হ বে ০ | ব ০ ০ | লে ০ ০ |
আ লো য | আ কা শ | ভ ০ ০ | রা ০ ০ |

পর্ববৈচিত্র্যের উদাহরণ তো অগণ্য বলা যেতে পারে। খেয়া নৈবেদ্য গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য ও গীতালির গানগুলি কাব্যসংগীত হলেও ছন্দোরূপসমৃদ্ধ কবিতারূপে অনিঃশেষ আলোচনার উপকরণ হয়ে থাকবে।

গীতবিতানের অনেকগুলি গানে কবি সংস্কৃত মাত্রাগণনার রীতিও অনুসরণ করেছেন। প্রাচীন ব্রজবুলি পদগুলির ঢঙে লেখা ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে এর ব্যবহার হলেও বাঙলা কবিতায় আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথই এই রীতি সার্থকভাবে প্রয়োগ করেন। 'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী' কল্পনা কাব্যের এই গানটি এই জাতীয় ছন্দের একটি প্রাচীন ব্যবহার। তাছাড়া 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী', 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে', 'ভুবনেশ্বর হে' প্রভৃতি গানগুলিতে এই সংস্কৃত মাত্রাগণনার রীতি সুরের সঙ্গে ঐক্যরূপ লাভ করেছে 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী', 'সকল-কলুষ-তামস-হর জয় হোক তব জয়' গান দুটিও এই পদ্ধতিতে রচিত, কিন্তু দ্বিতীয় গানে 'জয় হোক তব জয়' অংশের 'হোক' শব্দে দীর্ঘস্বর থাকা সত্ত্বেও, সুর একমাত্রাকে অবলম্বন করেছে। সাধারণত গম্ভীর-ভাবের কবিতায় বন্দনাস্তবে এই মাত্রারীতির সাফল্য ঘটলেও অন্য জাতের কবিতায় এই প্রকার মাত্রারীতির সার্থকতা বিশেষ নেই। প্রেম পর্যায়ে 'আহা জাগি পোহাল বিভাবরী' গানটি পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে, আপাতদৃষ্টিতে এটি সংস্কৃত মাত্রা-গণনার রীতিতে রচিত, কিন্তু সর্বত্র এই রীতি কবি রক্ষা করতে পারেননি।

তানপ্রধান ছন্দের কবিতাকে সুরারোপ করে সংগীতে পরিণত করার কঠিন পরীক্ষাতেও কবি সুসিদ্ধ হয়েছেন। কড়ি ও কোমলের 'দয়আকাশ' এবং 'গান রচনা', তানপ্রধান পয়ারে রচিত এই চতুর্দশপদী দুটি কবির দুই সুরচিত সংগীতে পরিণত হয়েছে 'ধরা দিয়েছি গো আমি আকাশের পাখি' এবং 'এ শুধু অলস মায়া এ শুধু মেঘের খেলা'। বলাকার 'ছবি' কবিতা, পূরবীর 'পঁচিশে বৈশাখ', চিত্রার 'উর্বশী' তানপ্রধান ছন্দের এই তিনটি কবিতাই

স্বরারোপে সার্থক হয়েছে। তাছাড়াও তাঁর নানা বয়সের গানে এমন অনেক কবিতা আছে যেগুলি ছন্দের দিক থেকে অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান। কিন্তু সেগুলির সংগীতরূপ শুনলে বিস্ময় লাগে কবি কী আশ্চর্য প্রতিভাবলে সেগুলির মধ্যে ধ্বনিস্পন্দ সঞ্চার করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'দুখ দিয়েছ দিতেছ ক্ষতি নাই' গানটির উল্লেখ করা যায়। এটি তানপ্রধান ছন্দে দশমাত্রার পর্বে রচিত—

সংসারের আলো নিভাইলে, বিষাদের আঁধার ঘনায়,
দেখাও তোমার বাতাযনে চির-আলো জ্বলিছে কোথায়।
শুষ্ক নির্ঝরের ধারে রই, পিপাসিত প্রাণ কাঁদে ওই—
অসীম প্রেমের উৎস কই, আমারে তৃষিত রেখো নাকো॥

তপতীর সূচনা-সংগীতটি নিছক পয়ার ছন্দে অষ্টমাত্রিক পর্বে রচিত শ্লোকবন্ধ—

সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ,
হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্তপানে চাহ।
দূর কর মহারুদ্র, যাহা মুগ্ধ যাহা ক্ষুদ্র—
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ॥
দুঃখের মন্থনবেগে উঠিবে অমৃত,
শঙ্কা হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যুভীত।
তব দীপ্ত রৌদ্রতেজে নির্ঝরিয়া গলিবে যে
প্রস্তরশৃঙ্খলোন্মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ॥

নটীর পূজার 'তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে' গানটিও অসমপর্বিক তানপ্রধানে রচিত—

তোমারই যে ডাকে
কুসুম গোপন হতে বাহিরায় নগ্ন শাখে শাখে,
সেই ডাকে ডাকো আজি তারে।...

তানপ্রধান ছন্দে রচিত অন্যান্য গানগুলির মধ্যে 'হৃদয়ে হৃদয় আসি মিলে যায় যেথা' এই বিবাহমঙ্গলটি ত্রুটিহীন কবিতামাত্র। তাছাড়া পূজা পর্যায়ের 'রজনীর শেষ তারা, গোপনে আঁধারে আধো-ঘুমে', প্রেম পর্যায়ের 'দীপ নিবে গেছে মম নিশীথ সমীরে', ঋতু পর্যায়ের 'মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি'— এগুলির ছন্দ কবিতার মতই এবং তানপ্রধান পয়ারে পাঠ করলে এই কবিতাগুলির ছন্দে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না।

ধ্বনিপ্রধান ছন্দের রূপকল্প ও পর্ব-বৈচিত্র্যই গীতবিতানে সর্বাধিক।

পঞ্চমাত্রিক, ষণ্মাত্রিক, সপ্তমাত্রিক, অষ্টমাত্রিক পর্ব ব্যবহার ছাড়াও চরণের ও স্তবকের বিচিত্রতাও ছান্দসিকের গবেষণার বস্তু হতে পারে। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, কেমন করে রবীন্দ্রসংগীতে আকস্মিক ভাবে ছন্দের 'নিখুঁত কারিগরি' এসে পড়েছে।[১৬] যেমন, ভানুসিংহের পদাবলীর একটি চরণ—

'শ্যামকো পদারবিন্দ ভানুসিংহ বন্দিছে'

অথবা, 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী' গানের এই অংশে—

'দৈন্যজীর্ণ কক্ষ তার মলিন, শীর্ণ আশা।
ত্রাসরুদ্ধ চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা।

এই উভয় ক্ষেত্রেই সম্ভবত কবির অজ্ঞাতসারেই সংস্কৃত তূনক ছন্দের প্রকৃতি ফুটে উঠেছে। অধ্যাপক সেন মনে করেন রবীন্দ্রনাথের আরো একাধিক কাব্যসংগীতে এই তূনক ছন্দের ধ্বনিস্পন্দ পাওয়া যায়। যেমন 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদু বায়' অথবা বাল্মীকিপ্রতিভার 'কত গ্রামপল্লী লুটে পুটে করেছি একাকার' এর উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যায়। তোটক ছন্দের সঙ্গেও কবি পরিচিত ছিলেন, যদিও সংস্কৃত মাত্রাগণনার রীতি ছাড়া নিছক ভারতচন্দ্রীয় ধরনের সংস্কৃত ছন্দ বাঙলা কবিতায় প্রয়োগের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। 'কতকাল পরে বল ভারত রে' তোটক ছন্দে রচিত গোবিন্দচন্দ্র রায়ের এই গানের প্যারডি রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার সভায় পাওয়া যায়। কিন্তু গভীররসাত্মক কবিতায় বা গানে এর ব্যবহার তিনি করেননি। তবে 'শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান' গানটিতে তোটক ছন্দের ধ্বনিস্পন্দ যে কিছুটা এসে পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। 'কেন পান্থ এ চঞ্চলতা', 'মধু গন্ধে ভরা' প্রভৃতি গানগুলিকেও এইরূপ অজ্ঞাতসারে তোটকধর্মিতার দ্বারা সংক্রামিত বলে অভিহিত করা যায়। কবির 'তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসের বর্ষণে' বা 'বেঠিক পথের পথিক আমার অচিন সে জন রে' এই গান দুটিতে পঞ্চচামর ছন্দের আভাস আছে মনে হয় (পঞ্চচামর ছন্দের ব্যবহার সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'মহৎ ভয়ের মূরৎ সাগর' এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য)। সংস্কৃত মতে এই ছন্দকে অনঙ্গশেখর ছন্দ বলে অধ্যাপক সেন অভিহিত করেছেন।

'সংগীতের মুক্তি' (ভাদ্র ১৩২৪) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কবিতার ছন্দ ও গানের তালকে একত্র করার যে চেষ্টা করেছিলেন তার কয়েকটি উদাহরণের সঙ্গে কিছু কিছু সংস্কৃত ছন্দের সাদৃশ্য আছে বলে জনৈক সংগীতবিশারদ একদা আলোচনা

করেছিলেন। 'কাঁপিছে দেহলতা থরথর' এগারো মাত্রার এই চরণটি স্বরারোপের ফলে এগারো মাত্রার তালে পরিণত হয়েছে। 'ব্যাকুল বকুলের ফুলে' এইভাবে গানে কাব্যছন্দের মত নয়মাত্রার তালে, 'যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে' 'দুয়ার মম পথপাশে' এইগুলিও নয়মাত্রার তালে পরিণত হয়েছে। এই তালগুলিকেই কবি সংগীতের মুক্তি নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধের প্রতিবাদে তৎকালে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ নামক জনৈক সংগীতজ্ঞ একটি প্রবন্ধে[১৭] প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে 'কাঁপিছে দেহলতা থর থর' একাদশ মাত্রার এই ছন্দ বা তাল রবীন্দ্রনাথের উদ্‌ভাবন নয। পিঙ্গলাচার্য-কৃত ছন্দ-সূত্রের ষষ্ঠ অধ্যায় ২৭ সূত্রে এই ছন্দের উল্লেখ আছে এবং এর নাম একাদশ-অক্ষর বিলাসিনী ছন্দ। সংগীতের দিক থেকে এই তালের নাম শ্রীশেখর তাল। 'দুয়ার মোর পথপাশে' কবিতার নয মাত্রার ছন্দকে '-ন্দোমঞ্জরী' এবং 'ছন্দোকুসুম' গ্রন্থানুযাযী 'মণিমধ্য' ছন্দ বলা হযেছে এবং গানে এই ছন্দের নাম 'জনক' তাল। 'যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে' এই ছন্দের নাম সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্র মতে 'কমলা' ছন্দ, তালের নাম কীর্তিতাল। 'ব্যাকুল বকুলের ফুলে' গানটির ছন্দ পিঙ্গলাচার্যের বর্ণনা অনুযাযী 'হলমুখী' ছন্দ, এই ছন্দে গান করলে তার তালের নাম হবে 'বসন্ত' তাল। 'বনের পথে পথে বাজিছে বায়' বারো মাত্রায় রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতার দৃষ্টান্তও উক্ত প্রবন্ধে উদ্ধার করেছিলেন, যদিও তাতে তিনি সুর সংযোগ করেননি। কৃষ্ণচন্দ্র উক্ত বারো মাত্রার পদটি সম্পর্কে লিখেছিলেন—

"বারো মাত্রা হইলেই সেটি হয় একতাল না হয় চৌতাল যে হইতেই হইবে, সংগীতশাস্ত্র এমন কোনো কঠিন বিধান করিয়াছেন? বারো মাত্রার তাল আরো অনেক প্রকার আছে। যেমন খেমটা আডখেমটা রাসমোহন ইত্যাদি। ইহারা প্রত্যেকেই বারো মাত্রার ছন্দ। মাত্রার চলনগত প্রভেদ ও লয়ের প্রভেদহেতু ইহাদের নামকরণ হইয়াছে। ধামার যে সাত মাত্রার তাল, তন্মধ্যে ছয়টি পূর্ণ মাত্রা আর দুইটি অর্ধ মাত্রা। এইজন্যই ধামার এখানে খাটিবে না। ঝাঁপতালও দশ মাত্রার তাল, সুতরাং কবিতার ছন্দ যখন বারো মাত্রায় নিবদ্ধ তখন কবির অভিপ্রায়ানুযায়ী গান করিতে হইলে, ঝাঁপতাল ইহার সংগত হইতে পারে না।...প্রোক্ত দ্বাদশাক্ষরনিবদ্ধ ছন্দটি ছন্দ-শাস্ত্র-ব্যাখ্যাত 'বাহিনী' ছন্দ। বাহিনী ছন্দে সপ্তমে ও পঞ্চমে যতি বিন্যস্ত হইয়া থাকে। বাহিনী ছন্দে গ্রথিত যে কোন কবিতা স্বরযোগে গান করিলে যে বারো

মাত্রাত্মক ঠেকা সহযোগে সংগত করিতে হইবে, শাস্ত্রসিদ্ধ সেই 'প্রতিমাভঙ্গ' তালেরও সপ্তমে পঞ্চমে লয় হইয়াছে।"

রবীন্দ্রসংগীতে ছন্দোরূপের বৈচিত্র্যের কথা বস্তুত একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনার বিষয়। সাধারণ গানের রূপ সীমাবদ্ধ বলে সুরের উপর নির্ভরশীল সংগীতের বাক্যে ও ছন্দে আমরা বৈচিত্র্য আশা করি না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানে সেই বৈচিত্র্য কাব্যের ভাবগভীরতা ও সুরের রহস্যময় প্রসারতাকেও যেন ছাড়িয়ে যেতে চায়। গীতিকবিতা হিসাবেই তাঁর গীতবিতান সমাদৃত হবে, গীতবিতান সংকলনকালে শেষ বয়সে নতুন করে এই বিশ্বাস তাঁর হয়েছিল। আর গানের কাব্যরূপের ছন্দেও কবির পরীক্ষানিরীক্ষা যে শেষ পর্যন্ত মুক্তির দিকে ধাবিত হয়েছিল তারও উদাহরণ আমরা পেয়েছি। তাঁর বহু গানে প্রচলিত মিত্রাক্ষর ও স্তবকরীতিকে তিনি বর্জন করেছেন। সাধারণ চার তুকের গানে সঞ্চারী বাদ দিয়ে স্থায়ী আভোগ ও অন্তরায় একই মিলের গ্রন্থনা রবীন্দ্র-সংগীতের সাধারণ লক্ষণ। কিন্তু এই রীতি স্বেচ্ছায় লঙ্ঘন করেছেন এমন সংখ্যাও কম নয়। উদাহরণস্বরূপ 'প্রভু তোমার বীণা যেমনি বাজে আঁধার মাঝে' গানটি উল্লেখযোগ্য। 'দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল' গানটিতে গানের চতুরঙ্গ বিভাগ আছে কিন্তু মিত্রাক্ষরেব পুনরাবৃত্তি নেই। তাই এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গীতিকবিতার স্বাভাবিকতা অর্জন করেছে। কবিতা ও কাব্যসংগীতে এখানে কোনো প্রভেদই নেই। 'গাব তোমার সুরে দাও সে বীণাযন্ত্র', 'আমার মুখের কথা তোমার নাম দিয়ে দাও ধুয়ে' দুটি গানই এই পদ্ধতিতে রচিত। 'সংসারে তুমি রাখিলে যে ঘরে' গানটিতে দুটি স্তবকে দুটি পৃথক মিত্রাক্ষর আছে। 'ঘাটে বসে আছি আনমনা যেতেছে বহিয়া সুসময়' গানটির তিনটি স্তবকে তিনটি মিত্রাক্ষর। 'আমি যখন তাঁর দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই' গানে প্রতি দুই চরণে এক একটি মিত্রাক্ষর। প্রেম পর্যায়ের গান 'একদিন চিনে নেবে তারে' প্রচলিত গীতরীতির মিলবিন্যাস অনুসরণ করেনি। এই গানের পর্বরূপও স্পষ্ট নয়। 'অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে কবে কখন একটুখানি পাওয়া', 'সবার সাথে চলতেছিল অজানা এই পথের অন্ধকারে', 'আমার সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করব নিবেদন' এই সকল সুদীর্ঘ চরণও সুরের-মুখে-হঠাৎ-এসে-পড়া রচনা নয়। রূপদক্ষ কবির ছন্দোদক্ষতা ও পরীক্ষণকৃত্যের অংশরূপে এইগুলি গবেষণার সামগ্রী হয়ে থাকবে। এছাড়া এক একটি বাক্য বা বাক্যাংশের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে

কতকগুলি কাব্যসংগীতে কবি এক ধরনের অনাস্বাদিতপূর্ব ধ্বনিস্পন্দন সৃষ্টি করেছেন সে কথারও উল্লেখ অপরিহার্য বলে মনে হয়। 'কবে আমি বাহির হলেম' গানে 'সে তো আজকে নয় সে তো আজকে নয়' এই বাক্যের আবেদন, কেবল সুরের বা গানের বিশিষ্টতা নয়। এই বাক্যটির পুনরাবৃত্তির দ্বারাই এই গানে কবির সঙ্গে, লীলাময় দেবতার সঙ্গে, যুগযুগান্তরের সম্পর্কের অবিচ্ছিন্নতা ধ্বনিত হয়েছে। 'ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা' গানের প্রতি স্তবকের শেষ চরণটি 'প্রভু, তোমার পানে', 'তোমার কানে', 'তোমার টানে', 'তোমার দানে' ও 'তোমার গানে' এই শব্দগুলি দ্বারা পুনরাবৃত্ত হয়েছে বলেই গানটি নিবিড় আত্মসমর্পণের একাগ্রতায় একটি ধ্যানমন্ত্র হয়ে উঠেছে। 'জীবন যখন শুখায়ে যায়' গানের একটি মাত্র মিত্রাক্ষর—অর্থাৎ সমাপ্তি বাক্য 'এসো', এই আহ্বানটিকেই প্রাণের গভীরে বাজাতে হবে, তাই 'করুণা ধারায় এসো', 'গীত সুধারসে এসো', 'শান্ত চরণে এসো', 'রাজসমারোহে এসো', 'রুদ্র আলোকে এসো'। এই আহ্বান শব্দ-মাত্রেই নিবদ্ধ থাকে না, এই আহ্বানের আকুলতা ধ্বনিত অঞ্জলি হয়ে ওঠে। কবি ছাড়া এমন কাব্যসংগীত কে রচনা করতে পারতেন? 'প্রাণ ভরিযে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ' গানটিতেও 'আরো' এই শব্দটিকে বাজিয়ে, ধ্বনিত পুনরাবৃত্ত করে, কবি তাঁর প্রার্থনাকে কী অসীম, কত অনায়াসে, কত কাব্যময়তার সাহায্যে কী বিশাল কী বিপুল করে তুলেছেন। 'তোরা শুনিসনি কি শুনিসনি তার পায়ের ধ্বনি' গানে 'সে যে আসে, আসে, আসে' এই চরণের ব্যবহার যেন তাঁর নিশ্চিত পদধ্বনির মতই আমাদের বক্ষস্পন্দনে ধ্বনিত হয়। 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো', 'মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরবেশে এসেছ', গান দুটিতেও এইরূপ বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তির দ্বারা প্রত্যাশিত অনুভূতি সৃষ্টি করা হয়েছে।

কিন্তু কাব্যসংগীতের ছন্দের আলোচনা এখানেই সমাপ্ত হয় না। পূর্বেই বলা হয়েছে, কবিতা ও সংগীতের ছন্দের মধ্যে কবি বহুবার একটি সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য চেষ্টা করলেই কবিতার ছন্দ ও গানের ছন্দকে একই মানদণ্ডে বিচার করার কতকগুলি ব্যবহারিক বাধা আছে। 'কবিতায় থাকে কথা ও ছন্দের সমবায়, পংক্তির অন্তে ধ্বনিগত মিল থাকে আবার না থাকলেও চলে। এর সঙ্গে রসসংযোগ হলেই সৃষ্টি হয় কাব্যের। গানের মধ্যেও এই সব উপাদান থাকে। আরও থাকে অতিরিক্ত একটি বস্তু

যার নাম স্বর। ছন্দের দিক দিয়েও কবিতার ছন্দ আর গানের ছন্দ এক নয়। কবিতার যত জানা বা অজানা ছন্দ আছে সে সবই গানে প্রযুক্ত হতে পারে, কিন্তু গানের সম্ভাব্য সমস্ত ছন্দকে কবিতায় প্রয়োগ করতে গেলে ছন্দশাস্ত্রে উপস্থিত হবে দারুণ বিপর্যয়।' ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ এই সত্যটি জানতেন কারণ সংগীতশাস্ত্রও তাঁর অধিগত ছিল। তিনি বলেছিলেন—"কাব্যে ছন্দের যে কাজ গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে, তাল সেই নিয়মে গানে চলবে।" ফলে কবিতার পর্বের মাত্রাপদ্ধতিকে গানে প্রয়োগ করার ফলেই আমরা রবীন্দ্রসংগীতে ষষ্ঠী, একাদশী, নবতাল, রূপকড়া প্রভৃতি ছন্দের সাক্ষাৎ পেয়েছি। সংগীতশাস্ত্রকারগণ হয়ত এগুলির ব্যবহারে আপত্তি করতে পারেন, কিন্তু ছন্দের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এর মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই। সংগীতে রাগ-রাগিণী প্রবর্তনের মত এই জাতীয় নূতন তালপদ্ধতির প্রয়োগ উদ্‌ভাবনেও যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে।

"সংগীতের একটা প্রধান অঙ্গ তাল। আমাদের আসরে সবচেয়ে বড় দাঙ্গা এই তাল নিয়ে। গান বাজনার ঘোড়দৌড়ে গান জেতে কি তাল জেতে এই নিয়ে বিষম মাতামাতি। দেবতা যখন সজাগ না থাকেন, তখন অপদেবতার উৎপাত এমনি করেই বেড়ে ওঠে। স্বয়ং সংগীত যখন পরবশ, তখন তাল বলে আমাকে দেখ স্বর বলে আমাকে। কেন না দুই ওস্তাদে দুই বিভাগ দখল করেছে—দুই মধ্যস্থের মধ্যে ঠেলাঠেলি—কর্তৃত্বের আসন কে পায়, মাঝ থেকে সংগীতের মধ্যে আত্মবিরোধ ঘটে।"

ওস্তাদি গানে স্বর ও তালের এই বিরোধ কাব্যসংগীতে দূর করাই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল। তাই স্বরকার রবীন্দ্রনাথের পক্ষে দরকার ছিল ছন্দোগুরু কবি রবীন্দ্রনাথকে, কবি রবীন্দ্রনাথেরও তাই দরকার ছিল স্বরকারের। তাই কাব্যের ছন্দকে কবি সংগীতের তালের সাহচর্যে পাঠালেন, তাল ও স্বরকে দিলেন সমমর্যাদা। এই কারণেই অধিকাংশ রবীন্দ্রসংগীতে পদের ছন্দোরূপ ও তার স্বরের তালের মধ্যে গভীর কোনো ব্যবধান নেই। রবীন্দ্রসংগীতের তাল স্বরের মতই 'অন্তরের ভাবগাঢ়তার অনুবর্তী, বাইরের কারুকলার প্রতি তার আকর্ষণ জাগেনি। হৃদয়াবেগই এ গানের মূল প্রেরণা।' কেন না রবীন্দ্রসংগীত যে স্বভাবতই অন্তর্মুখী সংগীত, ভাবমুখী সংগীত। তালে স্বরে কথায় ভাবে বিস্ময় জাগানো, চমক লাগানো তার স্বধর্ম নয়।' কবি স্বয়ং বলেছেন, 'সংগীত অনির্বচনীয়, কাব্যে বচনীয়তা আছে। এই অনির্বচনীয়তা

সঙ্গে বচনীয়তার মিলন ঘটিয়েছে এই ছন্দ। তাতে করে বাক্ ও অবাক্ বাঁধা পড়েছে ছন্দের মাল্যবন্ধনে।'

১। কমলাকান্তের আসরে কমলাকান্ত শর্মা [প্রমথনাথ বিশী] কথিত রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ, আনন্দবাজার

২। ত্রৈবার্ষিক রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন (১৯৫৭) উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকায় সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ

৩। রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ—প্রমথনাথ বিশী

৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড—সুকুমার সেন (৩য় সং) পৃ ৪৭৯

৫। সংগীত ও ভাব—সংগীতচিন্তা পৃ ৮

৬। রূপসৃষ্টি : মায়ার খেলার রূপান্তর—কানাই সামন্ত, রবীন্দ্রপ্রতিভা

৭। হৃদয়ের অসংখ্য পত্রপুট—অমলেন্দু বসু ; দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ

৮। রবীন্দ্র রচনাবলী ১ম খণ্ড, ভূমিকা, মাঘ ১৩৪৬ সংস্করণ

৯। সংগীতচিন্তায় উদ্ধৃত, পৃ ১৩৫।

১০। রবীন্দ্রসংগীতের কাব্যমূল্য—ডঃ নরেশ গুহ ; বেতার জগৎ ৩৯ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা (১৬-৩০ এপ্রিল পৃ ৩৭৩

১১। বাণী ও বীণা—প্রবোধচন্দ্র সেন : গীতবিতান পত্রিকা

১২। কবি ও কবিতা, ৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা গানদুটির পাঠ ও সম্পাদকীয় মন্তব্য দ্রষ্টব্য

১৩। রবীন্দ্রনাথ ও বাঙ্গালা সাহিত্য—মোহিতলাল মজুমদার, জয়ন্তী উৎসর্গ

১৪। ছন্দশিল্পী রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র—প্রবোধচন্দ্র সেন : বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-

১৫। ছন্দশিল্পী রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র—প্রবোধচন্দ্র সেন, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-

১৬। বাণী ও বীণা—প্রবোধচন্দ্র সেন, গীতবিতান পত্রিকা ১৩৬৮

১৭। হিন্দু সংগীত ও কবিবর স্যার রবীন্দ্রনাথ—কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্তচিন্তামণি (১৯১৭) আলোচ্য প্রবন্ধটির আরো আলোচনা আছে বর্তমান গ্রন্থের ৫-৭ পৃষ্ঠায়

রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তা

১

স্রষ্টা এবং সমালোচক, রচয়িতা এবং নিরীক্ষক, শিল্পী ও ভাবুক যদি একই ব্যক্তি হন, তাহলে সৃষ্টি, শিল্প বা রচনা স্বেচ্ছাচারিতার পথে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে নির্দিষ্ট নীতি-নিয়মের অঙ্গীভূত হয়। তেমনি সমালোচনা, বিচার বা আলোচনায় স্রষ্টার আপন অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়ে তাকে অধিকতর বাস্তব ও সত্যনিষ্ঠ করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনা করেছেন, বিশেষ ভাবে তাঁর আপন সাহিত্যসৃষ্টির মানদণ্ডে পরীক্ষিত বলেই তা সত্য হয়ে উঠেছে। সেই কারণে সাহিত্যসমালোচক রবীন্দ্রনাথ কবি স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথেরই ভাষ্যকার। নিরপেক্ষ বিচারকের দৃষ্টিতে সাহিত্যের সার্বভৌম সত্য আলোচনা করলেও সেই সত্যের উপস্থাপনায় কবি পুঁথিগত বিদ্যার প্রয়োগ করেননি, পণ্ডিতম্মন্য সমালোচনার জন্য তুলনামূলক বিচারশক্তির সাহায্য গ্রহণ করেননি। সাহিত্যের তত্ত্ব ও সত্য, সাহিত্যের তাৎপর্য ও সামগ্রী, গদ্যকাব্যের প্রয়োজনীয়তা, কবিজীবনীর আদর্শ, করুণ রসের আনন্দদায়কত্বের কারণ ইত্যাদি যা কিছু তিনি আলোচনা করেছেন, সবই তাঁর নিজের সারস্বত জীবনের সমর্থনে, আপন সৃজনমূলক অভিজ্ঞতার প্রেরণায়। তাই এরিস্টটল বা ভরত, প্লেটো কিংবা অভিনবগুপ্ত, ব্রাডলে অথবা বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সমালোচনা তত্ত্ব বা মতামত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যালোচনায় কখনাও উদ্ধৃত হয়নি বা উদাহৃত হয়নি। তাঁর স্বকীয় মনীষা ও মননের দ্বারা, স্বীয় প্রজ্ঞা ও উপলব্ধির অনন্যতায়, আপন অভিজ্ঞতার অসাধারণ প্রেরণায় কবি যে সিদ্ধান্ত ও প্রত্যয়ে উপনীত হন, যে অভিমত রচনা করেন, যে সূত্র নির্দেশ করেন—সেগুলি বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন সমালোচকদের মতামতের পাশেই স্থান পেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের সংগীতসম্পর্কিত আলোচনা-সম্পর্কেও এই মন্তব্যের পুনরুক্তি করা যায়। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনে সংগীতবিষয়ক যে সব আলোচনা করেছেন, সেগুলি কেবল তাত্ত্বিকের বা সংগীতসমালোচকের মতামত নয়, আপনার সাংগীতিক জীবনের অভিজ্ঞতাই সেগুলির মূল্য নিঃসংশয়িতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। স্বয়ং সুরকার ও গীতিকার বলেই রবীন্দ্রনাথের সংগীত-চিন্তায় অভিজ্ঞতার অসামান্য মূল্য স্বীকৃত হয়েছে। তাঁর কবিজীবনের প্রায়

সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত তাঁর সংগীতসৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল, তাই সংগীত সম্পর্কে কবির চিন্তার ইতিহাসও খুবই প্রাচীন। দীর্ঘ জীবনে রবীন্দ্রনাথ সংগীত সম্পর্কে বহুস্থানে নানা মতামত প্রকাশ করেছেন। সেইগুলি সংগীতস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের গীতসৃষ্টির ভূমিকা-রূপেই বিশেষভাবে বিবেচ্য। সম্প্রতি বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগের উদ্যমে সংকলিত কবির 'সংগীতচিন্তা' গ্রন্থে ('প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৭৩') কবির সংগীত-চিন্তার একটি ধারাবাহিক ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সংগ্রহ করা যায়। অবশ্য এই চিন্তায় কবির সংগীতবিষয়ক কবিতা বা গানের উল্লেখ নেই।

'সংগীতচিন্তা' গ্রন্থে সংকলিত রবীন্দ্রনাথের সংগীতালোচনার এক সীমায় আছে ভারতী ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত 'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধ এবং আরেক সীমায় আছে সংগীতবিষয়ক একটি অভিভাষণ, আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৭ আষাঢ় ১৩৪৭ সংখ্যায় প্রকাশিত ; অর্থাৎ প্রায় ষাট বৎসরব্যাপী চিন্তার বিবর্তন এতে প্রাপ্তব্য। কালানুক্রমিক সাজালে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য সংগীতবিচিন্তার তালিকা এইরূপ হবে (প্রকাশকাল অনুযায়ী)—

১।	সংগীত ও ভাব	ভারতী জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮
২।	সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা	ভারতী আষাঢ় ১২৮৮
৩।	সংগীত ও কবিতা	ভারতী মাঘ ১২৮৮ ('সমালোচনা')
৪।	বাউলের গান ১	ভারতী বৈশাখ ১২৯০ ('সমালোচনা')
৫।	বাউলের গান ২	ভারতী আশ্বিন ১২৯১ ('সমালোচনা')
৬।	কবিসংগীত	সাধনা জ্যৈষ্ঠ ১৩০২ ('লোকসাহিত্য)
৭।	গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ	প্রবাসী বৈশাখ ১৩১৯ ('জীবনস্মৃতি')
৮।	অন্তর-বাহির	ভারতী শ্রাবণ ১৩১৯ ('পথের সঞ্চয়'
৯।	সংগীত	ভারতী অগ্রহায়ণ ১৩১৯ ('পথের সঞ্চয়')
১০।	সোনার কাঠি	সবুজপত্র জ্যৈষ্ঠ ১৩২২
১১।	সংগীতের মুক্তি	সবুজপত্র জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ (ছন্দ, প্রথম সংস্করণ)
১২।	আমাদের সংগীত	সবুজপত্র ভাদ্র ১৩২৮
১৩।	অভিভাষণ ১	নব্যভারত জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯
১৪।	অভিভাষণ ২	নব্যভারত আশ্বিন ১৩৩১
১৫।	আলাপ-আলোচনা	বঙ্গবাণী জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২
১৬।	আলাপ-আলোচনা	প্রবাসী কার্তিক ১৩৩৪
১৭।	বাউল-গান	প্রবাসী চৈত্র ১৩৩৪

১৮। বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত

১৯। অভিভাষণ — আনন্দবাজার পত্রিকা ১২ পৌষ ১৩৪১

২০। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান — প্রবাসী ফাল্গুন ১৩৪২

২১। কথা ও সুর ১ — বিচিত্রা অগ্রহায়ণ ১৩৪৪

২২। আলাপ আলোচনা — বিচিত্রা ফাল্গুন ১৩৪৪

২৩। কথা ও সুর ২ — প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪৬

২৪। অভিভাষণ — আনন্দবাজার পত্রিকা ১৭ আষাঢ় ১৩৪৭

সংগীতচিন্তায় এই গদ্য আলোচনাগুলি ছাড়াও জীবনস্মৃতি-ছিন্নপত্রে প্রকীর্ণ কবির সংগীতচিন্তা, অন্যান্য ভ্রমণসাহিত্যে বা পত্রসাহিত্যে উল্লিখিত কবির সংগীতপ্রসঙ্গ, সংগীতবিষয়ক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পত্রালাপ বা মৌখিক আলাপ-চারিতার প্রতিবেদন, অন্যান্য প্রবন্ধ গ্রন্থে ছড়ানো কবির সংগীতভাবনাও মোটামুটি সংকলিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তা এছাড়াও তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে ছড়িয়ে আছে। পঞ্চভূত, ছিন্নপত্রাবলী, পথে ও পথের প্রান্তে, পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি ও জীবনস্মৃতির নানা পৃষ্ঠায় এবং অন্যান্য অনেক ব্যক্তিগত পত্রাদিতে রবীন্দ্রনাথের সংগীতবিষয়ক মতামত পাওয়া যায়। তাছাড়া গান ও গানের সুর কবির বহু কবিতার প্রেরণা উপলক্ষ বা বিষয়বস্তু। এগুলি সংকলন করলেও উপভোগ্য আলোচনা হতে পারে। গীতবিতানে পূজা ও প্রেম পর্যায়ের সূচনাতেও গানবিষয়ক অনেকগুলি গানকে কবি স্বতন্ত্রভাবে স্থাপন করেছেন। এগুলিও তাঁর সংগীতচিন্তার উপাদান।[১]

২

'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধটি সংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ এবং 'সভাস্থলে এই আমার প্রথম প্রবন্ধপাঠ'। ১৮৮১ সালে কবি আরেকবার বিলাতযাত্রার উদ্যোগ করেন এবং এই দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার প্রাক্কালে[২] বেথুন সোসাইটির এক সভায় রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কবি উদাহরণযোগে পঠিত এই প্রবন্ধে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে 'গানের কথাকেই গানের সুরের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া তোলা এই শ্রেণীর (কণ্ঠ) সংগীতের মুখ্য উদ্দেশ্য।'

ইতিপূর্বে প্রথমবার বিলাতপ্রত্যাগত কবি বাল্মীকিপ্রতিভা রচনা করেছেন, তাছাড়া ব্রহ্মসংগীত ও আরও নানা ধরনের গীতরচনায় তাঁর তরুণ প্রতিভা নিয়ত সৃষ্টিশীল। ঠাকুর-পরিবারের সংগীতানুশীলনের এবং গীতচর্চার উত্তাল পরিবেশে লালিত রবীন্দ্রনাথের মনে স্বভাবতই সংগীতসম্পর্কে গভীর অনুসন্ধিৎসা জেগেছিল। বাঙলাদেশের সমকালীন সংগীতচর্চাও নৈরাশ্যজনক ছিল না। সুতরাং 'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধে কবি বললেন—'আমাদের বঙ্গসমাজে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে· · ·এই নূতন আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে সংগীতের নব অভ্যুদয় হইয়াছে। সংগীত সবে জাগিয়া উঠিয়াছে মাত্র, কাজ ভালো করিয়া আরম্ভ হয় নাই।"[৩]

এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কবি সেদিন সংগীতকে শাস্ত্রের লৌহকারা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। রাগরাগিণীর দাসত্ব করাই সংগীতের একমাত্র কাজ নয়, কারণ ভাবপ্রকাশ করাই রাগরাগিণীর উদ্দেশ্য। 'যদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শোনায়' আর তাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে, তবে জয়জয়ন্তী রক্ষার জন্য চেষ্টিত না হলেও চলবে। সংগীতের উদ্দেশ্য যেহেতু ভাবপ্রকাশ করা, তাই 'গীতিনাট্যে, যাহা আদ্যোপান্ত সুরে অভিনয় করিতে হয় তাহাতে, স্থানবিশেষে তাল না থাকা বিশেষ আবশ্যক', কারণ ভাবপ্রকাশের জন্যই তার দরকার বলে কবি মনে করেন। কবির মতে, গায়করা কতকগুলি চেতনাহীন জড় সুরের উপর সংগীতকে স্থাপন করেন, কিন্তু কবি 'তাহাকে জীবন্ত অমর ভাবের উপর স্থাপন' করতে চেয়েছেন। 'তাঁহারা গানের কথার উপর সুরকে দাঁড় করাইতে চান। আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপর দাঁড করাইতে চাই। তাঁহারা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য। আমি সুর বসাইযা যাই কথা বাহির করিবার জন্য।' কেবল গায়করূপে অথবা সংগীতের অনুশীলনকারী ছাত্ররূপে কবি নিজেকে দেখেননি, তাঁর মধ্যে সে সুরস্রষ্টা-গীতিকারের সৃজনীপ্রতিভার আবির্ভাব ঘটেছে, এই প্রবন্ধে তারই দৌবারিকধ্বনি শুনতে পাই। প্রবন্ধটি যেন বাল্মীকিপ্রতিভার অমর স্রষ্টার আপন সংগীতসৃষ্টির কৈফিয়ৎ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংগীতসমালোচনা সংগীতের নিরাসক্ত বা নিরপেক্ষ বিচার নয়, আপন গীতসৃষ্টির অভিজ্ঞতার শ্রুতিলিখন।

'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধ রচনার পর রবীন্দ্রনাথ, হার্বার্ট স্পেন্সারের 'দি অরিজিন এণ্ড ফাংশান অফ মিউজিক'[৪] পাঠ করে তাঁর প্রাগুক্ত মতের সমর্থন

খুঁজে পেলেন। তার পরের মাসে 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' নামে আর একটি প্রবন্ধ রচনা করলেন।[৫] এখানে তিনি লিখেছেন—

'আমাদের মনোভাব গাঢ়তম তীব্রতমরূপে প্রকাশ করিবার উপায়স্বরূপে সংগীতের স্বাভাবিক উৎপত্তি। যে উপায়ে ভাব সর্বোৎকৃষ্টরূপে প্রকাশ করি, সেই উপায়েই আমরা ভাব সর্বোৎকৃষ্টরূপে অন্যের মনে নিবিষ্ট করিয়া দিতে পারি। অতএব সংগীত নিজের উত্তেজনা প্রকাশের উপায় ও ভাবকে উত্তেজিত করিবার উপায়।"

স্পেন্সারের মতকেই ঈষৎ বিতানিত করে কবি এই আশা প্রকাশ করেছেন যে, এমন একদিন আসন্ন যখন আমরা সংগীতেই কথাবার্তা বলব। অনুভব-প্রকাশের ভাষাই যেহেতু সংগীত, তাই অনুভবের ভাষা সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত হলে সংগীতও সম্পূর্ণতা পাবে। আমাদের শাস্ত্রগত ব্যাকরণগত অনুষ্ঠানগত সংগীত যেন নিষ্প্রাণ মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা। কিন্তু কবির বিশ্বাস ও ধারণা—সংগীতে এতখানি প্রাণ থাকা চাই, যাতে সে সমাজের সঙ্গেই বয়োবৃদ্ধি লাভ করে, সমাজপরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হতে থাকে, সমাজকে প্রভাবিত করতে ও সমাজের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

অথচ জীবনস্মৃতি গ্রন্থে যখন তাঁর এই কালের সংগীতবিষয়ক প্রবন্ধগুলির আলোচনা করেছেন, তখন প্রথম জীবনের এই সকল মতামত সম্পর্কে কবির মনোভাব পরিবর্তিত হয়ে গেছে।[৬] সেখানে তিনি বলেছেন—

"কিন্তু যে মতটিকে তখন এত স্পর্ধার সঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছিলাম সে মতটি যে সত্য নয়, সে কথা আজ স্বীকার করিব। গীতিকলার নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে। গানে যখন কথা থাকে তখন কথার উচিত হয় না, সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া। সেখানে সে গানেরই বাহন মাত্র। গান নিজের ঐশ্বর্যেই বড়। বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে। বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্বচনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব"।[৭]

রবীন্দ্রনাথের সংগীতসৃষ্টি তাঁর কাব্যজীবনের ক্রোড়পত্র নয়, তাঁর বহুসিসৃক্ষু জীবনের অবকাশরঞ্জনী নয়, তাঁর গান তাঁর যে কোনও সাহিত্যবিভাগের মতই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও প্রতিস্পর্ধী। 'সংগীত ও কবিতা' প্রবন্ধে (মাঘ ১২৮৮) তিনি সেই বিংশতিবর্ষ বয়সেই স্বীকার করেছিলেন যে, কথা ও সুর ভাবপ্রকাশের যুগ্ম উপকরণ। কবিতায় আমরা কথার ভাষাকে এবং সংগীতে সুরের ভাষাকে

প্রাধান্য দিয়ে থাকি। তবে সংগীত মনের একটি মাত্র স্থায়ী ভাবকে বেছে নেয়, আর কবিতার কাজ ভাব থেকে ভাবান্তরে গমন। ম্যাথিউ আরনল্ডের একটি কবিতার ('এপিলোগ টু লেসিংস্ লা ও কুন') সাহায্যে কবি বলেছেন, "চলনশীল ভাবের প্রত্যেক ছায়ালোক সংগীতে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। সংগীত একটি স্থায়ী স্থির ভাবের ব্যাখ্যা করে মাত্র।'

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানবিশি পর্বে ভারতীয় মার্গ ও ধ্রুপদী সংগীতের শিক্ষকদের প্রয়াস নিষ্ফল হয়নি। কবির এই-বিষয়ক বিনয় সত্ত্বেও আমাদের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে শাস্ত্রীয় সংগীতে কবির অধিকার জন্মেছিল। কিন্তু সংগীত-শাস্ত্রে যথোচিত পারদর্শিতা লাভ করেও শাস্ত্রবিহিত রাগরাগিণী অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন সংগীতরচনার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর অল্প বয়সের ঐ প্রবন্ধগুলিই তার প্রমাণ। কবি স্পষ্টই বলেছেন, 'নামবদ্ধ রাগ-রাগিণীতে আর যাহা করুক না করুক, সংগীতের প্রতিভা জন্মাইবার বিষম ব্যাঘাত করে।' কবিতার যে স্বাধীনতা সংগীতেও সেই স্বাধীনতা দাবি করে কবি বলেছেন, 'আমরা আজকাল যেমন নবরসের মধ্যেই মারামারি করিয়া কবিতাকে বদ্ধ করিয়া রাখি না, অলংকারশাস্ত্রোক্ত আড়ম্বরপূর্ণ নামের প্রতি দৃষ্টি করি না, তেমনি সংগীতে কতকগুলা নাম ও নিয়মের মধ্যেই যেন বদ্ধ না হইয়া থাকি।' সংগীতে এই মুক্তিই কবির সেই বয়সের অভিপ্রেত একথা ভাবতে আমাদের বিস্ময় লাগে। এই জাতীয় প্রবন্ধরচনার পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ হয়ত তখনও অসংখ্য গান সৃষ্টি করেননি। কিন্তু এই চিন্তা ও মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর সুর ও কথার প্রস্থতিসদনটি ধীরে ধীরে চিত্তগহনে গড়ে উঠছিল। সন্ধ্যাবিষয়ক কবিতা রচনা করতে যেমন সন্ধ্যার ভাব কল্পনা করতে হয়, তেমনি সন্ধ্যার গান রচনা করতে অনিবার্যভাবেই পূরবী নয়, সন্ধ্যার ভাব কল্পনা করতে হবে, তবেই সায়াহ্নের সুর আপনি নেমে আসবে। তখনই 'প্রত্যেক গীতিকবির রচনায় গানের নূতন রাজ্য আবিষ্কৃত হইতে থাকিবে। তাহা হইলে গানের বাল্মীকি গানের কালিদাস জন্মগ্রহণ করিবেন।'

হাফ্‌আখড়াই যাত্রা পাঁচালি লঘু নাট্যসংগীতঅধ্যুষিত বাঙলাদেশে গানের বাল্মীকি গানের কালিদাসের পথ অলক্ষ্যে প্রস্তুত হচ্ছিল এমনি করেই। কবিরই আপন 'হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে'।

৩

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে কবিতায় আলোচনায় প্রায়ই সংগীতের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। কারণ এই বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে সংগীতের গূঢ় সম্পর্ক আছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। শান্তিনিকেতন গ্রন্থমালার (২য় ভাগ) 'শোনা' নামক একটি ভাষণে (৫ পৌষ ১৩১৫) কবি এই বিশ্বকে একটি মহাসংগীত বলেছেন। কবির নিজেরই একটি গান ('বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে') তার অসীম স্বরের অনির্বচন আবেদন নিয়ে সেদিন কবির মনের মধ্যে কেবলই ঝংকৃত হচ্ছিল। সেই সংগীত ক্রমশ আকাশ ও অহোরাত্রকে পূর্ণ করে তুলল. আলোর ধারায় রূপের লীলায় বেজে উঠল বিশ্ববীণা—

'এই প্রকাণ্ড বিপুল বিশ্বগানের বন্যা যখন সমস্ত আকাশ ছাপিয়ে আমাদের চিত্তের অভিমুখে ছুটে আসে, তখন তাকে এক পথ দিয়ে গ্রহণ করতেই পারিনে, নানা দ্বার খুলে দিতে হয় চোখ দিয়ে স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে, নানাদিক দিয়ে তাকে নানারকম করে নিই। এই একতান মহাসংগীতকে আমরা দেখি শুনি ছুঁই শুঁকি আস্বাদন করি।'

এই বিশ্ববীণার ঝংকৃত গীতরহস্য আরও একটি গানে অপরূপ হয়ে বেজেছে—

বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে।
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদীনদে গিরিগুহা-পারাবারে
নিত্য জাগে সরসসংগীত মধুরিমা,
নিত্য নৃত্যরসভঙ্গিমা।

কবির বিভিন্ন রচনায়, বিশেষ করে সংগীতবিষয়ক নয় এমন লেখায়, সংগীতের প্রসঙ্গ কত ভাবে এসে পড়েছে, তার পরিচয় দান করা বিপুল শ্রমসাধ্য। বিশ্ববিধাতা বিশ্বতানে যে ধ্রুবপদ বেঁধে দিয়েছেন, কবি আপনার সৃজনতারযন্ত্রে তাকে শেখাতে চেয়েছেন বলেই তাঁর বিশ্ব স্বরে পূর্ণ হয়ে উঠেছে বারবার—

বাজায় উষা নিশীথকূলে যে গীতভাষা
সে ধ্বনি নিয়ে জাগিবে মোর নবীন আশা।
ফুলের মত সহজ সুরে প্রভাত মম উঠিবে পুরে
সন্ধ্যা মম সে সুরে যেন মরিতে জানে।

কবির সংগীত মানবলোকের সীমায়ত পরিধির মধ্যে আপনার স্বল্পায়ু-গণনার দুর্ভাগ্য নিয়ে আসেনি। বিশ্বসংগীতের সে যেন লীলাসহচর। তাই তাঁর এই গীতোদ্‌বোধনী—

জাগ জাগ রে জাগ সংগীত—চিত্ত-অম্বর কর তরঙ্গিত
নিবিড়নন্দিত প্রেমকম্পিত হৃদয়কুঞ্জবিতানে।
মুক্তবন্ধন সপ্তস্বর তব করুক বিশ্ববিহার।
সূর্যশশিনক্ষত্রলোকে করুক হর্ষ প্রচার।
পূর্ণ কর রে গগন-অঙ্গন তাঁর বন্দনাগানে॥…

কবির এই আজন্মলব্ধ সংগীতচেতনাই তাঁর সংগীতবিষয়ক আলোচনা-গুলিকে হৃদ্য ও জ্যোতির্ময় করে রেখেছে, অনুশীলনলব্ধ বিদ্যার প্রতিনিধি তারা নয়। রবীন্দ্রজীবনীকার যথার্থই লিখেছেন—

"রবীন্দ্রনাথ কবি ও সংগীতকাব, ছন্দ ও সুরের মধ্য দিয়া তাঁহার বিশ্ববোধ—আবাল্যের এই সংস্কার। সংগীত ও গায়ক অভিন্ন। শব্দব্রহ্ম কথাটি কবির নিকট কেবল শাস্ত্রবাক্য নহে, অথবা অনাহত নাদ কোনো রহস্যাবৃত পদমাত্র নহে; উহারা কবির অনুভূত সত্য। কবির জগৎ হইতেছে এই সুরের জগৎ, কথার জগৎ—কেবল রূপের জগৎ নহে। শব্দ সুর ও কথা এই তিনটি হইতেছে সংগীতের উপাদান ও প্রাণ। প্রাকৃতিক জগতে শব্দ মাত্র আছে, মেঘের গর্জন পাতার মর্মর জলের কল্লোল প্রভৃতি ঘর্ষণজাত নানা শব্দ অহর্নিশি চলিতেছে। জীবজগৎ হইতে অনুক্ষণ বিচিত্র শব্দ ও সুর উত্থিত হইতেছে,—অসংখ্য পশুপক্ষী-কীটপতঙ্গ-কণ্ঠনিঃসৃত শব্দ সুর ও কথা মিলিয়া সংগীত উচ্ছ্বসিত হইতেছে। এই অনন্ত শব্দস্রোত সুরশিল্পী কবির নিকট অত্যন্ত বাস্তব সত্য, তাই তিনি বিশ্বকে সংগীতের রূপকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন"।[৭]

সংগীতকে রবীন্দ্রনাথ ঠিক কী দৃষ্টিতে দেখতেন, তার একটি পরিপূর্ণ তত্ত্ব পঞ্চভূত গ্রন্থের 'গদ্য ও পদ্য' প্রবন্ধে পাওযা যায়। সেখানে কবি বলেছেন যে, আমাদের চেতনা যেহেতু একটি তরঙ্গিত কম্পিত অবস্থা সেইজন্য বিশ্বসংসারের বিচিত্র কম্পনের সঙ্গে তার গভীর যোগ আছে। ধ্বনি এসে তার স্নায়ুদোলায় দোল দিয়ে যায়, আলোকরশ্মি তাকে কাঁপিয়ে তোলে, জগতের যাবতীয় ছন্দে সে স্পন্দমান হয়। তাই সংগীতের সঙ্গে মানসিক আবেগের এত গভীর সম্পর্ক। সংগীত আপনার কম্পন সঞ্চার করে আমাদের সমস্ত অন্তরকে চঞ্চল করে তোলে; মনকে উদাস ব্যাকুল করে, অনন্তের জন্য উদ্‌বিগ্ন করে দেয়।

ভাষার এই ক্ষমতা নেই, সংগীতের আছে। সংগীতের সুর ও তাল, ছন্দ ও ধ্বনি দুই অংশ। কবি বলেছেন, অনন্ত আকাশ জুড়ে চন্দ্র সূর্য গ্রহতারা জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর ছন্দোময় নৃত্য চলেছে, তার বিশ্বব্যাপ্ত মহাসংগীতটি কানে শোনা যায় না, চোখে দেখা যায়। ছন্দ হল সংগীতের সেই রূপ যা কবিতায় ভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়। তাই 'ভাষা ও ছন্দে' বাল্মীকি বলেছিলেন দেবর্ষি নারদকে—

সূর্যেরে বহিয়া যথা ধায় বেগে দিব্য অগ্নিতরী
মহাব্যোমনীলসিন্ধু প্রতিদিন পারাপার করি,
ছন্দ সেই অগ্নিসম বাক্যেরে করিব সমর্পণ—
যাবে চলি মর্তসীমা অবাধে করিয়া সন্তরণ,
মহাম্বুধি যেইমতো ধ্বনিহীন স্তব্ধ ধরণীরে
বাঁধিয়াছে চতুর্দিকে অন্তহীন নৃত্যগীতে ঘিরে
তেমনি আমার ছন্দ, ভাষারে ঘেরিয়া আলিঙ্গনে
গাবে যুগে যুগান্তরে সরল গম্ভীর কলস্বনে
দিক হতে দিগন্তরে মহামানবের স্তবগান,— (কাহিনী)

ভাষার উপর এই ছন্দের প্রয়োগ আর কথার উপর সুরের প্রযোগ রবীন্দ্রনাথের কাছে একই তত্ত্বের প্রতীক। অনন্ত আকাশের সংগীতকে কবি তাঁর গানে এই ভাষায় ধরেছেন—

বিপুল তরঙ্গ রে, বিপুল তরঙ্গ রে।
সব গগন উদ্‌বেলিযা, মগন করি অতীত অনাগত
আলোকে-উজ্জ্বল জীবনে-চঞ্চল একি আনন্দ-তরঙ্গ॥
তাই, দুলিছে দিনকর চন্দ্র তাবা
চমকি কম্পিছে চেতনাধারা,
আকুল চঞ্চল নাচে সংসার, কুহরে হৃদয়বিহঙ্গ॥

পথের সঞ্চয় গ্রন্থের 'অন্তর বাহির' প্রবন্ধে আরব সমুদ্রে তরীবাহিত কবি একদিন বায়ুকল্লোলিত তরঙ্গমন্দ্রিত সমুদ্রের মধ্যে একটি অদৃশ্যযন্ত্রের সুর শুনতে পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। "সেই ধীর গম্ভীর সুরের অবিরাম ধারা সমস্ত আকাশের মর্মস্থলকে পূর্ণ করিয়া উচ্ছলিত হইতেছিল"—এবং সেই সূত্রেই কবি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বিশ্বসংগীতের অন্তরলোকে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছেন। তারই সঙ্গে সংগীতবিষয়ে আরও অনেক প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। শেষ সপ্তক কাব্যের সতেরো সংখ্যক কবিতাটি ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে

উদ্দেশ করে লেখা, বিষয় সংগীত। কবি এই করিতায় সংগীতের গভীরতম তাৎপর্য কবিপ্রাণতার দিক থেকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো ভাষা নেই, কেবল ইঙ্গিতে-ভঙ্গিতে ছন্দে আপনাকে সে প্রকাশ করে থাকে। মানুষের বোধও তেমনি কথার অতীত ছন্দ নৃত্য সুর ইশারায় আপনার অধীর বেগকে জানান দিতে থাকে। মানুষ তাই 'কাব্যে রচে বোবার বাণী'। যেমন অণুপরমাণু অসীম দেশে কালে আপন নৃত্যচক্র বানায় রূপের মধ্য দিয়ে তেমনি সেই বিদ্যুচ্চঞ্চল পরমাণুপুঞ্জের মতই মানুষের বোধ সংগীতে রূপ নেয়, সুরসংঘকে সীমায় বেঁধে তাকে বিচিত্র আবর্তনে নাচায়—

সেই সীমায়-বন্দী নাচন
পায় গানে-গড়া রূপ।
সেই বোবা রূপের দল মিলতে থাকে
সৃষ্টির অন্দরমহলে,
সেখানে যত রূপের নটী আছে
ছন্দ মেলায় সকলের সঙ্গে
নূপুর-বাঁধা চাঞ্চল্যের
দোলযাত্রায়।
আমি যে জানি
এ কথা যে-মানুষ জানায়
বাক্যে হোক সুরে হোক, রেখায় হোক,
সে পণ্ডিত।
আমি যে রস পাই, ব্যথা পাই,
রূপ দেখি,
এ কথা যার প্রাণ বলে
গান তারই জন্যে,
শাস্ত্রে সে আনাড়ি হলেও
তার নাড়িতে বাজে সুর।

নবজাতক কাব্যের 'সাড়ে নটা' নামক কবিতায় বেতারশ্রুত বিদেশী সংগীতের সুর কবির চেতনায় নিরাসক্ত দেহহীন পরিবেশহীন যে সংগীতের ধারা সঞ্চার করেছিল, তাকে অভিসারিকা বলা হয়েছে। সানাই কাব্যগ্রন্থের 'সানাই' কবিতাটিও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

৪

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘকালের সাহিত্যিক জীবনে সংগীতকে যে গভীর মূল্য দান করেছেন, তাঁর অন্যান্য সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে তুলনায় তাকে কোনো মতেই লঘু করা যায় না। গানের সুরের সঙ্গে কবির অস্তিত্বের নিগূঢ় আত্মিক সংযোগ ছিল এবং সেই সুরের ছন্দতালের আভ্যন্তর প্রেরণাতেই রবীন্দ্রনাথের কবিস্বরূপটি ধীরে ধীরে মূর্তিপরিগ্রহ করেছে। জীবনস্মৃতি গ্রন্থে কবি তাঁর জীবনে সংগীতের প্রভাবের যে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন, সে কথা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে—

"চিরকালই গানের সুর আমার মনে একটা অনির্বচনীয় আবেগ উপস্থিত করে। এখনো কাজকর্মের মাঝখানে হঠাৎ একটা গান শুনিলে আমার কাছে এক মুহূর্তেই সমস্ত সংসারের ভাবান্তর হইয়া যায়। এই সমস্ত চোখে-দেখার রাজ্য গানে-শোনার মধ্য দিয়া হঠাৎ একটা কী নূতন অর্থ লাভ করে। হঠাৎ মনে হয় আমরা যে জগতে আছি বিশেষ করিয়া কেবল তাহার একটা তলার সঙ্গেই সম্পর্ক রাখিয়াছি, এই আলোকের তলা, বস্তুর তলা,—কিন্তু এইটেই সমস্তটা নয়। বিশ্বের সমস্ত স্পন্দিত জাগ্রত শক্তি আজ প্রধানত বস্তু ও আলোকরূপেই প্রতিভাত হইতেছে বলিয়া আজ আমরা এই সূর্যের আলোকে বস্তুর অক্ষর দিয়াই বিশ্বকে অহরহ পাঠ করিতেছি, আর-কোনো অবস্থা কল্পনা করিতে পারি না—কিন্তু এই অসীম স্পন্দন যদি আমাদের কাছে আর-কিছু না হইয়া কেবল গগনব্যাপী অতিবিচিত্র সংগীতরূপেই প্রকাশ পাইত তবে অক্ষররূপে নহে, বাণীরূপেই আমরা সমস্ত পাইতাম। গানের সুরে যখন অন্তঃকরণের সমস্ত তন্ত্রী কাঁপিয়া উঠে তখন অনেক সময় আমার কাছে এই দৃশ্যমান জগৎ যেন আকারআয়তনহীন বাণীর ভাবে আপনাকে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে—তখন যেন বুঝিতে পারি জগৎটাকে যে ভাবে জানিতেছি তাহা ছাড়া কত রকম ভাবেই যে তাহাকে জানা যাইতে পারিত তাহা আমরা কিছুই জানি না"।[৮]

রবীন্দ্রপাঠকের কাছে এই ধরনের সংগীতভাষ্য অত্যন্ত পরিচিত। আমাদের কাছে লোভক্ষতি-কলহকণ্টক-আরামবিরাম-অধ্যুষিত সংসার অসামঞ্জস্যময়, কিন্তু গানের দ্বারা সেই ব্যত্যয়-বৈপরীত্যগুলি দূরীভূত হয়ে সামঞ্জস্য ও সুষমার আবির্ভাব ঘটে। তখন 'মানুষের জন্মমৃত্যু হাসিকান্না ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের পর্যায় একটি কবিতার সকরুণ ছন্দের মত কানে বাজে'

(ছিন্নপত্রাবলী, ২ মে ১৮৯৫)। অন্যত্র কবি লিখেছেন, 'সংগীতের মত এমন আশ্চর্য ইন্দ্রজালবিদ্যা জগতে আর কিছুই নেই—এ এক নূতন সৃষ্টিকর্তা' (ছিন্নপত্রাবলী, ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫)। প্রকৃতির সঙ্গে গানের সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে কবি একটি আশ্চর্য চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন একটি পত্রে (ছিন্নপত্রাবলী, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫)—'আমি নিশ্চয় জানি এখনি যদি আমি জানলার বাইরে দৃষ্টি রেখে রামকেলি ভাঁজতে আরম্ভ করি তাহলে এই রৌদ্ররঞ্জিত সুদূরবিস্তৃত শ্যামলনীল প্রকৃতি মন্ত্রমুগ্ধ হরিণীর মত আমার মর্মের কাছে এসে আমাকে অবলেহন করতে থাকবে।' পরিণত বয়সে গানের সুরের প্রভাব ব্যক্ত করতে বসে কবি গেয়েছিলেন, গানের ভিতর দিয়ে যখন ভুবন দর্শন ঘটে তখনই কবি তাকে চিনতে পারেন, অন্তরঙ্গ করে জানেন। একমাত্র তখনই সেই ভুবনের আলোকভাষায় আর ভালোবাসায় নিখিল গগন পূর্ণ হয়ে যায়, মর্তধূলায় পরম বাণী ধ্বনিত হয়—

তখন সে যে বাহির ছেড়ে অন্তরে মোর আসে
তখন আমার হৃদয় কাঁপে তারই ঘাসে ঘাসে।
রূপের রেখা রসের ধারায় আপন সীমা কোথায় হারায়,
তখন দেখি আমার সাথে সবার কানাকানি ॥

কিন্তু প্রভাতের রামকেলির সুরে মন্ত্রমুগ্ধ প্রকৃতি-হরিণীর অবলেহন-করা রূপটি রসের ধারায় রূপের রেখার একটি অনবদ্য উদাহরণ হিসাবে মনে গেঁথে যায়। এই একটি অলংকারে সমগ্র সংগীতসৃষ্টি কবির কাছে কী গোপন গভীর নিবিড় পুলকসূত্রে জড়িত তা আমরা মুহূর্তে অনুভব করি। শেষ বয়সে কবি অমিয় চক্রবর্তীকে এই ভাবটি অন্য ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন—

"গানেতে মনের মধ্যে এনে দেয় একটা দূরত্বের পরিপ্রেক্ষণী। বিষয়টা যত কাছেরই হোক সুরে হয় তার রথযাত্রা, তাকে দেখতে পাই ছন্দের লোকান্তরে, সীমান্তরে; প্রাত্যহিকের করস্পর্শে তার ক্ষয় ঘটে না, দাগ ধরে না"[১০]

বিবাহসন্ধ্যায় সানাইয়ে যে সাহানা বারোয়াঁ সিন্ধু কাফি প্রভৃতি রাগরাগিণী বাজে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু রচনায় সেই রাগিণীর মধ্যে একটি অসীমতার ব্যঞ্জনা অনুভব করার কথা লিখেছেন। পঞ্চভূত গ্রন্থের 'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ' প্রবন্ধে গ্রামের জমিদারগৃহে পুণ্যাহ উপলক্ষে বেসুরো সানাইয়ের মেঠো রাগিণী ও গোটাকতক ঢাকঢোলের আওয়াজের সার্থকতা নিয়ে ক্ষিতি

ও সমীরের মধ্যে তর্ক বেধেছিল। এই প্রসঙ্গে সমীর সেই গ্রাম্য সানাইয়ের সুরকে উৎসবের অন্তরাত্মার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে ব্যাখ্যা করেছে—

"সংসারের স্বার্থকোলাহলের মধ্যে মাঝে মাঝে একটা পঞ্চম সুর সংযোগ করিয়া দিলে, নিদেন ক্ষণকালের জন্য পৃথিবীর শ্রী ফিরিয়া যায়, হঠাৎ হাটের মধ্যে গৃহের শোভা আসিয়া আবির্ভূত হয়; কেনাবেচার উপর ভালোবাসার স্নিগ্ধ দৃষ্টি চন্দ্রালোকের ন্যায় নিপতিত হইয়া তাহার শুষ্ক কঠোরতা দূর করিয়া দেয়।"

পথের সঞ্চয়ের 'সংগীত' প্রবন্ধে কবি লিখেছেন, "আমাদের বিবাহের রাত্রে রশনচৌকিতে সাহানা বাজে, বিবাহের প্রমোদসভাকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া যে অন্ধকার রাত্রি নিস্তব্ধ হইয়া আছে, যেখানে লোকলোকান্তরের অনন্ত উৎসব নীরব নক্ষত্রসভায় প্রশান্ত আলোকে দীপ্যমান, সাহানার সুর সেখানকার বাণী বহন করিয়া প্রবেশ করে।" সবুজ পত্রে প্রকাশিত 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধে এরই পুনরুক্তি—

"যে সাহানার সুর অচঞ্চল ও গভীর, যাহাতে আমোদ-আহ্লাদের উল্লাস নাই, তাহাই আমাদের বিবাহউৎসবের রাগিণী। নরনারীর মিলনের মধ্যে যে চিরকালীন বিশ্বতত্ত্ব আছে, সেইটিকে সে স্মরণ করাইতে থাকে, জীবজন্মের আদিতে যে দ্বৈতের সাধনা তাহারই বিরাট বেদনাটিকে ব্যাক্তিবিশেষের বিবাহঘটনার উপরে সে পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয়।" 'দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে পাঠালো তোমার ঘরে' গানেও কবি লিখেছিলেন, 'ধরো সাহানাতে মিলনের পালা সাজাও যতনে বরণের মালা'। উৎসবের দিনে বাঁশি বা সানাইয়ের রাগরাগিণীর মধ্যে যে বিশ্বব্যাপ্ত বেদনা ও অনির্বচনীয় অনন্তের আভাস পাওয়া যায়, এই ভাবটি পঞ্চভূতের 'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ' ছাড়া 'অপূর্ব রামায়ণ' এবং লিপিকার 'বাঁশি', সাহিত্যের পথের 'সৃষ্টি' প্রবন্ধ ও সানাইয়ের নাম-কবিতায় কবি নানা ভাবে ব্যক্ত করেছেন। পঞ্চভূতের 'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ' প্রবন্ধে পুণ্যাহের বাঁশির উৎসব-উপযোগিতা বিষয়ে ভূতনাথবাবু ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, সাধারণ দিনের তুচ্ছতা-ইতরতার মধ্যে উৎসবের বাঁশি সহসা একটি সুন্দর সামঞ্জস্য ও মানবাত্মার সৌন্দর্য প্রয়োগ করে। 'খাজনার টাকার সহিত রাগরাগিণীর কোনো যোগ নাই, খাজাঞ্চিখানা নহবত বাজইবার স্থান নহে; কিন্তু যেখানেই ভাবের সম্পর্ক আসিয়া দাঁড়াইল অমনি সেখানেই বাঁশি তাহাকে আহ্বান করে, রাগিণী তাহাকে প্রকাশ করে, সৌন্দর্য তাহার

সহচর'। পঞ্চভূত গ্রন্থের 'অপূর্ব রামায়ণ' প্রবন্ধটি গানের সুরের একটি নূতন ভাষ্য। এখানেও প্রবন্ধ আরম্ভ হয়েছে সানাইয়ের সুরে—'বাড়িতে একটা শুভকার্য ছিল, তাই বিকালের দিকে অদূরবর্তী মঞ্চের উপর হইতে বারোয়াঁ রাগিণীতে নহবৎ বাজিতেছিল'। তাই শুনে ব্যোমের মন্তব্য একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য বলেই বিশ্বাস করা যায়—

"আমাদের এই সকল দেশীয় রাগিণীর মধ্যে একটা পরিব্যাপ্ত মৃত্যুশোকের ভাব আছে, সুরগুলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, সংসারে কিছুই স্থায়ী হয় না।...এটা বাঁশির মুখে শুনিতে এত ভালো লাগিতেছে কেন। কারণ বাঁশিতে জগতের এই সবাপেক্ষা সুকঠোর সত্যটাকে সর্বাপেক্ষা সুমধুর করিয়া বলিতেছে। মনে হইতেছে মৃত্যুটা এই রাগিণীর মত সকরুণ বটে, কিন্তু এই রাগিণীর মতই সুন্দর।...একজনের হৃদয়কুহর হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলে বাঁশি তাহাই সমস্ত জগতের মুখ হইতে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়া এখন অগাধকরুণাপূর্ণ অথচ অনন্তসান্ত্বনাময় রাগিণীর সৃষ্টি করিতেছে।"

পরিশেষ কাব্যের 'বাঁশি' কবিতায় হরিপদ কেরানির নিরাশ্বাস প্রাত্যহিকতা ও কিনু গোয়ালার গলির বীভৎস বাতাসও এক একদিন স্বর্ণাভ গোধূলিতে আপনার রঙ বদল করত, যখন পাড়ার মোড়ের কান্তবাবু সিন্ধু-বারোয়াঁয় বাজাতেন কর্নেট। আর তখনই সমস্ত আকাশে বাজত 'অনাদিকালের বিরহবেদনা'। ঠিক সেই মুহূর্তেই অনন্ত গোধূলিলগ্নে অনন্তপ্রবাহিনী ধলেশ্বরীর তীরে তালতমালচ্ছায় আঙিনাতে দেখা যেত চির অপেক্ষমানা একটি মেয়েকে, যার 'পরণে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর'। লিপিকার 'বাঁশি' ও এরই প্রতিলিপি মাত্র—

"গানের সুর সংসারের উপর থেকে এই সমস্ত চেনা কথার পর্দা একটানে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। চিরদিনকার বরকনের শুভদৃষ্টি হচ্ছে কোন রক্তাংশুকের সলজ্জ অবগুণ্ঠনতলে, তাই তার তানে তানে প্রকাশ হয়ে পড়ল"।

প্রৌঢ় বয়সে সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনা করতে বসেও কবি এই প্রশ্ন তুলেছেন সাহিত্যের পথের 'সৃষ্টি' প্রবন্ধে—'উৎসবের দিনে বাঁশি কেন বাজে। সে কেবল সুরের লেপ দিয়ে প্রত্যহের সমস্ত ভাঙাচোরা মলিনতা নিকিয়ে দিতে চায়'। সানাই কবিতা এই বিষয়ে সম্ভবত কবির শেষ রচনা—

সমস্ত এ ছন্দভাঙা অসংগতি মাঝে
সানাই লাগায় তার সারঙের তান।...

অরূপের মর্ম হতে সমুচ্ছ্বাসি
উৎসবের মধুচ্ছন্দ বিস্তারিছে বাঁশি।
সন্ধ্যাতারা-জ্বালা অন্ধকারে
অনন্তের বিরাট পরশ যথা অন্তর মাঝারে
তেমনি সুদূর স্বচ্ছ সুর
গভীর মধুর
অমর্ত লোকের কোন বাক্যের অতীত সত্যবাণী
অন্যমনা ধরণীব কানে দেয় আনি।

আপন সংগীতসৃষ্টি সম্পর্কে কবির দুর্বলতা ও স্পর্শকাতরতার পরিচয়ও রবীন্দ্রনাথের সংগীতবিষয়ক আলোচনায় বহুপ্রাপ্তব্য। বিশেষ করে কবির উত্তরার্ধের সংগীতরচনা তাঁর সমস্ত সারস্বত সৃষ্টির মধ্যে আনন্দিততম সৃষ্টি, এ স্বীকৃতি একাধিকবার পাই। পশ্চিম যাত্রীব ডায়াবি-র 'যাত্রী' অংশে কবির এই প্রৌঢ়জীবনের গীতসর্বস্বতার একটি আত্মসমীক্ষা লিপিবদ্ধ হয়েছে। সেখানে কবি বলেছেন—

"আজ নাগাদ প্রায় পনেরো ষোলো বছব ধবে খুব কমে গানই লিখছি। লোকরঞ্জনের জন্য নয়, কেন না পাঠকেরা লেখায় ক্ষমতার পরিচয় খোঁজে। ছোট ছোট একটু একটু গানে ক্ষমতার কাযদা দেখাবার মত জায়গাই নেই। কবিত্বকে যদি রীতিমত তাল ঠুকে বেড়াতেই হয়, তাহলে অন্তত একটা বড় আখড়া চাই। তাছাড়া গান জিনিসে বেশি বোঝা সয় না, যারা মালের ওজন করে দরের যাচাই করে তারা এরকম দশ বারো লাইনের হালকা কবিতার বাজার মাড়াতে চায না। তবু আমি এই কয় বছরে এত গান লিখেছি যে অন্তত সংখ্যা হিসাবে লম্বা দৌড়ের বাজিতে আমি বোধ হয পয়লা নম্বরের পুরস্কার পেতে পারি।

আর একটা কথা বলে রাখি, গান লিখতে যেমন আমার নিবিড় আনন্দ হয় এমন আর কিছুতে হয় না। এমন নেশায় ধরে যে, তখন গুরুতর কাজের গুরুত্ব একেবারে চলে যায়, বড় বড় দাযিত্বের ভারাকর্ষণটা হঠাৎ লোপ পায়, কর্তব্যের দাবিগুলোকে মন একধার থেকে নামঞ্জুর করে দেয়।"

শিল্প-সাহিত্য-সংগীত কলাসৃষ্টির এই তিনটি রূপরীতির মধ্যে সংগীতকেই

সর্বাধিক বিশুদ্ধ শিল্প বলে কবি মনে করতেন। 'বিশ্বকর্মার লীলাখেলার স্রোতটার মধ্যে হঠাৎ পড়ে গেলে শুকনো ডাঙার কথাটা একেবারেই মনে থাকে না'। কবি বারবার বলেছেন, অপ্রয়োজনের সৃষ্টিই আনন্দের সৃষ্টি, যেমন শরতের শিউলি ফুল, নববর্ষার জলবর্ষণে ঘসের বুকে নামহারা রঙের চমক। 'এটা হল রূপের লীলা, কেবলমাত্র হয়ে-ওঠাতেই আনন্দ'। এই রূপ যেমন প্রকৃতির বুকে, ফুলের রঙে রসে, তেমনি কলাবিদের সৃষ্টিতে। 'তার মধ্যে প্রাণের আনন্দ টলমল করে ওঠে, কত মধুর প্রলাপে, কত মন-ভোলানো ভঙ্গিতে'। সাহিত্যবিষযক প্রবন্ধে কবি বহুকাল থেকেই এই তত্ত্ব প্রচার করে আসছেন যে, অপ্রযোজনের নেশাতেই রূপ ওঠে জমে, সৃষ্টির মূলে আছে এই লীলাময় রূপের প্রকাশ। কবি বলেন, 'সেই প্রকাশের অহেতুক আনন্দে যখন যোগ দিতে পারি তখন সৃষ্টির মূল আনন্দে মন পৌছয়। সেই মূল আনন্দ আপনাতেই আপনি পর্যাপ্ত, কারো কাছে তার কোনো জবাবদিহি নেই।' এই স্বয়ংপূর্ণ আনন্দ আছে শিশুর সৃষ্টিলীলায, আছে কবির গানের বাণী ও সুরে। 'গড়বার শক্তিকে প্রকাশ করছি বলে আনন্দ নয়. কেন না সে শক্তি এক্ষেত্রে বিশেষ প্রকাশ পাচ্ছে না। একটি রূপবিশেষকে চিত্তে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বলে আনন্দ। সেই রূপটাকে শেষ লক্ষ্য করে দেখাই হচ্ছে সৃষ্টিকে দেখা। তার আনন্দই সৃষ্টির মূল আনন্দ।"

যদিও সামগ্রিকভাবে সমস্ত কলাসৃষ্টিই এই অহেতুক আনন্দ থেকে উৎসারিত, তবু কবির কাছে গানের ভূমিকা সম্ভবত তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানিক। কারণ গান হল নিছক সৃষ্টিলীলা। কবি বলেছেন, "ইন্দ্রধনু যেমন বৃষ্টি আর রৌদ্রের জাদু, আকাশের দুটো খামখেয়ালি মেজাজ দিযে গডা তোরণ, একটি অপূর্ব মুহূর্তকাল সেই তোরণের নিচে দিযে জয়যাত্রা করবে। হয়ে গেল এই খেলা, মুহূর্তটি তার রঙিন উত্তরীয় উডিযে দিয়ে চলে গেল। তার বেশি কিছু আর নয়। মেজাজের এই রঙিন খেলাই হচ্ছে গীতিকাব্য। ঐ ইন্দ্রধনুর কবিটিকে পাকডাও করে যদি জিজ্ঞাসা করা যেত 'এটার মানে কী হল', সাফ জবাব পাওয়া যেত 'কিছুই না'। 'তবে'? 'আমার খুশি'—সৃষ্টির সব প্রশ্নের এই হল শেষ উত্তর।"

সাহিত্যসৃষ্টির এই আনন্দকৈবল্য, অবকাশরঞ্জনী অহৈতুক লীলার তত্ত্ব, কত রূপে উপমানে কত ভাষায় ছন্দেই না কবি সারাজীবন শুনিয়ে এসেছেন। আজ সংগীত রচনা সম্পর্কেও তিনি এই আনন্দঘন কৈফিয়ৎ দিয়েছেন—

"সৃষ্টির অন্তরতম এই অহৈতুক লীলার রসটিকে যখন মন পেতে চায় তখনই বাদশাহী বেকারের মত সে গান লিখতে বসে। চারখানি পাপড়ি নিয়ে একখানি ছোট জুঁইফুলের মত একটুখানি গান যখন সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন সেই মহাখেলা, ঘরের মেজের উপরেই তার জন্য জায়গা করা হয়, যেখানে যুগ যুগ ধরে গ্রহনক্ষত্রের খেলা হচ্ছে। সেখানে যুগ আর মুহূর্ত একটি, সেখানে সূর্য আর সূর্যমণি ফুল অভেদাত্মা, সেখানে সাঁঝসকালে মেঘে মেঘে যে রাগরাগিণী আমার গানের সঙ্গে তার অন্তরের মিল আছে।

আজ পনেরো ষোলো বছর ধরে, কর্তব্যবুদ্ধি আমাকে নানা ভাবনা নানা ব্যস্ততার মধ্যে জোর করে টেনে নিয়ে ফেলে আমার কাছ থেকে কষে কাজ আদায় করে নিচ্ছে। এখানকার সকল কাজই মোটা কৈফিয়তের অপেক্ষা রাখে, খোঁচা দিয়ে দিয়ে কেবলই জিজ্ঞাসা করে ফল হবে কি? সেইজন্য যার ফরমাশ কৈফিয়তের সীমানা পেরিয়ে আপন বেদরকারি পাওনা দাবি করে, ভিতরে ভিতরে সে আমাকে কেবলই প্রশ্ন করতে থাকে, তুমি কবি চির-ছুটির পরোয়ানা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে, তার করলে কী? কাজের ভিড়ের টানাটানিতে পড়ে একেবারেই জাত খুইয়ে বসো না। নিশ্চয়ই ওরই এই তাগিদে আমাকে গান লেখায়, হট্টগোলের মধ্যেও নিজের পরিচয়টা বজায় রাখবার জন্য, লোকরঞ্জনের জন্যে নয়। কর্তব্যবুদ্ধি তার কীর্তি ফেঁদে গম্ভীর কণ্ঠে বলে, পৃথিবীতে আমি সবচেয়ে গুরুতর। তাই আমার ভিতরকার বিধিদত্ত ছুটির খেয়াল বাঁশি বাজিয়ে বলে, পৃথিবীতে আমিই সবচেয়ে লঘুতম। আমার কেজো পরিচয়টার প্রতি ঈর্ষা করে অবজ্ঞা করে আমার অকেজো পরিচয়টা আমাকে যখন তখন গান লিখিয়ে, নিজের দলিল ঠিক করে রাখছে। যখন বিরুদ্ধ পক্ষে মাতব্বর সাক্ষী এসে জোটে, তখনই নিজের দাবির দলিল খুব বড় করে তুলতে হয়। যতদিন ধরে একপক্ষে আমার কাজের রোকড় খুব মোটা হয়ে উঠছে, ততদিন ধরেই অন্যপক্ষে আমার ছুটির নথিও অসম্ভব রকম ভারি হয়ে উঠল। এই যে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলছে, এটা আমার অন্তরের খাস কামরায়। আমি আসলে কোন পক্ষের, সেইটের বিচার নিয়ে আমারই কাছে নালিশ।"

সংগীতসৃষ্টির বহুলতায় কবির অবসিতযৌবনের স্মৃতিমন্থর দিনগুলি যে নানা সময় ভরে উঠেছিল, এই সকল সংগীতমনস্ক আলোচনায় তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। কবি তাঁর গান ও গান-ব্যতিরিক্ত অন্যান্য সারস্বত শিল্পকে

দ্বিপাক্ষিক ভূমিকায় স্থাপন করে তাদের কৃত্রিম বিরোধ কল্পনা করে যেন কৌতুক বোধ করেছেন। তাঁর শেষ বয়সের সংগীতসৃষ্টির অন্যতম প্রেরণা যে স্মৃতি এরূপ উল্লেখও তাঁর বিভিন্ন রচনায় পাওয়া যায়। পূরবীর নাম কবিতায় কবি লিখেছিলেন,

যারা আমার সাঁঝসকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে, এই জীবনের সকল শাদা কালো
যাদের আলো-ছায়ার লীলা, সেই যে আমার আপন মানুষগুলি
নিজের প্রাণের স্রোতের পরে আমার প্রাণের ঝরনা নিল তুলি, ·

—তাদের প্রতি কবির 'সকরুণ নিবেদনের গন্ধঢালা' সুরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে প্রায় একই ভাষায় পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারির 'যাত্রী' অংশে—

"কিশোর বয়সে যারা আমাকে কাঁদিয়েছিল, হাসিয়েছিল, আমার কাছ থেকে আমার গান লুঠ করে ছড়িয়ে ফেলেছিল, আমার মনের কৃতজ্ঞতা তাদের দিকে ছুটল। তারা মস্ত বড় কিছুই নয়; তারা দেখা দিয়েছে কেউ বা বনের ছায়ায়, কেউ বা নদীর ধারে; কেউ বা ঘরের কোণে, কেউ বা পথের বাঁকে।··তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললুম, আমার জীবনে যাতে সত্যিকার ফসল ফলিয়েছে সেই আলোর, সেই উত্তাপের দূত তোমরাই, প্রণাম তোমাদের।"

সেই কারণেই কবির শেষ জীবনের সৃষ্টিপর্বে এমন গানের জোয়ার, গানের সুরে অধরাকে ধরার ব্যাকুলতা, সুরের খেয়ায় না-ছোঁওয়া ঘাটে পাড়ি জমাবার কান্না। শেষবেলার গানখানি মনে পড়ে—

আমি যে গান গাই জানিনে সে কার উদ্দেশে।
যবে জাগে মনে অকারণে চঞ্চল হাওয়া প্রবাসী পাখি যেন
যায় সুর ভেসে, কার উদ্দেশে॥
ঐ মুখ-পানে চেয়ে দেখি—
তুমি সে কি অতীত কালের স্বপ্ন এলে
নূতন কালের বেশে।
কভু জাগে মনে আজও যে আসেনি এ জীবনে
গানের খেয়া সে মাগে আমার তীরে এসে কার উদ্দেশে॥

আবার আমরা পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারির প্রাগুক্ত অংশে কান পাতি। কবি বলেছেন—

"যে সৃষ্টিলোকে জীবনযাত্রা সুরু করেছিলুম, যে লীলাক্ষেত্রে জীবনের প্রথম অংশ অনেকটা কেটে গেল, সেখানেই জীবনটার উপসংহার করবার উদ্বেগে কিছুকাল থেকেই মনের মধ্যে একটা মন-কেমন-করার হাওয়া বইছে। একদা পদ্মার ধারে আকাশের পারে সংসারের পথে যারা আমার সঙ্গী ছিল, তারা বলছে, সেদিনকার পালা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়নি, বিদায়ের গোধূলি-বেলায় সেই আরম্ভের কথাগুলি সাঙ্গ করে যেতে হবে। সেইজন্যই সকাল-বেলার মল্লিকা সন্ধ্যাবেলার রজনীগন্ধা হয়ে তার গন্ধের দূত পাঠাচ্ছে। বলছে, তোমার খ্যাতি তোমাকে না টানুক, তোমার কীর্তি তোমাকে না বাঁধুক,, তোমার গান তোমাকে পথের পথিক করে তোমাকে শেষ যাত্রায় রওনা করে দিক। প্রথম বয়সের বাতায়নে বসে তুমি তোমার দূরের বঁধুর উত্তরীয়ের সুগন্ধি হাওয়া পেয়েছিলে। শেষ বয়সের পথে বেরিয়ে গোধূলিরাগের রাঙা আলোতে তোমার সেই দূরের বঁধুর সন্ধানে নির্ভযে চলে যাও। লোকের ডাকাডাকি শুনো না। সুর যে দিক থেকে আসছে সেই দিকে কান পাতো —আর সেই দিকেই ডানা মেলে দাও সাগরপারের লীলালোকের আকাশ-পথে। যাবার বেলা কবুল করে যাও যে, তুমি কোনো কাজের নও, তুমি অস্থায়ীদের দলে।"

দূরের বন্ধু সুরের দূতী পাঠালে এমননি করেই কবির গানের ডালি পূর্ণ হয়ে ওঠে।

পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি গ্রন্থের যাত্রী অংশের বিস্তারিত আলোচনা ছাড়াও অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি পত্রে কবি একবার লিখেছিলেন যে গান আর ছবি, শেষ বয়সের এই দুই ঠিকানাতেই তাঁর পাকা আস্তানা। তাঁর গানের বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও কবির আনন্দ যে এই গানেই, সেই 'জাত-খোয়ানো কলঙ্ক'কে তিনি অঙ্গের ভূষণ বলে মেনে নিয়েছেন ; সে কথার উল্লেখ করে কবি বলেছেন—"গানে আমার পাণ্ডিত্য নেই, একথা আমার নিতান্ত জানা—তার চেয়ে বেশি জানা গানের ভিতর দিযে অব্যবহিত আনন্দের সহজ বোধ। এই সহজ আনন্দের নিশ্চিত উপলব্ধির উপরে বাঁধা আইনের করক্ষেপ আমাকে একটুও নাড়াতে পারেনি। এখানে আমি উদ্ধত, আমি স্পর্ধিত আমার আন্তরিক অধিকারের জোরে। বচনের অতীত বলেই গানের অনির্বচনীয়তা আপন মহিমায় আপনি বিরাজ করতে পারে, যদি তার মধ্যে থাকে আইনের চেয়ে বড় আইন। গান যখন সম্পূর্ণ জাগে মনের মধ্যে, তখন চিত্ত অমরাবতীতে গিয়ে পৌছয়।" (সংগীতচিন্তা পৃ ২০৬)

কথার সঙ্গে সুর যোজনা করলে সেই কথা কেমন করে তার অর্থের সীমা অতিক্রম করে অরূপ অনির্বচনীয় লোকে পাড়ি দেয়, তার দুটি উদাহরণ কবির স্বরচিত সংগীতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যেতে পারে। জীবনস্মৃতি গ্রন্থের 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ' অধ্যায়ে কবি লিখেছেন—'যেখানে অনির্বচনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে'। 'তোমার গোপন কথাটি সখী, রেখো না মনে'—কবি তাঁর এই গানের উল্লেখ করে বলেছেন যে এই গানের কথাবস্তুর উপর সুরযোজনা করার সঙ্গে সঙ্গে একদা তাঁর মনে হল, "আমি যে গোপন কথাটি শুনিবার জন্য সাধাসাধি করিতেছি তাহা যেন বনশ্রেণীর শ্যামলিমার মধ্যে মিলাইয়া আছে, পূর্ণিমারাত্রের নিস্তব্ধ শুভ্রতার মধ্যে ডুবিয়া আছে, দিগন্তরালের নীলাভ সুদূরতার মধ্যে অবগুণ্ঠিত হইয়া আছে—তাহা যেন সমস্ত জল-স্থল-আকাশের নিগূঢ় গোপন কথা"। বাল্যকালে কবি একটি গান শুনেছিলেন 'তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে'। ঐ গানের একটিমাত্র পদ কবির মনে যে অপরূপ একটি চিত্র এঁকে রেখেছিল তারই অনুষঙ্গে পরবর্তী জীবনে কবি 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী' এই গানটি লিখেছিলেন। এই গানের সুরের মন্ত্রগুঞ্জরণে "বিদেশিনীর এক অপরূপ মূর্তি মনে জাগিয়া উঠিল। আমার মন বলিতে লাগিল আমাদের এই জগতের মধ্যে একটি কোন্ বিদেশিনী আনাগোনা করে, কোন্ রহস্য-সিন্ধুর পরপারে ঘাটের উপরে তাহার বাড়ি, তাহাকেই শারদপ্রাতে মাধবী-রাত্রিতে ক্ষণে ক্ষণে দেখিতে পাই, হৃদয়ের মাঝখানেও মাঝে মাঝে তাহার আভাস পাওয়া গেছে, আকাশে কান পাতিয়া তাহার কণ্ঠস্বর কখনো বা শুনিয়াছি। সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ববিমোহিনী বিদেশিনীর দ্বারে আমার গানের সুর আমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল।" আপন গানের সুর কবির পুলকিত চিত্তে কী গভীর মায়ামন্ত্র সঞ্চার করত, এই আলোচনার ভাষাই তার প্রমাণ। ঠিক অনুরূপ অভিজ্ঞতা কবির অন্যত্র একস্থানে পাওয়া যায়। অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত প্রাগুক্ত চিঠিতেই কবি লিখেছেন (সংগীতচিন্তা পৃ ২০৬)—"আমার শ্যামা নাটকের জন্যে একটা গান তৈরি করেছি ভৈরবী রাগিণীতে—'জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা হে গরবিনী'। এই গরবিনীকে সংসারে দেখেছি বারম্বার, কিন্তু গানের সুর শুনলে বুঝবে এই 'বারম্বারে'র অনেক বাইরে সে চলে গেছে। যেন কোন চিরকালের গরবিনীর পায়ের কাছে বসে মুগ্ধ মন অন্তরে অন্তরে সাধনা করতে থাকে। সুরময় ছন্দোময় দূরত্বই তার সকলের চেয়ে বড় অলংকার।"

জীবনস্মৃতিতে 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ' অধ্যায়ে কবি আরো বলেছিলেন যে, এক দিন বোলপুরের রাস্তায় কবি একটি বাউল গান শুনতে পান—

খাঁচার মাঝে অচিন পাখি কমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।

—এই গানটির প্রসঙ্গে কবি মন্তব্য করেছেন—"মাঝে মাঝে বদ্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়, মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু পারে না। এই অচিন পাখির নিঃশব্দ যাওয়া-আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে!"

গানের সুরের ছন্দোহিল্লোলে এই বাউল গানের অচিন পাখিটিকে ধরে রাখার চিত্রকল্পটি উদ্‌ভাসিত হয়েছে কবির আর একটি গানে—

অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে
ও যে সুদূর প্রাতের পাখি
গাহে সুদূর রাতের গান।
বিগত বসন্তের অশোকরক্তরাগে ওর রঙিন পাখা,
তারি ঝরা ফুলের গন্ধ ওর অন্তরে ঢাকা॥

(দ্র সানাই কাব্যের 'অধরা')

'ছন্দের অর্থ' (চৈত্র ১৩২৪) নামক একটি প্রবন্ধে কবি লিখেছেন—"গানের স্পন্দন আমাদের চিত্তের মধ্যে যে আবেগ জন্মিয়ে দেয়, সে কোনো সাংসারিক ঘটনামূলক আবেগ নয়। তাই মনে হয়, সৃষ্টির গভীরতার মধ্যে যে একটি বিশ্বব্যাপী প্রাণকম্পন চলছে, গান শুনে সেইটেরই বেদনাবেগ যেন আমরা চিত্তের মধ্যে অনুভব করি"। (সংগীতচিন্তা পৃ ২২৮)

জাপানযাত্রী গ্রন্থের একস্থানে ছবি ও গানের তুলনা করে কবি লিখেছেন—"ছবি জিনিসটা হচ্ছে অবনীর, গান জিনিসটা গগনের। অসীম যেখানে সীমার মধ্যে সেখানে ছবি, অসীম যেখানে সীমাহীনতায় সেখানে গান। রূপরাজ্যের কলা ছবি, অপরূপ রাজ্যের কলা গান"। (সংগীতচিন্তা ২১৪ পৃষ্ঠায় উদ্‌ধৃত)

আর এ সমস্ত মতামতই বিশেষভাবে কবিরই আপন সংগীতসৃষ্টি সম্পর্কে প্রযোজ্য। আপনার গানরচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আরও কয়েকটি প্রকীর্ণ মন্তব্য উদ্ধার করে এই প্রসঙ্গের যবনিকা টানা যেতে পারে। সাধারণভাবে সংগীতের তত্ত্ব ও তাৎপর্য এবং সেই সূত্রে আপন সংগীতরচনার অভিজ্ঞতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ

একাধিকবার দিলীপকুমার রায় ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে কবির সংগীতবিষয়ক আলোচনায় আপন গান সম্পর্কে কবি একবার মন্তব্য করেন—"আমি যখন গান বাঁধি তখনই সবচেয়ে আনন্দ পাই। মন বলে, প্রবন্ধ লিখি, বক্তৃতা দিই, কর্তব্য করি, এ সবই এর কাছে তুচ্ছ। আমি একবার লিখেছিলাম,

যবে কাজ করি,
প্রভু দেয় মোরে মান।
যবে গান করি,
ভালবাসে ভগবান।

একথা বলি কেন?—এই জন্যে যে, গানে যে আলো মনের মধ্যে বিছিয়ে যায় তার মধ্যে আছে এই দিব্যবোধ যে, যা পাবার নয়, তাকেই পেলাম আপন করে, নতুন করে। এই বোধ যে, জীবনের হাজারো অবান্তর সংঘর্ষ হানাহানি তর্কাতর্কি এসব এর তুলনায় বাহ্য—এই হল সারবস্তু—কেন না, এ হল আনন্দ-লোকের বস্তু, যে লোক জৈবলীলার আদিম উৎস। প্রকাশলীলায় গান কিনা সবচেয়ে সূক্ষ্ম—ethereal—তাই তো সে অপরের স্বীকৃতির স্থূলতার অপেক্ষা রাখে না। শুধু তাই নয়, নিজের হৃদয়ের বাণীকে সে রঙিয়ে তোলে সুরে"। (সংগীতচিন্তা পৃ ১৩০)

ধূর্জটিপ্রসাদের কাছে লেখা একটি চিঠিতেও সময়ান্তরে কবির অনুরূপ স্বীকৃতি পুনরাবৃত্ত হয়েছে। কবি লিখেছেন—"মাঝে মাঝে গান রচনার নেশায় যখন আমাকে পেয়েছে, তখন আমি সকল কর্তব্য ভুলে তাতে তলিয়ে গেছি। আমি যদি ওস্তাদের কাছে গান শিক্ষা করে দক্ষতার সঙ্গে সেই সকল দুরূহ গানের আলাপ করতে পারতুম তাতে নিশ্চয় সুখ পেতুম, কিন্তু আপন অন্তর থেকে প্রকাশের বেদনাকে গানে মূর্তি দেবার যে আনন্দ, সে তার চেয়ে গভীর। সে গান শ্রেষ্ঠতায় পুরাযুগের গানের সঙ্গে তুলনীয় নয়, কিন্তু আপন সত্যতায় সে সমাদরের যোগ্য।" (সংগীতচিন্তা পৃ ১৭৮)

লেখন গ্রন্থের একটি দ্বিপদিক কবিতাকণা মনে পড়ে—কবি যা বলেছিলেন তা তাঁর নিজের সাংগীতিক জীবন সম্পর্কে অকপট সদুক্তিকর্ণামৃত—

সংগীতে যখন সত্য শোনে নিজ বাণী
সৌন্দর্যে তখন ফোটে তার হাসিখানি।

৬

রবীন্দ্রনাথের সংগীতবিষয়ক আলোচনায় সংগীতের মূলতত্ত্ব, বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে সংগীতের সম্পর্ক, আপন সংগীতসৃষ্টির প্রেরণা যেমন অনুপম কবিত্বসমৃদ্ধ উপলব্ধিনিবিড় দার্শনিক প্রত্যয়গাঢ়তায় আলোচিত হয়েছে, তেমনি ভারতীয় রাগরাগিণী, আমাদের উচ্চাঙ্গ সংগীতের আভ্যন্তর-রহস্য, ভারতীয় ও ইউরোপীয় সংগীতের তুলনামূলক আলোচনাও সেখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের সংগীতবিষয়ক আলোচনা সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন—

"তাঁর সংগীত-সমালোচনা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ নয়, দার্শনিকের তত্ত্বালোচনাও নয়, তা রসজ্ঞের রসাস্বাদনজাত আলোচনা। · তিনি সংগীতকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন প্রকৃতি ও প্রয়োজনের দিক থেকে। সংগীতের রূপরস, গতিপ্রকৃতি, দেশের বিভিন্ন গীতের পার্থক্য, বিদেশী সংগীতের বহিঃ ও আন্তররূপ—এই হচ্ছে তাঁর আলোচনার বিষয়"।[১১]

এই সমালোচনার প্রতিটি উক্তি অভ্রান্তভাবে গ্রাহ্য কিনা বিচার্য, কিন্তু একথা সত্য রবীন্দ্রনাথের সাংগীতিক আলোচনাগুলি মুখ্যত তাঁর কবিচিত্তের রসাপ্লুত আস্বাদনে অনন্যতা লাভ করেছে। রবীন্দ্রজীবনী-পাঠকের অজ্ঞাত নেই যে, রবীন্দ্রনাথের সংগীতশিক্ষা শাস্ত্রীয় মতেই প্রবর্তিত হয়েছিল এবং হিন্দুস্থানী রাগসংগীত ধ্রুপদ টপ্পা বিভিন্ন রাগরাগিণীর স্বরবিন্যাস কবি ভালো-ভাবেই শিখেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে কবির রাগরাগিণী-সম্পর্কিত আলোচনায় ঔপপত্তিক বা তৌর্যত্রিকবিজ্ঞান সযত্নে কবি পরিহার করেছেন। তথ্যের প্রতি কবির চিরন্তন অবহেলা এই সকল ভারতীয় রাগরাগিণীর অন্তর্নিহিত সত্য ও সৌন্দর্যগুলিকে অন্বেষণ করেছে। ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রে হিন্দুস্থানী রাগরাগিণীগুলির রূপমূর্তিকল্পনা ও ধ্যান আছে। কবি যেন আধুনিক গীতসাধকের মত অন্তর্ভেদী উপলব্ধিতে আমাদের রাগসংগীতগুলির সেই রূপমূর্তি ও ধ্যানকল্পনা করেছেন।

ভারতীয় সংগীতের রাগরাগিণীর তাৎপর্য নিয়ে কবির সম্পূর্ণ আলোচনার সংকলন করা সম্ভব হয়নি, কারণ নানাপ্রসঙ্গে তা ছড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রসম্মত রাগরাগিণীর প্রতি অবজ্ঞা বা নিস্পৃহতা প্রদর্শন করেছেন, এই ধরনের অভিমত যে অভ্রান্ত নয়, রবীন্দ্রনাথের আলোচনাগুলি তা প্রমাণ করবে বলে বিশ্বাস করি।

আমাদের রাগরাগিণীগুলির মধ্যে স্মৃতিউদ্দীপনের অসামান্য ক্ষমতা আছে।

যে গভীর শোক পার্থিব প্রিয়জন-হারানোর মত হৃতসর্বস্ব হৃদয়ে নৈরাশ্যের দুরপনেয় ম্লানিমা বিস্তার করে, সেই শূন্যতার মধ্যে একমাত্র সংগীত, একমাত্র কোনো রাগিণীই পারে বেদনাহীন স্মৃতিরস উদ্রিক্ত করতে। কড়ি ও কোমলের 'যোগিয়া' এবং মানসীর 'ভৈরবী গান' দুটি কবিতাই কোনো নিদারুণ মৃত্যুহত শোকবেদনা থেকে উৎসারিত, উভয় কবিতাই রিক্ত হৃদয়ের বিলাপগীত, উভয়ত্র এই স্মৃতিউদ্দীপনের ভূমিকা দুই প্রভাতী রাগিণীর, যার কোমল-কড়ি পর্দাগুলি জগতের মর্মস্থল থেকে উত্থিত হয়ে বিশ্বের আকাশে বাতাসে আলোকে সৌন্দর্যে নিরাসক্ত বেদনার সুরপ্লাবন ছড়িয়ে দেয়। তখন ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতির দীর্ঘশ্বাস নিবিড় শান্তিতে অনন্ত গগনে ছড়িয়ে পড়ে, সমস্ত আকাশে বাজে চিরচিরহের ক্রন্দন, চিরমিলনের আশ্বাসে অসহায় মানবাত্মা ধীরে ধীরে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। একমাত্র গানের সুরই মৃত্যুকে সংগীতে, শোককে শ্লোকে পরিণত করে। পঞ্চভূতের 'অপূর্ব রামায়ণ' প্রবন্ধে ব্যোমের উক্তি ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে, 'আমাদের এই সকল দেশীয় রাগিণীর মধ্যে একটা পরিব্যাপ্ত মৃত্যুশোকের ভাব আছে'। ঐ প্রবন্ধের মূল ভাবটি ব্যোমের মুখে আবার শোনা যাক—

"যে দিকে মৃত্যু সেই দিকেই জগতের অসীমতা। সেই অনন্ত রহস্যভূমির দিকেই মানুষের সমস্ত কবিতা, সমস্ত সংগীত, সমস্ত ধর্মতন্ত্র, সমস্ত তৃপ্তিহীন বাসনা সমুদ্রপারগামী পক্ষীর মতো নীড় অন্বেষণে উড়িয়া চলিয়াছে।" ইতিমধ্যে অদূরশ্রুত নহবত তখন মূলতান-বারোয়াঁ শেষ করে সূর্যাস্তকালের স্বর্ণাভ অন্ধকারের মধ্যে পূরবী ধরেছিল। সমীরের তৎকালীন উক্তি রবীন্দ্রনাথের কী অবিশ্রান্ত সুদূরগম্ভীর উপলব্ধির নিভৃত গুহার বাণী বহন করে আনল—

"মানুষ মৃত্যুর পারে যে সকল আশাআকাঙ্ক্ষাকে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছে, এই বাঁশির সুরে সেই-সকল চিরাশ্রুসজল হৃদয়ের ধনগুলিকে পুনর্বার মনুষ্যলোকে ফিরাইয়া আনিতেছে। সাহিত্য এবং সংগীত এবং সমস্ত ললিতকলা, মনুষ্যহৃদয়ের সমস্ত নিত্যপদার্থকে মৃত্যুর পরকালপ্রান্ত হইতে ইহজীবনের মাঝখানে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতেছে।"

কড়ি ও কোমলের 'যোগিয়া' কবিতায় যোগিয়া রাগিণী ঠিক এমনি করেই মৃত্যুর পরকালপ্রান্ত থেকে মনুষ্যহৃদয়ের কোন নিত্যপদার্থকে, কোন চিরাশ্রুসজল হৃদয়ের ধনকে ইহলোকের মাঝখানে, শরৎ-আলোর কমলবনে প্রতিষ্ঠিত করেছে—

আজিকে আপন প্রাণে না জানিবা কোনখানে
যোগিয়া রাগিণী গায় কে রে
ধীরে ধীরে স্বর তার মিলাইছে চারিধার
আচ্ছন্ন করিছে প্রভাতেরে।
গাছপালা চারিভিতে সংগীতের মাধুরীতে
মগ্ন হয়ে ধরে স্বপ্নছবি
এ প্রভাত মনে হয় আরেক প্রভাতময়
রচি যেন আর কোনো রবি।
ভাবিতেছি মনে মনে কোথা কোন উপবনে
কী ভাবে সে গাইছে না জানি,
চোখে তার অশ্রুরেখা, একটু দেছে কি দেখা,
ছড়ায়েছে চরণ দুখানি।

সেই অশ্রুরেখ চোখের বিষণ্ণ মূর্তিটি সমস্ত জগতের মাঝখানে অথচ সৌন্দর্যের অসীম দূরত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে কবির প্রিয় রাগিণী যোগিয়া, যেমন করে মানসীর 'ভৈরবী গান' খুলে দিয়েছিল কবির স্মৃতিবেদন দ্বারপথটি। তাই কবির মনে হয়েছিল—

যারে ফেলিয়া এসেছি, মনে করি, তারে
ফিরে দেখে আসি শেষবার
ওই কাঁদিছে সে যেন এলায়ে আকুল
কেশভার।
যারা গৃহছায়ে বসি সজলনয়ন
মুখ মনে পড়ে সে সবার।

ভারতীয় রাগরাগিণীর অনেকগুলিই ছিল কবির অত্যন্ত প্রিয়, তাঁর সাংগীতিক আলোচনা ছাড়াও তাঁর গানে সেইগুলি বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। 'ভৈরবী গান' কবিতায় কবি লিখেছিলেন—

হায় অতৃপ্ত যত মহৎ বাসনা
গোপনমর্মদায়িনী,
এই আপনা মাঝারে শুষ্ক জীবন-
বাহিনী

ওই ভৈরবী দিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া

রচিব নিরাশা কাহিনী।

ভৈরবী কবির অনুরূপ একটি অতিপ্রিয় রাগিণী, অনেক স্থানেই কবি এই সুরের আবেদন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। 'ছন্দের অর্থ' (চৈত্র ১৩২৪) নামক পূর্বোল্লিখিত একটি প্রবন্ধে কবি লিখেছিলেন—'ভৈরবী যেন সমস্ত সৃষ্টির অন্তরতম বিরহব্যাকুলতা। দেশমল্লার যেন যেন অশ্রুগঙ্গোত্রীর কোন্ আদি-নির্ঝরের কলকল্লোল। এতে করে আমাদের চেতনা দেশকালের সীমা পার হয়ে নিজের চঞ্চল প্রাণধারাকে বিরাটের মধ্যে উপলব্ধি করে।' ছিন্নপত্রাবলীর জুন ১৮৮৯, ১৮ জানুয়ারি ১৮৯১, ৫ জুলাই ১৮৯২, ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪, ২১ নভেম্বর ১৮৯৪, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫ এবং ১৫ ডিসেম্বর ১৮৯৫ তারিখের পত্রগুলিতে কবিজীবনের উপর বিভিন্ন রাগরাগিণীর প্রভাব কবি আশ্চর্য ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এইগুলির মধ্যে ভৈরবী মূলতান পূরবী রামকেলি টোড়ি ইমন মল্লার সবই প্রায় আছে। প্রতিটি সুরই কবির কল্পনাপ্রবণ ভাবাবেগপ্লুত চিত্তে হৃদয়বৃত্তির কী বিপুল সঞ্চার ঘটায়, তাঁর গীতসিসৃক্ষাকে প্রকাশোন্মুখ ও বাঙ্ময় করে তোলার প্রেরণারূপে কাজ করে, কবির স্বীকৃতিগুলি তার প্রমাণ। এই পত্রাংশগুলি তাই সুরস্রষ্টা-গীতিকার, এককথায় সংগীতস্রষ্টা কবি সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যের আকর। ধূর্জটিপ্রসাদকে লিখিত একটি পত্রে কবি বলেছিলেন—'আর্টের প্রধান আনন্দ বৈরাগ্যের আনন্দ, তা ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ হর্ষশোক থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। সংগীতে সেই মুক্তির রূপ দেখা গেছে ভৈরোঁতে, তোড়িতে, কল্যাণে, কানাড়ায়।' (সংগীতচিন্তা পৃ ১৭৯)

ভারতীয় রাগরাগিণীর তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা আছে পথের সঞ্চয়ের 'অন্তর-বাহির' প্রবন্ধে। আমাদের রাগরাগিণীর মধ্যে যেইগুলি সময়সূচক, প্রভাতসন্ধ্যা মধ্যরাত্রি বা বর্ষাবসন্তের নির্দেশক, সেইগুলির মধ্যে কবি কোনো গভীর তত্ত্বসংকেত আবিষ্কার করেছেন যা আমাদের তৌর্যত্রিকবিজ্ঞানে নেই। কবির উপলব্ধিতে, ভৈরোঁতে সকালবেলার সমস্ত শব্দ ও নৈঃশব্দ্যের অন্তরতর সংগীতটি গুণীর কানে ধরা পড়েছে। কবির ভাষায়, "বিশ্বেশ্বরের খাসমহলের গোপন নহবতখানায় যে কালে কালে ঋতুতে ঋতুতে নব নব রাগিণী বাজিতেছে, আমাদের গুণীদের অন্তঃকর্ণে তাহা প্রবেশ করিয়াছে। বাহিরের প্রকাশের অন্তরালে যে একটি গভীরতর অন্তরের প্রকাশ আছে, আমাদের দেশের টোড়ি কানাড়া তাহাই জানাইতেছে।"[১২]

ভারতীয় রাগসংগীতের এই গূঢ়তাৎপর্যের ইঙ্গিত সবুজপত্রে প্রকাশিত 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধেও পুনরুক্ত হয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন যে, আমাদের রাগরাগিণীতে এক 'অনির্বচনীয় বিশ্বরসটিকে নানা বড বড আধারে' ধরে রাখা হয়। তাই—"আমাদের কালোয়াতি গানটা ঠিক যেন মানুষের গান নয়, তাহা যেন সমস্ত জগতের। ভৈরোঁ যেন ভোরবেলারে আকাশেরই প্রথম জাগরণ ; পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা, কানাডা যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথবিস্মৃতি ; ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চিরবিরহবেদনা ; মূলতান যেন রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্তিনিশ্বাস ; পূরবী যেন শূন্য-গৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন।"[১৩]

ভারতীয় সংগীতের রাগরাগিণীগুলির এই অভিনব ধ্যানকল্পনা আমাদের সংগীতশাস্ত্রে অভাবনীয়। কোন অনাগত দিনের মহাশিল্পী আমাদের রাগ-রাগিণীগুলির এই মূর্তিকে রঙে রেখায় নতুন করে ফুটিয়ে তুলবেন ? নাকি রবীন্দ্রসংগীতেই রাগসংগীতের এই চরিতার্থতা ঘটেছে ?

রবীন্দ্রনাথের বহু গানের ভাষাতেও রাগরাগিণীর উল্লেখ পাওয়া যায় এবং সেই উল্লেখগুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাগরাগিণীর মূল তাৎপর্যের প্রতি উদ্দিষ্ট। রবীন্দ্রসংগীতের বিপুল সংগ্রহ থেকে রাগরাগিণীবাচক শব্দ ব্যবহারগুলির কয়েকটি এখানে সংকলন করা যেতে পারে—

১. সকালবেলার আলোয় বাজে বিদায়ব্যথার ভৈরবী—

আন বাঁশি তোর, আয় কবি।

২. 'সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে' গানে—

চকিতে ক্ষণে ক্ষণে পাব যে তাহারে
ইমনে কেদারায় বেহাগে বাহারে।

৩. 'যে ছায়ারে ধরব বলে' গানে—

আজ শরতের ছায়ানটে
মোর রাগিণীর মিলন ঘটে

৪ 'ওগো স্বপ্নস্বরূপিণী' গানে—

আজি পরজে বাজে বাঁশি
যেন হৃদয়ে বহুদূরে আবেশ বিহবল সুরে।

৫. 'আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ' গানে—

বাঁশরি বাজাই ললিত-বসন্তে
সুদূর দিগন্তে

৬. ডাকিল মোরে জাগার সাথী—

প্রাণের মাঝে বিভাস বাজে,

প্রভাত হল আঁধার রাতি।

৭. 'আজি ঝরঝর মুখর বাদর-দিনে' গানে—

মেঘমল্লারে সারা দিনমান

বাজে ঝরনার গান।

৮. 'আমার গোধূলিলগন' গানে—

এখন কী শুনি পূরবীর সুরে

কোন দূরে বাঁশি বাজে।

৯. 'ওলো শেফালি' গানে—

আমার সাঁঝে বাজে তোমার করুণ ভূপালি।

১০. 'আলোর অমল কমলখানি' গানে—

ললিত রাগের সুর ঝরে তাই শিউলিদলে।

১১. 'কত কথা তারে ছিল বলিতে' গানে—

কত যে পূরবীরাগে কত ললিতে।

১২. 'দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে পাঠাল' গানে—

ধরো সাহানাতে মিলনের পালা,

সাজাও যতনে বরণের ডালা

১৩. 'উদাসিনী বেশে বিদেশিনী কে সে' গানে—

কোনো বাসা পায় সেই দুরাশায়

গাঁথি সাহানায় বাণী।

১৪. 'ওগো সুন্দর একদা কী জানি' গানে

বিভাসে ললিতে নবীনের বীণা

বেজেছে জলে স্থলে।

১৫. 'আপনি আমার কোনখানে' গানে

পথের বাঁশি যায় কী কয়ে বিকালবেলার মূলতানে।

১৬. 'এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে সবাই জয়ধ্বনি কর' গানে

পূরবীতে করুণ বাঁশরি

দ্বারে বাজবে মধুর স্বর।

১৭. 'কেন রে এতই যাবার ত্বরা' গানে—

বনছায়া গায় শেষ ভৈরবী।

১৮. 'ধূসর জীবনের গোধূলিতে' গানে—

দেখি তার বিরহী মূর্তি বেহাগের তানে

সকরুণ নত নয়ানে।

১৯. 'সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায়' গানে—

শরৎশিশিরে ভিজে ভৈরবী

নীরবে বাজে।

২০. 'এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে' গানে—

মল্লার গানে তব মধুস্বরে

দিক বাণী আনি বনমর্মরে।

২১. 'কোন গহন অরণ্যে তারে' গানে—

ধরা-অধরার মাঝে

ছায়ানটের রাগিণীতে আমার বাঁশি বাজে।

২২. 'বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে' গানে—

উঠে রব ভৈরবতানে।

পবন মল্লারগীত গাহিছে আঁধার রাতে।

অতি নির্মল হাসবিভাসবিকাশ আকাশনীলাম্বুজ-মাঝে

শ্বেত ভুজে শ্বেত বীণা বাজে।

উঠিছে আলাপ মৃদু মধুর বেহাগতানে।

২৩. 'বারে বারে ফিরে ফিরে তোমার পানে' গানে—

ভৈরবী রামকেলি পূরবী কেদারা উচ্ছসি যায় খেলি,

ফেনিয়ে ওঠে জয়জয়ন্তী বাগেশ্রী কানাড়া গানে গানে।

২৪. 'এসো এসো ওগো শ্যামছায়াঘন দিন' গানে—

আনো আনো তব মল্লারমন্দ্রিত বীণ।

৭

প্রথম যৌবনে বিলাত-প্রবাসকালেই রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সংগীতের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত হয়েছিলেন ও তাঁর প্রথম জীবনের গীতচর্চায়, সুরসৃষ্টিতে, বাল্মীকিপ্রতিভা অপেরায় এই সদ্যোলব্ধ প্রতীচ্য সংগীতের প্রভাব পড়েছিল,

রবীন্দ্রসংগীত-জিজ্ঞাসুর কাছে এই সংক্রান্ত তথ্য অজানা নয়। জীবনের অন্যান্য পর্বেও কবি পাশ্চাত্ত্য সংগীতের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, যদিও সে পরিচয়কে গভীর অন্তরঙ্গ বা এমন কিছুই বলা যায় না। তৎসত্ত্বেও কবি তাঁর বুদ্ধি ও উপলব্ধির অনন্যতায় সেই পরিচয় থেকেই বিদেশী সংগীতের মর্মরূপটি বুঝে নিয়েছিলেন ও ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এ বিচার সর্বাঙ্গীণ কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর, কারণ ভারতীয় সংগীতের আদর্শ ও তার চিরায়ত তাৎপর্যকে উদ্‌ভাসিত করার জন্যই প্রতীচী সংগীতের প্রাসঙ্গিক উপস্থাপনা কবির পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল মাত্র।

ইউরোপীয় সংগীত সম্পর্কে এলোমেলো মন্তব্য 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' ও 'ছিন্নপত্রাবলী' থেকে সংকলন করলে একই প্রকার মনোভাব দেখতে পাই। 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'র ১৬ অক্টোবর ১৮৯০ তারিখের দিনলিপিতে কবি লিখেছেন যে, অনেক রাত্রে জাহাজে কিছুক্ষণের জন্য একটি দিশি রাগিণী গুনগুন করে কবি একটি পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেছিলেন। সেই সুরটি সমুদ্র-অন্ধকারের মধ্যে অনায়াসে প্রসারিত হয়ে গেল। কবি এই প্রসঙ্গেই লিখেছেন—

"আমার কাছে ইংরাজি গানের সঙ্গে আমাদের এই প্রধান প্রভেদ ঠেকে যে, ইংরাজি সংগীত লোকালয়ের সংগীত আর আমাদের সংগীত প্রকাণ্ড নির্জন প্রকৃতির অনির্দিষ্ট অনির্বচনীয় বিষাদের সংগীত। কানাড়া টোড়ি প্রভৃতি বড়ো বড়ো রাগিণীর মধ্যে যে গভীরতা আছে সে যেন কোনো ব্যক্তিবিশেষের নয়—সে যেন অকূল অসীমের প্রান্তবর্তী এই সঙ্গীহীন বিশ্বজগতের"।

লক্ষণীয় যে, ইংরাজি সংগীত এবং আমাদের সংগীতের এই তুলনা, উভয়ের পার্থক্যের ভাষাভঙ্গি পরবর্তীকালেও প্রায় অপরিবর্তিতই ছিল। ছিন্নপত্রাবলীর ১০ অগস্ট ১৮৯৪ তারিখের পত্রাংশে দিন ও রাত্রির পারস্পরিক তুলনায় ইউরোপীয় ও ভারতীয় সংগীতই হয়ে উঠেছে কবির উপমান। কবির মনে হয়েছে, 'দিনের জগৎটা য়ুরোপীয় সংগীত, সুরে-বেসুরে খণ্ডে-অংশে মিলে একটা গতিশীল প্রকাণ্ড হার্মানির জটলা—আর রাত্রের জগৎটা আমাদের ভারতবর্ষীয় সংগীত, একটা বিশুদ্ধ করুণ গম্ভীর অমিশ্র রাগিণী। দুটোই আমাদের বিচলিত করে, অথচ দুটো পরস্পরবিরোধী।......আমাদের নির্জন এককের গান, য়ুরোপের সজন লোকালয়ের গান। আমাদের গানে শ্রোতাকে মনুষ্যের প্রতিদিনের সুখদুঃখের সীমা থেকে বের করে নিয়ে নিখিলের মূলে যে একটি

সঙ্গীহীন বৈরাগ্যের দেশ আছে সেইখানে নিয়ে যায়, আর য়ুরোপের সংগীত মনুষ্যের সুখদুঃখের অনন্ত উত্থানপতনের মধ্যে বিচিত্রভাবে নৃত্য করিয়ে নিয়ে চলে'। বলাবাহুল্য এই সিদ্ধান্তের মূলে নূতন কোনো শিক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা নেই, য়ুরোপপ্রবাসীর ডায়ারির মনোভাবই এখানে পুনরাবৃত্ত হয়েছে এবং পরবর্তীকালেও তাই হয়েছে। ইউরোপীয় সংগীতে কণ্ঠের স্বরাধিক্যদ্বারা আবেগপ্রকাশ, অভিনয়চেষ্টার সহায়তায় 'হৃদয়াবেগের নকল' করার মধ্যে যে গভীরতা নেই, পথের সঞ্চয় গ্রন্থের 'অন্তর-বাহির' প্রবন্ধে সে কথা কবি বলেছেন। ইউরোপীয় সংগীতের হার্মনি ও ঐকতান বিপুল ব্যাপার, তা স্তম্ভিত করে, কিন্তু সেই লীলাহীন শক্তিবেগ কবিকে কখনই খুশি করেনি। পথের সঞ্চয়ের 'সংগীত' প্রবন্ধে হার্মনি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

"য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের সংগীতের এক জায়গায মূলত প্রভেদ আছে সত্য। হার্মনি বা স্বরসংগতি যুরোপীয সংগীতের প্রধান বস্তু, আর রাগরাগিণীই আমাদের সংগীতের মুখ্য অবলম্বন। য়ুরোপ বিচিত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছে, আমরা একের দিকে। বিশ্বসংগীতে আমরা দেখিতেছি বিচিত্রের তান সহস্র ধারায় উচ্ছ্বসিত হইতেছে, একটি আর একটির প্রতিধ্বনি নহে, প্রত্যেকেরই নিজস্ব বিশেষত্ব আছে। অথচ সমস্তই এক হইযা আকাশকে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। হার্মনি জগতের সেই বহুরূপের বিরাট নৃত্যলীলাকে স্বর দিয়া দেখাইতেছে। কিন্তু নিশ্চয়ই মাঝখানে একটি রাগিণীর গান চলিতেছে, সেই গানের তানলয়-টিকেই ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য আপনার বিচিত্র গতিকে সার্থক করিয়া তুলিতেছে। আমাদের দেশের সংগীত সেই মাঝখানের গানটিকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। চিরধাবমান বিচিত্রের সঙ্গে যোগ দিয়া তাল রাখিয়া চলাই যুরোপীয় প্রকৃতি, আর চিরনিস্তব্ধ একের দিকে কান পাতিয়া মন রাখিয়া আপনাকে শান্ত করাই আমাদের স্বভাব। য়ুরোপের সংগীতে মানুষের সমস্ত ঢেউখেলার সঙ্গে তাহার তালমানের যোগ আছে, মানুষের হাসিকান্নার সঙ্গে তাহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। আমাদের সংগীত মানুষের জীবনলীলার ভিতর হইতে উঠে না, তাহার বাহির হইতে বহিয়া আসে। সেইজন্য আমাদের সংগীত আমাদের সুখদুঃখকে অতিক্রম করিযা চলিয়া যায়। আমাদের বিবাহের রাত্রে সাহানা বাজে, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রমোদের ঢেউ খেলে না, যৌবনের চাঞ্চল্য নাই; তাহা গম্ভীর, তাহার মিড়ের ভাঁজে ভাঁজে করুণা।..."[১৪]

জীবনস্মৃতির 'বিলাতি সংগীত' অধ্যায়ে এবং পথে ও পথের প্রান্তে ৮ আগস্ট

১৯০০ তারিখের পত্রেও ইউরোপীয় ও ভারতীয় সংগীতের তুলনা প্রসঙ্গে কবির অনুরূপ মতামত প্রকাশিত হয়েছে।

আমাদের শিক্ষাজীবনে সংগীত বর্জিত, 'আমাদের কলেজ নামক কেরানিগিরির কারখানা ঘরে শিল্পসংগীতের কোনো স্থান নাই'—আমাদের বৃত্তির সঙ্গে এই কলাবিদ্যা নিঃসম্পর্ক—একথা রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রবন্ধেই আছে। পথের সঞ্চয়ের 'সংগীত' প্রবন্ধের শেষাংশেও কবি একথা বলেছেন। শান্তিনিকেতনে সংগীতচর্চা অপরিহার্য হোক, শিক্ষার সঙ্গে সংগীতও যে প্রয়োজনীয়, এই বিষযে কবি আমেরিকা থেকে একটি পত্র লেখেন (২৬ ভাদ্র ১৩১৯, দ্র প্রবাসী ১৩৪১ পৌষ)। তাছাড়া ১৯৪২ ফাল্গুনের প্রবাসীতে প্রকাশিত 'শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান' (সংগীতচিন্তায় পুনর্মুদ্রিত পৃ ৭৭) প্রবন্ধেও এই কথা কবি বলেছেন। এই প্রবন্ধে বাঙলা সংগীতের গত দুই এক শতকের সংক্ষিপ্ত ধারাপথটিও কবির আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অষ্টাদশ উনবিংশ শতকে বাঙলাদেশের জনজীবনে উচ্চকোটি ও নিম্নকোটি সংগীতের ব্যাপক চর্চা ও জনপ্রিয়তা ছিল। কবি বলেছেন—"নদীমাতৃক বাঙলাদেশের প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে যেমন ছোট বড নদীনালা স্রোতের জাল বিছিয়ে দিয়েছে, তেমনি বয়েছিল গানের স্রোত নানা ধারায। বাঙালির হৃদয়ে সে রসের দৌত্য করেছে নানা রূপ ধরে। যাত্রা পাঁচালি কথকতা কবির গান কীর্তন মুখরিত করে রেখেছিল সমস্ত দেশকে। লোক সংগীতের এত বৈচিত্র্য আর কোনো দেশে আছে কিনা জানিনে"।

বাঙলার বাউল ভাটিয়ালি প্রভৃতি লোকসংগীতের সঙ্গে কবির যোগ ছিল নিবিড়। এই সম্পর্কে 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—"গ্রাম্য সংগীত বাউলের গান এসবের মার নাই। কেন না, ইহারা যে রসে লালিত সেই জীবনের ধারা চিরদিনই চলিতেছে"। এই প্রবন্ধের অন্যত্রও তিনি এই গানগুলির স্বরবৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাঙলার লোকগীত, বিশেষত বাউল গান ও কবিজীবনের উপর বাউল গানের প্রভাব স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচিতব্য।

১. গানের গান—অমিয় চক্রবর্তী, গীতিবিতান পত্রিকা ১৩৫০

২. কবি দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রা করেন ২০ এপ্রিল ১৮৮১, ৯ বৈশাখ ১২৮৮, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাদ্রাজ থেকে ফিরে আসেন

৩. উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতায় সংগীত-আন্দোলনের বিস্তৃত ইতিহাস বর্তমান গ্রন্থের প্রথম পর্বে বিবৃত হয়েছে

৪. The Origin and Function of Music, in Essays: Scientific, Political and Speculative by Herbert Spencer, vol II. Williams & Norgate, 1891.

৫. ভারতী আষাঢ় ১২৮৮, সংগীতচিন্তায় সংকলিত

৬. গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ—জীবনস্মৃতি, সংগীতচিন্তায় সংকলিত

৭. কিন্তু কবির এই স্বীকৃতি সত্ত্বেও জীবনস্মৃতিতে উদধৃত অংশে পূর্বতম প্রবন্ধের অভিমতের সর্বাত্মক বিরোধিতা ঘটেনি, কিছু মতভেদ ঘটেছে মাত্র। মনে হয়, জীবনস্মৃতির অভিমত পূর্ববর্তী প্রবন্ধের পরিপূরক

৮. রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড পৃ ১৯৫ (১৩৫৫)

৯. সংগীতচিন্তায় উদ্ধৃত, পৃ ১৮১

১০. প্রবাসী চৈত্র ১৩৪৫

১১. শ্রীসাধনা কর—'রবীন্দ্রনাথের সংগীত আলোচনা', গীতবিতান পত্রিকা ১৩৬৮

১২. সংগীতচিন্তা পৃ ৩২

১৩. সংগীতচিন্তা পৃ ৫৩-৫৪

১৪. ভারতী ১৩১৯ অগ্রহায়ণ। রচনাবলীর পাঠের সঙ্গে এই পাঠের সামান্য পার্থক্য আছে

রবীন্দ্রসংগীতের বিষয়বিভাগ

১

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংগীত-সংকলন গীতবিতানের গানগুলি বিষয়ানুসারে সুবিন্যস্ত হওয়ায় গীতিকবিতার মাধুর্যে সেগুলি অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে আছে। এই সঙ্গে সংগীতের ভিতর দিয়ে কবির মনোলোকের ও সারস্বত সাধনার গতিপথটিকে রবীন্দ্রপাঠকের পক্ষে অনুসরণ করা সহজ। গীতবিতান গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণের (১৩৪৬ ভাদ্র) বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"গীতবিতান যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন সংকলনকর্তারা সত্বরতার তাড়নায় গানগুলির মধ্যে বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলাবিধান করতে পারেননি। তাতে কেবল যে ব্যবহারের পক্ষে বিঘ্ন হয়েছিল তা নয়, সাহিত্যের দিক থেকে রসবোধেরও ক্ষতি করেছিল। সেইজন্য এই সংস্করণে ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে গানগুলি সাজানো হয়েছে। এই উপায়ে সুরের সহযোগিতা না পেলেও পাঠকেরা গীতিকাব্যরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানগুলিকে, সুরের সহযোগিতা ব্যতিরেকেও, কাব্যসংগীত অর্থাৎ গীতিকবিতার ধর্মেই পাঠকদের সমাদরের উপকরণরূপে দেখেছিলেন। তাছাড়া গানগুলির মধ্যে 'ভাবের অনুষঙ্গরক্ষা' করার ফলে বিষয়শৃঙ্খলা কেবল রসবোধেরই উন্নতি করে না, কবির চিন্তা-ভাবনার ধারাবাহিকতার সঙ্গেও আমাদের পরিচিত করায়। গীতবিতানের দ্বিতীয় সংস্করণে কবি স্বয়ং এই বিষয়ানুক্রমিকতার রীতি গ্রহণ করায় রবীন্দ্রানুরাগী পাঠকদের পক্ষে অশেষ সৌভাগ্যের কারণ ঘটেছে। যদিও বিষয়ানুসারে গানগুলিকে বিন্যস্ত করার ফলে ঐগুলির ঐতিহাসিক রচনাকালগত ক্রমটি হারিয়ে গেছে, তথাপি কবির স্বরচিত বিষয়নির্দেশে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংগীতগুলি তাঁর কবিধর্মের এক নিগূঢ় নৈয়ায়িক ধারাবাহিকতার অঙ্গীভূত হয়েছে। তাঁর সৃষ্টিকর্মের অসীম বৈচিত্র্যবিলাসের পরিচয় পেয়ে এবং জীবনের বিচিত্র স্থান-কাল-পর্বে রচিত বিচিত্র সংগীতাবলীর ভিতর দিয়ে সংরক্ষিত একটি অদৃশ্য ঐক্যের সূত্রসন্ধান করেও আমরা মুগ্ধ হই। গীতবিতানের প্রতি কবির দুর্বলতা তাই তাঁর স্বয়ংসম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থের সঙ্গেই তুলনীয়।

প্রথম সংস্করণ গীতবিতান প্রকাশের পর দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পর্কে সংকলক এবং সম্পাদনা-সহায়ক সুধীরচন্দ্র করকে কবি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—

"প্রত্যেক পর্যায়ের গান সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত করতে বলেছি। ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের শিরোনামা দেওয়া সম্ভব হয়নি, অথচ ইঙ্গিতে তাদের ভিন্নতা রক্ষিত হয়েছে। সংখ্যামালার পরিবর্তনে পর্যায়ের পরিবর্তন নীরবে নির্দিষ্ট হতে পারবে—ভাবুক লোকের পক্ষে সেই যথেষ্ট।···

অন্য সকল বইয়ের মধ্যে গীতবিতানের দিকেই আমার মনটা সবচেয়ে বেশি তাড়া লাগাচ্ছে—নতুন ধারায় ও একটা নতুন সৃষ্টিরূপেই প্রকাশ পাবে।"[১]

এই পত্র থেকে দেখা যাচ্ছে গীতবিতানের গানগুলিকে কবি কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, যেমন 'পূজা' 'স্বদেশ' 'প্রেম' 'প্রকৃতি' 'আনুষ্ঠানিক' এবং কোনো বিশেষ শ্রেণীভুক্ত নয় বলে 'বিচিত্র'। এদের মধ্যেও বহু সূক্ষ্মতর বিষয়নির্দেশ ছিল, যার শিরোনামা দেওয়া সম্ভব হয়নি, কিন্তু 'ইঙ্গিতে' অর্থাৎ 'সংখ্যামালার পরিবর্তনে' তাদের নীরব পর্যায়-রূপান্তর বোঝানো যেতে পারে। এই উপপর্যায়গুলি ছিল এই প্রকার (বন্ধনীস্থিত সংখ্যা ঐ পর্যায়ের মোট গান)—

পূজা—গান (৩২), বন্ধু (৫৯), প্রার্থনা (৩৬), বিরহ (৪৭), সাধনা ও সংকল্প (১৭), দুঃখ (৪৯), আশ্বাস (১২), অন্তর্মুখে (৬), আত্মবোধন (৫), জাগরণ (২৬), নিঃসংশয় (১০), সাধক (২), উৎসব (৭), আনন্দ (২৫), বিশ্ব (৩৯), বিবিধ (১৪৩), সুন্দর (৩০), বাউল (১৩), পথ (২৫), শেষ (৩৪)।[২]

পূজাপর্যায়ের গানেই এই কবিজনসুলভ বৈচিত্র্য, প্রেম বা প্রকৃতির গানে এই ধরনের সূক্ষ্ম কবিত্বচারু শ্রেণীভেদ নেই।[৩] গীতবিতানে এসে এই শ্রেণীনির্দেশে কবি কতখানি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন, গীতবিতান-পূর্ববর্তী দুখানি গীতসংকলনের সঙ্গে তুলনা করলেই তা বোঝা যাবে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংগীতসংকলন রবিচ্ছায়ার (বৈশাখ ১২৯২) গানগুলি 'বিবিধ সংগীত', 'ব্রহ্মসংগীত' এবং 'জাতীয় সংগীত' এই তিন স্থূল বিষয়নির্দেশে সংকলিত হয়েছিল। প্রবাহিনীর (অগ্রহায়ণ ১৩৩২) গানগুলির বিষয়নির্দেশ ছিল 'গীতগান,' 'প্রত্যাশা', 'পূজা', 'অবসান', 'বিবিধ' ও 'ঋতুচক্র'। সেই তুলনায় গীতবিতানের শ্রেণীভেদ নিঃসন্দেহে সূক্ষ্মতর কাব্যোদ্দেশ্য-প্রণোদিত। যদিও শেষ পর্যন্ত কবি-নির্দেশিত এই পর্যায়বিন্যাস গীতবিতানে রক্ষিত হয়নি।

২

এখন এই কবিনির্দেশিত পর্যায়বিভাগ সম্বন্ধে আমাদের অভিমত প্রকাশ করা যেতে পারে। কবিতার নামকরণে কাব্যপ্রসঙ্গের যে দ্যোতনা আভাসিত হয়, গানের ক্ষেত্রে তার সুযোগ না থাকায়, কোনো কাব্যসংগীত পাঠ্যকবিতারূপে স্বভাবতই বিষয়গত নির্দেশ দাবি করতে পারে। বৈষ্ণব পদাবলীর সংকলয়িতারা যে রসপর্যায়ানুযায়ী কীর্তন সংগ্রহ করতেন, তার সার্থকতা শ্রোতাদের কাছে প্রতিপন্ন হয়েছিল। প্রাচীন কবিওয়ালাদের কাব্যসংগ্রহে স্পষ্টাক্ষরে সখীসংবাদ বিরহ আগমনী ইত্যাদি বিষয়বিভাগের নির্দেশ আছে। উনিশ শতকের শেষ দিকের গীতসংকলনে বিষয়গত বিভাগ অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। উনিশ শতকের পদসংকলনগুলির বিষয়বিভাগ কত সূক্ষ্ম হতে পারে, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত প্রীতিগীতি (১৮৯৮), নরেন্দ্রনাথ দত্ত ও বৈষ্ণবচরণ বসাক সংকলিত সংগীত-কল্পতরু (১৮৮৭), বঙ্গবাসী-সংকলিত সংগীত-সারসংগ্রহ তিন খণ্ড (১৩০৬-১৩০৮), নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সংকলিত সংগীত-সংগ্রহ (১৮৮২), প্রসন্নকুমার সেন সম্পাদিত বিবিধ ধর্মসংগীত (১৯০৭), সাধারণ, নববিধান ও আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত একাধিক ব্রহ্মসংগীত-সংকলনে তার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই সব গীতসংকলনের বিষয়বিভাগ কেবল রসজ্ঞ সম্পাদকের সহৃদয় উপলব্ধি ও আস্বাদনেরই দৃষ্টান্ত নয়, পরন্তু বহুকাল ধরে শ্রোতা ও পাঠকদের কাছে তার উপযোগিতাও পরীক্ষিত সত্য ছিল।

কিন্তু প্রাচীন সংকলন সম্পর্কে এই ধরনের সম্পাদনার আদর্শ বিবেচনা করা গেলেও রবীন্দ্রনাথের আপন কাব্যসৃষ্টির সম্পাদনার ক্ষেত্রে প্রাগুক্ত শ্রেণী-বিন্যাসের যৌক্তিকতা বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোন কাব্য-গ্রন্থে কবিতার বিষয়নির্দেশ করেননি, কেবল কবিতার শিরোনাম রক্ষা করেছেন। একমাত্র মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থাবলী প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ কবিতার স্বতন্ত্র শিরোনামা ছাড়াও বিষয়গত শ্রেণীবিভাগ রক্ষা করেছিলেন— কিন্তু পরবর্তীকালে কোনো কাব্যসংকলনে আর তা অনুসৃত হয়নি। কালের দূরত্বের প্রেক্ষিতে দেখলে পূর্বতন রচনাসামগ্রীর মধ্যে একজাতীয় ভাবের ঐক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা ভাবুক পাঠকের অনুমানসাপেক্ষ রাখলেই তো চলে, কবি কেন সেই বিষয়ে পাঠককে নিয়ন্ত্রিত করবেন ?

গীতবিতানের গানগুলিকে বিষয়ভেদে ভাগ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর

সংগীতগুলিকে কবিত্বের মহৎ ঐশ্বর্যে ভূষিত করেছেন, সংগীতসৃষ্টিকে তাঁর কাব্যসৃষ্টির ঐশীলীলার সঙ্গে যুক্ত করেছেন—এ সত্য আমরা অস্বীকার করতে পারি না। ঈশ্বর মানব ও নিসর্গ এই তিন সাম্রাজ্যেই কবির মুখ্য পর্যটন, গীতবিতানের বিষয়বিভাগ এই সত্যই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। কাব্য এবং সংগীত উভয়ত্রই কবিসত্তার একই পথরেখা ধরে অভিসার, একই মুগ্ধ অভিজ্ঞতায় রোমাঞ্চিত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই পর্যায়নির্দেশ চূড়ান্ত নয়। কবি যাকে পূজা-বিভাগের অন্তর্গত করেছেন, সেইগুলি একান্তভাবে ভগবদ্‌ভক্তিরই তন্ময় প্রকাশ—একথা নির্বিচারে মেনে নিতে মন চায না। বাইরে থেকে যা প্রকৃতিবিষয়ক, তাকে সুস্পষ্টভাষায় প্রেমের গান বলা যায়, এমন উদাহরণ অপ্রতুল নয। আবার প্রেমের গানের স্থান হয়েছে প্রকৃতিপর্যাযে, এরূপ দৃষ্টান্তও তো গীতবিতান-ব্যবহারের অনায়াস-অভিজ্ঞতা। এমন কি, প্রেম ও পূজার মধ্যেও নিযতই হৃদ্‌বিনিময চলেছে। অবশ্য 'যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পূজা।'[৪]—কবির প্রেমপূজা-তত্ত্বের এই সংকেত মেনে নিলে পূজা ও প্রেম-বিযয়ক সংগীতগুলির মধ্যে বিরোধের অবসান কল্পনা করা যায়। প্রকৃতি পর্যাযের অন্তর্ভুক্ত কোনো গান মূলত প্রেমবিষয়ক হলেও প্রত্যক্ষ প্রকৃতির বর্ণনা বা পটভূমিটির জন্যই কবি তাদের প্রকৃতি নামক স্বতন্ত্র শিরো-নামায় চিহ্নিত করেছিলেন বলে মনে হয। কোথাও প্রকৃতির পটে ভগবদুপলব্ধির প্রাধান্য ঘটেছে, কোথাও নিবিড় প্রেমব্যাকুলতার উপর ঋতুর সুগন্ধিজলকণা ও আলো এসে পড়েছে। কোথাও মিলনাকৃতি বা বিরহবেদনার রঙ্গভূমি হয়েছে নিসর্গ। সুতরাং এই জাতীয় কাব্যসংগীতকে কবি কোন্‌ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন, তা তাঁর নিজস্ব অনুভাবনার বিষয বলে এ সম্পর্কে আমরা কোনো সমালোচনার অধিকারী নই।

গীতবিতানের গানগুলির কবিকৃত পর্যায়নির্দেশে পূজাপর্যায়ের গানগুলিতেই বৈচিত্র্য ও সূক্ষ্ম সাদৃশ্যাবিষ্কারপ্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। প্রেম-বিভাগের গানে কেবল 'গান' এবং 'প্রেমবৈচিত্র্য' এই দুটি মাত্র বিষয়নির্দেশ সেই তুলনায় অতৃপ্তিজনক। প্রেমপর্যায়ের মোট গীতসংখ্যা ৩৯৫ এবং 'বিবিধ' ও 'পরিণয়' ব্যতীত পূজাপর্যায়ের গীতসংখ্যা ৫৭৪ (তৃতীয় খণ্ড গীতবিতান এই হিসেবের বহির্ভূত)। অথচ পূজা-বিভাগের মধ্যেই মোট উনিশটি উপবিভাগের উল্লেখ করা হয়েছে। বিভাগগুলি সর্বত্র গীতিবাহুল্যে সমৃদ্ধ নয়। 'অন্তর্মুখে', 'আত্মবোধন', 'নিঃসংশয়,' 'সাধক', 'উৎসব' প্রভৃতি শ্রেণীতে গীতসংখ্যা ঊর্ধ্বতম

দশ এবং নিম্নতম দুই মাত্র। অথচ প্রেমবৈচিত্র্যের গানগুলিতে কবি বিষয়গত কত সাধারণ বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করতে পারতেন! পূজার তুলনায় প্রেমের অনুরূপ বিষয়-বৈচিত্র্য নির্দেশ না করার হেতু নির্দিষ্ট ভাষায় কিছু বলা যায় না। হয়ত প্রেমের শ্রেণীবিভাগ তাঁর কাছে যান্ত্রিক অভ্যস্ত প্রথাগত বলে মনে হয়েছিল। ভাগবত-চেতনার পশ্চাতে প্রেরণার স্বতউৎসার অপেক্ষা প্রয়োজনের তাড়না ছিল বলেই কি সেগুলিকে কবি প্রথানুবদ্ধ বিন্যাসে সাজাতে চেয়েছিলেন? ব্রহ্ম-সংগীতের সংকলনগুলিতে যে ধরনের বিষয়নির্দেশ থাকে, কবি কি সেইগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন? আর প্রেমের গান তাঁর হৃদয়রক্তরাগে অঙ্কিত বলেই কি সেখানে কোন উপশ্রেণীর সুলভ সাদৃশ্য তাঁর কাছে পরিত্যজ্য মনে হয়েছিল? না কি, কেবল সময়াভাব, দ্রুততা, সত্বর প্রকাশের তাড়না প্রেমের গানে বিষয়বিন্যাসের প্রতিবন্ধক ছিল?

এ সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দুর্ভাগ্যবশত আমাদের জানা নেই।

৩

রবীন্দ্রসংগীতের প্রচলিত বিষয়বিভাগের মধ্যে স্বদেশবিষয়ক গান এবং আনুষ্ঠানিক গানগুলি সম্পর্কে বিশেষ কোন মতভেদ দেখা না দেওয়ারই সম্ভাবনা। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনা বিশিষ্ট শর্তে ও সংজ্ঞায় সীমাবদ্ধ ছিল না, তাই তাঁর ব্রহ্মসংগীতও অনেক সময় দেশাত্মবোধক সংগীতরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানে ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীতরূপে গৃহীত 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে' একদা ব্রহ্মসংগীতরূপেই প্রচারিত হয়েছিল। বাঙলা ব্রহ্মসংগীতের সংকলনগ্রন্থগুলিতে স্বদেশ সম্পর্কে যেমন পৃথক্ একটি বিভাগ দেখা যায়, তেমনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমকালীন বা পরবর্তী বহু দেশাত্মবোধক গীতসংকলনে রবীন্দ্রনাথের এমন বহু গান সংকলিত হয়েছিল, যেগুলি বর্তমানে স্বদেশপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। সাময়িক প্রযোজনে, বিষয়ের ভাবৈক্যে বা গায়কের কিংবা শ্রোতার মান-সিকতার আকর্ষণে ব্রহ্মসংগীত বা পূজাসংগীতকে স্বদেশী সংগীতরূপে ব্যবহার করার উদাহরণ বিরল নয়। সুতরাং স্বদেশপর্যায়ের গানগুলিকেও সর্বদা সুনিরূপিত বলে ঘোষণা করতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের দেশচেতনা স্বভাবতই ঈশ্বরচেতনা-বহির্ভূত ছিল না। কবিতার উদ্‌ধৃতি স্মরণ করলে বলা যায়—

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি দেখা দিলে আজ কী বেশে।
দেখিনু তোমারে পূর্ব গগনে, দেখিনু তোমারে স্বদেশে।...

সাগর তোমার পরশি চরণ
পদধূলি সদা করিছে হরণ,
জাহ্নবী তব হার-আভরণ দুলিছে বক্ষ'পর।
হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে, হেরিনু আজিকে নিমেষে—
মিলে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা, মোর সনাতন স্বদেশে।

[উৎসর্গ ১৬ সংখ্যক]

কবির বিশ্বদেবতাই স্বদেশের মূর্তি ধরে কখনও আবির্ভূত, কখনও জীবন-দেবতারূপে। রাজা নাটকের 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে,' প্রায়শ্চিত্তের 'রইল বলে রাখলে কারে' দেশাত্মবোধক আবহে রচিত হয়নি, তবু কবি সে দুটিকে স্বদেশপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। স্বদেশ-বিভাগের একাধিক গান আত্মিক জাগরণের বক্তব্যেই দেশাত্মবোধক গানরূপে গৃহীত হয়েছে ; যেমন 'সংকোচের বিহ্বলতা,' 'নাই নাই ভয়,' 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা' প্রভৃতি। 'চলো যাই' এবং 'শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান' এই দুটি গান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে রচিত, একথা মনে রাখলে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে এদের প্রত্যক্ষ যোগ স্বীকার করা যায় না।[৫] অন্যদিকে পূজাপর্যায়ের অনেকগুলি গানই দেশচেতনার সঙ্গে যুক্ত করে আমরা ব্যবহার করে থাকি। 'মরণসাগরপারে তোমরা অমর,' গানটি দেশপ্রেমিক শহিদের স্মৃতি উপলক্ষে সুপরিচিত গান হয়ে গেছে। 'এ দিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার' স্বাধীনতাদিবসের বা অনুরূপ উৎসবের উদ্বোধনসংগীতরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'ওগো পথের সাথি নমি বারম্বার', 'কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ,' তোমারই নামে নয়ন মেলিনু,' 'তোমারই গেহে পালিছ স্নেহে' 'ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়,' 'হবে জয় হবে জয়,' 'জয় হোক জয় হোক,' 'তোমার পতাকা যারে দাও' প্রভৃতি এলোমেলো-মনে-আসা অসংখ্য গান কোনো-না-কোনো ভাবে আমাদের জাতীয় চেতনা ও ঐতিহ্যসূচক উৎস-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ-নির্দেশিত গীতবিতানের স্বদেশপর্যায় যে চূড়ান্ত নয়, রবীন্দ্রসংগীতপ্রিয় শ্রোতা ও গায়কের ব্যবহারিক স্বাধীনতাই তার প্রমাণ।

অনুরূপভাবে পূজার গান সম্পর্কেও একাধিক প্রশ্ন তোলা যায়। উপশ্রেণীর সূক্ষ্ম বিচারে দেখা যায় কবি 'জাগরণে'র মাধ্যমে যার স্থান নির্দেশ করেছেন, 'আত্মবোধনে'ও তার স্থাননির্দেশ চলতে পারে। 'বন্ধু'-পর্যায়ের অনুরূপ গান

পূজার একাধিক উপবিভাগেই প্রাপ্তব্য। প্রকৃতির তথা ঋতুর, বিশেষত বর্ষা ও বসন্তবিভাগের অধিকাংশ সংগীতই প্রেমের গান। প্রেমের তীব্রতা, বিরহবেদনার নিঃসীম আকৃতি, মিলনের অসহ উৎকণ্ঠা বর্ষার অবিশ্রাম বারিধারাকে ছাপিয়ে দিয়ে আমাদের আচ্ছন্ন করে তোলে। আবার এমন বহু গান প্রেমপর্যায়ের অন্তর্গত হয়েছে, যেগুলি একই কারণে বর্ষা বা বসন্তের অন্তর্গত হতে পারত। 'মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম' বর্ষা ঋতুর অন্তর্গত হতে পারে, তবে 'অনেক কথা বলেছিলেম' অথবা 'বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে' কেন যে প্রেমবিভাগের অন্তর্গত, তা একমাত্র কবিই বলতে পারতেন।

সুতরাং আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারে, আমাদের আনন্দঘন চেতনায়, আমাদের ভাবানুকূল্যে রবীন্দ্রসংগীতকে আমরা নানাভাবেই ব্যবহার করে থাকি এবং রবীন্দ্রনাথই স্বয়ং তার পথ দেখিয়েছেন। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু সংগীতের রচনাকালীন প্রেরণা অবহেলা করে গানগুলিকে স্বেচ্ছায় ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে নির্বাসিত করেছেন। উত্তরকালে পাঠক বা শ্রোতাকে ভিন্নপথে চালিত করার কবিকৃত এই আয়োজনকে আমরা পুরস্কাররূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' ভগ্নহৃদয়ের উৎসর্গে সমর্পিত এই ব্যক্তিগত অনুরক্ত গীতিকবিতাকে কবি স্বয়ং একদা মাঘোৎসবের ব্রহ্মসংগীতরূপে প্রচার করে, পুনরায় গীতবিতানে প্রেমপর্যায়ে পুনর্বাসিত করেছেন।[৬] কিন্তু এমন কত গান তাঁর ভালোবাসার হৃদয়-শোণিমায় অনুরঞ্জিত হয়েও পূজার অস্থায়ী উপনিবেশে প্রহর গণনা করছে তার সন্ধান কে দেবে? কেমন করে সেগুলিকে পূজা থেকে প্রেমে স্থানান্তরিত করা যাবে? যে আত্মজীবনের অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতায় 'ছবি' কবিতা রচিত হয়েছিল, শাপমোচনে সেই 'ছবি' কবিতার খণ্ডিত গীতরূপ 'তুমি কি কেবলই ছবি' কি গানরূপে সার্থক? দস্যুর লুব্ধ দৃষ্টি থেকে রক্ষা করার তাড়নায় কৃপণ বৃক্ষতলে তার সযত্নসঞ্চিত ধনরত্ন লুকিয়ে রেখে চিহ্নলুপ্তির কারণে পরে নিজেই সেই হৃতসম্পদ খুঁজে মরে। রবীন্দ্রসংগীত-গুলিকেও রচনাকালের বিশেষ উপলক্ষ, হেতু বা প্রেরণা গোপন করার জন্য যেন দ্রুততাবশত বিভিন্ন পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মনে হয় কবিও স্বয়ং পরবর্তীকালে সেইগুলি বিস্মৃত হয়ে ব্যগ্র হয়ে তাদেব অন্বেষণ করে বেড়িয়েছেন। 'গান গেয়ে কে জানায় আপন বেদনা'—কিন্তু কোন বেদনা কখন কেমন করে গান হয়ে উঠল, ক্ষতবক্ষ হৃদয়ের কোন শোক শ্লোকরূপ ধারণ

করল, বিপুল গীতসংগ্রহে তা জানার কোন উপায়ই কবি রাখেননি—এ অনুতাপ দুরপনেয় হয়েই থাকবে। প্রতিটি সংগীত সম্পর্কেই যেন কবির গানের ভাষায় বলা যায়—

বাহির আমার শুক্তি যেন কঠিন আবরণ—
অন্তরে মোর তোমার লাগি একটি কান্না-ধন।

কিন্তু সেই কান্নাধনটিকে বাহিরের শুক্তি ভেঙে উদ্ধার করার পথ আমাদের জানা নেই!

অতএব গীতবিতানের অন্য কোনরূপ বিষয়বিভাগের অভাবে, বিকল্প পরিকল্পনার সংহতির দৈন্যে, কবিকল্পিত বিষয়নির্দেশই আমরা গ্রহণ করতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় সংগীতের কালানুক্রমিক তালিকা ও রচনা-কালগত সর্বপ্রকার তথ্যাদি প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত গীতবিতানের প্রচলিত বিষয়-নির্দেশকেই আমরা গ্রহণ করতে অঙ্গীকৃত থাকব।

১। ২৩শে বৈশাখ ১৩৪৫, সুধীরচন্দ্র করের 'কবিকথা'য় উদ্ধৃত

২। গীতবিতান ৩য় খণ্ড, পৃ ৯৬৩, আশ্বিন ১৩৬৭ সংস্করণ। এই সঙ্গে পরিণয় পর্যায়ে ৯টি গান ছিল

৩। প্রেমপর্যায়ের শ্রেণীবিন্যাস—গান (২৭) প্রেমবৈচিত্র্য (৩৬৮)। প্রকৃতিপর্যায়ের শ্রেণীবিন্যাস—সাধারণ (৯), গ্রীষ্ম (১৬), বর্ষা (১১৫), শরৎ (৩০), হেমন্ত (৫), শীত (১২) বসন্ত, (৯৬)

৪। চৈতালি—'পুণ্যের হিসাব'

৫। 'শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান' গানটির রচনা ১৩৪৩ মাঘোৎসবে, অর্থাৎ সেই উৎসবও গানটির অন্যতম উপলক্ষ ছিল

৬। "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা—ভারতী ১২৮৭ কার্তিক ৩৩৭ ভগ্নহৃদয় (গীতিকাব্য) উপহার, রাগিণী ছায়ানট, 'শ্রীমতী হে,-কে', ভারতীতে প্রকাশকালে ১০ পঙক্তির গান মুদ্রিত। 'ভগ্নহৃদয়' পুস্তকাকারে প্রকাশকালে (১২৮৮ বৈশাখ) এই গানটির পরিবর্তে পাঁচ স্তবকে ৩০ পঙক্তির কবিতা রচিত হয়। পরে প্রথম ৮ পঙক্তি ব্রহ্মসংগীতরূপে ১২৮৭ সালের মাঘোৎসবে গীত হয়, দ্র, তত্ত্ববোধিনী ১৮০২ শক (১২৮৭) ফাল্গুন ২১১। মালতী পুঁথি ৪৪। রবি (ব্রহ্ম ৪১) ১৩২ রাগিণী আলাহিয়া—তাল ঝাঁপতাল। স্বর ২৩।" (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী ১ম খণ্ড

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ ও সংগীত

১

রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা এবং কাব্যসংগীত একই পল্লবের যুগ্মকিশলয়। তাঁর কাব্যজীবনের সূচনালগ্ন থেকেই দেখি স্বতন্ত্রভাবে সংগীতরচনা ছাড়াও তিনি কাব্যগ্রন্থের একাধিক কবিতায় সুরারোপ করে তাদের সংগীত করে তুলেছেন অথবা সুরাশ্রিত কাব্যগীতিকে গীতিকবিতারূপে কাব্যগ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। সাধারণত সুরের সহযোগিতায় কাব্যের বাণী অনির্বচনীয়তা লাভ করে বলে গানের ভাষা পঠনীয় কবিতারূপে আপনার দৈন্যকে গোপন করতে পারে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সুরব্যতিরিক্ত কাব্যগীতগুলির মধ্যেই গীতিধর্মিতার নীরব আবেদন পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে। তাঁর প্রথম জীবনের কাব্যগ্রন্থগুলিতে সংগীত ও গান শব্দদ্বয়ের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয়। সংগীত শব্দটি যেন তাঁর কবিজীবনের উষালগ্নের ধ্রুবপদ—বারবার ঘুরে এসেছে। সন্ধ্যাসংগীত প্রভাতসংগীত কাব্যগ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও নামকরণে সংগীত শব্দের প্রতি কবির দুর্বলতা মনে রাখার যোগ্য। তাছাড়া ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল এই নাম দুটিতেও গান ও গানের অনুষঙ্গ রয়েছে। সন্ধ্যাসংগীতে 'পরাজয়-সংগীত' 'গান সমাপন', 'গান আরম্ভ', 'সংগ্রাম সংগীত', 'হৃদয়ের গীতধ্বনি,' 'কেন গান গাই', 'কেন গান শুনাই'—প্রভৃতি কবিতার নামকরণে গান শব্দের পুনঃপুন ব্যবহার তাৎপর্যময়। প্রথম জীবনের কাব্যসাধনা কবির কাছে কিশোর কণ্ঠের গীতচর্চা বলেই গৃহীত হয়েছে—কবিতা ও গানে এই পর্বে সূক্ষ্ম শিল্পগত প্রভেদ নেই। সন্ধ্যাসংগীতের প্রথম কবিতা 'সন্ধ্যা'য় গান শব্দটি অন্তত নয় বার ব্যবহৃত হয়েছে। 'গান আরম্ভ' কবিতায় কবির প্রথম জীবনের কাব্য-সূচনাকে সংগীতসাধনা বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ 'টলমল মেঘের মাঝারে' ঘর বেঁধে অনন্ত আকাশের কোলে কবি যে কবিতা সুরু করেছেন, তারই নাম 'গান আরম্ভ'। 'হৃদয়ের গীতধ্বনি' কবিতার সূচনাতেও সেই একই গানের অনুষঙ্গ—

> ও কী সুরে গান গাস হৃদয় আমার ?
> শীত নাই গ্রীষ্ম নাই বসন্ত শরৎ নাই,
> দিন নাই রাত্রি নাই—অবিরাম অনিবার
> ও কী সুরে গান গাস হৃদয় আমার ?…

বসিয়া বসিয়া সেথা বিশীর্ণ মলিন প্রাণ
গাহিতেছে একই গান একই গান একই গান
পারিনে শুনিতে আর একই গান একই গান।

সন্ধ্যাসংগীতে মোট ৫৮ বার গান শব্দটির ব্যবহার আছে। কেবল গানই নয়, সংগীত গীতি স্বর গাওয়া গাহে গাহি গাবে গীতোচ্ছ্বাস প্রভৃতি সংগীত-সংক্রান্ত শব্দও সন্ধ্যাসংগীত এবং পরবর্তী প্রায় প্রতিটি কাব্যেই ছড়িযে আছে।[১] সন্ধ্যাসংগীত থেকেই রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্য সংগীতমুখী। অবশ্য সে সংগীত অন্তর্মুখী—তাই যথার্থ গীতিকবিতা, যা বক্তার ইচ্ছা হয়ে স্বরের আকাঙ্ক্ষা জাগিযে তোলে, তারই ভাবরূপ তাঁর কিশোর বয়সের কবিতায় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংগীত যেমন স্বরের অরূপ লোক থেকে গীতিকবিতার বাঙ্ময় রূপলোকে নেমে এসেছে, রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা তেমনি বাক্‌সাম্রাজ্য থেকে স্বরের অসীম অনন্তের দিকে অভিসারী। একটিতে গান থেকে কবিতা আর একটিতে কবিতা থেকে গান।

এইরূপ কবিতা থেকে গানের উদাহরণগুলিই অধুনা আমাদের আলোচ্য। কবিতার প্রারম্ভিক রচনা সংগীতে উত্তীর্ণ হওযার স্তরগুলি যথাক্রমে আলো-চিতব্য।

২

ছবি ও গান (১২৯০) থেকেই দেখা যায রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থে সংগীত অবিচল প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কেবল শব্দ বা অনুষঙ্গে নয়, এক একটি গোটা কবিতাকেই স্বর এসে গ্রাস করেছে। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবন পর্যন্ত দেখা যায় যে তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির বহু কবিতাই যুগপৎ কবিতা এবং স্বতন্ত্রভাবে রবীন্দ্র-সংগীত। ছবি ও গানের নিম্নলিখিত কবিতাগুলিতে স্বর সংযোজিত হযেছে এবং সেগুলি যথাযথভাবে অথবা ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে রবীন্দ্রসংগীতরূপে পরিচিত—

আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে (কে?)
ওই জানালার কাছে বসে আছে (সুখস্বপ্ন)

এমন কি, কোনো কোনো কবিতায় স্বর সংযোজিত না হলেও যেন একপ্রকার অশ্রুত গীতধ্বনি বাণীতে ও ছন্দে সঞ্চারিত হয়েছে। বস্তুত ছবি ও গান কাব্যরচনার মূলে যে প্রেরণা উদ্দীপ্ত ও সঞ্চরমান ছিল, তা গানেরই

প্রেরণা। রূপদর্শনের ব্যাকুলতা আর সুরে তাকে প্রকাশ করার দুর্দম ইচ্ছা—এই নিয়েই ছবি ও গান। প্রমথ চৌধুরীকে পরবর্তীকালে একটি পত্রে কবি লিখেছিলেন—

"আমার ছবি ও গান আমি যে কী মাতাল হয়ে লিখেছিলুম······আমি তখন দিনরাত পাগল হয়ে ছিলুম।··আমার সমস্ত শরীরে মনে নবযৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মত এসে পড়েছিল।··· একটা বাতাসের হিল্লোলে একরাত্রির মধ্যে কতকগুলো ফুল মায়ামন্ত্রবলে ফুটে উঠেছিল, তার মধ্যে ফলের লক্ষণ কিছু ছিল না।"[২]

এই উদ্‌ভিন্ন ব্যাকুলতা কেবল কথায় সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, তাই কথাকে অতিক্রম করে সে সুর হয়ে উঠেছে আর সে সুর গানের প্রচলিত আঙ্গিককে অনুসরণ করেনি, তা যেন কবিতা-পাঠেরই একটি অতিরিক্ত সুর। 'কে?' কবিতাটি তার উদাহরণ—

আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মত।
সে যে ছুঁয়ে গেল নুয়ে গেল রে,
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত।···
আমি কোথায় যাব কোথায় যাব,
ভাবতেছি তাই একলা বসে।[৩]

লক্ষণীয় যে, এই গানে কবিতার বাণীরূপ পরিবর্তিত হয়নি, স্তবক ছন্দোবন্ধে কোনো রূপান্তর ঘটেনি, কবিতা হিসাবে এর পূর্ণ বয়ান সংগীতরূপেও অপরিবর্তিত। কেবল কবিতার অন্তরে যে গানের আবেগ, তাই একে গুঞ্জরিত করেছে। সুর এখানে কবিতার বাহন মাত্র। কিন্তু 'সুখস্বপ্ন' (ওই জানালার কাছে বসে আছে) গানে রূপান্তরকালে ঈষৎ পরিবর্তিত হয়েছে।[৪]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর দুটি পদ 'আজু সখী মুহু মুহু' এবং 'মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান' ছবি ও গানের প্রথম সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। কড়ি ও কোমলের প্রথম সংস্করণে 'কো তুহুঁ বোলবি মোয়' পদটিও ছিল, সম্ভবত এটিতে কবি সুরারোপ করেননি।[৫] ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর সব পদই সংগীত নয়। আর যেগুলি সংগীতরূপে পরিচিত সেগুলির সুরও রচনাকালের সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়া হয়েছিল কিনা সন্দেহ। মোটের উপর আলোচ্য পদগুলি কবিতারূপেই কবির কাছে গ্রাহ্য

ছিল—তাই কড়ি ও কোমল বা ছবি ও গানের সঙ্গেই তাদের সহাবস্থান ঘটেছিল। ক্রমশ এইগুলির গীতিমূল্য যখন কবির কাছে তীব্রতর হয়েছে, তখনই কাব্যগ্রন্থ থেকে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদ বিচ্ছিন্ন করে আনা হয়েছে ও সেগুলির উপর যথাসম্ভব স্বরারোগ করে তাদের গীতরূপ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

কড়ি ও কোমলের (১২৯৩) 'প্রাণ' কবিতায় কবি তাঁর কবিজীবনের যে সার্থকতা ও সাধনার উল্লেখ করেছেন, এবং আশুতোষ চৌধুরী যে কবিতাটিকে কড়ি ও কোমলের ভূমিকাস্বরূপ স্থাপন করেছিলেন, সেই প্রাণ কবিতাতেও সংগীতরচনার সঙ্গে কবির কাব্যসাধনার একাত্মতা স্থাপিত হয়েছে—

মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়।...
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।

গানের সুর চিরকালই কবির কাছে স্মৃতিগন্ধবহ। গানের সুর এই চেনা জগতের উপর অচেনার আবরণ বিছিয়ে দেয়, গানের সুর বর্তমান থেকে কবিকে এক কালচিহ্নহীন লোকে নিয়ে যায়। কড়ি ও কোমলের 'যোগিয়া' কবিতার তার পরিচয় আছে। যোগিযার করুণ মূর্ছনা কবিকে আর একদিনের প্রভাতে নিয়ে গেছে। সংগীতের মাধুরীতেই মগ্নছবি সেই সকালের অন্তরালে একটি মাধুরী মূর্তি ভেসে উঠেছে ধীরে ধীরে—

ভাবিতেছি মনে মনে   কোথা কোন উপবনে
কীভাবে সে গাইছে না জানি,
চোখে তার অশ্রুরেখা,   একটু দেছে কি দেখা,
ছড়াযেছে চরণ দুখানি।
তার কি পাযের কাছে   বাঁশিটি পড়িযা আছে—
আলোছাযা পড়েছে কপোলে।
মলিন মালাটি তুলি   ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি
ভাসাইছে সরসীর জলে।

কড়ি ও কোমলের নিম্নলিখিত কবিতাগুলি গানে পরিণত হয়েছে—

বাঁশরি বাজাতে চাই বাঁশরি বাজিল কই (মথুরায়), কখন বসন্ত গেল এবার হল না গান (বসন্ত অবসান), আমি নিশিনিশি কত রচিব শয়ন (বিরহ), ওগো এত প্রেম আশা প্রাণের তিয়াসা (বিলাপ), হেলাফেলা সারাবেলা

একী খেলা (সারাবেলা), আজি শরৎতপনে প্রভাত স্বপনে (আকাঙ্ক্ষা), তুমি কোন কাননের ফুল (তুমি), ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে (গান), আমি ধরা দিয়েছি গো আকাশের পাখি (হৃদয়-আকাশ), এ শুধু অলস মায়া এ শুধু মেঘের খেলা (গানরচনা), কেন চেয়ে আছ গো মা মুখ পানে (বঙ্গভূমির প্রতি), আমায় বোল না গাহিতে বোল না (বঙ্গবাসীর প্রতি)।

এই তালিকায় মথুরায়, বাঁশি, বিরহ, বিলাপ, সারাবেলা, আকাঙ্ক্ষা, তুমি, গানরচনা প্রভৃতি কবিতা সেইগুলির সংগীতরূপের সঙ্গে অভিন্ন। বসন্ত-অবসানের তৃতীয় স্তবক গানে বর্জিত হযেছে। কিন্তু হৃদয-আকাশের মূল কবিতা ও গানে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।[৬] কড়ি ও কোমলের যে কবিতাগুলি গানরূপে পরিচিত সেগুলির কাব্যরূপের সঙ্গে যে গানের বিশেষ পার্থক্য নেই তার একমাত্র কারণ, কবি সেগুলি যুগপৎ কাব্য ও গানের প্রেরণাতেই লিখেছিলেন। 'গান' (ওগো কে যায বাঁশরি বাজায়ে) স্পষ্টই গানরূপে নির্দেশিত। অন্যগুলি গান নামে পরিচিত না হলেও তাদের সাংগীতিকরূপ সম্পর্কে দ্বিধার কারণ নেই। 'বাঁশি' গানের ছন্দেই লেখা, 'আকাঙ্ক্ষা' ও 'তুমি' সম্পর্কেও এ কথা সত্য। কড়ি ও কোমলের যুগে কবির কাব্যধর্ম সুরের প্রেরণায় উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, তাই ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্র-কবিতায (মঙ্গলগীত ৩) কবি একাধিকবার আপনার কাব্য সম্পর্কে গান শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যথা—

> যদি যাই, মৃত্যু যদি নিযে যায় ডাকি,
> এই গানে রেখে যাব মোর স্নেহ-আঁখি।
> যবে হায সব গান
> হয়ে যাবে অবসান,
> এ গানের মাঝে আমি যেন বেঁচে থাকি।

'হৃদয়-আকাশ' (আমি ধরা দিযেছি গো) কবিতাটি মূলত একটি সনেট, কবি তারই উপর সুরারোপ করার জন্য সনেটের দৃঢ়পিনদ্ধ গঠন রক্ষা করতে পারেননি, ঈষৎ পরিবর্তিত করে নিয়েছেন, অথচ গানের আঙ্গিক রক্ষিত হয়নি, কেবল চরণান্ত মিলবিন্যাস গানের মত। সনেটের মত কবিতাকে সংগীতে পরিণত করা কবির পক্ষে প্রথম দুরূহ প্রয়াস। 'এ শুধু অলস মায়া'ও ষোড়শ-অক্ষর তানপ্রধান ছন্দে অষ্টমাত্রিক ও দ্বিপর্বিক চরণে রচিত দীর্ঘ কবিতা। এর সঙ্গে সংগীতের কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ এই দীর্ঘ কবিতার উপর

আবৃত্তির মত স্বর যোজনা করে এমন একটি অলস বিষাদ-বৈরাগ্যের গম্ভীর মন্দ্রধ্বনি নির্মাণ করা হয়েছে যা রবীন্দ্রসংগীতের একটি সম্পদ হয়ে থাকবে। কবিতারচনার অনেক পরে অবশ্য এই স্বরযোজনা হয়েছিল।[৭] আরও পরবর্তীকালে কবি এই গানটিকে শাপমোচন (১৩৩৮) নৃত্যনাট্যের ভূমিকাস্বরূপ ব্যবহার করেছিলেন, সেখানে গানটির একটি ব্যাখ্যাও আছে।[৮]

৩

মানসী (১২৯৭) কাব্যগ্রন্থেই কবি স্বরাশ্রিত কবিতার বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে গীতিকবিতার স্বয়ংনির্ভরতায় প্রতিষ্ঠিত হলেন। তথাপি মানসীর অনেকগুলি কবিতা অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে কবির সাংগীতিক পরীক্ষার উপকরণরূপে গৃহীত হয়েছে। যথা—

কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া (ভুলে), আবার মোরে পাগল করে দিবে কে (শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা), তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে (তবু), এমন দিনে তারে বলা যায় (বর্ষার দিনে)।

প্রথম দুটি রচনা মূলত কবিতাই, পরে স্বরারোপ করা হয়েছে এবং গানের আঙ্গিক রক্ষিত হয়নি। এই দুটিকে স্বরার্পিত কবিতা বলা যায়।[৯] মানসীর 'তবু' (তবু মনে রেখো) প্রকৃত পক্ষে একটি সনেট, সুতরাং গানে তার বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। ইতিপূর্বে কড়ি ও কোমলের 'হৃদয়-আকাশ' (আমি ধরা দিগেছি গো) সনেটটিতে কবি স্বরারোপিত করেছিলেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে মূল কবিতার চরণ পরিবর্তনের প্রয়োজন ঘটেনি, সনেটের অক্‌টেভ বা প্রথম আটটি চরণকেই যথাযথ গ্রহণ করে গানটি রচনা করেছিলেন। কিন্তু 'তবু' সনেটটিকে গানে রূপান্তরিত করতে যথেষ্ট পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। বলা যায় মূল কবিতার ভাবটুকু মাত্র নিগে এখানে গানটি নতুন করে গড়ে উঠেছে। অথচ গানে স্বরের শাসন মেনে চলার জন্য বাণী বা ছন্দে নৈরাশ্য আসেনি। পরন্তু গানে একটি নতুন লিরিক গড়ে উঠেছে তার নিজস্ব ছন্দে। স্বরের গভীর বেদনাসৃষ্টিতে, হৃদয়মথিত স্মৃতিভারব্যাকুল দীর্ঘশ্বাস রচনায় এখানে একটি অপূর্ব গীতিরস জমে উঠেছে যা সনেটটিতে দুর্লভ ছিল। অথচ সনেটটিতেই 'তবু মনে রেখো' এই বাক্যাংশটি চারবার ব্যবহৃত হয়েছে, গানেও চারবার। সুতরাং মূল কবিতায় চতুর্দশপদীর শাসনে নিয়ন্ত্রণে ও বন্ধনে যে স্মৃতিব্যাকুল আতুরতা বন্দী

হয়ে ছিল, তাকেই যেন গানে কবি মুক্তি দিয়েছেন। এটি রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ গান তাতে সন্দেহ নেই।[১০]

'এমন দিনে তারে বলা যায়' কবির একটি সুপরিচিত বর্ষাসংগীত, ভানু-সিংহের পদাবলীর অন্তর্গত দুএকটি গান ব্যতীত এবং নাট্যসংগীত ব্যতীত সম্ভবত এটিই কবির প্রথম বর্ষাগীতি, যা কবিতা থেকে রূপান্তরিত। কবিতাটির উপর সুরারোপেই গানের জন্ম হযেছে, তার জন্য কবিতাকে পরিবর্তিত বা সংশোধিত করতে হয়নি, কেবল গানের আয়তন-সংযমের জন্য মূল কবিতার চতুর্থ এবং ষষ্ঠ স্তবক বর্জিত হয়েছে এবং গানে প্রথম স্তবকে 'এমন দিনে মন খোলা যায়' ৩য় চরণে নতুন এই পঙক্তিটি সন্নিবিষ্ট হয়ে ভাবগভীরতাকে আরও নিপুণ করা হয়েছে।[১১]

সোনার তরী (১৩০০) রবীন্দ্রনাথের পরিণত যৌবন ও সান্দ্র প্রতিভার কাব্য। যথার্থ পাঠ্য গীতিকবিতার ঘনরসগভীর আবেদন এই পর্ব থেকেই রবীন্দ্রনাথ কবিতার মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চার করতে পেরেছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সোনারতরী কাব্যে সংগীতকার রবীন্দ্রনাথ একেবারে হারিয়ে যাননি। সোনার তরী কেবল কাব্যের যুগ নয়, গানেরও যুগ। এই পর্বে কবির পদ্মা-আলিঙ্গিত জীবনে *গীতিপ্রতিভাও* যে *বিকশিত* হযেছিল, সমকালীন ছিন্নপত্রাবলীতে তার স্বীকৃতি আছে। যে অজ্ঞাতপরিচয় নাবিক স্বর্ণতরীর কর্ণধাররূপে এই যুগে কবির কাছে সোনার ধান সংগ্রহ করতে এসেছিলেন, তাঁর কণ্ঠে ছিল গান—'গান গেয়ে তরী বেযে কে আসে পারে'; কবিও কি গান ছাড়া তার প্রত্যুত্তর দিতে পারেন? সোনার তরীর এই কবিতাগুলি সংগীতে রূপান্তরিত হয়েছে—তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও (তোমরা ও আমরা), খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে (দুইপাখি), আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় (ব্যর্থ যৌবন), যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ (হৃদয়যমুনা)।

'তোমরা ও আমরা' কবিতা সুরযোজনার ফলে গানে পরিণত, মূল কবিতার ৩য়-৪র্থ স্তবক গানে বর্জিত হওয়ায় গানটি আরও সংহত হয়েছে। 'খাঁচার পাখি ছিল' কবিতার কোনো চরণই গীতরূপে পরিত্যক্ত হয়নি। উভয় কবিতার সুরই গানের কাব্যধর্মকে যথাযথ রক্ষা করে প্রদত্ত—যেন সম্পূর্ণ কবিতা সুরে গীত হচ্ছে মাত্র। 'ব্যর্থ যৌবন' কবিতায় সংগীতের সম্ভাবনা পূর্বলিখিত কবিতাগুলির চেয়ে বেশি, সুতরাং 'তোমরা ও আমরা' বা 'দুই পাখি'র তুলনায় 'আজি যে রজনী যায়' গানটি আরও সার্থক হয়েছে। তবে এখানেও কবিতার

তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবক বর্জিত হয়েছে। ফলে গানটি যথারীতি গাঢ়বদ্ধ ও বিষাদ-ঘন হয়ে উঠেছে। ব্যর্থ যৌবনের বিপুল আর্তনাদ উৎকণ্ঠিতা নায়িকার মুখে সঞ্চার করা হয়েছে প্রথম পঙক্তির কম্পমান সুরে। এটিও কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ গান, কেবল কবিতার সুরানুবাদ মাত্র নয়।

চিত্রার (১৩০২) কয়েকটি কবিতাতেও কবি সুর আরোপ করেছিলেন, যদিও সেইগুলি কবির নানা বয়সের বিচিত্র পরীক্ষার উদাহরণ হয়ে আছে, তাই সংগীত হিসাবে অন্যান্য গানের মত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। যেমন—নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ (উর্বশী), একদা প্রাতে কুঞ্জতলে অন্ধ বালিকা (নারীর দান), কেন নিবে গেল বাতি (দুরাকাঙ্ক্ষা)।

'উর্বশী' কবিতায় সুরযোজনা নিতান্তই পরীক্ষা। গদ্যধর্মী কবিতার উপরও সুর প্রয়োগ করে কবি যে কী আশ্চর্য বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারেন, তারই দৃষ্টান্ত শেষ জীবনে অসংখ্য পাওয়া যায়। উর্বশীকে গানে পরিণত করার পরীক্ষাও সেই প্রৌঢ় বয়সেরই। কবির জীবৎকালে শাপমোচনের শেষ অভিনয় হয় ১৩৪৭ পৌষে, সেই উপলক্ষে উর্বশীতে সুরযোজনা হয়। সুরদানের সময় ১৩৪৭ অগ্রহায়ণ। সংগীতে রূপান্তরিত এবং বহুতর-স্তবকবর্জিত গানটি শুনতেও খারাপ লাগে না, কিন্তু মূল কবিতার ক্লাসিকাল বর্ণনার ঐশ্বর্য, স্তবকে স্তবকে ভাষা ও সৌন্দর্যের শিহরণ গানে পাওয়া যায় না। যুক্তাক্ষরবহুল তানপ্রধান ছন্দের কবিতাও গান হতে পারে, সম্ভবত এই পরীক্ষারই পরিণতি উর্বশীর গীতরূপ। কিন্তু মূল কবিতার প্রথম চরণের সূক্ষ্ম বক্তব্য গানের প্রথম চরণের উচ্চারণ-ভঙ্গির জন্য বিপরীতার্থক শোনায়। অর্থাৎ 'নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী' এই চরণের বাচ্যার্থ—উর্বশী চিরসৌন্দর্যের প্রতীক, মাতৃত্ব কন্যাত্ব বধূত্ব প্রকৃতি সকাম সাংসারিক নারীসম্পর্কের বন্ধন তার নেই। সুতরাং 'নহ বধূ' এবং 'সুন্দরী রূপসী'র মধ্যে যে কমাচিহ্নটি আছে কবিতার চরণে তা অর্থযতি ও ছন্দোযতির কাজ করে। কিন্তু গানে চরণটি শুনতে লাগে 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দরী রূপসী'—অর্থাৎ নন্দনবাসিনী উর্বশী যেমন মাতা বা কন্যা নয়, তেমনি সুন্দরী রূপসী বধূও নয়। অর্থাৎ কবিতায় 'সুন্দরী রূপসী' 'নন্দনবাসিনী উর্বশী'র প্রতি সম্বোধন, কিন্তু গানে তা মনে হয় 'বধূ'র বিশেষণমাত্র। গানের জন্য কবিতার অন্য যে চরণগুলি সংকলিত হয়েছে, তার মধ্য দিয়েও কোনো গাঢ়তা ফুটে ওঠেনি, কবি এলোমেলো চরণ উদ্ধার করেছেন মাত্র। গানটির দ্বিতীয় স্তবক কবিতার পঞ্চম ও চতুর্থ স্তবকের

বিচ্ছিন্ন চরণসমবায়ে গঠিত। অর্থাৎ পঞ্চম স্তবকের প্রথম চারটি চরণের সঙ্গে চতুর্থ স্তবকের পঞ্চম থেকে নবম চরণগুলি দিয়ে গানের সঞ্চারী ইত্যাদি গঠিত হয়েছে। কবিতার শব্দাবলীও গানে যথাযথ কবি রক্ষা করেননি। যথা,

গানে লজ্জিত বাসরশয্যাতে
অর্ধরাতে

কবিতায় সলাজ্জত বাসরশয্যাতে
স্তব্ধ অর্ধরাতে ইত্যাদি

'নারীর দান' এবং 'দুরাকাঙ্ক্ষা' কবিতা দুটিতে সুরারোপ করা হয়েছিল এবং গান দুটি গীতবিতানের ৩য় খণ্ডে নাট্যগীতি-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। তবে গীতরূপের সঙ্গে কাব্যরূপের কোনো পার্থক্য ঘটেনি। দুটি রচনাই ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে 'গান' গ্রন্থে সংকলিত।[১২]

চিত্রা কাব্যের কাব্যগ্রন্থবলী সংস্করণে একটি গান অতিরিক্ত ছিল—'বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে' (রচনা ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১), কিন্তু বর্তমান চিত্রা কাব্যে সেটি নেই। চিত্রার আর একটি কবিতার সঙ্গে কবির একটি গানের সাদৃশ্য আলোচনা করছি। চিত্রার 'জ্যোৎস্নারাত্রে' ('শান্ত করো, শান্ত করো এ ক্ষুব্ধ হৃদয়') কবিতাটির সঙ্গে পরবর্তী কালের একটি গীতরূপের বাণীগত সাদৃশ্য বিস্ময়কর। 'জ্যোৎস্নারাত্রে' কবিতায় কবি পূর্ণিমা নিশীথিনীর রহস্যময় সৌন্দর্য-পারাবারে অবগাহন করে একটি সুখস্বপ্ন রচনা করেছেন। সৌন্দর্য যেখানে বিশুদ্ধ ও নির্বস্তুক, সেইখানেই কবির সঙ্গে তার বিরহকল্পনা—এই ভাবটি 'মানসসুন্দরী' 'জ্যোৎস্নারাত্রে' 'উর্বশী' প্রভৃতি কবিতায় দেখা যায়। 'জ্যোৎস্নারাত্রে' কবিতার শেষ স্তবকে এই জাতীয় বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে—

তোমাদের বাসরকুঞ্জের বহির্দ্বারে
বসে আছি—কানে আসিতেছে বারে বারে
মৃদুমন্দ কথা, বাজিতেছে সুমধুর
রিনিঝিনি রুনুঝুনু সোনার নূপুর—
কার কেশপাশ হতে খসি পুষ্পদল
পড়িছে আমার বক্ষে, করিছে চঞ্চল
চেতনাপ্রবাহ।...
...উন্মাদ করিছে হিয়া
অপূর্ব বিরহে। খোলো দ্বার খোলো দ্বার।

তোমাদের মাঝে মোরে লহ একবার
সৌন্দর্যসভায়। নন্দনবনের মাঝে
নির্জন মন্দিরখানি—সেথায় বিরাজে
একটি কুসুমশয্যা, রত্নদীপালোকে
একাকিনী বসি আছে নিদ্রাহীন চোখে
বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী জ্যোতির্ময়ী বালা—

চিত্রার এই কবিতার সঙ্গে 'বেদনা কী ভাষায় রে' গানটির ভাষাতেও এই সৌন্দর্যবিরহের পুনরাবৃত্তি দেখা যায়—

বেদনা কী ভাষায় রে মর্মে মর্মরি গুঞ্জরি বাজে।
সে বেদনা সমীরে সমীরে সঞ্চারে, চঞ্চল বেগে বিশ্বে দিল দোলা।
দিবানিশা আছি নিদ্রাহরা বিরহে
তব নন্দনবন-অঙ্গনদ্বারে মনোমোহন বন্ধু—
আকুল প্রাণে
পারিজাতমালা সুগন্ধ হানে।

চৈতালির (১৩০৩) দুটি মাত্র কবিতা গানরূপে পরিচিত—তুমি পড়িতেছ হেসে: তরঙ্গের মত এসে (গান), আজি কোন ধন হতে বিশ্বে আমারে (প্রার্থনা)।

প্রথম রচনাটির তারিখ ২৯ চৈত্র ১৩০২, গানরূপে গীতবিতানের ৩য় খণ্ডে নাট্যগীতি-পর্যায়ভুক্ত, গানে কেবল কবিতার দ্বিতীয় স্তবকটি বর্জিত। কবিতাটিকে কবি কখন গানে পরিণত করেছিলেন জানা যায় না, কিন্তু কবিতাটির প্রথম প্রকাশকালেই শিরোনাম 'গান' বিস্ময়কর মনে হয়। কোনো কবিতার শীর্ষে 'গান' এই শব্দ কবিতাটির অন্তর্নিহিত কোনো ভাবের সংকেত দেয় না, কবিতাটি যে গানরূপে (অর্থাৎ সুরতালে গেয়) পরিচিত, তারই ইঙ্গিত দেয়। সুতরাং এই কবিতাটির রচনাকালেই কি কবি একে গানে পরিণত করবেন এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল? অথচ গীতবিতানে কবিতাটির সম্পূর্ণরূপ নেই, একটি স্তবক বর্জিত এবং সূচীপত্রে সুর কাফি-কাওয়ালি বলে উল্লিখিত। আলোচ্য কবিতাটির বিষয়বস্তু প্রেমিকার অন্তর্ধানপটে তার চিরন্তন রূপের উপলব্ধি এবং ভাবের দিক থেকে মানসসুন্দরীর সগোত্র। অবশ্য আলোচ্য কবিতায় কবি-প্রেয়সীর শারীরিক অন্তর্ধানের কথা স্পষ্ট ও প্রমাণসহ নয়—অনুমানে বুঝে নিতে হয়। কয়েকদিন পূর্বে রচিত (১৮ কার্তিক ১৩০২) আর একটি সংগীত এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম
নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমানিশীথিনী-সম।
মম জীবন যৌবন মম অখিল ভুবন
তুমি ভরিবে গৌরবে নিশীথিনী-সম।

এই গানটির ভাব ও ভাষার সঙ্গে 'তুমি পড়িতেছ হেসে' কবিতার সাদৃশ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'প্রার্থনা' (আজি কোন ধন হতে) ব্রহ্মসংগীতরূপেই প্রচারিত এবং সম্ভবত এই রচনার সুর কবিতার অব্যবহিত পরেই প্রদত্ত (গানে অবশ্য কবিতার ৭ম থেকে ১০ম চরণ বর্জিত)। এই জাতীয় ভক্তিগীতি কেবল রচনাকালের ঘনিষ্ঠতায় চৈতালির অন্তর্গত, অন্যান্য কবিতার সঙ্গে এর যোগ সামান্যই। কিন্তু এর দ্বারা দুটি সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে—

প্রথমত, কবির ব্রহ্মসংগীতগুলির গতানুগতিকতা থেকে এটি মুক্ত এবং কবির দেবতা ব্যক্তিদেবতায় পরিণত। তাই ভক্তি এখানে আনুষ্ঠানিক ও কৌলিক কর্তব্যপালন মাত্র নয়, ভক্তি এখানে সান্দ্রনিবিড় ব্যক্তিমনের উৎকণ্ঠায় পরিণত। 'পুরস্কার' কবিতায় সরস্বতীর প্রতি কবিভক্ত বলেছিলেন—

তোমারে হৃদয়ে করিয়া আসীন
সুখে গৃহকোণে ধনমানহীন
খ্যাপার মতন আছি চিরদিন
উদাসীন আনমনা।
চারিদিকে সবে বাঁটিয়া দুনিয়া
আপন অংশ নিতেছে গুনিয়া—
আমি তব স্নেহবচন শুনিয়া
পেয়েছি স্বরগসুধা।......
যার যাহা আছে তার থাক তাই
কারো অধিকারে যেতে নাহি চাই,
শান্তিতে যদি থাকিবারে পাই
একটি নিভৃত কোণে।

প্রার্থনা গানখানির ভাষাও পুরস্কারের কবির মতই কাব্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রতি প্রার্থনা ('নাথ' এই সম্বোধন সত্ত্বেও)—

হেথা কে আমার কাণে কঠিন বচনে বাজায় বিরোধঝনঝনা!
প্রাণে দিবসরজনী উঠিতেছে ধ্বনি তোমারি বীণার গুঞ্জনা।

নাথ, যার যাহা আছে তার তাই থাক, আমি থাকি চিরলাঞ্ছিত।
শুধু তুমি এ জীবনে নয়নে নয়নে থাকো থাকো চিরবাঞ্ছিত ॥

দ্বিতীয়, চৈতালির পরবর্তী গ্রন্থ কল্পনায় এই ধরনের ব্রহ্মগীতের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এখানে যেন তারই সূচনা। আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মসংগীত রচনার স্তর অতিক্রম করে কবি তাঁর নিজস্ব কবিমনের ব্যাকৃতি মিশিয়ে যে ভক্তিরসাত্মক গীতিকবিতার নূতন ঐতিহ্য তৈরি করতে চলেছেন, চৈতালির প্রার্থনা কবিতায় যেন তার সূত্রপাত, তারই পরিণতি গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালিতে।

৪

চৈতালির পর কণিকা, কথা ও কাহিনী প্রভৃতি গ্রন্থের নীতিমূলক ক্ষুদ্র ও কাহিনীমূলক দীর্ঘ কবিতার সংকলনে সংগীতের অবকাশ কম বলে কবিতার গীতিরূপ দেখতে পাই না। কল্পনায় (১৩০৭) এসে আবার কবিতা ও গানের যুগপৎ প্রাবল্য। কল্পনায় কবিতার গীতে রূপান্তর এবং স্বাধীন স্বতন্ত্র সংগীত দুই দেখা গেল। কল্পনার যে কবিতাগুলি গান হয়েছে তার তালিকা— ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে (বর্ষামঙ্গল), আজি উন্মাদ মধুনিশি ওগো চৈত্রনিশীথশশী (চৈত্র রজনী), সে আসি কহিল প্রিয়ে মুখ তুলে চাও (স্পর্ধা), একি তবে সবই সত্য (প্রণয়প্রশ্ন), বন্ধু, কিসের তরে অশ্রু ঝরে (হতভাগ্যের গান), কে এসে যায় ফিরে ফিরে (সে আমার জননী রে), ওগো কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ (ভিখারি), ভালবেসে সখী নিভৃত যতনে (যাচনা), এবার চলিনু তবে (বিদায়), কেন বাজাও কাঁকন কনকন (লীলা), হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে (নববিরহ), যামিনী না যেতে জাগালে না কেন (লজ্জিতা), আমি কেবলই স্বপন করেছি বপন (কাল্পনিক), তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর (মানস প্রতিমা), যদি বারণ কর তবে গাহিব না (সংকোচ), আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা (প্রার্থী), সখী প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় (সকরুণা), দুইটি হৃদয়ে একটি আসন (বিবাহমঙ্গল), অয়ি ভুবনমনোমোহিনী (ভারতলক্ষ্মী), ভাঙা দেউলের দেবতা (ভগ্নমন্দির), ভয় হতে তব অভয়মাঝারে (জন্মদিনের গান), সংসারে মন দিয়েছিনু (পূর্ণকাম), জানিহে যবে প্রভাত হবে (পরিণাম)।

কল্পনা কাব্যেই সর্বপ্রথম কবিতা অর্থাৎ সুরহীন গীতিকবিতা এবং সুরাশ্রিত কবিতা বা সংগীতের সহাবস্থান এত অধিকসংখ্যায় দেখা যায়। কল্পনা কাব্যে

কবি যে এতগুলি গানকে কবিতার সঙ্গে সমমর্যাদায় স্থাপিত করেছেন, রচনা-কালের অখণ্ডতাই কি তার একমাত্র কারণ? রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুরযোজিত গান-গুলিকে লিরিকরূপেই প্রাধান্য দিয়েছেন, কবিতার স্বাতন্ত্র্যে গীতিধর্মে তাদের মর্যাদা দিয়েছেন বলেই এই কাব্যগ্রন্থে তাদের নিঃসংকোচ অন্তর্ভুক্তি। এইজন্য সমসাময়িক কবিতাবলী ও গানগুলির মধ্যে বিষয় ও ভাবগত ঐক্য চোখে পড়ে এবং গানগুলির শীর্ষে সুরতালের উল্লেখ সত্ত্বেও কবিতার মতই সেইগুলির নামকরণ হয়েছে। রচনাতারিখ ও স্থাননির্দেশসহ কবিতার সঙ্গে তাদের কোনো প্রভেদ নেই। প্রাচীন ভারতের শিল্পসৌন্দর্যলোকে মানসপর্যটনের যে অভিজ্ঞতাসূত্রে কবি একদিকে মেঘদূতের বর্ষাদিবসের চিত্র এঁকেছেন 'বর্ষামঙ্গল' কবিতায়, সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই প্রাচীন সংস্কৃত বা মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব পদাবলীর মত আলংকারিক নায়িকার নানা মনোভাব স্মরণ করে যেন গীতাত্মক কবিতাগুলি লিখেছেন। এতে আনুষ্ঠানিক গানও আছে, যা নিতান্ত কেবল রচনাকালের নৈকট্যেই কল্পনার অন্তর্গত (যেমন বিবাহমঙ্গল), আবার তথাকথিত ব্রহ্মগীতিও আছে, (ভগ্ন হতে তব অভয় মাঝারে,[১৩] সংসারে মন দিয়েছিনু, জানিহে যবে প্রভাত হবে ইত্যাদি)।

'বর্ষামঙ্গল' রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত বহুজনপ্রিয় ঋতুসংগীত—বর্ষণগীত-মুখরিত কবির যাবতীয় বর্ষাসাহিত্যের গরীয়সী ভূমিকা। কবিতাটি নিঃসন্দেহে কবিতারূপেই রচিত এবং পরে বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে সংগীতে রূপান্তরিত। কবিতাটির 'বর্ষামঙ্গল' নামকরণও যেন সেই ভবিষ্যৎ সাংস্কৃতিক উৎসবের দিব্যসংকেতরূপে ব্যবহৃত। সংগীতে কবিতার ৫ম ও ৬ষ্ঠ স্তবক সম্ভবত বাহুল্যবোধে পরিবর্জিত। ১৩৩২ সালের ভাদ্রে কবি যে 'শেষবর্ষণ' পালা রচনা করেন, তাতেই প্রথম এই গানটি সুরযোজিতরূপে পাই।

কল্পনার অন্তর্গত 'চৈত্ররজনী,' 'স্পর্ধা,' 'প্রণয়প্রশ্ন' ও 'হতভাগ্যের গান' কবিতাগুলি সংগীতে রূপান্তরিত হলেও এইগুলির কাব্যরূপকে গানের সুর এসে অসীমচারী করে তোলেনি। সম্ভবত ইতিপূর্বে কবিতাকে ক্বচিৎ সুরে আবৃত্ত করার যে পরীক্ষা কবি করেছিলেন, এগুলি তারই পুনরাবৃত্তি। 'চৈত্র-রজনী' এবং 'স্পর্ধা'-র কবিতা ও গীতরূপের মধ্যে ভাষাগত পরিবর্তন ঘটেনি। 'প্রণয়প্রশ্ন' কবিতাটি কিন্তু গানে পরিবর্তিত হয়েছে। গানে কবিতার ৩য় ও ৪র্থ

স্তবক সম্পূর্ণ বিসর্জিত এবং প্রথম দুই স্তবকও পরিবর্তিত। এই পরিবর্তনের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে, কবি নিছক কৌতূহলের বশেই কবিতাটির উপর সুর ঢেলে দেননি, বরং একটি গান নতুন করে গড়ে তোলার জন্য কবিতার বাণীকে উপাদানরূপে গ্রহণ করেছেন। 'ভাঙা দেউলের দেবতা' কবিতাটি 'চৈত্ররজনী' বা 'স্পর্ধা'র মতই সংগীতরূপে বিশেষত্ববর্জিত।[১৪]

'হতভাগ্যের গান' এবং 'বিদায়' দুটিই যুগপৎ কবিতা এবং গান। মনে হয় কবিতারচনাকালেই কবি সুরারোপ করেছিলেন, কারণ কবিতার শীর্ষেই সুরের নির্দেশ আছে। কবিতা ও গানের বাক্‌রূপ ও ছন্দ অপরিবর্তিতই আছে। 'হতভাগ্যের গান' কবিতাটিতে সর্বস্বরিক্ত হতভাগ্যের দুঃখবরণের দুর্বিনীত দুঃসাহস যেন আপনিই এক নির্ভীক উল্লসিত জীবনস্পন্দনে গুনগুনিয়ে উঠতে চেয়েছে। উল্লাসের সেই স্বতঃস্ফূর্ত গুঞ্জনকে কবিতাপাঠকালে আরও শ্রুতি-গম্য বিশ্বস্ত ও বাস্তব করে তোলার জন্যই যেন কবি একে একটু সুর দিয়ে পড়তে অনুরোধ করেছেন। আর কেউ না পড়ুক, অন্তত রচনাকালে বা রচনার পর, কবি স্বয়ং সেইভাবে পড়েছিলেন বলে মনে হয়। আর তখনই বোধ করি এর অন্তর্নিহিত উদ্দামতা, পরিহাসের ঋজুকঠোরতার ভঙ্গি আরও সত্য হয়ে তাঁর নিজের কানে বেজেছিল, যেন আপনার সেই পাঠজনিত অভিজ্ঞতাই 'বিভাস' সুরে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। 'বিদায়' কবিতার করুণ আবেদনটিও অনুরূপভাবে ঈষৎ সুরের মধ্য দিয়ে দিয়ে সত্য হয়ে ধ্বনিত হবে, এই যেন কবির বিশ্বাস ছিল। তাই গানের স্বতন্ত্র ব্যাকরণ এই দুই ক্ষেত্রে অবান্তর। সুর এখানে গোড়া থেকেই কবিতাপাঠের সহায়ক মাত্র। তার প্রমাণ, গানে দীর্ঘ কবিতার একটি চরণও বর্জিত হয়নি, গানের পক্ষে সেই স্তবকভার দীর্ঘ ও অতিরিক্ত হলেও।

'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' গানটির একাধিক পাঠান্তর গীতবিতানে আছে, একটি কল্পনা কাব্যের অন্তর্গত, গীতবিতানের প্রেমপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত গানটির সঙ্গে তার পাঠ কিন্তু অভিন্ন নয়। গীতবিতানের তৃতীয় খণ্ডে মুদ্রিত পাঠটি বীণাবাদিনী ১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে গৃহীত, "ইন্দিরা দেবীর 'গানের বহি'-তে কবির হস্তাক্ষরে এই পাঠই দেখা যায়" (গীতবিতান ৩য় খণ্ড গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য)।

কল্পনার মত ক্ষণিকা (১৩০৭ শ্রাবণ) কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলি বিখ্যাত কবিতায় সুরযোজিত হওয়ায় সেইগুলি সুপরিচিত রবীন্দ্রসংগীতে রূপান্তরিত। যথা, নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে (আষাঢ়), হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে

(নববর্ষা), হে নিরুপমা (অবিনয়), কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি (কৃষ্ণকলি), ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে (মেঘমুক্ত), কোন বাণিজ্যে নিবাস তোমার (বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ)।

'আষাঢ়' কবিতাটি সম্ভবত বর্ষামঙ্গলে গীত হওয়ার জন্যই পরবর্তীকালে কবি যথাযথ সুরে রূপান্তবিত করেন। 'নববর্ষা'ও 'আষাঢ়ে'র মতই সুপরিচিত কবিতা ও 'আষাঢ়ে'র অনুরূপ উদ্দেশ্যেই গানে পরিণত হয়েছে। তবে গানে কবিতার সামান্য গৃহীত এবং কবিতার ছন্দোরূপ গানের প্রয়োজনে ঈষৎ পরিবর্তিত। মূল কবিতার প্রথম ষষ্ঠ ও অষ্টম স্তবক মাত্র গানে রক্ষিত। ষষ্ঠ স্তবক সঞ্চারী হয়েছে, কিন্তু অষ্টম স্তবকের অন্তরার মত নয়। তবে গানটিতে কবিতার উল্লাস ও স্ফূর্তি আশ্চর্যভাবে সঞ্চারিত। কবিতায় সুরযোজনার পরীক্ষায় কবি কত বিস্ময়কর দক্ষতা দেখিয়েছেন ও আশ্চর্য সাফল্য অর্জন করেছেন, ক্ষণিকার সুরারোপিত কবিতার প্রতিটি তার নিদর্শন। 'অবিনয়'ও রবীন্দ্রনাথের একটি বহুলপরিচিত বর্ষাগীতি।[১৫] এটি গীতবিতানের প্রেমপর্যায়ের অন্তর্গত—যদিও এর সর্বাঙ্গে বর্ষার জলকণা বিতত এবং আষাঢ়ের প্রথম দিবসে রচিত। কবিতা ও গানটিতে অবশ্য প্রয়োগের কিছু হেরফের আছে। মূল কবিতার তৃতীয় স্তবক গানের প্রথম স্তবক, পঞ্চম স্তবক গানের দ্বিতীয় স্তবক, প্রথম স্তবক গানের তৃতীয় স্তবক এবং দ্বিতীয় স্তবক হয়েছে গানের শেষ স্তবক। তাছাড়া কথার দিক থেকেও ঈষৎ সংস্কার ঘটেছে। যথা গানের শেষ স্তবকের ভাষা—

হেরো আকাশের দূর কোণে কোণে
বিজলি চমকি ওঠে ক্ষণে ক্ষণে
দ্রুত কৌতুকে তব বাতায়নে কী দেখে চেয়ে
অধীর পবন কিসের লাগিয়া আসিছে ধেয়ে।

আর সে ক্ষেত্রে কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের শেষ চরণ দুটি এইরূপ—

বাতায়নে তব দ্রুত কৌতুকে মারিছে উঁকি,
বাতাস করিছে দুরন্তপনা ঘরেতে ঢুকি।

কবিতার শেষ স্তবকে ভাষা ছিল এই প্রকার—

তোমার দুখানি কালো আঁখি 'পরে
শ্যাম আষাঢ়ের ছায়াখানি পড়ে,
ঘন কালো তব কুঞ্চিত কেশে যূথীর মালা;
তোমারই ললাটে নববরষার বরণডালা।

গানে 'শ্যাম আষাঢ়ের' স্থলে 'বরষার কালো' এবং 'ললাটে' স্থলে হয়েছে 'চরণ'। মূল কবিতায় বর্ষাই ছিল মুখ্য সংবাদ। বর্ষাই কবিকে তাঁর মানসীর কাছে একদিন দুরন্ত অবিনয়ে প্রগল্‌ভ চপল করে তুলেছিল, বর্ষাই সেই মানসীর ললাটে পরিয়েছিল প্রেমের বরণমালা। দীর্ঘকাল পরে পরিণত বার্ধক্যে সেই কবিতায় সুর দিতে বসেছেন কবি। আজ সে মানসী নেই, আছে তার স্মৃতি। সেই স্মৃতির কাছে নতজানু কবি বর্ষাকে দিয়ে হারানো প্রেমিকার চরণতলে বরণমালা সমর্পণ করেছেন। এইভাবে ঋতুর কবিতা হয়ে উঠেছে স্মৃতিসুরভিত প্রেমের গান। কবিতার পাঁচটি স্তবকের ৪র্থ স্তবকটি গানে সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে এবং গানে প্রতি স্তবকের তালবদলের দ্বারা একটি বৈচিত্র্য ও মাধুর্য সঞ্চার করা হয়েছে।

'কৃষ্ণকলি' রবীন্দ্রনাথের আর একটি অতুলনীয় সৃষ্টি, কবিতাকে গানে পরিণত করার বিচিত্র দুর্লভ নিদর্শন—কবিতা সুর ও কথকতা মিশ্রিত হয়ে একটি অভিনব চারুসৃষ্টি ঘটেছে। গানের প্রথাবদ্ধ আঙ্গিক নেই, অথচ সুর এসে কথাকে নিয়ে যায় তুচ্ছতার ধূলিপৃষ্ঠ থেকে, উধাও করে দেয় অসীম কোন মেঘমেদুর আকাশে, যেখানে কালোমেঘের কালো হরিণচোখে চিরকালের ত্রস্ত ইঙ্গিত।

লক্ষণীয় যে, ক্ষণিকার সংগীতে রূপান্তরিত কবিতাগুলির অধিকাংশই বর্ষা-বিষয়ক—সম্ভবত একই প্রেরণায় কবি এগুলিকে সুরের নেশায় সংগীত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। 'মেঘমুক্ত' মোট পাঁচ স্তবকের কবিতা, এর পর্ব ও স্তবকবিভাগ 'আষাঢ়' ও 'নববর্ষা'র মত। কবি সংগীতে প্রথম চতুর্থ ও পঞ্চম স্তবক মাত্র গ্রহণ করেছেন এবং কবিতার পঞ্চম স্তবকের শেষ ছয়টি ছত্রের বদলে আবার গীতরূপে কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবক থেকে শেষ ছয় ছত্র গ্রহণ করেছেন।

'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ' কবিতাটিকে ঈষৎ পরিবর্তত করে কবি পরবর্তী-কালে 'তাসের দেশে'র বহির্বাণিজ্যে তথা নিরুদ্দেশ-অভিযানে নির্গত রাজকুমারের সংগীতে পরিণত করেছেন। কবিতাটির প্রথম দশটি ছত্র বাদ দিয়ে 'যাবই আমি যাবই ওগো' এই তৃতীয় স্তবক থেকে গানটির আরম্ভ। তাছাড়া কবিতা ও গানে কথার কিছু পরিবর্তন বা সংস্কার ঘটেছে—তাও সাংগীতিক প্রয়োজনে নয়, নাটকের প্রয়োজনে, যথা—

'তোমায় যদি না পাই তবু আর কারে তো পাবই'	'লক্ষ্মীরে হারাবই যদি অলক্ষ্মীরে পাবই।'

'কোন্ নগরে যাব দিয়ে'	'কোন পুরীতে যাব দিয়ে'
'অকূল কালো নীরে'	'বিরাট কালো নীরে'
'বালু মরুর তীরে'	'সোনার বালুর তীরে'
'সোনার রেণু আনব ভরি সেথায় নামি যদি'	'সাত-রাজাধন মানিক পাবই সেথায় নামি যদি'
'সাগর উঠে তরঙ্গিয়া'	'হেরো সাগর উঠে তরঙ্গিয়া'
'ভিখারি তোর ফিরবে যখন'	'ভিখারি মন ফিরবে যখন'

কবিতার 'নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ' প্রভৃতি অংশ 'সাগর উঠে তরঙ্গিয়া' ইত্যাদি অংশের পরে ছিল, গানে তাকে আগে আনা হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে গানের ভাবার্থে। কবিতায় স্বদেশীয় দৈন্যের হীনতায় পর্যুদস্ত হয়ে অসহিষ্ণু কবি বহির্জীবনের মধ্যে সম্পদসংগ্রহে ব্যাকুল হয়েছিলেন। লক্ষ্মীর ধন অর্জনীয়—অভিযাত্রা-বিঘ্ন-বিপদের মধ্য দিয়েই স্বদেশের সম্পদবৃদ্ধির সংকেত ক্ষণিকার এই কবিতার কাব্যার্থ। কিন্তু 'তাসের দেশে' এই গান যুবরাজের কণ্ঠে পেয়েছে নূতন ব্যঞ্জনা। সেখানে বাণিজ্যে যাত্রার দুর্গম অভীপ্সা স্বদেশের দৈন্যে নয়, ভিক্ষান্নগ্রহণের গ্লানিতে নয়, সেখানে কেবল অহেতুক নিরুদ্দেশ যাত্রার উৎকণ্ঠা, অজানাকে জানার নৈর্ব্যক্তিক আকুলতা, রহস্যের সন্ধানে রোমান্টিক যৌবনাভিযানই প্রাধান্য লাভ করেছে। কবিতার বক্তা স্বয়ং ভিখারি, তাই বাণিজ্যান্তে তিনি রাজার মত প্রত্যাবর্তন করবেন এই আগ্রহ ছিল। কিন্তু গানে বক্তা তো ভিখারি নয় কারণ সে রাজপুত্র ; ভিখারি তার রিক্ত হৃদয়, তাই 'ভিখারি মন ফিরবে যখন ফিরবে রাজার মত,' এই আশাবাদ। কবিতাটি বাণিজ্যে লক্ষ্মীলব্ধ ধনীর প্রতি উদ্দিষ্ট, গানটি রাজকুমারকর্তৃক সওদাগর-বন্ধুর প্রতি সম্বোধিত। এটি বিশেষভাবেই নাট্যপ্রয়োজনে নির্মিত। তাই লক্ষ্মীর বদলে অলক্ষ্মীর সন্ধানে দৃক্‌পাতহীন, অজানাভিমুখে ঝাঁপ দিতে উদ্যত রাজপুত্র শেষ পর্যন্ত গহন সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে নৌকাডুবির ফলে তাসের দেশে এসে উপস্থিত হবে এবং সেখানে কী অপূর্ব ধন লাভ করবে, তাসের দেশের পাঠক মাত্রেরই তা জানা।[১৬]

৫

ক্ষণিকার পর নৈবেদ্য (১৩০৮) থেকে গীতালি (১৩২১) পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের জীবনে ব্রহ্মানুভূতি ঈশ্বরচেতনা ও ভক্তিবাদের একটি নিভৃত পথ রচিত হয়েছে। তার

দুধারে আনত হয়ে এসেছে সংগীতের মাধুরীতে উপচিত বনকুঞ্জ। এই সকল কাব্যে সংগীত আর কবিতা সরু-মোটা তারে জড়িয়ে গেছে—কোনটি কবিতা কোনটি গান পৃথকভাবে বোঝবার উপায় নেই। কবিতার বেদীতলে সংগীতের ধূপ অনিঃশেষ সুরভিত। পূর্ববর্তী কাব্যের কবিতাবিশেষ গানে পরিণত হয়েছিল কোনো পরীক্ষা-কারণে, বিশেষ উদ্দেশ্যে অথবা রচনাকালের বহু পরে, নিছক গানসৃষ্টির জন্যই। কিন্তু নৈবেদ্য যুগে এবং পরবর্তীকালে সুর কখন এসে কবিতাকে স্পর্শ করেছে, তার ইতিহাস জানা নেই। গীতবিতানে গানরূপে নির্দেশিত না থাকলেও (অর্থাৎ অনেক কবিতায় সুরযোজনা না ঘটলেও) সেগুলি গানের আঙ্গিকেই পরিচিতি লাভ করেছে। অর্থাৎ এ যুগের সব কবিতাই (নৈবেদ্য ইত্যাদি কাব্যের কিছু তানপ্রধান পয়ার ছন্দে রচিত চতুর্দশপদী বা অনুরূপ কবিতাগুলি ছাড়া) গানের ভঙ্গিমায় রচিত। এ কথা অকপটে বলা যায় যে, কবি সংগীতের সহায়তায় গীতিকবিতার একটি নূতন আঙ্গিকের প্রবর্তন করেছেন। সে শুধু একটি শৈল্পিক আঙ্গিক মাত্র নয়, সে আঙ্গিক সমগ্র কবিজীবনের, সে আঙ্গিক কবিধর্মের, তারই সর্বাঙ্গীণ নাম নৈবেদ্য গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য। জীবনদেবতার চরণে কবি যে হৃদয়ার্ঘ্য নিবেদন করেছেন, তা গীতসুধারসে পূর্ণ—তা শ্রুত বা অশ্রুত, গীত বা অগীত যাই হোক না কেন।

নৈবেদ্য কাব্যের গীতাত্মক কবিতাগুলির নামকরণ হয়নি, গীতাঞ্জলি গীতিমাল্যেও এইরূপ নামহীন সংখ্যানির্দেশ দেখতে পাই। এগুলিতে গানের স্বরূপধর্ম আরও স্পষ্টরেখ হয়ে উঠেছে—অর্থাৎ ধ্রুবপদ আভোগ সঞ্চারী অন্তরা নিয়ে এক একটি গান প্রায় সর্বত্র যথারীতি চারটি তুকে বিভক্ত। পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারির 'যাত্রী' অংশে কবি একবার লিখেছিলেন, "চারখানি পাপড়ি নিয়ে একখানি ছোট জুঁই ফুলের মত একটুখানি গান যখন সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে তখন সেই মহাখেলাঘরের মেজের উপরেই তার জন্যে জায়গা করা হয় যেখানে যুগ যুগ ধরে গ্রহ-নক্ষত্রের খেলা হচ্ছে।" চারখানি পাপড়ির জুঁইফুল যে গানের আঙ্গিকগত উপমান, নৈবেদ্য থেকেই তার যথার্থ সূচনা। নৈবেদ্যর কবিতাগুলির সঙ্গে তার গীতরূপের অনেকস্থলে হয়ত পাঠভেদ আছে, কিন্তু তা অকিঞ্চিৎকর। বোঝাই যায়, সংগীতের প্রেরণাতেই তাদের উৎসারণ, গান করে গাইতে হবে বলে তাদের পাঠ্যরূপে গভীর পরিবর্তন ঘটানোর কারণ ঘটেনি। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংগীতগুলির যে সুনিরূপিত রূপরীতি সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে, নৈবেদ্য-পর্বেই কবি তাকে নিশ্চিতভাবে সাঙ্গীকৃত করেছিলেন।

নৈবেদ্য গীতাঞ্জলির যে কবিতাগুলি গান নয়, সেগুলিতেও কবি গানের পূর্বপ্রতিষ্ঠিত উক্ত রীতিই অনুসরণ করেছেন।

নৈবেদ্যর কবিতাগুচ্ছের মধ্যে এইগুলি সংগীতরূপে পরিচিত—

১ প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী, ২ আমার এ ঘরে আপনার করে, ৩ নিশীথশয়নে ভেবে রাখি মনে, ৪ তোমারই রাগিণী জীবনকুঞ্জে, ৫ যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার, ৬ সংসার যবে মন কেড়ে লয়, ৭ জীবনে আমার যত আনন্দ, ১০ যারা কাছে আছে তারা কাছে থাক, ১২অমল কমল সহজে জলের কোলে, ১৩ সকল গর্ব দূর করি দিব, ১৪ তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে, ১৬ ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে জীবন সমর্পণ, ১৭ অল্প লইয়া থাকি তাই, ১৯ প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি, ২০ তোমার পতাকা যারে দাও, ২১ ঘাটে বসে আছি আনমনা, ১০০ সংসারে মোরে রাখিয়াছ যেই ঘরে।

রবীন্দ্র রচনাবলী অষ্টম খণ্ড গ্রন্থপরিচয়ে বলা হয়েছে, "নৈবেদ্যের অনেকগুলি কবিতা গানরূপে ব্যবহৃত হইবার সময় সেগুলির অনেক পাঠ পরিবর্তন হইয়াছে"। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে, এই পাঠ-পরিবর্তন গানের পক্ষে সামান্যই এবং তার জন্য কবিতার কাব্যরূপের গভীর কোনো পরিবর্তন ঘটাতে হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম গানের সঞ্চারী অংশের দ্বিতীয় চরণে আছে 'নিখিল ভুবনলোকের মাঝারে দাঁড়াব তোমারই সম্মুখে'। কবিতায় চরণটি ছিল 'নিখিল জগৎজনের মাঝারে দাঁড়াব তোমারই সম্মুখে'। ২য় সংখ্যক কবিতায়—

কোণে কোণে যত লুকানো আঁধার
মরুক ধন্য হয়ে
তোমারই পুণ্য আলোকে বসিয়া
প্রিয়জনে বাসি ভালো।

গানে পরিবর্তন ঘটেছে এই প্রকার—

কোণে কোণে যত লুকানো আঁধার
মিলাবে ধন্য হয়ে
তোমারই পুণ্য আলোকে বসিয়া
সবারে বাসিব ভালো হে। ইত্যাদি

—এই জাতীয় পরিবর্তন নিঃসন্দেহে অকিঞ্চিৎকর। ৪ সংখ্যক কবিতা ও গানে কোনো পাঠগত ভেদই নেই। ৫ সংখ্যক কবিতার ৩য় স্তবকের প্রথম দুটি ছত্র—

তব আহ্বানে যদি কভু মোর
নাহি ভেঙে যায় সুপ্তির ঘোর—

গানে হয়েছে—যদি কোনোদিন তোমার আহ্বানে
সুপ্তি আমার চেতনা না মানে

৬ ও ৭ সংখ্যক কবিতা গীতরূপের সঙ্গে অভিন্ন। ১০, ১২ ও ১৩ সংখ্যক কবিতার দু একটি শব্দগত পরিবর্তন ব্যতীত দুইরূপ অভিন্নপ্রায়। ১৪ সংখ্যক কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের তৃতীয় ছত্রে আছে 'তোমা হতে যবে স্বতন্ত্র হয়ে আপনার পানে চাই'। গানে চরণটি হয়েছে, 'তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই'। ২০ সংখ্যক কবিতাব কয়েকটি কথা গানের প্রয়োজনে পরিবর্তিত হয়েছে, যেমন 'মহৎপ্রয়াস' হয়েছে 'মহান দুঃখ'। ২১ সংখ্যক কবিতার সঙ্গে গানের কিছু হেরফের আছে। যেমন,

কবিতায়—	গানে—
দিন যায় ওগো দিন যায়	দিন যায় ওগো দিন যায়
দিনমণি যায় অস্তে।	দিনমণি যায় অস্তে
নাহি হেরি বাট দূর তীরে মাঠ	নিশার তিমিরে দশদিক ঘিরে
ধূসর গোধূলিময়।	জাগিয়া উঠিছে শত ভয়।
শেষ স্তবক—	গানে—
কোথা বুক জোড়া খোলা হাওয়া	কবে অকূলের খোলা হাওয়া
সাগরের খোলা হাওয়া কই।	দিবে সব জ্বালা জুড়ায়ে,
কোথা মহাগান ভরি দিবে কাণ	শুনা যাবে কবে ঘনঘোর রবে
কোথা সাগবের মহাগান।	মহাসাগরেব কলগান।

১০০ সংখ্যক কবিতার দ্বিতীয় স্তবকটি গানে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে এবং গানে আরও কিছু কথার পরিবর্তন ঘটেছে। যথা

কবিতাটির আরম্ভ—	গানের আরম্ভ—
সংসারে মোরে রাখিযাছ যেই ঘরে	সংসাবে তুমি রাখিলে মোরে যে ঘরে
সেই ঘরে রব সকল দুঃখ ভুলিযা	সেই ঘরে রব সকল দুঃখ ভুলিয়া।
প্রথম স্তবকের শেষাংশ—	গানে এই অংশ—
সেথা হতে বায়ু বহিবে হৃদয 'পরে	সেথা হতে বায়ু বহিবে হৃদয 'পরে
চরণ হইতে তব পদরজ তুলিয়া।	চরণ হইতে তব পদধূলি তুলিয়া॥

সে দুয়ার খুলি আসিবে তুমি এ ঘরে
আমি বাহিরিব সে দুয়ারখানি খুলিয়া। (পরবর্তী চরণ গানে বর্জিত হয়েছে।)

কবিতার তৃতীয় স্তবকের 'যত বিশ্বাস', গানে সঞ্চারীতে হয়েছে 'যত আশ্রয়'। তাছাড়া 'এক বিশ্বাস রহে যেন চিতে লাগিয়া' গানে হয়েছে 'এক আশ্রয়ে রহে যেন চিত লাগিয়া'।

পরবর্তী অংশের পার্থক্যও এইরূপ—

কবিতায়—	গানে—
দুখ পশে যবে মর্মের মাঝখানে	যবে দুখদিনে শোকতাপ আসে প্রাণে
তোমার লিখন-স্বাক্ষর যেন আনে	তোমারই আদেশ বহিয়া যেন সে আনে
রুক্ষ বচন যতই আঘাত হানে	
সকল আঘাতে তব সুর উঠে জাগিয়া	পরুষ বচন যতই আঘাত হানে
শত বিশ্বাস ভেঙে যদি যায় প্রাণে	সকল আঘাতে তব সুর উঠে জাগিয়া
এক বিশ্বাসে রহে যেন মন লাগিয়া।	

উৎসর্গ ১৩২১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও এর কবিতাগুলি ১৩১০ সালের মধ্যেই মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থাবলীর (১৩১০) জন্য লিখিত হয়। উৎসর্গের পরিশিষ্টসহ তিনটি কবিতার সংগীতরূপ প্রচলিত—

আমি চঞ্চল হে (৮ সংখ্যক)
হে ভারত আজি নবীন বর্ষে (পরিশিষ্ট ১২)
নব বৎসরে করিলাম পণ (ঐ ১৪)

'আমি চঞ্চল হে' কবিতাটি মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থাবলীর বিশ্ব-পর্যায়ের কবিতাগুলির প্রবেশকরূপে লিখিত। সংগীতে রূপান্তরকালে কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকটি বর্জিত হয়েছে। গৃহকোণবদ্ধ জীবনের ব্যাকুল রৌদ্রাভিসার, পিঞ্জরিত আত্মার উদগ্র সুদূরাকুলতা, বন্দী বিহঙ্গের মুক্তিপিপাসা কী করুণ উৎকণ্ঠাকাতর মূর্ছনায় এই গানের সুরে ধ্বনিত হয়েছে তা বোঝানো কঠিন। বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথের জীবন-অভিজ্ঞতাশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ চরৈবেতিমন্ত্র এই গানটির কথা ও সুরে স্তম্ভিত হয়ে আছে।

'হে ভারত আজি নবীন বর্ষে' এবং 'নব বৎসরে করিলাম পণ' কবিতা-রূপেই সুপরিচিত (রচনা ১৩০৯ নববর্ষ) কিন্তু এই দুটির উপর সুরার্পণ করা হয়েছিল এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বহু গীতসংকলনে গান দুটি সংকলিত হয়েছিল। প্রথম গানটির ভাষা পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে 'হে ভারত আজি তোমারই সভায়'।

খেয়া (১৩১৩) কাব্যগ্রন্থে কবি নৈবেদ্যের মত ক্রমশ অন্তর্মুখী ও ঈশ্বরচেতন হয়ে উঠেছেন। খেয়াতেও কয়েকটি গান আছে এবং কয়েকটি কবিতার গীতিরূপান্তর ঘটেছে। ডক্টর সুকুমার সেন লিখেছেন—

"খেয়ার সময় হইতে কবিতার ধারা আর গানের ধারা তফাৎ হইতে সুরু করিয়াছে। তাহার আগেও কোনো কোনো কাব্যে গান ছিল (যেমন কল্পনায়)। কিন্তু সে গান স্বতন্ত্র কাব্যগীতির রূপ পায় নাই। গানের ধারায় বেগ আসিল স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিবার সময়। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি দেশপ্রেমের গান লেখেন ও তাহাতে বাউলের সুর লাগান। গানগুলি 'বাউল' নামে পুস্তিকাকারে (১৯০৫) প্রকাশিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের এই গান-গুলি স্বদেশী আন্দোলনে প্রাণসঞ্চার করিয়াছিল। তাহাব পর এই ধারা প্রবল হইয়া বহিল গীতাঞ্জলি গীতিমাল্যে। তাহার পর কবিতার ধারার সঙ্গে গানের ধারা পাশাপাশি বহিতে লাগিল—গীতালি-বলাকার সময় হইতে শেষ পর্যন্ত"।[১৭]

এই উক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় না। খেয়ার সময় থেকে কবিতার ধারা আর গানের ধারা পৃথক হতে সুরু করেছে এর দ্বারা তিনি কী বুঝিয়েছেন স্পষ্ট নয়, অথচ নিজেই বলেছেন যে তারও আগে কোনো কোনো কাব্যে গান ছিল। আমরা আগেই দেখেছি যে, 'কোনো কোনো কাব্যে' না, প্রায় প্রতিটি কাব্যেই কিছু না কিছু গান আছে। কবিতার ধারা গানের ধারা গীতালি-বলাকার সময় থেকে কেন, কাব্যজীবনের সূচনা থেকেই পাশাপাশি বহমান। খেয়ার গানগুলি ও তাদের কাব্যরূপের তালিকা এইরূপ—

আমার নাইবা হল পারে যাওয়া (ঘাটে), দুখের বেশে এসেছ বলে (দুঃখমূর্তি), আমার গোধূলিলগন এল বুঝি কাছে (গোধূলিলগ্ন), আমি কেমন করিয়া জানাব (মিলন), বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে (বিকাশ), তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার (ভার), সেটুকু তোর অনেক আছে (সীমা), তুমি এপার ওপার কর কে গো (খেয়া)।

'ঘাটে' কবিতাটি খেয়া কাব্যে সংগীতরূপেই উল্লিখিত (অর্থাৎ সুরের উল্লেখ-সহ)। 'দুঃখমূর্তি', 'গোধূলিলগ্ন', 'মিলন'—এই কবিতা তিনটি সম্ভবত পরবর্তী কোনো সময়ে গানে রূপান্তরিত হয়েছে।[১৮] 'গোধূলিলগ্ন' ও 'মিলন' কবিতার সম্পূর্ণ স্তবকগুলি গানে নেই, 'গোধূলিলগ্নে'র তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবক এবং 'মিলন' কবিতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবক গানে বর্জিত হয়েছে। অন্যত্র বিশেষ

পাঠভেদ নেই, কেবল 'মিলন' কবিতায় সামান্য কয়েকটি কথা ও শব্দের বদল ঘটেছে। 'ভার' কবিতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকও গানে বর্জিত হয়েছে। 'বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে' গানের আঙ্গিকেই রচিত। একটি বৈদিক উষা-সূক্তের সঙ্গে গানে ব্যবহৃত সমাসোক্তির সাদৃশ্য আছে। কিন্তু সংগীতরূপে পরিচিত অংশে কবিতার সব চরণগুলি নেই। কবিতার নিম্নোক্ত অংশ—

কুঁড়ির মত ফেটে গিয়ে ফুলের মত উঠল কেঁদে

সুধাকোষের সুগন্ধ তার পারলে না আর রাখতে বেঁধে।

—গানে বর্জিত হয়েছে। ফলে গানটি খণ্ডিত হয়েছে বলে মনে হয়। ঈষৎ পরবর্তীকালে গানটিকে কবি শারদোৎসব (১৩১৫) নাটকের ভূমিকাস্বরূপ ব্যবহার করেন। 'ঘাটে' কবিতার সুর বাউল-ভাটিয়ালির মিশ্রণ বলা যায়। 'সীমা' কবিতার গানে রূপান্তরিত চরণ হল 'এক মনে তোর একতারাতে একটি যে সুর সেইটে বাজা'। 'খেয়া' এই কাব্যের নাম কবিতা, শেষে স্থাপিত হলেও সমগ্র কাব্যের ভূমিকা এবং 'শেষ খেয়া'র সম্পূরক।

নৈবেদ্য গ্রন্থের গানগুলির মধ্যে ব্রহ্মসংগীতের লক্ষণ যতখানি, খেয়াতে ততটা নেই। নৈবেদ্যে কবি ঈশ্বরকে জীবনস্বামী, প্রভু, জীবননাথ, পূর্ণ, অন্তরযামী ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করেছেন। নৈবেদ্যের ভক্তি সম্বোধনাত্মক। খেয়ায় কবি স্বগত—ঈশ্বরচেতন কিন্তু ঈশ্বরসর্বস্ব নন। এখানে যে কটি গান সম্বোধনের ভঙ্গিতে রচিত তার প্রতিটিতে অনির্দিষ্ট কর্তার ইঙ্গিত। 'দুখের বেশে এসেছ বলে' গানটিতেই কেবল 'স্বামী' শব্দের ব্যবহার আছে। কিন্তু খেয়ার যুগে যে দুঃখাভিঘাত ও তজ্জনিত উত্তরণপ্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, খেয়ার গানগুলিতেও তার রক্তরাগ অঙ্কিত হয়েছে। 'আমার নাইবা হল পারে যাওয়া' গানের নিষ্ফল মধ্যবর্তিতা, 'গোধূলিলগন এল বুঝি কাছে' গানের ব্রীড়াতুর প্রিয়মিলনসম্ভাবনা, 'আমি কেমন করিয়া জানাব' গানের সৌন্দর্যমুগ্ধ প্রকৃতিনিষ্ঠ গভীর প্রশান্তি, 'তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার' গানের আত্মভারগ্রস্ত সাংসারিকের বিপন্ন অসহায়তা, 'তুমি এপার ওপার কর কে গো' গানের রহস্যময় নেয়ের প্রতি কবির সকাতর দৃষ্টি—এসবই ব্যক্তিগত কবিহৃদয়ের রাগানুরাগ-অনুভূতি-আবেগের প্রসূতি। নৈবেদ্য স্তব, খেয়া বাস্তব। ছন্দের দিক থেকেও খেয়ার নূতনত্ব দ্রষ্টব্য। নৈবেদ্যের গানগুলি সবই যৌগমাত্রিক ধ্বনি-প্রধান ছন্দে রচিত। খেয়ার কবিতা মুখ্যত শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দে রচিত—খেয়ার কয়েকটি গানেও কবি এই শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের প্রয়োগ করেনেছ।

'ঘাটে,' 'দুঃখমূর্তি' ও 'বিকাশ' এইরূপ নূতন ছন্দে লেখা গান। 'ঘাটে' কবিতাটি সম্ভবত শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দে গানের আঙ্গিকে লেখা প্রথম গান। পরবর্তী গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালিতে এর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। খেয়া গীতাঞ্জলির যুগে পারান্তরের খেয়া।

৬

গীতাঞ্জলি (১৩১৭), গীতিমাল্য (১৩২১) ও গীতালি (১৩২১) তিনটি কাব্য একই গুচ্ছে গ্রথিত, তিনটি কাব্যের রূপরীতির মধ্যেই সাদৃশ্য আছে এবং তিনটি কাব্যের নামকরণ এক জাতীয়। তিনটি কাব্যেই কবির গানের ভিতর দিয়ে জগৎদর্শন, বিশ্বপর্যটন, সংগীতের সূক্ষ্মতার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরসমীপ্য। কিন্তু এই ঈশ্বরানুভূতি কেবল ভক্তি নয়, অন্তরউপলব্ধি ও আত্মোপলব্ধির আনন্দ মাত্র। খেযার যুগ থেকে বহু সাংসারিক ক্ষয়ক্ষতি, দুঃখবেদনা, প্রিয়জনের মৃত্যুজনিত শোকঘাত কবিকে রিক্ত নিঃসঙ্গ করে তুলেছিল। কবি ক্রমেই বহির্জগতের কলকোলাহল থেকে সরিয়ে এনে আপনাকে বিশ্বেশ্বরের নিভৃতবিশাল প্রাঙ্গণে দাঁড করিয়ে দিচ্ছিলেন। কণ্ঠে কেবল উদ্‌গত স্বর নিয়ে তাঁর আরতি, সেই আরতির প্রথম বিল্বদল গীতাঞ্জলি কাব্য।

গীতাঞ্জলির গীতরূপে পরিচিত গানগুলির সঙ্গে গ্রন্থে প্রকাশিত কাব্যরূপের বিশেষ পাঠভেদ নেই। গীতাঞ্জলির স্বরনির্ভর গানগুলির তালিকা—

১ আমার মাথা নত করে দাও হে, ২ আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই, ৩ কত অজানারে জানাইলে তুমি, ৪ বিপদে মোরে রক্ষা কর, ৫ অন্তর মম বিকশিত কর, ৬ প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে, ৭ তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে, ৮ আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়, ৯ আনন্দেরই সাগর হতে, ১০ তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ, ১১ আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, ১২ লেগেছে অমল ধবল পালে, ১৩ আমার নয়ন-ভুলানো এলে, ১৪ জননী তোমার করুণ চরণখানি, ১৫ জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দগান বাজে, ১৬ মেঘের পরে মেঘ জমেছে, ১৭ কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো, ১৮ আজি শ্রাবণঘনগহন-মোহে, ১৯ আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, ২০ আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, ২২ জানি জানি কোন আদিকাল হতে, ২২ তুমি কেমন করে গান করহে গুণী, ২৩ অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না, ২৪ যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু, ২৫ হেরি অহরহ তোমারই বিরহ,

২৬ আর নাইরে বেলা নামল ছায়া, ২৭ আজ বারি ঝরে ঝরঝর, ২৮ প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে, ২৯ ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়, ৩০ এই তো তোমার প্রেম ওগো, ৩১ আমি হেথায় থাকি শুধু, ৩২ দাও হে আমার ভয় ভেঙে দাও, ৩৩ আবার এরা ঘিরেছে মোর মন, ৩৪ আমার মিলন লাগি তুমি, ৩৫ এসো হে এসো সজল ঘন, ৩৬ পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে, ৩৭ নিশার স্বপন ছুটল রে এই, ৩৮ শরতে আজ কোন অতিথি এল, ৩৯ হেথা যে গান গাইতে আসা আমার, ৪০ যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে, ৪১ এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে, ৪২ গায়ে আমার পুলক লাগে, ৪৩ প্রভু আজি তোমার দক্ষিণ হাত রেখো না ঢাকি, ৪৪ জগতে আনন্দ-যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ, ৪৫ আলোয় আলোকময় করে হে, ৪৬ আসনতলের মাটির পরে, ৪৭ রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন, ৫০ নিভৃত প্রাণের দেবতা, ৫১ কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে, ৫৪ আজি গন্ধবিধুর সমীরণে, ৫৫ আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে, ৫৬ তব সিংহাসনের আসন হতে, ৫৭ তুমি এবার আমায় লহ হে নাথ, ৫৮ জীবন যখন শুকায়ে যায়, ৫৯ এবার নীরব করে দাও হে তোমার, ৬০ বিশ্ব যখন নিদ্রামগন গগন অন্ধকার, ৬১ সে যে পাশে এসে বসেছিল, ৬২ তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি, ৬৫ কবে আমি বাহির হলেম, ৬৮ আমার খেলা যখন ছিল তোমার, ৬৯ ঐ রে তরী দিল খুলে, ৭০ চিত্ত আমার হারালো আজ, ৭২ যতবার আলো জ্বালাতে চাই, ৭৪ বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি, ৭৫ দয়া দিয়ে হবে গো মোর, ৭৯ ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা, ৮৬ আমারে যদি জাগালে আজি নাথ, ৯০ আরো আঘাত সইবে আমার, ৯১ এই করেছ ভালো নিঠুর, ৯২ দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে, ৯৪ বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহার, ৯৬ যেথায় তোমার লুট হতেছে ভুবনে, ৯৯ আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে, ১০০ আজি বরষার রূপ হেরি, ১০১ হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহ প্রাণ, ১০৬ হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগোরে ধীরে, ১০৭ যেথায় থাকে সবার অধম, ১১৩ নদীপারের এই আষাঢ়ের প্রভাতখানি, ১১৭ যাত্রী আমি ওরে, ১১৮ উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে, ১২০ সীমার মাঝে অসীম তুমি, ১২১ তাই তোমার আনন্দ আমার পর, ১৪০ ওরে মাঝি ওরে আমার মানবজন্মতরীর মাঝি, ১৪৫ জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চাই, ১৪৭ জীবনে যত পূজা হল না সারা, ১৪৮ একটি নমস্কারে প্রভু।

দেখা যাচ্ছে গীতাঞ্জলির মোট ১৫৭খানি কবিতার মধ্যে ৭২টি কবিতায় সুর সংযোজিত হয়নি, ৮৫খানি গানে পরিণত হয়েছে, অর্থাৎ গীতাঞ্জলির কবিতাগুচ্ছের অর্ধেকেরও অধিক রচনাই সংগীত। ভাবতে অবাক লাগে সংগীতের কী অভাবনীয় দিব্যপ্রেরণায় কবির কাব্যজীবন এমন গীতসুধারসে পূর্ণ হয়েছিল, কোন আশ্চর্য গাণ্ডীবধন্বা প্রতিভা কথার ভূমিগর্ভ থেকে সুরের ভোগবতীর ধারা উৎসারিত করেছিল। গীতাঞ্জলির ৯৭ ও ১৩২ সংখ্যক কবিতা দুটিতে কবি স্বয়ং তাঁর এই নবসুরসাধনার রহস্য ব্যাখ্যা করেছেন। চিত্রা কাব্যের যুগে কবি যেমন তাঁর কাব্যসাধনার অন্তরালে 'কবিতা কল্পনালতা' এক মানসসুন্দরী জীবনদেবতার প্রেরণা অনুভব করেছিলেন, তেমনি গীতাঞ্জলি পর্বেও কবি তাঁর সুরসাধনাকে কোনো দুর্জ্ঞেয় অথচ অনিবার্য দেবতার দান বলে গ্রহণ করেছেন—

ফুলের মতন আপনি ফুটাও গান,
হে আমার নাথ, এই তো তোমার দান।
ওগো সে ফুল দেখিয়া আনন্দে আমি ভাসি,
আমার বলিয়া উপহার দিতে আসি
তুমি নিজ হাতে তারে তুলে লও স্নেহে হাসি,
দয়া করে প্রভু রাখো মোর অভিমান।

দেবতার দান এই পুষ্পপ্রতিম অর্ঘ্য ধরার ধূলায় পুনরায় ঝরে গেলেও কবির কোনো খেদ নেই, কারণ এগুলি তাঁর যন্ত্রণাদিগ্ধ মনের নির্মিতি নয়। এগুলি প্রসন্ন অনুপ্রাণিত মনের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ—

তারা আমার জীবনে ক্ষণকাল তরে ফুটে,
চিরকালতরে সার্থক করে প্রাণ। (৯৭ সংখ্যক)

এখন গানই তাঁর কাছে ঈশ্বরৈষণার পরশমণি, আলোকনক্ষত্র-দর্শনের বাতায়নিকা। গীতাঞ্জলির সুর-না-দেওয়া গীতকল্প আর একটি কবিতায় তাই কবি বলেছেন—

গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি
বাহির মনে
চিরদিবস মোর জীবনে।

নিয়ে গেছে গান আমারে
ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে,
গান দিয়ে হাত বুলিয়ে বেড়াই
এই ভুবনে। (১৩২ সংখ্যক)

গানের অঙ্গুলি দিয়ে কবির ভুবন স্পর্শ করার এই আশ্চর্য অভিজ্ঞতারই কাব্য গীতাঞ্জলি।

গীতাঞ্জলির এই গীতাত্মক গীতিকবিতাগুলি সম্পর্কে সাধারণভাবে কয়েকটি কথাসূত্র সংকলন করা যায়। কবির কাছে কবিতা ও গান, কথা ও সুর এই যুগে একই প্রেরণার অন্তর্গত হয়ে গেছে। এই গানই তাঁকে বিচিত্র সুখদুঃখের রাজ্য থেকে রহস্যলোকের প্রত্যন্তসীমা পরিভ্রমণশেষে সন্ধ্যাবেলায় নিভৃত চিত্তের বেদীসম্মুখে এনে তুলেছে। একটি অকৃত্রিম ভক্তিরসাত্মকতায় আর্দ্র কবিমন সুরের ঝরনায় স্নান করে উঠেছে, বারে বারে অবগাহনের পর যেন সূর্যস্তব করেছে করজোড়ে—সেই পুণ্যাত্ম স্তববন্দনার সঙ্গেই গীতাঞ্জলি পর্বের গানগুলির তুলনা চলে। রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রায় প্রথম সাহিত্যিক সূচনা থেকেই নানা প্রয়োজনে ব্রহ্মসংগীত রচনা করে এসেছেন। বিলাত থেকে ফেরার পর এবং প্রাক্‌গীতাঞ্জলি পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে মাঘোৎসব বা ব্রাহ্মসমাজের বহু আচার-অনুষ্ঠান স্মরণ করে কবি অজস্র ভক্তি- ও পূজা-সংগীত রচনা করেছিলেন। কিন্তু গীতাঞ্জলি যুগের গানগুলি আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মসংগীত নয়, এইগুলি কবিমনের স্বাভাবিক কাব্যধর্মের সঙ্গেই উৎসারিত। এই যুগের গানে কবির ভক্তি-সাহিত্যের অবিস্মরণীয় বৈশিষ্ট্য যে 'লীলাবাদ, তারই প্রতিফলন ঘটেছে এবং তাঁর জীবনদেবতাকে কবি কখনো নাথ, প্রভু, রাজা, আবার কখনো প্রিয়, প্রিয়তম, বন্ধু ইত্যাদি বলে সম্বোধন করেছেন। নৈবেদ্য-খেয়া-গীতাঞ্জলি যুগের এই গানের রাজাই সমকালীন 'রাজা' নাটকে আরও ঘনীভূত সংহত তত্ত্বের আকারে প্রকাশিত হয়েছে। আবার নৈবেদ্য-খেয়ার ভক্তিসংগীতে অন্তর্লোকের ধ্যানই যেন মুখ্য, গীতাঞ্জলির যুগে অন্তর্লোকের সঙ্গে বহির্লোক মিলিত হয়েছে—মুক্ত প্রকৃতিকে পটভূমিকা করে কবি পূজাস্তব রচনা করেছেন। গীতাঞ্জলির ৬-১৪, ১৬-২০, ২৬, ২৭, ৩০, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৪৫, ৫৪, ৫৫, ৭০, ৯৯, ১০০, ১১৩ প্রভৃতি গানগুলিতে প্রকৃতি-নিসর্গের যে ভূমিকা দেখা যায়, কবির পূর্বযুগের পূজাসংগীতে তা দুর্লভ ছিল। নৈবেদ্য-ভুক্ত গানগুলিতে বন্দনার সুর প্রবল, খেয়ার কয়েকটি গানে আত্মমগ্ন ঔদাসীন্য ও

কর্তব্যপরায়ণতার মধ্যবর্তী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু গীতাঞ্জলির কাব্যগীতে এই সবকে অতিক্রম করে একটি শাস্ত্রাচারবিমুক্ত সহজিয়া জীবনবোধ মর্তমমতা প্রেম সৌন্দর্যচেতনা ও অতীন্দ্রিয় আনন্দানুভূতির সংমিশ্রণ লক্ষ্য করি। খেয়ার কবিতাগুচ্ছে যে রাত্রির প্রাধান্য, গীতাঞ্জলির গোড়ার দিকের কিছু গানে তা আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা অপসারিত। গীতাঞ্জলি আলোকসংগীত।

অবশ্য গীতাঞ্জলির সব গানই একটি অলখ ভক্তিসূত্রে গ্রন্থিত মনে করার কোনো কারণ নেই। 'অল্প সময়ের ব্যবধানে যে সমস্ত গান পরে পরে রচিত হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি ভাবের ঐক্য থাকা সম্ভবপর' এই মনে করে কবি গীতাঞ্জলি সংকলন করেছিলেন। তবে দুএকটি ক্ষেত্রে সেই ভাবের ঐক্য' অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং নিতান্তই শিথিল মনে হয়। স্থূলভাবে গীতাঞ্জলির রচনাকাল ১৩১৩-১৩১৭ সাল। অর্থাৎ

১-৪ সংখ্যক গানের রচনাকাল	১৩১৩
৫-৭	১৩১৪
৮-১৪	১৩১৫
১৫-৫৯	১৩১৬ আষাঢ়-চৈত্র
৬০-১৫৭	১৩১৭ বৈশাখ-শ্রাবণ

দেখা যাচ্ছে গীতাঞ্জলির গানের ধারা ১৩১৬ আষাঢ় থেকেই পূর্ণ গতিতে শুরু হয়েছে এবং ৬০সংখ্যক সংগীত থেকে কবির গীতিপ্রবাহ না থেমে একেবারে পরবর্তী গীতিমালা পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গেছে।

গীতাঞ্জলির সব কটি রচনাই রবীন্দ্রসংগীতে পরিণত হয়নি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সবই গীতের অঞ্জলি। পূর্ববর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থে সাধারণ কবিতার সঙ্গেই সংগীত ছিল মিশ্রিত—গীতাঞ্জলি সেই হিসাবে সংগীতসর্বস্ব অথচ এটি গানের বই নয়। এমন কি এই গ্রন্থের যে কটি কবিতা গানের আঙ্গিকে রচিত নয়, যেগুলি বস্তুত কবিতাই, তারও দুএকটিকে গান করতে পেরেছিলেন কবি ('হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগোরে ধীরে' বা 'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন')। তাছাড়া গ্রন্থের প্রায় অর্ধাংশ সুরের প্রেরণাতেই রচিত, সেইগুলি যেন গানরূপেই শিল্পআত্মা থেকে উদ্বর্তিত হয়েছিল। সুরযোজিত গানগুলিতে কথা ও সুরের মধ্যে কালগত ব্যবধান সম্ভবত খুব বেশি ছিল না।

কবির এই সময়কার সংগীতরচনার পদ্ধতি সম্পর্কে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা এখানে স্মরণ করছি—

"আমরা যে সময়ে বোলপুরে ছিলাম রবিবাবুর গীতাঞ্জলির অনেকগুলি গান সে সময়ের লেখা। 'জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ বাজে' যেদিন লেখেন সেই দিন সুর দিয়ে দুপুরে যখন গান করেন আমরা তখন শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম। 'কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো' ইত্যাদি অনেকগুলি গানই যখন আষাঢ় মাসে আমরা ছিলাম, সেই সময়ের লেখা।"[১৯]

গীতাঞ্জলির অর্ধাংশে কবি সুরারোপ করেননি কেন, সে প্রশ্নের উত্তর আজ পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, কিন্তু সমস্ত রচনার মধ্যেই একটি সুরের আকৃতি আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আর্যগাথার সমালোচনা প্রসঙ্গে কবি লিখেছিলেন যে সেই গ্রন্থের কোনো কোনো কবিতায়—

"কোনো সুর না থাকিলেও ইহাকে আমরা গান বলিব—কারণ, ইহাতে আমাদের মনের মধ্যে গানের একটা আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া দেয়—যেমন ছবিতে একটা নির্ঝরিণী আঁকা দেখিলে তাহার গতিটি আমারা মনের ভিতর হইতে পূরণ করিয়া লই। আমরা সামান্য কথাবার্তার মধ্যেও যখন সৌন্দর্যের অথবা অনুভবের আবেগ প্রকাশ করিতে চাহি, তখন স্বতই আমাদের কথার সঙ্গে সুরের ভঙ্গি মিলিয়া যায়। সেইজন্য কবিতায় যখন বিশুদ্ধ সৌন্দর্যমোহ অথবা ভাবের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত হয় তখন কথা তাহার চিরসঙ্গী সংগীতের জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতে থাকে"।[২০]

গীতাঞ্জলির সুরহীন রচনাগুলি সম্পর্কেও কবির এই মন্তব্য সমভাবে প্রযোজ্য। প্রতিটি কবিতাই কবিকর্তৃক ইতিপূর্বে ব্যবহৃত আবিষ্কৃত ও প্রচলিত গীতিরূপের ছকেই রচিত। সেই গীতিরূপটি রবীন্দ্রনাথের পূর্বতন যুগের কাব্যের সুরহীন কোনো কবিতায় দেখা গেছে, এখন গীতাঞ্জলির প্রায় রচনাতেই তাকে দেখা যায়। গীতাঞ্জলির একটি সুরাশ্রিত এবং একটি সুরহীন কবিতা পাশাপাশি তুলনা করা যাক। প্রথমে সুরাশ্রিত কবিতা বা গান—

> জীবনে যত পূজা হল না সারা
> জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।
> যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে
> যে নদী মরুপথে হারাল ধারা,
> জানি হে জানি, তাও হয়নি হারা।

জীবনে আজও যাহা রয়েছে পিছে
জানি হে জানি তাও হয়নি মিছে।
আমার অনাগত আমার অনাহত
তোমার বীণাতারে বাজিছে তারা—
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা। (১৪৭ সংখ্যক)

এরই পাশে সুরবিহীন একটি কাব্যরূপ উদ্ধৃত করছি—

যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই—
যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।
এই জ্যোতিঃসমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে
তারই মধু পান করেছি, ধন্য আমি তাই—
যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।

বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে।
পরশ যাঁরে যায় না করা সকল দেহে দিলেন ধরা।
এইখানে শেষ করেন যদি শেষ করে দিন তাই—
যাবার বেলা এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই। (১৪২ সংখ্যক)

এ যেন একটি অশ্রুত সংগীত, অগীত গান। এটি আগাগোড়া গানের প্রচলিত রূপরীতিতেই রচিত। অথচ আক্ষেপ জাগে, এই ধরনের অনেকগুলি কবিতা কেন অপরূপ অলৌকিক সংগীত হয়ে উঠল না? গানে স্তবকান্তে যেমন প্রথম চরণটি ধ্রুবপদ হয়ে ঘুরে ঘুরে আসে এই সকল সুরহীন কবিতায়ও সেই ধ্রুবপদীয় প্রত্যাবর্তনের রীতিটি তার সাংগীতিক প্রবণতার অভ্রান্ত লক্ষণ হয়ে আছে। যথা—

মরণ যেদিন দিনের শেষে আসবে তোমার দুয়ারে
সেদিন তুমি কী ধন দিবে উহারে।
ভরা আমার পরানখানি সম্মুখে তার দিব আনি,
শূন্য বিদায় করব না তো উহারে—
মরণ যেদিন আসবে আমার দুয়ারে। (১১৪ সংখ্যক)

এছাড়া ১১৬, ১২৩, ১২৭, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৮, ১৩৯, ১৪১, ১৪২, ১৫১, ১৫৪ সংখ্যক কবিতাগুলিতে এইরূপ ধ্রুবপদীয় রীতির পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়।

গীতিমাল্যের (১৩২১) গানের ধারা গীতাঞ্জলিরই অনুবৃত্তি, গীতালিও তাই। তিনখানি কাব্যই একই মনোভাবের স্মারক, একই উৎসের উৎসবসংগীত, একই উপলব্ধি-তরুর ত্রিপত্র-পল্লব। গীতাঞ্জলির মতই এদের নামে যুগপৎ 'গীত' এই শব্দের এবং দেবচরণে নিবেদনের ব্যঞ্জনা নিহিত। গীতিমাল্যের কবিতাগুলিও গীতাঞ্জলির মত সুরাশ্রিত, কয়েকটিমাত্র সুরস্পর্শবিহীন। গীতিমাল্যের অন্তর্গত গানগুলির তালিকা—১-৩, ৭, ৮, ১৬-২৮, ৩০, ৩২-৩৭, ৩৯-৫২, ৫৫-৫৯, ৬১, ৬৩-৯৬, ৯৮, ৯৯, ১০১-১০৪, ১০৬-১০৮, ১১১ সংখ্যক। গীতিমাল্যের মোট ১১১ খানি গানের মধ্যে সুরযোজিত গানের সংখ্যা দেখা যাচ্ছে মোট ৮৯টি, অর্থাৎ গীতাঞ্জলির তুলনায় আনুপাতিক হার অধিক। গীতিমাল্যের সুরবিহীন কবিতাগুলির সবই অবশ্য গীতাঞ্জলির সুরবিহীন কবিতার মত গানের আঙ্গিকে রচিত নয়, কয়েকটি কবিতার রীতিতেই রচিত। বলা যেতে পারে যে, গীতিমাল্যে গান ও কবিতা দুই আছে।[২১] নৈবেদ্যের গানগুলি ছিল একান্তই ভক্তিরসাত্মক, গীতাঞ্জলিতে পূজাপর্যায়ের সঙ্গে ঋতুসংগীতও দেখা দিল। গীতাঞ্জলির সমসাময়িক শারদোৎসবের গানও গীতাঞ্জলির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গীতিমাল্যে এসে দেখতে পাচ্ছি গানের বিষয়বৈচিত্র্য আরও প্রসারিত হয়েছে। দেবতা ও মানবসম্পর্কের নিবিড়তা, নিসর্গ-সৌন্দর্য বর্ণনা থেকে সাধারণ পুষ্পও গীতিমাল্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নিঃশব্দ অন্ধকার রাত্রে দেব-মন্দিরে ক্ষীণ দীপালোকে ভক্ত ও ইষ্টদেবতা ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রভাতে সেই একই স্থানে বাইরের রৌদ্র ও পুষ্পঘ্রাণ প্রবেশ করে, পাখির ডাক শোনা যায়, দেউলের চত্বর পর্যন্ত চোখ প্রসারিত হয়। গীতিমাল্যের আরাধনার সময়কালও গীতাঞ্জলির তুলনায় পরিবর্তিত হয়েছে। গীতিমাল্যের অন্তর্গত ১৯, ২০ ও ৫৭ সংখ্যক গান গীতবিতানের প্রেমপর্যায়ের অন্তর্গত ও কবি স্বয়ং ঐ অন্তর্ভুক্তি সমর্থন করেছেন। সুতরাং গীতিমাল্যের গানগুলির মধ্যে 'ভাবের ঐক্য' কোন দিক দিয়ে বিচার্য, এবিষয়ে কবি কোনো সংকেত নির্দেশ করেননি। ৭৫ সংখ্যক গানটিও (জীবন আমার চলছে যেমন) গীতবিতানে পূজা-বিভাগে নেই, বিচিত্র-পর্যায়ে সংকলিত হয়েছে। গীতাঞ্জলির ক্ষেত্রেও এইরূপ দৃষ্টান্ত অবশ্য দুর্লভ নয়। গীতাঞ্জলির ৬১ সংখ্যক গান (সে যে পাশে এসে বসেছিল) গীতবিতানে প্রেমপর্যায়ভুক্ত এবং ১৪০ সংখ্যক গান (ওরে মাঝি ওরে আমার মানবজন্মতরীর) বিচিত্রপর্যায়ভুক্ত। তাছাড়া ঋতুপর্যায়ের অনেকগুলি গান গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্যে আছে।

গীতাঞ্জলি পর্বের গানগুলির সমাপ্তিকাল ছিল ২৯ শ্রাবণ ১৩১৭। তারপর ১৩২১-এ গীতিমাল্য প্রকাশিত হলেও গীতাঞ্জলি যুগের গানও গীতিমাল্যে আছে। গীতিমাল্যের ১-৩ সংখ্যক গান ১৩১৬ সালের রচনা। ৪-২৭ সংখ্যক গান চৈত্র ১৩১৮ থেকে বৈশাখ ১৩১৯ এর মধ্যে রচিত। এরপর কবি ইংলণ্ড যাত্রা করেন এবং আমেরিকা ও ইংলণ্ড ঘুরে সেপ্টেম্বর ১৯১৩ কলকাতা প্রত্যাবর্তন করেন। এর মধ্যবর্তী কালের সংগীত ও কবিতারচনার কালনির্দেশ ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় থেকে ১৩২১ আষাঢ় পর্যন্ত।

গীতিমাল্য রচনার পটভূমিতে দুটি অবিস্মরণীয় ঘটনা নিহিত। একটি কবির নোবেল পুরস্কার লাভ এবং আর একটি প্রথম মহাযুদ্ধ ঘোষণা। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির পূর্বে প্রতীচ্য রাষ্ট্রগুলি পরিভ্রমণকালে বিদেশের সুধীসমাজে কবি অভাবনীয় সম্বর্ধনা লাভ করেছিলেন, তারপর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর পুরস্কারপ্রাপ্তি ঘোষিত হয়। উভয় ঘটনার মধ্য দিয়েই কবি তাঁর জীবনচারী অদৃশ্যগোপন দেবতার অভ্রান্ত অমোঘ নির্দেশ অনুভব করেছিলেন। বহির্জগতের সমস্ত কলরোল, জনতার উন্মত্ত উত্তেজনা-বিক্ষোভ-চাঞ্চল্যের মধ্যেও আপনার চিত্তলোকে নিভৃতগোপন সেই জীবনাধীশের অঙ্গুলিসংকেতকে কবি অ.হেলা করেননি। ইতিমধ্যে মহাযুদ্ধের প্রলয়-সংবাদ এল, পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা, মানুষের কত কীর্তি, সভ্যতার কত অপব্যয়িত প্রলাপের রঙকরা প্রাচীর-গুলো ভেঙে পড়ল। কবির চিত্তও নিভৃত ভক্তির সরণী থেকে বেরিয়ে এল তাঁরই নির্দেশে মানবলোকের বিশ্বপ্রান্তরে, এগিয়ে চলার মহৎ বাণীতে তাঁর কাব্যবীণা ঝংকৃত হল। ধীরে ধীরে কবির সংগীতসাধনায় নতুন সুরের আগমনী শোনা গেল। গীতিমাল্যের পর গীতালি, গীতিমাল্যেরই উত্তরাধিকার, কিন্তু স্মরণযোগ্য যে, গীতিমাল্যের ১০২ সংখ্যক কবিতা থেকে ১১১ সংখ্যক কবিতা রচনার মধ্যেই বলাকার কাব্যধারা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

গীতালির মধ্যেও কবিতা এবং গান পূর্ববর্তী কাব্যের মত ও গানের সংখ্যা এখানেও কবিতা তথা সুরহীন গানের চেয়ে বেশি। গীতালির যে রচনাগুলি সুরাশ্রিত তার তালিকা—১, ৩-২৯, ৩১-৩৪, ৩৬-৩৮, ৪৩-৫০, ৫২, ৫৩, ৫৫-৫৭, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৫, ৬৯-৭১, ৭৩, ৭৫, ৭৮, ৮০, ৮৬, ৮৭, ৯০, ৯৫, ৯৭-৯৯, ১০১ এবং ১০৩ সংখ্যক। গীতালির মোট ১০৮টি রচনার মধ্যে ৬৮টি মাত্র সুরাশ্রিত, বাকিগুলি কবিতামাত্র—অর্থাৎ গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যের মতই গীতালি কাব্যগ্রন্থ, অবিমিশ্র গীতসংকলন নয়। কিন্তু এই কাব্যসাধনা কখনও গানের সুরে

কখনও গীতিমন্ত্রে সংসাধিত হয়েছে। তাই কাব্যগ্রন্থেই এই গানগুলির স্থান। নৈবেদ্য থেকে কবি সেই যে গীতিঅঞ্জলি দিতে সুরু করেছিলেন, গীতালিতে এসে তার অবসান ঘটল। এর মধ্যে গান ও কবিতা যেন এক হয়ে গিয়েছিল। গীতালির পরবর্তী যুগ থেকে গান ও কবিতা আবার পৃথক পথে চলেছে। গীতালির শেষ দুটি রচনা ১০৮ এবং ১০৭ সংখ্যক ('মুদিত আলোর কমল-কলিকাটিরে' এবং 'এই তীর্থ-দেবতার ধরণীর মন্দির-প্রাঙ্গণে') স্পষ্টই গানের আঙ্গিক ছেড়ে কবিতার পথ ধরেছে। কবি যে সুরের অঞ্জলির পালা ছেড়ে এলেন তারও ঘোষণা শোনা যায় গীতালির শেষ রচনায়—

এই তীর্থ-দেবতার ধরণীর মন্দির-প্রাঙ্গণে
যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইনু সযত্ন চয়নে
সায়াহ্নের শেষ আয়োজন ; যে পূর্ণ প্রণামখানি
মোর সারা জীবনের অন্তরের অনির্বাণ বাণী
জ্বালায়ে রাখিয়া গেনু আরতির সন্ধ্যাদীপ-মুখে
সে আমার নিবেদন তোমাদের সবার সম্মুখে
হে মোর অতিথি যত।

আরতির সন্ধ্যাদীপমুখে পুষ্পাঞ্জলি ও প্রণামখানি রেখে, সুরের ডালিতে অন্তরের অনির্বাণ বাণী সাজিয়ে অতিথিগণের আয়োজন সম্পূর্ণ করলেন কবি, কিন্তু তাঁর গন্তব্য কোথায়, কোন উদয়দিকপ্রান্তে রাত্রির নক্ষত্রের মত, রূপ হতে রূপে, প্রাণ হতে প্রাণে, অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে? গীতালির পর বলাকায় সে জিজ্ঞাসায় অবসান।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির গানগুলির সমকালীন কয়েকখানি গান ও কবিতা রবীন্দ্র রচনাবলীর একাদশখণ্ড সংযোজনাংশে মুদ্রিত হয়েছে। সেই গানগুলি যথাক্রমে—

জাগো নির্মল নেত্রে (৪ আশ্বিন ১৩১৭)
প্রভু আমার প্রিয় আমার (৫ আশ্বিন ১৩১৭)
আজি নির্ভয়নিদ্রিত ভুবনে (অগ্রহায়ণ ১৩১৭)
যদি আমায় তুমি বাঁচাও তবে (? ১৩১৭)
দুঃখ যে তোর নয় রে চিরন্তন (১ আশ্বিন ১৩২১)

৭

বলাকা (১৩২৩) রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহে বাঁকপরিবর্তনের কাব্য। গীতাঞ্জলি-গীতালির গানের যুগ শেষ হয়ে এল, সুরের অঞ্জলি দিয়ে কবি আর পরবর্তীকালে এমন করে জীবনদেবতার চরণে নৈবেদ্য অর্পণ করেননি। কিন্তু বলাকার প্রথম দিকের কবিতায় এবং অন্তর্বর্তী কিছু কিছু কবিতায় অব্যবহিত পূর্বযুগের গীতিরচনার প্রভাব একেবারে লুপ্ত হয়নি। বলাকার প্রথম পাঁচটি কবিতার ছন্দ গীতালির মতই শ্বাসাঘাতপ্রধান, স্তবকান্তে একই মিলের ব্যবহার তাদের সংগীতধর্মেরই পরিচায়ক। এমন কি ৩৪ সংখ্যক (আমার মনের জানলাটি আজ) কবিতাটিও এই প্রকার। ২৮ সংখ্যক (পাখিরে দিয়েছ গান গায় সেই গান) কবিতায় কবি লিখেছেন—

পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান,
তার বেশি করে না সে দান।
আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি দান,
আমি গাই গান।

'আমি গাই গান' অত্যন্ত ব্যাপ্তার্থে ব্যবহৃত, কারণ গানের ধারা বলাকার যুগে সত্যই স্তিমিত। তবে বলাকা কাব্যের কয়েকটি কবিতার সঙ্গে গানের সম্পর্ক আছে। সেইগুলি যথাক্রমে—

সংখ্যা ৬ তুমি কি কেবল ছবি
১৫ মোর গান এরা সব শৈবালের দল
৩০ আনন্দগান উঠুক তবে বাজি
৩৫ আজ প্রভাতের আকাশটি এই

বলাকার ৬ষ্ঠ কবিতার (তুমি কি কেবল ছবি) কয়েকটি চরণ সুরযোজিত হয়ে পরবর্তীকালে একটি অপূর্ব রবীন্দ্রসংগীতে পরিণত হয়েছে। সম্ভবত শাপমোচন নাটকের প্রয়োজনেই এই সুরযোজনা ঘটেছে। তানপ্রধান ছন্দের কবিতাকে সুরে রূপান্তরিত করার বিচিত্র পরীক্ষা ইতিপূর্বে বহুবার ঘটেছে—সুতরাং 'ছবি' কবিতার এই সুরযোজনা আশ্চর্য ব্যাপার নয়। দীর্ঘ কবিতার যে চরণগুলি গানে গৃহীত হয়েছে তার মধ্য দিয়ে কবিতার মূল ভাববস্তু ঘনীভূতভাবে ধরা পড়েছে, এইখানেই কবির কৃতিত্ব। সংগীতের ক্ষণবদ্ধ আয়তনের মধ্যে কবিতার ভাব আরও পরিণত প্রবীণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

'মোর গান এরা সব শৈবালের দল' কবিতাটি 'আমার গান' নামে সবুজ পত্রের ১৩২২ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, তখন এটি কবিতাই ছিল। উদ্দেশ্য কবির আপন সংগীতের আত্মপরিচয় ও কৈফিয়ৎ। গীতবিতানে 'গানগুলি মোর শৈবালেরই দল' ('বসন্ত' নৃত্যনাট্যে কবির গান) গানটি স্পষ্টই বলাকার আলোচ্য কবিতাটির গীতিরূপান্তর। কিন্তু কবি এক্ষেত্রে কবিতাটিকে সুরান্তরিত করেননি, কবিতার ভাব অবলম্বন করে নতুন গান লিখেছেন। কবিতার ভাব নিয়ে গান-রচনা রবীন্দ্রনাথের নতুন নয়—কিন্তু অন্যত্র তা সহজে বোঝা যায় না। এখানে কবিতা ও গানে সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট, দুটি রচনা পাশাপাশি রাখলেই তা বোঝা যাবে। প্রথমে কবিতাটি—

মোর গান এরা সব শৈবালের দল,
যেথায় জন্মেছে সেথা আপনারে করেনি অচল।
মূল নাই, ফুল আছে, শুধু পাতা আছে,
আলোর আনন্দ নিয়ে জলের তরঙ্গে এরা নাচে।
বাসা নাই, নাইকো সঞ্চয়,
অজানা অতিথি এরা কবে আসে নাইকো নিশ্চয়।

যেদিন শ্রাবণ নামে দুর্নিবার মেঘে,
দুই কূল ডোবে স্রোতোবেগে,
আমার শৈবালদল
উদ্দাম চঞ্চল,
বন্যার ধারায়
পথ যে হারায়,
দেশে দেশে
দিকে দিকে যায় ভেসে ভেসে।

এর পাশে বসন্ত নৃত্যনাট্যের গানটি রাখলেই বোঝা যাবে, কবি মূল কবিতার বক্তব্য ও ভাব অবলম্বনে নতুন করে গানটি লিখেছেন—

গানগুলি মোর শৈবালেরই দল—
ওরা বন্যাধারায় পথ যে হারায় উদ্দাম চঞ্চল।
ওরা কেনই আসে যায় বা চলে,

অকারণের হাওয়ায় দোলে—
চিহ্ন কিছুই যায় না রেখে, পায় না কোনো ফল।
ওদের সাধন তো নাই, কিছু সাধন তো নাই,
ওদের বাঁধন তো নাই, কোনো বাঁধন তো নাই।
উদাস ওরা উদাস করে গৃহহারা পথের স্বরে,
ভুলে-যাওয়ার স্রোতের পরে করে টলোমল॥

বলাকার 'আজ প্রভাতের আকাশটি এই' গানের আঙ্গিকেই রচিত এবং সে গান বলাকার কাব্যধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত বলে মনে হয় না, কেবল রচনাকালের নৈকট্যে বলাকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গীতবিতানে এই গানটির ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ পাওয়া যায়, তাতে প্রথম চরণটি 'তরুণ প্রাতের অরুণ আকাশ শিশির ছলোছলো'। অন্যান্য অংশ অপরিবর্তিত আছে।

পূরবী (১৩৩২) কাব্যের মাত্র দুটি কবিতায় ('আনমনা' এবং 'বদল') সুর যোজনা করা হয়েছে। সে দুটি হল—'আনমনা গো আনমনা' এবং 'হাসির কুসুম আনিল সে ডালি ভরি'। 'আনমনা' কবিতাটির প্রথম স্তবক এবং শেষ স্তবকের কয়েকটি ছত্র নিয়ে 'আনমনা আনমনা' গানটি রচিত হয়েছে। সম্ভবত 'ছবি' কবিতার সুরও এই গানটির সঙ্গেই দেওয়া হয়েছিল। দুটিই শাপমোচন নৃত্য-নাট্যে ব্যবহৃত হয়েছে। 'বদল' কবিতাটি গানে রূপান্তরিত হয়েছে এবং কথারও পরিবর্তন ঘটেছে। কবিতা ও গানের রূপটি পাশাপাশি তুলে দেওয়া হচ্ছে। প্রথমে কবিতাটি—

হাসির কুসুম আনিল সে, ডালি ভরি
    আমি আনিলাম দুখ-বাদলের ফল।
শুধালেম তারে, 'যদি এ বদল করি,
    হার হবে কার বল'।
হাসি কৌতুকে কহিল সে সুন্দরী
    'এসো না বদল করি।
দিয়ে মোর হার লব ফলভার
    অশ্রুর রসে ভরা'।
চাহিয়া দেখিনু মুখপানে তার
    নিদয়া সে মনোহরা।

সে লইল তুলে আমার ফলের ডালা,
করতালি দিল হাসিয়া সকৌতুকে।
আমি লইলাম তাহার ফুলের মালা,
তুলিয়া ধরিনু বুকে।
'মোর হল জয়' হেসে হেসে কয়
দূরে চলে গেল ত্বরা।
উঠিল তপন মধ্যগগনদেশে,
আসিল দারুণ খরা,
সন্ধ্যায় দেখি তপ্ত দিনের শেষে
ফুলগুলি সব ঝরা।

হাসি কৌতুক ও অশ্রুবেদনার মধ্যে হাসির ক্ষণস্থায়িত্বই আলোচ্য গানটির ভাবার্থ। গানে মূল কবিতায় বক্তব্য অবিকৃতই আছে অথচ সংগীত রূপটির জন্য গানটি পুনর্লিখিত করেছেন—

তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার কত রঙে রঙ-করা।
মোর হাতে ছিল দুখের ফলের ভার অশ্রুর রসে ভরা।
সহসা আসিল ; কহিল সে সুন্দরী, 'এসো-না বদল করি'।
মুখপানে তার চহিলাম, মরি মরি, নিদয়া সে মনোহরা।
সে লইল মোর ভরা বাদলের ডালা, চাহিল সকৌতুকে।
আমি লয়ে তার নবফাগুনের মালা তুলিয়া ধরিনু বুকে।
'মোর হল জয়' যেতে যেতে কয় হেসে, দূরে চলে গেল ত্বরা।
সন্ধ্যায় দেখি তপ্ত দিনের শেষে ফুলগুলি সব ঝরা।

পূরবীর 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটির সংগীতরূপের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য। 'হে নূতন দেখা দিক আরবার' কবিজন্মদিবসের এই গানটি পূরবীর বিখ্যাত কবিতারই অংশবিশেষ। অবশ্য এই সুরযোজনা কবির জীবনের সর্বশেষ সাংগীতিক কীর্তি। গীতবিতানের গ্রন্থপরিচয় থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি—

"কবি বহুদিন পূর্বে (২৫ বৈশাখ ১৩২৯) যে কবিতা (পঁচিশে বৈশাখ : পূরবী) লিখিয়াছিলেন তাহারই শেষ দিকের কতকগুলি ছত্র লইয়া, একটু-আধটু পরিবর্তন করিয়া, ইহার রচনা ও সুরযোজনা বাঙলা ১৩৪৮ সালের ২৩ বৈশাখ তারিখে ; কবির পরবর্তী জন্মদিবসোৎসবে গাওয়া হয়"।

৮

শেষ বসন্তের মহুয়ার মতই মহুয়া (১৩৩৬) রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ় বয়সের অভিনব প্রেমকাব্য। মহুয়ার কবিতাগুলির সঙ্গে গানের সংযোগ নিবিড়, মহুয়ার সৌরভ গীতবিতানে গভীরভাবে সংক্রামিত। মহুয়ার কাব্যগীতিগুলি দুই ধরনের। কতকগুলি কবিতায় কবি স্বরযোজনা করেছিলেন, যেমন পূর্ববর্তী অনেক কাব্যেই করেছেন। আবার কতকগুলি কবিতার ভাবের সঙ্গে কয়েকটি কাব্যগীতের গভীর ভাবৈক্য ও ভাষাগত ঐক্য দেখে বোঝা যায় গানগুলি কবিতারই ঈষৎ পরিবর্তন মাত্র এবং কবিতাগুলি গানের পূর্বাভাস মাত্র। কবিতায় স্বরযোজিত হয়ে যথাযথ ও অবিকৃত রূপে গানে পরিণত হয়েছে এইগুলি—

বিজয়ী	বিরস দিন বিরল কাজ (ঈষৎ শব্দগত পরিবর্তন ঘটেছে)
প্রত্যাশা	প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায়
সন্ধান	আমার নয়ন তব নয়নের
বরণডালা	আজি এ নিরালাকুঞ্জে
নিবেদন	অজানা খনির নূতন মণিব
নির্ভয়	আমরা দুজনা স্বর্গখেলনা
গুপ্তধন	আরও কিছুক্ষণ না হয় বসিয়ো পাশে
অবশেষে	বাহির পথে বিবাগী হিয়া

আবার কতকগুলি কবিতা (এর মধ্যে পূর্ব শ্রেণীর স্বরযোজিত কবিতাও আছে) অন্যভাবে গানে পরিণত হয়েছে। কবিতার নাম ও প্রথম ছত্র এবং রূপান্তরিত গানের প্রথম ছত্র পাশাপাশি দেওয়া হল—

(সন্ধান) আমার নয়ন তব নয়নের	আমার নয়ন তোমার নয়নতলে
(বরণডালা) আজি এ নিরালা কুঞ্জে	আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো
(নিবেদন) অজানাখনির নূতন মণির	কাহার গলায় পরাবি গানের
(গুপ্তধন) আরো কিছুক্ষণ না হয় বসিয়ো	আরো একটু বসো তুমি
(মুক্তি) ভোরের পাখি নবীন আঁখি দুটি	চপল তব নবীন আঁখি দুটি
(উদ্‌ঘাত) অজানা জীবন বাহিনু	জানি তোমার অজানা নাহি গো
(পুরাতন) যে গান গাহিয়াছিনু	অনেক দিনের আমার যে গান

মহুয়ার কবিতা ও গানগুলির পারস্পরিক তুলনা অন্যান্য গ্রন্থের কাব্য-সংগীতগুলির তুলনায় কৌতূহলজনক। মহুয়ার যে কবিতাগুলি মোটামুটি

যে কথা তোমার কোনোদিন আর হয়নি বলা
নাহি জানি কারে বলিবারে করে উতলা।
দখিনপবনে বিহ্বলা ধরা কাকলিকূজনে হয়েছে মুখরা
আজি নিখিলের বাণীমন্দিরে খুলেছে দ্বার।

'গুঞ্জনে'র স্বরাশ্রিত কাব্যরূপ 'আরো কিছুক্ষণ না হয় বসিয়ো পাশে' এবং স্বতন্ত্র গীতরূপ 'আরো একটু বসো তুমি আরো একটু বলো' বক্তব্যের দিক দিয়ে এক হলেও দ্বিতীযটি প্রথম রচনার বাহুল্যবর্জিত সংক্ষেপন মাত্র। কিন্তু 'মুক্তি' (ভোরের পাখি নবীন আঁখি দুটি), কবিতার সঙ্গে গীতরূপ 'চপল তব নবীন আঁখি দুটি' গানের কোনো ভাবসাম্য নেই। কবিতায প্রভাতের বিহঙ্গকলগীত কেমন করে কবিকে নৈশপ্রহরেব দুর্গম চিত্তনিরুদ্ধ স্বপ্নজাল থেকে আলোক-ভাসিত কলধ্বনিত মর্তমৃত্তিকার বুকে জীবনের চলচ্ছন্দে মুক্তি দিল তারই স্পন্দিত বিবরণ। গানে কবিতাব পঞ্চমাত্রিক ছন্দ এবং কিছু কথার পুনরাবৃত্তিমাত্র আছে—বক্তব্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নূতন। গানটির বিষয় প্রেম। ভোরের পাখির বদলে দয়িতার (?) চপলনবীন নয়নদুটি কেমন করে প্রেমিকের মনে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে দেয়, সেই চাঞ্চল্য বহির্জগতে ছড়িয়ে পড়ে, স্মৃতি উন্মথিত করে, তারই রোমাঞ্চিত উপলব্ধি মাত্র। কবিতাটির তুলনায গানে 'তব' শব্দ ব্যবহার করায় (চপল তব নবীন আঁখি দুটি) এবং অন্যান্য অংশ অপরিবর্তিত রাখায গানটি গভীরতাবাচক হয়ে ওঠেনি।

'উদ্‌ঘাত' (অজানা জীবন বাহিনু) কবিতাটির সঙ্গে গানটির ('জানি তোমার অজানা নাহি গো') ভাবগত কোনো বৈরূপ্য ঘটেনি। কেবল ভাষাই ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। প্রেমিকের নিভৃতগোপন প্রেম কেমন করে তার দৃষ্টিতে প্রকাশিত হযে পডেছে, তারই ব্রীড়াসংকুচিত প্রকাশ, কবির সংগীতে তার অপ্রচ্ছন্নতার লজ্জার উদ্‌ঘাতকাহিনীর সূক্ষ্ম ইতিহাস দুই রচনায নিহিত।

'পুরাতন' কবিতাটি প্রথমে উদ্ধারযোগ্য—

যে-গান গাহিয়াছিনু কবেকার দক্ষিণ বাতাসে
সে গান আমার কাছে কেন আজ ফিরে ফিরে আসে
শরতের অবসানে। সেদিনের সাহানার সুর
আজি অসময়ে এসে অকারণে করিছে বিধুর
মধ্যাহ্নের আকাশেরে; দিগন্তের অরণ্যরেখায়

দূর অতীতের বাণী লিপ্ত আছে অস্পষ্ট লেখায়,
তাহারে ফুটাতে চাহে। পথভ্রান্ত করুণ গুঞ্জনে
মধু আহরিতে ফিরে, সেদিনের অরুপণ বনে
যে-চামেলিবল্লী ছিল তারি শূন্য দানসত্র হতে।
ছায়াতে যা লীন হল তারে খোঁজে নিষ্ঠুর আলোতে।
শীতরিক্ত শাখা ছেড়ে পাখি গেছে সিন্ধুপারে চলি,
তারি কুলায়ের কাছে সে কালের বিস্মৃত কাকলি
বৃথাই জাগাতে আসে। যে তারকা অস্তে গেল দূরে
তাহারি স্পন্দন ও যে ধরিয়া এনেছে নিজ সুরে।

এরই পাশে রূপান্তরিত গানখানি দ্রষ্টব্য—

অনেক দিনের আমার যে গান আমার কাছে ফিরে আসে
তারে আমি শুধাই, তুমি ঘুরে বেড়াও কোন্ বাতাসে।
যে ফুল গেছে সকল ফেলে গন্ধ তাহার কোথায় পেলে,
যার আশা আজ শূন্য হল কী সুর জাগাও তাহার আশে।
সকল গৃহ হারালো যার তোমার তানে তারই বাসা,
যার বিরহের নাই অবসান তার মিলনের আনে ভাষা।
শুকালো যেই নয়নবারি তোমার সুরে কাঁদন তারি,
ভোলা দিনের বাহন তুমি স্বপ্ন ভাসাও দূর আকাশে।

কবিতাটি অষ্টাদশ মাত্রার প্রবহমান তানপ্রধান পয়ারে রচিত চতুর্দশপদী। পুরাতন প্রেমস্মৃতির মন্থর গুঞ্জরণ কবির সাতষট্টি বৎসর বয়সের প্রৌঢ় প্রহরে ভেসে আসে, অতীতের সংগীতের করুণ রেশ বর্তমানের ধূসর দিবালোকে কোন হারা-দিনের ব্যর্থ ক্রন্দন জাগিয়ে তোলে—এই ভাবটি এই ক্ষুদ্রায়তন কবিতায় বিষণ্ন বৈরাগ্যে ধ্বনিত। অবসিত যৌবনের প্রেমবেদনার বিপ্রলব্ধ স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের কাব্যদিনান্তের একটি ব্যাপ্ত রাগিণী—পূরবী থেকে শেষলেখা পর্যন্ত এই স্মৃতিশায়িত প্রেমের নিরুপায় আর্তনাদ ও নির্বিঘ্ন দীর্ঘশ্বাস স্তবকে স্তবকে স্তরে স্তরে শোনা যায়। সুতরাং 'পুরাতন' কবিতায় কোনো এক প্রৌঢ় পৌষের (১৩৩৫) মন্থর অপরাহ্নে কবির গানের সুরে জেগে উঠেছিল সেই বিরহের চিরধূসর বেলাশেষের আকাশপটের ছবিখানি। পূরবীর সমসাময়িক পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি-র যাত্রী অংশ পাঠ করলে দেখি এই সময় কবি তাঁর

অন্যান্য সাহিত্যসৃষ্টির তুলনায় গানরচনাতেই বেশি অভিনিবিষ্ট হয়েছিলেন· এবং সে গান অবিস্মরণীয় প্রেমেরই গান।

মহুয়ার বন্দিনী কবিতায় (৫ কার্তিক ১৩৩৫) কবি লিখেছেন—

আজি আমার সুরের মাঝে
দূরের ডানার শব্দ বাজে,
মেঘের পথিক গানে আমার এল প্রাণের কূলে,
বিরহেরই আকাশতলে নিল আমায় তুলে।
গানের হাওয়ায় নিকট মিলায় দূরে—
দূর আসে সেই হাওযায় প্রাণের নিকট অন্তঃপুরে।

এই গানের সুরে ফিরে-আসা বিগত দিনের প্রেমস্মৃতির আবেদনই 'অনেক দিনের আমার যে গান' গানখানিতে গুঞ্জরিত হযেছে। কবিতায যা বিষণ্ণ বিস্ময, গানে তাই পুরাতন-স্মৃতি-উদ্দীপক কোনো গানের প্রতি জিজ্ঞাসার আকারে উচ্চারিত। মৌনী বিস্ময করুণ প্রশ্নে রূপান্তরিত হয়েছে। শেষ জীবনে যে পুরাতন গানের প্রত্যাবর্তন কবির সমগ্র জীবনকে নানা রঙে রঙিন করে তুলেছিল, হারানো স্মৃতির কণিকা সন্ধান করে অন্তিম প্রহরগুলি তিনি ভরিয়ে তুলেছিলেন, কবিতায সেই ভাবটি মন্থর ঔদাস্যে আর গানে আর্ত ক্রন্দনে, মূর্ছিতপ্রায় আবেগে, আরক্তিম ব্যথায অপরূপ হয়ে বেজেছে। ফিরে-আসা পুরাতন গানের স্মৃতির এই অসম্ভব প্রত্যাশার অব্যক্তবেদনা একটি অশ্রুকম্পিত চরণে মুমূর্ষু আবেগে স্তম্ভিত হযে আছে। নিরাসক্ত চতুর্দশপদীটি ক্রন্দমান সংগীতে পরিণত হয়েছে। কবিতায় যা ছিল খোলা জানলার হু হু-করা হাওয়া, গানে তাই হয়েছে ঝরঝর বর্ষণ।

৯

মহুয়া ও সানাইয়ের (১৩৪৭) মধ্যবর্তী একাধিক কাব্যগ্রন্থে (বীথিকা, নবজাতক ইত্যাদি) কয়েকটি সংগীত আছে, সেইগুলি পরবর্তী একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। মহুয়ার পর সানাই কাব্যসংগীতের ক্ষেত্রে একটি বিশেষত্বপূর্ণ গ্রন্থ বলে সানাই কাব্যের আলোচনা আগে করতে চাই। সানাই রবীন্দ্রনাথের অন্তিম জীবনের কাব্য, বিদায়কালীন অন্তরাগে মূর্ছাতুর, দিনান্তবেলার শেষ ফসলে ভরা। সানাই কাব্যে রবীন্দ্রনাথের সংগীতপ্রতিভা আর একবার শেষ রাগিণীর সকরুণ উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হযে উঠেছে, কবিতা ও সংগীত

একই সঙ্গে দেখা দিয়েছে। সানাইয়ের অনেক কবিতাকেই কবি রচনার প্রায় অল্প সময়ের ব্যবধানে গানে পরিণত করেছেন। সেই গানগুলি কবির জীবন-সায়াহ্নের স্মৃতিভারে মন্থর, শিথিল তাদের ভঙ্গি কবিতারই মত, অনুরাগে কম্পমান, বিষাদে অবনত। অন্য কোনো কাব্যে এতগুলি সংখ্যক কবিতা কখনই সংগীতে রূপান্তরিত হয়নি। গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যের কবিতাগুলি সংগীতই। কিন্তু সানাইয়ের কবিতা ও সংগীতের রূপরীতির মধ্যে পার্থক্য আছে। হয়ত কবিতার ভিতর দিয়ে যে কথাটি কবি বলতে চেয়েছেন, তা সম্পূর্ণ বলা হয়নি, তাদের অব্যক্ত অনির্বচনীয় আবেদনকে আরও সূচীভেদ্য, আরও মর্মান্তিক করে তোলার জন্যই তাদের অঙ্গে সুরের প্রসাধন দিতে হয়েছে। এই জাতীয় কবিতা-সংগীতের রূপান্তরগুলির তালিকা প্রথমে প্রদেয়—

আসা-যাওয়া	ভালবাসা এসেছিল এমন সে নিঃশব্দ চরণে
অনাবৃষ্টি	প্রাণের সাধন কবে নিবেদন করেছি
নূতন রঙ	এ ধূসর জীবনের গোধূলি
গানের খেয়া	যে গান আমি গাই
বিদায়	বসন্ত সে যায় তো হেসে
যাবার আগে	উদাস হাওয়ার পথে পথে
পূর্ণা	তুমি গো পঞ্চদশী
কৃপণা	এসেছিনু দ্বারে ঘনবর্ষণরাতে
ছায়াছবি	আমার প্রিয়ার সচল ছায়াছবি
দেওয়া-নেওয়া	বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল
রূপকথায়	কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার
আহ্বান	জ্বেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি
ব্যথিতা	জাগায়ো না ওরে জাগায়ো না
অধরা	অধরা মাধুরী ধরা পড়িয়াছে
দ্বিধা	এসেছিলে তবু আস নাই
আধোজাগা	রাত্রে কখন মনে হল
উদ্বৃত্ত	তব দক্ষিণ হাতের পরশ
ভাঙন	কোন ভাঙনের পথে এলে
গানের জাল	দৈবে তুমি কখন নেশায় পেয়ে
মরিয়া	মেঘ কেটে গেল আজি এ সকালবেলায়

গান	যে ছিল আমার স্বপনচারিণী
বাণীহারা	ও গো মোর নাহি যে বাণী
আত্মছলনা	দোষী করিব না তোমারে
কর্ণধার	ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার

বিশ্বভারতী সংস্করণ রচনাবলীর ২৪শ খণ্ডে সানাই কাব্যের গ্রন্থপরিচয়ে সানাইএর গান সম্পর্কে মন্তব্য আছে—

"সানাই গ্রন্থের অনেকগুলি ছোটো ছোটো কবিতার স্বতন্ত্র সংগীতরূপ প্রচলিত আছে। কোথাও বা গান আগে রচিত হইয়াছে, কোথাও বা কবিতা। তুলনামূলক পাঠের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ গীতবিতান হইতে কবিতাগুলির সংগীতরূপ নিম্নে যথাক্রমে উল্লিখিত হইল—

অনাবৃষ্টি (গান)	মম দুঃখের সাধন যবে করিনু নিবেদন
নতুন রঙ	ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত মলিন যেই স্মৃতি
এবং	ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত আলোয় ম্লান স্মৃতি
গানের খেয়া	আমি যে গান গাই জানিনে সে
অধরা	অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে
ব্যথিতা	ওরে জাগায়ো না ও যে বিরাম মাগে
বিদায়	বসন্ত সে যায় তো হেসে
যাবার আগে	এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে
পূর্ণা	ওগো তুমি পঞ্চদশী
কৃপণা	এসেছিনু দ্বারে তব শ্রাবণরাতে
ছায়াছবি	আমার প্রিয়ার ছায়া
দেওয়া-নেওয়া	বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল
আহ্বান	এসো গো জ্বেলে দিয়ে যাও
দ্বিধা	এসেছিলে তবু আস নাই
আধোজাগা	স্বপ্নে আমার মনে হল
উদ্‌বৃত্ত	যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল
ভাঙন	তুমি কোন ভাঙনের পথে এলে
গানের জাল	দৈবে তুমি কখন নেশায় পেয়ে
মরিয়া	আজি মেঘ কেটে গেছে সকালবেলায়
গান	যে ছিল আমার স্বপনচারিণী

, বাণীহারা বাণী মোর নাহি

আত্মছলনা দোষী করিব না করিব না তোমারে”

রচনাবলী গ্রন্থপরিচয়ে প্রদত্ত এই তালিকায় আসা-যাওয়া, রূপকথায় এবং কর্ণধার কবিতা তিনটির সংগীতরূপ সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই কেন বোঝা যায় না।

‘অনাবৃষ্টি’ কবিতাটিতে ধ্বনিপ্রধান ছন্দের যে পর্বসৌষম্য ছিল, গানটিতে তা আদৌ নেই—গানের ছন্দ শিথিল এবং এলোমেলো। মনে হয় কবিতার ভাবার্থটুকু মাত্র গ্রহণ করে নতুন করে গানটি রচিত হয়েছে। ‘নতুন রঙ’ কবিতাটির দুটি গীতরূপের পরিচয় পাওয়া যায়—একটি ছন্দে বাঁধা আর একটি ছন্দভ্রষ্ট, গদ্যরূপের মত। দুটি গানেই মূল কবিতার ভাবানুষঙ্গ ভাষা ও শব্দ মোটামুটি রক্ষিত। তবে ‘ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত আলোয় ম্লান ছবি’ গানটি যেন তার ছন্দোহীন শিথিল ক্লান্তমন্থর ভঙ্গিতে আরও করুণ, আরও মর্মন্তুদ করে কবির জীবনশেষের স্মৃতিভারাবনত হৃদয়বেদনাকে ফুটিয়ে তোলে।

‘গানের খেয়া’র কিছু কথা ‘আমি যে গান গাই জানিনে সে কার উদ্দেশে’ এই গানটিতে সামান্য পরিবর্তিত হয়েছে। লক্ষণীয় যে সানাই কাব্যের এই গীতিকল্প কবিতাগুলির অধিকাংশই প্রেমবিষয়ক এবং সে প্রেম কোনো অতীত স্মৃতির গুঞ্জরণ। ‘গানের খেয়া’ কবিতার বাণীতে সেই মানসরূপিণী সুদূরিকার প্রতি কবির মন্তব্য—

কভু জাগে মনে আজও আসেনি এ জীবনে

গানের খেয়া সে বাগে আমার তীরে এসে, কার উদ্দেশে।

‘অধরা’ কবিতার অধরা মাধুরীও সেই অতীত কালের স্বপ্ন, নতুন কালের বেশে—

বিগত বসন্তের অশোকরক্তরাগে ওর রঙিন পাখা

তারই ঝরা ফুলের গন্ধ ওর অন্তরে ঢাকা।

অতীত স্মৃতির অধরা মাধুরীকে ছন্দোবন্ধনে, গানের সুরে, গীতস্পন্দে বন্দী করার কথা পত্রপুটের ১৪সংখ্যক কবিতার শেষাংশেই কবি ঘোষণা করেছিলেন —‘যখন তুমি থাকবে না তখনও তুমি থাকবে আমার গানে’। তারই পরিণাম ‘অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে’। কবিতার গীতরূপটি অবশ্য মূলের তুলনায় অনেকখানি বদলে গেছে। কবিতার ম্লান ছন্দোরূপ গানে

প্রায় অন্তর্হিত হওয়ায় গানটি একেবারে গদ্যভঙ্গিম হয়ে পড়েছে। 'ব্যথিতা' কবিতাটিতে ষণ্মাত্রিক ধ্বনিপ্রধান ছন্দ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তার গীতরূপের কোনোই ছন্দ নেই (ওরে জাগায়ো না)।

'বিদায়' কবিতাটি কিন্তু গীতরূপে আরও সাংকেতিক ও তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। প্রিয়ার অন্তর্ধানপটে কবি আপনার ম্লান করুণনিঃস্ব সত্তার দীর্ণ হাহাকার রচনা করেছেন এই গানে। অস্তরবির শেষরশ্মিপাতে উদ্ভাসিত যাত্রাতরণীর পাল যখন সঞ্চরমান দিগন্তের বুক থেকে ধীরে ধীরে অপসৃত হয়ে আসবে, তখন কবি আপন রাতের অন্তরালস্থিত কালিমা নিয়ে বসে থাকবেন ভাসান-খেলার শূন্য ঘাটে। কিন্তু কোন মূঢ় অর্থহীন সঞ্চয় নিয়ে?' গানে সেই কথাটি অপরূপ করে বলা হয়েছে—

রইব একা ভাসান-খেলার নদীর তটে,
বেদনাহীন মুখের ছবি স্মৃতির পটে—
অবসানের অস্ত আলো তোমার সাথি সেই তো ভালো—
ছায়া সে থাক মিলনশেষের অন্তরালে।

এই 'বেদনাহীন মুখের ছবিটি' কত রূপে কত রঙেই না কবি ফোটাতে চাইছেন শেষ বয়সের স্মৃতিভারব্যাকুল কাব্যগুলিতে। দূর অতীতের ব্যবধানে যা নিরাসক্ত, শোক যেখানে শান্ত, প্রিয়মুখ যেখানে তারকায় রূপান্তরিত, সেই স্মৃতির অনাহত আক্রমণ পরবর্তী আরও অনেকগুলি গীতকল্প রচনায় সংক্রামিত। 'যাবার আগে' (উদাস হাওয়ার পথে পথে) অপেক্ষা তার গীতরূপটি (এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে) আরও উৎকৃষ্ট এবং অনেকখানিই পরিবর্তিত। গানে অবশ্য মূলের ভাব পরিবর্তিত হয়নি। 'পূর্ণা' (তুমি গো পঞ্চদশী) কবিতার গীতিরূপ 'ওগো তুমি পঞ্চদশী'তে ছন্দ নেই, কবিতায় আছে। 'কৃপণা' (এসেছিনু দ্বারে তব) কবিতার তুলনায় উৎকৃষ্ট। 'ওগো তুমি পঞ্চদশী' এবং 'এসেছিনু দ্বারে তব' দুটিই জানুয়ারি মাসে লেখা ও সুর দেওয়া হয়েছে। অথচ দুটি গানই বর্ষাঋতু-পর্যায়ভুক্ত। বর্ষার কেতকী-বারি-সুগন্ধি নবযৌবন 'ওগো তুমি পঞ্চদশী' গানে এবং শ্রাবণের ঘনবর্ষণ রাত্রের একটি ব্যর্থাভিসারের বেদনা 'কৃপণা' গানটিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে গেছে। সম্ভবত কোনো হারাদিনের কান্নাহাসির বর্ষণনিষিক্ত স্মৃতি কাজভোলা মুহূর্তের অলস বাতায়ন দিয়ে প্রৌঢ় কবির মনে উঁকি দিয়ে গেছে। কেবল এই দুটি গানই নয়, সানাইয়ের অধিকাংশ কবিতাই স্মৃতিভারে বিষণ্ণ। 'কৃপণা' কবিতার

কবি কোনো বিমুখনারীকে সম্বোধন করে আজ পুরাতন দিনের এক ব্যর্থ অভিসারের জন্য বিলাপ করেছেন—

কেন বাধা হল দিতে মাধুরীর কণা
হায় হায় হে কৃপণা।
তব যৌবনমাঝে
লাবণ্য বিরাজে,
লিপিখানি তার নিয়ে এসে তবু
কেন যে দিলে না হাতে।

গানে এই আক্ষেপ আরও সূক্ষ্ম আরও অনির্বচনীয় হয়েছে—

কেন দিলে না মাধুরীকণা
হায়রে কৃপণা।
লাবণ্যলক্ষ্মী বিরাজে
ভুবনমাঝে
তারই লিপি দিলে না হাতে।

'পূর্ণা' 'কৃপণা' ইত্যাদি কবিতা ও গানে একটি নবযৌবনব্যাকুল নারীদেহের ছায়াখানি বারবার কিশোর প্রেমের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে বলেই একথা অস্বীকার করা যায় না, এই সকল প্রেম-কবিতার স্মৃতিবাহিনী একই উৎস থেকে উৎসারিত। শ্যামলীর 'মিলভাঙা'র নায়িকা এবং 'পূর্ণা'র পঞ্চদশী যে পৃথক স্মৃতিলেখ নয় তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। শ্যামলীর 'মিলভাঙা'য় কবি লিখেছিলেন—

যখন তোমাকে দেখতে পাই মনে মনে,
দেখতে পাই তুমি আছ
সেইদিনকার কচি যৌবনের মায়া দিয়ে ঘেরা।
তোমার বয়স গেছে থেমে।
তোমার সেই বসন্তের আমের বোলে
আজও তেমনি গন্ধের ঘোষণা।··

'ছায়াছবি' কবিতায় বর্তমানের আকাশপটে, বর্ষানিবিড় দিনের প্রহরে প্রহরে, বৃষ্টিসজল বিষণ্ণ নিশ্বাসে কবি তাঁর প্রিয়ার ছায়াছবি প্রত্যক্ষ করেছেন। গান ও কবিতায় রূপান্তর সামান্যই। যেমন কবিতায় 'আমার প্রিয়ার সচল ছায়াছবি সজল নীলাকাশে', গানে হয়েছে—

আমার প্রিয়ার ছায়া
আকাশে আজ ভাসে, হায় হায়।
বৃষ্টিসজল বিষন্ন নিশ্বাসে, হায় হায়।

'মানসসুন্দরী' কাবিতায় দেহান্তরিত মানস সুন্দরী যেমন ধূপের গন্ধবাষ্প হয়ে বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়েছিল এবং কবি তাকে 'তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে' বলে তার লোকান্তরিত সত্তাকে বিশ্বজনীন করে তুলেছিলেন, এও সেইরকম কোনো অনুভূতির পুনরাবৃত্তি। কিংবা এই 'ছায়াছবি' 'ছবি' কবিতারই রূপভেদ মাত্র। নয়নসম্মুখ থেকে তিরোহিত বলেই তার স্থান যেন 'নয়নের মাঝখানে', আর সেইজন্যই

শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।

ঠিক একই কারণে—

বারিঝরা বনের গন্ধ নিয়া
পরশহারা বরণমালা গাঁথে আমার প্রিয়া।
আমার প্রিয়া ঘন শ্রাবণধারায়
আকাশ ছেয়ে মনের কথা হারায়,
আমার প্রিয়ার আঁচল দোলে
নিবিড় বনের শ্যামল উচ্ছ্বাসে।

এই সর্বানুভূতিক প্রেম কেবল বর্ষার মধ্য দিয়েই নয়, প্রকৃতির মধ্য দিয়ে কবি বারবার পেয়েছেন। প্রকৃতির সত্তায়, জীবনের পত্রে পত্রে, ঋতুর রঙ্গস্থলীতে সেই একই লাবণ্যলক্ষ্মীকে অনুভব করার শিহরণ, 'পরশহারা বরণমালা' পরার রোমাঞ্চ, 'বেদনাহীন মুখের ছবি' স্পর্শ করার কাতরতা—শেষ পর্বের গানে এই অনুভূতিগুলি গুচ্ছ গুচ্ছ দ্রাক্ষাকুঞ্জের মত ফলে আছে।

'দেওয়া-নেওয়া' (বাদল দিনের প্রথম কদমফুল) কবিতাটি গানে পরিবর্তিত হয়ে কবিতার পুরাতন ছন্দ পরিত্যাগ করেছে। এই নূতন গানটিতেও বর্ষার অনুষঙ্গ আছে এবং এটিও জানুয়ারিতে লেখা। গানটি ঋতুপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হলেও প্রেমের গান, আবার এর বিষয়বস্তুও গান। প্রেমিকের দান, ঋতুর দাক্ষিণ্য, প্রকৃতির ফুলসম্ভার এইগুলি নশ্বর—এরাও একদিন ক্ষয় পায়। কিন্তু প্রেমকে স্মরণীয় করে রাখে একমাত্র কবির সংগীত—'সুরের খেতের

প্রথম সোনার ধান'—এই তত্ত্বই গানটিতে প্রকাশ পেয়েছে। আপনার সাংগীতিক সৃষ্টিকে প্রকৃতির প্রতিস্পর্ধী করে কবি আজ বেলাশেষে ঘোষণা করে গেলেন—

এ গান আমার শ্রাবণে শ্রাবণে
তব বিস্মৃতিস্রোতের প্লাবনে
ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে তরণী বহি তব সম্মান।

মেঘের ছায়ায় অন্ধকারে ঢেকে-রাখা রবীন্দ্রনাথের বর্ষাসংগীত সম্পর্কে কবির এই আত্মস্বীকারোক্তি এমন করে পূর্বযুগের গানে আমরা পাই না।

শেষ সপ্তকের একত্রিশ সংখ্যক কবিতায় বিপত্নীক (বিগতপ্রেমিক?) কবির ক্ষণেক মুহূর্তের অকর্মণ্য অবকাশে একদিন সন্ধ্যায় এক রহস্যময় অশরীরী সত্তার আবির্ভাব ঘটেছিল। আটবছর আগের যে-স্পর্শ সে-ঘরের হাওয়ায় ছড়ানো ছিল, তার স্পর্শ লাগল বাতাসে, যখন হঠাৎ-নিবে-যাওয়া ঘরের অন্ধকারে চুলের অস্পষ্ট গন্ধ ফিরিয়ে আনল এক পুরাতন বেদনা, হাওয়া উঠল ঝরঝর করে, দরজার পর্দা অস্থির হয়ে দুলতে লাগল, তখন কোনো নিশ্চিত সত্তার আবির্ভাবের প্রতি সম্বোধনে কবি বললেন—

ওগো আজ তোমার ঘরে তুমি এসেছ কি
মরণলোক থেকে
তোমার বাদামি রঙের শাড়িখানা পরে?

কিন্তু সে কল্পনাই মাত্র। শ্যামলীর 'মিলভাঙা' কবিতার স্মৃতিও মনে পড়তে পারে—

সেই তুমি আজ এই মেঘডাকা সন্ধ্যায়
যদি এসে বস আমার সামনে
দেখতে পাবে আমার চোখে
দিক-হারানো চাহনি
অজানা আকাশের সমুদ্রপারে
নীল অরণ্যের পথে।

এখানে 'যদি' শব্দের ব্যবহারে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে 'মরণলোক হতে জীবনদ্বার দিয়ে' একবার শেষবারের মত প্রিয়জনকে চোখে দেখার একটি থরথর-করা বাসনা কবির লোলকম্প্র অস্তিত্বে প্রদীপের মত দুলছে। সানাইয়ের 'আহ্বান' কবিতা (জ্বেলে দিয়ে যাও সন্ধ্যাপ্রদীপ) তারই এক বিস্ময়কর বিরহগীতে

রূপান্তরিত (এসো গো জেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি)। অনুষঙ্গ এখানেও বর্ষা, স্মৃতির ভূমিকা এখানেও লক্ষণীয়। দিনান্তের শেষপ্রহরে মধুময় পৃথিবীর ধূলিতে আপনাকে অনুরঞ্জিত করে কবি যখন যাবার বীণায় অন্তিম মূর্ছনা তুলেছেন, তখনও স্মৃতির এ কী লীলা! অসম্ভবের এ কী অনুনয়! কোন লুপ্ত দিবসের অন্ধকার আকাশ আজ অবনত হয়ে এল, নিয়ে এল শ্রাবণদিনের ঘনবর্ষণের স্মৃতি সঙ্গীহীন নিঃসঙ্গ প্রকোষ্ঠে—অশ্রুসিক্ত হৃদয়ে কবি কোন প্রিয়জনের অশ্রুত পদসঞ্চারের অহেতুক প্রত্যাশায় উৎকর্ণ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন। কার নীলাংশুকের অঞ্চলছায়া তাঁর নির্জন অন্তরে কোন সুখরজনীর তৃষ্ণাতুর নিভৃত কামনা মেলে ধরল? বিরহের হৃদয়ভেদী কান্না ইমনের পর্দাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে, প্রান্তরের হাওয়ার মত হাহাকার-ভরা আর্তনাদ নিয়ে এমন একখানি গান রেখে না গেলে আমরা ভাবতেই পারতাম না রবীন্দ্রনাথের প্রেমসংগীত কী গভীব অতলান্ত সমুদ্রের আবগাঢ় বিষাদ দিয়ে নির্মিত!

সানাইয়ের 'দ্বিধা' ও 'আধোজাগা,' পূর্বালোচিত কবিতা-গানগুলির সহচর ও সমকালীন, সবদিক থেকেই পূর্ববর্তী গানগুলির সঙ্গে সমসূত্রে গ্রথিত। 'আধোজাগা' কবিতা তথা গানটি পূরবীর অন্তর্হিতা কবিতাটিকে মনে পড়িয়ে দেয়, যদিও দুই রচনার উপকরণ ভিন্ন অভিজ্ঞতা বলেই মনে হয়।

'রূপকথা' কবিতার কাব্যরূপ ও গীতরূপ অভিন্ন। ডাকঘর অভিনয়োপলক্ষে তৃতীয় দৃশ্যে ফকিরবেশী ঠাকুরদাব ভূমিকায় স্বয়ং কবির এই গানটি গাইবার কথা ছিল।

'উদ্‌বৃত্ত' (তব দক্ষিণ হাতের পরশ করনি সমর্পণ) গানে হয়েছে 'যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল মম'। গানটিতে কবিতার কথা বদলে গেছে, ভাবার্থ অপরিবর্তিত আছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটি প্রেমসংগীত, সে প্রেম যথারীতি বিরহভাবনায় আতুর, বিরহবিপ্রলম্ভে মুমূর্ষু। কবির প্রৌঢ় দিনের ভাবনার প্রাঙ্গণে দূরকালের প্রিয়ার চকিতক্ষণিক আলোছায়া যে আলিম্পন রচনা করে চলেছে, আজও তাই দিয়েই কবি সেই অপূর্ণ জীবনের উদ্‌বৃত্ত সুখ খুঁজে পেয়েছেন। যে প্রেম পথের ধূলায় হারিয়ে গেছে, তা সত্যই হারায়নি, ভীরু বাসনার অঞ্জলিতে যতটুকু একদা পেয়েছিলেন, সেই তাঁর অসীম প্রাপ্তি—

> দিবসের দৈন্যের সঞ্চয় সে যে যত্নে ধরে রাখি
> সে যে রজনীর স্বপ্নের আয়োজন।

মনে পড়ে পূরবীর 'কিশোর প্রেম' কবিতাতেও কবি বলেছিলেন, কৈশোর-কালের অচরিতার্থ প্রেম না-বলা কথা কবির বর্তমানের সুরে-গানে আপন অর্থ কিছু খুঁজে পায়, কিছু থাকে স্বপ্নলোকে—

পারে যাওয়ার উধাও পাখি সেই কিশোরের ভাষা,
প্রাণের পারের কুলায় ছাড়ি
শূন্য আকাশ দিল পাড়ি,
আজ এসে মোর স্বপন মাঝে পেয়েছে তার বাসা
আমার সেই কিশোরের ভাষা।

'উদ্‌বৃত্ত' গানেও তাই বলা হয়েছে, সেই প্রেমস্মৃতি আজ দিবসের কর্মক্ষেত্র থেকে অপসারিত হয়ে 'রজনীর স্বপ্নের আয়োজনে' পরিণত হয়েছে। এই স্বপ্ন-স্বরূপিণীর কথা কবির শেষ জীবনের একাধিক কবিতায় শুনতে পাই। 'গান' কবিতাটি এই স্বপ্নস্বরূপিণীর প্রতিই উদ্দিষ্ট—

যে ছিল আমার স্বপনচারিণী
এতদিন তারে বুঝিতে পারিনি।

'নতুন রঙ' কবিতায় কবি ধূসর জীবনের গোধূলিতে যার ক্ষীণ উদাসীন স্মৃতি নিয়ে গুঞ্জনগীতি রচনার ঘোষণা করেছিলেন, 'মানসী' কবিতায় যে মানসীর মায়ামূর্তির কথা পাই, 'মায়া' কবিতায় তার স্বরূপটি আরও স্পষ্টভাবে দেখা গেল—

সহজেই ডাকি সহজেই রাখি দূরে
স্বপ্নরূপিণী তুমি
আকুলিয়া আছ পথ-খোওয়া মোর
প্রাণের স্বর্গভূমি।
নাই কোনো ভার নাই বেদনার তাপ,
ধূলির ধরায় পড়ে না পায়ের ছাপ।
তাই তো আমার ছন্দে
সহসা তোমার চুলের ফুলের গন্ধে
জাগে নির্জন রাতের দীর্ঘশ্বাস
জাগে প্রভাতের পেলব তারায়
বিদায়ের স্মিত হাস।

'যে ছিল আমার স্বপনচারিণী' গানটি এই কবিতাবলীর সুরেই বাঁধা। মানসীর যুগে রচিত মায়ার খেলা-র ষষ্ঠ দৃশ্যে শান্তার প্রতি অমরের একটি গান ছিল—

আমি কারেও বুঝিনে শুধু বুঝেছি তোমারে
তোমাতে পেয়েছি আলো সংশয়-আঁধারে।
ফিরিয়াছি এ ভুবন পাইনি তো কারো মন,
গিয়েছি তোমারই শুধু মনের মাঝারে।
এ সংসারে কে ফিরাবে কে লইবে ডাকি,
আজিও বুঝিতে নারি ভয়ে ভয়ে থাকি।
কেবল তোমারে জানি বুঝেছি তোমার বাণী
তোমাতে পেয়েছি কূল অকূল পাথারে।

এই গানটিই 'যে ছিল আমার স্বপনচারিণী'তে পরিণত হয়ে কবির নতুন নৃত্য-নাট্যে রূপান্তরিত মায়ার খেলা-র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে মায়ার খেলার গানটির সঙ্গে সানাইয়ের গানটির সুরে কোনো সাদৃশ্য নেই। কথাও আমূল রূপান্তরিত—ঐ স্বপনচারিণী শব্দের ব্যবহারেই তা প্রমাণিত। সানাইয়ের গানটির রচনাকাল ৮. ১২. ১৯৩৮ আর নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা রচনার তারিখ ১৩৪ অগ্রহায়ণ পৌষ অর্থাৎ একই সময়। সুতরাং মনে হয় মায়ার খেলার গানটির সংশোধনকালেই সানাইয়ের গানটি লেখা হয়। বস্তুত সানাই কাব্যের অন্যান্য কবিতার ভাবানুষঙ্গেই নূতন গানটির সৃষ্টি—মায়ার খেলা সেই প্রেরণার কাজ করেছিল।

'ভাঙন' কবিতার সঙ্গে তার গীতরূপের অমিল সামান্য, তবে গানে ছন্দো-রূপটি তিরোহিত হয়েছে। কবি ভাঙনের পথে স্বপ্নপ্রাতে যার চরণপাতের স্পর্শে ধন্য হয়েছেন, সেই খণ্ড স্মৃতিকে রক্তমণির হারে গাঁথবেন, গোপননিভৃত বেদনায় তাকে বক্ষে দোলাবেন। 'গানের জাল' কবিতা ও গানে পরিবর্তন অকিঞ্চিৎকর। এর বিষয়বস্তু 'দেওয়া-নেওয়ার' মত গান, তবে তা কবির গান নয়, অপরের গান (প্রেমিকার গান?)। সেই গানে কবির হৃদয় অদৃশ্যে ভেসে যায়, চেনাদিনের ঠিক-ঠিকানা ভোলে। গানের টানা জালে কবি নিমেষ-নিহত খণ্ডকাল থেকে অসীম কালে উত্তোলিত হন। এই গানটির সঙ্গে সানাই কাব্যের 'গানের স্মৃতি' কবিতাও উল্লেখযোগ্য।

'বাণীহারা' (ও গো মোর নাহি যে বাণী) কবিতাটির গীতিরূপান্তর 'বাণী

মোর নাহি'। সানাইয়ের অনেকগুলি কবিতায় কবির প্রৌঢ় জীবনের শেষ প্রহরে ফুটে-ওঠা যে ধূসর বৈরাগ্য, রিক্ত নিঃসঙ্গতা ও অব্যক্ত হাহাকার লক্ষ্য করি, এই গানটি যেন তারই ঘনীভূত কারুণ্যের রূপ সুরের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। 'এসো গো জ্বেলে দিয়ে যাও' গানটিতেই কবির অবসন্ন বেলার বিজন ঘরের নিভৃত কোণ, পথে-চেয়ে-থাকা বিমূঢ় দৃষ্টি ছোটখাট দুএকটি ইঙ্গিতে ফুটে উঠেছিল। 'বাণী মোর নাহি'তে সেই নিঃস্বতার সুগভীর যন্ত্রণা ভেঙে পড়তে চাইছে—

আমি অমা বিভাবরী আলোহারা
মেলিয়া অগণ্য তারা
নিষ্ফল আশায় নিঃশেষ পথ বাহি।

অমারজনীর মত এই নিষ্ফল পথ-চাওয়া, আলোকলুপ্ত অন্ধকারে তৃষ্ণার্ত অঙ্গুলি মেলে শূন্যপানে চেয়ে থাকা—এমন অবাক্-করা তুলনা রবীন্দ্রনাথের গানে দুর্লভ। অথচ এখানে শেষ পর্যন্ত এই নৈষ্ফল্য ও বাণীহীনতার ধিক্কারই বড় হয়ে দেখা দেয়নি। কারণ—

তুমি যবে বাজাও বাঁশি সুর আসে ভাসি
নীরবতার গভীরে বিহ্বল বায়ে
নিদ্রাসমুদ্র পারায়ে।
তোমারই সুরের প্রতিধ্বনি তোমারে দিই ফিরায়ে,
কে জানে সে কি পশে তব স্বপ্নের তীরে
বিপুল অন্ধকার বাহি।

'আত্মছলনা' কবিতাটিও গানে পরিণত হয়েছে এবং যথারীতি কবিতার ছন্দ গানে রক্ষিত হয়নি, ভাষাও বদলে গেছে। তবে দুটি রচনার বক্তব্য অবিকৃত আছে। অথচ কবিতাটি গানের আঙ্গিকেই রচিত।

সানাইয়ের 'আসা-যাওয়া' কবিতাটি (ভালবাসা এসেছিল এমন সে নিঃশব্দ চরণে) দুটি সংগীতে পরিণত হয়েছে। অবশ্য কোনটি ঠিক প্রাক্‌রূপ বলা কঠিন। মূল রচনাটি এইরূপ—

ভালবাসা এসেছিল এমন সে নিঃশব্দ চরণে
তারে স্বপ্ন হয়েছিল মনে,
দিইনি আসন বসিবার।

বিদায় সে নিল যবে খুলিতেই দ্বার
শব্দ তার পেয়ে
ফিরায়ে ডাকিতে গেনু ধেয়ে।
তখন সে স্বপ্ন কায়াহীন
নিশীথে বিলীন,
দূরপথে তার দীপশিখা
একটি রক্তিম মরীচিকা। (২৮ মার্চ ১৯৪০)

রচনাবলী সংস্করণ সানাইয়ের গ্রন্থপরিচয়ের সাক্ষ্যে আর একটি সমসাময়িক গান এখানে উদ্ধার করা যাক—

নির্জনরাতে নিঃশব্দ চরণপাতে কেন এলে।
দুয়ারে মম স্বপ্নের ধনসম এ যে দেখি—
তব কণ্ঠের মালা একি গেছ ফেলে।
জাগালে না শিয়রে দীপ জ্বেলে—
এলে ধীরে ধীরে নিদ্রার তীরে তীরে
চামেলির ইঙ্গিত আসে যে বাতাসে লজ্জিত গন্ধ মেলে।
বিদায়ের যাত্রাকালে পুষ্প-ঝরা বকুলের ডালে
দক্ষিণ পবনের প্রাণে
রেখে গেলে বলনি যে কথা কানে কানে—
বিরহবারতা অরুণ আভার আভাসে রাঙায়ে গেলে। (চৈত্র ১৩৪৬)

গ্রন্থপরিচয়ে বলা হয়েছে, "ইহাকে আলোচ্য কবিতার পূর্বপাঠ বলা সমীচীন না হইলেও ভাবের বিচারে পূর্বাভাস বলা চলে।" অবশ্য ভাবের দিক থেকে দুটি গানে পার্থক্যরেখাও গভীর, এখানে সে কথাও স্মরণীয়। প্রথম রচনা অর্থাৎ 'ভালবাসা এসেছিল' প্রেমের আকস্মিক আবির্ভাব-বিষয়ক। দ্বিতীয় রচনা অর্থাৎ 'নির্জনরাতে নিঃশব্দ চরণ পাতে' প্রেমিকার আবির্ভাব-বিষয়ক। তাছাড়া প্রেমের অপ্রত্যাশিত আগমন কবির কাছে আপন তাৎপর্য নিয়ে অনুভূত হয়নি, তার অন্তর্ধানপটেই কবির যথার্থ প্রেমের উপলব্ধি ঘটল—কিন্তু তখন সেই প্রেম সুদূর-পরাহত। পলাতক প্রেমের জন্য এই ব্যর্থ হতাশা দ্বিতীয় রচনাতে নেই। প্রকৃতপক্ষে 'আসা-যাওয়া' কবিতার সংগীতরূপ এইটি—

প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে।
তাই স্বপ্ন মনে হল তারে—
দিইনি তাহারে আসন।

বিদায় নিল যবে শব্দ পেয়ে গেনু ধেয়ে।
সে তখন স্বপ্ন কায়াবিহীন
নিশীথ তিমিরে বিলীন—
দূরপথে দীপশিখা রক্তিম মরীচিকা। (২৮ চৈত্র ১৩৪৬)

এটি কবিতার ভাষার সঙ্গে অভিন্ন, কেবল যথারীতি গানটি ছন্দ হারিয়ে বসে আছে।

'ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার' (কর্ণধার) কবিতাটি কোনো সমকালীন গানে পরিণত হয়েছে এরূপ তথ্য রবীন্দ্ররচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়ে নেই। তথাপি সানাই গ্রন্থের এই কবিতাটি এবং গ্রন্থপরিচয়ে প্রাপ্ত আলোচ্য কবিতার অনেকগুলি পাঠভেদ থেকে সহসা একটি অস্পষ্ট সন্দেহের উদয় হয়। এই 'কর্ণধার' কবিতার সঙ্গে কি 'সমুখে শান্তিপারাবার' এই বহুবিখ্যাত গানটির কোনো সম্পর্ক আছে? 'সমুখে শান্তিপারাবার' গানটি ডাকঘর নাটকের জন্য লিখিত। রচনাতারিখ (৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯), সানাইয়ে প্রকাশিত 'কর্ণধার' কবিতার একমাস পূর্বে। কিন্তু 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে মৈত্রেয়ী দেবীর সাক্ষ্য থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে কবিতারচনার প্রকৃত সূচনা তারও কয়েক মাস পূর্বে। 'রূপকথা' (কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা) গানটিও ডাকঘর নাটকের জন্য লিখিত হয়েছিল। কথা ছিল কবি নব-পরিকল্পিত ডাকঘর নাটকের শেষ দৃশ্যে সুপ্ত অমলের শিয়রে ঠাকুরদার বেশে 'সমুখে শান্তিপারাবার' গানটি গাইবেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নাটকটি মঞ্চস্থ হয়নি। কিন্তু আশ্রমবাসীদের সাক্ষ্যে জানা যায়, কবির ইচ্ছা ছিল তাঁর মৃত্যুর পর গানটি গীত হোক।[২২] সম্ভবত মে থেকে জানুয়ারি (১৯৩৯-৪০) মাসের মধ্যে 'কর্ণধার' কবিতাটি পরিবর্তিত হয়েছে এবং তারই মধ্যে গানটি রচিত হয়েছে। গানটির সঙ্গে 'কর্ণধার' বিষয়ক কবিতাগুলির ভাবসাদৃশ্যের বাধা হল, কর্ণধার কবিতাগুলির মধ্যে যে লীলার আভাস আছে গানটির শান্তভক্তিরস তার প্রতিকূলতা করে। কিন্তু এ সন্দেহ ভিত্তিহীন। কারণ লীলার কর্ণধার কোন্ গভীর তাৎপর্যে কবিকে পরিচালিত করেন, কর্ণধার-সম্পর্কিত কবিতাগুলি একাদিক্রমে পাঠ করলেই তা বোঝা যাবে। কবিতাটি সুরু হয়েছিল মংপুতে, মৈত্রেয়ী দেবীর বিশ্রামকুঞ্জে, কবিতাটিও তাঁর আতিথেয়তার প্রতিই উৎসর্গিত ছিল। কিন্তু কবির অন্তর্লোকে কয়েকটি শব্দ কোন্ অদৃশ্যভাবনায় আর এক রহস্যকেন্দ্রে পথবদল করেছে কে বলবে? মৈত্রেয়ী দেবী নিজেই স্বীকার করেছেন যে মাত্র

একদিনের রদবদলেই কবিতাটি অন্যরূপ ধারণ করে—"এমনি করে পরিবর্তিত হতে হতে বেশ কয়েকদিন পরে সে এক সম্পূর্ণ অন্য কবিতা হয়ে দাঁড়াল।" পরিবর্তনের স্তরগুলিও ক্রমশ বিশেষ থেকে নির্বিশেষে, সীমা থেকে অসীমে, জীবন থেকে মহাঅনন্ত অকূলে ধাবমান। 'ছুটির কর্ণধার' তরুণী একরাত্রে হারিয়ে গিয়ে হয়েছিল 'কে অসীমের লীলার কর্ণধার'। তারপর প্রবাসী ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় মুদ্রিত রূপে এই ভাষা কি 'সমুখে শান্তিপারাবারে'র নিকটবর্তী হয়ে ওঠেনি ?—

লীলার কর্ণধার
জীবন নিয়ে মৃত্যুভাঁটায়
চলেছ কোন পার।

এই মৃত্যুভাবনা তো সানাইয়ে প্রকাশিত 'কর্ণধার' কবিতাতে স্পষ্টই—

বক্ষে যবে বাজে মরণভেরী
ঘুচিয়ে ত্বরা ঘুচিয়ে সকল দেরি,
প্রাণের সীমা মৃত্যুসীমায়
সূক্ষ্ম হয়ে মিলায়ে যায়,
উর্দ্ধে তখন পাল তুলে দাও
অন্তিম যাত্রার।
ব্যক্ত কর হে মোর কর্ণধার,
আঁধারহীন অচিন্ত্য সে অসীম অন্ধকার।

লীলা দিয়ে যিনি জীবনে প্রেমের চাঞ্চল্য জাগান, তিনিই অসীমের পথে কর্ণধার হয়ে জীবনমৃত্যু পরপারে নিয়ে যান—কর্ণধার কবিতাগুচ্ছ ও গানখানির বিবর্তনের এই সূত্র অস্বীকার করা যায় না।

১০

প্রথম কৈশোরের অস্ফুট প্রতিভাবিকাশের কাব্য 'শৈশবসংগীত' (প্রকাশ ২৯ শে মে ১৮৮৪, ১২৯১) গ্রন্থের ভূমিকায় কবি লিখেছিলেন, "তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতাগুলি প্রকাশ করিলাম"। এই গ্রন্থের কয়েকটি রচনা রবীন্দ্রসংগীতরূপে পরিচিত। যথা

ফুলবালায় অশোকের গান — গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে
দেখে যা দেখে যা দেখে যা লো

ছিন্নলতিকা	সাধের কাননে মোর
অপ্‌সরার প্রেম	সোনার পিঞ্জর ভাঙিয়ে আমার
প্রভাতী	শুন নলিনী খোল গো আঁখি
কামিনী ফুল	ছি ছি সখা কী করিলে
লাজময়ী	কাছে তার যাই যদি (এটি ভগ্নহৃদয়ে অনিলের মুখে ৭ম সর্গে আছে ; ভগ্নহৃদয় শৈশবসংগীতের পূর্বেই প্রকাশিত হয়)
প্রেমমরীচিকা	ও কথা বল না তারে কভু সে কপট না রে
গোলাপবালা	বলি ও আমার গোলাপবালা
ভগ্নতরী	পাগলিনী তোর লাগি কী আমি করিব
	বল ওই কথা বল সখা বল আর বার

প্রথম জীবনের যে কাব্যগুলিকে কবি তাঁর উত্তরকালের কাব্যগ্রন্থাবলী থেকে বহিষ্কৃত এবং কাব্যস্মৃতিলোক থেকেই নির্বাসিত করতে চেয়েছিলেন, শৈশবসংগীত তারই অন্যতম। সুতরাং এর গানগুলির প্রতিও কবির দুর্বলতা থাকার কথা নয়।

কিন্তু কবির প্রথম জীবনের গানগুলিতে রাগভঙ্গিম কাব্যগীতির এক প্রকার পেলব মাধুর্য ও নিষ্পাপ সৌকুমার্য রবীন্দ্রসংগীতজিজ্ঞাসুর কাছে পরম আদরণীয়। এই গানগুলির সুর সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়নি, কয়েকটি উদ্ধার করা হয়েছে। হৃদয়-ভাবনার বাষ্পাচ্ছন্ন প্রকাশ, অনুরাগ ও প্রেমচেতনার বিহ্বলতা, ভাবপ্রকাশের এক প্রকার সারল্য গানগুলিকে বড়ই মনোরম করেছে। এই কাব্যগীতগুলি রচনাকালে বাঙলা সংগীতের ক্ষেত্রে যাদের অপ্রতিহত প্রভাব সেই কবিগান-যাত্রা-পাঁচালি-টপ্‌পার দ্বারা অভিভূত না হয়ে নিজস্ব একপ্রকার সূক্ষ্ম কোমলতা ও স্পর্শকাতর কৈশোর-সারল্য ফুটিয়ে তোলার রোমান্টিক পটুতা এদের মধ্যে পাওয়া যায়।[২৩]

শিশু (১৩১০) কাব্যগ্রন্থে কবির দু-একটি সংগীত ভাবৈকসূত্রে স্থান পেয়েছে। শিশুর 'খেলা' কবিতা (তোমার কটিতটের ধটি কে দিল রাঙিয়া) রবীন্দ্রনাথের বাৎসল্য রসের বিরল সৃষ্টি। এরই একটি সংক্ষেপিত অংশে সুরযোজনা করে কবি ১৩৩৮ সালের 'গীতোৎসব' (২৮ ২৯ ৩১ ভাদ্র, ১ আশ্বিন) উপলক্ষে 'বালক নটের নৃত্যসহযোগে' রূপদান করেছিলেন। সংগীতটিতে মূল কবিতার কেবল প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্তবক গৃহীত। 'নবীন অতিথি' (ওহে নবীন

অতিথি তুমি নূতন কি তুমি চিরন্তন') গানটি 'ইতিপূর্বে কোনো এক 'সময়ে নবজাতকের অভ্যর্থনা উপলক্ষে রচিত, শিশুতে 'গান' রূপেই উল্লিখিত (গীত-বিতানে আনুষ্ঠানিক পর্যায়ভুক্ত)। সম্ভবত আপন কন্যার জন্মতিথিই এই গানটির প্রেরণা ছিল।

'ফুলের ইতিহাস' নামে শিশুতে দুটি কবিতা আছে (যা মূলত একটি কবিতা) —'বসন্ত প্রভাতে এক মালতীর ফুল' এবং 'তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল'। দুটি বহুপূর্ব যুগের গান, রুদ্রচণ্ড নাট্যকাব্যের অন্তর্গত (১২৮৮) এবং 'রবিচ্ছায়া'য় সংকলিত, শিশুতে সংক্ষেপিত। যে যুগে সদ্য-কৈশোর-অতিক্রান্ত কবি ফুলের প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট ছিলেন, ফুলের ভাষায় পুষ্প-কোমল প্রেমের মনোভাব ব্যক্ত করতেন, গান দুটি সেই কোমলপ্রাণ যুগের মুদ্রা-চিহ্ন। 'আশীর্বাদ' (ইহাদের করো আশীর্বাদ) নামে শিশুর এই সমাপ্তি-কবিতাটির উপর আংশিক স্বরার্পণ করে গানে পরিণত করা হয়েছিল। গানে কবিতাটির প্রথম কয় পংক্তি এবং শেষ স্তবকটি মাত্র রক্ষিত। কবিতাটি সর্বপ্রথম কড়ি ও কোমলে ১২৯৩ সালে মুদ্রিত হয়। সম্ভবত তারই কাছাকাছি সময়ে সুর যোজিত হয় এবং ব্রহ্মসংগীতরূপে ব্রাহ্মসমাজের শিশুমঙ্গল কোনো অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়।

বনবাণী (১৩৩৮ আশ্বিন) বৃক্ষবন্দনা বৃক্ষস্তব ও তরুপ্রশস্তির অপরূপ কাব্য। প্রকৃতি-আশ্রমের এই শকুন্তলা কন্যার প্রতি রবীন্দ্রনাথের সহমর্মিতা আবাল্য। বনবাণী কাব্যে কবি তাই তাঁর পরিণত বয়সের বৃক্ষরোপণ উৎসব উপলক্ষে রচিত দুটি গান 'মরুবিজয়ের কেতন উড়াও হে শূন্যে' এবং 'আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথি বালক তরুদল' অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ধরণীর শ্যামলতার প্রতি এমন হৃদয়রসের গীতোৎসার সম্ভবত কোনো আধুনিক ভাষায় হয়নি। দুটি গান ভাষায় ছন্দে আবেগে অপরূপ দুটি কাব্যসংগীত, ঋদ্ধ তরুস্তব।

পরিশেষ কাব্যের (১৩৩৯ ভাদ্র) সংযোজন অংশে (বিশ্বভারতী সংস্করণ রবীন্দ্র রচনাবলী ১৫শ খণ্ড) সমকালীন কয়েকটি কবিতা মুদ্রিত হয়েছে—যার মধ্যে তিনটি সংগীত আছে। সংগীতে রূপান্তরীভবনের পূর্বে কবিতারূপগুলি যথাক্রমে—

প্রবাসী	পরবাসী চলে এসো ঘরে
বুদ্ধজন্মোৎসব	হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী
নূতন	আমরা খেলা খেলেছিলেম

'পরবাসী চলে এসো ঘরে প্রবাসী পত্রিকার পঞ্চবিংশতি বর্ষপূর্তি উপলক্ষে' কবিপ্রদত্ত আশীর্বাণী, উক্ত পত্রিকার ১৩৩৩ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই কবিতাটি দ্বিখণ্ডিত করে কবি দুটি গান রচনা করেন—'পরবাসী চলে এসো ঘরে' এবং 'এসো এসো প্রাণের উৎসবে'। মূলকবিতার প্রথম দুই চরণে 'পরবাসী' গানের প্রথম দুই চরণ গঠিত। কিন্তু গানের পরবর্তী তিন পংক্তি গৃহীত হয়েছে কবিতার তৃতীয় স্তবকের শেষ তিন চরণের দ্বারা। কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের দু চরণে গানের সঞ্চারী রচিত এবং গানের শেষ চরণগুলি কবিতার চতুর্থ স্তবক থেকে নেওয়া। শুধু 'পরবাসী বাহিরে অন্তরে' কবিতার এই চরণটি গানে হয়েছে 'নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে'। 'পরবাসী চলে এসো ঘরে' গানে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বে আরও কয়েকটি পাঠান্তর আছে। এই কবিতার সপ্তম স্তবকে আছে—

এসো এসো মাটির উৎসবে
দক্ষিণ বায়ুর বেণুরবে

কবি 'মাটির' শব্দ পরিবর্তিত করে এবং আরও কয়েকটি শব্দ ঈষৎ বদল করে এবং শেষ স্তবকটি বর্জন করে 'এসো এসো প্রাণের উৎসবে' গানটি রচনা করেছেন। প্রথম গানটি গীতবিতানের বিচিত্র এবং দ্বিতীয়টি আনুষ্ঠানিক পর্যায়ের অন্তর্গত।

বুদ্ধজন্মোৎসব উপলক্ষে লিখিত 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত মানব-কল্যাণসংগীত, নটীর পূজায় ব্যবহৃত। করুণাঘন মহামানব বুদ্ধের বাণী কবিজীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। আর্ত স্বার্থজটিল রক্তকলুষ পৃথিবীতে বুদ্ধদেব-প্রচারিত মৈত্রী ও করুণার মন্ত্র উচ্চারণে কবির আকুলতা এই অবিস্মরণীয় সংগীতের প্রতিটি সুরময় বর্ণে ধ্বনিত হয়েছে।

'নূতন' কবিতাটির সংগীতরূপ ও কাব্যরূপে কেবল চরণ-স্তবকের-স্থান পরিবর্তন ঘটেছে, শেষ স্তবকটি বর্জিত হয়েছে। মূল কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের দ্বারা গানের আরম্ভ—'দূর রজনীর স্বপন লাগে আজ নূতনের হাসিতে।' এই কবিতায় কবির বক্তব্য জন্মজন্মান্তর-বাহিত প্রেম-প্রণয়-সখ্য যুগে যুগে নূতন বেশে আত্মপ্রকাশ করে। ক্ষণিকার 'আমি যদি জন্ম নিতেম' এবং পরবর্তীকালে লিখিত 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন' এই কবিতার ভাবগ্রন্থিতেই বাঁধা।

বিচিত্রিতার (১৩৪০ শ্রাবণ) একটিমাত্র কবিতা 'ঝাঁকড়া চুল' (ঝাঁকড়া

চুলের মেয়ের কথা কাউকে বলিনি) গানের আঙ্গিকে রচিত নয়। কবির একটি চিত্র অবলম্বনে রচিত এটি একটি লঘুরসের ছড়া মাত্র। কবি এটিকে সুর দিয়ে গানে পরিণত করেছিলেন, এই তথ্যটি কৌতুকপ্রদ এবং কৌতূহলোদ্দীপক। কারণ সমগ্র সুবিপুল রবীন্দ্রসংগীতে এই জাতীয় কবিতার তুলনা নেই। গীত-বিতান থেকে জানা যায়—"শুনা যায় কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি কবিতায় সুর দিবার সমসময়েই (বর্ষামঙ্গল ১৩৩৮) কবি এই রচনাটিতেও সুর দেন।" সম্ভবত এটিতে বাউলাঙ্গের সুর অর্পণ করা হয়েছিল।

পূরবীযুগ থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলীতে গানের ধারা কমে এসেছে। এই যুগে গানের প্রকাশ ঘটেছে স্বতন্ত্র পথে। শান্তিনিকেতনকে ঘিরে কবির উৎসব-আনন্দানুষ্ঠানের ধারাবর্ষণ যেমন বছরের পর বছর প্রবল হয়েছে, তেমনি জেগেছে সংখ্যাতীত হিল্লোলে গানের অঙ্কুর। গানে গানে কবির বন্ধন ঘুচে গেছে, গানের ভেলায় পূর্ণ হয়েছে প্রাণের আশা-আকাঙ্ক্ষা। ঋতুর বর্ণালিস্পনে গানের জোয়ার এসেছে ক্ষণে ক্ষণে, পুরাতন দিনের স্মৃতিভার সুরের মায়াজাল হয়ে উথলে উঠেছে। আসা-যাওয়ার পথের ধারে গান গাইবার আর বিরাম ছিল না কবির। সেইসঙ্গে তাঁর কাব্যধারাও চলেছে সমান্তরাল বেগে, নানারূপে, ঋতুবদলে, লগ্নবদল-পালাবদলের ছাড়-পত্রে। তাই এই যুগে গানের প্রকাশক্ষেত্র স্বতন্ত্র—কখনো ঋতুরঙ্গ কখনো নৃত্য-নাট্য-গীতিনাট্য। তাই এইকালে কাব্যগ্রন্থে গানের আয়োজন কম। তবে এই পর্ব থেকে আর একটি বিশিষ্টতা চোখে পড়ে। কবি প্রায়ই কোনো না কোনে কবিতাকে গানে পরিণত করার জন্য কবিতার সংক্ষেপসাধন করেছেন, রূপা-ন্তরিত করেছেন। সানাই কাব্যে এই জাতীয় দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে।

বীথিকা (১৩৪২ ভাদ্র) কাব্যে কয়েকটি পরিচিত বর্ষাসংগীত কবিতা হিসাবে স্থান পেয়েছে। এইগুলিতে অবশ্য কবিতার রূপান্তর ঘটিয়ে গান করা হয়নি, সংগীতগুলিকেই কাব্যমর্যাদায় বীথিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রচনা-কালীন নৈকট্যই তার একমাত্র কারণ। সেগুলির তালিকা—

ছবি	একলা বসে হেরো তোমার ছবি
প্রতীক্ষা	আজি বরিষণমুখরিত শ্রাবণরাতি
বাদলসন্ধ্যা	জানি জানি তুমি এসেছ এ পথে
বাদলরাত্রি	কী বেদনা মোর জানো
অভ্যাগত	মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম

'ছবি' কবিতাটি একটি চিত্রদর্শনে রচিত বলে প্রচারিত এবং কবিতার উপর পরে সুর দেওয়া হয়েছে। অন্যগুলি সুরের সহযোগিতাতেই সৃষ্ট হয়েছে (বীথিকায় 'গান' রূপে উল্লিখিত)। ছবি ব্যতীত অন্য গানগুলি বর্ষার অনুষঙ্গে ও আবহে শীকরসিক্ত, কবির বর্ষামঙ্গলের উৎসবসংগীত—যদিও সব কটি গানের মধ্যেই বর্ষাবিরহ, মিলনোৎকণ্ঠা, অভিসারোদ্বেগ ও নিষ্ফল প্রতীক্ষার সুর কবির পূর্বরচিত বর্ষাগীতগুলির সঙ্গেই তুলনীয়। ১৩৪২ সালের শ্রাবণে উদ্‌যাপিত বর্ষা-মঙ্গল অনুষ্ঠানে এই গানগুলি পরিবেশিত হয়েছিল কিন্তু তার পূর্বে অথবা পরে গানগুলির ভাষাগত কিছু পরিবর্তন হয়েছে। উভয়বিধ পাঠান্তরই গীতবিতানে সংকলিত আছে। 'কী বেদনা মোর জান সে কি তুমি জান' গানটি সম্পর্কে গীতবিতানের গ্রন্থপরিচয়ে উল্লিখিত আছে—

"বীথিকায় মুদ্রিত এই গানের রচনা ২৮ শ্রাবণ ১৩৪২। শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহে কবির পরম স্নেহভাজন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহসা মৃত্যু হয়। স্বভাবতই মনে হয় যে, সেই 'সকল নাটের কাণ্ডারী, আমার সকল গানের ভাণ্ডারী' আত্মবন্ধুর অশ্রুগূঢ়স্মৃতি ১৩৪২ বর্ষামঙ্গলের সমকালীন এই রচনায় মিলিয়া মিশিয়া আছে।"

অবশ্য এই রচনাকালীন হেতু না জানলেও প্রেমের গান হিসাবেও 'কী বেদনা মোর জানো' গানটিকে গ্রহণ করা যায়।

নবজাতক (১৩৪৭ বৈশাখ) কাব্যের 'উদ্বোধন' কবিতার (প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে) উপর সুর যোজনা করা হয় এটিকে কবি তাঁর গীতবিতানের ভূমিকারূপে স্থাপন করেন। ১৯৩৮ সালের ১৩ অক্টোবর কবিতাটি প্রথম কুড়ি ছত্র লেখা হয়েছিল, সমগ্র অংশের রচনাকাল কবিতায় আছে ২৬ বৈশাখ ১৩৪৫। গীতবিতানে প্রথম কুড়ি ছত্রই সংগীতরূপে গৃহীত হয়েছে। সংগীত-পিপাসা সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকেই প্রকাশপিয়াসি ধরিত্রীর বনে বনে, উষার শিশিরস্নানে, আলো-আঁধারের আনন্দবিপ্লবে নিহিত। তারই রাগিণী এই ব্যাকুলিত বসুন্ধরায়, নীলিমার পেলব সীমায়, কবির চকিত প্রাণে, জনতার মধ্যে নিঃসঙ্গতায়, নবপরিচয়ের বিরহব্যথায় ক্ষণে ক্ষণে ঘনিয়ে ওঠে। সেই সংগীতই কবির গীতসৃষ্টির মধ্যে ধ্বনিত, কবি সেই নবসৃষ্টির কবিরই প্রতিনিধি। 'বিহ্বল প্রাণে সংগীত-সৌরভে দূর আকাশের অরুণিম উৎসবে' কবি তাঁর গানের মধ্য দিয়ে অবাক আলোর লিপি বহন করে এনেছেন। কবির গীতভূমিকা যথার্থই তাঁর গীতসৃষ্টির উদ্‌ভাসন।

নবজাতকের সমসাময়িক প্রহাসিনী কাব্যে (১৩৪৭ বৈশাখ) একটি মাত্র সংগীত আছে—সুসীম চা চক্র (হায় হায় হায় দিন চলি যায়)। চাস্পৃহচঞ্চল চাতকদলের প্রতি কবির এই সকৌতুক গীতার্ঘ্য সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য আলোচনা ও পশ্চাদ্‌বর্তী ইতিহাস রবীন্দ্রজীবনীতে পাওয়া যাবে।

রোগশয্যায় (১৩৪৭ ফাল্গুন) কাব্যের ৩য় কবিতার ('একা বসে আছি হেথায়') প্রথম দুটি পংক্তি বর্জন করে কবি এটিকে গানে পরিণত করেছিলেন— 'যারা বিহান-বেলায় গান এনেছিল আমার মনে।' গীতবিতান গ্রন্থপরিচয়ে প্রদত্ত তথ্যানুসারে জানা যায় যে, ৩ নভেম্বর ১৯৪০ তারিখের প্রভাতে কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে রবীন্দ্রসংগীতের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে আপন গান শুনেই কবির স্মৃতিলোক সম্ভবত আবেগে উন্মথিত হয়ে ওঠে এবং কবি উক্ত গানটি রচনা করেন। গীতবিতান গ্রন্থপরিচয় মতে, "এই বৎসর ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে কালিম্পঙে কবি নিদারুণভাবে পীড়িত হইয়াছিলেন, কলিকাতায় আসিয়া রোগমুক্তির পর ৩০ অক্‌টোবর একটি কবিতা রচনা করেন : 'একা বসে আছি হেথায়'। 'যারা বিহান বেলায় গান এনেছিল আমার মনে' উল্লিখিত রচনারই গীতরূপ বলা যায়।"

কবিতা ও গানের মধ্যে প্রথম স্তবকের ভাষায় ঈষৎ পরিবর্তন ঘটেছে। কবিতাটির সূচনা এইরূপ—

একা বসে আছি হেথায় যাতায়াতের পথের তীরে
যারা বিহান-বেলায় গানের খেয়া আনল বেয়ে প্রাণের ঘাটে
আলো-ছায়ার নিত্যনাটে
সাঁঝের বেলায় ছায়ায় তারা মিলায় ধীরে।

গানে এই অংশ হয়েছে—

যারা বিহান-বেলায় গান এনেছিল আমার মনে
সাঁঝের বেলায় ছায়ায় তারা মিলায় ধীরে।
একা বসে আছি হেথায় যাতায়াতের পথের তীরে।

গীতবিতানের গ্রন্থপরিচয় অনুসারে কবি কলকাতা বেতারকেন্দ্রের রবীন্দ্র-সংগীতের অনুষ্ঠান শুনে গানটি রচনা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানের তারিখ ৩ নভেম্বর ১৯৪০, কিন্তু কবিতার তারিখ ৩০ অক্‌টোবর ১৯৪০। অর্থাৎ অনুষ্ঠানের পূর্বেই কবি যারা বিহান-বেলায় কবির প্রাণের ঘাটে গানের খেয়া বয়ে এনেছিল তাদের কথা স্মরণ করেছেন। সুতরাং কবিতার ভাষা পূর্বেই নির্ধারিত, রবীন্দ্র-

সংগীতের অনুষ্ঠান শুনে সে ভাষা লিখিত হয়নি। তবে কবিতাটিকে গানে পরিণত করার প্রেরণা উক্ত অনুষ্ঠান শুনে পেযে থাকতে পারেন। কবির জীবনে বিহান-বেলার গীতোদ্রেককারীদের স্মৃতির আলোছায়া প্রৌঢ় মনের উপর বহুদিন ধরেই কল্পনাবেশ রেখে গেছে, পূরবীর যুগ থেকেই আমরা তার আলোচনা করেছি। এই গানে কবি তাঁর প্রথম বয়সের ভালোবাসার স্মৃতি, সুরহারা ব্যথা, তাপহারা বিস্মৃতির প্রতি শেষ নৈবেদ্য সমর্পণ করলেন।

শেষ লেখা কবির মৃত্যুপূর্ব কয়েকটি বিচ্ছিন্ন কবিতার সংকলন, কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সংকলিত কবিতাগুলির মধ্যে তিনটি গানরূপে গৃহীত—

১ সমুখে শান্তিপারাবার

৩ ওরে পাখি থেকে থেকে ভুলিস কেন সুর

৬ ঐ মহামানব আসে

সমুখে শান্তিপারাবার গানটি সম্পর্কে সানাই কাব্যের কর্ণধার কবিতা প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। 'ওরে পাখি থেকে থেকে ভুলিস কেন সুর' কবিতাটির একটি গীতরূপ পাওয়া যায় গীতবিতানে 'পাখি তোর সুর ভুলিস নে।' গীতবিতান গ্রন্থপরিচয়মতে গানটি পূর্ববর্তী, "পরে কবিতায় পরিবর্তিত হইয়া শেষ লেখার তৃতীয় কবিতারূপে মুদ্রিত আছে"।

'ঐ মহামানব আসে' কবির শেষ জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীত। শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে কবি মানবসাধারণের অভ্যুত্থান সম্পর্কে এইটি রচনা করেন ১ বৈশাখ ১৩৪৮ তারিখে। সভ্যতার সংকটে কবি তাঁর জীবনের সর্বশেষ ভাষণে অপরাজেয় মনুষ্যত্বের উপর অবিচল আস্থার কথা বিশ্ববাসীর কাছে ঘোষণা করে যান। সেই মানবাত্মার অভ্যুদয় যুগে যুগে কালে কালে ইতিহাসের রক্তাক্ত বন্ধুর পথে, এই গানেও কবি তাই জানিয়ে গেলেন। মহামানব মহাকবি বিদায়ের শেষ লগ্নে মানবঅভ্যুদয়ের যে মহামন্ত্র রচনা করলেন, তাও ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে থাকবে।

১। প্রভাতসংগীতে গান শব্দটির ব্যবহার ৫৪ বার। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' কবি বলেছেন, 'এত কথা আছে এত গান আছে এত প্রাণ আছে মোর'। কড়ি ও কোমলের 'প্রাণ' কবিতায় আছে—

তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।

২। চিঠিপত্র ৫ম, পৌষ ১৩৫২ পৃ ১৩২ : পত্রের তারিখ ২১'মে ১৮৯০

৩। প্রথম প্রকাশ ভারতী ১২৯০ ভাদ্র, ১৩০৪-এ স্বরলিপি-গীতিমালায় প্রথম স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। রবিচ্ছায়াতেও গানটি আছে, সুর মিশ্র কালাংড়া

৪। রবিচ্ছায়ায় গানটি 'বিবিধ' পর্যায়ে সংকলিত, সুর মিশ্রখাম্বাজ। ভারতী ১৩০০ বৈশাখে স্বরলিপি প্রকাশিত হয়, ঈষৎ পরিবর্তিত পাঠের স্বরলিপি ১৩০৪ সালে স্বরলিপি-গীতিমালায় প্রকাশিত হয়

৫। 'কো তুহুঁ বোলবি মোয়' প্রচার ১২৯৩ বৈশাখে প্রকাশিত এবং কড়ি ও কোমলের প্রথম সংস্করণে (১২৯৩) অন্তর্ভুক্ত, পরে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণে গৃহীত। 'গানের বহি'তে 'বিবিধ' পর্যায়ে এটি আছে, কিন্তু রবিচ্ছায়ায় ছিল না। ইমন কল্যাণরূপে উল্লিখিত, কিন্তু সে সুর পাওয়া যায়নি

৬। সম্ভবত কবিতাটির উপর সুরারোপ বহু পরবর্তী কালের, কারণ কাব্যগীতি (১৯২০)-তে এর স্বরলিপি প্রথম প্রকাশিত হয়, গানের বহি-তে নেই

৭। এই গানটিও ১৯২০-তে প্রকাশিত কাব্যগীতি-তে প্রথম অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং সুরযোজনা সেই সময়ের

৮। 'মনের নানা গভীর আকাঙ্ক্ষা কাহিনীতে রূপকে গানে রূপ নেয় ছন্দে বন্ধে, সঙ্গ রচনা করে কল্পনায়, বস্তুজগৎ থেকে ক্ষণকালের ছুটি নিয়ে কল্পজগতে করে লীলা।" শাপমোচন ২য় সংস্করণ (১৩৩৯)। এইসূত্রে দ্র কবি ও কবিতা ১০ম বর্ষ ২য় সংখ্যা 'রবিরশ্মি ও রবিচ্ছায়া' প্রবন্ধ

৯। কে আমারে যেন (ভুলে) এবং আবার মোরে পাগল করে দিবে কে (শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা) কবিতা দুটির রচনা বৈশাখ ১২৯৪, স্পষ্টই কাদম্বরী দেবীর স্মৃতিবেদনায় আবিষ্ট। ১৩২৬ পৌষে কাব্যগীতি-তে কবিতা দুটি সুরারোপিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কাব্যগীতির অনেকগুলি গানই কবির প্রথম যৌবনের প্রেমস্মৃতিতে বিষণ্ন এবং কবিতা থেকে সুরে রূপান্তরিত

১০। কবিতা রচনাকাল ১২৯৪ অগ্রহায়ণ, পাঁচ বছর পরে (স্বরলিপি ভারতী ১২৯৯ চৈত্র) সুরার্পিত। এটি কবির প্রিয় গান, কবিকণ্ঠে এই গানটি চিরকালের জন্য বাঁধা পড়ে গেছে গ্রামোফোন রেকর্ডে

১১। সাধনা ১২৯৯ শ্রাবণে ইন্দিরা দেবী এর স্বরলিপি প্রকাশ করেন, অর্থাৎ কবিতা লেখার তিন বছর পর

১২। গান দুটির স্বরলিপি নেই, অর্থাৎ সুর রক্ষিত হয়নি। গীতবিতানের সূচীপত্রে 'একদা প্রাতে কুঞ্জতলে' গানটির সুর 'ভৈরবী ঝাঁপতাল' এবং 'কেন নিবে গেল বাতি' 'গৌড় সারং একতালা' বলে নিরূপিত

১৩। গানে ও কবিতায় পাঠভেদ সামান্যই। আপন জন্মদিবস উপলক্ষে রচিত এটি প্রথমচ গান, যদিও আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মসংগীতের লক্ষণই গানটিতে বেশি। প্রভাতকুমারের মতে, রচনা ১৩০৬ জ্যৈষ্ঠ নাগাদ

১৪। 'প্রণয়প্রশ্ন' কবিতাটির সুরযোজিত গীতরূপটি কবির হস্তাক্ষরে স্বরলিপিসহ পাওয়া গেছে। দ্র বিশ্বভারতী পত্রিকা ভাদ্র ১৩৪৯

১৫। 'নীল নবঘনে' 'হৃদয় আমার নাচে রে' এবং 'হে নিরুপমা' তিনটি কবিতার গীতরূপ ১ম সংস্করণ গীতবিতানে (১৩৩৮) নেই, ২য় সংস্করণে (১৩৪৮ মাঘ) অন্তর্ভুক্ত হয়

১৬। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'গীতিবিতান কালানুক্রমিক সূচী' (১ম খণ্ড ২য় সং জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০) গ্রন্থে লিখেছেন, '১৩৩৮ সালে কবির সপ্ততিতম জন্মোৎসবে অনুষ্ঠিত 'শাপমোচন' নাটিকা অভিনয়কালে কবি তাঁহার তিনটি কবিতায় সুর বসাইয়াছেন। 'কৃষ্ণকলি' তাদের মধ্যে একটি। দ্র গীতিবিতান ৩য় খণ্ড ১ম সংস্করণ ১৩৩৯ শ্রাবণ, পাঠপরিচয় শ্রীসুধীরচন্দ্র কর।' কিন্তু শান্তিদেব ঘোষ তাঁর 'রবীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থে লিখেছেন,

'১৯৩১ সালে বর্ষামঙ্গল উপলক্ষে ক্ষণিকার 'কৃষ্ণকলি' কবিতাটিতে সুর দিলেন কীর্তন ও নানা রাগিণী মিশিয়ে।'

১৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৩য় খণ্ড (৩য় সং), পৃ ১৪৪

১৮। 'দুখের বেশে এসেছ বলে' গানটি মহর্ষির সাম্বাৎসরিক ব্রাহ্মোৎসব উপলক্ষে রচিত, ১৩১৪ সালের মাঘোৎসবে গীত হয়। ১৮২৯ শকাব্দ তত্ত্ববোধিনী ফাল্গুন সংখ্যায় স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। 'আমি কেমন করিয়া জানাব' গানটিও মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল, সুর আশাবরী-আশ্রিত। কিন্তু 'আমার গোধূলিলগন এল বুঝি কাছে' সুরারোপিত হয়েছে অনেক পরে, ১৩২৬ পৌষে 'কাব্য-গীতি'তে এর স্বরলিপি প্রকাশিত হয়

১৯। শ্রীসরোজকুমারী দেবী—শ্রেয়সী (শান্তিনিকেতনের মহিলাদের মুখপত্র), ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২৯

২০। আধুনিক সাহিত্য—'আর্যগাথা'

২১। গীতিমাল্যের ৬, ২৯, ৩৮, ৫৩, ৬০, ৬২, ৯৭, ১০০, ১০৫, ১০৯ এবং ১১০ সংখ্যক কবিতা-গুলি গানের অঙ্গিকে রচিত

২২। এই সম্পর্কে প্রথম তথ্যনির্ভর আলোচনা করেছেন জগদীশ ভট্টাচার্য, কবিমানসী ১ম খণ্ডে (১ম সং ১৩৬৬), পৃ ৪৪৫-৪৫০

২৩। "কবি গ্রন্থের নামকরণে বা নিবেদন উপলক্ষে 'শৈশবসংগীত' অথবা 'বাল্যলীলা' বলিয়া এই সময়ের গানগুলির প্রকাশে বিশেষ সংকোচ দেখাইয়াছেন। ইহার মধ্যে যেগুলি প্রেমের গান তাহাতে আবার প্রায়শই একটি নাটকীয়তাও দেখা যায়।...মানসী কাব্যে 'ভুলে', 'ভুলভাঙা', 'নারীর উক্তি' ও পুরুষের উক্তি' এবং আরও বহু কবিতায় মধুরভাবের সূক্ষ্ম ঘাতপ্রতিঘাতময় যে 'বিচিত্রি প্রকাশ রসোত্তীর্ণ এবং পরম রমণীয়তায় উদ্‌ভাসিত, তাহারই পূর্বাভাস শৈশবসংগীত ও রবিচ্ছায়া'র প্রেমের গানগুলিতে পাওয়া যায়।" (গীতবিতান ৩য় খণ্ড গ্রন্থপরিচয়)

রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংগীত

১

রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্য সুবিপুল এবং জীবনের প্রায় প্রথম পর্ব থেকেই কবি নাটককে গীতিবদ্ধ করার জন্য সংগীতের অকৃপণ ব্যবহার করেছেন। বস্তুত সংগীত তাঁর নাটকে একটি বিশিষ্ট মাত্রা যোজনা করেছে। শেষ জীবনে সংগীতের অদ্বৈতেই নাট্যরীতির প্রতিষ্ঠার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ নাট্যপ্রতিভার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। সুতরাং কেবল রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যের উন্মেষের দিক থেকেই নয়, কাব্যসংগীতের ইতিহাস ও বিশ্লেষণের দিক থেকেও তাঁর নাট্য-ব্যবহৃত গানগুলির পুনর্বিচার ও অনুসন্ধান আবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংগীতগুলিকে সাধারণত দুই শ্রেণীতে স্থূলভাবে ভাগ করা যায়[১]। প্রথম, নাটকের প্রযোজনে রচিত এবং দ্বিতীয়, পূর্বে অন্য কোনো উপলক্ষে রচিত, পরে প্রাসঙ্গিক ভাবসূত্রে নাটকে সংযোজিত। অবশ্য, নির্দিষ্ট তথ্যের অভাবে প্রথম জীবনের নাটকে ব্যবহৃত গানগুলির কোনটি নাট্যরচনার পূর্বে বা নাট্যপ্রয়োজনে রচিত নির্দেশ করা কঠিন। বিশেষ তথ্য পাওয়া না গেলে তাঁর নাট্যগীতগুলিকে নাটকের নিজস্ব প্রয়োজনে রচিত বলেই ধরে নিতে হবে। কিন্তু নাট্যান্তর্গত বা নাট্যপ্রয়োজনে রচিত পরিবেশনির্ভর গানও স্বয়ংসম্পূর্ণ কাব্যসংগীতরূপেই বিচার্য। কারণ যে অতুলনীয় বাক্-সম্পদ তাঁর কাব্যগীতির গৌরব, এগুলি তারই উদাহরণ। রবীন্দ্রপ্রতিভার কবিধর্মেই তাঁর নাট্যগীতগুলি সমৃদ্ধ, কাব্যসংগীতের মতই গানগুলি গীতিকবিতার লক্ষণে চিহ্নিত এবং সেগুলির সুর কথাবস্তুকে ঠিক একই ভাবে অরূপলোকে নিয়ে যায়। সর্বোপরি নাট্যব্যতিরিক্ত গানরূপেই সেগুলির জনপ্রিয়তা।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যসৃষ্টির শ্রেণী বহুতর—গীতিনাট্য গাথানাট্য কাব্যনাট্য নৃত্যনাট্য রূপক সাংকেতিক বা তত্ত্বনাট্য প্রহসনাত্মক নাট্য সামাজিক নাট্য-রূপে আমাদের কাছে সেগুলি সুপরিচিত। সূক্ষ্মতর সমালোচনায় এই শ্রেণী-বিভাগকে বিপুল ও ব্যাপকতর করার উদাহরণও রবীন্দ্রনাথের নাটকে আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই সকল শ্রেণীর নাটকেই কিন্তু সংগীত ব্যবহার করেছেন—দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। আর সবক্ষেত্রেই তাঁর নাট্যসংগীতগুলি পূর্বযুগের নাটকের মত কেবল অবকাশরঞ্জনের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়নি, কাব্যের গভীর

প্রয়োজনে, স্তিমিতবাক্ সাংকেতিকতার প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হয়েছে। সংগীত রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার সঙ্গে গভীরভাবে অনুস্যূত। তাঁর কবিচিত্ত কাব্য-স্ফুরণের উষালগ্ন থেকেই গীতসুধারসে পরিপ্লুত। তাই নিতান্ত কিশোর-জীবনের রচনাতেও গানের অনুষঙ্গ বা গানের ব্যবহার ছিল প্রচুর। ঠাকুর-পরিবারে সংগীতের যে সহজ চর্চা ও স্বচ্ছন্দ অনুশীলনের রেওয়াজ ছিল, গান সম্পর্কে কবিপ্রাণের এই দুর্বলতা তারও উত্তরাধিকারী হতে পারে।

বাঙলা নাট্যসংগীতের পূর্বতন ঐতিহ্যও এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের কৈশোর পর্ব বাঙলাদেশে যাত্রার নবোন্মেষের কাল। প্রাচীন যাত্রার সঙ্গে নতুন কালের পাঁচালি-তর্জা-কবি-হাফ-আখড়াই প্রভৃতি মিশ্রিত হয়ে এক প্রকার সংগীতবহুল গীতাভিনয় খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের শেষ কয়েক দশকেই বাঙলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারী দেবীও বিদেশী অপেরা এবং বাঙলা যাত্রার মধ্যে সমীকরণ ঘটিয়ে গীতিনাট্য রচনায় উৎসাহী হয়েছিলেন। তাছাড়া জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ তাঁর ঐতিহাসিক নাটকেও সংগীত ব্যবহার করতেন এবং তাঁর কোনো নাটকের সংকটময় পরিস্থিতিতে উপযুক্ত সংগীতরচনার জন্য তিনি কিশোর রবীন্দ্রনাথের সাহায্য গ্রহণ করেছেন, এরূপ তথ্যও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতিতে সুবিদিত। বিলাতপ্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথ সংগীতময় নাট্যরচনার দ্বারাই তাঁর নাট্যজীবন সুরু করেছিলেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাট্যের যাত্রা-সূচনায় সংগীতের তিলকেই তার আশীর্বাণী হয়েছিল।

বাঙলা নাটকে সংগীতব্যবহারের ব্যাপক ঐতিহ্যে লালিত হয়েও কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত নাট্যসংগীত রচনা করেননি। "সাধারণত বাঙলা নাটকে গানের ব্যবহার হত তিনটি উদ্দেশ্যে। এক, দর্শকদের অতিরিক্ত কিছু আনন্দ দান করা ; দুই, আবেগময় কোনো মুহূর্তকে ঘনীভূত করা, এবং তিন, কাহিনীর ভবিষ্যৎ গতিপরিণামের একটা সাংকেতিক নির্দেশ দেবার জন্য। তাছাড়া একঘেয়েমি কাটানো, নাচের প্রয়োজনে গানের সহযোগিতা এইগুলির কথাও বলা যায়"।[২] কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটকে, বিশেষ করে প্রথম জীবনের নাটকে, দর্শকদের মনোরঞ্জন করা বা একঘেয়েমি কাটানোর জন্য অথবা নৃত্যসহ-যোগিতার জন্য সংগীত ব্যবহার করেছেন, এই দৃষ্টান্ত কেবল বিরল নয়, অসম্ভব। কারণ পেশাদারি মঞ্চ বা নিয়মিত ব্যবসায়িক অভিনয় থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন বলেই দর্শকরুচি বা গণচাহিদার দিকটি রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যকে

কখনো বিচলিত নিয়ন্ত্রিত বা নিরূপিত করেনি। আবেগময় মুহূর্তের ঘনীভবন অথবা কাহিনীর ভবিষ্যৎ গতিপরিণামের নির্দেশদান—এই সূত্রেও কবির নাট্যসংগীতগুলিকে এক বাক্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের নাট্যরচনাগুলিকে ঠিক নাটক বলা চলে না, কারণ এইগুলিতে সংজ্ঞা মিলিয়ে নাট্যবিশিষ্টতা তো নেইই, এমন কি সংলাপের সাধারণ রীতিও অনেকাংশে অনুপস্থিত। অথচ নাট্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেই সেইগুলির আলোচনা করা উচিত। এর প্রথম ও প্রধান কারণ, এগুলিতে কাহিনী আছে, পাত্রপাত্রী তথা চরিত্র আছে। কবি আপনাকে যথাসম্ভব নিরপেক্ষ রেখে সেই পাত্রপাত্রীর মনোভাবই অভিব্যক্ত করেছেন। সেই সূত্রেই পাত্রপাত্রীর মনোভাব বা সংলাপের বিকল্পে গান প্রযুক্ত হয়েছে। অবশ্য পাত্রপাত্রীর মুখে নির্বিচারে তরুণ কবির হৃদয়ভাবেরই প্রাধান্য ঘটেছে এবং নাট্যকারের নিরাসক্তি অপেক্ষা গীতিকবির আত্মমগ্নতায় এগুলি যে আচ্ছন্ন তাতে সন্দেহ নেই। তৎসত্ত্বেও বাইরের দিক থেকে নাট্যপ্রসঙ্গেই কবিকাহিনী বনফুল ভগ্নহৃদয় রুদ্রচণ্ড প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের অচলিত কাব্যনাট্য বা গাথানাট্যগুলির আলোচনা করা উচিত। এই সকল রচনা যে যথার্থ নাটক হয়ে ওঠেনি, কবি নিজেও তা জানতেন। ভগ্নহৃদয়ের ভূমিকায় কবি লিখেছিলেন—

"এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক মনে না করেন। নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল কাণ্ড শাখা পত্র এমন কি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই। বর্তমান কাব্যটি ফুলের মালা, ইহাতে কেবল ফুলগুলি মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে দৃষ্টান্তস্বরূপেই ফুলের উল্লেখ করা হইল।"

এই মন্তব্য কেবল ভগ্নহৃদয় নয়, সমকালীন প্রতিটি কাব্যনাট্য সম্পর্কেই প্রযোজ্য। গানগুলিকে এই 'ফুলের' অঙ্গীভূত করেই বিচার করা উচিত। কিন্তু নাটকের গান তো নিছক ফুল নয়, কাণ্ড মূল শাখার সঙ্গেও তার সম্পর্ক আছে।

ভগ্নহৃদয়ের গানগুলি গীতবিতানে সংকলিত হয়েছে, কিন্তু তা কেবল তৎকালীন গাথাকাব্যের রীতি অনুসারেই। তাই সেগুলি যথার্থ গান হয়ে ওঠেনি। কবি সেইগুলিতে সুরযোজনাও করেননি বলেই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংগীতসংকলন 'রবিচ্ছায়া'য় কবির নিতান্ত কিশোর বয়সের সব গানই প্রায় আছে, কিন্তু কবিকাহিনী বা বনফুলের গান নেই—ভগ্নহৃদয়ের গান আছে। ভগ্নহৃদয়ের যে গানগুলিতে কবি সুরযোজনা করেছিলেন (পরবর্তী-

কালে তাদের সুর হারিয়ে গেলেও) সম্ভবত সেইগুলিকেই কবি তাঁর নিজস্ব সংগীতরূপে গ্রহণ করেছেন। তাই ভগ্নহৃদয় থেকেই তাঁর নাট্যগীত-রচনার পালা।

২

ভগ্নহৃদয় রবীন্দ্রনাথের নিতান্ত অপটু কিশোর বয়সের রচনা, এটি প্রকাশিত হয় জুন ১৮৮১ অর্থাৎ কবির বিংশতিবর্ষ বয়সকালে এবং তার কিছুকাল পূর্বে ১২৮৭ সালের কার্তিক থেকে ফাল্গুনে এর ছটি সর্গ ধারাবাহিক ভাবে ভারতীতে প্রকাশিত হয়। এটি গীতিকাব্য নামে প্রকাশিত হলেও আসলে এটি নাট্যকাব্য, মোট ৩৪টি সর্গে সমাপ্ত। আঠারো বছর বয়সে কবির বিলাত প্রবাসকালে এর সূচনা হয় ও দেশে প্রত্যাবর্তনকালে ও ফিরে এসে সম্পূর্ণ করা হয়।

ভগ্নহৃদয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথমজীবনের অনেকগুলি সংগীত আছে। এই কাব্যের-'উপহার' রূপে যে কবিতাটি আছে কবি সেটিকে পরে সুরযোজনার দ্বারা গানে রূপান্তরিত করেন—'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা'। 'ভগ্নহৃদয়ের উপহার' রূপেই এটি ভারতীতে মুদ্রিত হয়। ভগ্নহৃদয় কাব্যটি কাদম্বরী দেবীর প্রতি উৎসর্গীকৃত বলে রবীন্দ্রজীবনীকার জানিয়েছেন। এই গানে কবির প্রেমচেতনার একটি বিশেষ আদর্শের পরিচয় নিহিত আছে। পঞ্চভূত গ্রন্থের এক জায়গায় কবি বলেছেন, 'যাহাকে আমরা ভালোবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই'। এই অনন্তের উপলব্ধির অর্থ একটা বিনম্র আত্মবিস্মৃত ধর্মোপাসনার ভাবে জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠা। ছিন্নপত্রাবলীতে কবি লিখেছেন, 'আমাদের সমস্ত স্নেহপ্রীতির সম্বন্ধ একটা বিনম্র আত্মবিস্মৃত ধর্মোপাসনার ভাবে জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। দুঃখের দুঃখত্বটা যে চলে যায় তা নয়, কিন্তু সে আমার স্বার্থের সীমা অতিক্রম করে এমন সুবৃহৎ আকাশে ব্যাপ্ত হয়ে যায় যে, সেখানে একটা সৌন্দর্য বিকিরণ করতে থাকে—যেমন সূর্যাস্তের আলোক সমস্ত জলেস্থলে আকাশে একটা বিষাদের ছায়া ফেলে বটে, কিন্তু তার মধ্যে একটি উত্তাপবিহীন সুকোমল সৌন্দর্যের আনন্দ মিশ্রিত থাকে।' ভগ্নহৃদয়ের আলোচ্য গানটির মধ্যে কবির প্রণয়ভাবনা এইভাবেই জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছিল বলেই পরের বৎসর মাঘোৎসবে কবি গানটিকে ব্রহ্মসংগীতরূপে প্রচার করেছিলেন। এই গানে যে ধ্রুবতারার চিত্রকল্পটি ব্যবহৃত

হয়েছে, রবীন্দ্রকাব্যে পরবর্তী অধ্যায়ে বারবার তার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। মানসীর বিদায় কবিতায় পাই—

সম্মুখেতে তোমারই নয়ন জেগে আছে
আসন্ন আঁধার মাঝে অস্তাচল কাছে
স্থির ধ্রুবতারাসম ;

'বিদায়' কবিতাটিও বিদেশ-যাত্রাকালে রচিত, 'ভগ্নহৃদয়ের উপহার' যেমন বিদেশপ্রত্যাবর্তনকালে রচিত।

ভগ্নহৃদয় পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের প্রচলিত কাব্যগ্রন্থাবলী থেকে বিলুপ্ত হলেও এর সংগীতগুলি তাঁর পরবর্তী কাব্যসংগীতসংগ্রহে স্থান পেয়েছে। ভগ্নহৃদয়ের প্রথম সর্গে মুরলার গান 'কতদিন একসাথে ছিনু ঘুমঘোরে' রবিচ্ছায়ায় সংকলিত এবং মালতী পুঁথিতেও পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতীতে ভগ্নহৃদয় প্রকাশকালেও ভগ্নহৃদয়ের একটি পাণ্ডুলিপিতে (রবীন্দ্ররচনাবলী অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ড) 'কতদিন একসাথে ছিনু' গানটির বদলে আছে 'কে গো বলে দেবে এ কেমন ভাব হৃদয়ে উঠেছে মোর।'[৩] ২য় সর্গে নলিনীর গান 'নাচ শ্যামা তালে তালে' কাব্যে গানরূপে উল্লিখিত হলেও দীর্ঘ অংশের কয়েকটি মাত্র পংক্তিতেই স্বরার্পণ করা হয়েছিল।

৪র্থ সর্গে কবির কণ্ঠে মোট আটটি গান থাকলেও 'বিপাশার তীরে ভ্রমিবারে যাই' গানটিই রবিচ্ছায়ায় সংকলিত হয়েছে। ৫ম সর্গে নলিনীর কণ্ঠে 'খেলা কর খেলা কর তোরা কামিনী কুসুমগুলি' এবং প্রমোদের কণ্ঠে 'আঁধার শাখা উজল করি' এই দুটি গান উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় গানটি জীবনস্মৃতির সাক্ষ্যে (দ্রষ্টব্য বিশ্বভারতী পত্রিকা কার্তিক-পৌষ ১৩৫০) ভগ্নহৃদয়ের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিতভাবেই পূর্বে কোনো এক সময় রচিত হয়েছিল। ৬ষ্ঠ সর্গে কবির গান 'নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়' সম্পর্কেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য। এটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম 'প্রকৃত নিজের গান' যা বিলাত যাত্রার পূর্বে আমেদাবাদ বাসকালে রচিত, পরে পরিবর্তিত আকারে ভগ্নহৃদয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।[৪] ৬ষ্ঠ সর্গে চপলার 'সখী ভাবনা কাহারে বলে,' ৭ম সর্গে অনিলের গান 'কাছে তার যাই যদি', ৮ম সর্গে চপলার গান 'যে ভালবাসুক সে ভালবাসুক', ৯ম সর্গে নলিনীর গান 'কী হল আমার বুঝি বা সজনী'—প্রতিটি গানই প্রেমের। এই গানগুলির মধ্য দিয়ে অস্ফুট হৃদয়বেদনায় জর্জরিত কতকগুলি নরনারীর মনোভাবের যে পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে তা নবযৌবনবিহ্বল কবিরই রুদ্ধ হৃদয়াবেগের প্রতিফলন।

পরবর্তী কালের মায়ার খেলার পূর্বাভাস এগুলিতে সুস্পষ্টভাবেই পাওয়া যায়। ১০ম সর্গে কবির গান 'কে গো তুমি খুলিয়াছ স্বর্গের দুয়ার' ভগ্নহৃদয়ের কাহিনী অনুযায়ী কবিরচিত, কিন্তু নলিনীর কণ্ঠে গীত হওয়ায় বিহ্বল আনন্দে কবি সেই সংবাদ তার গোপন প্রণয়িনী মুরলাকে নিবেদন করেছে। মূল পাঠ গানে সম্পূর্ণ রক্ষিত নেই। ১১শ সর্গে অনিলের গান 'কিছুই ত হল না' কাব্য-গ্রন্থাবলীতে (আশ্বিন ১৩০৩) 'ছায়া' শিরোনামায় মুদ্রিত ও 'গান' রূপে নির্দিষ্ট। উক্ত পাঠে বর্তমান ৭ ছত্রের পর আরও ১৬ ছত্র দেখা যায়। ১৯শ সর্গে ললিতার গান 'বুঝেছি বুঝেছি সখা ভেঙেছে প্রণয়' ২২শ সর্গে 'তুইরে বসন্ত সমীরণ' বিনোদের কণ্ঠে অর্পিত, দুটিতেই মূলপাঠের সামান্য অংশ আছে।

ভগ্নহৃদয়ের গানগুলি সম্পর্কে সাধারণভাবে এখন কয়েকটি মন্তব্য করা যায়। ভগ্নহৃদয় কৈশোর-অতিক্রান্ত কবির অপরিণত প্রতিভার প্রথম আবেগসর্বস্ব গাথাকাব্য, নাটকীয়তা ও গীতিধর্মিতার সমন্বয়ে রচিত। কবির প্রথম জীবনের সংগীতরচনার বৈশিষ্ট্য এর গানগুলিতে রক্ষিত আছে। ভগ্নহৃদয়ের একাধিক গান যে কবির কাছে প্রিয় ছিল, তার প্রমাণ রবিচ্ছায়া নামক প্রথম সংগীত-সংকলনে ও গীতবিতানে এর অনেক গানই উদ্ধৃত হয়েছে। প্রথম জীবনের একটি প্রসিদ্ধ গান 'বলি ও আমার গোলাপবালা' সম্ভবত ভগ্নহৃদয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রসদনে ভগ্নহৃদয়ের একটি পাণ্ডুলিপি দান করেন, তার পাঠ ও মুদ্রিত ভগ্নহৃদয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। উক্ত পাণ্ডুলিপিতেই 'বলি ও আমার গোলাপবালা' গানটি মেলে, তবে বর্জন-চিহ্নাঙ্কিত। গানটি ভারতী পত্রে ১২৮৭ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় সংক্ষিপ্ত আকারে ও স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হয়। গীতবিতানে মুদ্রিত প্রচলিত পাঠ সংক্ষিপ্ততর।[৫]

কাব্য হিসাবে ভগ্নহৃদয় কবির অনুমোদন পায়নি অথচ এর অনেক গান সম্পর্কেই কবির দুর্বলতা ছিল। ভগ্নহৃদয়ের গানগুলি সবই প্রণয়গীতি—প্রেমের চঞ্চল আবেগধর্ম, উচ্ছ্বসিত হৃদয়ধর্মের ব্যাকুলতা এই তরুণ পেলব গানগুলির কথা ও সুরকে সুকুমারভাবে বেষ্টন করে আছে। একাধিক গানের ভাষা ও সুর সমকালীন ও পূর্ববর্তী গীতিকার—নিধুবাবু, হরু ঠাকুর, রাম বসু, শ্রীধর কথক, মনোমোহন বসু, জগন্নাথপ্রসাদ বসুমল্লিক, অক্ষয় চৌধুরী প্রভৃতি কবির গানের ধারাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এ ছাড়া কিছু কিছু গান কবিতা হিসাবে রচিত হয়েছিল, পরে সুরারোপিত হয়েছে; তার প্রমাণ প্রচলিত গীতরূপ ও ভগ্ন-

হৃদয়ে উদ্ধৃত কাব্যরূপের সঙ্গে ভাষাগত পার্থক্য। ভগ্নহৃদয়ের কয়েকটি গান আজও রবীন্দ্রসংগীত-রসিকের কাছে কাব্যগুণমাধুর্য ও সুরসম্পদের জন্য আদরণীয়। ভগ্নহৃদয়ের কিছু অংশ বিলাতপ্রবাসে ও দেশে ফিরে লেখা হলেও, বাল্মীকিপ্রতিভায় যেমন কবির প্রতীচ্যবাসের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাস্বরূপ বিদেশী সুরের প্রভাব পড়েছে, ভগ্নহৃদয়ে তা নেই।

রুদ্রচণ্ড গাথাকাব্যটি ভগ্নহৃদয়ের দুদিন পরে অর্থাৎ ২৫ জুন ১৮৮১ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়। কিন্তু সম্ভবত তারিখটি যথার্থ নয়, কারণ হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রে রুদ্রচণ্ডের প্রাপ্তিস্বীকার করা হয়েছিল ৯ মে এবং তাঁর সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল ২৩ মে, ১৮৮১ অর্থাৎ মাসাধিক পূর্বে। রুদ্রচণ্ড ভগ্নহৃদয়ের মত গীতিকাব্য নয়, নাটিকারূপেই এটি প্রচলিত হয়েছিল। ভগ্নহৃদয় ও রুদ্রচণ্ডের কয়েকটি গান কাব্যগ্রন্থাবলীর (১৩০৩) কৈশোরক অংশেও স্থান পেয়েছিল। ভগ্নহৃদয়ের তুলনায় রুদ্রচণ্ড দুর্বলতর ও কম জনপ্রিয় হলেও এর দু-একটি গান কবির স্মৃতিতে বহুকাল জাগরূক ছিল। রুদ্রচণ্ডে তৃতীয় দৃশ্যে অমিয়ার মুখে দুটি মাত্র গান আছে—'বসন্তপ্রভাতে এক মালতীর ফুল' এবং 'তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল।' দুটি গানই মালতী পুঁথিতে পাওয়া যায়। দুটি গানের পৃথক সুর নির্দেশ থাকলেও (প্রথমটি 'মিশ্রললিত' এবং দ্বিতীয়টি 'মিশ্র গৌড়সারং') ইন্দিরা দেবীর সাক্ষ্যে জানা যায় যে দুটি গান একই সুরে গাওয়া হত—এই মর্মে গীতবিতান গ্রন্থপরিচয়ে উল্লিখিত আছে। দুটি গান যে একই কবিতার দুই স্তবক তাতে সন্দেহ নেই। বসন্তপ্রভাতে প্রস্ফুটিত মালতী ফুলের ছিন্নবৃন্ত হওয়ার বেদনার্ত ইতিহাস গায়িকা অমিয়ার সংক্ষেপিত ক্ষুব্ধ হৃদয়েরই চিত্রকল্প। গান দুটি রবিচ্ছায়াতে আছে, তাছাড়া সংক্ষেপিত আকারে 'ফুলের ইতিহাস' নামে কবি শিশু কাব্যেও এদের স্থান দিয়েছিলেন।

রুদ্রচণ্ডের পর নলিনী ১২৯১ সালে (১০ মে ১৮৮৪) প্রকাশিত হয়। এটি গদ্যে রচিত কবির প্রথম মুদ্রিত নাটক, এতেও গান আছে। কয়েকটি গান, হা কে বলে দেবে মোরে, ও কেন ভালবাসা জানাতে আসে, ভালবাসিলে যদি সে ভাল না বাসে, মনে রয়ে গেল মনের কথা যথাক্রমে নীরদ, ফুলি, নবীন ও ফুলির কণ্ঠে আরোপিত। ভগ্নহৃদয়ের গান সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছে, নলিনীর গানগুলি সম্পর্কেও তারই পুনরাবৃত্তি করা যায়।

৩

রবীন্দ্রনাট্যসংগীতের ইতিহাসে বাল্মীকিপ্রতিভাকে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ বলা যেতে পারে। বাল্মীকিপ্রতিভা রবীন্দ্রনাথের নাট্যসৃষ্টি ও সংগীতরচনার ইতিহাসে প্রথম জীবনের সবচেয়ে বিশিষ্ট রচনা, যার ভিতর দিয়ে সুস্পষ্টভাবে পরবর্তী প্রবণতার বীজগুলি আবিষ্কার করা যায়। ১২৮৭ সালের ফাল্গুনে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এই রচনায় বিলাতপ্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথের অপেরা-সম্পর্কিত সদ্যোলব্ধ অভিজ্ঞতা ও সংগীতশিক্ষা যথাসম্ভব অপটু অবস্থায় প্রতিফলিত হয়েছে, সেই সঙ্গে কবির সংগ্রন্থনী প্রতিভা ও সৃজনশীলতা একটি যৌগিক সংমিশ্রণ লাভ করেছে। বাল্মীকিপ্রতিভার তিনটি রূপ পাওয়া যায়— একটি, ১ম সংস্করণের অপরিণত রচনা, দ্বিতীয়টি, ২য় সংস্করণ বাল্মীকিপ্রতিভা, যাতে বাল্মীকিপ্রতিভার ঠিক পরে রচিত কালমৃগয়া থেকে কিছু গান গৃহীত হয়েছে এবং তৃতীয়টি হল, প্রবীণ বয়সের ঈষৎ সংস্কার-করা মার্জিত বাল্মীকি-প্রতিভা।

বাল্মীকিপ্রতিভার সঙ্গে ভগ্নহৃদয়ের পার্থক্য আছে, কারণ ভগ্নহৃদয় কাব্যনাট্য, সংগীত যেখানে সংলাপের সঙ্গে অতিরিক্ত যোজিত। বাল্মীকিপ্রতিভা সংগীতনাট্য অর্থাৎ সংলাপই এখানে সুরে আবৃত্ত, স্বতন্ত্র কোনো কাব্যসংগীত এতে নেই। পরিণত বয়সে বাল্মীকিপ্রতিভার ভূমিকায় কবি লিখেছিলেন—

"বাল্মীকিপ্রতিভায় একটি নাট্যকথাকে গানের সূত্র দিয়ে গাঁথা হয়েছিল, মায়ার খেলায় গানগুলিকে গাঁথা হয়েছিল নাট্যসূত্রে। একটা সময় এসেছিল যখন আমার গীতিকাব্যিক মনোবৃত্তির ফাঁকের মধ্যে নাট্যের উঁকিঝুঁকি চলছিল।"

জীবনস্মৃতিতে কবি লিখেছেন—"জোড়াসাঁকোয় বিদ্বজ্জনসমাগম উপলক্ষে বাল্মীকিপ্রতিভার জন্ম হইল। আমি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর একবার এই সম্মিলনী আহূত হইয়াছিল—ইহাই শেষবার। এই সম্মিলনী উপলক্ষেই বাল্মীকিপ্রতিভা রচিত হয়। আমি বাল্মীকি সাজিয়াছিলাম এবং আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা সরস্বতী সাজিয়াছিল—বাল্মীকিপ্রতিভা নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রহিয়া গিয়াছে।

বাল্মীকিপ্রতিভায় অক্ষয়বাবুর কয়েকটি গান আছে এবং ইহার দুইটি গানে বিহারী চক্রবর্তী মহাশয়ের সারদামঙ্গল সংগীতের দুই একস্থানের ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে।"

দ্বিতীয় সংস্করণ বাল্মীকিপ্রতিভায় যে সংস্কার ঘটেছিল তাতে নাট্যসূত্রে কয়েকটি সংলাপাংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ কাব্যসংগীতের মর্যাদালাভ করেছে। যেমন—

১ম দৃশ্যে	বালিকার গান	ঐ মেঘ করে বুঝি গগনে
৪র্থ দৃশ্যে	বনদেবীর গান	রিমঝিম ঘন ঘন রে বরষে
৫ম দৃশ্যে	বনদেবীর গান	নমি নমি ভারতী তব কমলচরণে
	বাল্মীকির গান	শ্যামা এবার ছেড়ে চলেছি মা
৬ষ্ঠ দৃশ্যে	বনদেবীর গান	বাণী বীণাপাণি করুণাময়ী
	বাল্মীকির গান	এই যে হেরি গো দেবী আমারই

রবীন্দ্রনাথের সংগীত ও নাট্যসৃষ্টির ইতিহাসে বাল্মীকিপ্রতিভার জন্ম একটি বিস্ময়কর ও শুভংকর ঘটনা। উত্তরকালে যে রবীন্দ্রনাথ এই ভারতের মহা-মানবের সাগরতীরে উর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসীর মত প্রাচীপ্রতীচীর মিলনমন্ত্র প্রচার করেছিলেন, যিনি সমগ্র জীবন ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদের সঙ্গে পাশ্চাত্য রোমান্টিক কবিদের অন্তর্গূঢ় যোগসূত্র রচনা করে গেছেন, তাঁর এই পূর্বপশ্চিম সংস্কৃতি-সমন্বয়ের প্রথম পদক্ষেপ এই বাল্মীকিপ্রতিভা। জীবনস্মৃতিতে এই নাটকের গানগুলি সম্পর্কে কবির মন্তব্য স্মরণযোগ্য—

"ইহার [বাল্মীকিপ্রতিভা ১ম সংস্করণের] সুরগুলি অধিকাংশই দিশি, কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকী মর্যাদা হইতে অন্য ক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে। উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে। যাঁহারা এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়াছেন তাহারা আশা করি, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সংগীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসংযত বা নিষ্ফল হয় নাই।··· সংগীতের এইরূপ বন্ধনমোচন ও তাহাকে নিঃসংকোচে সকল প্রকার ব্যবহারে লাগাইবার আনন্দ আমার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল।··

বস্তুত বাল্মীকিপ্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা; অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোনো স্বাদগ্রহণ সম্ভবপর নহে। য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে বাল্মীকিপ্রতিভা তাহা নহে, ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা মাত্র, স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্প স্থলেই আছে।"

বাল্মীকিপ্রতিভার গানগুলি ভাষার দিক থেকে নাট্যসংলাপ, সুরের দিক

থেকে সব কটিই রাগাশ্রয়ী সংগীত। 'এর অনেকগুলি গান বৈঠকী গানভাঙা, অনেকগুলি জ্যোতিদাদার রচিত গতের সুরে বসানো, এবং গুটি তিনেক গান বিলাতি সুর হইতে লওয়া।' বাল্মীকিপ্রতিভা রচনার জন্য কবি বিদেশে অবস্থানকালীন অপেরার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, না তৎপূর্ববর্তী সময়েই এই নাট্যরচনার বীজ তাঁর মনে অঙ্কুরিত হয়েছিল, এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত করা কঠিন। তবে হার্বার্ট স্পেনসরের 'দি অরিজিন এণ্ড ফাংশান অফ মিউজিক' প্রবন্ধ পাঠ করে তাঁর মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে—

"সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় সেখানে আপনিই কিছু না কিছু সুর লাগিয়া যায়। বস্তুত রাগ দুঃখ আনন্দ বিস্ময় আমরা কেবলমাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না, কথার সঙ্গে সুর থাকে। . স্পেনসরের এই কথাটা মনে লাগিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম এই মত অনুসারে আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া গেলে চলিবে না কেন।" (জীবনস্মৃতি)

বাল্মীকিপ্রতিভা যদি এই চিন্তারই ফলশ্রুতি হয়, তবে এই গীতিনাট্যের প্রত্যক্ষ প্রেরণা পাশ্চাত্য অপেরা নয়, হার্বার্ট স্পেনসারের প্রাগুক্ত সাংগীতিক মত। তাই বাল্মীকিপ্রতিভা সম্পর্কে কবি বলেছেন যে, এতে 'গানের বাঁধন সম্পূর্ণ ছিন্ন করা হয় নাই তবু ভাবের অনুগমন করিতে গিয়া তালটাকে খাটো করিতে হইয়াছে। অভিনয়টাই মুখ্য হওয়াতে এই তালের ব্যতিক্রম শ্রোতা-দিগকে দুঃখ দেয় না।'

বাল্মীকিপ্রতিভার প্রথম অভিনয়কালে যে ভাষা ও ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছিল, তার দু-এক স্থানে সারদামঙ্গল কাব্যের এবং অক্ষয় চৌধুরীর রচনা কিছু কিছু গৃহীত হয়েছিল, একথাও কবি প্রসঙ্গান্তরে স্বীকার করেছেন। রচনা-পরিকল্পনায় বিহারীলালের প্রত্যক্ষ প্রভাবও তর্কাতীত। সারদামঙ্গলের সঙ্গে বাল্মীকিপ্রতিভার সাদৃশ্যবাচক পংক্তিগুলি নির্দেশ করা হচ্ছে—

সারদামঙ্গলের ১ম সর্গ ২০ স্তবকে—

> এস মা করুণারানী ও বিধুবদনখানি
> হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরি গো আবার ··
> এস আদরিনী রানী সম্মুখে আমার।

এই পংক্তিগুলি বাল্মীকিপ্রতিভায় বাল্মীকিকর্তৃক সরস্বতীবন্দনা অংশে

'হৃদয়ে রাখ গো দেবী চরণ তোমার' ইত্যাদি স্তবকে প্রায় অবিকৃতভাবে অনুসৃত হয়েছে। সারদামঙ্গলের পূর্বোদ্ধৃত স্তবকে আরও আছে—

যাও লক্ষ্মী অলকায়   যাও লক্ষ্মী অমরায়
এস না এ যোগীজন-তপোবন স্থলে···

—এই পংক্তিগুলি বাল্মীকিকর্তৃক লক্ষ্মী-প্রত্যাখ্যানদৃশ্যে 'কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা' ইত্যাদি স্তবকে ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে গৃহীত হয়েছে। সারদা-মঙ্গলের প্রথম সর্গের ৩৩ স্তবকে আছে—

অদর্শন হলে   তুমি ত্যজি লোকালয়ভূমি
অভাগা বেড়াবে কেঁদে নিবিড় গহনে ;
হেরে মোরে তরুলতা   বিষাদে কবে না কথা
বিষণ্ণ কুসুমকুল বনফুলবনে।
হা দেবী হা দেবী বলি   গুঞ্জরি কাঁদিবে অলি
নীরবে হরিণীবালা ভাসিবে নয়নজলে।

বাল্মীকির সরস্বতীবন্দনার ভাষাও একই প্রকার। এই সকল ইন্দ্রিয়ভেদ্য সাদৃশ্য ছাড়াও দূরাগত অস্পষ্টতাবাচক কিছু সদৃশপংক্তিও সূক্ষ্মতর অনুসন্ধিৎসায় আবিষ্কার করা যায়। ইন্দিরা দেবীর সাক্ষ্যে জানা যায় যে, বাল্মীকিপ্রতিভার 'রাঙা পদপদ্মযুগে' ও 'এত রঙ্গ শিখেছ কোথায়' গান দুটি অক্ষয় চৌধুরীর রচনা (রবীন্দ্রস্মৃতি)। ডক্টর সুকুমার সেনের অভিমত, রচনাভঙ্গি অনুসারে 'এখন করব কী বল', 'তবে আয় সবে আয়' এবং 'কালী কালী বল রে আজ' এই গান তিনটিও অক্ষয় চৌধুরীর রচনা (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৩য় খণ্ড)। শ্রীকানাই সামন্তের মতে, বাল্মীকিপ্রতিভার 'ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা ছন্দে কনক রবি উদিছে' প্রভৃতি কয়েকটি পংক্তি দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণের 'মহাকবি আদি কবি' ইত্যাদি অংশের স্মারক।

বাল্মীকিপ্রতিভার ভাষা ও ছন্দে গীতিনাট্যের যে পরীক্ষা সূচিত হয়েছে তা রবীন্দ্রনাথের সংগীতসৃষ্টির ইতিহাসে নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক। বাল্মীকি-প্রতিভার দীর্ঘকাল পর কবি পুনরায় এই রীতির অনুশীলনেই তাঁর পরবর্তী নৃত্যনাট্যগুলি রচনা করেছিলেন। বাল্মীকিপ্রতিভার ভাষা প্রায় মৌখিক গদ্য, এবং কবিতার ছন্দ প্রায়শই এতে বর্জিত। মৌখিক ভাবপ্রকাশের স্বাভাবিক বিস্ময় ক্রোধ হতাশা হাস্য উন্মত্ততা প্রভৃতি মনোভাব যেমন আমাদের প্রচলিত সংলাপে, তেমনি এই গ্রন্থেও সুরসহ প্রকাশিত। এক-একটি সংলাপ

আকারে দীর্ঘ হওয়ায় সেইগুলিতে কাব্যসংগীতের সমগ্রতার আভাস আছে, কিন্তু কেবল সমজাতীয় মিল ব্যতীত স্তবক বা ছন্দের দিক থেকে কাব্যসংগীতের বৈশিষ্ট্য যেন স্বেচ্ছায় লঙ্ঘন করা হয়েছে। নাট্যরীতির দিক থেকে আধুনিক দৃষ্টিতে একে বৈপ্লবিক বলা হলেও গীতিকবি রবীন্দ্রনাথ এই পদ্ধতিকে সেকালে প্রকাশক্ষমতার ত্রুটি বলেই গণ্য করেছিলেন। তাই ১৮৯৬ সালের কাব্যগ্রন্থাবলীতে বাল্মীকিপ্রতিভার পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে কবি এই টীকা যোজনা করেছিলেন—'এই গীতিনাট্যখানি ছন্দ ইত্যাদির অভাবে অপাঠ্য হইয়াছে। ইহা সুরে লযে নাট্যমঞ্চে শ্রবণ ও দর্শনযোগ্য।'

বাল্মীকিপ্রতিভার গীতিনাট্যগত সাফল্যে উদ্দীপ্ত হযে রবীন্দ্রনাথ এই রচনার অল্পকাল পরেই কালমৃগযা রচনা করলেন (১২৮৯ সালে প্রকাশিত)। বাল্মীকিপ্রতিভার প্রথম অভিনযের তারিখ ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১ এবং কালমৃগয়ার প্রথম অভিনয়ের তারিখ ২৩ ডিসেম্বর ১৮৮২। জীবনস্মৃতিতে কবি এই গীতিনাট্য সম্পর্কে লিখেছেন—

"বাল্মীকিপ্রতিভার গান সম্বন্ধে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিযা এই শ্রেণীর আরও একটি গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম। তাহার নাম কালমৃগয়া। দশরথকর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ তাহার নাট্যবিষয়।...ইহার করুণরসে শ্রোতারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। পরে, এই গীতিনাট্যের অনেকটা অংশ বাল্মীকিপ্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিযাছিলাম বলিয়া ইহা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।"

বস্তুত কালমৃগযার কাহিনী নূতন হলেও এটি বাল্মীকিপ্রতিভার রচনা ও সৃষ্টিধর্মেরই পরিণত সংস্কার মাত্র, এই কারণে অনতিবিলম্বে কবি এটিকে বাল্মীকিপ্রতিভার অঙ্গীভূত করে নিলেন। বাল্মীকিপ্রতিভার বিষযবস্তু ছিল ব্যাধকর্তৃক পক্ষী-শিকার, যা দেখে বাল্মীকির হৃদয়ে করুণার আবির্ভাব ঘটে। যে নৃশংস নিধন বাল্মীকিকে বিচলিত করেছিল সেও তো এক ধরনেব কাল-মৃগয়াই। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা-উন্মেষের প্রস্তুতিপর্বে এই মৃগযার নির্মমতা ব্যাপারটি দুবার তাঁর কবিচিত্তকে আকর্ষণ করল, এই তথ্যটুকু মনে রাখবার মত। কালমৃগয়া গীতিনাট্যে এমন কতকগুলি গান আছে যেগুলি নাট্যসংলাপ হলেও স্বতন্ত্র কাব্যসংগীত—

২য় দৃশ্য বনদেবী সমুখেতে বহিছে তটিনী

ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদু বায়

৪র্থ দৃশ্য বনদেবতা সঘন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া
বনদেবী ঝম ঝম ঘন ঘন রে বরষে
৬ষ্ঠ দৃশ্য অন্ধমুনি যাও রে অনন্তধামে মোহমায়া পাশরি

এর ভিতর 'সমুখেতে বহিছে তটিনী' গানটি দ্বিতীয় খণ্ড গীতবিতানে প্রেম পর্যায়ভুক্ত এবং কয়েকটি শব্দের পাঠভেদ ঘটেছে। 'সঘন ঘন ছাইল' গানটি 'গহন ঘন ছাইল' এই পাঠান্তরসহ গীতবিতানের বর্ষাপর্যায়ভুক্ত। 'ঝম ঝম ঘন ঘন রে' গানটির পরিচিত পাঠ 'রিমঝিম ঘন ঘন রে'। 'যাও রে অনন্ত ধামে' গানটি ব্রহ্মসংগীতরূপে পরিচিত।

কালমৃগয়া গীতিনাট্য রচনাকালে রবীন্দ্রনাথের গীতিকার-প্রতিভা অনেক পরিণত হয়েছে এবং এই নাটকের সংলাপগুলি ক্রমশ নিটোল গীতিধর্মিতায় পুষ্ট হয়েছে অর্থাৎ 'ছন্দ ইত্যাদির' যে অভাবে বাল্মীকিপ্রতিভা 'অপাঠ্য' হয়েছিল, সে ত্রুটি এখানে বহুলাংশে কবি সংশোধন করতে পেরেছেন। এই জন্যই কালমৃগয়ার একাধিক গান পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের নাট্যনিরপেক্ষ কাব্যগীতি হিসাবে জনপ্রিয় হয়েছিল। কালমৃগয়াতেই আমরা পরবর্তী রবীন্দ্রসংগীতের দুটি মুখ্য প্রবণতার পূর্বাভাস পাই, একটি, ঋতুগীতি আর একটি ব্রহ্মগীতি রচনার আগ্রহ। প্রথম সংস্করণ বাল্মীকিপ্রতিভায় বর্ষার কোনো পটভূমি বা পরিস্থিতি ছিল না। দ্বিতীয় সংস্করণে কালমৃগযার কয়েকটি গানের দ্বারা সে পটভূমি সৃষ্টি করা হয়েছে। কালমৃগয়া গীতিনাট্যে বর্ষার যে বাতাবরণ সৃষ্টি করা হয়েছে, তা কেবল নাট্যপ্রয়োজনেই নয়। নাটককে অতিক্রম করে তরুণ কবিমনের ঋতুচেতনা বর্ষার জলধারার মত সুরে ছন্দে মন্দ্রিত হতে চেয়েছে। নিশীথ রজনীতে অন্ধমুনির পুত্রকে নদীতীরে তৃষ্ণাবারি সংগ্রহে পাঠাবার কালে বর্ষাধারার অনিবার্য প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এই অবকাশে বনদেবতা ও দেবীগণের গীতমত্ত উল্লাসে কবি যেন তাঁর জীবনের প্রথম বর্ষামঙ্গলের আয়োজন করেছেন। মল্লার ও গৌড়মল্লারের সুরে এই বর্ষাগীতগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং কবির পরবর্তী বর্ষাগীতগুলির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। কালমৃগয়ার চতুর্থ দৃশ্যে তিনটি বর্ষাগীত আছে বনদেবীদের কণ্ঠে। এই তিনটি গানে কবির বর্ষাসংগীতের দুটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। প্রথমত, বর্ষণমুখর অন্ধকারত্রস্ত রজনীর বর্ণনা এবং দ্বিতীয়ত, বর্ষার সঙ্গে মানবমনের উল্লাসানুভূতি। 'সঘন ঘন ছাইল' গানের পাশে পরবর্তী কালের 'ঝর ঝর বরিষে বারিধারা' রাখলেই এই সত্য বোঝা যাবে। 'আয় রে সজনি সবে

মিলে' গানটি যেন 'এসো শ্যামল সুন্দর' কিংবা 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে' গানের পূর্বাভাস।

কালমৃগয়ার আর একটি গানের সঙ্গে কবির সমকালীন একটি কাব্যগীতির ভাবগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উভয়ের মধ্যে কোনটি অগ্রবর্তী বলা কঠিন। দুটি উদাহরণই পাশাপাশি দেওয়া গেল। প্রথমে কালমৃগয়ার প্রথম দৃশ্য থেকে লীলা ও ঋষিকুমারের গানটি—

মিশ্র বিভাস আড়খেমটা

লীলা। কাল সকালে উঠব মোরা যাব নদীর কূলে
শিব গড়িয়ে করব পূজো আনব কুসুম তুলে।
ঋষিকুমার। মোরা ভোরের বেলা গাঁথব মালা দুলব সে দোলায়
বাজিয়ে বাঁশি গান গাহিব বকুলের তলায়।

অতি স্বাভাবিক ভাবেই মনে পড়ে রবিচ্ছায়ার সেই সুপরিচিত গানটি—

পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়
ও সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়।··
মোরা ভোরের বেলা ফুল তুলেছি দুলেছি দোলায়
বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি বকুলের তলায়।···

কালমৃগয়া থেকে নিম্নলিখিত গানগুলি 'পরিবর্তিত আকারে অথবা বিশুদ্ধ আকারে' বাল্মীকিপ্রতিভার দ্বিতীয় সংস্করণে গৃহীত হয়েছে—

১। আঃ বেঁচেছি এখন ২। এনেছি মোরা এনেছি মোরা ৩। রিমঝিম ঘন ঘন রে ৪। এই বেলা সবে মিলে চল হো ৫। গহনে গহনে যারে তোরা ৬। চল ভাই চল ৭। কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে ৮। প্রাণ নিয়ে তো সটকেছি রে ৯। সর্দার মশায় দেরি না সয়।

বাল্মীকিপ্রতিভায় কবি 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং' এই সংস্কৃত শ্লোকটির প্রয়োগ করেন। কালমৃগয়ায় দশরথের প্রতি অন্ধমুনির অভিশাপটিও অনুরূপ সংস্কৃত শ্লোক ব্যবহারের দৃষ্টান্ত। কালমৃগয়ায় ৩য় দৃশ্যে কবি ঋষি ও ঋষিকুমারের কণ্ঠে বেদপাঠ সংযোজিত করেছেন। বৈদিক কাব্যপংক্তি আবৃত্তি ঠাকুরপরিবারে মহর্ষিদেবের প্রদত্ত শিক্ষা, কবির কাব্যজীবনে এই শিক্ষা গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। উত্তরকালে বহু বৈদিক কাব্যস্তবকে তিনি সুরযোজনা করেছিলেন, নাটকেও ব্যবহার করেছিলেন। কালমৃগয়াতেই তার যথার্থ সূচনা বলা যায়।

বাল্মীকিপ্রতিভার সংশোধিত পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ ১২৯২ ফাল্গুন। এই গ্রন্থটি প্রথম সংস্করণের তুলনায় পরিণততর, আরও লিপিকুশল, গীতিমন্দ্রিত ও পরিচ্ছন্ন। ভাবের দিক দিয়ে এর সঙ্গে পূর্ববর্তী প্রকৃতির প্রতিশোধের মিল থাকলেও এর রীতি স্বতন্ত্র, তাই এখানে নাটককে সরিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ কাব্যগীতি বের করা যায় না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে কালমৃগয়ার একাধিক গান বাল্মীকিপ্রতিভায় গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের কিছু গান বর্জন করে নতুন গানও রচিত হয়েছে। সেগুলির তালিকা—

১। সহে না সহে না কাঁদে পরাণ ২। ঐ মেঘ করে বুঝি গগনে ৩। মরি ও কাহার বাছা ৪। ছাড়ব না ভাই ছাডব না ৫। এত রঙ্গ শিখেছ কোথায় ৬। রাঙা পদপদ্মযুগে ৭। কী দোষে বাঁধিলে আমায় ৮। রাজা-মহারাজা কে জানে ৯। আছে তোমার বিদ্যেসাধ্যি জানা ১০। আঃ কাজ কী গোলমালে ১১। আহা আস্পর্ধা এ কী তোদের ১২। আয় মা আমার সাথে ১৩। কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই ১৪। কেন রাজা ডাকিস কেন ১৫। বলব কী আর খুড়ো ১৬। রাখ রাখ ফেল ধনু ১৭। দেখ দেখ দুটো পাখি ১৮। নমি নমি ভারতী ১৯। শ্যামা এবার ছেড়ে চলেছি মা ২০। বাণী বীণাপাণি করুণাময়ী।

আগেই বলেছি, স্বয়ংসম্পূর্ণ কাব্যগীতি হওয়ার অবকাশ বাল্মীকিপ্রতিভার সংলাপ-আশ্রিত গানে কমই, তবু এর দুএকটি গানের সুরে অন্তত সেই পূর্ণতার অবকাশ ছিল, যেজন্য বাল্মীকিপ্রতিভার অব্যবহিত পরে সেই সুরকে রক্ষা করে কবি নূতন কথা বসিয়ে স্বাধীন স্বতন্ত্র কাব্যগীতি রচনা করেছেন। চতুর্থ দৃশ্যে দস্যুদের মত্ত উল্লাসবৃত্তিতে বাল্মীকির অন্তরে যখন একটি গ্লানি ও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হযেছে, তখন একটি গানে এই আত্মসংকট ব্যক্ত করা হয়েছে—

> কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই—তবু প্রাণ কেন কাঁদে রে
> যাই দেখি শিকারেতে রহিব আমোদে মেতে
> ভুলি সব জ্বালা বনে বনে ছুটিয়ে—কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে।

রবিচ্ছায়া গ্রন্থের অধুনা-সুপরিচিত 'প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন' গানটি বাল্মীকির কণ্ঠে আলোচ্য গানেরই বাচ্যান্তর মাত্র। দ্বিতীয় সংস্করণ বাল্মীকি-প্রতিভা প্রকাশের পূর্বেই রবিচ্ছায়া প্রকাশিত হয় (১২৯২ বৈশাখ) এবং যতদূর জানা যায় 'প্রমোদ ঢালিয়া দিনু মন' গানটির সুর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দেওয়া (গীতবিতান গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য)। জ্যোতিদাদার বাজমান পিয়ানোর সুরে

কথা-বসানো এই গানটিকে বাল্মীকিপ্রতিভায় পরে ব্যবহার করা হয়েছে অথবা বাল্মীকির কণ্ঠের গানটির কথা বদলে 'প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন' গানটির জন্মলাভ হয়েছে, এ বিষয়ে জোর করে কিছু বলা যায় না।

দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত নতুন গানগুলির মধ্যে কাব্যগীতের মর্যাদা দেওয়া যায় এই গানগুলিকে

১ম দৃশ্য	বালিকা	ওই মেঘ করে বুঝি
২য় দৃশ্য	বাল্মীকি	রাঙা পদপদ্মযুগে
৩য় দৃশ্য	দস্যুগণ	এত রঙ্গ শিখেছ কোথায়
৫ম দৃশ্য	বাল্মীকি	শ্যামা এবার ছেড়ে চলেছি মা
৬ষ্ঠ দৃশ্য	বনদেবী	বাণী বীণাপাণি করুণাময়ী

এই গানগুলির মধ্যে তিনটিই শ্যামাবিষয়ক, কারণ রত্নাকর বাল্মীকির দস্যু-জীবনচিত্রণে কবি স্বাভাবিক ভাবেই তাকে কালীসাধক করেছেন। প্রত্ন-বৈদিক সভ্যতার বিকাশকাল থেকে বাল্মীকির রামায়ণ রচনাকাল পর্যন্ত ভারতীয় সমাজাদর্শে এদেশে মাতৃতান্ত্রিক চণ্ডিকা-কালিকা-উপাসনার প্রবর্তন ঘটেনি। কিন্তু এ তথ্য সে বয়সে কবির জানার কথা নয়, জানার প্রয়োজনও ছিল না। দস্যুরা কালীপূজা করে থাকে, এই লৌকিক বিশ্বাসই শ্যামাসংগীত রচনায় কবিকে উৎসাহিত করে থাকবে। সুতরাং গানগুলি নাট্যপ্রয়োজনগত, উদ্দেশ্যমূলক, শ্যামাভক্তির বিশুদ্ধ আবেগ থেকে উৎসারিত নয়। তথাপি গান তিনটির মধ্যে কষ্টকল্পনা বা আড়ষ্টতা নেই, যেমন বনদেবীগণের 'বাণী বীণাপাণি করুণাময়ী' গানের ভাষাতেও একটি স্নিগ্ধ স্বচ্ছন্দ অকৃত্রিমতা আছে। পরবর্তীকালে বিসর্জন নাটকেও কবি শ্যামাবিষয়ক কয়েকটি গান লিখেছেন। বাল্মীকিপ্রতিভার ও বিসর্জনের শ্যামাবিষয়ক গীতগুলি উনিশ শতকের তৎকাল-প্রচলিত শ্যামাসংগীতের আদর্শেই রচিত।

৪

রবীন্দ্ররচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত নাট্যতালিকার প্রথম নাটক প্রকৃতির প্রতিশোধ ১২৯১ সালে অর্থাৎ কবির ২৩ বৎসর বয়সের সময় প্রকাশিত হয়। 'আলোচনা' গ্রন্থে কবি একদা প্রকৃতির প্রতিশোধের যে সমালোচনা লিখেছিলেন সে সম্পর্কে পরে জীবনস্মৃতিতে মন্তব্য করেন—"এই একটি মাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আছে"। 'বঙ্গভাষার

লেখক' গ্রন্থেও প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্পর্কে কবি অনুরূপ মন্তব্য করেছিলেন।
প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটক হলেও এই নাটকে গানের ভূমিকাকে কবি তাৎপর্য দিয়েছেন। প্রভাতসংগীত সন্ধ্যাসংগীত গ্রন্থের কোনো কবিতায় সুরযোজনা করা হয়নি, কিন্তু গান শব্দটি উক্ত দুই গ্রন্থের একাধিক কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছিল। এই দুই গ্রন্থভুক্ত রচনা কবির প্রথম জীবনের হৃদয়অরণ্যে পথভ্রষ্টতার কবিতা, 'অবরুদ্ধ আলোকের কবিতা', 'নিজের মনের ভাবনা নিজের মনের প্রাচীরের মধ্যে প্রতিহত হয়ে আলোড়িত'। পরবর্তী যুগে যখন মানবের স্পর্শে এই অন্ধকার ঘুচে গেছে, তখনকার রোমাঞ্চ ধরা পড়েছে 'ছবি ও গানে' অর্থাৎ চিত্রে ও সুরে, রূপকল্পরচনায় ও গীতিধর্মিতায। এই যুগ থেকেই, বিশেষ করে বাল্মীকিপ্রতিভা-কালমৃগয়া পর্ব থেকেই রবীন্দ্রকবিমানসে ধীরে ধীরে গানের উৎস খুলে যেতে থাকে। পরিণত বয়সে প্রকৃতির প্রতিশোধের ভূমিকায় কবি লিখেছেন—

"...তখন আমার বযস বোধ হয় তেইশ কিংবা চব্বিশ হবে, কারোয়ার থেকে জাহাজে আসতে আসতে হঠাৎ যে গান সমুদ্রের উপর প্রভাতসূর্যালোকে সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিল তাকে নাট্যীয় বলা যেতে পারে, অর্থাৎ সে আত্মগত নয় সে কল্পনায় রূপায়িত। '*হেদে গো নন্দরানী*' *গানটি একটি ছবি, যার রস নাট্যরস*।... এই গানটি প্রকৃতির প্রতিশোধে ভুক্ত করেছি। এই আমার হাতের প্রথম নাটক, যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। এই বইটি কাব্যে এবং নাট্যে মিলিত।"

অর্থাৎ প্রকৃতির প্রতিশোধ থেকে রবীন্দ্রনাথ নাটকে স্বতন্ত্রভাবে গান যোজনা করতে লাগলেন। 'এরই মাঝে মাঝে গানের রস এসে অনির্বচনীয়তার আভাস দিয়েছে।' 'হেদে গো নন্দরানী' সেই অনির্বচনীয়তার দ্বারা আভাসিত বলে কবি ব্যাখ্যা করেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে শত্রুতা করে গুহাচারী সন্ন্যাসী প্রকৃতিকে জয় করেছেন, স্নেহপ্রেমের কঙ্কাল পিছনে ফেলে তিনি লোকালয়ে বেরিয়েছেন, যেখানে চলেছে কলরব, হাসিরঙ্গ, অকারণ জনতার অমূলক উচ্ছ্বাস। সেখানে কৃষকরা রৌদ্রপ্লাবিত শস্যভূমে যেতে যেতে জীবনের নীলাকাশে গানের পতাকা উড়িয়ে গেয়ে ওঠে—

হেরো গো প্রভাত হল, সুয্যি ওঠে, ফুল ফুটেছে বনে
আমরা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাব আজ করেছি মনে।

একই সুরে বাঁধা মালিনীর কণ্ঠের গানটি—'বুঝি বেলা বয়ে যায়'।
প্রকৃতির প্রতিশোধের কয়েকটি গান নিতান্তই নাট্যপ্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ

পরিস্থিতি- বা চরিত্রজ্ঞাপক। এইগুলির কথা ও সুর প্রাচীন বাঙলা কাব্য-সংগীতের মত। হালকা কথায় লঘু সুর-বসানো এই গানগুলি রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংগীতের গভীরতা ও সৌন্দর্যের পরিপন্থী। যথা

২য় দৃশ্যে ভিক্ষুকদের গান ভিক্ষে দে গো ভিক্ষে দে

৪র্থ দৃশ্যে স্ত্রীলোকদের গান কথা কোসনে লো রাই

পুরুষের গান প্রিয়ে তোমার ঢেঁকি হলে যেতেম বেঁচে

কিন্তু ৭ম দৃশ্যের গানগুলিতে আবার সেই নাট্যরসের ভিতর অনির্বচনীয়তার আভাস লেগেছে। স্নেহপ্রেমবিবিক্ত সন্ন্যাসী সদ্যউপজাত হৃদয়দুর্বলতার বিরুদ্ধে প্রাণপণে বৈরাগ্যের অস্ত্রাঘাত করতে করতে ক্ষতবক্ষ হয়ে যখন পর্বত-শিখরে এসে দাঁড়িয়েছেন, তখন দুইজন স্ত্রীলোকের কণ্ঠে শুনলেন লোকায়ত প্রেমের একটি লঘু সংগীত, দেহগত ভালোবাসার আসক্তি-মেশানো একটি চটুল ভালবাসার গান। কিন্তু তার আপাতলঘুতার মধ্য দিয়ে মানিনী প্রেয়সীর প্রতি প্রেমিকের মানভঞ্জনের সকাতর আহ্বান বৃহত্তর তাৎপর্য নিয়ে ফুল্লবিকশিত ত্রিভুবনের মাঝখানে বিরক্তযোগী সন্ন্যাসীর কাছে নূতন আহ্বানসহ হাজির হল—

বনে এমন ফুল ফুটেছে, মান করে থাকা আজ কি সাজে।

মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে চলো চলো কুঞ্জ-মাঝে।

সহসা প্রীতি-উদাসীন প্রবৃত্তিনিরুদ্ধ যোগীর কাছে জগৎ মায়াময় সুন্দর মনোহর হয়ে দেখা দিল। পশ্চিমে অস্তমিতপ্রায় সূর্যের সহচরী কনকসন্ধ্যার লীলাভিরাম আবির্ভাব, ঘনায়মান বনভূমির ছায়ান্ধকার, চতুর্দিকের শান্তিময়ী স্তব্ধতার মধ্যে সিন্ধুসংগীত, ছোট ছোট জীবনপূর্ণ সুন্দর লোকালয় সন্ন্যাসীর চোখে যে অমৃতময় আনন্দ ছড়িয়ে দিল, তারই ধ্রুবপদে বাঁধা একখানি অপরূপ সংগীত ঠিক সেই মুহূর্তেই আর একদল পথযাত্রীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল—

মরি লো মরি, আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে।

ভেবেছিলেম ঘরে রব, কোথায় যাব না—

ওই-যে বাহিরে বাজিল বাঁশি, বল কী করি।

এ গানের উৎসে রয়েছে গভীর বিশ্বপ্রীতি ও জীবনমমতা। মর্তজীবনের প্রতি যে নিবিড় আসক্তিতে রবীন্দ্রসংগীত কম্পমান, লোকায়ত পৃথিবীর মর্মে মর্মে মধুকোষসন্ধানের যে উৎকণ্ঠাকাতর মূর্ছনা রবীন্দ্রনাথের প্রেমসংগীতগুলির সম্বল, মাত্র তেইশ বৎসরের গানেই তার এমন অনির্বচনীয় অভিপ্রকাশ

সম্ভব হয়েছে। প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্পর্কে কবি বলেছিলেন যে, এর আইডিয়াটাই তাঁর সমস্ত রচনায় নানা বেশে ও ভাবে অনুস্যূত, সেই আইডিয়া হল 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়', তারই নামান্তর 'সীমার সহিত অসীমের মিলনসাধনের পালা'। 'মরি লো মরি' গানটি সেই প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তনের, জীবননিমন্ত্রণের মুগ্ধ রাগিণী। মাত্র তেইশ বৎসরের এই গানে প্রেমানুরাগ, আসক্তি ও লোকালয়ের মধুর আহ্বান কবিকে যে বাঁশিতে ডাক দিয়েছে, সেই বাঁশিটি আর কখনও তিনি ত্যাগ করেননি। জীবনের বাঁকে বাঁকে সেই একটি বাঁশি চলচপলার চকিত ইশারা হযে কবিকে হাতছানি দিয়েছে, অন্ধ ভূমিগর্ভে শস্যপীত জীবনের আহ্বান হযে বেজেছে। রক্তকরবীর নন্দিনীর কানেও সেই বাহিরেব বাঁশির ডাক বেজেছিল একদিন—

> ভালবাসি, ভালবাসি—
> এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি।

এই বাঁশিই 'ওগো সুদূর বিপুল সুদূর তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি' হযে কবিকে চিরকাল উন্মনা করেছে। প্রকৃতির প্রতিশোধের এই গান যেন সেই বংশীখণ্ডের গৌরচন্দ্রিকা।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই নাটকের অধিকাংশ গানেই পদাবলীর অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। 'হেদে গো নন্দরানী' যেন পদাবলীর গোষ্ঠলীলা, বাৎসল্যে ও সখ্যে জডিত। 'বুঝি বেলা বযে যায়' মালিনীদের এই গানের একটি পংক্তি 'যমুনার ঢেউ যাচ্ছে বয়ে বেলা চলে যায়' যমুনার স্মৃতিজড়িত। 'কথা কোসনে লো রাই শ্যামের বডাই বড বেজেছে' (৪র্থ দৃশ্য), 'বনে এমন ফুল ফুটেছে' ও 'মরি লো মরি আমায়' (৭ম দৃশ্য)—এইগুলিও পদাবলীর আধুনিক সংস্করণ। উনিশ শতকের মধ্য ও শেষভাগে বাঙলা গানে কবিগীতের ভগ্নাবশেষ পদাবলীর অনুষঙ্গ নিযেই বেঁচেছিল, সেই সূত্রে কবিও এই আবহাওয়া থেকেই তাঁর গানের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, প্রকৃতির প্রতিশোধে জীবনের যে শ্যামল পটভূমিকার উপর কবি যৌবন, স্নেহপ্রীতি, হাসি ও কান্নার লীলানাট্যটি স্থাপন করতে চেয়েছেন, পদাবলীর পরিবেশ ও তার অনুষঙ্গ সেখানে অপরিহার্য ছিল।

মায়ার খেলা রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতিনাট্য যেখানে একদিকে গীতিরচনার সংগঠিত প্রতিভা প্রকাশ পেয়েছে, অন্যদিকে নাট্যরসবিস্তারের জন্য

ভাবোচ্ছ্বাসজটিল রচনাতেও মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। সংগীতরচনা এখন আর নিভৃত কক্ষপ্রান্তের শয্যাবিলাস মাত্র নয়, কবি তাকে জীবনের প্রশস্ত রঙ্গমঞ্চের হাসিকান্নার উপযোগী করে তুলেছেন। সখীসমিতির জন্য মায়ার খেলা রচিত হয়েছিল, প্রকাশ ১২৯৫ অগ্রহায়ণে। মাযার খেলার বিষয়বস্তু প্রেম—তরুণতরুণীর রুদ্ধ হৃদযাবেগ ও অচরিতার্থ প্রেমের দুর্বহ বেদনা। পরিণত বযসে একটি পত্রে কবি লিখেছিলেন—

"প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিযে উঠেছি পরে। পরিণত বযসের গান ভাব বাতলাবার জন্য নয়, রূপ দেবার জন্য। তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশই রূপের বাহন"।[৬]

মাযার খেলা সেই হৃদযভাবপ্রকাশের অনবদ্য রচনা। স্বরচিত ৬৩টি কাব্যগীতের দ্বারা এই গীতনাট্য রচিত। এখানে সংলাপ সর্বত্রই ভাবঘন, প্রতিটি সংলাপই স্বয়ংসম্পূর্ণ এক একটি কাব্যসংগীত। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত 'বাঙ্গালীর গানে' সংকলযিতা দুর্গাদাস লাহিড়ী বাল্মীকিপ্রতিভার কোনো গান উদ্‌ধৃত করেননি, কিন্তু মাযার খেলার একাধিক গান সংকলন করেছেন। ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত বাংলা প্রেমসংগীতের সর্ববৃহৎ সংকলন অবিনাশচন্দ্র ঘোষের 'প্রীতিগীতি'তেও মাযার খেলার গান সংকলিত। ১২৯১ সালে লিখিত গদ্যনাট্য নলিনীর সঙ্গে মাযার খেলার সাদৃশ্যের কথা কবি নিজেই স্বীকার করেছেন, যদিও নলিনীর কোনা গানই এতে পুনরাবৃত্ত হয়নি। 'বাল্মীকিপ্রতিভায় একটি নাট্যকথাকে গানের সূত্র দিযে গাঁথা হযেছিল, মাযার খেলায় গানগুলিকে গাঁথা হয়েছিল নাট্যসূত্রে'। বাল্মীকিপ্রতিভা নাট্যধর্মী বলে সেখানকার সংলাপই গান, মায়ার খেলা গীতিধর্মী বলে গানই এখানে সংলাপ। তাই মাযার খেলায় কাব্যগীতি বেশি, 'গানের ভিতর দিযে অল্প একটুখানি নাট্য দেখা দিচ্ছে'। মায়ার খেলার অন্তর্বর্তী তিনটি গান কবির পূর্ববর্তী অন্য কাব্যে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিটি গানই গানের আঙ্গিকে রচিত, স্বরাশ্রিত গীতিকবিতা। গানগুলি সংলাপচ্ছলে সন্নিবেশিত বলে নাটক হিসাবে মায়ার খেলা শিথিল, কিন্তু আবেগঘন ও ভাবসর্বস্ব। দুএকটি গানে নাটকীয় সংলাপের দ্রুতি আছে, সংক্ষিপ্ততা আছে, নতুবা সবগুলি গানই দীর্ঘ। চরিত্রগুলি অস্পষ্ট, কারণ গানের কাব্যগর্ভ বাণীতে একরূপতা থাকায় চরিত্র ফোটেনি। প্রথম দিকের তুলনায় শেষ দিকের গান কিছুটা সংক্ষিপ্ত ও উক্তি-ধর্মী। মায়ার খেলার একাধিক গান স্বতন্ত্র প্রেমগীতি অথবা ঋতুগীতি হিসাবে

পরিচিত হয়েছিল, স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন স্বরলিপি-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। অথচ মায়ার খেলা এত অনায়াসস্বাচ্ছন্দ্যে রচিত যে, সংগীতগুলি আগে রচনা করে তাকে নাট্যসূত্রে গেঁথে দেওয়া হয়েছে এমন মনেও হয় না। মায়াকুমারীগণ এই নাটকে গ্রীক কোরাসের মত রঙ্গমঞ্চে প্রেমের রহস্যজাল বিছিয়ে দিয়ে গেছে, নাটকীয় কুশীলব সেই জালে আবদ্ধ বিহঙ্গের মত ছটফট করেছে, মুক্তি-কামনায় পক্ষসঞ্চালন করেছে, আপনার চারপাশে আকাশ খুঁজেছে। চরিত্র হিসাবে মায়াকুমারীগণ অভিনব পরিকল্পনাপ্রসূত, যদিও তাদের গানে সর্বদা মায়াসৃজনের বিস্ময় নেই। নাটকের চরিত্র ও মায়াকুমারীদের চরিত্রে অনেক পার্থক্য, কিন্তু গানে সে পার্থক্য রক্ষিত হয়নি। কয়েকটি দৃশ্যে মায়াকুমারীদের অন্তত একটি করে গান আছে এবং সেই গানে নাট্যদৃশ্যের ভাববস্তু ও পরিচয় ফুটে উঠেছে। মায়াকুমারীদের গীতভাষ্য অনুসরণ করে মায়ার খেলার যে কাহিনী গড়ে উঠেছে তাতে দেখা যায়, প্রতিদৃশ্যের ঘটনাপরম্পরার পরিণামে মায়াকুমারীদের গানে তার ভাষ্য-টীকা-ব্যাখ্যা আছে। মায়াকুমারীরা বৈষ্ণব কবিতার সখীদের মত এই নাটকের প্রেমলীলার লীলাবিস্তারিকা, প্রেমলীলায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেনি কিন্তু দূরস্থিত দর্শিকা মাত্র। তারা বিধাতার মত অলক্ষ্যচারী, সখীর মত মিলনপ্রত্যাশী, লীলাশুকের মত ভাষ্যকার, নাট্যকারের মত নিরপেক্ষ ও কবির মতো অনুকম্পায়ী। আসলে লীলাময়ী মাযাকুমারীগণ কবিমনেরই প্রক্ষেপ ও সম্প্রসারণ মাত্র। মায়াকলিত প্রেম সম্পর্কে কবির গভীর অনুভূতি, রসজ্ঞের মর্মানুভব ও প্রৌঢ় উপলব্ধিকেই রসঘন ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে মায়াকুমারীদের কণ্ঠে। মায়াকুমারীদের মুখে প্রথমেই শুনি, এই সংসার-ধূলিজালের উপর মায়াবিস্তারিকা সেই অশরীরিণীদের লীলাপ্রভাব, হৃদয়ের সুকুমার অনুরাগবৃত্তিতে তাদের কল্পবিহারের কথা—

মোরা জলে স্থলে কত ছলে মায়াজাল গাঁথি।
মোরা স্বপন রচনা করি অলস নয়ন ভরি।
গোপনে হৃদয়ে পশি কুহক-আসন পাতি।
মোরা মদিরতরঙ্গ তুলি বসন্তসমীরে।
দুরাশা জাগায় প্রাণে প্রাণে
আধো-তানে ভাঙা-গানে
ভ্রমরগুঞ্জরাকুল বকুলের পাঁতি।

রবীন্দ্রনাথের প্রণয়ভাবনার একটি বিশেষ ধারা এই গীতিনাট্যে প্রকাশিত

হয়েছে বলে মায়ার খেলায় কবির প্রকাশ এত স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। 'নব-যৌবনবিকাশে গ্রন্থের নায়ক অমর সহসা হৃদয়ের মধ্যে এক অপূর্ব আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিতেছে। সে উদাসভাবে জগতে আপনার মানসীমূর্তির অনুরূপ প্রতিমা খুঁজিতে বাহির হইতেছে।' এই বাক্যটি রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠকের কাছে গভীর তাৎপর্যবহ। 'জগতে আপনার মানসীমূর্তির অনুরূপ প্রতিমা'-অন্বেষণ রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক প্রেম-কবিতারও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। অমরের মুখে 'জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত' এই কাব্যসংগীতের অন্তর্গত এই পংক্তিগুলি মানসী কাব্যের বহু কবিতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়—

> সুখভরা এ ধরায় মন বাহিরিতে চায়
> কাহারে বসাতে চায় হৃদযে।
> তাহারে খুঁজিব দিকদিগন্ত।···
> কার সুধাস্বর মাঝে জগতের গীত বাজে,
> প্রভাত জাগিছে কার নয়নে।

যদিও মায়াকুমারীগণ গানে বলেছে যে মানসী-প্রতিমা বহির্ভুবনে নেই, অন্তরেই তার যথার্থ অবস্থান, কিন্তু অমর সে তত্ত্ব না জেনে বাইরে খুঁজে ব্যর্থ হয়েছে। মানসী রচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথও কি নিশ্চিতভাবে জানতেন যে মানসী অন্তরেই আছে? 'মানসী', 'মানসসুন্দরী' প্রভৃতি শব্দব্যবহার পূর্ববর্তী কাব্যে আমরা পাই না। 'অন্তরবাহিরের সেই ব্যাকুলিত মিলনেই কবির একান্ত সুখোচ্ছ্বাস' বলে কবি মানসীর ভূমিকায় ঘোষণা করেছেন। শান্তার গানে প্রেমের আর এক বাণীভঙ্গিমার প্রকাশ ঘটেছে, বিরহের নিঃসীমতায় প্রেমিকের মনে প্রেমের সত্য উপলব্ধি—যা রবীন্দ্রনাথের প্রেমকবিতার অন্যতম সুর। শান্তা গেয়েছে—

> আমি তোমারি বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস—
> দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ-মাস।

মায়ার খেলার কাব্যগীতিগুলিতে রবীন্দ্রসংগীতের আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়—ঋতু ও প্রকৃতিবিষয়ক গানেও কবির দক্ষতা। মায়ার খেলার অনেকগুলি গান গীতবিতানের প্রকৃতি-পর্যায়ভুক্ত, যেমন 'মধুর বসন্ত এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে' বসন্ত পর্যায়ের একটি পরিচিত গান। 'এস এস বসন্ত ধরাতলে' গানটি চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যেও কবি বসন্তস্পৃষ্ট যৌবনের উদ্দামতা ফোটাতে ব্যবহার করেছেন।

বাল্মীকিপ্রতিভার উত্তেজনা মায়ার খেলায় অনেক স্তিমিত হয়ে গেছে। বাল্মীকিপ্রতিভায় দেখা দিয়েছিল সুর ও নাট্য, মায়ার খেলায় গীতিকবিতা। মায়ার খেলায় কোনদিক থেকেই বিদেশী প্রভাব নেই। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের যে কোন ধরনের নাটকের সঙ্গে বিদেশী আদর্শের তুলনা করায় একটা অতি উৎসাহী মননশীল প্রয়াস প্রায়ই দেখা যাচ্ছে।[৭] মায়ার খেলা রবীন্দ্রনাথের মৌলিক সৃষ্টি এবং তাঁর সমকালীন কবিজীবনের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত বলে মায়ার খেলার গানগুলির স্বরূপ-ধর্মের বিচার করতে হবে রবীন্দ্রনাথেরই সমসাময়িক অন্যান্য রচনার আদর্শে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের এই সকল নাট্যকাব্যের, বিশেষত মাযার খেলার প্রেমসংগীতগুলিতে একটি বিষণ্ণতা, নৈরাশ্য ও বাষ্পাকুলতা লক্ষ্য করা যায। এই নৈরাশ্য কবির সমকালীন কবিজীবনের সঙ্গে অভিন্ন। কেবল সংগীতেই নয়, রাজা ও রানী, মানসী, বিসর্জন, মালিনী সর্বত্রই এই বিষাদ ও বৈরাগ্য বিসর্পিত। ১২৯৫ সালের বৈশাখ থেকে আষাঢ় পর্যন্ত গাজিপুরে রচিত মানসীর কবিতাগুচ্ছে প্রেমের যে আবেগসর্বস্বতা প্রকাশ পেযেছে, মাযার খেলা নাটকে তারই এক সাংগীতিক রূপ এবং রাজা ও রানী নাটকে তারই নাট্যরূপ দৃষ্ট হয়। মানসীর 'গুপ্ত প্রেম' কবিতায কবি লিখেছেন—

প্রেম যে চুপে চুপে ফুটিতে চাহে রূপে
মনেরই অন্ধকূপে থেকে যায়।

এই অন্ধকূপাবৃত প্রেমের সঙ্গে প্রেমের প্রকাশবেদনার সংশয়িত দ্বন্দ্বে পীড়িত কবিচিত্ত বলে—

ভবে প্রেমের আঁখি প্রেম কাড়িতে চাহে
মোহনরূপ তাই ধরিছে
আমি যে আপনায় ফুটাতে পারি নাই
পরান কেঁদে তাই মরিছে।

বস্তুত প্রেম এক মহান সম্পদতুল্য, তা অমরাবতী অপেক্ষাও মহীয়ান, তা জীবনের তমসা দূর করে। তাই কুরূপা নারী পর্যন্ত বলে—

আমি আমার অপমান সহিতে পারি
প্রেমের সহে না তো অপমান।

চিত্রাঙ্গদা নাটিকাতেও এই রূপনির্জিত প্রেমের বিজয়প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। রূপাকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রবঞ্চিত হওয়ায় চিত্রাঙ্গদার জীবনে এসেছিল গ্লানি।

সুমিত্রাও ঠিক একই কারণে যথার্থ প্রেমের বদলে আসক্তির মধ্যে গ্লানি অনুভব করেছিলেন। আবার প্রতিহত-প্রেম বিক্রমদেবও এই সত্যই একদিন উপলব্ধি করেছিলেন। মায়ার খেলার মতই তিনি বলতে পারতেন, 'ভালবেসে যদি সুখ নাহি তবে কেন মিছে ভালবাসা'।

এই দিক থেকে রাজা ও রানীর সঙ্গেও মায়ার খেলার সম্পর্ক আছে। গাজিপুর থেকে ফিরে কবি পুনরায় সোলাপুর যান এবং সেখানেই মায়ার খেলা লেখা হয়। মানসী কাব্যে 'প্রকাশবেদনা' নামে একটি কবিতা আছে। এই প্রকাশবেদনা কবিচিত্তেরই একটি তৎকালিক অভিজ্ঞতা। এই প্রকাশবেদনাই তাঁর সমগ্র সৃষ্টিতে সংক্রামিত ও নাট্যচরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। ঐ কবিতায় আছে—

আপন প্রাণের গোপন বেদনা
টুটিয়া দেখাতে চাহি রে
হৃদয়বেদনা হৃদয়েই থাকে
ভাষা থেকে যায় বাহিরে।

এই অস্ফুটতা বিক্রমদেব-সুমিত্রা কুমারসেন-ইলা দেবযানী-কচ সকলের প্রেমের মধ্যেই লক্ষণীয়, আর তারই কাব্যগীতি মায়ার খেলার চতুর্থ দৃশ্যে অশোকের গানে—

তারে দেখাতে পারিনে কেন প্রাণ খুলে গো
কেন বুঝাতে পারিনে হৃদয়বেদনা।

এমন কি বাল্মীকিপ্রতিভায়ও বাল্মীকির মুখে এই আত্মবদ্ধ নৈরাশ্যের পূর্বাভাস আছে একটি গানে—

জীবনের কিছু হল না হায়।
হল না গো হল না হায় হায়।

মায়ার খেলার কাব্যগীতিগুলির সর্বত্রই এই প্রকাশযন্ত্রণা নৈষ্ফল্য ও হাহাকার শোনা যায়। মায়াকুমারীগণ অন্তরাল থেকে এই হৃদয়বেদনার কোরাস গেয়ে চলেছে। কখনও 'কাছে আছ দেখিতে না পাও, তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও'—কখনও

নিমেষের তরে শরমে বাধিল মরমের কথা হল না,
জনমের তরে তাহারই লাগিয়া রহিল হৃদয়বেদনা।

এর সঙ্গে তুলনীয় মানসীর 'ভালো করে বলে যাও', রাজা ও রানীর বিক্রমদেবের

আর্তনাদ, বিসর্জনের জয়সিংহের মৃত্যুকামনা। সর্বত্রই নৈরাশ্য, ক্ষুব্ধ অসহায় বিলাপ, আপনাকে শতখণ্ড করার দৈন্য, কখনও ক্রোধের দুর্জয় মূর্তি, কখনও আত্মঘাতী সর্বনাশ। মায়ার খেলা এই নৈরাশ্যেরই নাট্যরূপ, গানগুলি তারই কাব্যরূপ।

৫

১২৯৬ সাল থেকে ১৩১৪ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে নাট্যরচনাগুলি প্রকাশিত হয় তার নাম 'রাজা ওরানী,' 'বিসর্জন', 'গোড়ায় গলদ', 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' এবং 'ব্যঙ্গকৌতুক'। এর মধ্যে 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' ঠিক নাটক নয়, 'ব্যঙ্গ-কৌতুক'কেও পূর্ণাঙ্গনাট্যরচনা বলে ধরা যায় না। কিন্তু সংগীতের প্রয়োগের দিক থেকেই এগুলি আমাদের আলোচ্য। রাজা ও রানী ১২৯৬ সালের শ্রাবণে প্রকাশিত হয়। মায়ার খেলা গীতপ্রধান নাটক, বিসর্জনেও একাধিক সংগীত আছে, একমাত্র মালিনীতে কোনো গান নেই। রাজা ও রানীতে গান থাকলেও এই কাব্যনাট্যে গানের ভূমিকা অকিঞ্চিৎকর। সাধারণত ভাবমুখ্য নাটকে গানগুলিই হয়েছে কবির নিজস্ব সংলাপ। কিন্তু রাজা ও রানী নাটকে সংগীতের প্রযোগ সেইরকম তাৎপর্যপূর্ণ বা সংকেতবাহী নয়, পক্ষান্তরে তপতীর সমগ্র নাট্যদেহ গীতব্যঞ্জনায় কম্পিত হযেছে। রাজা ও রানী বিসর্জন প্রভৃতি নাটকের সংগীতব্যবহার কিছুটা যেন উনিশ শতকীয় বাঙলা নাটকে দর্শকমনোরঞ্জনের জন্য সংগীতপ্রয়োগের মতই। রাজা ও রানী নাটকের ৩য় অঙ্কের ১ম দৃশ্যে জনৈক সৈনিকের গান 'ঐ আঁখি রে' নাট্যধর্মের সঙ্গে নিবিড়ভাবে অন্বিত হয়ে ওঠেনি। ২য় দৃশ্যে সখীদের গান 'যদি আসে তবে কেন যেতে চায়', ৫ম দৃশ্যে সখীর গান 'বাজিবে সখী বাজিবে' এবং 'ঐ বুঝি বাঁশি বাজে' কুমারসেন-ইলার ললিতলাবণ্যময় প্রেমের পটভূমিকা সৃষ্টি করেছে। তবে শেষের দুটি গানের সঙ্গে নাট্যপরিণামের ঈষৎ সম্পর্ক আছে। কুমারসেন ও ইলার আসন্ন মিলন সহসা অপরিহার্য ব্যর্থতায় পরিণত হবে, এ গান যেন তারই প্রতি নাটকীয় শ্লেষ। ৫ম অঙ্কের ২য় দৃশ্যে কাশ্মীর-বাসীদের মুখে হাটের গান 'যমের দুয়ার খোলা পেয়ে' গভীর তাৎপর্যযুক্ত নয়। ৪র্থ দৃশ্যে 'আমি নিশিদিন তোমায়' ইলার বেদনার গান। সখী ও ইলার সংগীতগুলির আবহ মানসিকতা ভাষা ও সুর মায়ার খেলারই সমতুল। এরপর ঘটনা এত দ্রুতবেগে সংঘটিত হয়েছে যে সেই প্রবল ঘটনা-স্রোতের

মধ্যে আকস্মিক পরিণতি ও অনিবার্য বিস্ময়ের আঘাতে সংগীত-যোজনার অবকাশ পাওয়া যায়নি।

বিসর্জন (১২৯৭) রাজর্ষি উপন্যাসের ঈষৎ পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত নাট্যরূপ। এটি রাজা রানীর মতই ঘটনাপূর্ণ আখ্যানসর্বস্ব নাটক, যদিও রবীন্দ্রনাথের কাব্যদর্শন ও আইডিয়া একেও স্পর্শ করেছে। এই নাটকে গানের অবকাশ কম হলেও প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে অপর্ণার মুখে 'আমি একেলা চলেছি এ ভবে', ৫ম দৃশ্যে পুরবাসীদের গান 'উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে', ২য় অঙ্কের ২য় দৃশ্যে অপর্ণার কণ্ঠে 'ওগো পুরবাসী আমি দ্বারে', ৩য় দৃশ্যে জয়সিংহের মুখে 'আমারে কে নিবি ভাই সঁপিতে চাই' এবং ৩য় অঙ্কের ১ম দৃশ্যে প্রজাদের একটি গান আছে। কাব্যনাট্যে সংগীতের প্রয়োজন সীমাবদ্ধ, কারণ এই জাতীয় নাটক আগাগোড়াই লিরিকের সমষ্টি, গান সেখানে অতিরিক্ত যোজনা মাত্র। লিরিককে বাড়াতে গিয়ে তা নাট্যধর্মকে ক্ষুণ্ণ করে। কাব্যনাট্যের সংলাপে যে সাংকেতিকতা, সংক্ষিপ্ততা ও কাব্যধর্মিতা নিগূঢ়ভাবে বিরাজ করে, সাধারণ নাটকের সংলাপ অপেক্ষা তা উচ্চস্তরের। সুতরাং কাব্যনাট্যে গান প্রায়ই অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। মালিনী বা চিত্রাঙ্গদায় সংগীতের অভাব বোধ হয় না, কিন্তু রাজা ও রানী ও বিসর্জনে গানের ব্যবহার অতিরেক বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। বিসর্জন নাটকে জয়সিংহের আত্মদ্বন্দ্ব তার সংলাপে যতটা ফুটেছে, 'আমারে কে নিবি ভাই সঁপিতে চাই আপনারে', গানে কি তার চেয়ে বেশি ব্যক্ত হয়েছে? আসলে বিসর্জনের যুগ থেকেই রবীন্দ্রনাথের নাটকে গানের প্রবেশ ঘটেছে কবির অভিপ্রায়ে, নাট্যকারের অভিপ্রায়ে নয়। ফলে এই জাতীয় অনেকগুলি গানই কাব্যসংগীতরূপে সার্থক হলেও নাট্যগীতরূপে সুপ্রযুক্ত নয়।

গোড়ায় গলদ (১২৯৯) রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক প্রহসন। এই নাটকে গানের অভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই জাতীয় নাটকে সংগীতের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তা গ্রহণ করেননি। হয়ত এই ক্ষতিপূরণের জন্যই গোড়ায় গলদ পরিমার্জিত করে পরবর্তী কালে শেষরক্ষা (১৩৩৪) লিখিত হয়েছে। গোড়ায় গলদের শেষদৃশ্যে একটি মাত্র গান আছে সমবেত কণ্ঠে, 'যার অদৃষ্টে যেমনি জুটুক তোমরা সবাই ভালো'। মূল নাটকের পরিহাসিক ভাবটি এই গানে ব্যাখ্যাত হয়েছে। হাসির গান রচনায় রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অবহেলাযোগ্য নয়, এই গানটি তার প্রমাণ। প্রহসন-নাটকে অকারণ

জটিলতা, ঘটনাবর্ত, ভ্রান্তিবিলাস, ভুল বোঝা ও ভাবসমুদ্রে নিমজ্জমান পাত্র-পাত্রীর হাস্যকর পরিণাম শেষ পর্যন্ত একটি মধুর-রসাত্মক সংগতিতে মিলিত হয়, এই ভাবটি বর্তমান গানে ফুটে উঠেছে। এই গানটির সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গানের ভাষা ও ভাবসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বীণাবাদিনী পত্রিকার ১৩০৪ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'পরিহাসের গান' শিরোনামায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই গানটি ('শ্রীজো লিখিত') মুদ্রিত হয়েছে—

গঞ্জনা ও উপদেশ

তোমরা যা হোক ভ্যালা!
নূতন নূতন কতই যতন পরে পুরাতনে হেলা।
প্রথম প্রথম 'হৃদয়রতন' শেষে ইট পাটকেল ঢ্যালা!
নূতন প্রেমের ভাবের ঘটা আগাগোড়া বাক্যছটা
এখন বোঝা গেছে ভাবখানাটা শুধু হৃদয় নিয়ে খেলা!
পেরিয়েছে যার তিনটে বিশ, সেও মিসি দেখলেই অনিমিষ
ধেঁাড়া হলেও থোড়া বিষ মোদ্দা কেউ যাও না ফ্যালা।
আমরা রাঁধবো তোমরা খাবে নিজের সুখটি বোঝো আগে,
চুনটি খসলে দারুণ রাগে কথা শোনাও মেলা।
যখন যেটা হচ্ছে সাধ কিনচো বেচ্‌চো নাহিক বাধ
বেজায় খরচ অপরাধ শুধু আমাদেরই বেলা!
কিন্তু একি বিধির কল তোমরা নইলে আমরা বিকল
প্রাণে প্রাণে বাঁধা শিকল ওরে সাধ্যি কি তায় ঠেলা।
তোমরা ঘোড়া আমরা গাড়ি আমরা মাঝি তোমরা দাঁড়ি
উভয় মিললে তবেই পাড়ি নৈলে যায় না চলা।
কাজ কি তবে আর বিবাদে মুক্‌খু বলি কি তোদের সাধে
যার জালে মাছ যেমনি বাধে, জুড়া তাতেই মনের জ্বালা!

'গোড়ায় গলদে' রবীন্দ্রনাথের গানটি এর পাশে উদ্ধৃত করা যাক—

যার অদৃষ্টে যেমনি জুটুক সেই আমাদের ভালো
আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালো।
কেউ বা অতি জ্বলো-জ্বলো, কেউ বা ম্লান ছলোছলো,
কেউ বা কিছু দহন করে, কেউ বা স্নিগ্ধ আলো।

নূতন প্রেমে নূতন বধূ আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্ল মধুর একটুকু ঝাঁঝালো।
বাক্য যখন বিদায় করে চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো।
আমরা তৃষ্ণা তোমরা সুধা, তোমরা তৃপ্তি আমরা ক্ষুধা,
তোমার কথা বলতে কবির কথা ফুরালো।
যে মূর্তি নয়নে জাগে সবই আমার ভালো লাগে—
কেউ বা দিব্যি গৌরবরণ কেউ বা দিব্যি কালো।

দুটি গানের সুরই বাউলের সুর বলে উল্লিখিত। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের গানটি অবলম্বন করেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তার প্যারডি লিখেছেন।

'প্রজাপতির নির্বন্ধ' প্রথমে 'চিরকুমার সভা' নামে ১৩০৭ বৈশাখ-কার্তিক পৌষ-চৈত্র এবং ১৩০৮ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সালে ভারতীতে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে গ্রন্থখানি উপন্যাস-বিভাগের অন্তর্গত হলেও চিরকুমার সভার রূপান্তর প্রজাপতির নির্বন্ধ মূলত নাটকই। এই গ্রন্থের সূচনাভাগ উপন্যাসের বর্ণনামূলক রীতিতে রচিত হলেও শেষ পর্যন্ত বর্ণনা নাট্যনিয়মের বশীভূত হয়েছে, কেবল অঙ্ক-দৃশ্যবিভাগ নেই। প্রজাপতির নির্বন্ধের এই নাট্যসম্ভাবনার জন্যই পরবর্তীকালে কবি কর্তৃক পুনর্লিখিত হয়ে এটি সম্পূর্ণ নাটকে পরিণত হয়েছিল (১৩৩২)। প্রজাপতির নির্বন্ধ প্রকৃতপক্ষে বৈকুণ্ঠের খাতা বা গোড়ায় গলদের মত প্রহসনাত্মক মনোভঙ্গিতে লেখা এবং তাই প্রহসনে সংগীতের ভূমিকা এতে উপেক্ষিত হয়নি। এই গ্রন্থে অনেকগুলি গানই আছে, তার অধিকাংশই যথার্থ প্রহসনের প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত, সংলাপধর্মী, কৌতুকোচ্ছল, কিন্তু কাব্য-সংগীতরূপে যোজিত নয়। বৌঠাকুরানীর হাট উপন্যাসে যেমন বসন্তরায় কথায় কথায় গান গেয়ে ওঠেন, তাঁর কথাই ভাবাবেগে মনের ঔজ্জ্বল্যে ও কণ্ঠের ঔদার্যে গীতমূর্তি ধারণ করে, তেমনি এই প্রহসনমূলক নাট্যোপন্যাসে অক্ষয়ও গীতরসিক ব্যক্তি। তাঁর সংলাপ কবির মতই সংগীতরূপে উচ্ছ্বসিত হয়। লেখকের ভাষায়—

"অক্ষয়কুমার ঝোঁকের মাথায় দুটো-চারটে লাইন গান মুখে মুখে বানাইয়া গাহিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু কখনই কোনো গান রীতিমত সম্পূর্ণ করিতেন না। বন্ধুরা বিরক্ত হইয়া বলিতেন, তোমার এমন অসামান্য ক্ষমতা, কিন্তু গানগুলো শেষ কর না কেন? অক্ষয় ফস করিয়া তান ধরিয়া জবাব

দিতেন, সখা শেষ কল্লা কি ভালো ? তেল· ফুরোবার আগেই আমি নিবিয়ে দেব আলো।" (১ম পরিচ্ছেদ)

প্রজাপতির নির্বন্ধ থেকে আমরা লক্ষ্য করি, রবীন্দ্রনাথের নাটকে এই জাতীয় এক প্রকার চরিত্রের অনুপ্রবেশ প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছে, যারা কথাকে সুর, সংলাপকে সংগীত, স্পষ্টকে ব্যঞ্জনাময় করে তোলেন। নাটক-বিশেষে তাঁদের আচরণ বক্তব্য ও ভাবাদর্শে যতই পার্থক্য থাক, এই প্রকার চরিত্রের ভিতর দিয়েই রবীন্দ্রনাট্যে কবি রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রক্ষেপ ঘটেছে। তাই বসন্তরায়ের গান সংক্ষিপ্ত হলেও বিচ্ছিন্ন পংক্তিসমষ্টি মাত্র নয়, অক্ষয়ের গান হাস্যপরিবৃত হলেও তার অনেকগুলিই কাব্যসংগীতরূপে সুরচিত।

প্রজাপতির নির্বন্ধে বেশ কয়েকটি ছোট বড় গান আছে। এই গানগুলির কিছু পরে চিরকুমার সভাতেও গৃহীত হয়েছে। এইগুলি কাব্যসংগীতের মর্যাদা লাভ করতে পারে—

৯ম পরিচ্ছেদ	অক্ষয়	মনোমন্দিরসুন্দরী
১১ম	শ্রীশ	নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
		ওরে সাবধানী পথিক
১১শ	বিপিন	তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়
১৫শ	অক্ষয়	অলকে কুসুম না দিও
	শ্রীশ	কেন সারাদিন ধীরে ধীরে

মনোমন্দিরসুন্দরী গানটি অক্ষয়ের নারীস্তব। এর ভঙ্গি পরিহাসিক, ভাষা জগদানন্দের বৈষ্ণব পদগুলিকে মনে করিয়ে দেয়। সমাসবদ্ধ আনুপ্রাসিক পদের এমন সুশোভন যোজনা কাব্যসংগীতে বস্তুত দুর্লভ। অন্তত এই একটি রচনার দ্বারাই অক্ষয়ের মন্দকবিযশঃপ্রার্থিত্ব অপরাধজনক মনে হয় না, তার স্বভাবকবিত্বের অন্তরালে কোনো উচ্চতর প্রতিভাবানের গোপন প্রেরণা অনুভূত হয়।[৮] প্রজাপতির নির্বন্ধে শ্রীশ চরিত্র অক্ষয়ের মত গীতপ্রসাদধন্য নয়, কিন্তু তার সংগ্রহেও জনৈক 'আধুনিক কবির' গান আছে। শ্রীশ বলেছে, "আমাদের কবি লিখেছেন নিশি না পোহাতে জীবন প্রদীপ জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া"। শ্রীশের মুখে এই 'আমাদের কবি'-লিখিত আরও একাধিক গানের সন্ধান মেলে, যথা 'ওরে সাবধানী পথিক', 'কেন সারাদিন ধীরে ধীরে' ইত্যাদি।[৯] এই আধুনিক কবিটিকে চিনতে আশা করি পাঠকদের অসুবিধা হয় না।

ব্যঙ্গকৌতুকের (১৩১৪) অন্তর্গত প্রথম প্রহসন 'বিনি পয়সার ভোজে'

একটি হাস্যকৌতুকময় গান 'যদি জোটে রোজ এমন বিনি পয়সার ভোজ' রচনা হিসাবে সাধারণ। তাছাড়া এই গ্রন্থের 'বশীকরণ' নাটিকায় দুটি গান আছে, 'আমি কী বলে করিব নিবেদন' এবং 'এবার সখী সোনার মৃগ দেয় বুঝি দেয় ধরা'। প্রথম গানটি গীতবিতানের ব্রহ্মসংগীত (পূজা) এবং দ্বিতীয় গানটি প্রেমপর্যায়ের অন্তর্গত।

৬

শারদোৎসবের (রচনাকাল ৭ ভাদ্র ১৩০৫) মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের নাট্য-জীবন সুস্পষ্টভাবে এক নতুন পর্বে, তত্ত্বময় সংকেত-সমৃদ্ধ কবি-দার্শনিকতার যুগে প্রবেশ করল। শারদোৎসবের সংগীতগুলি তাই নাট্যাবহের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত, চরিত্রের মর্মমূল থেকে উৎসারিত, সংলাপের গূঢ় ইঙ্গিতে পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংগীতের যে সংকেতধর্মিতা, গভীর কাব্যসৌন্দর্য ও ভাবরস, তা এই যুগের নাটকেই যেন সার্থক হয়েছে। গানের ভিতর দিয়ে ভুবনকে নূতন করে আবিষ্কার করার এই নেশা রবীন্দ্রনাথের জীবনে শেষ পর্যন্ত প্রসারিত। ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানকার রৌদ্রপ্লাবিত শাল-শাল্মলী-সপ্তপর্ণের উদারশ্যামল আতিথ্যের মধ্যে গৈরিক পথে পথে তরুণ বিদ্যার্থীদের নিয়ে কবির নূতন জীবন ও পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে, তাদের শিক্ষাদানের অঙ্গরূপেই কবি নাট্যরচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন। শারদোৎসব এই উপলক্ষেই রচিত, আর এই জন্যই এই নাটকে গানের ভূমিকাও অসামান্য। শান্তিনিকেতন তপোবনবিদ্যালয়ে বিদ্যার্জনের সঙ্গে যেমন গানের সংযোগ অপরিহার্য, এই যুগ থেকে তেমনি রবীন্দ্রনাথের নাটকেও গান এসেছে অবিচ্ছেদ্যভাবে।

শারদোৎসব কেবল নাটক নয়, ঋতুউৎসবও—তাই ঋতুর গান এই নাটকে গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের ঋতুসংগীতগুলি শারদোৎসব থেকেই প্রকৃতপক্ষে সূচিত হয়েছে। গীতাঞ্জলি পর্বে রচিত এই নাটকের প্রাঙ্গণ গানের জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। খেয়া-গীতাঞ্জলির একাধিক গান শারদোৎসবে আছে। শারদোৎসবের উদ্বোধনে আছে 'আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি'। গানখানি কবিতা-আকারে ('বিকাশ') খেয়া কাব্যান্তর্গত। এই মুক্তবক্ষ উষার বর্ণালোকে আশ্রমবালকেরা বেরিয়েছে ছুটির আনন্দের সন্ধানে। সে আনন্দ আছে ঋণশোধের সৌন্দর্যে—'এই ঋণশোধেই যথার্থ ছুটি যথার্থ মুক্তি।' কবি লিখেছেন—

"নব ঋতুর অভ্যুদয়ে যখন সমস্ত জগৎ নূতন রঙের উত্তরীয় পরিয়া চারিদিক হইতে সাড়া দিতে থাকে, তখন মানুষের হৃদয়কেও সে আহ্বান করে—সেই হৃদয়ে যদি কোনো রঙ না লাগে, কোন গান না জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে মানুষ সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।" (শান্তিনিকেতন পত্র, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৬)

শারদোৎসব নাটকে হৃদয়ে সেই রঙ লেগেছে, গান জেগেছে। শারদোৎসব সেই ঋতু-উৎসবেরই পালা। তাই এই নাটকের অঙ্গাবরণ হয়েছে রবীন্দ্রসংগীত। একটি পত্রে পুনরায় শারদোৎসবের বাণী ব্যাখ্যা করে কবি বলেছেন—"ওটা হচ্ছে ছুটির নাটক। ওর সময়ও ছুটির, ওর বিষয়ও ছুটির। রাজা ছুটি নিয়েছে রাজ্য থেকে, ছেলেরা ছুটি নিয়েছে পাঠশালা থেকে। তাদের আর কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই, কেবল একমাত্র কাজ হচ্ছে বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা। ওর মধ্যে একটা উপনন্দ কাজ করছে, কিন্তু সেও তার ঋণ থেকে ছুটি পাবার কাজ।" (ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ৫২)

বলা বাহুল্য শারদোৎসবের এই গীতমুখ্য পালা ব্যর্থ হয়নি। পরবর্তীকালে ১৩২৯ সালে শারদোৎসবের অভিনয়কালে কবি এই নাটকের যে ভূমিকা রচনা করেছেন, তাতে সংগীতের অপরিহার্যতাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে দেখি, রাজা পুরবাসী ও সভাসদদের আমন্ত্রণ করেছেন উৎসবে, কিন্তু সভা-পণ্ডিতের নির্দেশ সত্ত্বেও সভাকবি সেদিন শুম্ভনিশুম্ভ পালা রচনা করেননি, তিনি যা রচনা করেছেন, 'সেটা গানেতে গন্ধেতে রঙেতে রসেতে মিশিয়ে একটা কিছুই-না গোছের জিনিস।' তারপরই শারদোৎসব অভিনয় আরম্ভ হয়েছে।

শারদোৎসব নাটকের গান মোট নটি। এর মধ্যে প্রথম দৃশ্যে একটি মাত্র গান বালকদের কণ্ঠে 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি'। অন্যান্য গান সবই দ্বিতীয় দৃশ্যে। বালকদলের গান 'আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা', ঠাকুরদাদা ও বালকদের সমবেত গান 'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ' এবং 'আমার নয়ন-ভুলানো এলে'। ঠাকুরদাদা স্বয়ং গেয়েছেন 'আনন্দেরই সাগর হতে এসেছে আজ বান'। সন্ন্যাসীর কণ্ঠে মোট তিনখানি গান—'তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ', 'নবকুন্দধবলদলসুশীতলা' এবং 'লেগেছে অমলধবল পালে মন্দমধুর হাওয়া।' তাছাড়া বন্দনাকারীদের মুখে দেওয়া হয়েছে 'রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে'।

গীতাঞ্জলির ৮-১৩ সংখ্যক গান শারদোৎসব নাটকের শারদীয় প্রকৃতি

যেন এই গানগুলির ভাষা ও সুরে অকৃপণ অমলিন ঐশ্বর্যে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। বিশ্বজগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করেছে—এই তত্ত্বটি এই নাটকে রূপায়িত আর সেই তত্ত্ব যেন গানের সুরের মধ্য দিয়েই যথার্থ অনুভবগম্য হয়। সুরের ঋণই সেই আনন্দের ঋণ, এই নাটকের পাত্রপাত্রী গানের দ্বারাই যথার্থ শারদোৎসব করেছে। বেতসিনীর তীরবনে ঠাকুরদাদা ও বালকদের 'আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায়' গানে সেই উৎসবের আগমনী বাজে, 'আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ নেব রে লুঠ করে' এই প্রতিজ্ঞায় উৎসবের মন্ত্রসূচনা হয়। ঠাকুরদাদার গান 'আনন্দেরই সাগর হতে' উৎসবের উপরিতলের আনন্দধ্বনির পরিচায়ক আর তার তলদেশে রয়েছে উৎসবের গভীর দর্শন যা সন্ন্যাসী রাজার গানে বেজেছে—'তোমার সোনার থালায় সাজাবো আজ দুখের অশ্রুধার।' অবশেষে এই জগতের উপর থেকে প্রত্যহের সেই আবরণটি যায় ঘুচে, নির্মল শুভ্র রৌদ্রধৌত সোনার সকালটি লক্ষ্মীর চরণ-পদ্মের মত বেরিয়ে আসে। তখনই দেখা যায়—

"জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করছে। বড সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিযে, সমস্ত জগৎ ত্যাগ করে করছে। সেইজন্যই ধানের খেত এমন সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে, বেতসিনীর নির্মল জল এমন কানায় কানায পরিপূর্ণ।"

তারপর আলোর সঙ্গে আকাশের সঙ্গে মিলনের উৎসবে শুভ্রপুষ্পাচ্ছাদিত সন্ন্যাসী পুরোহিত সাজলেন, শরতাগমনের বেদমন্ত্র উচ্চারিত হল, শারদোৎসবের আবাহন গান গাইতে গাইতে শুভ্রচিত্ত বালকেরা বনপথ প্রদক্ষিণ করল—

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা গেঁথেছি শেফালিমালা
নবীন ধানের মঞ্জরী দিযে সাজিযে এনেছি ডালা।

এরপর শারদলক্ষ্মী কি দূরে থাকতে পারেন? সন্ন্যাসীর নিরঞ্জন কবি-দৃষ্টিতে এই গানের ভাবরহস্য ব্যাখাত হয়েছে—

"তোমাদের গান আজ একেবারে আকাশের পারে গিযে পৌঁচেছে! দ্বার খুলেছে তাঁর! দেখতে পাচ্ছ কি শারদা বেরিযেছেন? দেখতে পাচ্ছ না? দূরে দূরে সে অনেক দূরে, বহু দূরে! সেখানে চোখ যে যায় না। সেই জগতের সকল আরম্ভের প্রান্তে, সেই উদয়াচলের প্রথমতম শিখরটির কাছে! যেখানে প্রতিদিন উষার প্রথম পদক্ষেপটি পড়লেও তবু তাঁর আলো চোখে এসে পৌঁছয় না, অথচ ভোরের অন্ধকারের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে—সেই অনেক অনেক দূরে!"

সেইখানে হৃদয় মেলে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকা। তারপর সন্ন্যাসী স্বয়ং সেই শারদলক্ষ্মীর আগমন গাইতে থাকেন 'লেগেছে অমলধবল পালে'। অবশেষে বরণের গান 'আমার নয়ন-ভুলানো এলে'। ইতিমধ্যে রাজধানীর লোকজন এসে সন্ন্যাসীবেশী চক্রবর্তীসম্রাট বিজয়াদিত্যকে বরণ করেছেন। যে রাজা প্রেমপ্রীতি সখ্য ও ত্যাগের দ্বারা শাসন করেন, তিনিই যথার্থ রাজা। সন্ন্যাসই তাঁর রাজবেশ, মৃত্তিকাই তাঁর সিংহাসন, পুষ্পই তাঁর অলংকার, গৈরিক তাঁর বসন—তিনিই জীবনের রাজাধিরাজ, শরৎকালই তাঁর দিগ্বিজয়ের কাল। তাই শারদলক্ষ্মীর বরণগান ও রাজার বরণগান একাকার হয়ে গেছে।

'বৌঠাকুরানীর হাটে'র নাট্যরূপ 'প্রায়শ্চিত্ত' ১৩১৬ সালে প্রকাশিত হয় এবং পরে পুনর্লিখিত হয়ে ১৩৩৬ সালে 'পরিত্রাণ' নামে প্রকাশিত হয়। পরিত্রাণের সঙ্গে আবার মুক্তধারা নাটকেরও আংশিক যোগ আছে।

বৌঠাকুরানীর হাট উপন্যাসেই অনেকগুলি গান ছিল, পরে প্রায়শ্চিত্ত নাটক রচনাকালে কবি সেই গানগুলিকে মোটামুটি অবিকৃত রেখেছেন। এই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি-শারদোৎসব পর্ব সুরু হয়েছে, কবিজীবনে গানের স্রোত নেমেছে। তাই প্রায়শ্চিত্ত নাটকে গানের নতুন প্রেরণা সঞ্চারিত হল। এই নাটকে গানের ধারা বহন করে আনল একটি নতুন চরিত্র যার নাম ধনঞ্জয় বৈরাগী, কণ্ঠে তার সুর, হাতে একতারা। ভাষায়-ব্যবহারে-আদর্শে সে হয়ে উঠল রবীন্দ্রনাথের এক প্রকার মানস-প্রতিরূপ।

মূল উপন্যাসের (বৌঠাকুরানীর হাট প্রথম প্রকাশ ১২৮৯ পৌষ) যে গানগুলি প্রায়শ্চিত্ত নাট্যরূপেও আছে সেইগুলির আলোচনা করা যাক। উপন্যাসে বসন্ত-রায় একটি বিশিষ্ট চরিত্র এবং এই সদাহাস্যোজ্জ্বল প্রাণবন্ত সংগীতপ্রিয় চরিত্রটিকে প্রায়শ্চিত্ত নাটকেও অবিকৃত রাখা হয়েছে। ফলে নাট্যরূপে বসন্ত-রায়ের সংলাপের মত তার কণ্ঠের গানগুলিকেও কবি রক্ষা করেছেন। কিন্তু বৌঠাকুরানীর হাটে বসন্তরায়ের মুখে কবি কেবল গানই যোজনা করেছিলেন, সেই গানগুলি তখনো সুর হয়ে ওঠেনি। প্রায়শ্চিত্তে উক্ত গানগুলিতে কবি যথাসম্ভব সুরযোজনা করেন। তার ফলে সুরের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনে অনেক ক্ষেত্রে কথার পরিবর্তন ঘটাতে হয়েছে ও কাব্যরূপটিকে বদল করতে হয়েছে। যেমন উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদে বসন্তরায় সেতার কোলে তুলে নিয়ে উদয়াদিত্যকে গান শোনাচ্ছেন—

বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ ?
সকলি যে স্বপ্ন বলে হতেছে বিশ্বাস।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে সেথায় তো আদর মিলে ?
এরই মধ্যে মিটিল কি প্রণয়ের আশ ?
এখনো তো রয়েছে রাত এখনো তো হয়নি প্রভাত
এখনো এ রাধিকার ফুরায়নি তো অশ্রুপাত।
চন্দ্রাবলীর কুসুমসাজ এখনি কি শুখাল আজ
চকোর হে, মিলাল কি সে চন্দ্রমুখের মধুর হাস ?

নাটকে উক্ত দৃশ্য পরিস্থিতি বা ঘটনা আছে তৃতীয় দৃশ্যে, অনুরূপ ক্ষেত্রে সেতার নিয়ে বসন্তরায় যে গানটি গেয়েছেন তা এইরূপ—

বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ
সকলই যে স্বপ্ন বলে হতেছে বিশ্বাস।
তুমি গগনেরই তারা
মর্তে এলে পথহারা
এলে ভুলে অশ্রুজলে আনন্দেরই হাস।

প্রথম গানটি খণ্ডিতা নায়িকার উক্তি, দ্বিতীয়টি বিপ্রলব্ধা নায়িকার—সুতরাং পরিবর্তন অনেকখানিই ঘটেছে। প্রথম রচনাটির রীতিরুচি অশোভন না হলেও উনিশ শতকের মধ্যভাগের বাঙলা কবিসংগীত হাফআখড়াই তর্জা গানগুলির আদর্শকেই মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু নাট্যরচনাকালে কবির সংগীত-চেতনা অনেক পরিচ্ছন্ন ও সূক্ষ্ম শিল্পরুচির দ্বারা মার্জিত হয়েছে। সুতরাং কবি-সংগীতের রীতিতে রচিত গানটি পরিবর্তিত করে তিনি গানটির রুচিগত উৎকর্ষ ঘটালেন। হয়ত বসন্তরায়ের হত্যাকাণ্ডের পটভূমিকায় এই হাস্যোজ্জ্বল চরিত্রটির মুখে এই প্রকার ভাষাব্যবহার অবাঞ্ছিত মনে হয়েছে। উদয়াদিত্যের সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাৎকারই আনন্দপ্রেরণা হয়ে বসন্তরায়ের মুখে এই গানের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু উদয়াদিত্যের সঙ্গে বসন্তরায়ের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত গানের রসিকতা হয়ত নাট্যরচনার যুগে কবির কাছে অশোভন মনে হয়েছিল।

প্রায়শ্চিত্ত নাটকের দুটি গান 'মলিন মুখে ফুটুক হাসি' এবং 'আজ তোমারে দেখতে এলেম' উপন্যাসের সঙ্গে একরূপ নয়। উপন্যাসের ২৬।২৭ বৎসর পরে প্রায়শ্চিত্ত নাটক রচিত এবং এই নাট্যরচনা গীতাঞ্জলির যুগসূচনায় স্থাপিত।

উপন্যাসেই কবি সংগীতের মর্যাদা পৃথকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তার একটি প্রমাণ আমরা এখানে উদ্‌ধৃত করতে পারি—

"পাঠান ঘাড় নাড়িয়া চোখ বুজিয়া কহিল আহা ঠিক বলিতেছেন, ঠিক বলিতেছেন। একটি বযেৎ আছে যে তলোয়ারে শত্রুকে জয় করা যায়, কিন্তু সংগীতে শত্রুকে মিত্র করা যায়।

বসন্তরায় বলিয়া উঠিলেন, কী বলিলে খাঁ সাহেব? সংগীতে শত্রুকে মিত্র করা যায়? কী চমৎকার।··· তলোয়ার যে এতবড ভয়ানক দ্রব্য তাহাতেও শত্রুর শত্রুত্ব নাশ করা যায় না···কিন্তু সংগীত যে এমন মধুর জিনিস তাহাতে শত্রু নাশ না করিযাও শত্রুত্ব নাশ করা যায। একি সাধারণ কবিত্বের কথা?"

নাট্যরচনা কালে প্রায়শ্চিত্তে সংগীতের গুরুত্ব যে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এইজন্যই উপন্যাসের তুলনায নাটকে বসন্তরায়ের কণ্ঠে গানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, পুরাতন গানেব ভাষায পরিবর্তন ঘটেছে। ধনঞ্জয় বৈরাগী নামে নতুন গীতরসাত্মক চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে যার গানের আবেদন বসন্তরায়ের গানের চেয়ে গভীর ও তাৎপর্যবহ। এমন কি অন্যান্য চরিত্রের মুখেও গান যোজিত হযেছে, যেমন সুরমা ও রামমোহন। নাট্য-প্রযোজনে অন্যত্রও কিছু গান যোজিত হযেছে, যেমন দ্বিতীয অঙ্কের চতুর্থ ও ষষ্ঠ দৃশ্যে নটীর গান।

প্রাযশ্চিত্ত নাটকের প্রাণ এই সংগীত, বিশেষত ধনঞ্জযের সংগীত। গানের সুর এবং কাব্যের বাণী এখানে নাটকীয়তার পরিপন্থী না হয়ে তাকে সূক্ষ্মতর ও গূঢ় করে তুলেছে। উপন্যাসের শেষ দৃশ্যে ছিল বিভা যেদিন আপন স্বামীগৃহে এল ভিখারিনীর মত, রামচন্দ্র সেইদিনই দ্বিতীযবার দারপরিগ্রহ করতে চলেছে। বিভা লজ্জিতা অপমানিতা হযে ফিরে এল, তারপর উদয়াদিত্যের সঙ্গে কাশীতে বাস করতে গেল। এই বর্ণনা নাটকে নেই। নাটকে নদীর ঘাট থেকেই রামচন্দ্রের বিবাহের সংবাদ শুনে বিভা ফিরে চলেছে। উদয়াদিত্য এবং রামমোহন তাদের সঙ্গে নিয়েছেন। প্রত্যাখ্যাত প্রত্যাবর্তনের এই মৌন ও বিষাদ ঘনীভূত হয়ে উঠল ধনঞ্জয়ের যোগদানে, আর সেই সমবেত শোক সহসা অশ্রুসিক্ত বেদনায় সংগীতের উৎসারণে কী নির্বিড় রোমাঞ্চিত নাট্যপুলক সৃষ্টি করল এই সমাপ্তি-সংগীতে—

আমি ফিরব না রে ফিরব না আর ফিরব না রে
এমন হাওয়ার মুখে ভাসল তরী
কূলে ভিড়ব না আর ভিড়ব না রে।

উপযুক্ত নাট্যপরিস্থিতিতে স্বরচিত কাব্যসংগীত যে কী গভীর ভাবঘনতা সৃষ্টি করতে পারে, ধনঞ্জয়ের গানগুলি তারই উদাহরণ। ধনঞ্জয়ের নীরব সহিষ্ণুতা ও অহিংস প্রতিরোধের কঠিনতা তাঁর আচরণে যতটা প্রত্যক্ষ তার চেয়ে বেশি সার্থক হয়ে উপলব্ধ হয় তাঁর স্বেচ্ছাগীতে—বিশেষত 'আরো আরো প্রভু আরো আরো', 'আমাকে যে বাঁধবে ধরে', 'বাঁচান বাঁচি মারেন মরি', 'আমারে পাডায় পাডায় খেপিয়ে বেডায়', 'ওরে আগুন আমার ভাই', 'রইল বলে রাখলে কারে' প্রভৃতি কাব্যগীতে। প্রায়শ্চিত্ত নাটকের সর্বশ্রেষ্ঠ গান 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ'। এই গানটির নিরাসক্ত ঔদাস্যের সুরে নাটকটির মর্মবাণী অপরূপ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রতত্ত্বনাট্যের একটি বিশেষ প্রকৃতি ইতিহাসাশ্রিত প্রায়শ্চিত্ত নাটকেও প্রকাশিত হতে স্বরু করেছে, এই গানই তার প্রমাণ। একটি জীবনপথের মুক্ত আহ্বান এই নাটকখানিতে আগাগোড়া শোনা যায়। পথের সেই আহ্বান গীতাঞ্জলি যুগের গানে আছে, শারদোৎসবে আছে ছেলেদের গানে 'আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ নেব রে লুঠ করে।' শারদোৎসবে বিজয়াদিত্য সিংহাসন ছেডে পথে নেমে এসেছিলেন। প্রাযশ্চিত্তে হৃদযহীন প্রতাপাদিত্য পর্যন্ত উপলব্ধি করেছেন—

প্রতাপ। বৈরাগী, আমার এক একবার মনে হয় তোমার ওই রাস্তাটাই ভালো—আমার এই রাজ্যটা কিছু না।

ধনঞ্জয়। মহারাজ, রাজ্যটাও তো রাস্তা। চলতে পারলেই হল। ওটাকে যে পথ বলে জানে সেই পথিক ; আমরা কোথায় লাগি ? তাহলে অনুমতি যদি হয় তো এবারকার মত বেরিয়ে পড়ি। (৪।৭)

পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে এই পথের আহ্বান আরো উদাত্ত হয়ে উঠেছে, 'আজ রাস্তায় মিলন হবে' বলে ধনঞ্জয় উদয়াদিত্যকে আলিঙ্গন করেছেন। এই সময়ে ধনঞ্জয়ের সংলাপ আর নাট্যসংলাপ নয়, তা যেন কবির একটি বিশেষ জীবনাদর্শেরই বাহন হয়ে উঠেছে—

'আমি তাঁর রাস্তার ছেলে—রাস্তার কোলেই দিন কেটে গেল—দিনরাত্র একেবারে ধুলোয় ধুলোময় হয়ে বেডাই—মায়ের আদরে একেবারে লাল হয়ে উঠি।'

এই রক্তিম মাতৃস্নেহপ্রতিম ধূলির অপরূপ সংগীত 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ'। এই রাঙা মাটির পথ অসীম বৈরাগ্যের দিকে পাড়ি-দেওয়া নিমন্ত্রণের চিঠি মেলে ধরেছে নাটকের শেষ দৃশ্যে—সেখানে সকলেই কেবল যাত্রী, কোথাও

স্থিতি নেই, 'আমি ফিরব না আর'। 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ' গানে যার বোধন, 'আমি ফিরব না আর' গানে তারই বিসর্জন। প্রায়শ্চিত্ত নাটকে বৈরাগ্যের ধূসর উদাসীনতা বাউলাঙ্গ সুরে আরও লোকায়ত, জীবননিষ্ঠ, মৃত্তিকাসন্নিধ ও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর্ব থেকে যে লোকসংগীতের সুর ও জীবনাদর্শ রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শে প্রবেশ করেছিল, প্রায়শ্চিত্ত নাটকে তারই দার্শনিক মূর্তির নাম ধনঞ্জয় বৈরাগী।

প্রায়শ্চিত্ত নাটকের বহুপূর্বে কেদারনাথ চৌধুরী বৌঠাকুরানীর হাট উপন্যাসের নাট্যরূপ দান করেছিলেন 'রাজা বসন্তরায়' নামে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নাটকটি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।[১০] অবিনাশচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন, "এই সময়ে যে কয়খানি নাটক অভিনীত হয় তন্মধ্যে কেদারবাবু কর্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বউঠাকুরানীর হাট খুব জমিয়াছিল। প্রবীণ অভিনেতা স্বর্গীয় রাধামাধব কর বসন্তরায়ের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সুমধুর সংগীতে দর্শকগণকে মুগ্ধ করিযাছিলেন"।[১১] রাজা বসন্ত-রায়ের গানগুলি জনপ্রিয় হযেছিল তার প্রমাণ সমকালীন কযেকটি নাট্যগীত-সংকলনে রাজা বসন্তরাযের গান সংকলিত হতে দেখি। চিৎপুর বেঙ্গল লাইব্রেরি প্রকাশিত 'থিযেটার সংগীত' (১৩২৮) গ্রন্থে এই গানগুলি আছে। এই গানগুলি বৌঠাকুরানীর হাটের গানগুলিরই অনুরূপ, কেবল 'কবরীতে ফুল শুকাল' এই গানটি নেই (গীতবিতানের গ্রন্থপরিচয়ে উদ্ধৃত)। তাছাডা বসন্ত-রায় নাটকে আর একটি নতুন গান পাওয়া যায়—'মা আমি তোর কী করেছি' (রবিচ্ছায়া গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত)। প্রায়শ্চিত্ত নাটকে কবি 'রাজা বসন্তরায়ে'র সব গান গ্রহণ করেননি, এই তথ্যটি লক্ষণীয়।

৭

রাজা (১৩১৭) প্রায়শ্চিত্তের অব্যবহিত পরবর্তী নাটক এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাংকেতিক বা তত্ত্বনাটক। সমাজজীবনের প্রাত্যহিক বাস্তবতা থেকে নাটককে সরিযে এনে কবি তাকে স্থাপন করেছেন আপন চিত্তলোকের এমন এক নিভৃত কল্পনারাজ্যে যেখানে বাস্তবতার সত্য আছে, তথ্য নেই, যেখানে ইঙ্গিতে সংকেতে ব্যঞ্জনায় অসীমের সীমা রচনা হয়। পূর্ববর্তী নাটকে সংগীত খানিকটা নাট্যপ্রয়োজনে, কিছুটা দর্শক মনোরঞ্জনে ব্যবহৃত হলেও তত্ত্বনাট্যে সংগীত সম্পূর্ণই ব্যঞ্জনাপুষ্টির সহায়তায় ব্যবহৃত হয়েছে। এখন 'গান কেবল

অলংকরণের দায়িত্বই নিল না, কোনো একটি বিশেষ নাট্য-মুহূর্তের মর্মমর্মর হয়েই আত্মবিকাশ করল না, এরা নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দেখা দিল'।[১২] এইজন্যই সাংকেতিক নাটকের গানকে 'ভাবের সিংহদ্বার খোলবার জন্য সোনার চাবিকাঠি' বলা হয়। অবশ্য অনেকে মনে করেন সাংকেতিক নাটকে গান একটা বাহুল্য মাত্র, কারণ যেখানে মিতব্যয়িতা ও সংযম, স্বল্পবাক্ ইঙ্গিত ও স্তব্ধতার ভাবপ্রকাশ এই জাতীয় নাটককে সার্থক করে তোলে, সেখানে সংগীত দায়িত্বহীন আরোপ হযে উঠতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক সম্পর্কে এই ব্যাখ্যা গ্রাহ্য নয। তাঁর তত্ত্বনাট্যে অধ্যাত্মজীবন বা পরলোকের ইঙ্গিত নেই, তিনি প্রধানত অসীম জীবনের রূপকার। দৃশ্যে-গন্ধে-গানেই সেই অসীমের প্রকাশ, সুতরাং সংগীতের ভাষা ও সুরে কবি তাকে অন্যান্য নাট্যসংকেতের চেযে অধিকতর স্বচ্ছভাবে ব্যক্ত করতে পারেন।

রাজা নাটকখানি গীতাঞ্জলির যুগে রচিত এবং গীতাঞ্জলির ভাবলোকের অঙ্গীভূত বা তার সঙ্গে প্রবলভাবে সম্পৃক্ত। পৃথিবীর উর্ধ্বলোকের মাধ্যাকর্ষণ-বিহীন শূন্যতাকে যদি গীতাঞ্জলির আধ্যাত্মিক ভাবমণ্ডলের সঙ্গে উপমিত করা যায়, তবে রাজা সেই শূন্যমার্গে প্রথম উৎক্ষিপ্ত উপগ্রহ। রাজা নাটকের একটি গান 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' গীতাঞ্জলিতে আছে। আবার গীতাঞ্জলির অনেক গানেই রাজার রথচক্রধ্বনি শোনা যায়, হয়ত বা গীতাঞ্জলির পুর্বে নৈবেদ্যের যুগ থেকেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে-গানে রাজার অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করি। নৈবেদ্যের ১, ৫, ২৭, ৩৪, ৩৭, ৩৯, ৪১, ৪৯, ৫৩ সংখ্যক কবিতায় রাজা শব্দটি তার যথাযথ আনুষঙ্গিক নিয়ে উপস্থিত। রাজা-র রূপকল্প খেয়ার 'শুভক্ষণ' 'ত্যাগ' 'আগমন' 'দান' 'কৃপণ' 'মিলন' প্রভৃতি কবিতায় ঈশ্বরের সমার্থক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। খেয়ার উক্ত কবিতাগুলিতে যে স্বর্ণরথারূঢ় রাজমূর্তির চিত্র, গীতাঞ্জলির একটি গানে তাকে সুন্দর বলে সম্বোধিত করা হলেও আগমনদৃশ্যটি রাজকীয়ই বটে। এই প্রসঙ্গে গীতাঞ্জলির ৫৬, ৫৮, ৬৭, ১২২ সংখ্যক গানগুলি দ্রষ্টব্য। নৈবেদ্যের একাধিক কবিতায় রাজা রাজেন্দ্র রাজন শব্দের প্রয়োগ ছাড়াও কবির জীবনেশ্বরের একটি বিশ্বব্যাপ্ত মহৈশ্বর্যপট লক্ষ্য করা যায়। রাজা সেখানে শুধু প্রভু বা নাথের সমার্থক নয়, রাজার অনুষঙ্গগুলি আরও ব্যাপক। কবি কখনও রাজার সঙ্গে সভার উল্লেখ করেছেন, কখনও রাজকোষের প্রসঙ্গ এসেছে, কখনও এই রাজা শাসনদণ্ডদাতা—

তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে। প্রত্যেকের পরে
দিয়েছ শাসনভার হে রাজাধিরাজ। (নৈবেদ্য ৭০)

এরই সঙ্গে একাত্ম করে মনে পড়ে রাজা নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে ঠাকুরদাদার গান 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে'। আবার নৈবেদ্যের ৭৬ সংখ্যক কবিতাটি যেন ঐ গানেরই ভাষ্য।

রাজা সংগীতমুখ্য নাটক। এই নাটকের দৃশ্যপটে অন্ধকার, সংলাপে সুরই প্রধান। পূর্ববর্তী নাটকে সংগীতের গুরুত্ব, রাজা নাটকে সংগীতের গূঢ়ত্ব। গীতাঞ্জলির ১৩২ সংখ্যক পদে কবি বলেছেন—

গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি বাহির মনে
চিরদিবস মোর জীবনে।
নিয়ে গেছে গান আমারে ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে
গান দিয়ে হাত বুলিয়ে বেড়াই এই ভুবনে।

রাজা নাটকের পাত্রপাত্রীও গান দিয়ে রাজাকে খুঁজেছেন, গান দিয়েই তাঁরা জীবনের সর্বত্র হাত বুলিয়েছেন। এমন কি রাজাও এই নাটকে গান গেয়েছেন। গানই এই নাটকের সংলাপের বিকল্প। আত্মাবগাহন ও প্রণতি, নম্র ভক্তিরস ও আবিষ্টতা, প্রশান্ত আত্মসমর্পণ ও ঈশ্বরচেতনা রাজার গানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রাজার মোট গীতসংখ্যা ২৬টি—পূর্বযুগের গীতিনাট্য ব্যতীত অন্য কোনো রবীন্দ্রনাট্যে এ পর্যন্ত এত গান ব্যবহৃত হয়নি। এর ভিতর সুরঙ্গমার গান ৮টি, রাজার কণ্ঠে ২টি, সুদর্শনার ১টি, ঠাকুরদাদা ও অনুচরবৃন্দের ১১টি, বাউল ও পাগলের ৩টি এবং বালকের ১টি গান। রাজা নাটকের প্রথম গান নেপথ্যচারী রাজার কণ্ঠে 'খোলো খোলো দ্বার'। এ গান রাজা নাটকের অনেক পূর্বেই কবির রচনায় আভাসিত। ইতিপূর্বে উল্লিখিত নৈবেদ্যের ৫ সংখ্যক কবিতা 'যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার', খেয়ার শুভক্ষণ, গীতাঞ্জলির ৫৬ সংখ্যক কবিতা 'তব সিংহাসনের আসন হতে এলে তুমি নেমে', ৬৭ সংখ্যক 'সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে' এবং ১২১ সংখ্যক 'তাই তোমার আনন্দ আমার পর'—এইগুলিতেই রাজার প্রথম গানটির বক্তব্য ধ্বনিত। পূর্ববর্তী ও অন্যান্য সমকালীন রচনাগুলিতে যা কবির পক্ষ থেকে, রাজা নাটকে তাই রাজার পক্ষ থেকে গীতায়িত। বিশ্বেশ্বর এসেছেন প্রেমিক-রূপে ভক্তের একান্ত দুয়ারে,

তাঁকে অভ্যর্থনার আয়োজনে যেন ত্রুটি না হয়—এই ভাবটি আলোচ্য গানে ফুটে উঠেছে।

সাংকেতিক নাটকে অরূপ তত্ত্বকে ইঙ্গিতবাহী করার জন্য সূক্ষ্ম সুরের অভিব্যক্তি সর্বাধিক কাজে লাগে। এখানে চরিত্রের পক্ষে সংগীতানুশীলনের অধিকার, শ্রোতার পক্ষে সংগীতের রসগ্রহণের অধিকার এবং প্রসঙ্গের পক্ষে গীতোপযোগিতার অধিকার বড় কথা নয়। এখানে নাট্যকারের পক্ষে ইঙ্গিতের অধিকারই চরম। গানগুলি পরিবেশনির্ভর হলেও সে পরিবেশ ঘটনাসাপেক্ষ নয়। 'মানস সরসে রসপুলকে পলকে পলকে' যখন ঢেউ তুলে ওঠে, তখনই গানের 'কমলমুকুলদল' খুলে যায়। মনোলোকের অশ্রুতবচন গানের দ্বারা বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। সংলাপের অপূর্ণতা, চরিত্রের চেষ্টিতের অসংলগ্নতা গানে পরিপূর্ণতা লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের গানের ভাবরূপ এবং ধ্বনিরূপ যাঁদের পূর্বতন সংস্কারে গৃহীত হয়েছে, তাঁদের পক্ষেই রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংগীতের রস পূর্ণভাবে উপভোগ করা সম্ভব।

রাজা নাটকের গানগুলি এই বিশেষ অর্থে সাংকেতিক, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এ নাটকে তিনি, সুদর্শনার প্রতি নেপথ্যচারী অন্ধকারের রাজার মত, হাত দিয়ে দ্বার খুলতে চাননি, গান দিয়ে দ্বার খুলতে চেয়েছেন। রাজা অন্ধকারের নাটক, গানই সে অন্ধকারের আলোকরশ্মি। সমগ্র রবীন্দ্রনাটকের প্রতিপাদ্য ভাব বা তত্ত্বের উপর আলোকপাত করে সমগ্র ভাবটির ঔজ্জ্বল্যসাধনই তাঁর নাটকে সংগীতের প্রধান ভূমিকা। এই নাটকের কতকগুলি গান যেন সমগ্র নাটকের ভাবগ্রন্থিটিকে খুলে দেয়। সুরঙ্গমার 'এ যে মোর আবরণ', 'অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ', ঠাকুরদাদার 'আমরা সবাই রাজা', বাউলের 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে', ঠাকুরদাদার 'বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা', সুদর্শনার 'কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে', রাজার 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না' প্রভৃতি গানগুলি এই পর্যায়ের। এই শ্রেণীর গান গায়কের ব্যক্তিত্বনির্ভর নয়, কিংবা ঘটনার অনিবার্য ফলশ্রুতিরূপে গীত হয়নি। এই শ্রেণীর গান নাট্যকারের মূলগত মনোভাবটির দ্যোতক এবং প্রায় সবক্ষেত্রেই নাটকের প্রসঙ্গচ্যুত। সবগুলি গানই অরূপ রাজার তত্ত্ববাহী। আভাসে ইঙ্গিতে কবি তাঁর জীবনসাধনার কেন্দ্রপুরুষটিকে বোঝাতে চেয়েছেন। যে চরিত্রের মুখেই কাব্যগীতি যোজিত হোক না কেন, এই গানগুলি কবিরই কণ্ঠ। ২য় দৃশ্যে বাউলের কণ্ঠে 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে' গানটির

উদাহরণ নেওয়া যাক। দৃশ্যটিতে জনার্দন-কৌণ্ডিল্য-ভবদত্তের মূঢ় বিসংবাদের মধ্যে বাউলের প্রবেশের কোনো অনিবার্য প্রয়োজন ছিল না। বরং এখানে বাউলের বেশে যেন নাট্যকার স্বয়ং প্রবেশ করে সমগ্র নাটকের মূল ভাবটি ঘোষণা করেছেন। বাউলের গানে রাজার যে সর্বত্রগামিতার প্রচার, ঠাকুরদাদার 'আমরা সবাই রাজা' গান সেই সর্বত্রগামীর সার্বভৌম গণতান্ত্রিক অধিকারদানের ঘোষণাপত্র। নাটকে ঠাকুরদাদার মত সুরঙ্গমা সেবার মধ্য দিয়ে রাজার স্বরূপ উপলব্ধি করেছে বলে 'এ যে মোর আবরণ' গানে সে রাজার বলদীপ্ত আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়েছে এবং 'কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে' গানে সেই রাজকীয় মহাসত্তাকে যে কোনো সংকীর্ণ সংজ্ঞায় জানা যায় না, সেই সতর্ক অভিজ্ঞতা প্রচার করেছে—

> চেয়ে দেখিস না রে হৃদয়দ্বারে কে আসে যায়,
> তোরা শুনিস কানে বারতা আনে দখিনাবায়।
> আজি ফুলের বাসে সুখের হাসে আকুল গানে
> চির- বসন্ত যে তোমারই খোঁজে এসেছে প্রাণে।
> তারে বাহিরে খুঁজি ঘুরিবা বুঝি পাগলপ্রায়
> তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।

এই দিক দিয়ে রাজা ও বসন্ত সমার্থক। রাজা যেমন সর্বময় হয়েও অদৃশ্য সর্বত্রগামী, ঐশ্বর্যের বাহ্যাড়ম্বরে তাঁকে দেখা যায় না, তেমনি বসন্ত, অন্তরে তারও রিক্ততা ও বৈরাগ্য। ঋতুরাজ বসন্তের স্বরূপ রাজারই স্বরূপ। 'বসন্তে কি শুধু কেবল' গানে বলা হয়েছে 'চরণে তার লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলা'। 'মোদের কিছু নাই রে নাই' গানেও এই তত্ত্ব ধ্বনিত—

> এ যে বসন্তরাজ এসেছে আজ, বাইরে তাহার উজ্জ্বল সাজ
> ও রে অন্তরে তার বৈরাগী গায়—তাইরে নাইরে নাইরে না।

'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না' গানটি কেবল সুরঙ্গমার প্রতি রাজার উক্তি নয়, এই ক্ষুদ্র নিরুপম কাব্যসংগীতটি রবীন্দ্রনাথের রাজা নাটকে তিনটি তাৎপর্যের সূত্রধর। প্রথম, এই গানে সুরঙ্গমার প্রতি রাজার প্রেমাদর্শ ও তার স্বরূপ বিজ্ঞাপিত। দ্বিতীয়, প্রেমের দেবতা বাহিরের ঐশ্বর্যের দ্বারা মনোহরণ করেন না, অন্তরের গভীর প্রেমসম্পদের দ্বারা তিনি আমাদের আপন করেন, এ কথা এই গানের বক্তব্য। তৃতীয়, রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় সংকেতমূলক নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রেই সংগীতের প্রয়োজনীয়তা কতখানি একথাও এই গানে

প্রকাশিত হয়েছে। গীতবিতানে এই গানটিকে কবি প্রেমপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যসাহিত্যের প্রেমতত্ত্বই এই গানটির মধ্য দিয়ে বাণীরূপ লাভ করেছে।

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার গান দুটি 'এ অন্ধকার ডুবাও তোমার' এবং 'অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে' অন্ধকারের রাজার অন্তরস্বরূপের ইঙ্গিতগ্রাহী। গীতাঞ্জলির অনেকগুলি গানেই অন্ধকারের পটভূমিকা আছে এবং অন্ধকারের ভিতর দিয়েই আলোকের উৎসর্পণ ঘটে, সে কথা কবি অনেক গানেই বলেছেন। যেমন—

নিশীথে ঘন অন্ধকারে ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে
দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান।
তোমার লাগি জাগেন ভগবান। (১৭ সংখ্যক)

'মেঘের পরে মেঘ জমেছে', 'আজি শ্রাবণঘন-গহন মোহে', 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার', 'বিশ্ব যখন নিদ্রামগন', 'সে যে পাশে এসে বসেছিল', 'এই করেছ ভাল নিঠুর' প্রভৃতি গানে নানাভাবেই অন্ধকারের পরিবেশ ঘনিয়ে এসেছে।[১৩] অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে গীতালির একটি গানও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো
সকল দ্বন্দ্ববিরোধ-মাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেই তো তোমার ভালো।

কতকগুলি গান নাটকীয় প্রসঙ্গের সঙ্গে যুক্ত থেকেও বৃহত্তর তাৎপর্য বিস্তার করেছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগীতির সৌকুমার্য থেকে সেগুলি বঞ্চিত নয়, অথচ নাটকে তাদের মধ্যে প্রসঙ্গ-ঘনিষ্ঠতাও সহজেই লক্ষ্য করা যায়। ঠাকুরদাদার তিনটি গান 'আজি দখিন-দুয়ার খোলা', 'আজি কমলমুকুলদল', 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' বসন্তবিষয়ক—বসন্তোৎসব রাজা নাটকের মূল প্রসঙ্গ। রানী সুরঙ্গমা রাজাকে চাক্ষুষ দর্শন করবে এই অভিলাষ প্রকাশ করেছিল। তার জন্য রাজ্যে ও রাজপুরীতে রাজা বসন্ত-উৎসবের আয়োজন করেছেন। রানী রাজাকে কোথায় দেখবেন, এই প্রশ্নের উত্তরে রাজা বলেছেন—

'যেখানে পঞ্চমে বাঁশি বাজবে, ফুলের কেশরের ফাগ উড়বে, জ্যোৎস্নায় ছায়ায় গলাগলি হবে—সেই আমাদের দক্ষিণের কুঞ্জবনে।'

কিন্তু সে দেখা যে সার্থক হতে পারে না-সুদর্শনা তা বোঝেনি, তাই বসন্ত-উৎসবের বাহ্যিক কোলাহলকেই রানী সত্য বলে ভুল করেছিল। ঠাকুরদা প্রথম থেকেই সেই বসন্তের আগমনীর সুরটি ধরিয়ে দিয়েছে, দক্ষিণের হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বালকবাহিনীকে নিয়ে রাস্তা ভাসিয়ে দিয়েছে বসন্তের গানে —এসো হে এসো হে এসো হে আমার বসন্ত এসো। কিন্তু ধীরে ধীরে বসন্তোৎসবের প্রকৃতি বদলে গেল, মত্ততার মধ্যে সমবেত হল সন্দেহ, কাশী-কোশল-কাঞ্চীর শত্রুতা, জনতার মধ্যে দেখা দিল বিভ্রান্তি। এ শুধু বসন্তকে ভুল দেখারই পরিণাম। কিন্তু সেই ভুল-দেখা না ঘটলে সত্যদর্শনও দুরান্বিত হত। তাই এই বসন্ত-উৎসবের বাহিরের মত্ততার সঙ্গে সঙ্গে বসন্তের গভীর রূপটি ঠাকুরদার কাছে সত্য হয়ে উঠেছে। 'আজি কমলমুকুলদল খুলিল' সেই সার্থক বসন্তের আগমনী এবং শেষ পর্যন্ত নাটকের প্রায় শেষ দৃশ্যে ঠাকুরদা সেই অন্তঃরিক্ত বৈরাগী বসন্তের সৌন্দর্যকে একেবারে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' গানে। এ বসন্ত কুঞ্জবনের মত্ত প্রলাপ, অধীর ভ্রমরগুঞ্জরণ, পুষ্পকেশরের হোলিখেলা মাত্র নয়, এ বসন্ত কবির ধ্যান-দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত বসন্তের এক আশ্চর্য রাজরূপ, অন্ধকারের রাজার মতই। এ বসন্তের আগমনে বনমাঝে নিবিড় বেদনা সঞ্চারিত হয়, বসুন্ধরা পথপার্শ্বে বাসকসজ্জিকার মত অপেক্ষা করে, একে রাজার মতই বলা যায়

ওগো সুন্দর বল্লভ কান্ত
তব গম্ভীর আহ্বান কারে।

পাগল বাউল বালক জাতীয় চরিত্র রবীন্দ্রনাটকে খানিকটা যাত্রার আঙ্গিককে স্মরণ করিয়ে দেয়, কারণ গান গেয়ে চলে যাওয়া ছাড়া এই সব চরিত্রের কোনো নাট্যপ্রয়োজন ছিল না। পাগলের 'তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই' এবং বালকদলের 'বিরহমধুর হল আজি মধুরাতে' গান দুটি প্রসঙ্গ-সম্পৃক্ত। রাজবেশী সুবর্ণের মনোহর রূপ ও কান্তি রাজপরিচয় অজ্ঞ পথিকদের মুগ্ধ করেছে, রাজার তানব দীপ্তি তাদের মুগ্ধদৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করেছে। এই বিভ্রান্তির ইঙ্গিত পাগলের গানে প্রকাশ পেয়েছে। প্রাসাদশিখর থেকে রাজদিদৃক্ষু রানী সুদর্শনা সুবর্ণকে রাজা মনে করে তার কাছে ফুল প্রেরণ করেছে, চাঁদের উদ্ভাসিত জ্যোৎস্নায় অন্তর মধুর বিরহে কম্পমান। কিন্তু সুদর্শনা যে মরীচিকাকে মরূদ্যান মনে করেছে, এ কথা বালকদের কণ্ঠের গানে দৈবসংকেতের মত বিজ্ঞাপিত—

ভরি দিয়া পূর্ণিমানিশা অধীর অদর্শনতৃষা
কী করুণ মরীচিকা আনে আঁখিপাতে।

কিন্তু এই গান কি বালকদের মুখে শোভা পায়?

কতকগুলি গান চরিত্রের ভাষ্য মাত্র। সাংকেতিক নাটকে চরিত্রগুলি যখন কোনো তত্ত্বের দোসর হয়, তখন চরিত্রের আচরণে ও কার্যকলাপে সেই চরিত্রের পূর্ণপরিচয় সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় না, আভাসে ইঙ্গিতে চরিত্রকে বোঝাতে হয়। সেক্ষেত্রে গানের সাহায্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। রাজা নাটকে রাজার অরূপ তত্ত্ব রাজার দুটি গানে ব্যাখ্যাত হয়েছে 'খোলো খোলো দ্বার' এবং 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না।' এই নাটকে যেহেতু সুরঙ্গমার সাধনা দাস্যভক্তির, ঠাকুরদার সখ্যভক্তির, সেইজন্য তাদের কোনো কোনো গান এই চরিত্রাদর্শ-নির্ণায়ক হয়ে উঠেছে। সুরঙ্গমার গানগুলিতে দাস্যের সেই সরল বিশ্বস্ত আত্মসমর্পণ, অকপট সেবাপরায়ণতা, চরণ-বরণের নিরুদ্‌বিগ্ন আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে 'আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী' এবং 'আমি কেবল তোমার দাসী' গানে। ঠাকুরদা বন্ধু সহচর, প্রয়োজন মত সেনাপতিও। এই ঠাকুরদা রবীন্দ্রনাথের নাটকে নূতন চরিত্র নয়। প্রায়শ্চিত্তের বসন্তরায় চরিত্রে সম্ভবত এর সূত্রপাত। তারপর শেষজীবন পর্যন্ত অধিকাংশ নাটকেই, একমাত্র নৃত্যনাট্যব্যতীত, এই জাতীয় আত্মভোলা, স্বভাব-বৈরাগী, আন্তর-প্রজ্ঞার আলোকে উদ্ভাসিত, পথের প্রেমিক, শিশুকিশোরযুবার অকপট বন্ধু, বয়োবৃদ্ধ কিন্তু চিরতরুণ দাদাঠাকুর-ঠাকুরদাদা চরিত্র দেখা যায়। ঠাকুরদাদার সংলাপ ক্ষণে ক্ষণে সংগীত হয়ে ওঠে। কবিকেশরী তাঁর নামে গান বাঁধেন—

যেখানে রূপের প্রভা নয়নলোভা
সেখানে তোমার মতন ভোলা কে ঠাকুরদাদা।
যেখানে রসিকসভা পরম-শোভা
সেখানে এমন রসের ঝোলা কে ঠাকুরদাদা।

নৃত্যের ছন্দে তাঁর বন্ধনমুক্তি ঘটে, হাসিকান্না হীরাপান্না দুলে ওঠে, ছন্দ ও ভালোমন্দ একসঙ্গে উন্মথিত হয়—

নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
কী আনন্দ কী আনন্দ কী আনন্দ
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ—

সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।

এই আশ্চর্য কাব্যগীতিটি ঠাকুরদাদার কাণ্ঠে সমর্পণ করে কবি নিশ্চিতভাবে ঠাকুরদাদার সঙ্গে তাঁর সাময়িক একাত্মতা ঘোষণা করেছেন।

৮

১৩১৮ সালের আশ্বিনের প্রবাসীতে অচলায়তন সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়েছিল, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা কবির পত্রে (রবীন্দ্র রচনাবলী ১১শ খণ্ড, গ্রন্থপরিচয়) জানা যায় ঐ বৎসর জুলাইয়ের পূর্বেই নাটকটি রচিত হয়। নাটকের পট-ভূমিকায় গ্রীষ্মাবসান ও বর্ষাবির্ভাবের ইঙ্গিতও সেই সাক্ষ্য দেয়। অচলায়তন রূপক নাটক। রবীন্দ্রনাথের ভাবমুখী তত্ত্বনাট্যের যাবতীয় বিশেষত্বই এতে প্রতিফলিত। তবে অচলায়তনে রাজার মত অধ্যাত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়নি, এখানে ভারতবর্ষীয় আচারসর্বস্ব হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতাকে বিদ্রূপ করা হয়েছে। "জগতের যেখানেই ধর্মকে অভিভূত করিয়া আচার আপনি বড় হইয়া উঠে, সেখানেই মানুষের চিত্তকে সে রুদ্ধ করিয়া দেয়, এটা একটা বিশ্বজনীন সত্য।" সেই রুদ্ধচিত্তের বেদনাই অচলাগতন নাটকের মূল সুর। এই নাটকেও যথাবিধি সংগীতের ব্যবহার ঘটেছে এবং গানের ভিতর দিয়েই অনেক ক্ষেত্রে নাট্যবস্তুর আভাস পাওয়া যায়। চরিত্রনির্বিশেষে গানের প্রয়োগ ছাড়াও দাদাঠাকুর-জাতীয় চরিত্র পূর্ববর্তী ধনঞ্জয়-ঠাকুরদা প্রভৃতি চরিত্রের স্মারক। তবে গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যের যুগে লেখা হলেও অচলায়তনের গান-গুলিতে গভীর ভক্তিরস বিশেষ নেই, পূজা পর্যায়ে এই গানগুলি অন্তর্ভুক্ত—'তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে', 'এ পথ গেছে কোনখানে গো', 'আমি কারে ডাকি গো', 'সকল জনম ভরে ও মোর দরদিয়া', 'যিনি সকল কাজের কাজি', 'আমি যে সব নিতে চাই', 'আর নহে আর নয়'। এগুলির রচনারীতি গীতাঞ্জলি যুগের গানগুলির মত। অচলায়তনের পঞ্চক চরিত্রটি এই নাটকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, তার কণ্ঠেই সর্বাধিক গান সংযোজিত হয়েছে। অচলায়তনে সে মূর্তিমান বিদ্রোহ, অহেতুক উচ্ছ্বাস, অকারণ সংগীত, অবাঞ্ছিত মুক্তির আগ্রহ। তাই বাহির বিশ্বের আহ্বান সংগীত হয়ে তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। 'নববর্ষা-সমাগমের সমারোহ এবং আশা, প্রথম বারিপাতের সিক্ত অভ্যর্থনা এবং উল্লাস, পঞ্চকের কণ্ঠের ভাষায় ও সংগীতে প্রকাশ পাইয়াছে।'[১৪] নাটকে মোট ২৩টি

গানের মধ্যে পঞ্চকের কণ্ঠেই ১২টি গান। প্রথম দৃশ্যের সূচনাতেই পঞ্চকের কণ্ঠে 'তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে' নাটকখানির মর্মবাণী উদ্‌ঘাটিত করেছে। রুদ্ধগৃহে অবরুদ্ধপ্রাণ জীবনধর্মের নিকট মুক্তির আমন্ত্রণ ইঙ্গিতে ধ্বনিত হয়েছে মাত্র, কিন্তু সে আহ্বান তখনও অপরের নিকট বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি। অথচ বদ্ধ গৃহদ্বার অসহ্য বেগে ভগ্নপ্রায়, আকাশবাতাস ব্যাকুলতায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তাই পঞ্চকের পাঠে ভ্রান্তি ঘটে, নিষ্প্রাণ মন্ত্রোচ্চারণ নিষ্ফল হয়, অচলায়তনের জীবন যন্ত্রণাক্ত হয়ে দেখা দেয়, আনন্দের আহ্বান বৃথাই দ্বারে করাঘাত করে। এই সুন্দর কাব্যসংগীতটির ভাষায় ছন্দে ও সুরে সেই বদ্ধপ্রাণের মুমুক্ষা গীতায়িত হয়েছে। অথচ পঞ্চকের মনেও দ্বিধা আছে সংশয় আছে, প্রথার দাসত্বকে তখনও সে মিথ্যা বলে মানতে জানে না, তখনও জাতি-বর্ণ-আচার সম্পর্কে পুরাতন শিক্ষার নৈষ্ফল্য সে অনুভব করেনি। কেবল অন্তরের আর্তনাদ, বাহিরের প্রক্ষেপ—এই দুইয়ের সামঞ্জস্যহীন দ্বন্দ্বে এক একবার তার ক্ষতবিক্ষত প্রাণ ব্যথায় বিদীর্ণ হতে চেয়েছে, কখনও বা নূতন জীবনবরণের আগ্রহে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। পঞ্চকের কণ্ঠে দুই জাতীয় গানই আছে। প্রথম ধরনের গান, অর্থাৎ যেখানে দ্বন্দ্বমথিত অন্তরের বহির্মুখিতায় ভাষা বিষণ্ণ—'তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে', 'দূরে কোথায় দূরে দূরে', 'এ পথ গেছে কোনখানে গো কোনখানে', 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে', 'আমি কারে ডাকি গো', 'সকল জনম ভরে ও মোর দরদিয়া'। দ্বিতীয় ধরনের গান, অর্থাৎ সংশয়হীন চিত্তের উল্লাস গানের ভাষায় সুরে প্রতিফলিত—'আজ যেমন করে গাইছে আকাশ', 'এই মৌমাছিদের ঘরছাড়া কে করেছে', 'হারে রে রে রে রে আমায়', 'ওরে ওরে আমার মন মেতেছে', 'আর নহে আর নয়'।

এই নাটকে দাদাঠাকুর ঠিক সংগীতসর্বস্ব চরিত্র নয়, মাত্র দুটি গান তাঁর কণ্ঠে আছে। দাদাঠাকুর সম্পর্কে শোণপাংশুদের গান 'এই একলা মোদের হাজার মানুষ' রাজা নাটকের ঠাকুরদা-সম্পর্কীয় 'যেখানে রূপের প্রভা নয়ন-লোভা' গানটির সগোত্র। শোণপাংশুদের কণ্ঠে একটি কৃষিবিষয়ক, আর একটি শ্রমবিষয়ক গান আছে—'আমরা চাষ করি আনন্দে' এবং 'যিনি সকল কাজের কাজি মোরা তাঁরই কাজের সঙ্গী'। দুটি সৃষ্টি সার্থক এবং পরবর্তীকালে এই ধরনের কর্মসংগীত রচনার পথিকৃতের মর্যাদা পেতে পারে। দর্ভক দলের 'উতল ধারা বাদল ঝরে' রবীন্দ্রনাথের বর্ষাগীতি হিসাবে বিখ্যাত। পরবর্তী বর্ষামঙ্গলে এই গানটি অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছে কিন্তু দর্ভক দলের মুখে এটি

সুপ্রযুক্ত হয়নি। অচলাতনের বালকদের 'আলো আমার আলো' রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ সংগীত। প্রবুদ্ধ আলোর এই উদাত্ত জয়মন্ত্রকে গানের বলিষ্ঠ সুরে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছেন কবি এই গানে। রাজা নাটকে ছিল অন্ধকারের মর্মগীতি, অচলায়তনে আলোর। আলোকে আঁধারে মিলিয়ে দিল গানের সুর, অন্ধকারের অন্তর থেকে আলোকের আকাশে উৎসারিত হল সংগীত।

১৩২৮ পৌষ-সংক্রান্তির দিন মুক্তধারা নাটক রচনা সমাপ্ত হয়েছে এবং ১৩২৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে নাটকটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছে। ৪ মাঘ ১৩২৮ তারিখে রাণু অধিকারীকে লেখা পত্র থেকে জানা যায়, কবি নাটকটি এক সপ্তাহ ধরে লিখে সদ্য সমাপ্ত করেছেন এবং এর পূর্বপরিকল্পিত নাম ছিল 'পথ'। মুক্তধারার কাহিনী নূতন, কিন্তু পূর্ববর্তী প্রায়শ্চিত্ত নাটকের কথা অনিবার্যভাবে এতে এসে পড়ে। প্রায়শ্চিত্ত ১৩১৬ সালে বৌঠাকুরানীর হাট অবলম্বনে লিখিত হয়। কিন্তু উপন্যাসের তুলনায় নাটকে কিছু নূতনত্ব ছিল, তার মধ্যে ধনঞ্জয় বৈরাগীর অন্তর্ভুক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্রটি পথ বা মুক্তধারা নাটকেও দেখা গেল। অথচ পূর্বোল্লিখিত চিঠিতেই কবি লিখেছিলেন—

"এ নাটকটা প্রায়শ্চিত্ত নয়, এর নাম পথ। এতে কেবল প্রায়শ্চিত্ত নাটকের সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী আছে আর কেউ নেই—সে গল্পের কিছু এতে নেই, সুরমাকে এতে পাবে না।"

অবশ্য আর কিছু না থাকলেও ধনঞ্জয় বৈরাগী, তার অহিংস প্রতিরোধ আদর্শ, কণ্ঠে গান (যা আবার প্রায়শ্চিত্ত নাটক থেকেই গৃহীত), জনগণকে বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করার ভঙ্গি—এ সবই প্রায়শ্চিত্ত থেকে মুক্তধারায় গৃহীত হয়েছে। সুতরাং অচলায়তন থেকে গুরু বা শারদোৎসব থেকে ঋণশোধের মত রূপান্তর না হলেও মুক্তধারা যে কবির এক মৌলিকসৃষ্টিবিরল রূপান্তর-যুগের রচনা, মুক্তধারায় তার প্রমাণ যথেষ্ট আছে। মুক্তধারার কোথাও কোথাও, যেমন মহারাজের সম্মুখে গুরু ও ছাত্রদের সংলাপে, অচলায়তনেরও প্রভাব আছে। তৎসত্ত্বেও মুক্তধারা থেকেই রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ আবার সক্রিয় হয়েছে, যার বিপুল সার্থকতা রক্তকরবীতে।

প্রায়শ্চিত্তের প্রভাব মুক্তধারা রচনায় যে আরও এক ব্যাপারে সক্রিয় ছিল

তার প্রমাণ এই নাটকের পথ নামকরণ পরিকল্পনায়। বৌঠাকুরানীর হাটকে প্রায়শ্চিত্তে পরিণত করার সময়ই পথের প্রতি কবির আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। গীতাঞ্জলিতে কবি বারবার পথের গান ও আহ্বান রচনা করেছেন। ধনঞ্জয় বৈরাগী সুরমা বিভা উদয়াদিত্য সবাই শেষ দৃশ্যে পথেই বেরিয়ে পড়েছিল। তাই 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথে'র গৈরিক ধূসরতা উক্ত নাটকের শেষ দৃশ্যে সঞ্চারিত হয়ে 'আমি ফিরব না রে ফিরব না আর' এই গানে ঘনীভূত আবেগে ঝংকৃত হয়ে উঠেছিল। মুক্তধারা নাটকেও গানটি জনৈক বাউলের মুখে 'ও তো ফিরবে না রে ফিরবে না আর' এই পাঠান্তরে আছে। সেই পথিক চিত্তের আকাশ-খাওয়া সুরই মুক্তধারায় ধনঞ্জয় বৈরাগী বহন করে এনেছে। ধনঞ্জয় বৈরাগীর কণ্ঠে 'আমি মারের সাগর পাড়ি দেব' এই গানটি যোজনা করার সময় কবি স্বয়ং পাদটীকায় সেই পৃষ্ঠায় লিখেছেন—

"এই নাটকের পাত্র ধনঞ্জয় ও তাহার কথোপকথনের অনেকটা অংশ প্রায়শ্চিত্ত নামক আমার একটি নাটক হইতে লওয়া। সেই নাটক এখন হইতে পনেরো বছরেরও পূর্বে লিখিত।"

কেবল ধনঞ্জয় বৈরাগী নয়, মুক্তধারা নাটকে যুবরাজ অভিজিতের প্রতি স্নেহপরায়ণ, দয়ার্দ্র, মহারাজ রণজিতের 'খুড়া মহারাজ বিশ্বজিৎ' চরিত্রও প্রায়শ্চিত্তের বসন্তরায়কে অনিবার্যভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। কেবল এখানে বসন্তরায়ের মত খুড়া মহারাজের হস্তে সেতার আর কণ্ঠে গান নেই। তবে এখানেও খুড়ার সঙ্গে রাজার বিরোধ। তাছাড়া অভিজিতের প্রতি প্রজাদের প্রীতিপূর্ণ মনোভাবও উদয়াদিত্যের কথা মনে করিয়ে দেয়।

মুক্তধারা নাটক থেকেই রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক-রূপক-তত্ত্বনাট্যে দৃশ্যবিন্যাসরীতি সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়েছে। রাজা নাটকেই কবি অঙ্ক-দৃশ্যের বদলে কেবল ১, ২, ৩ এইরূপ সংখ্যাচিহ্নের দ্বারা দৃশ্যবিভাগ করেছিলেন। ফাল্গুনীতে দৃশ্যবিভাগ আছে, কিন্তু তা একেবারেই নাট্যধর্মী নয়। মুক্তধারায় আগাগোড়া নাটক একই দৃশ্যে সংঘটিত। মুক্তধারার গানগুলির মধ্যে ভৈরবপন্থীদের ভৈরববন্দনা, উত্তরকূটবাসীর একটি যন্ত্র-বন্দনা ও বাউলের একটি গান ব্যতীত সমস্ত গানই ধনঞ্জয় বৈরাগীর। প্রায়শ্চিত্ত নাটকের 'আরো আরো প্রভু', 'আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়', 'আমাকে যে বাঁধবে ধরে', 'রইল বলে রাখলে কারে' এবং 'আগুন আমার ভাই' মুক্তধারাতেও আছে।

তাছাড়া 'আমি ফিরব না রে' গানের রূপান্তর 'ও তো আর ফিরবে না রে' গানটির কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

মুক্তধারা নাটকে ভৈরবপন্থীদের গান 'জয় ভৈরব জয় শংকর' এবং 'তিমির-হৃদ্‌বিদারণ' প্রকৃত পক্ষে একটি গান। নাটকে মুক্তধারার যন্ত্রবাঁধ ভাঙবার পরই একমাত্র ভৈরবপন্থীগণ গানটি সম্পূর্ণ গেয়ে গেছে এবং নাট্যযবনিকা পড়েছে। সমগ্র নাটকে ভৈরবপন্থীগণ খণ্ড খণ্ড ভাবে গানটি গেয়েছে, যেন অসমাপ্ত ভৈরব-উপাসনার ফলে একটি পদ আর একটি পদকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। মুক্তধারা নাটকে এই ভৈরবপন্থীদের গান সমস্ত নাট্যদৃশ্যকে আচ্ছন্ন করে আছে। যন্ত্ররাজ বিভূতি পর্বতশৃঙ্গের উপর যন্ত্রের যে অভ্রভেদী মহিমা স্থাপন করেছেন, তা যেন ভৈরবের প্রতিস্পর্ধী—মনুষ্যশক্তির দেবদ্রোহী ঔদ্ধত্যে আকাশ যেন খণ্ডিত হয়ে আছে। এই শক্তি যে অতিরেক, তার স্পর্ধিত প্রকৃতিবিরোধী ক্ষমতা যে ধ্বসে পড়বে, ভৈরবের ভয়ংকর প্রতাপে যন্ত্রের লেলিহান রসনার যে মৃত্যু ঘটবে, শংকরসেবীদের জলদগম্ভীর কণ্ঠনিঃসৃত ভৈরববন্দনা থেকে থেকে আসন্ন বিপ্লবের সংকেতের মত তা জানিয়ে দিচ্ছে এই গানের সুরে। রুদ্র দেবতা শংকরের প্রতি কবির সাংগীতিক জীবনের বহু নৈবেদ্য নিবেদিত হয়েছে—মুক্তধারার আগে ও পরে। ভৈরবপন্থীদের গান তারই অন্যতম। উত্তরকূট-নিবাসীগণ যন্ত্ররাজ বিভূতি ও তার নির্মিত যন্ত্রের সাফল্যে ভৈরবমন্দিরপ্রাঙ্গণে উৎসব করতে চলেছে, এই ঘটনার মধ্যে যেন একটি শ্লেষ আছে। এ যেন দেবতার বিরুদ্ধে মানুষের তৃষ্ণাজলহরণকারী দস্যুর উপাসনা, যন্ত্রের দানবীয় ক্ষমতাকে দেবতার নামে শোধন করার অপচেষ্টা। সেই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে দেবতার রোষ ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে ঘনিয়ে উঠেছে, আকাশের রক্তাভা সেই রুদ্রের ললাটবহ্নির পূর্বাভাস। সেই যে ভয়ংকর রুদ্র, যিনি মানুষের সৃষ্ট প্রলয়সম্ভাবনাকে ধ্বংস করেন, সংশয় ভেদন করেন, বন্ধন ছেদন করেন, সংকট হরণ করেন, সেই তিমিরহৃদ্‌বিদারণ জলদগ্নি-নিদারুণ শূলপাণির স্তবসংগীত দৃশ্যপটের সমস্ত কোলাহল-উত্তেজনাকে যেন থেকে থেকে এক অজ্ঞাত শিহরণে পূর্ণ করে তোলে। রক্তকরবী নাটকে আগাগোড়া যক্ষপুরীর ভীতিপ্রদ অন্ধকারে পেষণনিষ্কাশনের ত্রস্ত পরিবেশে যেমন দূর থেকে শ্যামা মৃত্তিকার আনন্দময় সংগীত 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' শোনা যায়, তেমনি এই ভৈরবসংগীত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে কোনো আবহসংগীতের নির্দেশ দেননি[১৫], কিন্তু ভৈরবপন্থীদের এই গান সেই আবহ-

সংগীতের মতই। যন্ত্ররাজ বিভূতিকে মাল্যভূষিত ও স্কন্ধারূঢ় করে উত্তরকূটের নাগরিকগণ যে যন্ত্রবন্দনাগীতটি গেয়েছে, তাও এই নাটকের জন্য বিশেষভাবে রচিত। এই গানের (নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র) ঘনপিনদ্ধ বাক্‌সম্পদ, সমাসজটিল শব্দের কঠিন গুরুভার, যান্ত্রিক সভ্যতার আরাধনে প্রযুক্ত অহংকৃত হৃদয়বৃত্তিহীন মানুষের নিষ্ঠুরতা ও দাম্ভিকতাকে পরোক্ষভাবে উদ্ঘাটিত করে দেয়।

প্রায়শ্চিত্ত নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগী ছিল সহিষ্ণু প্রতিরোধের মূর্ত প্রতীক, তার কণ্ঠে গান অপমান-লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে আত্মার ধিক্কৃত প্রতিবাদ হয়ে বেজে উঠেছিল। মুক্তধারা নাটকেও ধনঞ্জয় শিবতরাইয়ের লাঞ্ছিত নির্যাতিত মনুষ্যত্বের নীরব প্রতিবাদের অনুরূপ আদর্শ। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের তেজোদীপ্ত আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ প্রশংসা অর্জন করেছিল। প্রায়শ্চিত্তে যে চরিত্র ছিল কবির আপন চিত্তের গভীরতা থেকে বিশ্বস্তভাবে উৎসারিত, পরবর্তী ভারত-ইতিহাস সেই বিশ্বাসকে সত্য করে তুলল। সুতরাং মুক্তধারায় ধনঞ্জয় কেবল আদর্শ নয়, কল্পনা বা স্বপ্ন নয়, ঐতিহাসিক বাস্তবতার পটভূমি হয়ে উঠেছে। তাই ধনঞ্জয়ের সংলাপ ও সংগীত, আবির্ভাব ও আন্দোলনের ভঙ্গিটি নাটকে আশ্চর্য গতি ও ছন্দ সঞ্চার করেছে। ধনঞ্জয়ের কণ্ঠে কবি যে কয়টি নূতন গান যোজনা করেছেন, তার সবগুলিই এই নূতন অহিংস প্রতিরোধের প্রত্যক্ষতা থেকে অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেছে। ধনঞ্জয়ের প্রথম গান 'আমি মারের সাগর পাড়ি দেব'। নির্ভীক হৃদয়ের দুঃসাহস এবং সহিষ্ণুতার অনমনীয় বীর্য সম্বল করে মারের সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার এই বীরোদাত্ত গর্জমান আহ্বান কেবল কবির স্বপ্নকল্পনা থেকে জাগতে পারে না, একটি বিদ্যুদ্‌গর্ভ ব্যক্তিত্বের অরণিসংঘর্ষেই যেন এই গানখানি এমন বজ্রস্তনিত হয়ে উঠেছে। মহাত্মা গান্ধীকে বারবার কারারুদ্ধ করার জন্য কবি ব্যথিত হয়েছিলেন। যেন সেই অপরাভূত আত্মার পক্ষে অসম্ভাবিত বন্ধনকে তুচ্ছ করার জন্যই ধনঞ্জয়ের কণ্ঠে এই গান—

আমাকে যে বাঁধবে ধরে এই হবে যার সাধন,
সে কি অমনি হবে ?
আমার কাছে পড়লে বাঁধা সেই হবে মোর বাঁধন
সে কি অমনি হবে ?

প্রায়শ্চিত্তে ধনঞ্জয় কেবল কবিজীবনের একপ্রকার আদর্শেরই রূপক চরিত্র

ছিল, কিন্তু মুক্তধারা নাটকে চরিত্রটি ক্রমশ রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। রাজা নাটকে রাজার সত্তা ছিল দ্বিবিধ। একদিকে তিনি অন্ধকারের অন্তর থেকে উৎসারিত আলো, পরমাত্মা, পরমপ্রিয় ঈশ্বর। অন্যদিকে তিনি রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা, আদর্শ শাসক, সর্বশক্তিমান নরপতি। এই সামাজিক-রাষ্ট্রিক রাজার স্বরূপ সম্পর্কেই ঠাকুরদা গেয়েছিলেন 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে'। আদর্শ রাষ্ট্রাধিপতি যে দেশের প্রজাগণকে গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীন স্বাতন্ত্র্য দান করবেন, এ বিশ্বাস কবির সামাজিক চৈতন্যে দীর্ঘকাল জাগরূক ছিল। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় জীবনে সে বিশ্বাস ধূলিকীর্ণ মরীচিকায় পর্যবসিত হল। তাই ধনঞ্জয় বৈরাগীকে আবার নাটকে ফিরে আসতে হল, স্পর্ধার সঙ্গে ঘোষণা করতে হল—

"রাজত্ব একলা যদি রাজারই হয়, প্রজার না হয়, তাহলে সেই খোঁড়া রাজত্বের লাফানি দেখে তোরা চমকে উঠতে পারিস, কিন্তু দেবতার চোখে জল আসে। ওরে রাজার খাতিরেই রাজত্ব দাবি করতে হবে।"

তাই ধনঞ্জয়ের কণ্ঠে নতুন গান—

ভুলে যাই থেকে থেকে
তোমার আসন পরে বসাতে চাও
নাম আমাদের হেঁকে হেঁকে।

মুক্তধারা নাটকে ধনঞ্জয়ের গানগুলি সম্পর্কে আরও একটি তথ্য উল্লেখযোগ্য। প্রায়শ্চিত্ত ও মুক্তধারায় যে গানগুলি একই প্রকার (ঈষৎ ভাষা-ঘটিত পরিবর্তন ব্যতীত), সেইগুলি প্রায়শ্চিত্তে অখণ্ডিত গানরূপেই আছে অর্থাৎ ধনঞ্জয় সেগুলি প্রথম থেকে শেষ পংক্তি পর্যন্ত একটানাই গেয়ে গেছে। কিন্তু মুক্তধারায় সেই গানগুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আরও গভীর হয়ে উঠেছে, সংগীত এখানে সংলাপের সঙ্গে মিশে গেছে। এইজন্য ধনঞ্জয়ের দুই ছত্র গান, আর সেইসঙ্গে তার ব্যাখ্যান করা হয়েছে সংলাপের দ্বারা। ফলে মুক্তধারায় ধনঞ্জয়ের গান আরও মর্মভেদী এবং প্রসঙ্গনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সংগীতের মধ্যবর্তী এই সংলাপগুলি কেবল সংলাপরূপে নয়, কবির স্বরচিত কাব্যগীতির স্বকীয় ভাষ্যরূপেও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'আরো আরো প্রভু আরো আরো' গানটির সংশ্লিষ্ট সংলাপ উদ্ধার করা যাক—

"ধনঞ্জয়।…তোদের চোখ রাঙিয়ে, তোদের গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। একটু স্বর ধরিয়ে দেব?

গান

আরো আরো প্রভু আরো আরো
এমনি করেই মারো মারো।

ওরে ভীতু, মার এড়াবার জন্যই তোরা হয় মরতে নয় পালাতে থাকিস,. দুটো একই কথা। দুটোতেই পশুর দলে ভেড়ায়, পশুপতির দেখা মেলে না।

লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই
ভয়ে ভয়ে কেবল তোমায় এড়াই ;
যা কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো।

দেখ বাবা, আমি মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চলেছি। বলতে চাই, মার আমায় বাজে কিনা তুমি নিজে বাজিয়ে নাও। যে ডরে কিম্বা ডর দেখায় তার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এগোতে পারব না।

এবার যা করবার তা সারো সারো
আমিই হারি কিম্বা তুমিই হারো।
হাটে ঘাটে বাটে করি খেলা
কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা ;
দেখি কেমনে কাঁদাতে পারো।"

৯

গীতাঞ্জলি পর্বে লিখিত রাজা নাটককে যেমন গীতাঞ্জলির নাট্যরূপ বলা হয়, ফাল্গুনী তেমনি বলাকার নাট্যরূপ। বলাকার মধ্যবর্তী পর্বেই ফাল্গুনী রচিত, ২০ ফাল্গুন ১৩২১ সুরুলে এই নাট্যরচনা সমাপ্ত হয়। বিশ্বজনীন গতির শিহরণে কবির প্রাণমন তখন উদ্দাম উধাও। তারুণ্যের প্রতি যৌবনের প্রতি কবির জয়তিলক বলাকা কাব্যেই ঘোষিত হয়েছিল, ফাল্গুনীতে তাকেই নাট্যের সুরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে মাত্র। বলাকার একটি কবিতায় কবি লিখেছিলেন যে, তাঁর বহুদিনকার ভুলে-যাওয়া যৌবন পৌষের জীর্ণপত্র ঝরাবার অবকাশে কবির কাছে আমন্ত্রণ পাঠাল, 'উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের হাতে, অকস্মাৎ সংগীতের ইঙ্গিতের সাথে'। সেই আমন্ত্রণের উত্তরেই কবি যেন তাঁর গানের লিপি প্রেরণ করলেন সেই ভুলে-যাওয়া যৌবনের কাছে, সেই লিপির নামই ফাল্গুনী।

ফাল্গুনীর 'গীতিভূমিকার গানগুলি ও সর্বশেষের উৎসবের গানটি একত্রে

বসন্তের পালা নামে নাটকের প্রবেশকরূপে এবং নাটক অংশটি ফাল্গুনী নামে ১৩২১ সালের চৈত্র মাসের সবুজপত্রে' প্রকাশিত হয়। তাতে ভূমিকাস্বরূপ, কবি বলেন, 'এই বসন্তের পালার গানগুলি তম্বুরার মত তাহারই মূল সুর কয়টি ধরাইয়া দিতেছে।' ফাল্গুনী রবীন্দ্রনাথের একটি বিচিত্র নাট্যসৃষ্টি। এই রচনায় নাট্যবস্তুর গুরুত্ব কম, সংগীতের গুরুত্বই বেশি, অথচ এটি মায়ার খেলা-জাতীয় গীতিপ্রধান রচনা নয়। মায়ার খেলা আগাগোড়াই সুরে রচিত, পাত্রপাত্রী মানবচরিত্র, তাদের সংলাপ কেবল সুর, বিষয়বস্তু প্রেম ও হৃদয়বৃত্তির সংঘাত। সুতরাং মায়ার খেলা যথার্থ ই গীতিনাট্য। কিন্তু ফাল্গুনীর নাট্য-ভাগ গদ্যে রচিত, সেখানে মানবচরিত্রই পাত্রপাত্রী, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই নাট্যভাগ নাটকীয়তাহীন এবং চরিত্রগুলিও সেখানে স্ফুটতর নয়। তাদের আকৃতি আছে প্রকৃতি নেই, কথা আছে নাম নেই। আসলে এই অংশ যেন মূল নাটকের ভূমিকা মাত্র। কবি যেন কতকগুলি ব্যক্তি-আভাস দিয়ে একটি রূপক ব্যাখ্যা করেছেন। প্রত্যেক দৃশ্যের সঙ্গেই একটি পৃথক গীতিভূমিকা আছে, যাকে কেউ কেউ প্রোলোগ বলেছেন, সেই অংশগুলি কেবল কাব্যগীতি। কিন্তু তা কবির গান নয়, কয়েকটি প্রাকৃত বস্তু বা তত্ত্বের গীতিভূমিকা, যেমন প্রত্যাগত যৌবনের গান, বেণুবনের গান, ফুলন্ত গাছের গান। এইগুলি নৃত্যনির্ভর, সেখানেই এদের নাটকীয়তা। সব মিলিয়ে ফাল্গুনীতে গানের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজা বা অচলায়তনে নাটক আছে, নাটকীয়তা আছে, তত্ত্ব আছে। গান সেখানে তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেছে, কিন্তু নাটকীয়তাকে লঙ্ঘন করে নয়, নাটকীয়তাকে গ্রহণ করেই, প্রয়োজনমত নাটকীয়তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশ্রিত হয়ে। ফাল্গুনীতে নাট্যাভাস আছে, নাটক নেই। গান এ নাটকে রূপককে ব্যাখ্যা করেছে নাটকীয়তাকে অতিক্রম করে। ফাল্গুনী প্রকৃতপক্ষে দুটি নাটক। একটি নাটক রাজা ও কবির, আর একটি মূল নাটক, চন্দ্রহাসের নাটক। এই অপরূপ পরিকল্পনা ফাল্গুনীতেই সুরু হয়েছে, পরবর্তী কয়েকটি গীতিপালায় পুনরায় কবি 'নাটকের মধ্যেই নাটকে'র রীতি গ্রহণ করেছেন। ফাল্গুনীর সূচনা রাজোদ্যানে—রাজা, মন্ত্রী, শ্রুতিভূষণ ও কবির কথোপকথনে। পলিতকেশের আবির্ভাবে রাজ্যচিন্তা ও সামাজিক কর্তব্য থেকে পলাতক বৈরাগ্যপন্থী রাজা কেমন করে কবির দ্বারা প্রত্যাবৃত্ত হলেন এবং প্রৌঢ় বয়সের বাহ্যিক ভ্রান্তি ঘুচিয়ে প্রাণের অখণ্ড অজর লীলায় আত্মমগ্ন হলেন, এই নাটকে তাই বর্ণিত হয়েছে। সেই সূত্রেই

রাজার সমুখে অভিনীত হল কবির নূতন পালা—'সেটা নাটক কি প্রহসন কি প্রকরণ কি রূপক কি ভাণ' বলা কঠিন। তার অর্থগ্রহণের প্রশ্ন ওঠে না, কারণ কবির ভাষায় তা 'বাঁশির মত, বোঝবার জন্য নয়, বাজবার জন্য'। এতে তত্ত্বকথা নেই, এই রচনার মধ্যে কেবল "প্রাণ বলে উঠেছে সুখে দুঃখে, কাজে বিশ্রামে, জন্মে মৃত্যুতে, জয়ে পরাজয়ে, লোকে লোকান্তরে, এই আমি আছি-র, জয়, জয় এই আনন্দময় আমি আছির জয়"। উক্ত পালাই ফাল্গুনী যেখানে চিত্রপটের প্রয়োজন নেই, কেবল চিত্তপটের প্রয়োজন, শুধু সুরের তুলি বুলিয়ে ছবি আঁকবার জন্য। এই নাটকে গান আছে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে রাজসভার কবির উক্তিকে রবীন্দ্রনাথেরই আত্মসমর্থন বলে ধরে নিতে পারি। কবি জবাব দিয়েছেন—

"হ্যাঁ মহারাজ, গানের চাবি দিয়েই এর এক একটি অঙ্কের দরজা খোলা হবে।

গানের বিষয়টা কী?

শীতের বস্ত্রহরণ।

এ তো কোনো পুরাণে পড়া যয়নি

বিশ্বপুরাণে এই গীতের পালা আছে। ঋতুর নাট্যে বৎসরে বৎসরে শীত বুড়োটার ছদ্মবেশ খসিযে তার বসন্তরূপ প্রকাশ করা হয়, দেখি পুরাতনটাই নতুন।

এতো গেল গানের কথা, বাকিটা?

বাকিটা প্রাণের কথা।…

তোমার গানের বিষয় আর তোমার নাট্যের বিষয়টা আলাদা নাকি?

না মহারাজ—বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলছে আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা। বিশ্বকবির সেই গীতিকাব্য থেকেই তো ভাব চুরি করেছি।"

ফাল্গুনী নাটকের চরিত্র সম্পর্কে মহারাজ ও কবির এই সংলাপই আলোক-প্রদর্শক এবং সংগীত এই নাটকে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করেছে তার প্রমাণ। ফাল্গুনীর সংগীতগুলির নাট্যনির্দেশ এইরূপ—

সূচনা রাজোদ্যান	কবি	পথ দিয়ে কে যায় গো চলে
১ম দৃশ্যের গীতিভূমিকা	বেণুবনের গান	ওগো দখিন হাওয়া ও পথিক হাওয়া

(নবীনের আবির্ভাব)	পাখির নীড়	আকাশ আমার ভরল আলোয়
	ফুলন্ত গাছ	ওগো নদী আপন বেগে
১ম দৃশ্য পথ	যুবকদল	ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে
		মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ
	যুবকদল ও সর্দার	আমাদের পাকবে না চুল
		আমাদের ভয় কাহারে
২য় দৃশ্যের গীতিভূমিকা	দুরন্ত প্রাণ	আমরা খুঁজি খেলার সাথী
(প্রবীণের দ্বিধা)	শীতের বিদায়গান	ছাড় গো তোরা ছাড় গো
	নবযৌবনের গান	আমরা নূতন প্রাণের চর
	উদ্‌ভ্রান্ত শীতের গান	ছাড় গো আমায় ছাড় গো
২য় দৃশ্য	যুবকদল ও চন্দ্রহাস	আমাদের খেপিয়ে বেড়ায় যে
		চলি গো চলি গো
		ভালমানুষ নই রে মোরা
৩য় দৃশ্যের গীতিভূমিকা	বসন্তের হাসির গান	ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি
(প্রবীণের পরাভব)	আসন্ন মিলনের গান	আর নাই যে দেরি
৩য় দৃশ্য	যুবকদল	মোরা চলব না
	বাউল	ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে
৪র্থ দৃশ্যের গীতিভূমিকা	প্রত্যাগত যৌবনের জয়	বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম
(নবীনের জয়)	নতুন আশার গান	এই কথাটাই ছিলেম ভুলে
	বোঝাপড়ার গান	এবার তো যৌবনের কাছে
	নবীন রূপের গান	এতদিন যে বসেছিলেম
৪র্থ দৃশ্য	যুবক দল	তুই ফেলে এসেছিস কারে মন
		আমি যাব না গো অমনি চলে
	বাউল	সবাই যারে সব দিতেছে
		বসন্তে ফুল গাঁথল আমার
	যুবকদল	চোখের আলোয় দেখেছিলেম
	বাউল	হবে জয় হবে জয়
		তোমায় নতুন করে পাব বলেই
	সমবেত উৎসবের গান	আয় রে তবে মাত রে সবে

সম্পূর্ণ গীতিনাট্য মায়ার খেলা ছাড়া ফাল্গুনীর মত এত বেশিসংখ্যক সংগীত পূর্ববর্তী অন্য কোন নাটকেই নেই। অথচ নাট্যবস্তু ও প্রতি দৃশ্যের স্বতন্ত্র গীতিভূমিকার অভিনব বৈচিত্র্যের জন্য সংগীত এই নাটককে ক্লান্ত করে না বরং গানের চাবি দিয়ে নাটকের আভ্যন্তর দ্বারগুলি বিচিত্রভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়। গীতিভূমিকা বাদ দিলে নাট্যাংশের চরিত্র যুবকদল, চন্দ্রহাস, সর্দার, বাউল, কোটাল, মাঝি, দাদা, কলু ইত্যাদি। এদের মধ্যে কণ্ঠে গান কেবল যুবকদলের[১৬] ও বাউলের[১৭] কারণ—তারাই এই নাটকে নবযৌবনের প্রতীক, সত্যের প্রতিনিধি। এই নাটকে নবযৌবনের দল কবির ভাষায় সেই 'আমি আছি-র' দল, যারা শীত বুড়োকে খুঁজতে বেরিয়েছে। তাদের চলার বেগে পথের বন্ধন খসে যায়, তাদের অমিত উৎসাহে জরার শাসন লোপ পায়। তারা অবিবেচক, তারা নবীন, সবুজ। তারা যৌবনের আবাহনী গায— 'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে'। তারা দুরন্ত, দুর্বিনীত, প্রমত্ত, তারা অশান্ত কাঁচা। সংসার তাদের কাছে কারাপ্রাচীর তুলে ধরে না, পথ তাদের আমন্ত্রণলিপি পাঠায। তারা কর্মচক্রে পিষ্ট নয়, ক্রীডা ও কর্ম তাদের কাছে অভিন্ন বলেই তাদের গান— 'মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ জানিসনে কি ভাই।'

ক্ষণিকা কাব্যে কবি একদিন আপনার পলিতকেশ সত্ত্বেও সকলের সঙ্গে সমবযসিত্বের দাবি জানিয়েছিলেন। ফাল্গুনী নাটকের সূচনাংশে মহারাজ আপনার সদ্যোপক্ক দুইগুচ্ছ শুভ্রকেশের জন্য বিশ্ব-বৈরাগ্য অনুভব করে বিমর্ষ হযেছিলেন বলেই কবিশেখর তাঁকে ছদ্ম-বার্ধক্যের আবরণনিম্নে চিরযৌবনের রহস্যলীলা দেখাতে ডাক দিয়েছেন। নবযৌবনের দল সেই চিরযৌবনের রহস্য গানে প্রকাশ করে—

আমাদের পাকবে না চুল গো মোদের পাকবে না চুল,
আমাদের ঝরবে না ফুল গো মোদের ঝরবে না ফুল।

নবযৌবনের কণ্ঠের গানগুলির মধ্য দিয়ে এইভাবেই কবি তারুণ্যের বন্দনা করেছেন। 'আমাদের ভয কাহারে,' 'আমাদের খেপিয়ে বেডায় যে', 'চলি গো চলি গো যাই গো চলে', 'ভালমানুষ নই রে মোরা', 'আয় রে সবে মাত রে সবে আনন্দে' এই গানগুলি ফাল্গুনীর কবির যৌবনবন্দনাগীতি। এই গানগুলির সঙ্গে সবুজপত্রে, সবুজের অভিযান কবিতার যৌবন-দর্শনের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। অচলায়তনের পঞ্চকও ছিল এই যৌবনেরই প্রতিনিধি, যদিও অচলায়তন আরও পূর্বের রচনা বলে যৌবনের রহস্যলীলা কবির কাছে এত

স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। সবুজপত্রের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে কবি লিখেছিলেন—

"যাঁহারা দেশকে ঠাণ্ডা করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকদিন একাধিপত্য করিয়াছেন।···কিন্তু দেশের নবযৌবনকে তাঁহারা আর নির্বাসিত করিয়া রাখিতে পারিবেন না। তাঁহারা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া থাকুন, আর বাকি সবাই পথে ঘাটে বাহির হইয়া পড়ুক। সেখানে তারুণ্যের জয় হউক। তাহার পায়ের তলায় জঙ্গল মরিয়া যাক, জঞ্জাল সরিয়া যাক, কাঁটা দলিয়া যাক, পথ খোলসা হউক, তাহার অবিবেচনার উদ্ধত বেগে অসাধ্যসাধন হইতে থাক।" (কালান্তরে সংকলিত)

ফাল্গুনীর নবযৌবনের গানগুলি এই তারুণ্যের গান। মূলত ফাল্গুনীতে চরিত্রের কণ্ঠে যোজিত হলেও এইগুলি কবি রবীন্দ্রনাথেরই কবিবিশ্বাস থেকে উৎসারিত। তাই এগুলি আত্মভাবমূলক, নাটকীয় নয়।

গীতিভূমিকার গানগুলি আসলে ঋতুসংগীত। কবি নানাভাবে বসন্তের স্তুতিগীতি রচনা করেছেন। বসন্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যেন নবপরিচয় ঘটেছে ফাল্গুনী রচনাকালেই। জীবনের ক্ষেত্রে যার নাম যৌবন, ঋতুর ক্ষেত্রে তাই বসন্ত—"বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলেছে আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা। বিশ্বকবির সেই গীতিকাব্য থেকেই তো ভাব চুরি করেছি"—সূচনাংশে মহারাজের নিকট কবিশেখরকথিত এই মন্তব্য রবীন্দ্রনাথের বসন্তবন্দনাগানগুলির পরিচয়পত্র। ফাল্গুনীর ঋতুগীতগুলির বৈশিষ্ট্য কবি স্বয়ং তাঁর গানগুলির বিষয়-শিরোনামায় দান করেছেন। বেণুবনের গান, পাখির নীড়ের গান, ফুলন্ত গাছের গান, শীতের গান, আসন্ন মিলনের গান, প্রত্যাগত যৌবনের গান, নূতন আশার গান, বোঝাপড়ার গান, নবীন রূপের গান—এই সকল বিষয়ভেদে গানগুলির বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয়েছে মাত্র, অন্যথায় সবগুলিই ঋতুগীতি। অন্যান্য গানের মধ্যে বাউলের গানগুলিতে ঈষৎ বৈচিত্র্য আছে। ফাল্গুনী নাটকে বাউল একটি নূতন ধরনের চরিত্র। বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। বাউলের গানগুলিও তাই বাউল সুরে রচিত হয়নি। তবে বাউলের সহজিয়া জীবনাদর্শের সঙ্গে কবির সত্যসন্ধতা মিশিয়ে এই বাউল চরিত্রের সৃষ্টি—হয়ত কবির আত্মিক প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনেও। বাউলের গানেই ফাল্গুনী নাটকের মর্মবাণীটি অভ্রান্তভাবে বেজেছে—

তোমায় নতুন করে পাব বলে
হারাই ক্ষণে ক্ষণ
ও মোর ভালবাসার ধন।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সঙ্গে নাটকের, সংগীতের সঙ্গে কাব্যের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, বলাকার সঙ্গে ফাল্গুনীর অন্তরঙ্গ তুলনাসূত্রেই তা প্রমাণিত হবে। বলাকা কাব্যে যা কবিতায় বলা হয়েছে ফাল্গুনীতে তাই সংগীতে ও ছদ্মনাট্যে প্রকাশিত হয়েছে। সংগীতই ফাল্গুনীতে প্রধান, সেই সংগীতকে কেবল নাট্য-কথার ফ্রেমে বেঁধে রাখা হয়েছে। ১৩২১এর ফাল্গুনের মধ্যে ফাল্গুনী রচনা সমাপ্ত হয়, তার মধ্যে বলাকার প্রথম ৩৩টি কবিতা রচিত হয়ে গেছে। বলাকার কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তার মধ্যে দুটি মুখ্য সুর আছে, একটি নিখিল বিশ্বের ধাবমানতা ও গতিবাদ এবং আর একটি যৌবনের চিরঞ্জীবতা—গভীরভাবে এই দুটির মধ্যে এক সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য আছে। পঞ্চাশোর্ধ প্রবীণ কবি সহসা যৌবনের প্রতি এমন আসক্ত হয়ে পডলেন কেন, তার কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। বলাকা কাব্যরচনাকালে কবি যেন তাঁর হারানো যৌবনকে ফিরে পেয়েছেন। কেবল যৌবন নয়, সেই সঙ্গে যৌবনের প্রেমকেও নতুন ভাবে আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেই প্রেম তাঁর কাছে অবিনশ্বর হয়ে দেখা দিয়েছে, তাই কবি মৃত্যুকে অস্বীকার করে সেই বিগত প্রেমকেই চিরন্তন করে অনুভব করেছেন। সবুজের অভিযান কবিতায় কবি সামাজিক জীবনে কিছুটা অন্তরের তাগিদে, হয়ত বা কিছুটা কর্তব্যের অনুরোধে, যৌবনের প্রতি আশীর্বচন দান করেছিলেন। তার কিছুদিন পরে বিস্মৃতপ্রায় প্রিয়জনের ছবি দেখে কবির লুপ্তযৌবন সহসা অসীম স্মৃতি নিয়ে কবিকে বিচলিত করল। বিস্মৃতির ধূসর যবনিকা সহসা খসে পড়ল, অপরূপ পুলকে কবি অনুভব করলেন, 'ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা'। এই অভিজ্ঞতা একটি কাব্যসংগীতেও বেদনাময় ভাষায় প্রকাশিত—

দিনে দিনে কঠিন হল কখন বুকের তল
ভেবেছিলেম ঝরবে না আর আমার চোখের জল।
হঠাৎ দেখা পথের মাঝে কান্না তখন থামে না যে—
ভোলার তলে তলে ছিল অশ্রুজলের খেলা।

প্রৌঢ়তার জীর্ণ প্রান্তরে অকালবসন্তের এ কী সমারোহ! কার্তিক মাসের এক হেমন্তকরুণ নিশীথে ছবি কবিতার মধ্য দিয়ে যে প্রগল্‌ভ বিস্ময়ের সূচনা

হল, পৌষ মাসে সুরুলে তাকে আরও সম্পূর্ণ করে আনলেন। বলাকার ১৩ সংখ্যক কবিতাটি ছবি কবিতারই উপসংহার এবং যেন ফাল্গুনীর অনুল্লিখিত ভূমিকা। বহুদিনকার ভুলে-যাওয়া যৌবনের যে পত্র উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের হাত দিয়ে অকস্মাৎ 'সংগীতের ইঙ্গিতের সাথে' কবির প্রৌঢ় বর্তমানের ঠিকানায় এসে পড়ল, সেই পত্রই যেন ফাল্গুনী, সেই 'সংগীতের ইঙ্গিত'ই ফাল্গুনীতে বসন্তের অভিযানে পরিণত হল; কবির চেতন-মনের গভীরতম স্তরে এই বিশ্বাস ভূপ্রোথিত হল যে—

"জরা মৃত্যুর আক্রমণ চারদিকেই দিনরাত চলেছে, তবুও বিশ্বের চিরনবীনতা নিঃশেষ হল না। ফ্যাক্ট্‌স্‌এর দিকে দেখি জরা মৃত্যু, ট্রুথের দিকে দেখি অক্ষয় জীবন যৌবন। শীতের মধ্যে এসে যে-মুহূর্তে বনের সমস্ত ঐশ্বর্য দেউলে হল বলে মনে হল সেই মুহূর্তেই বসন্তের অসীম সমারোহ বনে বনে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। জরাকে, মৃত্যুক ধরে রাখতে গেলেই দেখি, সে আপন ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে প্রাণের জয়পতাকা উড়িয়ে দাঁড়ায়। পিছনদিক থেকে যেটাকে জরা বলে মনে হয়, সামনের দিক থেকে সেইটেকেই দেখি যৌবন।...

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রতি ফাল্গুনে চিরপুরাতন এই যে চিরনূতন হয়ে জন্মাচ্ছে, মানুষপ্রকৃতির মধ্যেও পুরাতনের সেই লীলা চলছে। প্রাণশক্তিই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আপনাকে বারে বারে নূতন করে উপলব্ধি করছে। যা চিরকালই আছে তাকে কালে কালে হারিয়ে হারিয়ে না যদি পাওয়া যায় তবে তার উপলব্ধিই থাকে না"।[১৮]

এই তত্ত্ব একদিকে ছবি কবিতার, অন্য দিকে ফাল্গুনী নাটকেরও রূপক। এই তত্ত্বই ফাল্গুনীর বাউলের মুখে শোনা যায়—

তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই ক্ষণে-ক্ষণ
ও মোর ভালবাসার ধন।
দেখা দেবে বলে তুমি হও যে অদর্শন
ও মোর ভালবাসার ধন।
ওগো তুমি নও আড়ালের, তুমি আমার চিরকালের
ক্ষণকালের লীলার স্রোতে হও যে নিমগন
ও মোর ভালবাসার ধন।
আমি তোমায় যখন খুঁজে ফিরি ভয়ে কাঁপে মন
প্রেমে আমার ঢেউ লাগে তখন।

তোমার শেষ নাহি তাই শূন্য সেজে শেষ করে দাও আপনাকে যে,
ঐ হাসি রে দেয় ধুয়ে মোর বিরহের রোদন
ও মোর ভালবাসার ধন।

বলাকার ১৩, ২৫ ও ২৬ সংখ্যক কবিতায় এই প্রত্যাগত যৌবনের কথা বারবার বলা হয়েছে। মনের মধ্যে যখন যৌবনের এই প্রত্যাবর্তনের পালা, বাইরের প্রকৃতির দিকে চেয়ে দেখলেন, জীর্ণ জরাতুর শীতের বস্ত্রাঞ্চল ভেদ করে বসন্তের পল্লবসমারোহ, শিমুলপলাশের কানাকানি, ঠিক একই ভাবে ফাল্গুনের সচল আবির্ভাব। আপনার প্রত্যাবৃত্ত যৌবন বসন্তের চির-আবির্ভাবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেল, ধীরে ধীরে তা কবির দার্শনিক মনের প্রকোষ্ঠে তত্ত্ব হয়ে গেল। তারপর তত্ত্ব হল কবিতা, কবিতা থেকে নাটক, গল্প, প্রবন্ধ। সেই প্রবন্ধের নাম 'বিবেচনা ও অবিবেচনা,' নাটকের নাম ফাল্গুনী, গল্পের নাম 'হালদারগোষ্ঠী', কবিতার নাম বলাকা। সর্বত্রই যৌবনের বন্দনা আর সে যৌবনের উৎস কবির ভুলে-যাওয়া যৌবনের জাগরণ। এই তত্ত্বই ফাল্গুনীর তত্ত্ব, যা চতুর্থ দৃশ্যের গীতভূমিকায় নূতন আশার গান হয়ে দেখা দিয়েছে—

এই কথাটাই ছিলেম ভুলে—
মিলব আবার সবার সাথে ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।[১৯]

১০

রূপান্তর, পাঠান্তর, আঙ্গিক-পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে শিল্পরূপের ক্রমপরিণতির সাধনায় শিল্পীর আত্মস্বরূপের কোনো নিগূঢ় ইতিহাস জানা যায় কিনা, এই বিষয়ে সাহিত্যসমালোচনায় সম্প্রতি নানাপ্রকার বিচারবিশ্লেষণ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার ইতিহাসে এইরূপ রূপান্তরের বহু বিচিত্র উদাহরণ পাওয়া যায়। তাঁর নাট্যকার জীবনের ধারাবাহিকতায় এই রূপান্তরীকরণের ভূমিকা মৌলিক অপেক্ষা কম নয়। বহু নাটককে তিনি নাট্যরচনার অপেক্ষাকৃত দূরত্বে স্থাপন করে এমন কিছু অপূর্ণতার সন্ধান পেয়েছিলেন, যার ফলে সেইগুলির পুনর্লিখন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। অধিকাংশ সময় এই পরিবর্তন অভিনয়ের প্রত্যক্ষ প্রযোজনে বলে ঘোষিত হলেও প্রথম রচনার অভিনয়গত ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা প্রমাণিত হয়নি। রচনাগত উৎকর্ষকেও সর্বদা চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করতে অনেক দ্বিধাগ্রস্ত হবেন, কারণ প্রায়শই রূপান্তরিত

রচনার চেয়ে প্রথম সৃষ্টির উৎকর্ষ অবিসংবাদিত বলে মনে হয়েছে। তা ছাড়া রূপান্তরের পরে নাটকের রূপ-রস এমনই পরিবর্তিত হয়েছে যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেগুলির স্বতন্ত্র নাট্যরূপ স্বীকার করে উভয় রচনাকেই কবি রক্ষা করেছেন।

রবীন্দ্রনাট্যের এই রূপবদলের স্বভাবধর্ম ও চরিত্র অধুনা আমাদের আলোচ্য নয়, কিন্তু এই নাট্যরূপান্তরে সংগীতঘটিত যে সকল পরিবর্তন অনিবার্যভাবে দেখা দেয় সেইগুলির ঈষৎ পর্যালোচনার প্রয়োজন। ফাল্গুনী (প্রকাশ ১৩২২) থেকে মুক্তধারা (প্রকাশ ১৩২৯) রচনা পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মে অভিনব মৌলিক বা চমকপ্রদ রচনা প্রায় অনুপস্থিত বলেই হয়ত এই সময় কবি তাঁর পূর্বতন রচনাগুলিকেই মাজাঘষার কাজে লেগেছিলেন। এরই মধ্যে তিনটি নাটককে পরিবর্তিত করে তিনটি প্রায় স্বতন্ত্র নাটক লেখা হয়। অচলায়তনকে সংস্কার করে গুরু, রাজাকে পরিমার্জিত করে অরূপরতন এবং শারদোৎসব অবলম্বনে ঋণশোধ এই মধ্যবর্তী সময়েরই নাট্যকৃতি।

১৩২৪এর ১লা ফাল্গুন গুরু নাটকটি লেখা হয়। এটি অচলায়তনের সহজ অভিনয়যোগ্য লঘুতর ও কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত সংস্করণ। এই রূপান্তর-কার্যে অচলায়তনের বহু গানই বর্জিত হয়েছে এবং 'ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়' গীতালি থেকে গৃহীত এই গানটি চতুর্থ দৃশ্যে সমবেত কণ্ঠে নূতন সংযোজিত হয়েছে। অন্যান্য গান চরিত্রানুযায়ী যথাযথই আছে। গুরু নাটক স্বভাবধর্মে বক্তব্যে অচলায়তনকে অতিক্রম করে যায়নি, কেবল তার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র। অভিনেয়তায় সংহত হলেও অচলায়তনের যাবতীয় গান যেহেতু এই নাটকে নেই, সেই জন্য এর ব্যঞ্জনাশক্তিও সীমাবদ্ধ। শোণপাংশুর দল এই নাটকে হয়েছে যূনক। এই নাটকে পঞ্চকের কণ্ঠে দুটি গান পঞ্চকের সমস্ত অস্তিত্বকে বিচলিত করে দিয়েছে। অশান্তির আঘাতে যার চিত্তবীণা বেজে উঠত, যার বিদ্রোহ উল্লাস কারাপ্রাচীরে ছিদ্র দিয়ে সংগীতের মত প্রবাহিত হত, কবি যেন তার কণ্ঠের গান কেড়ে নিয়ে তাকে একটি নির্জীব তত্ত্বমাত্রে পরিণত করেছেন।

অরূপরতন (ভূমিকার তারিখ মাঘ ১৩২৬) গুরুর মতই সংক্ষেপিত, অভিনয়-সৌকর্যে পরিবর্তিত সংস্করণ। তবে প্রচলিত অরূপরতনটি ১৩৪২ সালে কবিকর্তৃক দ্বিতীয়বার পরিবর্তনের ফল। মোটের উপর রাজার সঙ্গে অরূপরতনের তত্ত্বগত পরিবর্তন ঘটেনি, কারণ অরূপরতনের ভূমিকায় উল্লিখিত কবিমন্তব্য

রাজা নাটকের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়ে থাকে। তবে সংগীতের ক্ষেত্রে অরূপরতন ও রাজার মধ্যে ব্যবধান আছে। রাজা অপেক্ষা অরূপরতনে সংকেতিক নাটকের (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'নাট্যরূপক') বৈশিষ্ট্য আরও সূক্ষ্মতর ভাবে সংগীতের মধ্য দিয়ে আভাসিত হয়েছে। রাজা নাটকের গানগুলি অরূপরতনে থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই নাটকে সংগীত-পরিবেশনে চরিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে। এই নাটকের জন্য কবি কয়েকটি নতুন গান রচনা করে দিয়েছেন। এইগুলির মধ্যে প্রস্তাবনা গান (বা থিম মিউজিক) 'চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো' এবং নাট্যশেষের 'অরূপবীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে' গানদুটি যেন এই নাট্যবস্তুর নির্যাস-সৌরভ। গীতাঞ্জলির একাধিক গানেই এই নূতন নামকরণের পূর্বাভাস নিহিত ছিল।[২০] সেই অরূপতত্ত্বটিকেই গানের সুরে নতুন করে বললেন এই নাটকের প্রস্তাবনায়—

আমায় তোরা ডাকিস নারে—
আমি যাব খেয়ার ঘাটে অরূপ-রসের পারাবারে।
উদাস হাওয়া লাগে পালে পারের পানে যাবার কালে
চোখ দুটোরে ডুবিয়ে যাব অকূল সুধা-সাগর-তলে গো।

'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি' গীতাঞ্জলির এই গানে কবি জীর্ণতরী বেয়ে খেয়াপার করা অপেক্ষা অরূপরতনের প্রত্যাশায় রূপসাগরে সুধায় তলিয়ে গিয়ে অমর হবার প্রার্থনা করেছিলেন। 'চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো' গানে সেই 'অরূপ-রসের পারাবারে'র তীরে উত্তীর্ণ হয়েছেন, কিন্তু এই একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে যে, 'চোখ দুটোরে ডুবিয়ে যাব অকূল সুধাসাগর তলে'। 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি' গানেই কবি গেয়েছিলেন—

যে গান কানে যায় না শোনা সে গান যেথায় নিত্য বাজে
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব সেই অতলের সভা-মাঝে।
চিরদিনের সুরটি বেঁধে শেষ গানে তার কান্না কেঁদে
নীরব যিনি তাঁহার পায়ে নীরব বীণা দিব ধরি।

সেই বীণার রূপক পুনরায় 'অরূপবীণা রূপের আড়ালে' গানে ব্যবহৃত হয়েছে। অরূপবীণায় যে সুর বাজে তাও বড়ই সূক্ষ্ম বড়ই অনির্বচনীয়, সেও যে গান কানে যায় না শোনার মত। সেই সুর সম্পর্কে কবি বলেছেন—

ভুবন আমার ভরিল সুরে ভেদ ঘুচে যায় নিকটে দূরে
সেই রাগিণী লেগেছে আমার সকল কাজে।

অরূপরতনের শেষ দৃশ্য ঠাকুরদা বলেছেন, "আমাদের রাজাটির নিজের নাকি রূপের সম্পর্ক নেই, তাই তো বিচিত্র রূপ সে এত ভালবাসে। এই রূপই তো তার বক্ষের অলংকার। সেই রূপ আপন গর্বের আবরণ ঘুচিয়ে দিয়েছে— আজ আমার রাজার ঘরে কী সুরে যে এতক্ষণে বীণা বেজে উঠেছে, তাই শোনবার জন্য প্রাণটা ছটফট করছে।" সেই সুরতৃষ্ণার কথাই কবি বললেন তাঁর গানে—

হাতে-পাওয়ার চোখে চাওয়ার সকল বাঁধন
গেল কেটে আজ সফল হল সকল কাঁদন।
সুরের রসে হারিয়ে যাওয়া সেই তো দেখা সেই তো পাওয়া,
বিরহমিলন মিলে গেল আজ সমান সাজে।

রাজা নাটকে রাজার কণ্ঠে দুটি, সুদর্শনার একটি এবং সুরঙ্গমার মোট আটটি গান ছিল, কিন্তু অরূপরতনে রাজা ও সুদর্শনার গান বর্জিত হয়েছে। এখানে সুরঙ্গমার গানই সর্বাধিক, মোট এগারোটি। রাজা নাটকে রাজার কণ্ঠের গান 'খোলো খোলো দ্বার', 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না', অরূপরতনে সুরঙ্গমার গানে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া পুরাতন গান বর্জিত ও নূতন গান সন্নিবিষ্ট হয়েছে। নূতন গানের মধ্যে 'পথের সাথি নমি বারম্বার', 'আমার আর হবে না দেরি', 'ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর' এই গানগুলি ইতিপূর্বেই গীতালিতে প্রকাশিত হয়েছিল। 'কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে' গীতিমাল্যের গান। 'আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায়' ১৩২৬ সালে কবির জন্মদিন উপলক্ষে রচিত হয়।

রাজা অপেক্ষা অরূপরতনে সুরঙ্গমার ভূমিকা মুখ্যতর, তাই তার কণ্ঠে সংগীতের বাহুল্য ঘটেছে। অরূপরতনের সূচনায় সুরঙ্গমাকে ডেকে সুদর্শনা বলেছে—

"তোমার এখানে আকাশে যেন অর্ঘ্য সাজানো, যেন শিশিরধোওয়া সকালবেলার স্পর্শ। তুমি এখানকার বাতাসে কী ছিটিয়ে দিয়েছ বলো দেখি।

সুরঙ্গমা। সুর ছিটিয়েছি।"

এই কারণেই রাজা অপেক্ষা অরূপরতনে সুরঙ্গমার কণ্ঠে ক্ষণে ক্ষণে সুরের প্রবাহ উচ্ছলিত হয়, অন্ধকারের অন্তর থেকে গানের শিখার দ্যুতি ঝলসে ওঠে তার কণ্ঠে। সুরঙ্গমার নূতন গানগুলির আলোচনা করলে দেখা যায়

'আমি যখন ছিলেম অন্ধ' এই গানের ভিতর দিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত আঘাত-প্রত্যাঘাতের দ্বারা সুরঙ্গমার অন্তরে রাজার স্বরূপ উপলব্ধি হয়েছে। 'প্রভু বলো বলো কবে' গানটিতে আত্মনিবেদনের দ্বারা সুরঙ্গমা তার প্রভুস্বরূপ রাজার চরণে আপনাকে সমর্পিত করেছে। 'খোলো খোলো দ্বার' গানটি রাজা নাটকে রাজার কণ্ঠে ছিল, কিন্তু অরূপরতনে সুরঙ্গমার কণ্ঠে যোজিত। প্রথমোক্ত নাটকে গানটির বিষয় ছিল ভক্তের হৃদয়পুরে জগদীশ্বরের প্রবেশাকৃতি। অরূপরতনে এই ভাবটিকে বিপরীত দিক থেকে দেখা হয়েছে, অর্থাৎ প্রেমিক প্রভুর জন্য বাসকসজ্জিকা ভক্তের প্রতীক্ষা ও আহ্বান, কিন্তু যেহেতু সুদর্শনার ধারণা 'আমি তো মনে করি যে ডাকছি, কিন্তু সাড়া পাইনে, বোধ হয় ডাকতে জানি নে'—তাই সুরঙ্গমা এখানে নিরপেক্ষভাবে রানীর হয়ে রাজাকে আহ্বান জানিয়েছে। অবশ্য নাটকে সুরঙ্গমার ভূমিকা অনুযায়ী এ আহ্বান কেবল সুদর্শনার নয়, সুরঙ্গমারও। রাজা নাটকে যেহেতু সুরঙ্গমা 'দাসীভাবে রাজাকে ভজনা করিয়াছে' এবং 'সুদর্শনার সাধনপন্থা মধুরভাবে' এজন্য সুরঙ্গমা ও সুদর্শনার মধ্যে আচরণগত পার্থক্য আছে। কিন্তু অরূপরতনে এই পার্থক্য স্পষ্ট নয়। রাজা নাটকে সুরঙ্গমার গান 'আমি কেবল তোমার দাসী' অরূপরতনে নেই। অথচ এখানে সুরঙ্গমা ও সুর্দশনা রাজার প্রতি প্রায় একই আচরণ করেছে। 'খোলো খোলো দ্বার' রাজায় যখন রাজকণ্ঠের গান ছিল তখন তার ভাষা সঞ্চারীতে ছিল এইরূপ—

> ভরি লয়ে ঝারি এনেছ কি বারি সেজেছ কি শুচি দুকূলে
> বেঁধেছ কি চুল তুলেছ কি ফুল গেঁথেছ কি মালা মুকুলে।

অরূপরতনে সুরঙ্গমার কণ্ঠে স্বভাবতই এর ভাষা পরিবর্তিত হয়েছে—

> ভরি লয়ে ঝারি এনেছি তো বারি সেজেছি তো শুচি দুকূলে,
> বেঁধেছি তো চুল তুলেছি তো ফুল গেঁথেছি তো মালা মুকুলে।

'বাহিরে ভুল ভাঙবে যখন' গানটি কুঞ্জবাতায়নে বসন্তউৎসবের মুহূর্তে সুরঙ্গমার কণ্ঠে গীত। এই উৎসবেই কিংশুকপতাকাধারী সুবর্ণকে সুদর্শনা রাজা বলে ভুল করবে, তারপর সেই ভুল সুদর্শনার জীবনে আনবে বিপর্যয় ও অগ্নিদাহ এবং পরিণামে অভিমান ক্ষয় হয়ে দুঃখের অশ্রুজলে রাজার প্রকৃত পরিচয় তার কাছে উদ্ঘাটিত হবে। সেই আসন্ন ঘটনার ইঙ্গিত এই গানটিতে যেন নিহিত। 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না' রাজা নাটকে রাজার এই গান অরূপরতনে সুরঙ্গমার কণ্ঠে অর্পিত হয়েছে। ইতিমধ্যে

অগ্নিকাণ্ডের আলোকে সুদর্শনা রাজার রূপ দেখেছে, সে রূপ ভয়ানক—'ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মত কালো—ঝড়ের মেঘের মত কালো—কূলশূন্য সমুদ্রের মত কালো'। কিন্তু এ রূপ বাহ্যরূপ। রাজার অন্তরের প্রেমের সঙ্গে সুদর্শনার পরিচয় ঘটেনি বলেই বাহ্যরূপের দৈন্যে তার অন্তরলোক বিক্ষুব্ধ। যথার্থ প্রেম রূপনির্ভর নয়, একথা বোঝাবার দায়িত্ব এই নাটকে সুরঙ্গমাই গ্রহণ করেছে—'যে কালো দেখে আজ তোমার বুক কেঁপে গেছে সেই কালোতেই একদিন তোমার হৃদয় স্নিগ্ধ হয়ে যাবে'—তাই এই গান 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না'। তবুও মনে হয় রাজার কণ্ঠেই এই গান শোভন হত। অরূপরতনে রাজার কণ্ঠে কোনো গান না রেখে নাট্যকার রাজাকে সম্পূর্ণ নেপথ্যবর্তী করেছেন, কিন্তু সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের ফলে তাঁকে তো শ্রুতির অতীত করেননি। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী জানিয়েছেন যে, রাজা নাটকের ১৩২৬ সালের সংস্করণে অদৃশ্য রাজার উত্তরপ্রত্যুত্তর বর্জিত হয়েছিল। কিন্তু ১৩৪২ সালের সংস্করণে পুনরায় অদৃশ্য রাজার কথোপকথন প্রবিষ্ট হয়েছে। 'রাজা যদি দৃষ্টিগোচর না হন, তবে তাঁহার শ্রুতিগোচর হওয়াও উচিত নয়। যিনি অতীন্দ্রিয়, তিনি সব ইন্দ্রিয়ের পক্ষেই সমান অগোচর।'

রাজার প্রতি অভিমানবশত সুদর্শনার গৃহত্যাগের পর রাজার আপাতনিষ্ঠুরতা সম্পর্কে সুরঙ্গমার 'ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর' এই গান কবির পূর্ববর্তী একাধিক গানকে স্মরণ করিয়ে দেয় (তুলনীয়, এই করেছ ভালো নিঠুর, গীতাঞ্জলি ৯১ সংখ্যক; আরো আঘাত সইবে আমার, ঐ ৯০ সংখ্যক; ও নিঠুর আরো কী বাণ তোমার তূণে আছে, গীতালি ৬ সংখ্যক; আঘাত করে নিলে জিনে, ঐ ৯ সংখ্যক ইত্যাদি)। 'ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর' গানটিও গীতালির অন্তর্ভুক্ত। 'বসন্ত তোর শেষ করে দে রঙ্গ' গানটির ইঙ্গিত আপাতভাবে নাটকের বসন্তোৎসবের প্রতি। এই উৎসবকে কেন্দ্র করেই সুদর্শনার অন্তরে জ্বলেছিল রূপের আগুন। কিন্তু অরূপ রাজাকে সে চিনতে পারেনি, কারণ তিনি যে রূপাতীত। বসন্ত তো সেই রাজারই প্রতিরূপ—বাইরে তার ভূষণ, অন্তরে বৈরাগ্য। রাজা নাটকে ঠাকুরদার 'মোদের কিছু নাইরে নাই' এবং 'বসন্তে কি শুধু কেবল' এই গানদুটির ভাবার্থ সুরঙ্গমার আলোচ্য গানেরই প্রতিধ্বনি। 'এখনো গেল না আঁধার' গানে সুদর্শনার অন্তরে যে দ্বিধা ও অভিমান তখনও অবলুপ্ত হয়নি, তারই স্বগত ইঙ্গিত।

'আমার আর হবে না দেরি' গীতালির এই পূর্বরচিত গানটি সুরঙ্গমার কণ্ঠে যোজিত হয়েছে সুদর্শনার মানসপ্রস্তুতির পর্ব যখন শেষ হয়েছে। নাটকে ইতিমধ্যে রাত্রি অবসিতপ্রায়, তাই এই গানের সঞ্চারী অংশে 'আমার স্বপন হল সারা, এখন প্রাণে বীণা বাজায় ভোরের তারা' এই উক্তি সেই নাটকীয় সময়-পরিবেশকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে।

রাজা ও অরূপরতন দুই নাটকেই ঠাকুরদা গীতপ্রধান চরিত্র যার সংলাপে ও সুরে তত্ত্বপ্রধান নাটকের সূক্ষ্মতর উদ্দেশ্য ক্ষণে ক্ষণে আভাসিত হয়। ঠাকুরদাদার কণ্ঠে রাজা নাটকে যতগুলি গান ছিল, অরূপরতনে সে সংখ্যা অবশ্য হ্রাস পেয়েছে, দু একটি নতুন গানও যুক্ত হয়েছে। বস্তুত ঠাকুরদা তত্ত্বগত ভাবে অপরিবর্তিত থেকেও রাজা নাটকের তুলনায় অরূপরতনে অনেক বেশি অপ্রগল্ভ, মিতবাক্, স্তিমিতকণ্ঠ। ঠাকুরদার গান তাই এগারোটা থেকে ছয়ে পরিণত। এর মধ্যে পাঁচটি রাজা নাটকেরই, কেবল একটি নূতন। ঠাকুরদা তাঁর বালক সঙ্গীদলের সঙ্গে মেতে বেড়ানোর কারণ কী এই জিজ্ঞাসার উত্তরে 'আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায়' এই গান গেয়ে আপনার জীবনাদর্শ ব্যাখ্যা করেছিলেন। অন্যদিকে কবির আপন জন্মদিবস উপলক্ষে রচিত এই গান কবিরও জীবনাদর্শ। সুতরাং ঠাকুরদার মুখে আপনার জন্মদিবসের গান স্থাপন করে কবি ঠাকুরদা চরিত্রের আচার-আচরণ ও সংলাপের সঙ্গে আপনার সাদৃশ্য ও সারূপ্যই প্রমাণিত করলেন।

অরূপরতনে গানের দল নূতন যোজিত—সম্ভবত শান্তিনিকেতনের গীত-শিক্ষার্থীদের কথা স্মরণে রেখেই তাদের পরিকল্পনা। এই গীতসম্প্রদায়ের প্রথম গান 'আগুনে হল আগুনময়' বসন্তোৎসবে অগ্নিদাহ উপলক্ষে গীত। এই অগ্নি-কাণ্ডের মূলে ছিল সুদর্শনার ভ্রান্ত মোহ, তাই "তাহার চারিদিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল—সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল, এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার প্রভুর সঙ্গলাভ করিল"—সেই তত্ত্বেরই পূর্বাভাস এই গানখানি। এই গানেই ঘোষণা করা হয়েছে যে নাটকে অগ্নিদাহ একটি রূপক। গানের দলের দ্বিতীয় গান 'আমার অভিমানের বদলে আজ নেব তোমার মালা'। এই গানে সুদর্শনার ভ্রান্তিনিরসন ও অভিমানভঙ্গের

পর রাজার কাছে মিলনের সম্ভাবনা ঘোষণা করা হয়েছে। সুদর্শনা যখন সুরঙ্গমার কাছে আপনার সদ্যজাগ্রত চৈতন্যের দ্বারা রাজার স্বরূপ উপলব্ধির কথা স্বীকার করেছে, তখনই গানের দল গ্রীক কোরাসের মত নেপথ্য থেকে মঞ্চে এসে সুদর্শনার মানসিক অবস্থার মানচিত্র গানের সুরে এঁকে দিয়ে গেছে।

শারদোৎসবের রূপান্তর ঋণশোধ ১৩২৮ (১৯২১) সালে প্রকাশিত হয়। ১৩২৮এর আশ্বিনে শান্তিনিকেতনে অভিনয়োপলক্ষে এতে কিছু নতুন অংশ যোজিত হয়েছিল। ঋণশোধ, গুরু ও অরূপরতনের মত, অভিনয়-সৌকর্যের জন্য কবিকর্তৃক সংস্কৃত হলেও, অরূপরতন যেমন রাজার সংক্ষিপ্তরূপ হয়েও অনেকাংশে রূপান্তরিত, ঋণশোধও তাই। শারদোৎসব রচনাকালে কবি গীতাঞ্জলি পর্বে সবে প্রবেশ করেছেন, তখনও তাঁর নাট্যসাহিত্যে তত্ত্বমুখিতার তীব্র প্রভাব পড়েনি। ঋণশোধ রচনাকালে কবি তত্ত্বনাট্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত, তাই পূর্বের ঋতুউৎসবপ্রধান নাটক তত্ত্বনাটক হয়ে উঠেছে, অর্থাৎ শারদোৎসব হয়েছে ঋণশোধ। শারদোৎসবের গানগুলি ছিল ঋতুর সুরে গাঁথা, সোনার রৌদ্রে প্লাবিত। এখন ঋণশোধের গানে সেই রৌদ্রের উপর তত্ত্বের মেঘচ্ছায়া পতিত হয়েছে। শারদোৎসবে চরিত্র ছিল সন্ন্যাসী ঠাকুরদাদা লক্ষেশ্বর উপনন্দ রাজা রাজদূত অমাত্য ও বালক। ঋণশোধে এর সঙ্গে তত্ত্বপ্রচারের জন্য শেখর কবি এসে প্রবেশ করেছেন। তাছাড়া ঋণশোধ নাটকে সম্রাট বিজয়াদিত্য ও কবিশেখরের সংলাপের মধ্য দিয়ে এই নাটকের নাট্যপালার যে ভূমিকা রচনা করা হয়েছে, শারদোৎসবে তা ছিল না। এই ভূমিকা পূর্বরচিত ফাল্গুনীর ভূমিকার মত। কিন্তু এসবের ফলে নাটকটির পূর্বতন বাস্তবতা, কৌতূহল ও মাধুর্য ক্ষুন্ন হয়েছে। শেখর চরিত্রও নাটকের পক্ষে বাহুল্য, কিন্তু গীতপ্রধান ঋতুতত্ত্বভৌম নাটকে কবিরাই ঋতু-রাজের বন্দনাকারী ও দূত, সুতরাং এই কারণেই ফাল্গুনী বা ঋণশোধে কবির ভূমিকা অপরিহার্য। শেখর নামটি রবীন্দ্রনাথের প্রিয় নাম, গল্পগুচ্ছে জয়পরাজয় গল্পে (১২৯৯) রাজা উদয়নারায়ণের সভাকবির নামও ছিল শেখর। শারদোৎসব মোট দুটি দৃশ্যের নাটক—প্রথম দৃশ্য পথ—সংক্ষিপ্ত, দ্বিতীয় বেতসিনীর তীরবন—এটিই দীর্ঘতর। ঋণশোধে প্রথম দৃশ্য রাজসভা এবং মূল নাটক বেতসিনীর তীরবনে সংঘটিত। শারদোৎসবের ভূমিকায় 'বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে' গান ব্যতীত সমগ্র নাটকে মোট গান ছিল ৯টি।

ঋণশোধে ভূমিকার গান ছাড়া মোট গানের সংখ্যা হয়েছে ১১টি। সুতরাং অভিনয়ের প্রয়োজনে সরলীকরণ ও সংক্ষেপীকরণের জন্যই শারদোৎসব ঋণশোধ হয়নি, কোনো নিগূঢ় সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য ছিল। ঋণশোধ গুরু বা অরূপরতনের মত সংক্ষিপ্ততর নয়। ঋণশোধে শারদোৎসবের কয়েকটি গান বাদ পড়েছে ও নূতন গান যুক্ত হযেছে। শারদোৎসবে 'তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ' গানটি সন্ন্যাসীর কণ্ঠে ছিল, 'লেগেছে অমল ধবল পালে'ও তাই। ঋণশোধে দুটি গানই শেখর কবির কণ্ঠসম্পত্তি। এমন কি ঠাকুরদা ও বালকদের সমাপ্তি-সংগীত 'আমার নয়ন-ভুলানো এলে' এখন শেখরের অধিনায়কত্বে সমবেতভাবে গীত হয়েছে। কড়ি ও কোমলের যুগের 'আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে' গানটিও এই প্রসঙ্গে কবি ব্যবহার করেছেন।

ঋণশোধে সন্ন্যাসীবেশী মহারাজ বিজয়াদিত্যের তুলনায় শেখরের গুরুত্ব বৃদ্ধির কারণ, 'কবির বীণাতেই সুন্দরের আরাধনা বেজে ওঠে'—এই সাম্প্রতিক বিশ্বাস। ঋণশোধ কবির কলমে রচিত। নাট্যকারকে ক্রমশ নিষ্প্রভ করে গীতিকবি ও গীতিকার রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে প্রাধান্য অর্জন করছেন। তাই শারদোৎসবে সন্ন্যাসী বিজযাদিত্যের অনেক উক্তি ঋণশোধ নাটকে শেখর অপহরণ করেছেন। বিজযাদিত্য কেবল সিংহাসনের অবরোধ থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন। সে মুক্তি যে শরতের আলোয, শেখরের সান্নিধ্য ছাড়া, সংগীত ছাড়া, তিনি যেন তা বুঝতে পারতেন না। শারদোৎসবে সন্ন্যাসী একবার উপলব্ধি করেছিলেন 'জগৎ আনন্দের ঋণশোধ করছে'। কিন্তু তার জন্য উপনন্দকে, বেতসিনীর তীরবনে ছেলের দলকে শরৎপ্রভাতে দেখার দরকার ছিল। আর ঋণশোধের ভূমিকাতে কবিই তা জানিয়ে দিলেন—"আমার মস্ত দোষ এই যে, আমি কেবল স্মরণ করাই, এই যে বিশ্ব আমাদের চিত্তে অমৃত ঢেলে দিচ্ছে তার ঋণ আমাদের শোধ করতে হবে।" তত্ত্বের এই কক্ষটি শেখরের সংগীতের চাবি দিয়ে খুলে দেওয়া হযেছে। রাজা তাই কবিকে বলেছেন, 'তোমার কবিতা দিয়ে তুমি বিশ্বকে অমৃত ফিরিযে দিচ্ছ'। কবিতা এখানে কবির গানই।

ঋণশোধের নতুন ভূমিকা-সংগীত 'হৃদয়ে ছিল জেগে দেখি আজ শরৎ মেঘে'। গানটি প্রেমসংগীত এবং পূর্বব্যাখ্যাত শারদোৎসব-তত্ত্বের সঙ্গে এর সম্পর্ক গভীর নয়। অথচ এই গানখানিকে ঋণশোধের ভূমিকায় কবি কেন স্থাপন করলেন? বলাকা-ফাল্গুনীর যুগ থেকেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নাটকে 'পথ-হারানো ভুলে-

যাওয়া যৌবনের' এক অপ্রত্যাশিত পুনরাবির্ভাব-পর্ব শুরু হয়েছে। এই বিস্মৃত-প্রায় যৌবন ও পুরাতন প্রেমস্মৃতির সক্রন্দন প্রত্যাবর্তনে তাঁর সমকালীন কাব্যের অনেক স্তবক-পংক্তির আশেপাশে স্ফটিকশুভ্র অশ্রুমুক্তা জমে উঠেছে। ১৯১৯-২০ (১৩২৬-২৭) সালে লিপিকার গদ্য কথিকাগুলির ভিতর দিয়েও কবির এই প্রেমস্মৃতির বিষণ্ণ প্রত্যাবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ঋণশোধ রচনাকালে 'আজি শরৎতপনে প্রভাতস্বপনে কী জানি পরাণ কী যে চায়' এই গানটিকে কড়ি ও কোমলের যুগ থেকে উদ্ধার করে এনে কবির কণ্ঠে সমর্পণ করে তিনি অবশ্যই এই গানের স্মৃতির ও রচনাকালীন অনুষঙ্গের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রথম যৌবনের যে করুণ প্রেমস্মৃতি এই গানটির সঙ্গে জড়িত, কড়ি ও কোমলের পাঠকের কাছে তা অবশ্যই পরিচিত। সেই স্মৃতিলোকশায়ী প্রেম চিরবিরহের দীপশিখাটি জ্বেলে রেখেছে রবীন্দ্রকাব্যে—থেকে থেকে তারই আলোর বেদনা এসে লাগে কাব্যে-নাটকে। বলাকা থেকে, বিশেষ করে পূরবী থেকে এই বিরহবিলাপ ও স্মৃতিরোমন্থন যে কোনও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আমাদের মনে হয, শারদোৎসবকে ঋণশোধে পরিণত করার সময় কবি পুনরায এই পুরাতন স্মৃতির দ্বারা আক্রান্ত হযেছিলেন। তাই ঋণশোধ নাটকে শেখরের কণ্ঠে আমরা যা শুনি তা ঠিক শারদোৎসবের তত্ত্ব নয, তার মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে বিরহবেদনার কথা কেন এসে পডে?

"প্রেমও অমৃত মহারাজ। আজ সকালের সোনার আলোয় পাতায় পাতায় শিশির যখন বীণার ঝংকারের মত ঝলমল করে উঠল তখন সেই সুরের জবাবটি ভালোবাসার আনন্দ ছাডা আর কিছুতে নেই। আমার কথা যদি বলেন সেই আনন্দ আজ আমার চিত্তে অসীম বিরহবেদনায উপছে পডছে।"

আনন্দ থেকে অসীম বিরহবেদনা এবং সেই বিরহবেদনা থেকে 'আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে কী জানি পরাণ কী যে চায়' এই সহজ উত্তরণ কেমন করে সম্ভবপর হল! গানটি তো অবিমিশ্রভাবে স্বজন-হারানোর বিলাপ, সেখানে আনন্দের কোনো সম্পর্ক নেই। সে গানের মূল কথা—

> আজি কে যেন গো নাই এ প্রভাবে তাই জীবন বিফল হয় গো,
> তাই চারিদিকে চায় মন কেঁদে গায়, এ নহে এ নহে নয় গো।

একই কারণে কবি ঋণশোধের ভূমিকায় সদ্যরচিত এই গানটি স্থাপন করেছেন—

হৃদয়ে ছিল জেগে দেখি আজ শরৎ মেঘে।
কেমনে আজকে ভোরে গেল গো গেল ঝরে
তোমার ঐ আঁচলখানি শিশিরের হাওয়া লেগে।

ঋণশোধের আরও একটি গানেও শরতের শিশিরসজল শূন্যতায় ক্ষণিকের অতিথির স্মৃতি কবিকে উন্মথিত করেছে—

আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে আমার মনে।
ও সে আছে বলে
আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে,
প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে আমার বনে।
সে আছে বলে চোখের তারার আলোয়
এত রূপের খেলা রঙের মেলা অসীম সাদায় কালোয়
ও সে সঙ্গে থাকে বলে
আমার অঙ্গে অঙ্গে হরষ জাগায় দখিন-সমীরণে।

এর সঙ্গে অনিবার্যভাবে মনে পড়ে 'ছবি' কবিতার কথা। কবি শেখরের আরেকটি গান 'দেওয়া-নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া তোমায় আমায়'এর সঙ্গে বলাকার ২৮ সংখ্যক কবিতার ভাবসাদৃশ্য আছে।

১৩২৪ সালে গুরু, ১৩২৬ সালে অরূপরতন এবং ১৩২৮ সালে ঋণশোধ, চার বৎসরের মধ্যে এই তিনটি নাটক কবির পূর্বরচিত নাটক অবলম্বনে পুনর্লিখিত হয়। কিন্তু তিনটি নাটকই যে অভিনয়-সৌজন্যে সংক্ষিপ্ত, অবান্তরবর্জিত করা হয়েছে, একথা সত্য নয়। বস্তুত সংশোধন ও রূপান্তরকার্যে এক জাতীয় সিসৃক্ষু উৎসাহই এই নাট্যরূপগুলিতে সক্রিয় ছিল, কবি যে কৈফিয়ৎ দিন না কেন। লক্ষণীয় যে, এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক কাব্যরচনা স্তিমিত—একে অনুর্বর পর্বই বলা যায়। লিপিকার অনেকগুলি কথিকা এই সময়ে লেখা—যদিচ সেইগুলিও মৌলিক নয়—বহুকাল পূর্বের 'পুষ্পাঞ্জলি'র এক প্রকার রূপান্তর মাত্র। এই সময় কবির গীতরচনাই একমাত্র অব্যাহত ছিল। ১৩২৬ সালে, এক বৎসরের মধ্যে গীতিবীথিকা, কাব্যগীতি, ও অরূপরতন প্রকাশিত হয়। সুতরাং একথা অনুমান করা অসংগত নয় যে, আলোচ্য তিনখানি নাটকের পরিবর্তনে কবির সমকালীন অন্তর্মুখী তত্ত্বচিন্তা নাটকগুলিতে সংযোজিত নূতন গানগুলিতেই বেশি করে নিহিত। ১৩২৮ সালের ১৮ কার্তিক প্রমথ চৌধুরীকে কবি লিখেছিলেন—

"মাঝে মাঝে প্রায়ই গান লিখি। যখন লিখি তখন মনে হয় স্বরাজ ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুতর নয়—মানুষের ইতিহাসে অনেক স্বরাজ বুদবুদের মত উঠেছে আর কেটে গেছে—কিন্তু যে গানগুলাকে দেখতে বুদবুদের মত তারা আলোর বুদবুদ নক্ষত্রের মতই। সৃষ্টিকর্তার খেলেনাগুলির সঙ্গে তাদের রঙের মিল আছে। সেইজন্যই যখন তারা গড়ে উঠছে তখন কর্তব্য ভুলে যাই। অথচ দেশের কর্তাব্যক্তিদের কাছ থেকে হুকুম আসছে যে সময় খারাপ অতএব বাঁশি রাখো লাঠি ধরো। যদি তা করি তাহলে কর্তারা খুশি হবেন, কিন্তু আমার এক বাঁশিওয়ালা মিতা আছেন কর্তাদের অনেক উপরে, তিনি আমাকে একেবারে বরখাস্ত করে দেবেন।"

১৯২৪ সালে পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারিতে যে কবি লিখেছিলেন, 'খুব কষে গান লিখছি' তাও এই যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রজীবনীকারের মন্তব্য দিয়ে পরিচ্ছেদ শেষ করি—

"১৯১৭ সাল হইতে ১৯২৪ পর্যন্ত এই আট বৎসরে কবির গ্রন্থতালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে সৃষ্টিকার্যে কবি কোথাও নাই, এই পর্ব হইতেছে বিশ্বভারতীর জন্য ভ্রমণপর্ব, রাজনীতি আলোচনার পর্ব। তবে আপাতদৃষ্টিতে এই সাহিত্যশূন্য বৎসরগুলি কবির অন্তর্জীবনের সম্পদ হরণ করে নাই। কারণ গীতসরস্বতী কবিকে নিঃসঙ্গ রাখেন নাই।"

সেই গীতসরস্বতীর বেদীতলে অর্ঘ্যদান-করা গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ করে ঋণশোধ ও অরূপরতনের নাম উল্লেখযোগ্য।

১১

১৩২৯ সালের (১৯২৩) ফাল্গুন মাসে গ্রন্থকারে প্রকাশিত বসন্ত পরে ঋতু-উৎসব (১৩৩৩) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল। বসন্ত পূর্বরচিত ফাল্গুনীর মতই ঋতুউৎসবের তত্ত্বনাট্য—সুতরাং সাধারণ নাটকের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য নয়। মুখ্যত সংগীতের আকর্ষণেই এগুলির নাটকীয়তা। ফাল্গুনীর মত বসন্তও রাজসভার পরিবেশে স্থাপিত, এখানেও রাজসভা থেকে পলাতক রাজার সম্মুখে সভাকবি তাঁর নাট্যপালা উপস্থিত করেছেন। ফাল্গুনীর পালায় গান ছিল নাট্যবস্তুর উদ্ঘাটনী-সংকেত, 'গানের চাবি দিয়েই এর এক একটি অঙ্কের দরজা খোলা হবে।' বসন্ত পালাতেও কবি অনুরূপ ভাষাতে বলেছেন—

"এতে মূলেই অর্থ নেই, বোঝা না বোঝার কোন বালাই নেই, কেবল এতে সুর আছে।"

ফাল্গুনীতে রাজার সম্মুখে কবির নাট্যপালা সুরু হওয়ার পর রাজা দর্শকে পরিণত হয়েছিলেন, তাঁর কোন স্বতন্ত্র ভূমিকা ছিল না। সমগ্র নাট্যবস্তু চারটি দৃশ্য বিভক্ত ছিল এবং প্রতিটি দৃশ্যের এক একটি গীতিভূমিকা ছিল। বসন্তে একটিই দৃশ্য, অন্য কোন স্বতন্ত্র নাট্যভূমিকা নেই। গীতিভূমিকাই এখানে নাট্য অর্থাৎ সনৃত্য-গীত। রাজা ও কবি আগাগোড়া সংলাপরত, কবি ভাষ্যকার মাত্র। ফলে কেবল গান নয়, কবির কণ্ঠে আমরা গানগুলির ব্যাখ্যানও পাই। এইভাবে বসন্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঋতুসংগীতগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যায় নেমেছেন। ইতিপূর্বে মুক্তধারা নাটকে ধনঞ্জয় যেমন নিজের গানের মধ্যে থেকে থেকে গানের অর্থ ব্যাখ্যা করেছিলেন, বসন্ত গীতপালাতেও গানের ফাঁকে বা শেষে কবির ভূমিকায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঋতুউৎসবের ভাবার্থভাষ্য রচনা করেছেন। যে বসন্ত বাস্তুছাড়াদের দলপতি, কবি যে তাঁদেরই 'গানের তলপি বয়ে' বেড়ান, এই নাটগীতে সে কথা সাড়ম্বরে ঘোষণা করে প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ সংগীতকেই তাঁর কাব্যজীবনের শ্রেষ্ঠ প্রকাশমাধ্যমরূপে স্বীকার করেছেন। এই কারণে রবীন্দ্রসংগীতের ইতিহাসে বসন্ত পালাটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বসন্তের গীতিমুখর নর্তননন্দিত চরিত্রগুলি ফাল্গুনীর গীতিভূমিকারই সম্প্রসারণ। চরিত্রগুলি মানবিক নয়, বসন্তের প্রতীক ও আনুষঙ্গিকগুলিই চরিত্ররূপে কল্পিত হয়েছে। যথা, দখিন হাওয়া মাধবী মালতী বেণুবন ঋতুরাজ ঝুমকোলতা ইত্যাদি। গানই তাদের সংলাপ, গানের সূত্র ধরে অস্পষ্টভাবে তাদের মধ্যে একটি নাটক ঘনিয়ে এসেছে। সে নাটকে স্বভাবতই কৌতূহল বা উৎকণ্ঠা নেই, তথাকথিত নাট্যধর্মিতা নেই; তবু তা নাটক, আসা-যাওয়ার লীলানাটক। কবি সেই নাটকের সূত্রধার। সুরের রসে মন মজলে তবেই এই অন্তরঙ্গ নাটকের মর্ম অনুধাবন করা যায়। তত্ত্বের দিক থেকে বসন্তের তত্ত্ব ফাল্গুনীরই দোসর—"আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে তার এক পিঠে নূতন, এক পিঠে পুরাতন। যখন উলটে পরেন তখন দেখি শুকনো পাতা, ঝরা ফুল; আবার যখন পালটে নেন তখন সকালবেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী—তখন ফাল্গুনের আম্রমঞ্জরী, চৈত্রের কনকচাঁপা। উনি একই মানুষ নূতনপুরাতনের মধ্যে লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছেন।"

বসন্ত রচনার পূর্বে বর্ষায় বর্ষামঙ্গল রচনা করে কবি যে ঋতুউৎসবের সূচনা করেছিলেন এবং যে ঋতুউৎসব কবিজীবনের শেষ কয়েকটি ঋতু আচ্ছন্ন ও অধিকার করেছিল, বসন্তে তা যেন পূর্ণতা পেয়েছে। বসন্তের রচনাকালে কবির সাহিত্যসৃষ্টি অপেক্ষাকৃত মন্থর ছিল, সংগীতের মধ্যেই কবি সারস্বত মুক্তি লাভ করেছিলেন।

বসন্তের ২৩টি গানের মধ্যে অধিকাংশই এই সময়ে রচিত, কেবল 'গানগুলি মোর শৈবালেরই দল' বলাকার ১৫ সংখ্যক 'মোর গান এরা সব শৈবালের দল' কবিতার গীতিরূপান্তর। সম্ভবত এই সময়ই কবি এটিতে সুর বসান (দ্রষ্টব্য প্রেয়সী, ফাল্গুন ১৩২৯)। কবির গান 'আমরা বাস্তুছাড়ার দল' গীতবিতানে 'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল' এই রূপান্তরে পাওয়া যায়। 'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল' অবশ্য ১৩০২ আশ্বিনে রচিত।

'বসন্ত' গীতিনাট্যের সূচনায় আছে বসন্তের পরিচরদের বসন্ত-আবাহন-গীতি—'সব দিবি কে, সব দিবি পায়, আয় আয় আয়'। ঋতুরাজের আগমনে 'সব দিয়ে ফেলতে হবে' আপনার সর্বস্ব-রিক্ত শূন্যতার দ্বারাই যথার্থ পূর্ণতার উৎসব করা যায়, ভাবটি কবির নূতন নয়। কবির বসন্ত ঋতুরাজ, রাজা নাটকে তাঁকে পূর্বে আমরা দেখেছি। তিনি রাজা হয়েও ঋষি, ঐশ্বর্যবান হয়েও রিক্তসম্পদ। তাঁর বাইরে ঐশ্বর্য-সমারোহ কিন্তু অন্তরে তাঁর বৈরাগ্য। আজ বিশ্বভারতীর অর্থকোষ পূর্ণ করার বাস্তব দৈন্যে অর্থপীড়িত কবির কাছেও বস্তু-জগতের সম্পদ, বিত্তের অন্তঃসারশূন্যতা অনুভূত হয়েছে। সংসারের অভাব-অভিযোগে কর্মব্যস্ততায় মানুষ যখন অবরুদ্ধ থাকে, তখন ঋতুর অভ্যর্থনার আয়োজনে ত্রুটি ঘটে, এ বেদনা কবির চিরকালের। তাই ক্ষণস্থায়ী বসন্তের সম্বর্ধনার আয়োজনে যেন কোনো ত্রুটি না ঘটে, এই আকূতি নিয়ে কবি গেয়েছেন—

ক্ষণেক কেবল তাহার খেলা, হায় হায় হায়।
তারপরে তার যাবার বেলা, হায় হায় হায়।
চলে গেলে জাগবি যবে ধনরতন বোঝা হবে—
বহন করা হবে যে দায়, হায় হায় হায়।

শরতের মত বসন্তও ক্ষণিকের অতিথি, সেও 'ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া'। এই বসন্তের অভ্যর্থনায় পুষ্পপল্লব আম্রমঞ্জরী শালবীথিকার আয়োজনে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নেই। বনভূমি তাই উদার আতিথ্যে বসন্তকে বলে—'তোমার চলার

পথে পথে ছেয়ে দেব ভুঁই'। আম্রকুঞ্জ নিজেকে নির্মঞ্জরিত করে পূর্ণ হতে চায়—

ফল ফলবার আশা আমি মনে রাখিনি রে,
আজ আমি তাই মুকুল ঝরাই দক্ষিণসমীরে।

কবি ব্যাখ্যা করে বলেন, 'আম্রকুঞ্জ মুকুল ঝরাতে ভরসা পায় বলেই তার ফল ধরে।' করবীর কণ্ঠে সুর, কারণ তার গোপন পল্লবে যে বসন্তের প্রণয়-সম্ভাষণ চলেছে—

সে কি আমার কুঁড়ির কানে কবে কথা গানে গানে,
পরাণ তাহার নেবে কিনে এই নব ফাল্গুনের দিনে—
জানিনে, জানিনে।

ফাল্গুনী নাটকে ছিল বেণুবনের গান—'ওগো দখিন হাওয়া ও পথিক হাওয়া দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে'। আজ আবার বেণুবনে আর এক বসন্তের চঞ্চলতা লাগল, তার আন্দোলিত পাতায়-শাখায় নীরব সংগীত মূর্ত হতে চাইল বসন্ত বাতাসের স্পর্শে। তাকেই গান করে তুললেন কবি। শত লক্ষ যুগ ধরে বেণুবনের এই আর্তিকে কে-ই বা প্রকাশ করতে পেরেছেন—'দখিন হাওয়া জাগো জাগো, জাগাও আমার সুপ্ত এ প্রাণ'?

ফাল্গুনীর বেণুবন হঠাৎ বসন্ত বাতাসের সাড়া পেয়েছিল বলেই গেয়ে উঠেছিল—'এসো আমার শাখায় শাখায় প্রাণের গানের ঢেউ তুলিয়ে'। বসন্তের বেণুবনের ভাষাও একই সুরে গাঁথা—

আমি বেণু, আমার শাখায় নীরব যে হায় কত না গান।
পথের ধারে আমার কারা,
ওগো পথিক বাঁধন-হারা,
নৃত্য তোমার চিত্তে আমার মুক্তিদোলা করে যে দান।

অন্ধকারে কেঁপে ওঠে কম্পিত প্রদীপশিখা, মাতাল দখিন হাওয়ার আক্রমণ থেকে আপনাকে অঞ্চলতলে আবৃত করার ক্ষীণ আবেদন তার। বসন্তের সঙ্গে শত্রুতা নয়, কিন্তু বসন্তের সাড়া জাগবে তার ঘরের কোণে। সেই দূরের গাথা বনের বাণীকে কাণে কানে শোনাবে দীপশিখা। এই তো বসন্ত! বেণুবন চায় তার মত্ততাকে, প্রদীপশিখা চায় তার সংগোপন নিভৃতি। বসন্ত সকলেরই, সে জাগায়, আবার নিভৃতে কথাও বলে। সে চাঁপাকরবীর ডালপালাকে উতলা করে তোলে, বনাঞ্চলে জাগিয়ে তোলে সুরের মাতন,

নাচনের নূপুরধ্বনি। ফুলের ঝংকম্পনে ধরা পড়ে তার আগমনসংবাদ, তৃণটি পর্যন্ত খবর পায় কখন বসন্ত আসে। বহুদিন পূর্বে 'বসন্তযাপন' নামক প্রবন্ধে কবি লিখেছিলেন—

'এই তো অল্পদিন হইল আমাদের আমলকী মউল ও শালের ডাল হইতে খসখস করিয়া কেবলই পাতা খসিয়া পড়িতেছিল—ফাল্গুন দূরাগত পথিকের মত যেমনি দ্বারের কাছে আসিয়া একটা হাঁফ ছাড়িয়া বসিয়াছে মাত্র, অমনি আমাদের বনশ্রেণী পাতা-খসানোর কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া একেবারে রাতা-রাতিই কিসলয় গজাইতে সুরু করিয়া দিয়াছে'। (বিচিত্র প্রবন্ধ ১৩০৯ চৈত্র)

আজ সেই কথাটি মাধবীর স্বগত-সংগীতে কবি জানিয়ে দিলেন—

সে কি ভাবে গোপন রবে লুকিয়ে হৃদয় কাড়া
তাহার আসা হাওয়ায় ঢাকা, সে যে সৃষ্টিছাড়া।

আকাশের পূর্ণচন্দ্র হয়ে যখন অকস্মাৎ দক্ষিণবাতাসে অমরার স্বপ্ন ভেসে আসে তখন কবি তাঁর গানের সুর দিয়ে তাকে ধরতে চান, শালবীথিকা যেমন ছায়া দিয়ে সেই হাসিকে ধরতে চায়। কবি সেই দেবলোকের স্বপ্নস্বরূপ চন্দ্রোদয়ের বরণগীত শালবীথির কণ্ঠে বকুলের কণ্ঠে নদীর কণ্ঠে তুলিয়ে দিয়েছেন। স্বপনলোকের অশরীরিণী মায়া যে গীতিসুরে সঞ্চরণ করতে পারে, 'ভাঙল হাসির বাঁধ', 'ও আমার চাঁদের আলো', 'কে দেবে চাঁদ তোমায় দোলা' প্রভৃতি গানগুলি না শুনলে তা বোঝা যাবে না। বকুল যেমন করে বলে—

যে গান তোমার সুরের ধারায় বন্যা জাগায় তারায় তারায়,
মোর আঙিনায় বাজল সে-সুর আমার প্রাণের তালে তালে।...
শুভ্র, তুমি করলে বিলোল আমার প্রাণে রঙের হিলোল
মর্মরিত মর্ম আমার জড়ায় তোমার হাসির জালে।

এ যে বকুলের কণ্ঠে জ্যোৎস্নামূর্ছিত কবির অন্তরেরই বাণী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নদীর কণ্ঠেও কবিরই মুগ্ধ হৃদয়ের সম্মোহগীতির কলরোল—

আজ মানসের সরোবরে
কোন মাধুরীর কমলকানন দোলাও তুমি ঢেউয়ের পরে।
তোমার হাসির আভাস লেগে বিশ্বদোলন দোলার বেগে
উঠল জেগে আমার গানের কল্লোলিনী কলরোলা।

তারপর রসের ডালি রঙের থালি সুরের সাজি পূর্ণ করে বসন্ত বিদায় নেয় —'পূর্ণ থেকে রিক্ত, রিক্ত থেকে পূর্ণ, এরই মধ্যে ওঁর আনাগোনা'। বাঁধন-শক্কা

ও বাঁধন-খোলা এও যেমন এক খেলা, পূর্ণ-রিক্ত হওয়াও তেমনি আর এক খেলা। তখন আকাশ দূরের গানে ভরে ওঠে, অলখদেশে ঋতুরাজের ডাক পড়ে। পাতাঝরা কুসুমঝরা নিকুঞ্জকুটিরে মাধবী অশ্রুনীরে তাকায়, মিলন-পিয়াসী ঝুমকোলতা বৃথাই পথিককে ফিরে ডাকে, আকন্দ বিদায় বেলার সুর ধরে, ধুতুরা খেলাভাঙার খেলায় আহ্বান জানায় তাকে। জবাফুলের গানে কবির চিরবিরহবেদনার চেনা সুরটি আমরা শুনতে পাই—

> নয়ন হতে তুমি আসবে প্রাণে,
> মিলবে তোমার বাণী আমার গানে গানে।
> বিরহব্যথায় বিধুর দিনে দুখের আলোয় তোমায় নেব চিনে,
> এ মোর সাধনা রে।

এই তো কবির চিরকালের সাধনা—সেই 'ছবি' কবিতা থেকেই মর্তের চিরবিচ্ছেদ-বেদনার মধ্য দিয়ে প্রেমিকের অন্তর্ধান-স্মৃতিকে অন্তর-ধ্যানপটে অক্ষয় করে রাখার সাধনা, বিচ্ছেদেই খণ্ডমিলন পূর্ণ করার সাধনা। এমনি করেই মুক্তিপাগল বৈরাগীদের চিত্ততলে চিরদিন জ্বলে প্রেমসাধনার হোমহুতাশন, সেই হুতাশনেই রবীন্দ্রনাথের প্রেম কবিতা চিরদীপ্তিময়ী—

> সব আশাজাল যায় রে যখন উড়ে পুড়ে
> আশার অতীত দাঁড়ায় তখন ভুবন জুড়ে
> স্তব্ধ বাণী নীরব সুরে কথা কবে।

বসন্তউৎসব সুরু হয়েছিল ঋতুমঙ্গলে, শেষ হল স্মৃতিবেদনায়, ঠিক যেমন হয়েছিল ঋণশোধে। ফাল্গুনীর মত কবি বসন্তে শেষ পর্যন্ত পুরাতন প্রেম-বেদনাকেই আবার ভাষা দিলেন—'নতুন করে পাব বলেই হারাই ক্ষণে ক্ষণ' এই মন্ত্রেই বসন্ত উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে।

১২

১৩৩০ সালে গ্রীষ্মাবকাশে শিলঙে বসে যক্ষপুরী নামে কবি যে নাটকটি রচনা করেন সেটি পরে নন্দিনী এবং অবশেষে রক্তকরবী নামে ১৩৩১ সালের আশ্বিন সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় (গ্রন্থপ্রকাশ ১৩৩৩, ১৯২৬ ডিসেম্বরে)।

রক্তকরবীতে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব-নাটকের পূর্ণতা ঘটেছে। এই নাটকে কবি আধ্যাত্মিক অতীন্দ্রিয় সাংকেতিকতার আভাস দেননি, নিতান্ত সমসাময়িক সমাজব্যবস্থা, ঔপনিবেশিক দেশের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক পরিবেশ

সম্পর্কে তাঁর গভীর চিন্তা ও বিশ্লেষণ আশ্চর্য রূপকল্পের মাধ্যমে এখানে নাট্যরূপ লাভ করেছে। ধনতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থায় যে সম্পদ-বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত মুনাফার অতিরেক নিহিত, শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের যে দুরবস্থা ও শোষণ আধুনিক সমাজসচেতন ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্য অভিজ্ঞতা, এই নাটকে তারই পটভূমিকায় কবি একটি নিষ্ঠুর বর্তমান ও আদর্শায়িত ভবিষ্যতের চিত্র রচনা করলেন। বাস্তবতা ও সত্যই রক্তকরবীর প্রেরণা, দৃশ্য ও সংলাপই এই নাটকের প্রধান ব্যাপার, তাই কাব্যসংগীত রক্তকরবীতে বড় হয়ে ওঠেনি, তা সংলাপের বিকল্প ভূমিকা গ্রহণ করেনি। বরং রক্তকরবীর গান সংগীতরূপেই বিরাজমান। সেখানে সংগীতের সুর মৃত্তিকাগর্ভের কঠিন অন্ধকার ও দুঃসহ পীড়নযন্ত্রণাকে ঈষৎ লঘু করে তোলে মাত্র—কিন্তু রাজা বা ঋণশোধের মত কোনো পরমরমণীয় অরূপ সত্তার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে না।[২১]

রক্তকরবীর মুখ্য সংগীতকার বিশু। সে ব্যক্তি যথার্থই গায়ক, যক্ষপুরীতে তার সমস্ত ব্যক্তিসত্তা ও প্রয়োজন সত্ত্বেও তার পূর্বার্জিত শিক্ষায সংগীতকে সে ভোলেনি, তাই তার রুদ্ধহৃদয়ের বেদনাকে সে কখনও কখনও গানের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করে। তাছাড়া নন্দিনীর একটি গান আছে—'ভালবাসি ভালবাসি'। সে গান তার চরিত্রের মাধুর্য বিশিষ্টতা ও সজীবতাকে ফুটিয়ে তুলেছে, যদিও বিশুই এ গান নন্দিনীকে শিখিয়েছে। অবশ্য এই গান না থাকলেও নন্দিনী চরিত্রের হানি ঘটত না। একমাত্র 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' এই পরিবেশ-সংগীতটি এই নাটকে সর্বাধিক ইঙ্গিতময়।

রক্তকরবীর মোট গীতসংখ্যা, পরিবেশ-সংগীত বাদ দিয়ে, সাতটি। যে পর্বে রবীন্দ্রনাথ অফুরন্ত গীতিরচনায় পূর্ণ ছিলেন, সে পর্বে রক্তকরবীতে মাত্র এই কটি গান বিস্ময়কর। তবে তাকে অসংগত বলব না। সংগীতের স্বল্পতার দ্বারাই প্রমাণিত হয়, রক্তকরবী তথাকথিত সাংকেতিক-পর্যায়ভুক্ত নয়, হয়ত বা রক্তকরবীই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র সামাজিক নাটক। অবশ্যই সামাজিক নাটক শব্দটি নাট্যসাহিত্যের পূর্ববর্তী প্রচলিত শর্তে ব্যবহার্য নয়। রক্তকরবী রচনাকালে কবিগুরুর নাট্যসত্তা যে সর্বাধিক সমাজসচেতন ছিল, এই অর্থেই সামাজিক কথাটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। মরাধনের প্রেত-সাধনায় রত যক্ষপুরীতে নন্দিনী চরিত্রই 'ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যাতারা', তাই তাকে দেখে 'নিরেট নিরবকাশ গর্তের পতঙ্গ'দের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে। তাই কিশোর মারের মুখের ওপর দিয়ে তাকে রোজ রক্তকরবী ফুলের জোগান দেয়,

বিশু শোনায় গান। যক্ষপুরীর কর্মিকেরা বিশুকে বলে বিশুপাগল। যক্ষপুরীর অন্ধকারের জীবিকায় আবদ্ধ থাকলেও জীবনের স্বরূপ তার কাছে অজ্ঞাত নয়, তাই বিশুর কণ্ঠে এখনও গান আছে, হৃদয়ে ভাব আছে, মুখে ভাষা আছে। নাটকের দৃশ্যসূচনায় দেখি 'কিছুদিন থেকে হঠাৎ ওর গান খুলে গেছে।' চন্দ্রার মুখে জানা যায়, 'ওকে নন্দিনীতে পেয়েছে, সে ওর প্রাণ টেনেছে, গানও টেনেছে।' বিশুর প্রথম আবির্ভাব 'মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে' গানের মধ্য দিয়ে। এই গান নন্দিনীর প্রতি উদ্দিষ্ট। চন্দ্রা তো খোলাখুলিই জানিয়েছে 'তোমার স্বপনতরীর নেয়েটি কে সে আমি জানি।' বিশুর স্বপনতরীর নেয়ে বাহ্যত নন্দিনী হলেও এই একটি গানের ভাষায় বিশুর স্বপ্নকল্পনার সুদূরতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশু কেবল পাগল নয়, সে কবিও। অসীমের যে রহস্যদূতী দুরান্ত থেকে সীমার বাতায়নে ক্ষণে ক্ষণে উঁকি দিয়ে যায়, বিশুর জাগ্রত চৈতন্য তারই অনুসরণ করে। তাই অসীম রহস্যচারিণীর ছদ্মবেশ খসিয়ে তার প্রসন্ন হাসিতে আপনাকে উদ্ভাসিত করার আকূতি বিশুর এই গানটিতে প্রকাশ পেয়েছে। বিশুর দ্বিতীয় গান 'তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে'। এই স্বল্পবাক্ গানটি যক্ষপুরীর নিরানন্দ গুহাগহ্বরে কর্মপিষ্ট মুমূর্ষু মানুষগুলির মরণের মুখে ধাবিত আর্তনাদ মাত্র। এ গানের ব্যাখ্যা বিশুই করেছে—

'আমাদের না আছে আকাশ না আছে অবকাশ। তাই বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসিগান সূর্যের আলো কড়া করে চুঁইয়ে নিয়েছি এক চুমুকের তরল আগুনে। যেমন ঠাস দাসত্ব তেমনি নিবিড় ছুটি।'

'তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ' বিশুর এবং রক্তকরবী পালার সর্বশ্রেষ্ঠ, এমন কি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গান। এ শুধু বিশুর গান নয়, তার জীবনবেদ, যক্ষপুরীর রুদ্ধশ্বাস শোষণযন্ত্রণার মধ্যে নিরাশ্বাস জীবনের শেষ জীবনাসক্তির অমৃততৃষ্ণা। যক্ষপুরীর যান্ত্রিক জীবনে নন্দিনীর মত প্রাণচঞ্চল প্রেমপুলকে পরিপূর্ণ নারীর প্রবর্তনা যখন এসে পড়ে আচমকা আলোর মত, অন্ধকারের বুকে যখন একফালি আলোক আশার মত দেখা দেয়, বিশুর কাছে নন্দিনী সেই বদ্ধ গুহায় একখানি আকাশ, বিশুর কাছে নন্দিনী সমুদ্রের অগম পারের দূতী। তাই নন্দিনীকে বিশু 'ঘুমভাঙানিয়া' 'দুখজাগানিয়া' বলে সম্বোধন করেছে। এই গানের গোপন ব্যথায় নন্দিনী বিশুর মনের খবর পায়, তার দুঃখের দোলনচাঁপা হঠাৎ যেন সুরের সুবাস ছড়িয়ে যায় নন্দিনীর মনে।

নন্দিনীর সঙ্গে বিশুর সম্পর্ক অবশ্যই প্রেমের নয়, নিষ্কাম সখ্যের। কিন্তু নন্দিনী বিশুর শুধু সমবেদনার সখী নয়, বিশুর হৃদয়ের নিভৃতে এক ব্যর্থ প্রেমের ক্ষতস্থানে নন্দিনী মাধুর্যের প্রলেপ দিয়ে গেছে। লক্ষণীয় যে, রক্তকরবী নাটকে বিশুর গানের মধ্য দিয়েই গীতিসম্রাট কবি সর্বপ্রথম ব্যক্তিগত প্রেম-বেদনার আভাস দিলেন। অর্থাৎ রূপক-সাংকেতিক-তত্ত্বনাট্যে চরিত্রগুলি সাধারণত নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বের শ্রেণীরূপ হয়ে থাকে, কিন্তু বিশুকে ব্যক্তিরূপেই অনুভব করা যায়। বিশুর গানে এক ব্যক্তিগত ব্যথা আছে, স্পর্শকাতর সূক্ষ্ম একটি অব্যক্ত যন্ত্রণা আছে, ব্যর্থ প্রেমের একটি মর্মন্তুদ নৈরাশ্য আছে। বিশু একদিন ছিল দুঃসাহসী রঞ্জনেরই দলে, কিন্তু তীরবেঁধা পাখির মত একদিন সে ছিটকে এল এই সুড়ঙ্গ খোদাই করার কাজে। একটি মেয়ে তাকে স্বর্ণের প্রলোভনে এখানে টেনে আনল, স্পর্ধিত ঔদ্ধত্যে বিশু যক্ষপুরীতে এল। সেই থেকে তৃষ্ণার জল তার আশার অতীত হয়েছে, বিশু এখন নিঃসঙ্গ যন্ত্রণার খননকার্যে বন্দী, এখন সে 'রঞ্জনের ও পিঠ, যে পিঠে আলো পড়ে না'। এমন সময় এল নন্দিনী, এল মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, যেন চাঁদের টানে সাগরে লাগল জোয়ার, হৃদযের তারে সখ্যের টানে লাগল চাপা ব্যথার মীড়, চোখের জলে পড়ল সূর্যের আলো। সেই অনির্বচনীয় অনুভূতি একটি আশ্চর্য গীতরূপ লাভ করেছে এই গানে—

> ও চাঁদ চোখের জলে লাগল জোয়ার দুখের পারাবারে
> হল কানায় কানায় কানাকানি এই পারে ঐ পারে।

নাটকে বিশুর এই গানটি খণ্ডিত, গীতবিতানে এর একটি অতিরিক্ত স্তবক পাওয়া যায় যা রক্তকরবীতে বিশুর গানে নেই। কিন্তু বিশুর কণ্ঠে উদ্গীত হওয়ার জন্যই যেন এই কথাগুলি কবির লেখনী থেকে নির্গত হওয়ার পর থেকে প্রহর গুণছে। যথা—

> পথিক সবাই পেরিয়ে গেল ঘাটের কিনারাতে
> আমি সে কোন আকুল আলোয় দিশাহারা রাতে।
> পথ হারানোর অধীর টানে অকূলে পথ আপনি টানে
> দিক ভোলাবার পাগল আমার হাসে অন্ধকারে।

বিশুর আর একটি গান 'যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে'। নন্দিনী যখন তাকে পথ চলার গান গাইতে বলেছে বিশু এই গান শুনিয়েছে। প্রেমের এই জন্মান্তরীণ পথ-চাওয়া রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের স্থির প্রত্যয় হয়ে আছে।

সেই জন্মান্তরীণ বা চিরন্তন প্রেমের কথাই সোনার তরীর মানসসুন্দরীতে আছে। [illegible] গান মূলত প্রেম বিষয়ে কবির পুরাতন বিশ্বাসেরই গান।

রাজাকে নন্দিনী একটি গান শুনিয়েছে 'ভালবাসি ভালবাসি'। এ গান মর্তমমতার, গভীর জীবনাসক্তির, মৃত্তিকাঘনিষ্ঠতার। নন্দিনীকে বিশুই শিখিয়েছিল এই গান। এই গানের ভাষা বিশুর গাওয়া 'যুগে যুগে বুঝি আমায়' গানের মতই কবির চিরন্তন প্রেমস্মৃতির উদ্দীপক—

সেই সুরে বাজে মনে অকারণে
ভুলে-যাওয়া গানের বাণী ভোলাদিনের কাঁদনহাসি।

আবার এই নাটকে নন্দিনীর জীবনমমতা প্রাণোচ্ছলতা সবই এই একটি গানের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে অন্ধকার নেপথ্যবর্তী শক্তিদম্ভী রাজার চিত্তে অতীতের সহজ জীবনের স্মৃতি জাগিয়ে তোলার জন্যও এই গানের প্রয়োজন ছিল।

নাটকের নেপথ্য-সংগীত 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' ফসল কাটার গান। মুক্তধারায় ভৈরবপন্থীদের 'জয় শংকর' একাধিকবার শোনা গেলেও নেপথ্য-সংগীত নয়, কারণ যেহেতু নাটকটির ঘটনা পথে সংঘটিত, তাই ভৈরবপন্থী-গণকে বারবার মন্দিরের দিকে যেতে যেতে পথে দেখা গেছে। ফসলকাটার গান সম্পূর্ণ নেপথ্যের। শুধু নেপথ্যে নয়, সে গান যক্ষপুরীর বাইরে ফল-শস্যভারাবনত ভূমির গান। যক্ষপুরীতে সোনা ওঠে, ফসল জন্মায় না। তাই ফসলকাটার গান দূর থেকে ভেসে আসে এখানে। মৃত্তিকার হৃদগহ্বর থেকে যক্ষের ধন হরণ করার কাজ চলেছে যক্ষের পুরীতে, আর মৃত্তিকার উপরে চলেছে শস্যের হিল্লোল, সবুজের সমারোহ। একদিকে শক্তিবাহুল্যের যোগে হরণ, অন্যদিকে প্রেমের যোগে গ্রহণ। একদিকে রাজা, অন্যদিকে রঞ্জন, একদিকে স্বর্ণখোদাইয়ের প্রলোভন, অন্যদিকে ফসলকাটার ডাক। জীবনের এই বৈপরীত্যই এই নাটকে দ্বন্দ্ব রচনা করেছে। এই দ্বন্দ্ব রাজার মনে, যক্ষপুরীর সর্বত্র, আঁধারবাসী মানুষগুলির আসাড় চিত্তে ধ্বনিত করে তোলার জন্যই নাটকে বারবার পৌষালি গানের সুরটি ভেসে আসে। ফসলের গান মাটির গান এখনো ভেসে আসে, এই তো এ গানের সেরা খবর। যক্ষপুরীর আলোক-হীনতার বাইরে যখন 'পৌষের রোদ্দুর পাকা ধানের লাবণ্য আকাশে মেলে দিচ্ছে', তখন রাজাই বা কেন পৃথিবীর বুক চিরে মরা হাড়গুলোকে ঐশ্বর্য বলে ছিনিয়ে আনবে? অন্ধকার থেকে কানা রাক্ষসের অভিশাপ বয়ে আনবে?

'সোনার পিণ্ড কি তোমার ঐ হাতের আশ্চর্য ছন্দে সাড়া দেয়, যেমন সাড়া দিতে পারে ধানের খেত'? সুতরাং জালের অন্তরালবর্তী শক্তিমান মানুষকে মৃত্তিকার বুকে সম্পূর্ণরূপে মূর্তিমান করার জন্যই ঐ ফসলকাটার গানের দরকার ছিল। এই নাটকে রাজা শেষ পর্যন্ত আপনার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছেন। আর ঠিক তখনই যক্ষপুরীতে অন্তর্বিপ্লব সুরু হয়ে গেছে, লুব্ধ উৎপাদন-ব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্যতা আপনার স্ববিরোধিতায় ধ্বসে পড়েছে। পুনরায় দূরশ্রুত পৌষের গান শ্রোতা ও দর্শকদের কাছে দ্রুতধ্বনিত হয়ে উঠেছে, যেন হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতনই দ্রুততর হয়ে উঠেছে। এই ফসলকাটার গান দিয়েই নাটক সমাপ্ত হয়েছে। যন্ত্রের চেয়ে, দম্ভের চেয়ে, স্বর্ণের চেয়ে, মরা ধনের প্রেত-সাধনার চেয়ে প্রাণের, প্রেমের, সখ্যের, শস্যের ও জীবনের সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৩

চিরকুমার সভা উপন্যাসাকারে ভারতী পত্রে (১৩০৭-১৩০৮) ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশের পর প্রজাপতির নির্বন্ধ নাম দিয়ে ১৩১৪ সালে গদ্যগ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত হয়েছিল। পুনরায় এটিকে অংশত পরিবর্তিত করে কবি ১৩৩১ চৈত্র ১৩৩২ বৈশাখে নূতন নাটকের রূপ দান করেন এবং কয়েকটি নূতন গানও যোগ করেন। চিরকুমার সভা নামে গ্রন্থাকারে ১৩৩২ সালের চৈত্রে এই নাটকটি প্রকাশিত হয়। প্রহসন রূপে চিরকুমার সভায় সংগীতের উপযোগিতা প্রজাপতির নির্বন্ধ প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। বর্তমান চিরকুমার সভায় কবি কয়েকটি সম্পূর্ণ কাব্যগীতি এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড-গীতি যোগ করেন। চিরকুমার সভায় ক্ষুদ্র গান অসংখ্য এবং সমগ্র নাটকখানি সংগীতে-সুরে-রাগে-অনুরাগে পরিপূর্ণ। সংযোজিত গানগুলি কবির সমকালীন গীতগ্রন্থ প্রবাহিনীর (১৩৩২) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নীরবালার কণ্ঠে 'যেতে দাও গেল যারা' গানখানি কয়েকদিন পরবর্তী অনুষ্ঠিত বর্ষামঙ্গলে দেখতে পাই। চিরকুমার সভায় কবি পাত্রপাত্রীর সংলাপের বিশেষ মুহূর্তে সংগীত যোজনা করেছেন বটে, কিন্তু সংগীত এই সকল ক্ষেত্রে গভীর মানবিক আবেগানুভূতির বাহন হয়ে উঠেনি। অক্ষয় ও নীরবালার মুখে গীতের প্রাধান্য তাদের গীতপ্রিয়তার পরিচায়ক মাত্র, কিন্তু সে গান প্রায়শ না-বলা-বাণীর ঘন যামিনীর অন্তরাল থেকে উঠে আসে না। এইজন্য দুএকটি গানের

প্রয়োগ নাটকে লঘুতর মনে হয়—যেমন, প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নীরবালার কণ্ঠে 'জয়যাত্রায় যাও গো ওঠো জয়রথে তব'। অবশ্য সামাজিক নাটকে বা প্রহসনে গান অলংকার মাত্র; দর্শক-মনোরঞ্জন এবং প্রাসঙ্গিক লঘুতার আবহাওয়া-সৃষ্টি ব্যতীত তার কাছ থেকে গভীরতর কিছু প্রত্যাশা করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের প্রহসনেও সংগীত তার প্রহসনীয় পরিহাস ও তারল্য ব্যতীত অন্য কোনো সাংকেতিকতা বা গূঢ়তা সৃষ্টি করেনি।

গল্পগুচ্ছের কর্মফল (১৩১০) গল্পটির নাট্যরূপ শোধবোধ ১৩৩২ সালের মাসিক বসুমতীতে এবং ১৯২৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। শোধবোধ সামাজিক নাটক এবং কমেডি জাতীয়। এই নাটকে কয়েকটি গান আছে—সে গানগুলি কাব্যগীতি হিসাবে উৎকৃষ্ট হলেও সামাজিক নাটকের প্রয়োজনেই সেগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে, তার বেশি কোনো মূল্য সেগুলিতে নেই। চিরকুমার সভার গান সম্পর্কে ইতিপূর্বে যা বলা হয়েছে, শোধবোধের গান সম্পর্কেও তার পুনরুল্লেখ করা যায়। এই নাটকের তিনটি গানই (সে আমার গোপন কথা, বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা এবং এবার উজাড় করে লও হে আমার) আছে নাটকের নায়িকা নলিনীর কণ্ঠে—নলিনী নামটিও কবির কিশোর বয়সের প্রিয় নায়িকার নাম। এখানে নলিনী ধনীকন্যা, আধুনিকা, যদিও নাট্যঘটনায় তার নিভৃত মনের নিঃশেষ আত্মসমর্পণ ও অকৃত্রিম প্রেমানুরাগের যে পরিচয় আছে তা নানা নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাত ও ঘটনাসংঘর্ষের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়েছে। নলিনীর বাহ্যিক চাপল্য ও লঘুতা এবং আভ্যন্তর বেদনার বৈপরীত্য চরিত্রটিকে এই নাটকে সর্বাধিক আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সেক্ষেত্রে নলিনীর গোপন চিত্তের বেদনাপ্রকাশে সংগীতগুলি অত্যন্ত সার্থক হয়েছে বলা যায়। প্রথম গানটি সম্ভবত কবির পূর্ববর্তী কালের রচনা, কারণ কবি স্বয়ং তাঁর এই গান সম্পর্কে একটু টিপ্‌পনী করেছেন। নালিনীর সখী চারু বলেছে—

"—তুই ভাই এইসব সখীকে-ডাক-পাড়া সেকেলে ধরনের গান কোথা থেকে জোগাড় করলি বলতো।

নলিনী। খুব একেলে ধরনের কবির কাছ থেকেই।"

'একেলে ধরনের কবি' যখন নলিনীর কণ্ঠে সংগীত জোগানোর ভার নিয়েছেন, তখন স্বভাবতই নলিনীর মত চাপা-স্বভাবের মেয়ের চিত্তের একটি গোপন দিক তার গানে ফুটবে, সে গান শুধুই ড্রইং রুমের শোভা হবে না।

নলিনীর কথায়-পরিহাসে-প্রেমালাপে 'লঘু কৌতুক ও চপল নৈষ্ঠুর্য, কিন্তু তার সমস্ত চিত্ত একটি বিন্দুতেই কেন্দ্রীভূত, অন্তত তার কোনো বেদনাবোধ আছে, তার গানই সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গান এখানে নাটকের নয়, কেবল নলিনীর, একটি নারীর, নিভৃত সংলাপ। তার গানের শ্রোতা যেই হোক না কেন, উদ্দিষ্ট যেন একজনই। কেবল নাটকের শেষ দৃশ্য পর্যন্ত সেই একজন অবশ্য সে কথা বুঝতে পারেনি, তাই জটিলতা ও নাট্যকৌতূহলের সৃষ্টি। তাই নলিনী বিলাতপ্রত্যাগত অত্যাধুনিক পাণিপ্রার্থীর সম্মুখেও আভিজাত্যরক্ষার আনুষ্ঠানিক হিসাবে যে ইংরিজি গান গায়—

Love's golden dream is done,
Hidden in mist of pain—

—তার মধ্যেও গোপন ব্যথার ইঙ্গিত আছে। সেই গোপন ব্যথাই আরও স্পষ্ট ও নিবিড়তর হযেছে 'বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা নিয়ো হে নিয়ো' গানে।

গৃহপ্রবেশ ১৩৩২ সালের আশ্বিনে প্রবাসীতে এবং কিছুকালের মধ্যেই গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। গৃহপ্রবেশও মৌলিক নাটক নয়—গল্পগুচ্ছের শেষের রাত্রি (১৩২১) গল্পের নাট্যরূপকে ঘনীভূত করার জন্য যেমন নূতন উপস্থাপনা এবং ঘটনাযোজনার প্রয়োজন হয়েছে, তেমনি অনেকগুলি গানও অপরিহার্যভাবে এই নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে। নাটকের মূল ঘটনা শেষ শয্যায় শায়িত যতীনের ক্রমশ অন্তিম মুহূর্তের সম্মুখীন হওয়া। নাটকের গান-গুলি মুমূর্ষু যতীনের ইচ্ছানুযায়ী তার সম্মুখে বারবার গীত হয়েছে। মৃত্যুপথ-যাত্রীর অন্তিম বাসনার আভায় প্রতিটি গান আশ্চর্যরকম করুণ বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। এই নাটকের গানগুলি অবশ্যই এই নাটকের জন্য রচিত হয়নি, কিন্তু অধিকাংশ গানের বাণীতেই যতীনের মুমূর্ষু গোপন হৃদয়লালিত কামনা ও ইচ্ছার সঙ্গে একপ্রকার সূক্ষ্ম মিল আছে, সেইজন্যই গানগুলি শোনা মাত্র দর্শক ও শ্রোতার অন্তরে সকরুণ সমবেদনা বাষ্পীভূত হতে থাকে। নাটকের যাবতীয় গানই যতীনের ভগ্নী হিমির কণ্ঠে, কেবল একটি গান যতীন গেয়েছে। যতীন ছিল গীতরসিক ব্যক্তি, হিমিকে সে সংগীতে দীক্ষা দিয়েছে, যোগাযোগে বিপ্রদাস যেমন ভগ্নী কুমুকে সংগীতে অনুপ্রাণিত করেছিল। যতীনের সংগীত-বিষয়ে দুর্বলতা হিমির কাছে তাই অজানা ছিল না। এই অকালবিদায়ী ভ্রাতার মরণোন্মুখ পাণ্ডুর বাসনাগুলিকে পূর্ণ করার জন্য হিমি যথাসাধ্য নতমুখে

আজ্ঞা পালন করে। আসন্ন সর্বনাশের শঙ্কায় বেদনায় তার কোমল স্নেহাতুর চিত্ত বিদীর্ণপ্রায় হলেও কণ্ঠে গান এনে ভ্রাতার উৎসুক শ্রুতিকে সে তৃপ্ত করে চলেছে। এইরূপ পরিস্থিতি ও পরিবেশে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের গানই তার অসামান্য গভীরতা ও বেদনাগর্ভ আবেদনে উপযুক্ততা লাভ করেছে এবং প্রতিটি সংগীতই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সার্থক হয়ে উঠেছে। দীপনির্বাণের অনিবার্য মুহূর্ত আসন্ন জেনেও সেই মৃত্যুপাংশু সকরুণ নয়নের সম্মুখে জীবনের শূন্যগর্ভ সান্ত্বনা ও স্তোকবাক্য দানের প্রতারণা আমাদের অন্তরে নিঃশব্দ হাহাকার জাগিয়ে তোলে, এক অমোঘ নৈরাশ্য সমস্ত সত্তাকে শীতল করে তোলে। কেবল সেই স্তব্ধতার মাঝখানে কিছু অনবদ্য সংগীতই মৃদু আলোক ও শান্ত বহিরাগত হাওয়ার মত একটি ক্ষণিক প্রত্যাশা ও অপরাজেয় আত্মার জ্যোতি বিকীর্ণ করে রাখে। যতীনের বারবার সংগীতশ্রবণের আগ্রহ ও হিমিকে গান গাইবার অনুরোধ করার ভিতর দিয়ে তার অস্থিরচিত্তের বিষণ্ণ আকাঙ্ক্ষা ও ধূসর স্বপ্নবিলাসের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত মনে হয় না।

এই নাটকে যতীনের 'ও রে মন যখন জাগলি না রে' গানখানি ছাড়া হিমির কণ্ঠে মোট আটখানি গান আছে। গানগুলি হিমির কণ্ঠে গীত হলেও মরণাহত যতীনের বিষণ্ণ হৃদয়পট এই গানগুলির মাধ্যমে শ্রোতার চিত্তে উদ্‌ঘাটিত হয় মাত্র। যে গৃহপ্রবেশ, মণিসৌধ ও মণিমন্দির-নির্মাণের স্বপ্নে যতীনের শয্যাশায়ী চিন্তা আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তার সবটাই যে মিথ্যা প্রবঞ্চনার উপর দাঁড়িয়ে আছে, যেন তারই অস্পষ্ট আভাস অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রথম অঙ্কে হিমির কণ্ঠে 'খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি আমার মনের ভিতরে' গানটিতে প্রতিফলিত হয়েছে। যতীনের রোগভারাক্রান্ত পাণ্ডু হৃদয় যখন পত্নীর প্রেমসেবার প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে আছে, তারই স্মরণে সে কখনও হিমির কণ্ঠে শুনতে চায় 'নতুন বিয়ের গানটা'—'বাজো রে বাঁশরি বাজো'। আসন্ন মৃত্যুর সঙ্গে এই অন্তিমজীবনযাত্রীর চিরমিলনের করুণ সংকেত ঘনিয়ে ওঠে শ্রোতার স্পর্শকাতর মনে। কখনও দাম্পত্য জীবনের যৌবনোচ্ছল সুখসম্ভোগের স্মৃতি যতীনকে রোমাঞ্চিত করে। হিমিকে তখন গাইতে হয় 'যৌবনসরসীনীরে মিলন-শতদল'। শুনতে শুনতে বিবর্ণ রোগশয্যায় স্বগতোক্তির মত যতীন বলে—

"আমি চোখ বুজে শুনব সেই ঝাউগাছের ঝরঝর শব্দ। কিন্তু হিমি, তুই আজ গাইলি, ও যেন ঠিক তেমন—কে জানে! আর একটু অন্ধকার হয়ে

আসুক, আপনা আপনি শুনতে পাক—ধীরে বও ধীরে বও সমীরণ। আচ্ছা তুই যা। ছবিটা কোথায় রাখলুম ?”

যতীনের অস্থির মন যখন তার পত্নীর চিন্তায় পূর্ণ হয়ে আছে, তখন পত্নী মণি তার দৃষ্টের অগোচরে, ‘ধরা দেওয়ার ধন সে তো নয় অরূপ মাধুরী’। সেই অরূপ মাধুরী প্রিয়তমা এই নাটকে যতীনেরই আপন মনের মাধুরী দিয়ে নির্মিত। ঠিক সেই মুহূর্তে সেই কথাই হিমির কণ্ঠে গান হয়ে ঝরে পড়েছে—‘আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী’। হিমির আর একটি গান ‘ঐ মরণের সাগরপারে চুপে চুপে’। এই গান মৃত্যুবিষয়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের স্বল্পসংখ্যক কয়েকখানি গানের অন্যতম, এই নাটকে ব্যবহৃত হয়ে যতীনের রোগজর্জর নিরানন্দ ঘরে মৃত্যুর বিষণ্ণ ছায়া ঘনিয়ে তুলেছে। দুঃখের আঁধার রাত্রি ধীরে ধীরে নেমে আসছে যতীনের চারপাশে, মৃত্যুর তুহিন স্পর্শের আসন্ন বিস্তার ক্রমশ একটি অচরিতার্থ বাসনার কণ্ঠরোধ করছে, সেই বিপুল অন্ধকারের ভয়াতুর বক্ষ থেকে ‘ভুবনমোহন স্বপনরূপে’ অজ্ঞাত লোকের অশরীরিণী প্রিয়ার নিঃশব্দ পদসঞ্চার শোনা যাচ্ছে, অন্ধকারে স্পষ্ট হয়ে উঠছে তার আলুলায়িত কেশদাম, যার স্তরে স্তরে সন্ধ্যাতারার মাণিকজ্বালা। আজ নিশীথের নিস্তব্ধ আকাশ মৃত্যুসংগীতের যন্ত্রণায় আর্ত—‘আকাশ আজি গানের ব্যথায় ভরে আছে’। সেই ভুবনমোহন স্বপনের তুলনায় একটি গৃহনির্মাণ, পার্থিব ভোগস্বপ্ন, সুখবাসনা—এইগুলি কত অর্থহীন, কী অসীম অকিঞ্চিৎকর! বিপুলের সঙ্গে, অসীমের সঙ্গে এই নশ্বর খণ্ড দুর্বল আতুর জীবনের বৈপরীত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে ‘ঐ মরণের সাগরপারে’—একটি গানের সুরে। যতীনের চোখে মুখে ইচ্ছায় এই মৃত্যুপ্রিয়ার পদধ্বনি যতই নিশ্চিত হয়ে উঠেছে, ততই সে বিদায়প্রহরের বিষণ্ণ স্মৃতির ঘ্রাণে আত্মনিমজ্জিত হতে চেয়েছে, প্রত্যাসন্ন মুহূর্তের মর্মে শেষ আসক্তির বর্ণালী অন্ধকারের বুকে গোধূলির করুণ কণ্ঠহারের মত। তারই সার্থক প্রতিরূপ ঘটেছে এই গানে—‘যদি হল যাবার ক্ষণ, তবে দিযে যাও শেষের পরশন’। কিন্তু এই শেষের পরশন যে দেবে, সেই মণি মৃত্যুপথযাত্রীর শিয়রে নেই, সে সেই গৃহেই অনুপস্থিত, যতীনের অজ্ঞাতসারেই। কিন্তু মুমূর্ষু যতীনের শেষ আগ্রহ অন্তিম উৎকণ্ঠা কৌতূহল অসম্ভব আশা—সবই যে তাকে ঘিরেই। নাটকটির নাম গৃহপ্রবেশ। এই গৃহপ্রবেশ-উৎসবকে স্মরণ করে হিমির কণ্ঠে একটি গানও আছে—‘অগ্নিশিখা এস এস আনো আনো আলো’। গানখানি নাটকে গৃহপ্রবেশের আনুষ্ঠানিকতার,

পরিপ্রেক্ষিতে সংযোজিত হলেও একটি করুণ অশ্রুকাতর বাতাবরণের সৃষ্টি করেছে। একটি নির্বাণোন্মত দীপশিখার সামনে উৎসবের অগ্নিশিখা কেমন করে জ্বলে উঠতে পারে? যে গৃহপ্রবেশের কাল্পনিক উৎসবে যতীনের মন স্বপ্নাতুর, সেই গৃহপ্রবেশ কোনোদিনই বাস্তবে সম্ভব হবে না, দর্শকরা তো জানেন। ধীরে ধীরে যতীন মৃত্যুপুরীর গৃহপ্রবেশ-উৎসবে প্রবেশ করছে, এই অর্থেই নাটকখানির নামতাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হিমির মুখে যতীন আনুষ্ঠানিক গৃহপ্রবেশের গানই শুনতে চেয়েছিল, যে গান স্বয়ং যতীনেরই নির্বাচিত। কিন্তু এই গানের অগ্নিশিখা যেন কোনো দিব্য জ্যোতিশিখায় পরিণত হয়েছে, যে আলোক মৃত্যুর অন্তরে অমৃতের পন্থানিরূপণ করে দেয়। এই দিক দিয়ে গানটি সার্থকভাবে প্রযুক্ত।

হিমির সর্বশেষ গান 'জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে'। যতীনের জীবনপ্রদীপ আয়ুর শেষপ্রহরে উপনীতশিখা, তার স্নায়ু-ধমনী-শিরায় তখন নিভন্ত আলোর শেষ বিদায়ের সম্বর্ধনা চলেছে। মৃত্যুর সঙ্গে যেন যতীনের নবপরিণয় সুরু হয়ে গেছে—'চোখের উপর কী রকম সব ঘোর হয়ে আসছে। গোধূলি লগ্ন, গোধূলি লগ্ন আমার। বাসরঘরের দরজা খুলবে'। এই অবস্থাতেই যতীন তার সর্বশেষ প্রিয় গানটি শুনতে চেয়েছে 'জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে'। হিমি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শেষ ইচ্ছাটি পূরণ করেছে, অপ্রতিরোধনীয় শোকের নিবিড়তম বেদনা বক্ষে প্রাণপণে চেপে ধরে যন্ত্রণাবিকৃত কণ্ঠে এ গান ফুটিয়ে তুলেছে। এ গান শুনতে শুনতে যতীনের আয়ুর প্রদীপ জ্যোতিঃসমুদ্রে বিলীন হয়ে গেছে। মৃত্যুর পটভূমিকায় মুমূর্ষু রোগীর মৃত্যুপূর্ব মুহূর্তে এইভাবে সংগীতযোজনা করা রবীন্দ্রনাথের মত মহাকবির পক্ষেই সম্ভব এবং সেই সংগীত যে কত মর্মস্পর্শী হতে পারে, এই গানখানি নিঃসন্দেহে তার পরিচায়ক।

১৯২৯ সালের জুলাই মাসে শেষরক্ষা নাট্যরূপটি প্রকাশিত হয়। গোড়ায় গলদ (১২৯৯) প্রহসনের নাট্যরূপান্তর এই শেষরক্ষা ১৩৩৪ সালের আষাঢ়ে মাসিক বসুমতীতে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। গোড়ায় গলদ প্রহসনে গানের সুযোগ থাকলেও কবি তাতে কোনো কাব্যগীতি যোজনা করেননি, কেবল নাটকটির সমাপ্তিতে মধুরেন সমাপয়েৎ রীতিতে একটি সমবেতগীতি ছিল। শেষরক্ষা নাটকটি গোড়ায় গলদের তুলনায় উৎকৃষ্ট। গোড়ায় গলদের নিমাই শেষরক্ষায় হয়েছে গদাই—উৎকট নামে পরিহাসিক সুর বর্ধিত হয়েছে।

গোড়ায় গলদে কিছু স্বগতোক্তি ছিল, যেগুলি আধুনিক নাটকের বাস্তবতার পক্ষে শ্রুতিকটু, এখানে তা সংশোধন করা হয়েছে। দৃশ্যবিন্যাসেও পরিবর্তন ঘটেছে। গোড়ায় গলদে ঘটনার অবিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও দৃশ্যপরিবর্তন করতে হয়েছে, শেষরক্ষায় দৃশ্য অপরিবর্তিত রেখে কেবল 'পাশের ঘর' এইরূপ বোঝানো হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি সমকালীন কাব্যগীতি শেষরক্ষাকে সমৃদ্ধ করেছে। তাতে প্রহসনের সুখশ্রাব্যতা ও মাধুর্য নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেয়েছে। গোড়ায় গলদ এবং শেষরক্ষা উভয় প্রহসনের বিষয়বস্তু একই—অবিবাহিত জীবনে নারীজাতির সংস্পর্শে রোমান্সের সম্ভাবনা এবং শেষ পর্যন্ত সেই রোমান্সের সামজিক রোমান্টিকতায় পরিণতি। গোড়ায় গলদে এই মধুর বিষয়টিকে নিছক সংলাপের মধ্যে ও ঘটনাগত কৌতূহলেই প্রকাশ করা হয়েছিল। এই জাতীয় রসমধুর প্রহসনে গীতহীনতা অবিবাহিত-অধ্যুষিত বিশৃঙ্খল মেস বাড়ির মতই। তাতে নাটকের রোমান্সও যেন ক্ষুণ্ণ হয়। শেষ-রক্ষা প্রহসনে তাই নারীকণ্ঠে ক্ষণে ক্ষণে গানের সুর উৎসারিত হয়ে নাটকটির সুরহীনতার প্রাথমিক গলদ দূরীভূত করেছে এবং এই জাতীয় প্রহসনের সম্মান প্রতিষ্ঠার দ্বারা শেষরক্ষা ঘটিয়েছে। শেষরক্ষায় কোমল নারীকণ্ঠের মধুর গীতে প্রতিবেশীর জানালার যে খড়খড়ি ঘন ঘন উন্মোচিত হয়, তা জীবনের উৎকর্ণ শ্রুতিরই প্রতীক। গোড়ায় গলদে, এই খড়খড়িটি আগাগোড়া বন্ধই ছিল। সেখানে 'পাশের বাড়ি হইতে গানের শব্দ' মাত্র আছে, গানের বাণীটি ছিল না। শেষরক্ষায় গানগুলি সম্পূর্ণ হওয়াতে সংলাপ যেন আরও সার্থক হয়ে উঠল।

শেষরক্ষায় কমলমণি স্বরলিপি দেখে গান তোলে, বলা বাহুল্য সে গান রবীন্দ্রসংগীত, কারণ ১২৯৯ সালের তুলনায় ১৩৩৪ সালে রবীন্দ্রসংগীত অধিকতর জনপ্রিয় এবং তার স্বরলিপির প্রচারও বেড়েছে। শিক্ষিত মহলে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে তার চর্চা ক্রমবর্ধমান, কবি তা জানেন।

রবীন্দ্রনাথের সমাজবিষয়ঘটিত নাটকে, সামাজিক প্রহসনাদিতে নাগরিক শিক্ষিত সমাজের যে নরনারীর চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তাদের মার্জিত রুচি, বিদগ্ধ ব্যবহার, পরিশীলিত বাচনভঙ্গির সঙ্গে সুললিত কাব্যগীতি অপরিহার্য উপাদানরূপে পরিগণিত হয়েছে। শেষরক্ষার গানগুলি এই অর্থেই বিশুদ্ধ নাট্যসংগীত। প্রজাপতির নির্বন্ধ, চিরকুমার সভা ইত্যাদি প্রহসনের গীতগুলি একই সূত্রে গ্রথিত। মোটামুটি ঈষৎ নাট্যবিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত, ঘটনার সঙ্গে

আভাসিত কাব্যময় এই গানগুলি মঞ্চে যেমন রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি করে, তেমনি দর্শকদের মনেও সাংগীতিক মুক্তির আনন্দ দেয়। রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাও কবির এই জাতীয় নাটকে অধিকতর সংখ্যায় সংগীত-যোজনার জন্য দায়ী বলা যেতে পারে। এগুলি মুখ্যত প্রেমসংগীত। রোমান্টিক প্রণয়ের বর্ণালীসম্পাতে, অনুরাগের রক্তিম রোমাঞ্চে যখন নায়ক-নায়িকা ও মুখ্য পাত্রপাত্রীদের ঘিরে একটি ঘনরসময় কৌতূহল গড়ে ওঠে, এই গানগুলি—অন্তত কিছু গান, তখন তারই মধ্যে বিচিত্র ও গাঢ়তর রসাবেশ সৃষ্টি করে মাত্র। সব গানই হয়ত এই নাটকের প্রয়োজনে রচিত হয়নি। অন্য উপলক্ষে ইতিপূর্বে রচিত কাব্যগীতগুলি ক্ষীণ সাদৃশ্যসূত্রে এই নাটকে সংযুক্ত করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই নাটকের প্রথম দৃশ্যে কমলের মুখে 'ডাকিল মোরে জাগার সাথী' গানটির উল্লেখ করা যায়। এই দৃশ্যে কান্তমণির সঙ্গে ইন্দুর কথোপকথনে জানতে পারা যায় যে, কবি বিনোদবিহারীর কাব্যের একনিষ্ঠা পাঠিকা কমল, কবিতাপাঠের ভিতর দিয়েই কবির প্রতি সংবদ্ধমনা হয়ে উঠেছে। কমলের খাতায় বিনোদবিহারীর সদ্যোরচিত কবিতার পংক্তি তার জপমন্ত্র, তার অনুরাগের কালিতে লেখা। ঠিক সেই মুহূর্তে কমলের কণ্ঠে একটি গান মুগ্ধ ভক্তের প্রেমানুরাগরূপেই যেন দূরস্থিত কবির প্রতি উদ্দিষ্ট মনে হয়—

ডাকিল মোরে জাগার সাথী
প্রাণের মাঝে বিভাস বাজে প্রভাত হল আঁধার রাতি।

অথচ রবীন্দ্রসংগীতের শ্রোতারা গানটিকে পূজা-বিষয়ক গান বলেই জানেন। নিতান্ত বিষয়গত সাদৃশ্যসূত্রেই নাটকে এটি স্থান পেয়েছে। কমলের খাতায় 'কাননকুসুমিকা'র কবি বিনোদের আর যে উদ্‌ধৃতি স্থান পেয়েছে, তা এই—

রসনায় ভাষা নাই থাকি চুপে চুপে
অন্তরে যোগায় সে যে বাণী,
সময় পায় না আঁখি মজিবারে রূপে
গোপনে স্বপনে তারে জানি।

এই কথাই প্রকারান্তরে কমলের আলোচ্য গানেও ধ্বনিত হয়েছে—

গোপনতম অন্তরে কী লেখনরেখা দিয়েছে লেখি।
মন তো তারই নাম জানে না, রূপ আজিও নয় যে চেনা
বেদনা মম বিছায়ে দিয়ে রেখেছি তারই আসন পাতি।

ইন্দুর কণ্ঠে আর একটি গানে (হায় রে ওরে যায় না) প্রেমের একই রহস্যময় গোপনচারিতার প্রতি সংকেত—

অলখ পথেই যাওয়া-আসা শুনি চরণধ্বনির ভাষা
গন্ধে শুধু হাওয়ায় হাওয়ায় রইল নিশানা।

শেষরক্ষায় যে প্রেমসংগীতগুলি আছে, বাঙলা নাটকে ব্যবহৃত প্রেমগীতির তুলনায় সেইগুলি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট, পরিচ্ছন্ন এবং শালীন। প্রেমের সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য ও বৈচিত্র্য, মানঅভিমানের জটিল হৃদবৃত্তি, হৃদয়ভাবনার বহু দুষ্প্রকাশ্যতা এই সকল সূক্ষ্ম সুরের সুনন্দ প্রকাশে সার্থক হয়ে উঠেছে। 'যাবার বেলা শেষ কথাটি যাও বলে', 'কাছে যবে ছিল পাশে হল না যাওয়া', 'এবার মিলন-হাওয়ায়-হাওয়ায হেলতে হবে' প্রভৃতি গানগুলি রোমান্টিক প্রীতিগীতিরূপে বাঙলা কাব্যসংগীতের দীর্ঘস্থায়ী সম্পদ হয়ে থাকবে। 'কাছে যবে ছিল পাশে হল না যাওয়া' গানটি বিরহ পর্যাযের, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও গানে এই বিরহ-বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের মাহাত্ম্য একাধিকবার ঘোষিত হয়েছে। ইতিমধ্যে পূরবী কাব্য থেকেই কবিজীবনে অতীত প্রেমের বিষণ্ণ মধুর রোমন্থন এবং স্মৃতিচারণার প্লাবন লক্ষ্য করা যায়। তারই সুরে এই গানটি নিবিড়ভাবে সংসক্ত—

হারানো দিনের ভাষা স্বপ্নে আজি বাঁধে বাসা
আজ শুধু আঁখিজলে পিছনে চাওয়া।

চতুর্থ অঙ্কে ইন্দুর মুখে 'এবার মিলন-হাওয়ায়-হাওয়ায় হেলতে হবে' মিলনের কাব্যগীতি, তারই প্রত্যুত্তরে কবি বিনোদবিহারী গান বেঁধেছে 'লুকালে বলেই খুঁজে বাহির করা'। দুটি গানই প্রেম পর্যায়ের। বিবাহের পর বিনোদ-বিহারী ও কমলের মধ্যে মনোমালিন্যঘটিত সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটেছিল, প্রথম গানটিতে তারই মধুর অবসানের ইঙ্গিত এবং পত্নীর সঙ্গে নূতন করে মিলনের অপ্রত্যাশিত বিস্ময় দ্বিতীয় গানে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই সামান্য নাট্যবিষয়ের সঙ্গে গানগুলির বাণীগত সাদৃশ্য আপতিক মাত্র। এ গানের ভাষা কবিজীবনে পুরাতন। ফাল্গুনীর 'তোমায় নতুন করে পাব বলেই হারাই ক্ষণে ক্ষণ' এবং 'লুকালে বলেই খুঁজে বাহির করা' এই দুই সংগীতে কোনো ভাবগত ভেদ নেই। 'জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না'—কবির আর একটি বিখ্যাত কাব্যগীতি, ভীরু প্রেমের গান। সমকালীন মহুয়ায় কবি নিরপেক্ষ দর্শকের মত নরনারীর হৃদয়লীলার বহু বৈচিত্র্যকে ভাষা দিয়েছেন। এটি সেই জাতীয় একটি রচনা বলেই মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের সর্বশেষ গদ্যনাটক বাঁশরি যে পরিমাণে আধুনিক সে পরিমাণে জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। ১৩৪০ সালে রচিত এই নাটকটিকে সহজেই শেষের কবিতার সগোত্র মনে করা যেতে পারে এবং অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে বাঁশরি উপন্যাসাকারেই লেখা উচিত ছিল। তথাকথিত রিয়ালিস্ট আধুনিক লেখক ক্ষিতীশ এবং শাশ্বতভাবে আধুনিকা বাঁশরিকে নিয়ে এই নাটক রচিত হলেও এই নাটকে উল্লেখযোগ্য চরিত্র সোমশংকর সুষমা এবং সন্ন্যাসী পুরন্দর। শেষ পর্যন্ত প্রেম এবং পরিণয়ের দুই ভিন্নমুখী রাস্তায় শেষের কবিতার মতই এই নাটকের কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে। বাক্‌সর্বস্ব, শাণিত চরিত্রে শোভন, ইঙ্গবঙ্গ সমাজের ঝক্‌ঝকে উজ্জ্বল পরিবেশে স্থাপিত এই নাটকে সংগীতযোজনার অবকাশ হয়ত ছিল না, হয়ত কবি স্বেচ্ছায় এই সংলাপপ্রবল নাট্যোপন্যাসে যথেষ্ট গান দিতে চাননি। তবু এতে কয়েকটি গান আছে। পুরন্দরের প্রতি সর্বমনপ্রাণসমর্পিত সুষমা গুরুপ্রেমিক সন্ন্যাসীর ইচ্ছাতেই সোমশংকরের গৃহিণী হতে চলেছে, তবু অন্তরের অন্ধকার নেপথ্যে তার আদর্শ প্রেমের উপলব্ধিকে চকিতে প্রকাশ করার জন্য আছে একটি গান 'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়'। সোমশংকরের 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো' পুরন্দরের শিক্ষা ও আদর্শের প্রতিফলন হয়ে উঠেছে, অন্তরের গভীর থেকে উঠে আসেনি। এই গানটিকে কবি তাঁর স্বদেশ পর্যায়ের মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন। 'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল' সুধাংশু শচীন প্রভৃতি ইঙ্গবঙ্গ সমাজের তরুণ প্রতিনিধিদের কণ্ঠে উপযুক্ত পরিস্থিতি ও মহিমা অর্জন করেনি। নাটকের সর্বশেষে আছে পুরন্দরের গান, বাঁশরির প্রতি পুরন্দরের আশীর্বাদস্বরূপ। গানটি 'পিনাকেতে লাগে টংকার'—আদর্শব্রতী সন্ন্যাসীর মুখে কবি তাঁর প্রিয় রুদ্রবন্দনা যোজনা করেছেন—

দানবদন্ত তর্জি
রুদ্র উঠিল গর্জি,
লণ্ডভণ্ড লুটিল ধুলায় অভ্রভেদী অহংকার।

১৪

শেষ বর্ষণ ঠিক নাট্যসাহিত্যের মধ্যে পড়ে না, যদিও ঋতুঘটিত এই পালা পঠনীয় নয়, মঞ্চেই দর্শনীয় ও শ্রাব্য। ১৩৩২ সালে এর প্রথম প্রকাশ। ঐ বৎসর ভাদ্রে শেষ বর্ষণ মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং গানগুলি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত

হয়েছিল। নিবিড় গানের মেঘাচ্ছায়ায় কবি তখন মন দিয়েছিলেন মেলে, ঋতুর গানে শান্তিনিকেতনের মেঘমন্দ্রিত আকাশ ও তরুমর্মরিত মৃত্তিকা ভরে উঠেছিল। কিছুকাল পূর্বেই প্রবাহিনীর গান, বর্ষামঙ্গলের গান (১৩৩২ শ্রাবণ) রচিত ও গীত হয়েছে, তার সুর না মেলাতেই শেষ বর্ষণের ধারাপাত সুরু হল। শেষ বর্ষণের ২০টি নতুন গান সবুজপত্রের ১৩৩২ কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

শেষ বর্ষণ ঠিক নাটক নয়, এ যেন গানের ফুলগুলিকে একটি অলখ নাট্য-ডোরে বেঁধে দেওয়া। ফাল্গুনী ঋণশোধ প্রভৃতির মত এই নাট্যপালাও সভাগৃহে সূচিত, কিন্তু পূর্ববর্তী নাটকগুলির মত সভাদৃশ্য থেকে পরবর্তী দৃশ্যে আর পরিবর্তন ঘটেনি। বসন্তের মত এখানে রাজা কেবল দর্শক, কুশীলব প্রকৃতি। কিন্তু বসন্ত পালায় বনভূমি আম্রকুঞ্জ দক্ষিণ সমীর মাধবীমঞ্জরী গানকে সংলাপ করে যে নাট্যাভাস দিয়েছিল, এখানে তারও অভাব। বসন্তে মুখপাত্র ছিল কবি, শেষ বর্ষণে নটরাজ—আসন্ন নটরাজ ঋতুরঙ্গশালার ভূমিকা যেন এখান থেকেই সূচিত হয়েছে। শেষ বর্ষণ পালাটি থেকে রবীন্দ্রনাথের ঋতুউৎসব ও রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কথা জানা যাচ্ছে। এই পালায় কবি অদৃশ্য ও পলাতক—কারণ তিনি কেবল রচয়িতা মাত্র, পরিবেশনের দায়িত্ব তাঁর নয়। এখানে কবির প্রতিনিধি নটরাজ—ঋতুর অধিপতি তো তিনিই। তাঁরই লীলারঙ্গে ঋতুর গান আপনিই জেগে ওঠে, কবি যেন উপলক্ষ—এই সংকেতটি মনে রাখলে কবির অদৃশ্য থাকার কারণ বোঝা যাবে। কবি কেন অদৃশ্য তার কারণ ব্যাখ্যা করে নটরাজ বলেছেন, 'অস্তসূর্য নিজে লুকিয়েছেন কিন্তু মেঘে মেঘে রঙ ছড়িয়ে আছে।' এই নটরাজ বর্ষাকে আবাহন করেছেন, বর্ষাশরতের রহস্যতত্ত্বটি গান দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু যাবতীয় গান নটরাজের কণ্ঠনিঃসৃত নয়, নটরাজের নির্দেশে সেইগুলি গেয়েছে গায়কগায়িকার দল। অথচ প্রতিটি গান ঋতুর কোনো না কোনো মর্ম উদ্ঘাটন করে দিয়েছে কখনও বাদলের আবাহনে, কখনো বাদলের বীণায় শরৎলক্ষ্মীর অঙ্গুলিপরশে।

শেষ বর্ষণ পালায় রবীন্দ্রনাথের সংগীতগুলি মাধুর্যে ঘনীভূত, রসে সমৃদ্ধ, সংকেতে সূক্ষ্ম এবং সৌন্দর্যে বিহ্বল হয়ে উঠেছে। ঋতুর একটি অনির্বচনীয় মধুরিমাকে সুরের মৃদুস্পর্শে ফুটিয়ে তোলার অবিশ্বাস্য ক্ষমতা এসেছে এই কাব্য-গীতগুলিতে। সেই সঙ্গে নটরাজের বাণী গানগুলির ভাষ্য, না গানগুলি

বাণীর ভাষ্য, নিশ্চয় করে বলা যায় না। বর্ষাশরতের আগমনী-বিজয়ার একটি মনোরম তত্ত্ব এই নাট্যপালায় বিবৃত হয়েছে, কিন্তু তা বড়ই সূক্ষ্ম বড়ই অনিন্দ্য ও অনির্বচনীয়। ভাষা দিয়ে তাকে ব্যাখ্যা করা যায় না, কেবল গান দিয়েই বোঝানো যায়। নটরাজ বলেছেন, 'অন্তরের আকাশে তাকে গান গেয়ে ডেকে আনতে হয়।' এই অন্তরের আকাশে প্রবেশ করা বড় সহজ নয়, ভিতরের দিকের পথই সবচেয়ে দুর্গম, কিন্তু নটরাজ রাজাকে তাই অভয় দিয়ে বলেছেন, 'গানের স্রোতে হাল ছেড়ে দিন, সুগম হবে'। গানের ভিতর দিয়ে জগৎ নিরীক্ষণের ফলেই কবির কাছে—

রূপের রেখা রসের ধারায় আপন সীমা কোথায় হারায়
তখন দেখি আমার সাথে সবার কানাকানি।

—এই উপলব্ধি যে কত গভীর, শেষ বর্ষণ না শ্রবণ করলে তা বোঝা যাবে না। কথা ও সুরের উপর কী অবলীলাময় অধিকার, কী আশ্চর্য স্বামীত্ব এসেছে তাঁর, তাঁর গানের গুঞ্জরণে শ্রাবণপূর্ণিমার এক চোখে হাসি আর একচোখে কান্না সত্যই ছলছল করে ওঠে। নীপবনতলে ছায়াবীথিকায় বনাঙ্গনারা এলোচুল আকাশে উড়িয়ে দিয়ে ধারাজলে স্নান করে। বাদললক্ষ্মীর অবগুণ্ঠন খসিয়ে শরৎপ্রাতের আলোর বাণীকেই দেখা যায়। কবির কাব্যজীবন যে এই সময় সাময়িকভাবে স্তিমিত ছিল, সৃষ্টির সকর্মক লেখনী অপেক্ষাকৃত মন্থর, যেন তা শেষ পর্যন্ত কোনো ক্ষোভ রেখে যায় না। গানের উৎসারে আপনাকে পরিপূর্ণভাবে সার্থক করেছেন কবি। যে অসীম অনির্বচনীয়, অরূপের যে রহস্যময় আভাস চিরকাল রূপসীমার প্রান্ত থেকে অদৃশ্য ইঙ্গিতে কবিকে বিচলিত করেছে, যেন গানের ভিতরেই কবি তাকে ধরতে পেরেছেন, যেন শেষ বর্ষণের গীতিরচনাকালেই ইন্দ্রিয়াতীত সেই অনির্বাচ্য অপরূপ মাধুরী হয়ে তাঁর সূক্ষ্ম শ্রুতির কাছে আবেদন পাঠিয়েছে। নটরাজ তাই এই পালানাট্যে বলেছেন—

"যে মাধুরী হাওয়ায় হাওয়ায় আভাসে ভেসে বেড়ায়, সেই ছায়ারূপটিকে ধরেছে কবি আপন গানে। সেই ছায়ারূপিণীর নূপুর বাজল, কঙ্কণ চমক দিল কবির সুরে, সেই সুরটিকে তোমাদের কণ্ঠে জাগাও তো—

যে ছায়ারে ধরব বলে করেছিলেম পণ
আজ সে মেনে নিল আমার গানেরই বন্ধন।

আকাশে যার পরশ মিলায় শরৎমেঘের ক্ষণিক লীলায়
আপন সুরে আজ শুনি তার নূপুরগুঞ্জন।
অলসদিনের হাওয়ায়
গন্ধখানি মেলে যেত গোপন আসাযাওয়ায়।
আজ শরতের ছায়ানটে মোর রাগিণীর মিলন ঘটে
সেই মিলনের তালে তালে বাজায় সে কঙ্কণ।"

এত আনন্দিত প্রতীতি, এত অমেয় তৃপ্তি রবীন্দ্রনাথের ইতিপূর্বের গানে ঘটেছে বলে যেন আমাদের বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। গানের পাত্রে বর্ষাশরতের লীলারসকে কবি যেন এমন করে আর কখনও পান করেননি।

শেষ বর্ষণে বর্ষা ও শরৎ রৌদ্রছায়ার মত মিলিত হয়েছে। বর্ষার আনন্দিত আবির্ভাব ও তার অন্তরের ঘনীভূত বিষাদপ্রতীক্ষা, মেঘমল্লারের উৎকণ্ঠাকাতর দীর্ঘশ্বাস ও দেশরাগের নন্দিত শ্যামল ছন্দ, শরতের ক্ষণিক হাস্যোজ্জল রাঙিমা ও শেফালির শুভ্র লাবণ্য নির্যাসিত হয়ে এই পালার গানগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে। কখনও আকাশের বেদনার সঙ্গে হৃদয়ের রাগিণীর মিল ধরেছে 'ঝরে ঝরঝর ভাদর বাদর' এই গান। কখনও 'ঘন মেঘে যার চরণ পড়ে, শ্রাবণের ধারায় যার বাণী, কদম্বের বনে যাঁর গন্ধের অদৃশ্য উত্তরীয়,' গানের আসনে তাকে বসানো হয়েছে। 'এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে' এই গানের সুরে তিনি মূর্তিধারণ করেছেন। ঘরছাড়া শ্রাবণ-বৈরাগী অশ্রান্ত ধারায় একতারার একই সুর বাজিয়ে সারা হল, সেই সুর মেঘমল্লারের গানে 'কোথা যে উধাও হল'। পূর্ব দিক আলো করে আসে শ্রাবণপূর্ণিমা, যার 'হাসির কানায় কানায় ভরা নয়নের জল'। 'বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা' আষাঢ়ের একই চেহারা—তারই পাশে আবার সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ, অকারণ উৎকণ্ঠা, পথচেয়ে-থাকা আনমনার গান 'পুব হাওয়াতে দেয় দোলা আজ মরি মরি'। যে আষাঢ় কবির হৃদয়ে গান জোগায়, সুরের নদীতে তরঙ্গ তোলে, অকারণ বেদনায় উদ্‌ভ্রান্ত করে, সেই গান-জাগানো আষাঢ়ের অভ্যর্থনা এর চেয়ে সার্থক কোন গানে হতে পারে?

পুব-হাওয়াতে দেয় দোলা আজ মরি মরি
হৃদয়-নদীর কূলে কূলে জাগে লহরী।
পথ চেয়ে তাই একলা ঘাটে বিনা কাজে সময় কাটে
পাল তুলে ঐ আসে তোমার সুরেরই তরী।......

মিলবে যে আজ অকূল পানে তোমার গানে আমার গানে
ভেসে যাবে রসের বানে আজ বিভাবরী।

বিরহিণীর 'অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে', ঘনবর্ষার মেঘ আর ছায়ায় গড়া সজল রূপের সঙ্গে সঙ্গে 'ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে' আকাশ-পৃথিবীর আনন্দঘন মিলনের ছন্দ ধ্বনিত হয়। গানের ছন্দে মৃদঙ্গের অশ্রুত ধ্বনি বাজে কোনো গানে—'পথিক মেঘের দল জোটে ঐ শ্রাবণগগন-অঙ্গনে'। মন ছুটে যায় নিরুদ্দেশের সঙ্গ নিতে, দিক-হারানো দুঃসাহসে। কেতকীর কণ্ঠে বাদলশেষের মিনতি বাজে করুণ সুরে,

একলা বসে বাদল-শেষে শুনি কত কী
এবার আমার গেল বেলা বলে কেতকী।

শ্রাবণকে বিদায়ের পূর্বে আরো কিছুক্ষণ থাকতে বলেন কবি, 'শ্যামল শোভন শ্রাবণ ছায়া নাইবা গেলে।' কিন্তু সে তো বস্তুতই যাওয়া নয়, সে শরতের আলোয় পরিবর্তন মাত্র, শুকতারা যেমন শিউলি ফুলকে ডাকে। ধীরে ধীরে 'শরতের অমল মহিমা'র আবির্ভাব ঘটে, বাদললক্ষ্মীর আবরণ খুললেই দেখা যায় সেই ছদ্মবেশিনীই শরৎপ্রতিমা, যেমন ফাল্গুনী নাটকে জীর্ণ জরার আবরণ খসিয়ে দেখা দিয়েছিল চিরন্তন যৌবনেরই রূপটি। এখানেও বর্ষার ধারায় যাঁর কণ্ঠ গদগদ, শিউলিবনে তাঁরই গান, মালতীবিতানে তাঁরই বাঁশির ধ্বনি, তাঁরই গান 'এবার অবগুণ্ঠন খোল।' অবগুণ্ঠন খুলে দেখা গেল অপরূপকে, শরৎপ্রাতের আলোর বাণীকে, যার নাম জানা না গেলেও সুর চিনতে ভুল হয় না, সে 'অকারণ বেদনার বীণাপাণি।' 'হে ক্ষণিকের অতিথি' এবং 'আমার রাত পোহালো' শেষ বর্ষণ পালার দুটি শ্রেষ্ঠ কাব্যগীতি। ঋতুলক্ষ্মীর আসা-যাওয়ার লীলানাট্যের গোপন ঐশ্বর্য এই দুটি গানে অনবদ্য হয়ে ফুটে উঠেছে। শেষ বর্ষণ পালায় কবি বর্ষা ও শরতের মিলিতরূপের বন্দনা করে ঋতুউৎসবের যে সামগ্রিকতার পরিচয় দিলেন, তাই তাঁর পরবর্তী নটরাজ ঋতুরঙ্গশালায় আরও পূর্ণাঙ্গ হয়ে দেখা দিয়েছে। মোটের উপর শেষ বর্ষণ ইত্যাদি পালানাট্যে কবি তাঁর সংগীতসৃষ্টির মাধুর্যের দ্বারা ঋতুপ্রকৃতির অন্তঃপুরটি উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছেন। 'যে কথা রয় প্রাণের ভিতর অগোচরে'—কবির বাঁশি গানে গানে তাকেই চুরি করে নিয়েছে, ছড়িয়ে দিয়ে গেছে শিউলি ফুলের সুবাসে, ভিজে বনের ঘাসে ঘাসে, মেঘের গায়ে। এক পরম নিবিড় অনাসক্তি ও বাউল বৈরাগ্যে ভেসে গেছে কবির গান, নদীর প্রবহমান জলস্রোতের পর দিয়ে,

দক্ষিণের হিল্লোলিত বাতাসে, ফাল্গুন-শ্রাবণের কত প্রভাতে-রাতের অব্যক্ত মুহূর্তে। কবির শেষ বয়সের কাব্যে বারবার যে নিরাসক্ত জীবনদর্শনের কথা ঘোষিত হয়েছে, কবির গানে তারই প্রতিধ্বনি পড়েছে। শেষসপ্তকের সংখ্যক কবিতায় কবি লিখেছিলেন—

চঞ্চল বসন্তের অবসানে
আজ আমি অলস মনে
 আকণ্ঠ ডুব দেব ঐ ধারার গভীরে ;
এর কলধ্বনি বাজবে আমার বুকের কাছে
 আমার রক্তের মৃদু তালের ছন্দে।
এর আলোছায়ার উপর দিয়ে
 ভাসতে ভাসতে চলে যাবে আমার চেতনা
 চিন্তাহীন তর্কহীন শাস্ত্রহীন
 মৃত্যু-মহাসাগর-সংগমে।

শেষ বর্ষণের শেষ গীতটি এই প্রশান্তিগভীর জীবনদর্শনের উপরই প্রতিষ্ঠিত—

গান আমার যায় ভেসে যায়
চাসনে ফিরে চাসনে, দে তারে বিদায়।···
কাঁদনহাসির আলোছায়া সারা অলস বেলা—
মেঘের গায়ে রঙের মায়া, খেলার পরে খেলা।
ভুলে-যাওয়ার বোঝাই ভরি গেল চলে কতই তরী—
উজান বায়ে ফেরে যদি কে রয় সে আশায়।

নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা ১৩৩৩ সালে রচিত ও অভিনীত হয়, অভিনয়কালে এর নাম দেওয়া হয়েছিল ঋতুরঙ্গ। ইতিপূর্বে ফাল্গুনী বসন্ত শেষ বর্ষণে যতখানি ছদ্মনাট্য ছিল, এখানে তাও নেই। পরন্তু এটি কবিতা ও গানে ঋতুর উৎসব-মাল্যরচনা। কেবল একটি ঋতু নয়, সমগ্র ঋতুচক্র এই উৎসবের অঙ্গীভূত। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে এটি নাট্যপর্যায়ভুক্ত এবং রবীন্দ্রনাট্যসমালোচকগণও নাট্য-বিষয়ের আলোচনায়ও একে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। নটরাজ ঋতুরঙ্গশালাকে নাট্যবিভাগে স্থানান্তরিত করলেও স্বতন্ত্রভাবে গান ও কবিতার যোজনায় এর মধ্যে কোনো নাটকীয়তা সঞ্চারিত হয়েছে কিনা এই বিষয়ে কবির একটি মন্তব্য এখানে স্মর্তব্য—

"পূরবী ও মহুয়ার মাঝখানে আর একদল কবিতা আছে,—সেগুলি অন্য জাতের। তাদের মধ্যে নটরাজ ও ঋতুরঙ্গই প্রধান। নৃত্যাভিনয়ের উপলক্ষ নিয়ে এগুলি রচিত হয়েছিল কিন্তু এরাও স্বভাবতই উপলক্ষকে অতিক্রম করেছে। আর কোনখানেই শান্তিনিকেতনের মত ঋতুর লীলারঙ্গ দেখিনি—তারই সঙ্গে মানবভাষায় উত্তর-প্রত্যুত্তর কিছুকাল থেকে চলছে। তার রীতিমত স্বরু হয়েছে শারদোৎসবে—তার পরে ঋতুগীতির প্রবাহ বেয়ে এসে পড়েছিল ঋতুরঙ্গে। বিষয় এক তবু প্রভেদ যথেষ্ট। সেই প্রভেদ যদি না থাকত তাহলে লেখবার উৎসাহই থাকত না"।[২২]

সুতরাং ঋতুর লীলারঙ্গ ও মানবভাষায় তার উত্তরপ্রত্যুত্তর এই সংকেতেই কবি এগুলিকে নাটক বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর ভাষায়—

"ইহাতে গল্প নাই, সংলাপ নাই, মানব পাত্রপাত্রী নাই, পুরো ভূমিকা ও পটভূমিকায় ভেদ করিবার চেষ্টা নাই। পূর্বোক্ত দুটিতে গল্প ও গান আছে, এখানে তৎপরিবর্তে কবিতা ও গান। কবিতাগুলি আবৃত্তি করিবার জন্য, অভিনয়কালে স্বয়ং কবি এগুলি আবৃত্তি করিতেন। এই কবিতাগুলিকে ইহার পটভূমিকা বলিলেও বলা যাইতে পারে। এগুলি যেন একাধারে প্রযোজক ব্যাখ্যাতা ও আদর্শ দর্শকের বক্তব্য"। (রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ)

নবীন ১৩৩৭ সালের ফাল্গুনে রচিত ও পরে বনবাণী (১৩৩৮ আশ্বিন) গ্রন্থে পরিবর্তিত আকারে পুনঃপ্রকাশিত হয়। নবীন ঋতুরঙ্গশালার মত রচনাবলীর নাট্যবিভাগে মুদ্রিত এবং গীতিনাট্যরূপে প্রচলিত, কিন্তু এখানেও প্রচলিত নাট্যরীতির কিছুই নেই। এটি একক কথকতায় গ্রন্থিত কথাবস্তুর সঙ্গে কয়েকটি ঋতুগীতির যোজনা মাত্র এবং নৃত্যসহযোগেই গানগুলির নাটকীয়তা ফোটানো হযে থাকে। গানের বিচারে এতে অলিমালা, কিশোর, মাধুরীর মহাশ্বেতা (বসন্তলক্ষ্মী?), কবি প্রভৃতি পাত্রপাত্রী আছে। কিন্তু এখানে গানগুলি বস্তুত সংলাপ নয়, বস্তু বা বসন্তের সামগ্রী-বিশেষকে সম্বোধন করে কবির মুগ্ধ হৃদয়াবেগই গীতছন্দে ঝরে পড়েছে। কবি যেন বসন্তের রঙ্গ-দেউলের সোপানে বসে টুকরো টুকরো সুখদুঃখের মালা গেঁথেছেন, সাতনরী হার করে পরিয়ে দিতে চেয়েছেন মাধুরীর মহাশ্বেতা সেই বসন্তলক্ষ্মীর কমকণ্ঠে। তাঁর সেই গানের দানে মিলিয়ে দিয়েছেন ফাল্গুনের ভরা সাজির উদ্বৃত্ত থেকে তুলে আনা বনের মর্মর, বাণীর সূত্রে গেঁথে বেঁধে দিয়েছেন মণিবন্ধে। হয়ত

কবি যখন থাকবেন না, তখনও এই দানের ভূষণ থাকবে আমাদের স্মরণিকার বক্ষোপটে। এই আকৃতিটুকু একটি মুক্তাফলের মত জমাট বেঁধেছে এই ছোট গানখানিতে—

ফাগুনের নবীন আনন্দে গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে
দিল তারে বনবীথি কোকিলের কলগীতি,
ভরি দিল বকুলের গন্ধে।
মাধবীর মধুময় মন্ত্র রঙে রঙে রাঙালো দিগন্ত।
বাণী মম নিল তুলি পলাশের কলিগুলি,
বেঁধে দিল তব মণিবন্ধে।

এই জন্য গানখানি কেবল নবীনের নয়, সমস্ত ঋতুপর্যায়ের গানেরই ভূমিকা হয়ে উঠেছে। পত্রপুটের ১৫ সংখ্যক কবিতায় কবি লিখেছিলেন—

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য আলোকের প্রকাশ—
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য ভালোবাসার অমৃত।

এই আলোকের প্রকাশ ও ভালোবাসার অমৃত, জ্যোতি ও প্রীতি, প্রকৃতির মাধুর্য ও সৌন্দর্য, রঙ ও রস উজাড় করে উপচিত হয়েছে কবির সংগীত। সেই সংগীতগুলিই এই জাতীয় ঋতুকাব্যগুলিকে এমন অনির্বচনীয় মাধুরিমা দান করেছে।

১৫

নটীর পূজা রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের পূর্বাভাস এবং সাধারণভাবে ঈষৎ অবহেলিত রচনা। বৌদ্ধকাহিনী অবলম্বনে প্রথম জীবনে রচিত পূজারিণী কবিতাকে ভিত্তি করেই নটীর পূজা রচিত হয় এবং ১৩৩৩ সালের বৈশাখের মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয। পূজারিণীর পল্লবিত এই নাট্যসংস্করণ নিঃসন্দেহে কবির শেষ জীবনের একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। এই নাটকে ঘটনাগত নাটকীয়তার সঙ্গে নৃত্যের একটি নূতন মাত্রা যোজিত হয়েছে এবং নৃত্যগীত-সম্বলিত হয়ে নটীর পূজা সাধারণ নাট্যস্তর থেকে উন্নীত হয়ে একটি বিচিত্র নৃত্যগীত-নাট্যরূপে পরিগণিত হয়েছে। গীত ও নৃত্য এই নাটকে কেবল বহিরঙ্গ ব্যাপার মাত্র নয়, গীত ও নৃত্যই যেন এই নাটকের যুগ্মনায়িকা—নটী তারই মানবী মূর্তিমাত্র। রক্তকরবী নাটকে নন্দিনী যেমন শোষণভিত্তিক অন্ধকার

যক্ষপুরে আনন্দ-মাধবীর ছবি, নটীও তেমনি ক্রোধ ও হিংসাভিত্তিক সমাজে আত্মনিবেদন ও নিঃস্বার্থ আত্মদানের মানবীরূপ। প্রেমের দ্বারাই পূজা সম্পূর্ণ হয়, এই তত্ত্বটি রবীন্দ্রকাব্যে নূতন নয়, কিন্তু সেই তত্ত্বকে নৃত্যেসংগীতে ফুটিয়ে তোলাই অভিনব।

অবশ্য নটীর পূজা অপেক্ষা পূজারিণী অনেক বেশি একমুখী, ভাবমুখ্য, ও করুণ-রসাত্মক ছিল। নাট্যরূপে বহু বৈচিত্র্য ও চরিত্রের ভিড়ে শ্রীমতী চরিত্রের সেবাপ্রাণ একমুখিতা ক্ষুণ্ন হয়েছে বলেই তার কণ্ঠে গানের পর গান দিয়ে কবি নটীর পূজাকে সার্থক করেছেন। ভগবান করুণাঘন বুদ্ধ যে নটীর পূজা গ্রহণ করবেন, সেই সংবাদে নটী ধন্য, তার আত্মনিবেদনের আনন্দই বারবার সুরেছন্দে উৎসারিত। প্রথম অঙ্কে নটীর গান 'নিশীথে কী কয়ে গেল মনে'— ভোরের অরুণরাগে উপালির মুখে শুনতে-পাওয়া করুণাঘনের আহ্বান নটীর এই গানে স্পন্দিত হয়েছে, নটীর সমস্ত দিবাকৃত্য সে সংবাদে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে। নটীর পূজা নাটকে নটীর কাছে যা অনন্তপুণ্য বুদ্ধের আহ্বান, রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকে তাই সুদূরের আহ্বান। অচলায়তনের সূচনায় পঞ্চকের মুখে 'তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে', ফাল্গুনীর গান 'পথ দিয়ে কে যায় গো চলে', মুক্তধারায় ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায় কোন খেপা সে'—সবগুলি একই পর্যায়ভুক্ত তাতে সন্দেহ নেই। দূর অজানিতের আহ্বান এমনি করেই রবীন্দ্রনাট্যে এক এক জাতীয় চরিত্রের কাছে অজানিতের ডাক হয়েছে, কবির সুর তারই স্বরলিপিটি ধরে রেখেছে নাটকের পৃষ্ঠায়। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কবি একদিন লিখেছিলেন, 'যে শুনেছে তাহার আহ্বানগীত ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে'। নটীর গানে এখানে আমরা শুনি—

> সে কথা কি নানা সুরে বলে মোরে চলো দূরে
> সে কি বাজে বুকে মম বাজে কি গগনে
> কী জানি কী জানি।

নাটকে এই গানের পরবর্তী সংলাপগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়—

"বাসবী। মালতী, তোমার চোখে যে জল ভরে এল। এ গানের মধ্যে কী বুঝলে বলো তো।

মালতী। শ্রীমতী ডাক শুনেছে।

বাসবী। কার ডাক?

মালতী। যার ডাকে আমার ভাই গেল চলে। যার ডাকে আমার—"ইত্যাদি

নটীর সব গানগুলিই তার নিভৃত মনের সংলাপ। তার মুখরতা কথায় নয়, সুরে। নটীর গানগুলি আত্মদানের স্বগতভাষণ। 'তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে' রমণীয় বাসকসজ্জিকার প্রতীক্ষাবসানের বিস্ময়-সংগীত। গীতাঞ্জলি পর্বের 'তাই তোমার আনন্দ আমার পর' এবং বলাকার 'যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা' এই লীলাবাদ যেন শ্রীমতীর আলোচ্য গীতটির মর্মবাণী। গানটির ছন্দ তানপ্রধান অসমপর্বিক অর্থাৎ প্রবহমাণ পয়ার কিংবা মুক্তবন্ধ বলা চলে। এই জাতীয় ছন্দে রচিত কবিতায় ইতিপূর্বে সুর যোজনা করলেও এইরূপ ছন্দে গান রচনার উদাহরণ বেশি নেই। স্বল্পবাক কয়েকটি ভাবসমৃদ্ধ চরণে পরম প্রিয়ের আহ্বানকে ব্যঞ্জিত করেছেন কবি যুগপৎ দয়িতার অন্তরে ও বহির্ভুবনে—

> তোমারই যে ডাকে
> কুসুম গোপন হতে বাহিরায় নগ্ন শাখে শাখে
> সেই ডাকে ডাকো আজি তারে।
> তোমারই সে ডাকে বাধা ভোলে
> শ্যামল গোপন প্রাণ ধূলি-অবগুণ্ঠন খোলে।
> সে ডাকে তোমারই
> সহসা নবীন উষা আসে হাতে আলোকের ঝারি
> দেয় সাড়া ঘন অন্ধকারে।

দ্বিতীয় অঙ্কে শ্রীমতী ও সহচরীগণ যখন বনের প্রবেশপথে পূজা সমাপ্ত করে স্তূপমূলে পূজার্ঘ্য দিতে চলেছে, তখন স্তূপের রুদ্ধপ্রাচীর তাদের বাধা দিল, ভয়ংকর গর্জন ভেসে এল প্রাচীরের অপরপ্রান্ত থেকে, আসন্ন সর্বনাশের ইঙ্গিতকে অভ্যর্থনা জানাল ভয়হীনা শ্রীমতী সমবেত নৃত্যছন্দে স্পন্দিত এই গানে—

> বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন হবে
> ছেড়ে যাব তীর মাভৈঃ রবে।

এই গানে 'ভৈরব' শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়, যদিও শ্রীমতী বুদ্ধশিষ্যা অহিংসা-ব্রতিনী। কিন্তু কবির কাছে এই তত্ত্ব নূতন নয় যে 'বাধা দিলে বাধবে লড়াই মরতে হবে'। কবি সত্যের উপাসক, তাঁর সত্য ভৈরবের রূপ ধরে অধর্মের বিনাশ করে, রুদ্ররূপ ধরে মৃত্যুর মধ্যে জীবনের সম্ভাবনাকে সার্থক করে।

মুক্তধারা নাটকে যন্ত্রদানবের বিরুদ্ধে, মনুষ্যত্বঘাতী বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে, মানুষের ভ্রাতৃদ্রোহী অহংকারের বিরুদ্ধে ভৈরবের রোষবহ্নি কেমন করে জ্বলে উঠল, ইতিপূর্বে তা প্রত্যক্ষ করেছি। তাই প্রেম ও সত্যধর্ম বাধা পেয়েছে বলেই বুদ্ধশিষ্যা শ্রীমতীর কণ্ঠে ভৈরববন্দনা ধ্বনিত হয়েছে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সেই ভৈরবমন্ত্রে দীক্ষিত বলেই তো শ্রীমতী এত সহজে আত্মদান করতে পেরেছিল। তার পূর্বে তার অভয়-সংগীতটিও উল্লেখযোগ্য—'আর রেখো না আঁধারে আমায় দেখতে দাও'। শ্রীমতীর অন্যান্য গানগুলির মধ্যে 'হে মহাজীবন, হে মহামরণ' এবং 'আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো নমো হে নমো' এই দুটি গান এখানে শ্রীমতীর নিভৃত তথাগত বন্দনায় পরিণত, আত্মার গভীর থেকে উৎসারিত, আত্মসমর্পণের নিবিড়তায় মূর্ছিত, আসন্ন আত্মবিসর্জনের পূর্ব মুহূর্তে আপনার জীবনকে প্রদীপশিখায় প্রজ্বলিত করে দেবার নিবেদন। রাজপুরীর বৌদ্ধবিরোধীগণ বুদ্ধশিষ্যা নটীকে বুদ্ধদেবের জন্মদিবসে স্তূপমূলে নৃত্যাদেশ জানিয়েছে। এই নিষ্ঠুর আদেশকে নত মস্তকে গ্রহণ করে নটী শ্রীমতী তার নৃত্যের দ্বারাই বুদ্ধদেবের জন্মতিথি পালন করবে—এই হল নটীর পূজা নামকরণের সার্থকতা। তারই প্রস্তুতি 'হে মহাজীবন হে মহামরণ' গানটি এবং সেই আত্মদানের নৃত্যগীত 'আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো' গানটি। সংগীতকে কবি যেমন মর্যাদার আসনে উন্নীত করেছেন এই গানে, নৃত্যকেও সেইরূপ বিলাসসভার কলুষতা থেকে সম্মানের স্তরে উন্নীত করলেন। নৃত্যের দ্বারাও যে দেবতার, পরম করুণাময় ভগবান তথাগতের বন্দনা হতে পারে, নটী যেন তাই প্রমাণ করল। দেহছন্দ হল মন্ত্রহারা স্তব, ব্যথা হয়ে উঠল বন্দনা, সকল চেতনা হিল্লোলিত হয়ে আরাধনা-রূপে ঝরে পড়ল, তারপরই পরমা নির্বৃতি, পরমা শান্তি—'স্তূপপাদমূলে নিবিল চকিতে শেষ আরতির শিখা'। কিন্তু জয় হল প্রেম ক্ষমা ও অহিংসার। মৃত্যুর দীপ্তশিখায় উজ্জ্বল হল আরতির বেদী। আত্মদানের মধ্য দিয়ে মঙ্গলের শঙ্খ বাজিয়ে ছিল এমনি করে মুক্তধারার অভিজিতও। কিন্তু সেগুলির সঙ্গে শ্রীমতীর ক্ষেত্রে পার্থক্য, শ্রীমতী কেবল প্রাণদান করেনি, তারপূর্বে আপনার বৃত্তিকে, সাধনাকে, নৃত্যকে জ্যোতির্ময় করে গেছে। শ্রীমতী নটী তার দেহ-চাঞ্চল্য ও ছন্দোময় নর্তনকে, তনুর হিল্লোলিত আন্দোলনকে অঞ্জলিতে পরিণত করে গেছে। নটীর পূজার সর্বশেষ সংগীতটি তাই সমগ্র নাটকখানিকে স্নিগ্ধ মাধুর্যে ও অনুপম কারুণ্যে সার্থক করেছে। এই একখানি সংগীতের জন্যই

নটীর পূজা নাটকখানি ধন্য হয়েছে বলা যায়। সংগীত এ গানে একান্তই নৃত্যনির্ভর কিন্তু নৃত্য ও সংগীত বরং এখানেই প্রথম একাত্ম হয়ে গেছে।[২৩]

বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সারস্বত ইষ্টদেবতা, এবং বুদ্ধবাণী রবীন্দ্রকাব্যে বারংবার পুনরাবৃত্ত। নটীর পূজা নাটকের দুখানি গান প্রত্যক্ষভাবে মানবপুত্র বুদ্ধদেবের প্রতি মহাকবির গীত-নৈবেদ্য। দুটি গানই ভিক্ষুদের কণ্ঠে, 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' এবং 'সকল-কলুষ-তামস-হর'। বুদ্ধজয়ন্তী ও বুদ্ধ-আদর্শ স্মরণেই গানদুটির জন্ম, প্রথম গানটি পরিশেষের সংযোজনীতে সন্নিবিষ্ট। ক্ষমা ও প্রেমের প্রতীক বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের কাছে চিরউপাস্য মহামানব, এই গানের বাণীতেই সেই শ্রদ্ধার প্রমাণ নিহিত। 'করুণাঘন' শব্দটি বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে সংগ্রহ করে কবি সার্থকভাবে মহাপ্রাণ অনন্তপুণ্য বুদ্ধদেবের বিশেষণরূপে ব্যবহার করেছেন। একালের কবিকণ্ঠের এই ঘোষণা যুগ যুগ ধরে আর্ত কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হবে—

ক্রন্দনময় নিখিল হৃদয় তাপদহনদীপ্ত
বিষয়-বিষ-বিকার-জীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত।...

'সকল-কলুষ-তামস-হর' গানটি 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' গানটিরই ভাষাগত রূপান্তর মাত্র। দুটি গানের বক্তব্যই এক অর্থাৎ লোভজটিল রক্তপঙ্কিল বর্তমানের উপতটে দাঁড়িয়ে প্রেম ও মৈত্রী, অহিংসা ও কল্যাণ, প্রীতি ও শান্তির মহাবির্ভাবের আকূতি-নিবেদন।

পরিত্রাণ নাটকটি প্রাযশ্চিত্তের নাট্যরূপান্তর, ১৩৩৪ সালের বার্ষিক বসুমতীতে এবং ১৩৩৬ সালের জ্যৈষ্ঠে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এর ভূমিকায় কবি লিখেছেন যে এটি নাটকটির "কোনো কোনো অংশ প্রায়শ্চিত্ত হইতে গৃহীত, অবশিষ্ট অংশ নূতন"। এই সংশোধন নাট্যসংস্কারের আদর্শে হয়েছে কিনা সে কথা কবি কিছু বলেননি। প্রায়শ্চিত্তের তুলনায় যে অংশ পরিত্রাণে নূতন সে অংশে সংগীত ব্যবহারেও করি দ্বিধা করেননি। পরিত্রাণ প্রাযশ্চিত্তের রূপান্তরিত সংস্করণ হলেও এই রূপান্তর-প্রক্রিয়ায় নাটকটি যথারীতি তত্ত্বগর্ভ বা সাংকেতিক হয়ে ওঠেনি। কেবল সংলাপগত ও দৃশ্যসংস্থানগত কিছু পরিবর্তন ঘটেছে—কাহিনী ও চারিত্রিক কাঠামো অক্ষুণ্ণ আছে। পূর্ববর্তী নাটকের অনেক গানই এতে আছে, তৎসহ ধনঞ্জয়ের পাঁচখানি ও নটীদের জন্য তিনখানি গান। এ সংযোজনা একান্তই বৈচিত্র্যহেতু, তাই সুরের গভীর

সাংকেতিকতায় রসিকচিত্ত বাণবিদ্ধ হয় না। এই গানগুলি তৃপ্ত করে, বিস্মিত করে না। ধনঞ্জয়ের মুখে 'কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারই ঘায়ে' এই প্রেমগীতির প্রয়োগ সার্থক হয়নি। এই অপূর্ব প্রেম-বৈচিত্ত্যের কাব্যগীতিতে প্রণয়ের বেদনাহত মাধুর্য সংযত বাণী ও নিবিড় সুরসম্পদে ঘনরসায়িত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু ধনঞ্জয় বৈরাগীর মুখে বসন্তরায়ের প্রতি উদ্দিষ্ট এই গান বেমানান লাগে। 'তুমি বাহির থেকে দিলে বিষম তাড়া' গানটি পূজা পর্যায়ের, একে মিস্টিকধর্মী গীত বলা যায়। প্রায়শ্চিত্ত নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগী ছিল বিদ্রোহী প্রজাদের নেতা, রাজার বিরুদ্ধে তার অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন একটি বলিষ্ঠ সামাজিক শক্তির প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছিল। তার কণ্ঠের গান ছিল সেই কঠিন শান্ত বিক্ষোভেরই বাক্‌রূপ। কিন্তু ক্রমশ পরিত্রাণে ধনঞ্জয়ের চরিত্র সমাজান্দোলনের নেতৃত্ব থেকে যেন মিস্টিক ধর্মে বাঁক নিয়েছে, আত্মানুসন্ধিৎসায় আত্মবিশ্লেষণে সে যেন অরূপ লোকের যাত্রী হতে চলেছে। এইজন্য তার গানগুলিও অন্তর্মুখী, সাংকেতিক হয়ে উঠেছে। 'আমার পথে পথে পাথর ছড়ানো' গানটির বক্তব্য গীতাঞ্জলির 'দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল' গানটির ভাষা ও ব্যাকুলতাকেই অনিবার্যভাবে মনে পড়িয়ে দেয়। উপলবন্ধুর পথেই নির্ঝরের কলগীতি উৎসারিত হয়, বিরোধিতার অমসৃণ পথ দিয়েই বিজয়রথের অভিযাত্রা। পরবর্তী গীত 'তুমি হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন'— এইজাতীয় ভাবও কবিজীবনে পূর্বদৃষ্ট। জীবনের পরম কোনো প্রাপ্তি বা চরম রত্ন অপ্রত্যাশিত মুহূর্তেই আসে, সহসা পথ থেকে পথিকপ্রিয়ের আগমন আমাদের অভ্যস্ত দিনযামিনী বিপর্যস্ত করে দেয়। কিন্তু এই দুটি গান ধনঞ্জয় বৈরাগীর কণ্ঠে পরিত্রাণ নাটকে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল বলে মনে হয় না। আসলে ধনঞ্জয়ের মুখে যে সত্যভাষণ ও গভীর অভিজ্ঞতার বাণীরূপে কবি অভ্যস্ত, তারই সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গানদুটি স্থাপন করা হয়েছে। ধনঞ্জয়ের অন্যান্য গান প্রায়শ্চিত্তের মতই। নটীদের গান নিতান্তই নৃত্যগীত ও প্রমোদের উপকরণ। রক্তকরবী ও শেষ বর্ষণের নাট্যকার-কবি উনিশ শতকীয় নাট্যকারদের এই গীতাত্মক রীতি কেন গ্রহণ করলেন তা বলা দুঃসাধ্য। পরিত্রাণ সাধারণ মঞ্চে এমন কিছু অভিনীত বা জনপ্রিয়ও হয়নি। তবে কাদের প্রয়োজনে কী প্রেরণায় প্রায়শ্চিত্তের এই সংস্কার ঘটল, অথচ প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা পরিত্রাণ আরো সর্বগুণোপেত চারুশীলিত হয়ে উঠল না কেন, এসব প্রশ্ন অমীমাংসিতই থাকে। নটীদের মুখে 'আমার নয়ন তোমার নয়নতলে' মহুয়ার 'সন্ধান' কবিতার

রূপান্তর মাত্র। নটীদের কণ্ঠে গানটি নিশ্চয় গভীরতা হারিয়েছে। অন্য দুটি গান (ফুল তুলিতে ভুল করেছি এবং চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে) নটীদের কণ্ঠে মোটামুটি সুপ্রযুক্ত হয়েছে।

রাজা ও রানী নাটকের নাট্যরূপান্তর তপতী ১৩৩৬ সালের ভাদ্রমাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (২২শে শ্রাবণ রচনা সমাপ্ত হয়) এবং ১৩৩৮ সালের জ্যৈষ্ঠের দ্বিতীয় সংস্করণে নাটকটি ঈষৎ পরিবর্তিত হয়। সেই দ্বিতীয় সংস্করণই রচনাবলীতে মুদ্রিত এবং প্রচলিত। লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে দেশপ্রেমিক যতীন দাস যেদিন অনশনে মৃত্যুবরণ করেন, সেইদিন সেই সংবাদ পেয়ে কবি মর্মাহত হয়েছিলেন এবং 'সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ' গানটি রচনা করেন এবং তপতীতে সেটি সংযোজনা করেন। তপতী ও রাজা ও রানীর মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান আছে, এই পরিবর্তন প্রায়শ্চিত্তের রূপান্তর পরিত্রাণের মত অনুল্লেখযোগ্য নয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত ১২৯৬ সালের রোমাণ্টিক ভাবোচ্ছ্বাস তপতীতে কী পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছে, তপতীর ভূমিকায় কবি স্বয়ং তা ব্যাখ্যা করেছেন। রাজা ও রানী নাটকে কয়েকটি গান ছিল, কিন্তু সেগুলির ভূমিকা ছিল গৌণ। কাব্যনাট্যে স্বভাবতই গানের ভূমিকা স্তিমিত হয়ে থাকে, রাজা ও রানীর গানগুলিও নাট্যদ্বন্দ্বে অপরিহার্যতা লাভ করেনি। কিন্তু তপতী নাটকের অন্যতম আবেদন তার সংগীতেই।

তপতীকে ঠিক তত্ত্বনাট্য অর্থাৎ রূপক-সাংকেতিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, যদিও রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকেই এক জাতীয় তত্ত্বের আভাস অপরিহার্য। তপতী নাটকে রাজা ও রানী নাটকের ছদ্মঐতিহাসিক বক্তব্য গভীরতর হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এই নাটকে কবি বিপাশা চরিত্রের সৃষ্টি করে প্রধানত তারই কণ্ঠে কয়েকটি গান যোজিত করেছেন। তপতীর গান কেবল নাট্যকৌতূহল সৃষ্টির উপায়রূপে যোজিত হয়নি, গানগুলির ভিতর দিয়ে নাটকের বক্তব্যও পরিস্ফুট হয়েছে। এই নাটকে রাজা ও রানীর মতই সুমিত্রা এবং বিক্রমদেবের মধ্যে প্রেমের বিরোধ—সে বিরোধ প্রতীকায়িত হয়েছে মীনকেতু ও ভৈরব-উপাসনার মধ্য দিয়ে। রাজা বিক্রমদের ললিতপ্রেমে রূপমোহে যৌবনলীলায় বন্দী তাই তিনি রাজ্যময় পঞ্চশরের মূর্তিপ্রতিষ্ঠা ঘটিয়ে প্রণয়দেবতার পুজাপ্রবর্তনের চেষ্টা করেছেন। সুমিত্রা ভৈরবমন্দিরের উপাসিকা হয়ে সেই ভোগসর্বস্ব প্রেমের হীনতার অবসান ঘটাতে চেয়েছে, তাই সে তপতী। যিনি ভৈরব তিনিই রুদ্র, তিনিই

মার্তণ্ডদেব ও নটরাজ। রুদ্রের ক্রোধে মদন ভস্ম হয়, ললিত আবেশের অবসান ঘটে, দীনতার আবর্জনা খসে যায়, তপতী নাটকের প্রথম গান 'সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ' বজ্রকণ্ঠে সেই রুদ্রভৈরবের উদ্দীপনগীত। এমন বলিষ্ঠ ক্রোধকম্প্র বীর্যবান শক্তিজাগরণের গীত রবীন্দ্রনাথ কমই লিখেছেন। এই রুদ্র-ভৈরবের আহ্বান-সংগীতের সঙ্গে মুক্তধারা নাটকের 'তিমিরহৃদ্‌বিদারণ' জাতীয় গানগুলির তুলনা করা যায়। উভয় নাটকেই ভৈরবোপাসনার পরিবেশটি একই প্রকার। এই পর্বে নাটকে ও কাব্যে নটরাজের নৃত্যছন্দের প্রতি কবির আকর্ষণ যে বৃদ্ধি পেয়েছিল অন্যত্র তার প্রমাণ আছে। নটরাজ ঋতুরঙ্গশালায় নটরাজের চরণবিক্ষেপে উন্মথিত সৃষ্টিলীলার রূপক ব্যাখ্যাত হয়েছে। নটীর পূজাতেও নটরাজেরই বন্দনা—সেখানে বুদ্ধদেব ও নটরাজ একাকার হয়ে গেছেন। তপতীতেও বিপাশার কণ্ঠে 'প্রলয়নাচন নাচলে যখন' গানটি সেই নৃত্যউন্মাদ নটরাজের বন্দনা।

নাটকে বিপাশা ও নরেশের অনুরাগ-সম্পর্কের যে সমান্তরাল বৃত্তান্তটি আছে, কয়েকটি গান তারই উদ্দেশে নিবেদিত। 'মন যে বলে চিনি চিনি,' 'বকুলগন্ধে বন্যা এলো,' 'দিনের পরে দিন যে গেল' প্রভৃতি বিপাশার গানগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বিপাশা নরেশের মধ্যে ধীরে ধীরে যে প্রণয়-রাগ গড়ে উঠেছে, প্রথমে তা বিরোধি ভাব অমসৃণ পথ বেয়ে এসেছে, তারপর নরেশ আপনার আত্মাহংকার ত্যাগ করে বিপাশার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে।

১৬

রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যে কোথাও শিশুতীর্থের নামোল্লেখ নেই, পুনশ্চ কাব্যে এটি কবিতারূপে সংকলিত। কিন্তু স্বতন্ত্র নাট্যরূপ প্রচলিত না থাকলেও যে অর্থে কবি শাপমোচনকে নাটকে পরিণত করেছেন সে অর্থে শিশুতীর্থকেও আমরা এক জাতীয় নাটক বলতে পারি। রবীন্দ্রজীবনীর সঙ্গে পরিচিত মাত্রই অবগত আছেন যে ১৯৩০ সালে ইওরোপে—ইংলণ্ড-ফ্রান্স-জার্মানি প্রভৃতি রাষ্ট্রের বিভিন্ন নগরে আপন চিত্রকলার প্রদর্শনী উপলক্ষে পর্যটনকালে কবি বিদেশী দর্শকদের উপযোগী করে একটি চিত্রনাট্য লিখেছিলেন কোন এক জার্মান চলচ্চিত্র কম্পানির অনুরোধে। কবির সহযাত্রী অমিয় চক্রবর্তীর সমকালীন এক পত্র থেকে জানা যায়—"রবীন্দ্রনাথ সারাদিন ধরে ইংরেজিতে একটা নূতন

রকম টেকনিকে ফিল্মের জন্য গল্প লিখচেন।" এই চিত্রনাট্যরচনার প্রেরণা ছিল একাধিক। প্রথমত, পূর্বরাত্রে মিউনিকের কিছু দূরবর্তী একটি গ্রামে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মূক-নাট্য প্যাশন প্লে দর্শন ('খ্রীস্টের শেষ জীবনাংশের অভিনয়'); দ্বিতীয়ত, আপন চিত্রপ্রদর্শনী উপলক্ষে ইওরোপের বিভিন্ন গ্যালারিতে মাইকেল এঞ্জেলো, দা ভিঞ্চি, টিশিয়ান, এল গ্রেকো, রুবেনস প্রমুখ ইতালীয় নবজাগৃতি-উদ্‌বুদ্ধ শিল্পীদের অঙ্কিত খ্রীস্ট-জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর চিত্রপটদর্শন; তৃতীয়ত, টি এস এলিয়ট লিখিত দি জার্নি অব দি ম্যাজাই কবিতাপাঠ (পুনশ্চে কবিকর্তৃক অনূদিত); চতুর্থত, খ্রীস্টজন্মের রূপকের মধ্য দিয়ে যুদ্ধভয়-প্রত্তাপশঙ্কিত ইওরোপের কাছে মানবপুত্রের প্রেম-মৈত্রী-কল্যাণের বাণী স্মরণ করিয়ে দেওয়ার কবিবাসনা। মোটের উপর ইংরেজিতে লিখিত 'দি চাইল্ড' নামক এই চিত্রনাট্যটি কবির কাছে অব্যবহৃত হয়ে পড়েছিল, দেশে ফিরে কবি এর অনুবাদ করেন এবং শিশুতীর্থ নামে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। এই অভিনয়ে কবিতাবর্ণিত বিষয়বস্তু নৃত্য ও মূকাভিনয়ের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয় এবং তার মধ্যে কবি কয়েকটি সংগীত যোজনা করেন। সংগীতযোজিত অভিনীত শিশুতীর্থের খশড়া আজও প্রকাশিত হয়নি, হলে রবীন্দ্রনাথের একটি নূতন নাট্যরচনার সন্ধান পাওয়া যেত। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

"অভিনয়ের জন্য গান ও নৃত্য সংযোগ করিয়া জিনিসটিকে কবি এইবার নূতন রূপ দিলেন। পুনশ্চের মধ্যে আমরা শিশুতীর্থের যে রূপটি পাই, গীতোৎসবে তাহার রদবদল বৃদ্ধি অনেক কিছুই হয়। নাটিকাটি উদ্বোধনবাক্য ছাড়া দশটি সর্গে বিভক্ত।"

পুনশ্চের অভিনয় উপলক্ষে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল গীতোৎসব নামে।[২৪] এই পুস্তিকায় পুনশ্চের নাট্যরূপের যে আভাসটি ছিল সংগীতসহ সেটি এখানে উদ্‌ধৃত হল—

"দেবতার পরাভব হল, দৈত্যেরা হল জয়ী, ছারখার হয়ে গেল স্বর্গলোক। ঋতুপর্যায় গেল ভেঙে, চন্দ্রসূর্য গেল থেমে, সমস্তই হল উলটপালট।

তখন পিতামহ বললেন, ভয় নেই। স্বর্গকে উদ্ধার করবে নূতন প্রাণ। নবজাত কুমার দেখা দেবেন, অভয় বহন করে।

মানুষের সমস্ত প্রত্যাশা নবজীবনের কাছে। শিশু আসে যুগে যুগে 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং'। আদিকাল থেকে মানব-ইতিহাসের যাত্রা নবজন্মের তীর্থে। বুদ্ধ একদিন শিশুরূপে দেখা দিয়েছিলেন, এনেছিলেন

নবজন্ম। মানুষ তাকিয়ে আছে শিশুর দিকে। এই শিশুতীর্থের বিষয়টি নিয়ে নৃত্যাভিনয়।”

কবি স্পষ্টই নৃত্যাভিনয় শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া কবিতাটির নাট্যরূপান্তরে তার দৃশ্যবিন্যাস ও গীতযোজনার আদর্শটিও পাওয়া যাচ্ছে—

“প্রথম সর্গ। অন্ধকার, উচ্ছৃঙ্খলতা, ভয়, লোভ, ক্রোধ, উন্মাদের অট্টহাস।

দ্বিতীয় সর্গ। ভক্ত অরুণোদয়ের অপেক্ষা করে আকাশের দিকে চেয়ে আছেন। বলছেন, ভয় নেই, মানবের মহিমা প্রকাশ পাবে। গান॥ কী ভয় অভয়ধামে তুমি মহারাজা। সংশয়াচ্ছন্ন বিভ্রান্তচিত্তের দল তাকে বিশ্বাস করে না। বলে, পশুশক্তিই আদ্যাশক্তি, রক্তপঙ্কের মধ্যে পরিণামে সেই শক্তিরই জয় হবে।

তৃতীয় সর্গ। প্রভাতের আলো দেখা দিল। ভক্ত বললেন, চলো সার্থকতার তীর্থে। তার অর্থ স্পষ্ট করে কেউ বুঝলে না, কিন্তু পারল না স্থির থাকতে। কণ্ঠে কণ্ঠে এই ধ্বনি জেগে উঠল—চলো। গান॥ আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।

চতুর্থ সর্গ। যাত্রীরা দেশদেশান্তর থেকে বেরিয়েছে, নানা জাতি নানা বেশে, নানা পথ দিয়ে সাধু অসাধু জ্ঞানী অজ্ঞানী। গান॥ কে যায় অমৃত-ধাম যাত্রী।

পঞ্চম সর্গ। তাদের ক্লান্তি তাদেব সংশয়।

ষষ্ঠ সর্গ। জ্বলে উঠল তাদের ক্রোধ। গান॥ যেতে যেতে একলা পথে। বললে, মিথ্যাবাদী আমাদের বঞ্চনা করেছে। ভক্তকে মারতে মারতে মেরে ফেললে। গান॥ মোর মরণে তোমার হবে জয়।

সপ্তম সর্গ। তাদের ভয়, তাদের অনুতাপ, পরস্পরের প্রতি দোষারোপ। প্রশ্ন এই, এখন তাদের পথ দেখাবে কে? পূর্বদেশের বৃদ্ধ বললে, যাকে মেরেছি তার প্রাণ আমাদের সকলের প্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে আমাদের পথ দেখাবে। সকলে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, জয় মৃত্যুঞ্জয়ের। গান॥ হবে জয় রে ওহে বীর হে নির্ভয়।

অষ্টম সর্গ। আবার সকলে যাত্রা করলে। গান॥ অমাদের খেপিয়ে বেড়ায় যে। ক্লান্তি নেই সংশয় নেই। বললে, আমরা জয় করব ইহলোক, আমরা জয় করব লোকান্তর

নবম সর্গ। কালজ্ঞ বললেন, আমরা এসেছি। কিন্তু কই প্রাসাদ কই,

সোনার খনি কই, শক্তিমন্ত্রের পুঁথি কই? পথের ধারে উৎস। উৎসের পাশে কুটীর। কুটীরের ধারে বসে অজানা সিন্ধুতীরের কবি, গান গেয়ে বলছে, মাতা দ্বার খোলো। গান॥ তিমিরদুয়ার খোলো।

দশম সর্গ। দ্বার খুলল। মা বসে তৃণশয্যায়, কোলে তার শিশু, অন্ধকারের পরপার থেকে প্রকাশমান শুকতারার মত। কবি গেয়ে উঠল, জয় হোক মানুষের, জয় হোক নবজাতকের, জয় হোক চিরজীবিতের। যাত্রীরা প্রণাম করলে, দেশদেশান্তরের কণ্ঠে ধ্বনিত হল সেই জয়গান, যুগে যুগান্তরে তা ব্যাপ্ত হল। গান॥ জয় হোক জয় হোক নব অরুণোদয়। নমো নমো নমো নমো॥"

শিশুতীর্থের স্তবকে স্তবকে যে ঘনীভূত নাটকীয়তা নাটোৎকণ্ঠা আবেগ-চূড়া নিহিত, এই সামান্য চুম্বকেই তা অনুভব করা যায়। সংলাপহীন মূকাভিনয়ের দ্বারা এই নাট্যসম্ভাবনাকে শিহরণসঞ্চারী করার ইঙ্গিত প্রথমাবধি কবিতার মধ্যে, তথা কবিকল্পনায় ছিল। নৃত্যাভিনয়ে কবি তাকেই সার্থক করে তুলেছিলেন। কিন্তু শিশুতীর্থের উক্ত নৃত্যাভিনয়ে সংযোজিত গানগুলি নাট্যধর্মের সঙ্গে সুপ্রযুক্ত হয়নি। কয়েকটি ব্রহ্মসংগীতের বিনীত ভক্তি এই মানবতার মহাকাব্যে প্রক্ষিপ্ত মনে হয়। মানবের মহিমা প্রকাশ পাবে, এই সত্যভাষণের পর 'কী ভয় অভয়ধামে তুমি মহারাজা' একেবারেই উপযুক্ত মনে হয় না। ক্ষীণ ভাবৈকসূত্রেও গানগুলি সংকলিত হয়নি, হয়েছে কখনো বা কথার সাদৃশ্যে বা অনুষঙ্গে। শিশুতীর্থে যে বিশ্বমানবসংঘের অভিযাত্রার ছবি কবি এঁকেছেন, ইতিহাসের যে ভয়ংকর পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা দেখিয়েছেন, মনুষ্যত্বের যে আশ্চর্য শুভ্র বন্দনা করেছেন, তার উপযুক্ত গান তাঁর রচনা করে দেওয়া উচিত ছিল। সংগীতের এই দুর্বলতার জন্যই কি কবি শিশুতীর্থকে নাট্যরূপে আর প্রচলিত করেননি?

কিন্তু শিশুতীর্থ নাট্যরূপ পুনঃপ্রচারিত না হলেও শিশুতীর্থের আঙ্গিক অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ অল্পকালের মধ্যেই আর একটি অনুরূপ নাট্যরচনা করলেন, শাপমোচন নামে তা স্মরণীয় হয়ে আছে। শাপমোচন শিশুতীর্থের মতই গদ্যছন্দে রচিত কবিতারূপে প্রথম লেখা এবং পুনশ্চ কাব্যেই তা সংকলিত। তারিখদৃষ্টে জানা যায় পুনশ্চের প্রথম কবিতা শিশুতীর্থ (শ্রাবণ ১৩৩৮) এবং দ্বিতীয় কবিতাই শাপমোচন (পৌষ ১৩৩৮)।

শাপমোচন রচনাবলীর নাট্যপর্যায়ভুক্ত হলেও এতে পুনশ্চের মত বর্ণনাই

প্রধান, নাট্যসুলভ বিশিষ্টতা অনুপস্থিত। এ যেন অভিনব নাটগীত—নাটককে কথকতায় পরিণত করা। শাপমোচনের কাহিনীর সঙ্গে রাজা নাটকের কাহিনীর ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে—সাদৃশ্য কেন, বলা যায় রাজার কাহিনীকেই শাপমোচনে কবি রূপান্তরিত পরিমার্জিত সংশোধিত করে নিয়েছেন। শিশুতীর্থের মত এই রচনায় গ্রন্থিকের ভূমিকাই মুখ্য—তিনি একটি নাট্যবিষয়ক বর্ণনা করে চলেছেন দৃশ্যহীন বিবৃতির সূত্রে, তারই মধ্যে পাত্রপাত্রী অর্থাৎ মূল কাহিনীর চরিত্রগুলি মঞ্চে আপন ভূমিকা অভিনয় করে চলেছে। ইতিপূর্বে ১৩৩১ ফাল্গুনে নবীন পালাগানেও কবি স্বয়ং গ্রন্থিকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। একথা অবশ্য স্মর্তব্য যে স্বয়ং কবির গ্রন্থনাসম্ভাবনাতেই এই জাতীয় বিবৃতিপ্রধান রচনাগুলির অসামান্যতা নিভর করত। শাপমোচনের এবং বলা বাহুল্য শিশুতীর্থেরও, অভিনয়ের ভাষা নৃত্য এবং গীত। এই গীতগুলি কদাচিৎ গ্রন্থিকের ভাষ্য বা বিবৃতির অংশ, অন্যথায় অধিকাংশই পাত্রপাত্রীর সংলাপরূপে গৃহীতব্য। কাহিনী স্বর্গে সূচিত, তারপর জন্মান্তরে মর্তে অবতীর্ণ। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের মত এর চিহ্নরেখহীন দুটি খণ্ড দেবখণ্ড ও নরখণ্ড। তবে মর্তজন্মের সামগ্রিকতা নয়, অংশমাত্রই এখানে গৃহীত আর সেই স্বল্পাংশের ভিতর দিয়েই শাপমোচন নামকরণের সার্থকতা।

শাপমোচন গীতবহুল নাটগীত, সংগীতই এই নাটকে সংলাপ, এ কথা পূর্বেই কথিত। শাপমোচন রচনাকালে কবি তাঁর পূর্বরচিত গানই এতে প্রয়োগ করেছিলেন একথা ভূমিকায় লেখা থাকলেও শাপমোচনের জন্য নতুন গানও কবি রচনা করেছিলেন। বিভিন্ন অভিনয়সময়ে গানের বহু পরিবর্তন ঘটেছিল, বিশেষ করে ১৯৩৪ সালের অক্টোবরে মাদ্রাজে শাপমোচনের অভিনয়কালেও কয়েকটি নতুন গান লেখা হয়। কবির জীবদ্দশায় শাপমোচনের শেষ অভিনয় উপলক্ষে ১৩৪৭ পৌষ মাসে (১৯৪০) কবি গানগুলির পুনর্বিন্যাস করেন। এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখযোগ্য যে, শাপমোচনের গদ্যভাগের কিছু অংশ 'অসুন্দরের পরম বেদনায় সুন্দরের আহ্বান', 'একদিন সইতে পারবে সইতে পারবে' এবং 'তোমাদের একী অনুকম্পা'—কবি এগুলিতেও সুরসংযোজন করেছিলেন। সুতরাং শাপমোচনের উপর দিয়ে একাধিকবার গানের পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়। শাপমোচনের জন্য নতুন গান রচনা করলেও আমরা লক্ষ্য করি যে শেষ পর্যন্ত নতুন গানের তুলনায় পূর্বরচিত গানগুলির উপরই শাপমোচন নৃত্যাভিনয়ের সাফল্য নির্ভর করে। অথচ পূর্বে যে গান অন্য প্রসঙ্গে অন্য উপলক্ষে লেখা,

এখন ভিন্নতর প্রয়োজনে সেগুলির প্রয়োগ ঘটলে স্বাভাবিকভাবেই প্রণালী-বিশুদ্ধ সংগীত-আলোচনায় বা ঐতিহাসিক দিক থেকে গানগুলির প্রতি সুবিচার করা সম্ভব হয় না। শাপমোচনের প্রচলিত সংস্করণের অনেকগুলি কাব্যগীতি সম্পর্কেই একথা বলা যায়।

শাপমোচনের সূচনাগান 'এ শুধু অলস মায়া এ শুধু মেঘের খেলা'। দীর্ঘকাল পূর্বে রচিত কড়ি ও কোমলের 'গান রচনা' নামক এই অষ্টমাত্রিক দ্বিপর্বিক চরণের সনেটকল্প চতুর্দশপদীতে (মিত্রাক্ষরবিন্যাসও বৈচিত্র্যপূর্ণ, ক খ ক খ ক গ ঘ গ ঘ গ ঘ ঙ ঘ ঙ, অষ্টক ও ষট্কের আবর্তনসন্ধি নেই) কবি কেন সুর যোজনা করলেন এবং সেই কঠিন বিচিত্র সুরপরীক্ষার নিদর্শনকে শাপমোচনের ভূমিকায় স্থাপন করলেন, অনুমান করা দুঃসাধ্য। তবে মূল কবিতার নাম ছিল 'গান রচনা', শাপমোচনে কবি স্বয়ং তার একটি সময়োচিত ব্যাখ্যা করেছেন—

"মনের নানা গভীর আকাঙ্ক্ষা কাহিনীতে রূপকে গানে রূপ নেয় ছন্দে-বন্ধে, সঙ্গ রচনা করে কল্পনায়, বস্তুজগৎ থেকে ক্ষণকালের ছুটি নিয়ে কল্পজগতে করে লীলা।"

শাপমোচনে কবির মনের কোন্ গোপন আকাঙ্ক্ষা গানে ছন্দেবন্ধে রূপকে রূপ ধারণ করেছে সে অনুসন্ধিৎসার সুযোগ সম্ভবত এখনো আসেনি।

ভূমিকার গানের পর কাহিনী আরম্ভ হয়েছে ছদ্ম-পৌরাণিক উপাখ্যানের দ্বারা। স্বাধিকারপ্রমত্ত সদ্যবিবাহিত যক্ষ পত্নীচিন্তায় যেমন প্রভুশাপগ্রস্ত হয়ে বর্ষভোগ্য নির্বাসন গ্রহণ করেছিল দূর রামগিরি পর্বতের নৈঃসঙ্গ্যে, তেমনি কলানায়কাগ্রণী গন্ধর্ব সৌরসেনও সুমেরুশিখরগতা প্রেয়সীর ধ্যানে ইন্দ্রের নৃত্যসভায় অন্যমনস্ক হল, ফলে তালভঙ্গাপরাধে সুরসভার অভিশাপে বিকৃতদেহে সে অরুণেশ্বর নামে গান্ধাররাজগৃহে মর্তজাতকে পরিণত হল। সুরলোকেও সুরভঙ্গ তালভঙ্গের অপরাধ ঘটে, 'পাছে সুর ভুলি' গানটির এই বক্তব্য[২৫]। 'ভরা থাক স্মৃতিসুধায় বিদায়ের পাত্রখানি'—মর্তজাতকের প্রতি মধুশ্রীর গান। এ গানের বক্তব্য কবির পুরাতন ভাবনা, বিরহবেদনার অবিস্মরণীয়তাই প্রেমের অভিজ্ঞান—'নয়নে আঁধার রবে ধেয়ানে আলোকরেখা'। এই জন্মান্তরীণ বিরহ যখন আত্মবিস্মৃত থাকে, তারই গান 'জাগরণে যায় বিভাবরী'। 'এসো এসো হে তৃষ্ণার জল' অন্য প্রসঙ্গ থেকে ছিন্ন-করে-আনা গান। গান্ধাররাজ-অন্তঃপুরে কমলিকার ছবি দেখে অরুণেশ্বরের মনে হয়েছিল—'যা হারিয়েছিল

এই জন্মের আড়ালে তাই যেন ফিরে ধরা দিল অপরূপ স্বপ্নরূপে।' ঠিক একই অনুভূতি বলাকার ছবি কবিতারও পূর্বপট, তাই অনিবার্যভাবে ছবি কবিতার প্রাসঙ্গিক অংশ সুরারোপিত হয়ে এখানে সংযোজিত হয়েছে। এবং চিত্ররূপিণীর উদ্দেশে রাজার গীতপত্র 'কখন দিলে পরায়ে' যেন ছবি কবিতারই সংযোজনী। চৈত্রপূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে একদিন যখন রাজার বুকের মধ্যে রক্ত ঢেউ খেলিয়ে উঠেছিল দূর জন্মান্তরেব মিলনস্মৃতিতে, সেই জন্মান্তরীণ স্মৃতিবেদনার অপরূপ সংগীত 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে'। এই গানের ব্যাখ্যা স্বয়ং কবিই দিয়েছেন অরুণেশ্বরের স্বপ্নকল্পনায়—"কেবলই তার মনে হতে লাগল, লোকান্তরে কার সঙ্গে এই রকম জ্যোৎস্নারাত্রে সে যেন এক দোলায় দুলেছিল। ভুলে-যাওয়ার কুহেলিকার ভিতর থেকে পড়েছে মনে"। 'বাজো রে বাঁশরি বাজো' বিবাহ-সংগীতরূপে ব্যবহৃত। অন্তঃপুরিকাদের সমবেত কণ্ঠে পরিণয়মাঙ্গল্যের এই গানখানি লাবণ্যসুন্দব স্মিতবাক ধ্বনিমাধুর্যে ঋদ্ধরসোজ্জ্বল বাণীবন্ধে একটি আশ্চর্য রমণীয় কাব্যসংগীত। অরুণেশ্বরের বীণার সঙ্গে কমলিকার পরিণয়-উৎসবে বীণা হয়েছে সুন্দরের প্রতীক। বীণাকে সুন্দরের প্রতীকরূপে কল্পনা বহুপূর্বেই রবীন্দ্রকাব্যে আছে—'লহো লহো তুলে লহো নীরব বীণাখানি' (প্রথম প্রকাশ গীতমালিকা ২, পৌষ ১৩৩৬) তাই এখানে সার্থকভাবে কবি প্রয়োগ করতে পেরেছেন। 'কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে হায় রে হায়' এবং 'আজি দখিনদুয়ার খোলা' দুটি গানই পূর্ববর্তী রাজা এবং অরূপরতনে আছে। তবে প্রথমটি পূর্ববর্তী দুটি নাটকেই সুরঙ্গমার কণ্ঠে, এখানে রাজার কণ্ঠে, এবং 'আজি দখিন দুয়ার খোলা' দুটি নাটকেই ঠাকুরদার কণ্ঠে ছিল। এখানে ঠাকুরদার কোনো ভূমিকাই নেই। 'বাহিরে ভুল ভাঙবে যখন' গানটি অরূপ-রতনে সুরঙ্গমার কণ্ঠে, শাপমোচনে রাজার কণ্ঠে স্থাপিত। 'আমি এলেম তোমার দ্বারে' গানটি ঈষৎ পরিবর্তিত হয়েছে—'তারই দ্বারে' স্থানে হয়েছে 'তোমার দ্বারে', তদনুযায়ী পরবর্তী পংক্তিতে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে।

রাজা ও শাপমোচনের মধ্যে ব্যবধান যেমন গভীর তেমনি সূক্ষ্ম। রাজা অধ্যাত্মতত্ত্বের নাটক, শাপমোচনে অধ্যাত্মচিন্তা নেই। অত্যন্ত সুকুমার রোমান্টিক কবিকল্পনায় সমৃদ্ধ শাপমোচনে নাটক তাই সংগীত হয়ে উঠেছে। রাজা নাটকে রানীর প্রেমের সাধনায় রূপমোহকে নিঃশেষে দগ্ধ করার জন্য ছিল সুবর্ণের ছদ্মবেশের ছলনা, ছিল ভ্রান্তির অভিশাপ, ছিল যুদ্ধ অপমান অসম্মান,

১০। প্রথম অভিনয় ৩ জুলাই ১৮৮৬, ২০ আষাঢ় ১২৯৩। ১৯০১ সালের ৬ এপ্রিল মিনার্ভা থিয়েটারে রাজা বসন্তরায় পুনরভিনীত হয়

১১। রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ডে পুনরুদ্ধৃত

১২। রবীন্দ্রনাট্যে গানের ভূমিকা—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ; গীতবিতান পত্রিকা ১৩৬৮

১৩। "গীতাঞ্জলির প্রথম অর্ধের কবিতাগুলিতে দেখা যায় কবির জীবনে দীপ আছে, কিন্তু শিখা নেই। তাই গভীর বিষাদ, অন্ধকার, বর্ষা, সজল হাওয়া, বিরহ, অপেক্ষার প্রাচুর্য।...... কিন্তু গীতাঞ্জলির শেষের দিকে একটি সুরের আভাস পাওয়া যায়। যেন দীপের শিখাটি জ্বলল, দীপ সার্থক হল। প্রথম অংশের কবিতাগুলিতে বর্ষা রাত্রি অন্ধকার প্রভৃতির প্রাচুর্য দেখি, শেষের কবিতাগুলিতে তার পরিবর্তে আলোর জয়গান।"—বিমলচন্দ্র সিংহ : বলাকার যুগ ; বিশ্বভারতী পত্রিকা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০

১৪। রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ—প্রমথনাথ বিশী (অখণ্ড সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৩৪)

১৫। নাটকে গান, রবীন্দ্রনাথের নাটক : শঙ্খ ঘোষ ; সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ মনন ও শিল্প' গ্রন্থে সংকলিত

১৬। "কোটাল। তোমরা বুঝি কথার জবাব দিতে হলে গান গাও ?

—হ্যাঁ। নইলে ঠিক জবাবটা বেরোয় না। সাদা কথায় বলতে গেলে ভাবি অস্পষ্ট হয়, বোঝা যায় না।

কোটাল। তোমাদের বিশ্বাস তোমাদের গানগুলো খুব স্পষ্ট।

চন্দ্রহাস। হ্যাঁ ওতে সুর আছে কিনা।" (২য় দৃশ্য)

১৭। "বাউল। আমি গান গাইতে গাইতে যাই, তোমরা আমার পিছনে পিছনে এস। গান না গাইলে আমি রাস্তা পাইনে।

—সে কি কথা হে।

বাউল। আমার গান আমাকে ছাড়িয়ে যায়—সে এগিয়ে চলে, আমি পিছনে চলি" (৩য় দৃশ্য)

১৮। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত কবির পত্র, শিলাইদহ ১০ মাঘ ১৩২২। রবীন্দ্র রচনাবলী ১২শ খণ্ড গ্রন্থপরিচয়

১৯। "ফাল্গুনী থেকে একটা নতুন সুর কবির গীতিনাট্যে প্রবেশ করল, বেশ মনে আছে, যদিও তারিখ মনে নেই ; সেটি রূপকের সুর, চিরযৌবনের সুর—চলে যায়, কিন্তু আবার ফিরে আসে। ঘুরে ফিরে সেই একই কথা কতবার কতরকমে প্রকাশ করেছেন, এই সেদিনও 'নবীনে'ও বলে গেছেন। রাজা অচলায়তন রক্তকরবী মুক্তধারা, এ সবই রূপক নাট্যস্রোতের এক একটি তরঙ্গ। সবই গানে গানে ঝংকৃত, অলংকৃত—মানে খুব স্পষ্ট বোঝা যাক বা না যাক।"—ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী—সংগীতে রবীন্দ্রনাথ, জয়ন্তী উৎসর্গ

২০। 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি।' (৪৭ সংখ্যক)

'কত বর্ণে কত গন্ধে কত গানে কত ছন্দে

অরূপ তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর

আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ এমন সুমধুর'। (১২০ সংখ্যক)

২১। সম্ভবত এইজন্যই 'বহুরূপী'র রক্তকরবী প্রয়োজনায় সংগীতের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

২২। ১৩৩৬ সালে মহুয়া গ্রন্থপ্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে লিখিত কবির পত্রাংশ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫শ গ্রন্থপরিচয়

২৩। 'আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো' নটীর পূজার এই সর্বশেষ গানটির সঙ্গে মহুয়া কাব্যের 'বরণডালা' (আজি এ নিরালা কুঞ্জে) কবিতাটির (পরে গীতরূপ) সাদৃশ্য লক্ষণীয়। অবশ্য নটীর পূজার গানটিই প্রাক্‌রূপ মনে হয়। বরণডালা কবিতার আর একটি পাঠান্তর (আজি এই মম সকল ব্যাকুল) রবীন্দ্ররচনাবলীর ১৫শ খণ্ডে গ্রন্থপরিচয়ে উদ্‌ধৃত আছে। তার সঙ্গেও নটীর পূজার আলোচ্য গানটির বাণীসাদৃশ্য স্পষ্টতর

২৪। শিশুতীর্থ আখ্যান ব্যতীত গীতোৎসবে এই গানগুলি ছিল—'নির্মলকান্ত নমো হে নমঃ, বিশ্ববীণারবে, নীলাঞ্জনছায়া, এসো এসো হে তৃষ্ণার জল, ঐ বুঝি কালবৈশাখী, এসো নীপবনে, দুঃসময় আবৃত্তি, বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা, আজ বাঙলা দেশের হৃদয়, মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে, তোমার কটিতটের ধটি, আবৃত্তি দোল, আমি চিনিগো চিনি তোমারে, সংকোচের বিহ্বলতা'॥ তারপর 'দশ মিনিটের অবকাশ' লেখা এবং শিশুতীর্থ অংশ

২৫। তুলনীয়, স্বরলোকে নৃত্যের উৎসবে

যদি ক্ষণকাল তরে

ক্লান্ত উর্বশীর

তালভঙ্গ হয়

দেবরাজ করে না মার্জনা।

পূর্বার্জিত কীর্তি তার

অভিসম্পাতের তলে হয় নির্বাসিত।—রোগশয্যায়, ১ম কবিতা

রবীন্দ্রসংগীতে ঋতু-প্রকৃতি

১

গীতবিতানে প্রকৃতি ও ঋতুপর্যাযে মোট গীতসংখ্যা ২৮৩, পূজা ও প্রেম-পর্যায়ের পরই এই সংখ্যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংখ্যার দিক থেকে তৃতীয় হলেও প্রকৃতি পর্যায়ের মোট জনপ্রিয় গানের সংখ্যা সম্ভবত পূজা এবং প্রেমের গানের তুলনায় বেশি। তার কারণ ঋতু প্রকৃতির গানগুলির মধ্যে নিসর্গজীবনের বিচিত্র রূপরসগন্ধ যেমন মনোহর ভঙ্গীতে প্রকাশিত হযেছে তেমনি সুরের দিক থেকেও এইগুলির মধ্যে সহজ প্রাণস্পর্শী আবেদন আছে। শিক্ষিত বঙ্গবাসীর কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনা—তাঁর প্রকৃতিনিসর্গের কবিতা এবং বিশেষ করে ঋতুসংগীতগুলিই বাঙলার ঋতুগুলিকে জনপ্রিয় উৎসবযোগ্য করে তুলেছে। বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত বারো মাস ছয় ঋতুর যে লীলারঙ্গ আবহমানকাল এই শ্যামায়মান গাঙ্গেয় বঙ্গভূমিতে নীরব সংগীতে, অদৃশ্য উৎসবের শঙ্খধ্বনিতে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে, একমাত্র একালের কবি রবীন্দ্রনাথই যেন সেই লীলানাট্যের যবনিকাকে তুলে দিযেছেন। যেন সেই উৎসবের সূত্রধর কবির কণ্ঠে আমরা তাঁর স্বরচিত গান শুনি না, সমগ্র বঙ্গপ্রকৃতির চিরন্তন মর্মবাণীই এই গানগুলিতে ঝরে ঝরে পড়েছে।

বাঙলা কাব্যে ঋতুচেতনার ইতিহাস সুপ্রাচীন নয বলা বাহুল্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঋতুবোধ শক্তিউপাসক কবিদের আগমনী-বিজয়া পদে ক্ষীণভাবে শ্রুতিগোচর হয়েছিল। উনিশ শতকের কাব্যসংগীতের পৃষ্ঠাতেও রোমান্টিক ঋতুগীত বা প্রকৃতিচেতনার উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু ঋতুসংগীতে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ এক নবদিগন্তের উন্মীলন ঘটিয়েছেন। ঋতু তাঁর কাছে কেবল কতকগুলি বাহ্যিক রূপপরিবর্তন ছিল না, কিংবা ফুলফসলের চেহারা বদলের মানচিত্রেই তিনি ঋতুকে নিরীক্ষণ করেননি। অনন্ত কালের বিবর্তনে এক একটি ঋতু ক্ষণিকের অতিথির মত আমাদের জীবনে উপস্থিত হয। সেই ঋতুর প্রতি অভ্যর্থনায় কবি কখনও ত্রুটি ঘটাননি। এই জীবনের খরস্রোতে ভাসমান মানবহৃদযের কুঞ্জবনে 'দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে যেই ক্ষণে বসন্তের মাধবী-মঞ্জরী' মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল ভরে তোলে, সেই মুহূর্তেই যে বিদাযগোধূলি আসে 'ধূলায়ে ছড়ায়ে ছিন্নদল'। আবার শিশিররাত্রে সেই কুঞ্জবনে কখন হেমন্তের

অশ্রুভরা কুন্দরাজি ফুটে ওঠে নিঃশব্দে। আমাদের কবিও সেই চঞ্চল পলাতক কালকে ভোলাতে চেয়েছিলেন সৌন্দর্যের ছলনায়, তার কণ্ঠে গান দিয়ে সময়ের হৃদয়হরণ করতে চেয়েছিলেন বুঝি। রবীন্দ্রনাথের অপরূপ ঋতুগীতগুলি যেন রূপহীন মরণের কণ্ঠে অনবদ্য মৃত্যুহীন বরণমালা। বিশ্বপথিক ভৈরবী বৈরাগিণী যে মহাকাল তার চলার পথে পথে ঋতুর থালি থেকে জুঁই চাঁপা বকুল পারুল ঝরিয়ে ঝরিয়ে চলে যায়, কবি যেন সেই ধূলিতল থেকে কুড়িয়ে-আনা ফুলগুলি দিয়ে গেঁথেছেন তাঁর গানের মালা—কান্নাহাসির দোল-দোলানো পৌষফাগুনের পালায় এই মালা বহন করাই বুঝি তাঁর প্রতি কবির জীবনদেবতার আনন্দিত নির্দেশ।

রবীন্দ্রনাথের গীতসৃষ্টির নিত্যসহচর, তাঁর গানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের ঋতুসংগীতগুলি সম্পর্কে লিখেছিলেন, "বিশ্বপ্রকৃতিতে দিবারাত্রি এবং বিচিত্র ঋতুর আবর্তন, কালের নিরন্তর নৃত্যছন্দ, যেন তার এমন কোনো ভাবভঙ্গি বা ব্যঞ্জনা নেই যা রবীন্দ্রনাথের কথায় ও সুরে ব্যক্ত বা আভাসিত হয়ে ওঠেনি।"[১] বাঙলার ঋতুবৈচিত্র্যকে কবি বিচ্ছিন্ন কোনো ভৌগোলিক বিশেষত্বরূপে দেখেননি, এর সঙ্গে তিনি বিশ্বনিসর্গের আভ্যন্তর গীতচ্ছন্দটি মিলিয়ে দিয়েছিলেন। যে বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিত হয়, যার সুরমাধুরীতে স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে, নদীনদে গিরিগুহা পারাবারে 'নিত্য জাগে সরস সংগীতমধুরিমা, নিত্য নৃত্যরসভঙ্গিমা'—কবির ঋতুসংগীত তারই অঙ্গ—বসন্ত বর্ষা শরৎ তারই বিশ্বসংগীতের রাগিণী থেকে উৎসারিত বলেই তার উৎসবের বাঁশি এমন করে কবিমনকে তরঙ্গিত করে। ভারতবর্ষের বিশিষ্ট প্রকৃতিপ্রীতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "আমাদের দেশের কবিত্বে যে প্রকৃতি-প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় অন্যদেশের কাব্যের সঙ্গে তার বিশিষ্টতা আছে। আমাদের এ প্রকৃতির প্রতি প্রভুত্ব করা নয়, প্রকৃতিকে ভোগ করা নয়, এ প্রকৃতির সঙ্গে সম্মিলন।...মানুষের চিত্ত যেখানে সাধনা দ্বারা জাগ্রত আছে সেখানকার মিলন কেবলমাত্র অভ্যাসের জড়ত্বজনিত হতে পারে না। সংস্কারের বাধা ক্ষয় হয়ে গেলে যে মিলন স্বাভাবিক হয় তপোবনের মিলন হচ্ছে তাই।" প্রকৃতির সঙ্গে এই নন্দিত মিলনসাধনের পালাই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবোধের মুখ্য বৈশিষ্ট্য। এই আনন্দের দাবিতেই ঋতুর অভ্যাগমকে কবি জীবনে কখনও বৃথা হতে দেননি, প্রতিটি ঋতুর আবির্ভাবকে সজ্ঞানে অভিনন্দন জানিয়েছেন, জীবনের অভিব্যক্তির সঙ্গে তার গভীর সম্বন্ধবন্ধন ঘটিয়েছেন।

'বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে'—এই বিশ্বলোকের নিভৃতি থেকে যে রম্যবীণা বাজে তারই স্থরে সমস্ত জগৎ প্রকৃতি মানব উদ্বেল হয়ে ওঠে—

বাজে বাজে রম্য বীণা বাজে
অমল কমল-মাঝে, জ্যোৎস্নারজনী মাঝে,
কাজল-ঘন-মাঝে, নিশি-আঁধার-মাঝে,
কুসুম সুরভি-মাঝে বীণারণন শুনি যে।
প্রেমে প্রেমে বাজে।

নাচে নাচে রম্য তালে নাচে—
তপন তারা নাচে, নদী সমুদ্র নাচে,
জন্ম মরণ নাচে, যুগযুগান্ত নাচে,
ভকত হৃদয় নাচে বিশ্বছন্দে মাতিয়ে
প্রেমে প্রেমে নাচে।

সাজে সাজে রম্য বেশে সাজে—
নীল অম্বর সাজে, উষা সন্ধ্যা সাজে,
ধরণীধূলি সাজে দীন দুঃখী সাজে,
প্রণত চিত্ত সাজে বিশ্বশোভায় লুটায়ে
প্রেমে প্রেমে সাজে।

এ গান কেবল ব্রহ্মসংগীত নয়, এই গান কবির প্রকৃতিদর্শনেরও ভূমিকা (শান্তিনিকেতন গ্রন্থের 'শোনা' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য)। সারা জীবন প্রকৃতির নিগূঢ় সান্নিধ্যে থাকার ফলে প্রকৃতির সঙ্গে কবি একটি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন একথা যেমন সত্য, তেমনি অদ্বৈতবাদী উপলব্ধিতে অভিব্যক্তির ধারায় প্রকৃতির প্রতি এক প্রকার অবোধপূর্ব জন্মান্তরীণ আকর্ষণও অনুভব করেছেন। জগতের যে আনন্দযজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়ে কবি এই ধরাবক্ষে মর্তজন্ম গ্রহণ করেছেন, তারই আনন্দকণিকা ভুবনের তারায় তারায়, আলোকজ্যোতিতে, তৃণে-বিপিনে, পল্লবপুঞ্জে, জ্যোৎস্নালোকে, বসন্তসমীরে অনুভব করেছেন বলেই সকলের সঙ্গে একটি সর্বানুভূতি, বিশ্বচৈতন্যের অংশ-রূপে অনুভব করে সকলের প্রতি সুগভীর আত্মাকর্ষণ তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল। আর সেই বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দরোমাঞ্চ তাঁর গান ছাড়া এমন করে কোথায় সার্থক হয়ে উঠবে—

ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে,
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে,
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
কান পেতেছি চোখ মেলেছি ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।

কবির গান যে বিস্ময়ের বাণীরূপ, সেই বিস্ময় তাঁর প্রকৃতিবোধেরই মূলসূত্র বলা যেতে পারে। অসংখ্য গানে কবি বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্কের কথা বলেছেন। নিশীথকূলে উষার গীতভাষার ধ্বনি নিয়ে কবি কেমন করে তাঁর জীবনগানকে মেলাবেন, নবীন আশাকে জাগ্রত করবেন, ফুলের মত সহজ সুর দিয়ে তাঁর জীবনপ্রভাতকে পূর্ণ করবেন, তাঁর গানে সে কথা আমাদের অতি পরিচিত, অতীব প্রিয়। শেষ জীবনের একটি বিখ্যাত গানে কবি গেয়েছিলেন—

আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে
আমার মুক্তি ধূলায় ধূলায় ঘাসে ঘাসে।
দেহমনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলি আপনারে
গানের সুরে আমার মুক্তি ঊর্ধ্বে ভাসে।

এ গানও কি তাঁর প্রকৃতিচেতনার গান নয়? এই আলোকময় আকাশ আর ধূলিতৃণাঙ্কিত মৃত্তিকা, তারই মধ্যে গানের সুর দিয়ে আপনাকে হারিয়ে ফেলার আনন্দই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবোধের গূঢ় বাণী। তারই বৈচিত্র্যময় রূপের ধ্যানই তাঁর ঋতুসংগীতগুলিতে অভিব্যক্ত। অসীমরূপে প্রকৃতি, খণ্ড রূপে ঋতু। সুতরাং ঋতুর মধ্য দিয়ে প্রকৃতির বোধ তো সীমার মধ্য দিয়ে অসীমেরই স্বাদগ্রহণ। কবির প্রকৃতি ও ঋতুসংগীতের মর্মবর্তী যোগসূত্রটি দিনেন্দ্রনাথ এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

"গভীর অনুভূতির আনন্দ যেমন মানুষকে সুখদুঃখের মিলনবিরহের জন্ম-মৃত্যুর অতীত অতীন্দ্রিয় আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করে, তেমনি প্রকৃতিও অন্তর্নিহিত গভীর সত্তায়, পরিব্যাপ্ত চৈতন্যে, উদ্বোধিত প্রাণের নব নব প্রকাশে জয়পরাজয়ের বাণী নিত্যনিয়ত ঘোষণা করছে। এই বিজয়বার্তায় সান্ত্বনার বাণী, এই একান্ত আত্মীয়তার রূপ কবির ঋতুসংগীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে।"[১]

রবীন্দ্রনাথের অজস্র ঋতুসংগীতকে তাঁর কাব্যের পটভূমিকায় আলোচনা করার, সেগুলির গভীর তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা আজও হয়নি। রবীন্দ্র-নাথের নাটকে ঋতুচক্রের আবর্তনবিষয়ে রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহে অধ্যাপক প্রমথ-নাথ বিশী মনোজ্ঞ আলোচনা করেছিলেন। ডঃঅমিয়কুমার সেনের 'প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র প্রকৃতিচেতনার আলোকে তাঁর ঋতুসংগীতগুলির আলোচনা করা হয়েছে, যদিও স্বল্পাক্ষর, তথাপি সে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের ঋতুগীতিগুলির বৈশিষ্ট্য মোটামুটি প্রকাশিত। বিক্ষিপ্তভাবে কোনো কোনো প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ঋতুসংগীতের মর্মরহস্য অনুধাবনের চেষ্টা হয়েছে। জনৈক আধুনিক লেখক একটি রবীন্দ্র-সংগীতবিষয়ক আলোচনায় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"প্রকৃতির লীলার প্রাঙ্গণে যা কিছু হচ্ছে, অন্তর-আকৃতির প্রেরণায় বিকশিত হচ্ছে, পূর্ণতর সত্য হয়ে উঠতে চাইছে, পূর্ণতার সাধনায় নিমগ্ন রবীন্দ্র-মানস যেন তাকেই গ্রহণ করেছে আপন নিভৃতে; তারই সঙ্গে কবির হৃদয়ের সম্পর্ক, আত্মীয়তার অচ্ছেদ্য বন্ধন। প্রীতির বন্ধনে আকৃষ্ট রবীন্দ্রনাথ তাকেই প্রত্যক্ষ করার আনন্দে বিভোর হয়ে থাকতেন। আর নিভৃত আবির্ভাব-তিরোভাবের সাক্ষ্য বহন করেছেন আপন অন্তরে, তার দুঃখে দুঃখী হয়েছেন, সুখে সুখী, আনন্দে আনন্দিত। অর্থাৎ কবি আপনার জীবন-অভিজ্ঞতাকে শুধু সংসারসীমায় আবদ্ধ রাখেননি, প্রতি মুহূর্তে তাকে বিস্তৃত করেছেন, প্রকৃতি বিশ্বের বিপুল প্রাণের সত্যে, তার বিপুল সৌন্দর্যে। তা না করতে পারলেই হয়ত তাঁর জীবনের অভিব্যক্তি অন্যরূপ হত। যাই হোক, প্রকৃতিবিশ্বে তাঁর এই যে জাগরণ পুলকে বিস্ময়ে রসে, তারই অসামান্য প্রকাশ তাঁর ঋতুসংগীত, কল্পনার ইন্দ্রজালচ্ছটায় রূপবান, অনুভবের সূক্ষ্মতায় কমনীয়। কবির নিজস্ব উক্তি অনুকরণ করে বলতে ইচ্ছা হয়, এই মাধুরীসরোবরের কোনো তল নেই, তা অন্তহীন"।[২]

২

ঋতুর আমন্ত্রণ সংগীতে ধ্বনিত করার ইতিহাস রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের সূচনাপর্ব থেকেই অন্বেষণ করা যায়। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী থেকে বাল্মীকিপ্রতিভা মায়ার খেলা প্রভৃতি গীতিনাট্যে বর্ষা এবং বসন্ত কবির ঋতু-চৈতন্যে বিশেষভাবে আন্দোলিত হয়েছিল, যথাস্থানে এ বিষয়ে আলোচনা করা

হয়েছে। তাছাড়া শান্তিনিকেতনের আশ্রমকুটিরে শালসপ্তপর্ণীর ছায়ানিভৃত আশ্রয়ে জীবনের মধ্যবয়স থেকে স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধবার পর ঋতুর লীলা-নাট্যরহস্যে কবির মন ক্রমশ অভিভূত হতে থাকে। শারদোৎসব থেকে সুরু করে শ্রাবণগাথা পর্যন্ত অর্থাৎ ১৩১৫ থেকে ১৩৪১ পর্যন্ত সুদীর্ঘ কালপর্বে ঋতুকে নায়ক করে রবীন্দ্রনাথ অজস্র পালা ও গীতিনাট্য রচনা করেছেন। প্রচলিত গ্রন্থাদি ছাড়াও প্রায় প্রতি বৎসর প্রতি ঋতুতে বিভিন্ন কাব্যকবিতা ও সংগীতের ডালি সাজিয়ে ঋতুবরণের আয়োজন শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছিল। কবির উপস্থিতিতে শান্তিনিকেতনে কোনো ঋতুই কখনও অজানিতে অনাহূত প্রবেশ করেনি। ঋতুর সঙ্গে মানবজীবনের, বিশেষ করে কবিজীবনের যোগ ঘনিষ্ঠ করার জন্যই কবি ঋতুসংগীত রচনা করেছেন একটির পর একটি। কখনও সে সংগীতে বেজেছে উৎসবের মাঙ্গলিক ধ্বনি, কখনও ঋতুর রূপচিত্র ফুটে উঠেছে, কখনও বা ঋতুর পটভূমিকায় কবির কোনো গোপন মনের অসীম বিরহবেদনা প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে, শান্তি-নিকেতনে প্রথম ঋতুউৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৩১৩ সালের শ্রীপঞ্চমীতে। কবির কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ ছিলেন এই উৎসবের পরিকল্পনাকার ও প্রধান উদ্যোক্তা। এই অনুষ্ঠানে শমীন্দ্রনাথ এবং আরও কয়েকজন ছাত্র বর্ষা ও বসন্তের প্রতিনিধি সেজেছিলেন—ঋতুর প্রতীক ফুলের মুকুট পরে ফুলের সাজি নিয়ে ঋতুস্তব আবৃত্তি করে কবির গান দিয়ে সেদিন প্রথম বসন্তের শীতাভ সন্ধ্যায় ঋতুউৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর ১৩১৫ সালের বর্ষায় শান্তিনিকেতনে প্রথম বর্ষামঙ্গলের অনুষ্ঠান হয় ক্ষিতিমোহন সেনের সহায়তায় বৈদিক মন্ত্রপাঠের দ্বারা। সম্ভবত এই সময়েই কবি শারদোৎসব নাটক লেখার প্রেরণা লাভ করেছিলেন। তারপর শারদোৎসব থেকে প্রায় শেষ জীবন পর্যন্ত কবি বিভিন্ন ঋতুর উপযোগী নাটক গীতিনাট্য নৃত্যগীতিনাট্য রচনা করেছেন। ধীরে ধীরে এই ঋতুনাট্যগুলিতে এক এক প্রকার তত্ত্ব দেখা দিয়েছে। ঋতুর সঙ্গে জীবনের পূর্ণতাসাধনের পালায় কবির দার্শনিক মন এক এক জাতীয় তত্ত্বব্যাখ্যার প্রতি প্রবণতা দেখিয়েছে। নটরাজ ঋতুরঙ্গশালায় এই তত্ত্বের পূর্ণতা, সুতরাং নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের ঋতুতত্ত্বটি প্রথমে আলোচিতব্য।

নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা ১৩৩৩ সালের দোল-পূর্ণিমার রাত্রে নৃত্য গীত ও

আবৃত্তির যোগে অভিনীত হয়েছিল, যদিও এই পালাগান—পালা-নাটকের বিষয়বস্তু কেবল বসন্ত নয়, সমগ্র ঋতুচক্র। এর ভূমিকায় কবি লিখেছেন—

"নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। নটরাজ পালাগানের এই মর্ম।"

এই নটরাজ কে? বিশ্বনৃত্য শব্দটি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সংগীতে বহু-ব্যবহৃত। এই নৃত্যকলার অধীশ্বর যিনি তিনিই নটরাজ, তিনিই মহাকাল। মহাকালের অবিচ্ছিন্ন গতির এক একটি ক্ষণস্থায়ী রূপান্তরেই ঋতুর বিবর্তন ঘটে, এ তত্ত্ব বলাকার চঞ্চলা কবিতাতেই আছে। গীতাঞ্জলির একটি সুপরিচিত সংগীতে কবি লিখেছিলেন, যে ভয়ংকর বিশ্বছন্দে ধ্বংস মৃত্যু আনন্দ ও গতির প্রকাশ, তারই সঙ্গে কবির প্রাণের যোগ—

পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে
খসে যাবার ভেসে যাবার ভাঙবারই আনন্দে রে।
পাতিয়া কান শুনিস না যে দিকে দিকে গগন-মাঝে
মরণবীণায় কী সুর বাজে তপন-তারা-চন্দ্রে রে
জ্বালিয়ে আগুন ধেয়ে ধেয়ে জ্বলবারই আনন্দে রে।
পাগল-করা গানের তানে ধায় যে কোথা কেই বা জানে
চায় না ফিরে পিছন-পানে রয় না বাঁধা বন্ধে রে।
লুটে যাবার ছুটে যাবার চলবারই আনন্দে রে।
সেই আনন্দ-চরণপাতে ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে,
প্লাবন বয়ে যায় ধরাতে বরণগীতে গন্ধে রে—
ফেলে দেবার ছেড়ে দেবার মরবারই আনন্দে রে।

(১৮ ভাদ্র ১৩১৬)

সুতরাং এই বিশ্বছন্দের আনন্দ-চরণপাতেই 'ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে', ঋতুচক্র আবর্তিত হয় —এই বিশ্বাসের বীজ পাওয়া যায়। এই চলার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে ঋতুর ক্রমবিবর্তনের ইঙ্গিত ফাল্গুনীর (১৩২১) 'চলি গো চলি গো যাই গো চলে' গানটিতেও দ্রষ্টব্য। সেখানে কবি গেয়েছেন—

পথিক ভুবন ভালবাসে পথিকজনে রে
এমন সুরে তাই সে ডাকে ক্ষণে ক্ষণে রে।
চলার পথের আগে আগে   ঋতুর ঋতুর সোহাগ জাগে,
চরণঘায়ে মরণ মরে পলে পলে।

এই বিশ্বনৃত্য, বিশ্বতাল, বিশ্বছন্দ প্রভৃতি গতি ও ছন্দোনৃত্যময় শব্দগুলিকে কবি এখন যুক্ত করে দিলেন নটরাজের সঙ্গে। দক্ষিণভারত ভ্রমণকালে সেখানকার মন্দিরভাস্কর্যে নটরাজ শিবের মূর্তি ও দক্ষিণী সংস্কৃতিতে শৈবধর্মের প্রতাপ কবির উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভারতীয় শৈবধর্ম একদা দক্ষিণ ভারতের পৌরোহিত্যেই বহির্ভারতে দক্ষিণপূর্ব এশিযায় ছডিযে পডেছিল, সে তথ্যও কবির 'সাগরিকা' কবিতায় প্রসিদ্ধ। ১৩৩৩এর সূচনাতেই নটীর পূজা রচনা ও অভিনযের মধ্য দিযে এই নটরাজচেতনা কবিকল্পনাকে বিশেষভাবে আচ্ছন্ন করল। বুদ্ধশিষ্যা নটী আত্মাহুতির মধ্য দিযে করুণাঘন বুদ্ধের প্রতি প্রণতি নিবেদন করেছিল, এই মূল কাহিনী রক্ষা করেও নটীর পূজায় আর একটি নূতন তত্ত্ব স্পষ্ট হযে উঠল। নটী যে নৃত্যের অঞ্জলি দান করল সে নৃত্য তো নটরাজেরই বন্দনা—নটীর নৃত্যসংগীত 'ক্ষমো হে ক্ষমো নমো হে নমো' গানে 'নিরুপম' 'সুন্দর' যেন শান্তসত্য মহাদেবরূপেই প্রতিভাত হয। সুতরাং নটীর পূজার শেষ নৃত্য কেবল নটীর অণুপরমাণুতে সঞ্চারিত হযনি, সেই নৃত্যছন্দ বিশ্বনৃত্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে কবির চেতনাকে আন্দোলিত করে তুলল। সেই নৃত্য আপনার মঞ্জীরধ্বনিকে ছডিযে দিল দূর আকাশে, সমস্ত বিশ্বগগনে অদৃশ্য নটরাজের চরণক্ষেপের আঘাতেই রঙের পরে রঙের খেলা, রূপের নৃত্য, ঋতুর পরে ঋতুর পালা, দিনের পর রাত—এই সত্য স্পষ্ট হযে উঠল কবির চোখে। আর যে প্রত্যয়ে, যে গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে কবির চোখে এই নটরাজ-মূর্তির সত্যরূপ ধরা পড়ল, সেই প্রত্যয়বুদ্ধ রসচেতনাকেই 'নটরাজের অন্য পদক্ষেপ' বলে তিনি অভিহিত করেছেন নটরাজ ঋতুরঙ্গশালায়। এতদিন নটরাজ ছিলেন নটের গুরু, এবার থেকে তিনি হলেন নাটের গুরু। তাই নটরাজ অলক্ষ্যে নটীর পূজায় নটীর নৃত্যনিবেদনের বেদীপশ্চাতে দাঁড়িয়েছেন। ঋতুরঙ্গশালা তো নটরাজেরই বোধনসংগীত। পরবর্তী দু-একটি ঋতুনাট্যে নটরাজ নামক একটি চরিত্রেরও প্রয়োগ লক্ষ্য করি, যদিও তিনি মহারুদ্র শিব নন। কিন্তু রাজসভার নৃত্যগুরু এই চরিত্রটি ইতিপূর্বে চোখে পড়েনি। জীবনীকার প্রভাতকুমার লিখেছেন—

"বর্ষামঙ্গল শেষ বর্ষণ শারদোৎসব বসন্তোৎসব প্রভৃতির মধ্য দিয়া বিভিন্ন ঋতুর বন্দনাগান হইয়াছে। নটরাজ ঋতুরঙ্গশালায় সকল ঋতুকে একটি নিরবচ্ছিন্ন স্থিতিগতি, বন্ধনমুক্তির পারম্পর্যের মধ্যে সমন্বিত করিয়া মুক্তিতত্ত্বরূপে কবি দেখিতেছেন। এই সব ঋতুর উৎসবে পাত্রপাত্রী বা নটনটীর দলে আছে তরুশিশুর দল। ফাল্গুনীর সময় হইতে নানা ফুলফল নদীগিরির মাধ্যমে কবি গান গাহিয়াছেন। বসন্তে ঋতুপূজার বিকাশ ও নটরাজে তাহার পূর্ণতা। ঋতুরঙ্গশালার পর হইতে বৃক্ষবন্দনা ক্রমে পরিপূর্ণ বনবাণীরূপে উদ্‌গীত হইল।"

সুতরাং দেখা গেল ঋতুরঙ্গশালায় কবি ঋতুর পর্যায়ক্রম আবৃত্তিকে একটি অবিচ্ছিন্ন সৃষ্টিধারার অঙ্গ বলে মনে করেন এবং বিশ্বসৃষ্টির মূলীভূত যে আনন্দ-নৃত্যছন্দ তার একটি অধিপতির কল্পনা করেছেন। ভারতীয় পুরাণে রুদ্র বা শিবকল্পনা কবিকে পূর্বেও অভিভূত করেছিল। তাঁর কবিধর্মে, দার্শনিক তত্ত্ব-বুদ্ধিতে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্ এই উপলব্ধি বারবার সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। রুদ্র ভয়ংকর শংকর প্রলয়ংকর পিনাকপাণি ও ভৈরবের আহ্বানগীত গীতবিতানে বহু গানেই প্রকীর্ণ। দুঃখ পর্যায়ের সুবিখ্যাত এই গানখানি রবীন্দ্রকবিকল্পনায় শৈবচেতনার জন্য স্মরণীয়—

> হে মহাদুঃখ হে রুদ্র হে ভয়ংকর,
> ওহে শংকর হে প্রলয়ংকর।
> হোক জটানিঃসৃত অগ্নিভুজংগম-দংশনে জর্জর স্থাবর জংগম
> ঘন ঘন ঝন ঝন ঝননন ঝননন পিনাক টংকরো।

মুক্তধারার আবহসংগীতরূপে 'জয় ভৈরব জয় শংকর' 'তিমিরহৃদ্‌বিদারণ'—এগুলিও প্রমাণ করে শিবরুদ্রকল্পনা তাঁর ধর্মবোধকে কতখানি আচ্ছন্ন করেছিল। তপতীর 'সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ' 'জাগো হে রুদ্র জাগো' প্রভৃতি গানগুলি স্বভাবতই মনে পড়বে। নটীর পূজায় 'বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন হবে' গানটিতেও 'নমি নমি সে ভৈরবে' এই বাক্যটি লক্ষণীয়।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে কবির এই জাতীয় শৈবচেতনায় শিবকে ভৈরব রুদ্র ভয়ংকররূপে দেখানো হয়েছে। কবির 'সুন্দর' এবং 'শিব' কি পৃথক সত্তা? সুন্দর কি রুদ্রবিবর্জিত হতে পারে? 'সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় খচিত' ১১ আষাঢ় ১৩১৯ তারিখে রচিত গীতিমাল্যের এই গানে খড়্গের ও দেব বজ্রপাণির উল্লেখ কবির সৌন্দর্যচেতনায় মাধুর্য ও রৌদ্রের সমন্বয়ের ইঙ্গিত দেয়। 'এই তো তোমার আলোকধেনু সূর্যতারা

দলে দলে' গানটি কবির জীবনাধীশের প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি উদ্দিষ্ট। এই গানে দেবতাকে তিনি বলেছেন, 'মোর জীবনের রাখাল ওগো ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হলে'। পূরবীর 'তপোভঙ্গ' কবিতায় রুদ্রসন্ন্যাসীর প্রতি কবির 'কালের রাখাল তুমি সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাজে' এই চিত্রকল্পটি মনে পড়ে। 'রুদ্রবেশে কেমন খেলা কালো মেঘের ভ্রূকুটি' গানেও সুন্দর শব্দের ব্যবহার আছে। অতএব যিনি ভৈরব তিনিই সুন্দর। তাঁরই সমগ্ররূপ নটরাজ—বিশ্বসৃষ্টি তাঁরই চরণের পদপাতে ধ্বংস ও রচনায়, জন্মমৃত্যুতে, হরণ-পূরণে, পূর্ণ-অপূর্ণে লীলায়িত উন্মথিত। এই হল নটরাজ-পরিকল্পনার তাৎপর্য।

এই নটরাজের সঙ্গে কবি মুক্তিতত্ত্ব যোগ করেছেন কেন? 'অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যছন্দে যোগ দিতে পারলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। এই 'অখণ্ড লীলারস উপলব্ধি' এবং মনের বন্ধনমুক্তি বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

১৩২৯ সালে বসন্ত পালাগানে কবি বলেছেন, পূর্ণ থেকে রিক্ত, রিক্ত থেকে পূর্ণ, এরই মধ্যে ঋতুরাজের আনাগোনা। বাঁধন-পরা বাঁধন-খোলা, একবার বন্ধন একবার মুক্তি—এই খেলা-ভাঙার খেলাই হল ঋতুর তাৎপর্য। তাই বসন্তের শেষ গান ছিল—

ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,
বিচ্ছেদে তোর খণ্ড মিলন পূর্ণ হবে।
আয় রে সবে
প্রলয়গানের মহোৎসবে।

বিচ্ছেদে খণ্ডমিলন পূর্ণ হওয়ার মহোৎসবের নামই ঋতুরঙ্গ। ঋতুরাজই তাই নটরাজ। যেহেতু এক চরণে তিনিই ভাঙেন অন্য চরণে থাকে সৃষ্টি। এই গানে ঋতুরাজরূপে সেই নটরাজের আগমনী অত্যন্ত স্পষ্ট—

তাণ্ডবে ঐ তপ্ত হাওয়ায় ঘূর্ণি লাগায়,
মত্ত ঈশান বাজায় বিষাণ শঙ্কা জাগায়—
ঝংকারিয়া উঠল আকাশ ঝঞ্ঝারবে।

এই 'ভাঙন-ধরার ছিন্ন করার রুদ্র নাটে' কেমন করে মুক্তিতত্ত্ব যুক্ত থাকে সে কথাও সেই গানে কবি বলে দিয়েছেন—

ভাঙন-ধরার ছিন্ন করার রুদ্র নাটে
যখন সকল ছন্দ বিকল বন্ধ কাটে,

মুক্তিপাগল বৈরাগীদের চিত্ততলে
প্রেমসাধনার হোমহুতাশন জ্বালবে তবে।
ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,
সব আশাজাল যায় রে যখন উড়ে পুড়ে
আশার অতীত দাঁড়ায় তখন ভুবন জুড়ে,
স্তব্ধ বাণী নীরব সুরে কথা কবে।
আয় রে সবে
প্রলয়গানের মহোৎসবে।

প্রকৃতির মধ্যে নিত্যকাল চলেছে এই বন্ধন ও মুক্তির লীলায়িত রূপ। নটরাজের ছন্দে সেই আসক্তি-মুক্তি, সৃষ্টি-ধ্বংসের লীলা অনুধাবন করলে এই জগতের, এই মৃদাসক্ত সংসারের বন্ধনও খসে পড়ে। তখন আলোকিত বিশ্বজীবনে মুক্তি ঘটে—'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে'। এই 'বাঁধন-খোলার সাধন' 'নটরাজের চেলা' কবি মহাকালের বিপুল নাচের কাছ থেকে শিখে নিয়েছেন এতদিনে। নটরাজ বিশ্বভুবনে যথার্থই মুক্তির প্রতীক। একদিকে যাঁর অসীম বিত্ত, অন্যদিকে সেই সুন্দরের ত্যাগের নৃত্য—'আপনাকে তার হারিয়ে প্রকাশ আপনাতে যার আপনি আছে'। এখন কবি জেনেছেন মুক্তির রহস্যকে। দেখেছেন তরুর মুক্তি ফুলের নৃত্যে, নদীর মুক্তি লীলাতরঙ্গে, রবির মুক্তি আলোকরেখায়, অসীম গগনের মুক্তি তারার নৃত্যে। প্রাণের যথার্থ মুক্তি মৃত্যুর মধ্য দিয়েই ঘটে নব নব প্রাণবিকাশে, যেমন জ্ঞানের মুক্তি সত্যের মনন-ধারায়। এই মুক্তির অধিদেবতা নটরাজ। দুঃসাহসী বন্দী যৌবনকে মুক্ত করার জন্য কবি উদ্বোধন কবিতায় সেই নটরাজের বন্দনা করেছেন। সেই নটরাজের অশান্ত নৃত্যস্পন্দনে ধূলিবন্দিশালা থেকে নবশষ্পদল মুক্তি পায়, মরু হয় শস্যশ্যামলিম, দুরন্ত প্রাণ দুর্গম পথে জন্ম-মরণের তালে আন্দোলিত হতে হতে ছুটে যায়, বহ্নিবাষ্প-সরোবরে চলোর্মিচঞ্চলতা জাগে, গ্রহনক্ষত্র আবর্তিত হয় নিত্যকাল, কর্মের বন্ধনগ্রন্থি খুলে যায়। সেই নটরাজের মন্ত্রশিষ্য কবি দোলপূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রে, বসন্তদোলনৃত্যে, পলাশের রক্তিমায়, বকুলের মত্ততায়, আম্রমঞ্জরীর সর্বত্যাগপণে, বেণুকুঞ্জের কম্পনে পেয়েছেন তাঁর আমন্ত্রণলিপি—'তব নামে আমার আহ্বান'। সেই আহ্বানেই কবি তাঁর নৃত্যগীতপালা রচনা করেছেন ঋতুরঙ্গশালা।

নটরাজ-বন্দনার প্রথম সংগীত 'নৃত্যের তালে তালে নটরাজ ঘুচাও সকল

বন্ধ হে'। কবিতারূপে রচিত এবং সুরযোজনায় সংগীতে পরিণত এই চার স্তবকের গানখানিতে জড়বিশ্বসৃষ্টির মূলীভূত রহস্য আশ্চর্য জ্যোতির্ময় সত্যদৃষ্টিতে উদ্‌ভাসিত হয়েছে, অণুপরমাণুর নৃত্যছন্দে অনন্ত অসীম ব্রহ্মাণ্ডের যে জন্ম-বিস্ময় নিহিত সে কথা কী লীলায়িত ছন্দে কী সহজ সৌন্দর্যে তিনি বলে দিয়েছেন। ১৩৪৪ সালে লেখা বিশ্বপরিচয় পাঠ করে আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারি আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পরমাণুবিস্তায় কবির মোটামুটি অধিকার ছিল, বিজ্ঞানের মূল সত্যগুলিকে তিনি অধিগত করেছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানের সত্য যখন কবির সৌন্দর্যে মিলে যায়, রহস্য যখন গান হয়ে ওঠে, তখনই সৃষ্টি হয় এমন অপরূপ একটি সংগীতের। বিশ্বপরিচয়ে কবি লিখেছিলেন—

"অতিপরমাণুদের দুরন্ত চাঞ্চল্য পজিটিভ নেগেটিভে সন্ধি করে সংযত হয়ে আছে তাই বিশ্বে আছে শান্তি। ভালুকওয়ালা বাজায় ডুগডুগি, তারই তালে ভালুক নাচে, আর নানা খেলা দেখায়। ডুগডুগিওয়ালা না যদি থাকে, পোষমানা ভালুক যদি শিকলি কেটে স্বধর্ম পায় তা হলে কামড়িয়ে আঁচড়িয়ে চারদিকে অনর্থপাত করতে থাকে। আমাদের সর্বাঙ্গে এবং দেহের বাইরে এই পোষমানা বিভীষিকা নিয়ে অদৃশ্য ডুগডুগির ছন্দে চলেছে সৃষ্টির নাচ ও খেলা। সৃষ্টির আখড়ায় দুই খেলোয়াড় তাদের ভীষণ দ্বন্দ্ব মিলিয়ে বিশ্বচরাচরে রঙ্গভূমি সরগরম করে রেখেছে।"

এই তত্ত্বই কি এই স্তবকে বলা হয়নি?—

> নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ নৃত্যে তোমার মায়া
> বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে কাঁপে নৃত্যের ছায়া।…
> নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু;
> পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্রভানু।

যে গভীর অবিশ্বাস্য কবিকল্পনায় পরমাণু থেকে চন্দ্রভানু পর্যন্ত একই চিত্রকল্পের অঙ্গীভূত হয়, বিদ্রোহী পরমাণুকে সুন্দর করার এবং পদযুগের জ্যোতি-মঞ্জীরে চন্দ্রভানু বাজিয়ে তোলার যে সৃষ্টিরহস্য-ভেদকারী কল্পনা এই কবিতার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে, আমাদের উপলব্ধির সীমা তার চেয়ে অনেক গুণ ক্ষুদ্র!

৩

ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন ঋতুর উপর একাধিক কবিতা ও সংগীত রচনা করেছেন, কিন্তু হেমন্ত ও শীত তাঁর কোনো পালাগানে কর্তৃত্ব লাভ করেনি। রবীন্দ্রনাথের নাটকেও ঋতুচক্রের রূপটি দেখা যায়। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রনাট্যে ঋতুচক্রের যে সূচীপত্র রচনা করেছেন তা এইরূপ—গ্রীষ্ম-বর্ষা : অচলায়তন ; বর্ষা-শরৎ : বিসর্জন ; শরৎ-প্রারম্ভ : শারদোৎসব, ঋণশোধ ; শরৎ-শেষ : ডাকঘর ; শীতকাল : রক্তকরবী ; বসন্ত : রাজা ও রানী, রাজা, ফাল্গুনী। গ্রীষ্মের শুষ্কতা-রুক্ষতা অচলায়তনের আচারসর্বস্ব প্রাণহীন সমাজের সঙ্গে উপমিত হয়েছে এবং নাটকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রাচীরভাঙা অনাচার, বাইরের মুক্ত বায়ু ও নববর্ষার বারিধারা একই সঙ্গে উদ্দাম বেগে প্রবাহিত হয়েছে। নাটকের চরিত্রগুলির মধ্যেও গ্রীষ্মের দাবদাহ ও হাহাকারের উপমান নিহিত। মহাপঞ্চককে গ্রীষ্মের এবং পঞ্চককে তাই বর্ষার প্রতীক বলা যায়। নববর্ষার অনেকগুলি গানই এই নাটকে কবি সংযুক্ত করেছেন। বিসর্জনে ঋতুর পরিবেশমাত্র আছে, ঋতুসংগীত নেই, কারণ সেই পর্বে তখনও ঋতুর সঙ্গে মানবজীবনের লীলায়িত সম্পর্কের কথা কবির নাট্যচেতনায় প্রবেশ করেনি। শারদোৎসবে ও ঋণশোধেই শরৎপ্রকৃতি ও মানবজীবন একাকার হয়ে গেছে।

শারদোৎসব নাটক উপলক্ষে বিভিন্ন আলোচনায় ঋতু সম্পর্কে কবির মনোভাবের একটি রেখাচিত্র পাওয়া যায়। ১৩২৬সালে শান্তিনিকেতনে এই নাটকের অভিনয়-উপলক্ষে কবি একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন—

"বিশেষ বিশেষ ফুলে-ফলে হাওয়ায়-আলোকে আকাশে-পৃথিবীতে বিশেষ বিশেষ ঋতুর উৎসব চলিতেছে। সেই উৎসব মানুষ যদি অন্যমনস্ক হইয়া অন্তরের মধ্যে গ্রহণ না করে তবে সে পার্থিব জীবনের একটি বিশুদ্ধ এবং মহৎ আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়।...মানুষের জন্ম তো কেবল লোকালয়ে নহে, এই বিশাল বিশ্বে তাহার জন্ম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তাহার প্রাণের গভীর সম্বন্ধ আছে। তাহার ইন্দ্রিয়বোধের তারে তারে প্রতি মুহূর্তে বিশ্বের স্পন্দন নানা রূপে রসে জাগিয়া উঠিতেছে।"

গীতাঞ্জলির উদ্বোধন-পর্বে এই উপলব্ধির কথা তাঁর নানা সংগীতে অভিব্যক্ত হয়েছে। শারদোৎসবের আয়োজন সেই বিশ্বসৃষ্টির বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আত্মার যোগসূত্রটিকে স্মরণ করার জন্যই, এই তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করে কবি বলেছেন—

"মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের উৎসব ঘরে ঘরে বারে বারে ঘটিতেছে।

'কিন্তু প্রকৃতির সভায় ঋতু-উৎসবের নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করি তখন আমাদের মিলন আরও অনেক বড় হইয়া উঠে।…তাই নব ঋতুর অভ্যুদয়ে যখন সমস্ত জগৎ নূতন রঙের উত্তরীয় পরিয়া চারিদিক হইতে সাড়া দিতে থাকে, তখন মানুষের হৃদয়কেও সে আহ্বান করে—সেই হৃদয়ে যদি কোনো রঙ না লাগে, কোনো গান না জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে মানুষ সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। সেই বিচ্ছেদ দূর করিবার জন্য আমাদের আশ্রমে আমরা প্রকৃতির ঋতুউৎসবগুলিকে নিজেদের মধ্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছি।"

শারদোৎসবকে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্যপর্যায়ে রেখে বিচার করলে দেখা যায়, এই নাটকেই ঋতুর বাহ্যিক সৌন্দর্যকে কবি জীবনের একটি গভীর প্রতীতির সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছেন। শারদোৎসব (১৩১৫) থেকে ঋণশোধে (১৩২৮) পরিবর্তনের সময় এই তত্ত্ব আরো গভীর হযে দেখা দিয়েছিল। শরৎঋতুর মধ্যে কী তত্ত্ব আরোপ করেছিলেন কবি? শরতের হিরণ্ময় রৌদ্রপ্লাবনে, শেফালির অযাচিত শুভ্র সৌরভে, শিশিরময় তৃণাসনে, ধবল জ্যোৎস্নার বর্ণালিম্পনেই কবি নিবিষ্ট ছিলেন না—তার মাঝখানে কোনো লক্ষীর সৌন্দর্যের শতদল-পদ্মটিরও খোঁজ করেছেন কবি। শরতের মধ্যে আছে ঋণশোধের আত্মোৎসর্গের সৌন্দর্য। শরতের পূর্ণতোয়া নদীধারায়, ফসলাবনম্র শস্যখেতে, যে ভাবটি তাঁর মধ্যে জেগেছে তা এই—

"প্রকৃতি আপনার ভিতরে যে অমৃতশক্তি পাইযাছে সেটাকে বাহিরে নানা রূপে নানা রসে শোধ করিয়া দিতেছে। সেই শোধ করাটাই প্রকাশ।…এই ঋণশোধেই স্বার্থ ছুটি যথার্থ মুক্তি।"

শারদোৎসবের 'ভিতরকার ধুয়ো' সম্বন্ধে সবুজ পত্রের আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪ সংখ্যায় আমার ধর্ম প্রবন্ধে কবি আরও লিখেছিলেন—

"শারদোৎসব থেকে আরম্ভ করে ফাল্গুনী পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ করে মন দিযে দেখি তখন দেখতে পাই প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটা ওই একই।…বিশ্বই যে এই দুঃখ-তপস্যায় রত; অসীমের যে দান সে নিজের মধ্যে পেয়েছে অশ্রান্ত প্রয়াসের বেদনা দিযে সেই দানের সে শোধ করছে। প্রত্যেক ঘাসটি নিরলস চেষ্টার দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করছে, এই প্রকাশ করতে গিয়েই সে আপন অন্তর্নিহিত সত্যের ঋণ শোধ করছে। এই-যে নিরন্তর বেদনায় তার আত্মোৎসর্জন, এই দুঃখই তো তার শ্রী, এই তো তার উৎসব, এতেই তো সে শরৎপ্রকৃতিকে সুন্দর করেছে, আনন্দময় করেছে।"

দুঃখের মূল্যে আনন্দের ঋণ শোধ করা, আনন্দময় প্রকাশ, মুক্তি—এ সমস্ত তত্ত্বই রবীন্দ্রনাথের ঋতুউৎসবে বারবার প্রত্যাবৃত্ত হয়েছে। এই কারণে শারদোৎসব থেকেই রবীন্দ্রনাট্যে যথার্থ ঋতুচক্র আরম্ভ হয়েছে। বাল্মীকি-প্রতিভা বা মায়ার খেলায় বর্ষা বা বসন্তের কথা থাকলেও ঋতু সেখানে নাটকের সঙ্গে গভীর সংকেতে অবিচ্ছেদ্য হতে পারেনি। শারদোৎসবের অভিনয়োপলক্ষে কবি ১৩১৫সালে একটি নান্দী রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্র রচনাবলীর (৭ম খণ্ড, বিশ্বভারতী) গ্রন্থপরিচয় থেকে সেটি এখানে সংকলিত হল—

শরতে হেমন্তে শীতে বসন্তে নিদাঘে বরষায়
অনন্ত সৌন্দর্যধারে যাঁহার আনন্দ বহি যায়
সেই অপরূপ, সেই অরূপ, রূপের নিকেতন
নব নব ঋতুরসে ভরে দিন সবাকার মন।
প্রফুল্ল শেফালিকুঞ্জ যাঁর পায়ে ঢালিছে অঞ্চলি,
কাশের মঞ্জরীরাশি যাঁর পানে উঠিছে চঞ্চলি—
স্বর্ণদীপ্তি আশ্বিনের স্নিগ্ধ হাস্যে সেই রসময়
নির্মল শারদরূপে কেড়ে নিন সবার হৃদয়।

নান্দীর এই 'অপরূপ' 'অরূপ' 'রসময়'ই পরবর্তীকালে 'নটরাজে' রূপান্তরিত হয়েছেন—তাতে সন্দেহ নেই।

পরবর্তীকালে শারদোৎসব যখন ঋণশোধে রূপান্তরিত হয়েছে তখন শরতের উপর কবির আর একটি নূতন তত্ত্ব আরোপিত হয়েছে। শরতের মধ্যে যে রিক্ততা আছে তা যে পূর্ণতারই নামান্তর, রাজা হতে গেলে যে সন্ন্যাসী হওয়া চাই—এই ভাবটি এখানে প্রবেশ করেছে। রাজা নাটকেও এই তত্ত্বটিই প্রধান এবং বসন্ত সম্পর্কেও কবির একই তত্ত্ব। সুতরাং এইভাবে শারদোৎসব থেকে সুরু করে নটরাজ পর্যন্ত কবির ঋতুপরিক্রমার ধুয়াটা দাঁড়াচ্ছে একই। গানের ভাষায় বলতে গেলে তা এইরূপ—

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।
তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্য চন্দ্র তারা,
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে।
তরঙ্গ মিলায়ে যায়, তরঙ্গ উঠে,
কুসুম ঝরিয়া পড়ে, কুসুম ফুটে।

নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্যলেশ—
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে।

১৩২২ সালে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি পত্রে কবি ফাল্গুনী নাটকের যে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন, পূর্বোদ্ধৃত গানটির সঙ্গে তার পার্থক্য নেই। ১২শ খণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয় থেকে পত্রাংশ সংকলন করা হচ্ছে—

"জগৎটার দিকে চেয়ে দেখলে দেখা যায় যে, যদিচ তার উপর দিয়ে যুগ যুগ চলে যাচ্ছে তবু সে জীর্ণ নয়—আকাশের আলো উজ্জ্বল, তার নীলিমা নির্মল। ধরণীর মুখে রিক্ততা নেই, তার শ্যামলতা অম্লান—অথচ খণ্ড খণ্ড করে দেখতে গেলে দেখি ফুল ঝরছে, পাতা শুকচ্ছে, ডাল মরছে। জরামৃত্যুর আক্রমণ চারিদিকেই দিনরাত চলেছে, তবুও বিশ্বের চিরনবীনতা নিঃশেষ হল না।·· জরাকে, মৃত্যুকে ধরে রাখতে গেলেই দেখি, সে আপন ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে প্রাণের জয়পতাকা উড়িয়ে দাঁড়ায়। পিছন দিক থেকে যেটাকে জরা বলে মনে হয় সামনের দিক থেকে সেইটেকেই দেখি যৌবন।··

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রতি ফাল্গুনে চিরপুরাতন এই যে চিরনূতন হয়ে জন্মাচ্ছে মানুষপ্রকৃতির মধ্যেও পুরাতনের সেই লীলা চলছে। প্রাণশক্তিই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আপনাকে বারেবারে নূতন করে উপলব্ধি করছে। যা চিরকালই আছে তাকে কালে কালে হারিয়ে হারিয়ে যদি না পাওয়া যায় তবে তার উপলব্ধিই থাকে না।···"

বসন্ত পালায় এরই রূপান্তর ঘটল অন্য ভাষায়, প্রলয়গানের মহোৎসবে সবাইকে ডাক দিলেন কবি, 'বিচ্ছেদে তোর খণ্ড মিলন পূর্ণ হবে'। এই নাটকের শেষেও সেই একই তত্ত্ব—'ঋতুরাজ তাঁর রাজবেশ খসিয়ে দিয়ে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে চলেছেন'। শারদোৎসব থেকে নটরাজ তাই একই ধ্রুবপদ—

তোমার বিশ্ব-নাচের দোলায়, বাঁধন পরায় বাঁধন খোলায়,
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে
অন্ত কে তার সন্ধান পায় ভাবিতে লাগায় ধন্দ হে।

৪

গীতবিতানে গ্রীষ্ম-পর্যায়ে কবির গীতসংখ্যা ১৬টি, তাছাড়া অন্যান্য পর্যায়ের গানে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের বা গ্রীষ্মের অনুষঙ্গবাহী গান কয়েকটি অনুসন্ধান করা যেতে পারে। যেমন প্রেমপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত—ঘুমের ঘন গহন হতে যেমন

আসে স্বপ্ন, যদি হায় জীবনপূরণ নাই হল মম তব অকৃপণ করে, ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো আমার মুখের আঁচলখানি, পূর্ণপ্রাণে চাবার যাহা রিক্ত হাতে চাস নে তারে; বিচিত্র-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত—গগনে গগনে ধায় হাঁকি বিদ্যুৎবাণী বজ্র-বাহিনী বৈশাখী গানের কথা মনে পড়বে। বৈশাখকে কবি কবিতা ও গানে, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে, রুদ্রতাপস মহাদেবের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই পর্যায়ের অধিকাংশ গান ঐ একটি রূপকল্পেরই ভাষ্য ও বিস্তার মাত্র। নটরাজ ঋতুরঙ্গশালাতেও বৈশাখের এই ধ্যানস্তব্ধ নিশ্চলশ্বাস রুদ্র ভয়ংকর তপস্বী মূর্তিটির বন্দনা করা হয়েছে। কিন্তু এই তপস্যা তো অন্তহীন অকারণ হতে পারে না, মহারুদ্র তপোচারীকে জাগতে হবে, নিখিল জগতকে জড় দানবের হাত থেকে বাঁচাতে হবে, আশায় ভাষায় সঞ্জীবিত করতে হবে, কলুষমুক্ত করতে হবে—

> পিনাকে তোমার দাও টংকার, ভীষণে মধুরে দিক ঝংকার,
> ধূলায় মিশাক যা কিছু ধূলার, জয়ী হোক যাহা নিত্য।

এই কল্যাণতত্ত্বই গীতরূপ লাভ করেছে 'এস এস এস হে বৈশাখ' এই বিখ্যাত গানে। 'তাপসনিশ্বাসবায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে'—বৎসরের আবর্জনা দূরে করে দিতে হবে নববর্ষের প্রতীক এই বৈশাখকেই। ঋতুরঙ্গশালার 'সম্বোধন' কবিতায় ধূসরবসন রক্তলোচন বৈশাখের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা শান্ত মঙ্গলময় শিবের নয়—সে এক ভয়ংকর আততায়ী যেন, যে

> শুষ্কপথের দানবদস্যু,
> শুষে নিতে চাও হাসি ও অশ্রু,
> ইঙ্গিতে দাও দারুণ ডাক।
> স্তম্ভিত হল সে ডাকে পৃথ্বী,
> ভাণ্ডারে তার কাঁপিল ভিত্তি,
> শঙ্কায় তার শুকায় তালু,
> অট্টহাসিল মরুর বালু।

আবার 'নমো নমো হে বৈরাগী' গানে তাকেই বৈরাগী বলা হয়েছে। বৈশাখের আনুষঙ্গিক হল বৈশাখী ঝড, সেই ঝড়ের মধ্যে রয়েছে জীর্ণতার অবসানের সংকেত, পুরাতন গ্লানির নিঃশেষ অপসারণ, মৃত্যুদুঃখবেদনার মধ্য দিয়ে নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয়ের আসন্ন সংবাদ। এই তত্ত্বটি রবীন্দ্রকাব্য-পাঠকের কাছে পরিচিত ও পুরাতন—ঝড়ের রূপকল্পটি তাঁর গানে বারবার ঘুরে

ফিরে এসেছে। এই ঝড়কে নটরাজ ঋতুরঙ্গশালার 'কালবৈশাখী' কবিতায় বৈশাখের প্রলয়-রঙ্গিণী লীলাসঙ্গিনী বলা হয়েছে, অন্যত্র কালবৈশাখী বৈশাখ-রূপ তাপসের নিশ্বাসরূপেই কল্পিত। 'নাই রস নাই দারুণ দাহনবেলা', 'হৃদয় আমার ঐ বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে', 'ওই বুঝি কালবৈশাখী সন্ধ্যা-আকাশ দেয় ঢাকি' গানগুলিতে রুদ্রভৈরবের রূপকল্পটিই বারবার দেখা যায়। ঋতুরঙ্গ-শালার একটি কবিতায় গ্রীষ্ম সম্পর্কে কবির ধ্যানকল্পনা সহসা সরে গেছে দেখতে পাই—

পরাণে কার ধেয়ান আছে জাগি
জানি হে জানি, কঠোর বৈরাগী।

ধ্যানমগ্ন গ্রীষ্মের এই মূর্তি কেবল ক্রুদ্ধ নিশ্বাসে আবর্জনা ভস্ম করার জন্যই নয়, এই ধ্যান-মূর্তির নিভৃতে রয়েছে মাধুর্যের স্বপ্নকল্পনা। দারুণ তপ্ত দ্বিপ্রহরে রাখালের বাঁশি শুনে বৈরাগী ধেয়ানীর ধ্যান যায় ভেঙে, জেগে ওঠে রুদ্রতাপসের বিরহ, সৌন্দর্যবিরহ, মাধুর্য-বিরহ। 'মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি' গানে কবি বলেছেন, রাখাল যখন বিহঙ্গকূজনক্লান্ত দ্বিপ্রহরে নিঃসঙ্গ বেণুতে সুর দেয়, সেই সুর 'শান্ত প্রান্তরের কোণে (গীতবিতানে 'প্রান্তর-প্রান্তের কোণে') 'রুদ্র বসি তাই শোনে', মধুরের স্বপ্নাবেশে তাঁর ধ্যানমগ্ন আঁখি উন্মীলিত হয়, জেগে ওঠে বিরহী আতুর দীর্ঘশ্বাস—

সহসা উচ্ছ্বসি উঠে ভরিয়া আকাশ
তৃষাতপ্ত বিরহের নিরুদ্ধ নিশ্বাস।

সেই বিরহই কি দূর অম্বরপ্রান্তে গম্ভীর ডম্বরুধ্বনিতে বিদ্যুৎচ্ছন্দ আসন্ন বৈশাখীতে পরিণত হয়? তাঁর বিরহের সন্তপ্ত নিশ্বাসে রৌদ্রদগ্ধ তপস্যার আড়ালে শোনা যায় চঞ্চলের চকিত খঞ্জনী, মাধুরীর মঞ্জীরের মৃদুমন্দ গুঞ্জরিত ধ্বনি। কঠোর প্রাণে কোমলের স্পর্শদানের জন্য—

হঠাৎ নীরবে চলে আসে
একটি করুণ ক্ষীণ স্নিগ্ধ বায়ুধারা,
কে অভিসারিণী যেন পথে এসে পায় না কিনারা।

মুহূর্তে অম্বরবক্ষে উলঙ্গিনী শ্যামার আগমন ঘটে। এইভাবে আষাঢ়ের কালো মেঘের আগমনে রুদ্র বৈশাখের তপোভঙ্গ ঘটে। 'তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসের বর্ষণে' এই গানের দ্বারা কবি নটরাজ-পালায় গ্রীষ্মের অবসান ও বর্ষার আগমন চিহ্নিত করেছেন। গ্রীষ্মের মধ্যেই বর্ষার সম্ভাবনা, ভয়ংকরের মধ্যেই

সুন্দরের ধ্যান, এই তত্ত্বটি গ্রীষ্মের একাধিক কবিতা ও গানে নিহিত। 'বৈশাখ হে মৌনী তাপস কোন্ অতলের বাণী এমন কোথায় খুঁজে পেলে' গানটি তার উদাহরণ। কয়েকটি গান সাধারণভাবে গ্রীষ্মঋতুর বাহ্যরূপ ও শুষ্ক তৃষ্ণাতুরতার পরিবেশকে সার্থক ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। 'নাই রস নাই দারুণ দাহনবেলা', 'দারুণ অগ্নিবাণে রে হৃদয় তৃষায় হানে রে', 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা ওগো তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে' (চণ্ডালিকায় চণ্ডালিকার কণ্ঠে সার্থকভাবে প্রযুক্ত) প্রভৃতি গানগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই তৃষ্ণার্তির পরই 'এসো এসো হে তৃষ্ণার জল কলকল ছলছল' এই প্রার্থনা।

গ্রীষ্মবিষয়ক আর একটি গানে একটি নূতন চিত্রকল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রীষ্ম যেন কোন শুষ্কতাপের দৈত্য, কালবৈশাখী সেই দৈত্যপুরীতে মুক্তির বার্তা-নিয়ে-আসা দূর সাগরপারের রাজপুত্র। এই দৈত্যপুরীতে শুষ্কশীর্ণ বন্দিনী পৃথিবী মুক্তিদাতার আবির্ভাবের প্রহর গুণে চলেছে। এখন রাজপুত্রের মেঘডমরু ও বজ্রকণ্ঠ শুনে, বীরের পদস্পর্শে তার মূর্ছা গেল ভেঙে, বসুন্ধরা তখন মরকতমণির থালা সাজিয়ে বরণমালা গেঁথে সজল হাওয়ায় প্রতীক্ষমানা। 'শুষ্কতাপের দৈত্যপুরে দ্বার ভাঙবে বলে' গানটি ছাড়া 'তপস্বিনী হে ধরণী ঐ যে তাপের বেলা আসে'—গানটিতে তানপ্রধান ছন্দে কবি তপস্বিনী ধরণীকে দৈন্যের ধূসর ধূলিশয়ান থেকে ধীরে ধীরে লাবণ্যলক্ষ্মীতে পরিণত হতে বলেছেন—

> যে তব বিচিত্র তান উচ্ছ্বসি উঠিত বহু গীতে
> এক হয়ে মিশে যাক মৌনমন্ত্রে ধ্যানের শান্তিতে।
> সংযমে বাঁধুক লতা   কুসুমিত চঞ্চলতা,
> সাজুক লাবণ্যলক্ষ্মী   দৈন্যের ধূসর ধূলিবাসে।

গ্রীষ্ম-পর্যায়ে দুটি প্রেমের গান আছে,—'বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া আসে মৃদুমন্দ' এবং 'মধ্যদিনের বিজন বাতায়নে'। দুটি গানই স্মৃতিভারে মন্থর, বিরহাতুর ও করুণ বেদনায় অশ্রুরুদ্ধ। কবির অতীতকালের কোন প্রেমস্মৃতি আজ বৈশাখের প্রভাতী হাওয়ায়, চাঁপা ও বকুলফুলের গন্ধে ব্যাকুল—'ক্লান্তিভরা কোন বেদনার মায়া স্বপ্নাভাসে' প্রৌঢ়মনের প্রান্তে ভেসে আসে। চিত্রা কাব্যের 'স্নেহস্মৃতি' (বর্ষশেষ ১৩০০) কবিতার 'সেই চাঁপা সেই বেলফুল' এই গানদুটির সঙ্গে অনিবার্যভাবে মনে পড়ে।

৫

বর্ষা রবীন্দ্রনাথের প্রিয়তম ঋতু। কালিদাসের কবিশিষ্য রবীন্দ্রনাথ এই বর্ষার বন্দনারচনায় 'বহুযুগের' সঙ্গে আধুনিক কালের যোগবন্ধন স্থাপন করেছেন। ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে কবি ঘোষণা করেছিলেন, মেঘদূত লেখার পর থেকে আষাঢ়ের প্রথম দিনটি তাঁর কাছে 'বিশেষচিহ্নিত' হয়ে গেছে। সজ্ঞানে জীবনের প্রতিটি বর্ষাকে তাই অভিনন্দন জানিয়েছেন, প্রতি বর্ষা তাঁর কবিজীবনের উপর প্রবলধারায় বারিবর্ষণ করে গেছে। মানসীর 'মেঘদূত' কবিতায় কালিদাসের প্রতি উদ্দিষ্ট কবিবাণীকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রয়োগ করে আমরা বলতে পারি—

> সেদিনের পরে গেছে কত শতবার
> প্রথম দিবস স্নিগ্ধ নববরষার।
> প্রতি বর্ষা দিয়ে গেছে নবীন জীবন
> তোমার কাব্যের পরে করি বরিষণ
> নববৃষ্টিবারিধারা, করিয়া বিস্তার
> নবঘনস্নিগ্ধচ্ছায়া, করিযা সঞ্চার
> নব নব প্রতিধ্বনি জলদমন্দ্রের,
> স্ফীত করি স্রোতোবেগ তোমার ছন্দের
> বর্ষাতরঙ্গিণীসম।

'মেঘদূত' কবিতায় এবং প্রাচীন সাহিত্যের 'মেঘদূত', বিচিত্র প্রবন্ধের 'নববর্ষা' ইত্যাদি প্রবন্ধে মেঘদূত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে কাব্যভাষ্য, মোটামুটি তাঁর সারা জীবনের বর্ষাসাহিত্যে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। বর্ষা রবীন্দ্রনাথের কবি-দৃষ্টিতে চিরকাল বিরহের পটভূমি বিস্তার করেছে, প্রেমবেদনার স্মৃতি উদ্রিক্ত করেছে। বর্ষার সঘন বিস্তার আমাদের জীবনের চারপাশে একটি আবেষ্টন রচনা করে দেয়, মনে করিয়ে দেয়—

"আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি সে আপনার মানস সরোবরের অগমতীরে বাস করিতেছে, সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই। আমিই বা কোথায়, তুমিই বা কোথায়! মাঝখানে একেবারে অনন্ত। কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে। অনন্তের কেন্দ্রবর্তী সেই প্রিয়তম অবিনশ্বর মানুষটির সাক্ষাৎ কে লাভ করিবে।" (মেঘদূত: প্রাচীন সাহিত্য)

ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্রনয়ান,
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান ?
কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ ?
সশরীরে কোন নর গেছে সেইখানে,
মানসসরসীতীরে বিরহশয়ানে,
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদীগিরি সকলের শেষে। (মেঘদূত : মানসী)

"আজ কেবলই মনে হচ্ছে এই যে বর্ষা, এতো এক সন্ধ্যার বর্ষা নয়, এ যেন আমার সমস্ত জীবনের অবিরল শ্রাবণধারা। যতদূর চেয়ে দেখি, আমার সমস্ত জীবনের উপরে সঙ্গিহীন বিরহসন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার—তারি দিগ্‌দিগন্তরকে ঘিরে অশ্রান্ত শ্রাবণের বর্ষণে প্রহরের পর প্রহর কেটে যাচ্ছে; আমার সমস্ত আকাশ ঝরঝর করে বলছে, কৈসে গোঙায়বি হরি বিনে দিনরাতিয়া।' (শ্রাবণসন্ধ্যা : শান্তিনিকেতন)

'বাঁধন-হারা জলধারার কলরোলে
আমারে কোন পথের বাণী যায় যে বলে।
সে পথ গেছে নিরুদ্দেশে মানসলোকে গানের শেষে
চিরদিনের বিরহিণীর কুঞ্জবনে !'

কবির বর্ষার গান সেই নিরুদ্দেশ পথে, মানসলোকে, চিরদিনের বিরহিণীর কুঞ্জবনে প্রয়াণ করেছে। মেঘদূত কবিতায় কালিদাসের কাব্যের যক্ষ-প্রিয়াকেই কবি 'চিরদিনের বিরহিণী' করে নিয়েছিলেন—'মণিহর্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহবেদনা।' সেই বিরহবেদনাতুরা নারীই বর্ষাসংগীতে ও বর্ষার কাব্যে রবীন্দ্রনাথের মানসসুন্দরীতে পরিণত, অথবা 'কোন স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে কোন ছায়াময়ী অমরায়' এই বেদনায় যার স্মৃতি, কবি তাকেই যক্ষপ্রিয়ার সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছেন। মৃত্যুর পর প্রিয়জন যেহেতু সৌন্দর্যরূপে স্মৃতিলোকে স্থানান্তরিত হয়, সেই স্মৃতি-সৌন্দর্যশায়িত প্রিয়জনকেই কবি মেঘদূতের মধ্যে দেখেছেন, যেখানে

চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া
অনন্তসৌন্দর্যমাঝে একাকী জাগিয়া।

মেঘদূতের বিশেষকে তাই কবি নির্বিশেষে রূপান্তরিত করে নিলেন, কারণ

তার মধ্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিশেষটির সাধারণীকরণ ঘটে গেল। নতুবা কালিদাসকে সম্বোধন করে কবি একথা কেন লিখবেন,

কবি, তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হয়ে যায়
রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা।

কেমন করে কবির 'রুদ্ধ হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা' দূর করে দিলেন কালিদাস? —যক্ষপ্রিয়ার সেই অনন্তবিরহশয্যালীনা ছবিটি এঁকে। মানসলোকের অগম পারে যার বাস তার সঙ্গে মিলনের যখন সম্ভাবনা নেই তখন—

"আজ কেবল ভাষায় ভাবে আভাসে ইঙ্গিতে ভুলে-ভ্রান্তিতে আলো-আঁধারে দেহে-মনে জন্মমৃত্যুর দ্রুততর স্রোতোবেগের মধ্যে তাহার একটুখানি বাতাস পাওয়া যায় মাত্র। যদি তোমার কাছ হইতে একটা দক্ষিণের হাওয়া আমার কাছে আসিয়া পৌঁছে, তবে সেই আমার বহুভাগ্য, তাহার অধিক এই বিরহলোকে কেহই আশা করিতে পারে না।" (মেঘদূত : প্রাচীন সাহিত্য)

তাই গান বলেছে—'হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে
সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।'
'যে গিয়েছে দেখার বাহিরে আছি তারই উদ্দেশে চাহি রে
স্বপ্নে উড়িছে তারই কেশরাশি পুরব-পবনবেগে।'
'আজি হৃদয় আমার যায় যে ভেসে
যার পাইনি দেখা তার উদ্দেশে।
বাঁধন ভোলে হাওয়ায় দোলে যায় সে বাদল মেঘের কোলে রে
কোন সে অসম্ভবের দেশে।'

গীতবিতানে কবির বর্ষাসংগীতের সংখ্যা ১১৫টি, বসন্ত-পর্যাযের চেয়ে ১৯টি কম। অবশ্য তাঁর অন্যান্য পর্যায়ের অজস্র গানেও বর্ষার মেঘচ্ছায়া পড়েছে, আষাঢ়ের জলকণা লেগেছে, কেতকীগন্ধবারি নিষিক্ত হয়েছে। তাই সংখ্যার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের গানে বর্ষার গুরুত্ব বোঝা যাবে না।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার লিখেছিলেন, 'মানবহৃদয়ের চিরবিচিত্র চির-পরিবর্তমান ভাবগুলি সম্পর্কে—তার অহেতুক বিষাদ আর সুখ, আশা এবং আকাঙ্ক্ষা—বুকের হারে বা কোলের কাছটিতে, যা আছে যা নেই অথবা ছিল যেন জননান্তর-সৌহৃদানি রূপে, সে সব নিয়েই এক পাওয়া-না-পাওয়ার আনন্দবেদনামিশ্রিত অপূর্ব আকুলতা—এ সবই কবির গানে কী আশ্চর্যভাবেই না ব্যক্ত হয়েছে'।[৩] রবীন্দ্রনাথের বর্ষাসংগীত সম্পর্কে একথা কী সার্থকভাবেই

না প্রযোজ্য মনে হয়। বর্ষাকে কবি তাঁর হৃদয়ের সমস্ত সত্তা দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন, সমস্ত বেদনা দিয়ে প্রকাশিত করেছিলেন এবং আমরা আমাদের সমস্ত জীবনের সমস্ত সাধনা দিয়েও যার মাধুর্য নিঃশেষ করতে পারি না। খেয়ার 'প্রভাতে' কবিতায় কবি লিখেছিলেন—

এক রজনীর বরষণে শুধু কেমন করে
আমার ঘরের সরোবর আজি উঠেছে ভরে।

মাত্র এক রজনীর শ্রাবণবর্ষণে যাঁর গৃহসরোবর এমন অকূল-অতল হয়ে উঠেছিল, সারা জীবনের কত বর্ষণে কত সরোবর সমুদ্র হয়ে উঠেছিল তাঁর, কত অমলকান্তি শ্বেত শতদলই না ফুটে উঠেছিল। জীবনস্মৃতির 'বর্ষা ও শরৎ' অধ্যায়ে কবি তাঁর শৈশবস্মৃতিতে বর্ষার পুলকরোমাঞ্চের বিবরণ দিয়েছেন। পুনশ্চের 'বালক' কবিতাতেও ছেলেবেলার বর্ষাসঘন দিনগুলির স্মরণচিহ্ন মাখানো—

অশোকবনে এসেছিল হনুমান,
সেদিন সীতা পেয়েছিলেন নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের খবর।
আকাশ কালো করে
সজল নবনীল মেঘে।
আনত তার মেদুর কণ্ঠে দূরের বার্তা,
যে দূরের অধিকার থেকে আমি নির্বাসিত।...
বাদলের দিনগুলো বছরে বছরে তোলপাড় করেছে আমাব মন ;
আজ তারা বছরে বছরে নাড়া দেয় আমার গানের সুরকে।

শেষ বয়সের একটি গানে কবি তাই জানিয়েছিলেন, প্রকৃতির দান ঋতু-অবসানে যদি-বা রিক্ত হয়, কবির শ্রাবণসংগীত বেঁচে থাকবে, বিস্মৃতিস্রোতের উজান ঠেলে ফিরে ফিরে আসবে সেই তরণী। বর্ষাদিবসের প্রথম-প্রস্ফুটিত কদম্বকুসুমের মত, কবির মেঘচ্ছায় অন্ধকারের আবরণে-ঢাকা সুরের ক্ষেতের প্রথম স্বর্ণশস্যতুল্য রবীন্দ্রসংগীতটি—

বাদল-দিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান,
আমি দিতে এসেছি শ্রাবণের গান।
মেঘের ছায়ায় অন্ধকারে রেখেছি ঢেকে তারে
এই-যে আমার সুরের খেতের প্রথম সোনার ধান।
আজ এনে দিলে, হয়ত দিবে না কাল—
রিক্ত হবে যে তোমার ফুলের ডাল।

এ গান আমার শ্রাবণে শ্রাবণে তব বিস্মৃতিস্রোতের প্লাবনে
ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে তরণী বহি তব সম্মান।

গীতবিতানের বর্ষাপর্যায়ের গানগুলিতে কবির বিচিত্র অনুভূতিপুঞ্জ সঞ্চারিত হয়েছে। কোথাও বর্ষার ঋতুপ্রকৃতির বর্ণনা চিত্রসৌন্দর্যে, ধ্বনিস্পন্দে, বর্ণগন্ধে পুলকিত, কোথাও মৃত্তিকার ঘ্রাণ। কোথাও নিবিড় মেঘের ছায়ায় উদাসী মনের বিরহবেদনা, কোথাও পলাতক বর্ষার জন্য ব্যগ্র ব্যাকুলতা। বিষয়ভেদে বর্ষা-ঋতুর গানগুলিকে ঋতুপ্রকৃতি, সময়, অভিসার, বিরহবেদনা ও মিলনোৎকণ্ঠা, অতীতস্মৃতি, নিঃসঙ্গতা, বর্ষামঙ্গল, শেষ বর্ষণ ও বিচিত্র—এই ধরনের শ্রেণীবিন্যাসে দেখা যেতে পারে। অবশ্য এই প্রকার বিষয়শ্রেণী সংগীতের রসগ্রহণের পক্ষে অর্থহীন, কারণ একই গানে যেমন বর্ষার প্রাকৃত-রূপের মেদুর চিত্র আছে তেমনি নিঃসঙ্গতার অন্তহীন ক্রন্দনও ছড়িয়ে পড়েছে। বিরহবেদনা তো বর্ষার সব কটি গানেই সংক্রামিত। আবার বর্ষামঙ্গল বলতে বিশেষ কোনো গানকে নির্দিষ্ট করা যায় না, কারণ বর্ষামঙ্গল উৎসবানুষ্ঠানে সব জাতের বর্ষাগীতই কবি পরিবেশন করতেন।

বর্ষার নৈসর্গিক রূপ রবীন্দ্রনাথের সংগীতগুলিতে অপরূপতা লাভ করেছে। আকাশ ও মৃত্তিকার প্রলয়মত্ত সম্মীভবন, বনভূমির উত্তালতা, নিশীথরাত্রির চকিত বিদ্যুৎশিহর, ভীরু কেতকীর অভিসারযাত্রা, কদম্বকোরকের পুলক-রোমাঞ্চ, নিবিড় অবিচ্ছিন্ন বর্ষণসংগীত, নিদ্রাহীন রাত্রির সঙ্গাতুরতা, গোধূলির তমালঅরণ্যে শেষ কেকাধ্বনি, মেঘের কোলে ধাবমান বলাকাপংক্তি, পূর্ণতরঙ্গিণীর কলধ্বনি—তাঁর গানে বর্ষা উল্লাসে-গাম্ভীর্যে নৃত্যে-স্বপ্নে কী স্বপ্নমদির নেশায়-মেশা, কী বিপুল উন্মত্ততা, কী রসরহস্যরভস! অসংখ্য গান যেন ঋতুরূপের চিত্রশালা। প্রথম আষাঢ়ের সমারোহ থেকে শ্রাবণের বিরামহীন বিদ্যুচ্চকিত নিদ্রাহীন রাত্রি, ভাদ্রের প্রলয়ধারা—সবাইকে ছুঁয়ে গেছে তাঁর গান। মল্লার-দেশ-মেঘ-কানাড়া-কীর্তন-বাউলে বাদলের মাদল-ডম্বরু-একতারা সব একসঙ্গে বেজে উঠেছে। শালের বনে ধানের খেতে ঝড়ের দোলা, তমালবনে মর্মরিত পবনের হুংকার, জামের বনে আমের বনে হাওয়ার হাহাকার, কদম্বের কাননে আষাঢ় মেঘের ছায়া, চঞ্চল বনাঞ্চলে সমীরের তন্দ্রাহারা অধীরতা, শ্রাবণগগনাঙ্গনে পথিক মেঘের সমাবেশ, কূজনহীন কাননভূমির নিস্তব্ধতা, গানের সুর এইগুলিকে সঞ্চার করে দেয় আমাদের হৃদয়ে। নববর্ষাপাতে প্রতিটি মালতীর ফুটে-ওঠার গন্ধ পাই তাঁর

গানে। কোথাও কবি বর্ষাকে আদিপ্রাণের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। কোন পুরাতন প্রাণের টানে কবির মন ছুটে যায় মৃত্তিকার কাছে, চোখ ডুবে যায় নবাঙ্কুরে, 'কখন বাদল ছোঁওয়া লেগে' গানে যাদের সম্পর্কে বলেছেন—

ওরা যে এই প্রাণের রণে মরুজয়ের সেনা,
ওদের সাথে আমার প্রাণের প্রথম যুগের চেনা।

'আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে' গানে এরই প্রতিধ্বনি শুনি—

প্রথম যুগের বচন শুনি মনে
নবশ্যামল প্রাণের নিকেতনে।

এই শ্রাবণের বুকের গহনে একদিকে বিরহবেদনার স্তম্ভিত স্ফটিক, অন্তপুটে আছে অগ্নিতেজ। বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা আষাঢ়ের মালিকারচনা এবং শ্যামলশোভার বক্ষে বিদ্যুৎজ্বালার পরিকল্পনা, বনলক্ষ্মীর কম্পিত কায় ও ঝিল্লীর ঝংকৃত মঞ্জীর, কদম্বের পল্লবে শ্রাবণের বীণাপাণির বর্ষণসংগীত রেখে-যাওয়া কিংবা পূর্বসাগরপ্রান্তবাসীর হাওয়ায় হাওয়ায় সনসন সাপ-খেলাবার বাঁশি-বাজানো—এই আশ্চর্য চিত্রকল্পগুলি কত সহজে এক একটি বাক্যে স্তবকে কয়েকটি বৃষ্টিবিন্দুর মত চরণে ঝরে ঝরে পড়েছে।

আসন্ন আষাঢ়ের ছায়াধূসর গোধূলি, অমারাত্রির কান্নাভরা প্রহর, আষাঢ়ের পূর্ণিমা, শ্রাবণের পূর্ণিমা, মেঘাবৃত স্বপ্নমেদুর শ্রাবণদিন, বৃষ্টিক্লান্ত প্রভাত —বর্ষার নানা সময়ের অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের বর্ষাসংগীতগুলি থেকে সংকলন করা যেতে পারে। অনেকগুলি গানে পদাবলীর অভিসারের ইঙ্গিত আছে। এই অভিসারের পরিবেশ কখনও শ্রাবণতমসার নিবিড় শর্বরীতে, কখনও ব্যর্থ দিবাভিসারের কল্পনাও সেখানে আছে, যদিও নায়কনায়িকার চিত্রপট স্পষ্ট নয়। 'মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম' কিংবা 'বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে এসেছি তোমারই দ্বারে' এগুলি এক হিসাবে অভিসারেরই পদ, যদিও পদাবলীর মত অভিসারের স্বকীয়া-পরকীয়া লক্ষণ রবীন্দ্রনাথের কাছে তত্ত্বগতভাবে প্রাধান্য লাভ করেনি। এই অভিসার কখনও লোকায়ত প্রেমের দিক থেকে ঘটেছে, কখনও প্রিয়তম অর্থে ঈশ্বরও কবির অভিপ্রেত হয়ে উঠেছে। 'আমারে যদি জাগালে আজি নাথ', 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার', 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' এই গানগুলি বর্ষাভুক্ত হলেও গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য পর্বের ভক্তি ও আত্মনিবেদনের সুরে রণিত। 'উতল ধারা বাদল ঝরে' গানটিতে বর্ষার ঋতু-চিত্রটির অন্তরালে প্রতীক্ষমান নায়কের কাছে বঁধুবেশে আগত

প্রেমিকাকে লোকায়ত প্রেমের অধীশ্বরী বলে গ্রহণ করা যায় না। অন্তত অচলায়তন নাটকে দর্ভকদের কণ্ঠে যোজিত এই গানটি ভিন্নতর উদ্বর্তিত কোনো গভীর সংকেতের দিকেই আমাদের আকৃষ্ট করে—

ভুলে গিয়ে জীবনমরণ লব তোমায় করে বরণ—
করিব জয় শরমত্রাসে, দাঁড়াব আজ তোমার পাশে—
বাঁধন বাধা যাবে জলে, সুখদুঃখ দেব দলে,
ঝড়ের রাতে তোমার সাথে বাহির হব অভয় ভরে।

'আজ কিছুতেই যায না মনের ভার' ব্যর্থ দিবাভিসারের গান। 'তিমির-অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি' গানে অভিসারিকার মূর্তি স্পষ্ট এবং কবির মিলনোৎকণ্ঠাও তীব্র। 'মম মন-উপবনে চলে অভিসারে' পদাবলীর মানসঅভিসারকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'শাঙন-গগনে ঘোর ঘনঘটা' তো পদাবলীর রাধারই অভিসার-প্রস্তুতি। 'স্বপ্নে আমার মনে হল কখন ঘা দিলে আমার দ্বারে' গানটিও ব্যর্থ নৈশাভিসারের উদাহরণ।

কিন্তু বর্ষার গানের ঐশ্বর্য অসীম বিরহানুভূতিতে, কবির নিবিড় নিঃসঙ্গতা-বোধে, অতীতস্মৃতির উন্মথিত বেদনায় ও অনন্তবিচ্ছিন্না মানসসুন্দরীর সঙ্গে নিরুপায় মিলনের নির্নিমেষ উৎকণ্ঠায়। এই গানগুলিই কবির বর্ষাসংগীতের প্রতিনিধিমূলক গান, এইগুলি তাঁর হৃদয়ের নিভৃত রহস্যান্ধকার গোপন অন্তঃপুর থেকে উৎসারিত। তাঁর সমগ্র জীবনের কম্পমান স্মৃতির সূক্ষ্ম তারের ছোঁওয়ায় সুরের তলদেশ দিয়ে যেন বেদনার শীতল বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেছে। পল্লব-মর্মরের মত ম্লান স্মৃতির বাণীগুলি বৃষ্টির শীকরকণায় সিক্ত, সজল হাওয়ায় দোলায়িত হয়ে তাঁর বক্ষের নিকটে অসহায় দুঃখে হা-হা করে গেছে। স্মৃতিমন্থর দিবাবসানে বৃথা আশ্বাসে কবি প্রতীক্ষা করেছেন দূরকাল থেকে যদি তাঁর দুখরজনীর সাথী সহসা এই বহুযুগের ওপার-থেকে-আসা বর্ষাধারার জলে মিশে এসে দাঁড়ায়! মিলনের বৃথা প্রত্যাশায় মায়াবিনী শ্রাবণসন্ধ্যা ছলনা করে গেছে, পথ-চাওয়া বাতি তবু 'ব্যাকুলিছে শূন্যেরে কোন প্রশ্নে।' স্বপ্নপ্রদোষ থেকে উঠে-আসা ব্যর্থ প্রেমের স্মৃতি, অকৃতার্থ অতীতের তৃষ্ণাতুর ছায়া-মূর্তিগুলি পিছুডাকা অক্লান্তআগ্রহে কবির সম্মুখের পথে অস্তশিখরের দীর্ঘছায়া বিস্তীর্ণ করে দিয়েছে, মরণের অধিকার থেকে যত তাঁর বেদনার ধনগুলি, কামনার রঙিন ব্যর্থতাগুলি হরণ করে এই বেলাশেষের বৃষ্টিসিক্ত গানগুলির সজল পল্লবের উপর ছড়িয়ে দিয়েছে। কখনও এই স্মৃতিবেদনার প্রান্তসীমাটিকে

এই জীবনের সূচনা কাল থেকে মুছে দিয়ে কবি নিয়ে গেছেন যুগান্তে, বহুযুগের ওপারে, যেখানকার আষাঢ়ে মালবিকার অনিমিখ দৃষ্টি আজও জেগে থাকে, যেখানকার কুঞ্জকুটিরে ভাবাকুললোচনার ভূর্জপাতায় নবগীত রচিত হয়, সেই চিরদিনের বিরহিণীর কুঞ্জবনস্পর্শী চিরন্তন এক কালে। এই যুগান্তরের স্মৃতিবেদনায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কালিদাসের সংযোগসেতু স্থাপিত হয়েছে। 'আজ আকাশের মনের কথা ঝরঝর বাজে' গানে 'বাতাস বহে যুগান্তরের প্রাচীন বেদনা যে' কবির এক জাতীয় স্থির শিল্পবিশ্বাসের পরিচায়ক। 'বহুযুগের ওপার হতে আষাঢ় এল' এই প্রসঙ্গের সুপরিচিত গান। 'আজি হৃদয় আমার যায় যে ভেসে' গানে যে অমূলক বিরহ, অকারণ বেদনা, নিরুদ্দেশ ব্যাকুলতার আভাস পাই, তা রোমান্টিকতার স্বভাবলক্ষণ মাত্র। 'আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে আমার মনে' গানও এই জাতের। কিন্তু যথার্থ বর্ষাবিরহ কালচিহ্নহীন অতীতে নয়, এই জন্মে। কল্পনার অভিসার সুদূর তেপান্তরে নয়, ব্যর্থ অভিসার আপনারই অনায়ত্ত অতীতে, যৌবনের পুঞ্জিত স্মৃতিলোকে। শ্রাবণমেঘের খেয়াতরীর মাঝির কাছে কবির স্বীকৃতিতে কোথাও কোনো দ্বিধা নেই, সংকোচ নেই, সংশয় নেই—

ভোরবেলা যে খেলার সাথি ছিল আমার কাছে,
মনে ভাবি তার ঠিকানা তোমার জানা আছে।
তাই তোমারই সারিগানে সেই আঁখি তার মনে আনে,
আকাশভরা বেদনাতে রোদন উঠে বাজি।

কতবার কম্পিত বক্ষে অসম্ভব কল্পনায় অমূলক প্রত্যাশায় কবি তার ছায়ামূর্তি খানিকে সত্য বলে মনে করেছেন ব্যাকুল বাদল সাঁঝের বৃষ্টিকাতর মুহূর্তে—

কোন দূরের মানুষ যেন এল আজ কাছে,
তিমির-আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে।
বুকে দোলে তার বিরহব্যথার মালা,
গোপন-মিলন-অমৃতগন্ধ-ঢালা।
মনে হয় তার চরণের ধ্বনি জানি—
হার মানি তার অজানা জনের সাজে।

হার মানতেই হয়েছে কবির, কারণ যার চিরবিচ্ছেদবেদনার মালায় চিরমিলনের আশ্বাসের গোপন সুগন্ধ, 'সেই তুমি মূর্তিতে দিবে কি ধরা' এই প্রশ্ন সোনার তরীর মানসসুন্দরীতেই জেগেছিল কবির মনে। এখন 'বাদল-

দিনের দীর্ঘশ্বাসে জানায় আমায় ফিরবে না সে'। 'আমি তারে যে চাই'— সুরে সুরে গানে-শ্লোকে-শোকে বৃষ্টিজলে-অশ্রুজলে শতবার বললেও, 'শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ণ সন্ধ্যায়' গানে কবি নিজেই বলেছেন—

হায় জানি সে নাই জীর্ণ নীড়ে, জানি সে নাই নাই
তীর্থহারা যাত্রী ফিরে ব্যর্থ বেদনায়—

তবু গান থাকে, তবু 'তারায় তারায় রবে তার বাণী, কুসুমে ফুটিবে প্রাতে', তবু 'বীণাবাদিনীর শতদলদলে করিছে সে টলোমল'। 'ফিরবে না তা জানি' বলেও কবিকে গাইতে হয় 'আহা তবু তোমার পথ চেয়ে জ্বলুক প্রদীপখানি'। বলতে হয়

ডাকে তবু হৃদয় মম মনে-মনে রিক্ত ভুবনে
রোদন-জাগা সঙ্গীহারা অসীম শূন্যে শূন্যে।

সেই বৃথাপ্রত্যাশার স্বপ্নসংগীত বিহ্বল আত্মবিস্মৃত বেদনায করুণ অপরূপ হয়ে উঠেছে 'আমি শ্রাবণ-আকাশে ঐ দিযেছি পাতি' গানে। রক্তাশ্রুকাতর বিলাপের ও স্বপ্নভঙ্গের সান্ত্বনাহীন আর্তনাদের পূর্বমুহূর্তটি কী অবিশ্বাস্য কল্পনায় রোমাঞ্চিত হযে উঠেছে 'এসো গো জ্বেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি বিজন ঘরের কোণে' এই গানে। এই বিপুল গীতসংগ্রহ অবলম্বন করে রবীন্দ্রকবিমানসের কোন নিভৃত অন্তঃপুরে প্রবেশ করা যায়। কত বিচিত্র আবেগ ও কাব্যসৌন্দর্য, কত সুরের সোহাগ এগুলির স্তরে স্তরে লগ্ন হযে আছে উদ্‌ঘাটনের ও বিশ্লেষণের প্রতীক্ষায়।

এক হিসাবে বর্ষাসংগীত বর্ষামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত হলেও কতকগুলি বর্ষার গানে কবি বর্ষাকে ঋতুহিসাবে অভ্যর্থনা করেছেন, প্রাচীন ভারতের ঋতুসম্বর্ধনার ভঙ্গিটি আত্মসাৎ করে উৎসবের বাঁশরিতে বাজিয়ে তুলেছেন। বর্ষাঋতুর পরিবেশবর্ণনা ছাড়াও এই গানগুলিতে একটি সামাজিক উৎসবের আয়োজন-সমারোহ, বরণ ও প্রত্যুদ্‌গমনের অভিনব প্রযোজনা প্রকাশ পেয়েছে। বাঙলাদেশে বর্ষামঙ্গল উৎসবকে একালে রবীন্দ্রনাথই আমাদের জাতীয় জীবনের ছন্দে ও সাংস্কৃতিক সম্পদে অপরিহার্য করে তুলেছেন। তেমনি করে শেষ বর্ষণ ব্যাপারটিকেও তিনি একটি উৎসবের রূপ দান করেছেন। 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে' কল্পনার বর্ষামঙ্গল কবিতাটিকে সুরারোপিত করে তিনি এই বর্ষামঙ্গলের উদ্বোধনী সংগীতে পরিণত করেছেন। তাছাড়া 'এসো শ্যামল সুন্দর', 'এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে', 'ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে', 'নমো

নমো নম', 'তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসের বর্ষণে', 'এসো হে এসো সজলঘন', 'কোন পুরাতন প্রাণের টানে', 'আবার এসেছে আষাঢ়', 'আষাঢ় কোথা হতে আজ', 'আহ্বান আসিল মহোৎসবে' প্রভৃতি গানগুলি বিশেষভাবে বর্ষামঙ্গলগীতি হয়ে উঠেছে। 'শ্যামলছায়া নাইবা গেলে', 'বাদলধারা হল সারা', 'একলা বসে বাদলশেষে', 'শ্যামল শোভন শ্রাবণ তুমি', 'শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার আভাস পেলে','কেন পান্থ এ চঞ্চলতা', 'থামাও রিমিকি ঝিমিকি বরিষণ' প্রভৃতি গানে বর্ষাবিদায়ের বিশেষ কালটির স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনা পাওয়া যায় বলে এগুলিকে শেষ বর্ষণের গান বলা যেতে পারে। ১৩৩২ সালে কবি যে শেষ বর্ষণ পালা রচনা করেছিলেন, তার সব কটি গান অবশ্য বর্ষণাবসানকালের সংকেতবহ ছিল না। কিন্তু বর্ষাশেষের সুরটি তাতে মধুর হযে বেজেছে। বর্ষা শেষ হয শরতে, কারণ 'সাজবে বাদল সোনার সাজে আকাশ মাঝে কালিমা ওর ঘুচিয়ে ফেলে'-এই তত্ত্বেই শেষ বর্ষণের সুর মিলে গেছে শরতের গানে। নটরাজ ঋতুরঙ্গশালাতেও কবি এই বলে বর্ষার পালাগান শেষ করেছিলেন—

শ্রাবণ সে যায় চলে পান্থ কৃশতনু ক্লান্ত
উড়ে পড়ে উত্তরীপ্রান্ত উত্তর-পবনে।
যূথীগুলি সকরুণ গন্ধে আজি তারে বন্দে,
নীপবন মর্মর ছন্দে জাগে তার স্তবনে।
শ্যামঘন তমালের কুঞ্জে পল্লবপুঞ্জে
আজি শেষ মল্লারে গুঞ্জে বিচ্ছেদগীতিকা,
আজি শেষ বর্ষণরিক্ত নিঃশেষবিত্ত,
দিল করি শেষ অভিষিক্ত কিংশুকবীথিকা।

বর্ষাসংগীতগুলির মধ্যে কবির সুদীর্ঘ কবিজীবনের যে বেদনা ও পুলক, দীর্ঘশ্বাস ও উল্লাস, তত্ত্ব ও কল্পনা স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হযে আছে, বস্তুত নির্দিষ্ট শ্রেণীতে তার পরিমাপ করা যায় না। কোনো গানে বৃন্দাবনের অভিসারসজ্জায় শ্রীরাধার প্রস্তুতি, আবার তারই পাশে নিদ্রামগন কোন এক শ্রাবণরাতের আকস্মিক বৃষ্টিধারায় কবির 'দেহের সীমা গেল পারায়ে' এই আশ্চর্য অনুভূতি—কোন সূত্রে এই দুইকে মেলানো যাবে? 'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে' গানটিতে অভিসারিকা কেয়ার রূপকল্পটি আষাঢ়ের অবৃষ্টিসংরক্ত সন্ধ্যার শিরায় কম্পন তোলে। 'ওগো সাঁওতালি ছেলে', 'আজি পল্লীবালিকা অলকগুচ্ছ সাজালো' 'কাঁপিছে দেহলতা থরথর', 'ওগো তুমি

পঞ্চদশী', 'মধুগন্ধে-ভরা', 'আমার প্রিয়ার ছায়া' প্রভৃতি গানগুলিতে পূর্বালোচিত পর্যায়-বৈশিষ্ট্য থাকলেও স্বতন্ত্র সৌন্দর্যে এগুলি বিচিত্র রসানুভূতির সৃষ্টি করে।

১৩৪১ সালের শ্রাবণে 'শ্রাবণগাথা' নামে কবি একটি পালা রচনা করেন। পূর্বোক্ত শেষ বর্ষণ এবং শ্রাবণগাথা কবির নটরাজ ঋতুরঙ্গশালারই সম্প্রসারণ, ঋতুবিশেষের উপর নাট্যাভাস ও গীতোৎসব। উভয় পালাতেই নটরাজ রাজসভায় ঋতুর নৃত্যগীতময় উৎসবের প্রযোজক, উভয় পালাতেই ভাষাগত ঈষৎ সাদৃশ্য আছে। শেষ বর্ষণের তুলনায় শ্রাবণগাথা অবশ্য শ্রাবণের গানেই পূর্ণ, শরতের উল্লেখমাত্রে সমাপ্ত। রাজা নটরাজ সভাকবিদের সংলাপের মধ্য দিয়ে দুই পালা থেকে কবির একাধিক বর্ষাগীত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত রসঘন ভাষ্য-টীকা-মন্তব্য সংগ্রহ করা যায়।

৬

শরৎ রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রিয় ঋতু, শারদোৎসবের তত্ত্বের আলোচনায় শরতের প্রতি কবির পেলব দুর্বলতার পরিচয় অবিস্মরণীয় ভাষায় মুদ্রিত আছে। জীবনস্মৃতির বর্ষা ও শরৎ অধ্যায়ে, পরিচয় গ্রন্থের শরৎ প্রবন্ধে, শেষ বর্ষণ পালায়, বিসর্জন ও ডাকঘর নাটকেও শরতের সোনার ছবিটি অপরূপ হয়ে জেগেছে। মাটির পৃথিবীর উপর এই ক্ষণিকের অতিথি তার স্বল্পাবকাশের স্বর্ণরৌদ্ররেখা এঁকে ও শিশিরশিহর তৃণাঞ্চলে এক মুঠো শিউলিফুল ছড়িয়ে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ধরা পড়ে গেছে সোনার বাঁধনে, ছুটির নেশায়, ঋণশোধের তত্ত্বে, গানের সুরে। শরতের সুনীল নিরভ্র আকাশপটে যখন বাঙালি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসবের বাঁশি বাজে, তখন কবিও সেই আগমনী-বিজয়ার হাসিকান্নার পালাটিকে নিবিড় করে গ্রহণ করেছেন। কড়ি ও কোমলের যুগ থেকে জীবনের শেষ বিদায়ের কাল পর্যন্ত কবির গানে কতবার শরতের ঘর-ছাড়ানো ডাক, কাজ-খোয়ানো সুর বাজল।

গীতবিতানে শরতের গীতসংখ্যা ৩০টি, অন্যান্য পর্যায়ের গানেও শরতের রৌদ্রাভা পড়েছে বৃষ্টিবিধৌত প্রভাতের মত। 'যে ছায়ারে ধরব বলে করেছিলেম পণ', 'আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল', 'ছুটির বাঁশি বাজল যে ঐ নীল গগনে', 'সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে', 'আরো কিছুক্ষণ না হয় বসিয়ো পাশে', 'আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা', 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী', 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না', 'আহা

জাগি পোহাল বিভাবরী', 'তবু মনে রেখো', 'হে ক্ষণিকের অতিথি', 'সকাল-বেলার আলোয় বাজে', 'কেন আমায় পাগল করে যাস', 'সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায়', 'তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে', 'তুমি উষার সোনার বিন্দু প্রাণের সিন্ধু-কূলে', 'আমারে ডাক দিল কে ভিতর-পানে', 'জানি হল যাবার আয়োজন'—এই গানগুলি প্রেমপর্যায়ের বা বিচিত্র পর্যায়ের অন্তর্গত হলেও প্রতিটি গানের বাতাবরণে শরতের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। প্রেমপর্যায়ের আর একটি গান 'ওকে বাঁধিবি কে রে হবে যে ছেড়ে দিতে' শরতেরই অন্তর্গত, কারণ নটরাজ ঋতুরঙ্গশালায় 'শাস্তি' শিরোনামে এই গানটি শরতের গানরূপেই চিহ্নিত, অবশ্য নটরাজে গানটির পাঠ ঈষৎ পরিবর্তিত। নটরাজের পাঠ—

পাগল আজি আগল খোলে বিদায়রজনীতে,
চরণে ওর বাঁধিবি ডোর, কী আশা তোর চিতে।

গীতবিতানের পাঠ—

ওকে বাঁধিবি কে রে হবে যে ছেড়ে দিতে
ওর পথ খোলে যে বিদায়রজনীতে।

অন্যান্য চরণেও পাঠের সামান্য পরিবর্তন আছে, তবে অর্থের পরিবর্তন ঘটেনি। নটরাজ পালায় পাগল নিঃসন্দেহে বর্ষা, বর্ষামঙ্গল কবিতায় যাকে সম্বোধন করে লিখেছিলেন, 'ওগো সন্ন্যাসী কী গান ঘনালো মনে'। বর্ষা-পাগলের বিদায় আসন্ন, প্রভাত-রাগিণীতে এখন শরতের আগমনী, 'শিশিরে-ভরা শিউলি-ঝরা গীত' (গীতবিতানের পাঠ, 'শিশিরে-ভরা সেঁউতি-ঝরা গীত')। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য পূজাপর্যায়ের 'এই যে তোমার প্রেম ওগো হৃদয়হরণ' গানটিও শরতের আলোকিত প্রভাতের পটে স্থাপিত।

শরতের গানগুলি অত্যন্ত শুভ্র-কোমল, বিষণ্ণমধুর, ক্ষণরসময, শরৎ-প্রাতের রৌদ্রপায়ী শিশিরের মত, ঝরা শেফালির মত। সকালের রাগিণীতে কেমন কান্নার-মীড়-দেওয়া এর সুরগুলি, গতায়ু আনন্দের জন্য ধাবমান দীর্ঘশ্বাস এর ভাষায় নিহিত। শরতের শেফালিবনের মর্মের কামনাখানিকে উজাড করে, ম্লান বিষণ্ণতার রৌদ্রাশঙ্কা থেকে শিশিরকে মুক্ত করে কবি তাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর গানে। শরতের স্বর্ণরৌদ্রপ্লাবিত প্রভাতের আলোর কমলখানি ফুটিয়ে তোলা ও ঝরিয়ে-দেওয়ার লীলাসূত্রে-গাঁথা যে উৎসবের ছায়া শুভ্র মেঘচুম্বিত নীলাকাশে ছড়িয়ে যায়, শঙ্খধবল কাশের বনে যে উৎসবের আগমনী বাজে, জলভারাবনত নদীস্রোতে যে উৎসবের সোনার তরীতে

প্রবাসী ঘরে ফিরে আসে ছুটির নিমন্ত্রণে, সেই উৎসবের বোধন ও বিজয়া এই স্বল্পসংখ্যক শরৎসংগীতে সকরুণ বেণুতে শোনা যায়। বাঙালির আগমনী-বিজয়া গানগুলি রবীন্দ্রনাথের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কল্পনা কাব্যের বিখ্যাত 'শরৎ' কবিতার শারদলক্ষ্মী কুন্দধবলা সুখসমুজ্জ্বলা সুমঙ্গলা দশভুজারই আদর্শায়িত রূপ মাত্র। আকাশবীণার তারে তারে তাঁর আগমনী বাজে, শিউলিতলার পাশে পাশে ঝরা পুষ্পরাজির উপর শিশিরসিক্ত তৃণের পরে তাঁর অরুণরাঙা চরণ পড়ে, কাশের গুচ্ছ শেফালিমালা ও নবীনধানের মঞ্জরী দিয়ে তাঁর ডালা সাজিয়ে তুলতে হয়। শারদোৎসবের সন্ন্যাসী শারদোৎসবের আবাহনগান 'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ' গানের পর বলেছিলেন—

"পৌঁচেছে, তোমাদের গান আজ একেবারে আকাশের পারে গিয়ে পৌঁচেছে। দ্বার খুলেছে তাঁর। দেখতে পাচ্ছ কি শারদা বেরিয়েছেন? দূরে দূরে, সে অনেক দূরে, বহু বহু দূরে। সেখানে চোখ যে যায় না! সেই জগতের সকল আরম্ভের প্রান্তে, সেই উদয়াচলের প্রথমতম শিখরটির কাছে! যেখানে প্রতিদিন উষার প্রথম পদক্ষেপটি পড়লেও তবু তাঁর আলো চোখে এসে পৌঁছয় না, অথচ ভোরের অন্ধকারের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে—সেই অনেক অনেক দূরে। সেইখানে হৃদয়টি মেলে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকো, ধীরে ধীরে একটু একটু করে দেখতে পাবে।"

এরপর আগমনীর গান 'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া' এবং বরণের গান 'আমার নয়ন-ভুলানো এলে'। নাটকে এই বরণ কেবল শরৎ-বরণ নয়, শেষ পর্যন্ত বিজয়াদিত্যকে বরণে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সে তো রূপকচ্ছলে। 'রাজা হতে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই'—বিজয়াদিত্য সেই অর্থে রাজর্ষি। আর শরৎও তাই। শরতের মধ্যেও প্রাকৃত সন্ন্যাসের মাঝখানে পূর্ণতার সম্পদ। শরতের দিক থেকে দেখলে গানের উদ্দিষ্টা শারদলক্ষ্মী—আলোছায়ার আঁচল এবং সোনার নূপুরই তার প্রমাণ। 'লক্ষ্মী যখন মানবের মর্তলোকে আসেন তখন দুঃখিনী হয়েই আসেন; তাঁর সেই সাধনার তপস্বিনী বেশেই ভগবান মুগ্ধ হয়ে আছেন—শত দুঃখেরই দলে তাঁর সোনার পদ্ম সংসারে ফুটে উঠেছে।'

পরিচয় গ্রন্থের 'শরৎ' প্রবন্ধে শারদীয়া দশভুজার রূপকল্পটি মৃত্তিকার মৃন্ময়ী প্রতিমা রূপে দেখা দিয়েছে—

"মাটির কন্যার আগমনী গান এই তো সেদিন বাজিল। মেঘের নন্দীভৃঙ্গী শিঙা বাজাইতে বাজাইতে গৌরী শারদাকে এই কিছুকাল হইল ধরাজননীর কোলে রাখিয়া গেছে। কিন্তু বিজয়ার গান বাজিতে তো আর দেরি নাই; শ্মশানবাসী পাগলটা এল বলিয়া, তাকে তো ফিরাইয়া দিবার জো নাই; হাসির চন্দ্রকলা তার ললাটে লাগিয়া আছে। কিন্তু তার জটায় জটায় কান্নার মন্দাকিনী"।

যেন এর পরেই শোনা যাবে—

কোন খেপা শ্রাবণ ছুটে এল আশ্বিনেরই আঙিনায়
দুলিয়ে জটা ঘনঘটা পাগল হাওয়ার গান সে গায়।

বাঙলার লোকসংগীত গ্রাম্য সংগীতের আলোচনায় আগমনী-বিজয়া গান-গুলিকে কবি 'বাঙালির মাতৃহৃদয়ের গান' বলেছিলেন। তাঁর ভাষায়, "আমাদের এই ঘরের স্নেহ ঘরের দুঃখ বাঙালির গৃহের এই চিরন্তন বেদনা হইতে অশ্রুজল আকর্ষণ করিয়া বাঙালির হৃদয়ের মাঝখানে শারদোৎসব পল্লবে ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।" আগমনী-বিজয়ার শাস্ত্রীয় রূপটুকু বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের গানেও এই দুই শব্দের তাৎপর্য আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু প্রকৃতির বর্ষণক্লান্ত হিরণ্যপ্লাবিত আলোকপটে শারদসুন্দরীর সোনার নূপুর-ঝংকৃত লীলাচরণটি তিনি আগমনী সুরেই বাজিয়েছেন আর 'আমার ছুটি ফুরিয়ে গেল কখন অন্যমনে' এ সুরই তো বিজয়ার। 'সকালবেলার আলোয় বাজে বিদায়ব্যথার ভৈরবী' বা 'হে ক্ষণিকের অতিথি'—নবমী নিশি না-পোহানোর আবেদনের চেয়ে কি কম করুণ? শাক্ত পদকর্তা গোবিন্দ চৌধুরীর একটি পদে উমার আগমনসম্ভাবনায় ব্যাকুলা জননী মেনকা বলেছিলেন, শেফালিকা এল উমার বর্ণ মাখি।' আর কবির শারদলক্ষ্মীও 'শেফালিবনের মনের কামনা'। গৃহবাসিতা মেনকার চোখে উমার প্রথম অভ্যুদয়টি শাক্ত কবি কমলাকান্ত স্বপ্নে ব্যঞ্জিত করেছেন, 'আমি কী হেরিলাম নিশি স্বপনে'। কবিও তাঁর নয়ন-ভুলানো শরৎকে দেখেছেন মানসপটে—'আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে'। প্রায়শ্চিত্ত নাটকের 'সারা বরষ দেখিনে মা' গানটি আগমনী পর্যায়ভুক্ত হওয়ারই যোগ্যতা রাখে। পিতৃগৃহে-আগত পার্বতীকে দেখে মেনকা যেমন মাতৃস্নেহে বিগলিত হয়েছিলেন, তেমনি কন্যায় ঐশ্বর্যরূপ দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। দাশরথি রায় লিখেছেন—

এমন রূপ দেখি নাই কারো মনের অন্ধকার
হরে মা, তোর হর-মনোমোহিনী।

এই মুগ্ধ বিস্ময়ের রূপাহৃত গীতার্ঘ্য—'দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী-বাওয়া'। কবির শরৎও চলে যায় উমার মত, ক্ষণিকের অতিথি আসে 'কার বিষাদের শিশিরনীরে' স্নান করে। তাই ঋতুরঙ্গশালার 'শরতের বিদায়' কবিতায় আছে—

কেন গো যাবার বেলা
গোপনে চরণ ফেলা,
যাওযার ছায়াটি পড়ে যে হৃদয় মাঝে,
অজানা ব্যথার তপ্ত আভাস রক্ত আকাশে বাজে
সুদূর বিরহতাপে
বাতাসে কী যেন কাঁপে,
পাখির কণ্ঠ করুণ ক্লান্তি-ভরা,
হারাই হারাই মনে করে তাই সংশয়-ম্লান ধরা।

শেষ বর্ষণ গীতিনাট্যে রাজা নটরাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'শরৎলক্ষ্মীর সহচরটি এরই মধ্যে চঞ্চল হযে উঠলেন কেন? উত্তরে নটরাজ রাজাকে বলেছিলেন—

"শিশির শুকিয়ে যায়, শিউলি ঝরে পড়ে, আশ্বিনের সাদা মেঘ আলোয় যায় মিলিয়ে। ক্ষণিকের অতিথি স্বর্গ থেকে মর্তে নেমে আসেন। কাঁদিয়ে দিয়ে চলে যান। এই যাওয়াআসায় স্বর্গমর্তের মিলনপথ বিরহের ভিতর দিয়ে খুলে যায়"।

লক্ষণীয় যে শরতের বর্ণনায় এখানে একটি নতুন সুর লেগেছে, বিরহের সুর। শারদোৎসবে এই বিরহের আভাস ছিল না। ১৩১৫ সালের শারদোৎসবে ১৩২৮ সালে লাগল বিরহতত্ত্বের আভাস। পরিচয় গ্রন্থের 'শরৎ' (১৩২২) প্রবন্ধ ফাল্গুনীর এক বৎসর পরে লেখা। তার মধ্যে ফাল্গুনীর তত্ত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে—

"আমাদের শরতে বিচ্ছেদবেদনার ভিতরেও একটা কথা লাগিয়া আছে যে, বারে বারে নূতন করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই চলিয়া যায়—তাই ধরার আঙিনায় আগমনী গানের আর অন্ত নাই। যে লইয়া যায় সেই

আবার ফিরাইয়া আনে। তাই সকল উৎসবের মধ্যে বড় উৎসব এই হারাইয়া ফিরিয়া পাওয়ার উৎসব"।

কড়ি ও কোমলের 'আজি শরত-তপনে প্রভাত স্বপনে কী জানি পরাণ কী যে চায়' এই বিরহের গানটি তাই নতুন করে শারদোৎসবের নাট্যরূপান্তর ঋণশোধে স্থাপিত হয়েছে। ঋণশোধে আরও পাই—

হৃদয়ে ছিল জেগে দেখি আজ শরত-মেঘে।
কেমনে আজকে ভোরে গেল গো গেল সরে
তোমার ঐ আঁচলখানি শিশিরের ছোঁওয়া লেগে।
কী-যে গান গাহিতে চাই বাণী মোর খুঁজে না পাই।
সে যে ওই শিউলিদলে ছড়ালো কাননতলে,
সে যে ওই ক্ষণিক ধারায় উড়ে যায় বায়ুবেগে।

এও সেই 'হারাইয়া ফিরিয়া পাওয়ার উৎসবে'র গান। শরতের বর্ণনায় জীবনস্মৃতিতে কবি লিখেছিলেন—

"এই শরৎকালের মধুর উজ্জ্বল আলোকটির মধ্যে যে উৎসব তাহা মানুষের। মেঘরৌদ্রের লীলাকে পশ্চাতে রাখিয়া সুখদুঃখের আন্দোলন মর্মরিত হইয়া উঠিতেছে, নীল আকাশের উপরে মানুষের অনিমেষ দৃষ্টির আবেশটুকু একটা রং মাখাইয়াছে, এবং বাতাসের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাবেগ নিশ্বসিত হইয়া বহিতেছে।"

জীবনস্মৃতির মৃত্যুশোক অধ্যায়ে যে প্রিয়জনবিচ্ছেদের দুর্বিষহ শোক-বেদনার উল্লেখ আছে, যে মৃত্যুশোকস্মৃতি 'তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদ-শোকের সহিত মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে', সেই প্রচণ্ড ভয়ংকর আঘাতের নৈদারুণ্যে কিছুকাল অভিভূত হলেও ধীরে ধীরে একটি তত্ত্বে এসে শোকের পরিণতি ঘটল—"সংসারের বিশ্বব্যাপী অতি বিপুল ভার জীবন-মৃত্যুর হরণপূরণে আপনাকে আপনি সহজেই নিয়মিত করিয়া চারিদিকে কেবলই প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে"। বৈরাগ্যের ভিতর দিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য আরও রমণীয় হয়ে উঠেছিল, আলোকিত নীল আকাশের মধ্যে গাছপালার আন্দোলন অশ্রুধৌত চক্ষে ভারি একটি মাধুরী বর্ষণ করল। মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের এই মনোহর ছবিরচনার বাসনাই 'প্রাণ' কবিতার প্রেরণা—'জীবন্ত হৃদয়মাঝে যদি স্থান পাই।' আমাদের মনে হয় এই অনুভূতি ও প্রত্যয় বিশেষভাবে শরৎকালেই ঘটেছিল 'এ যেন আবার একটা

ছুটির পালা'। এই শরৎকাল থেকেই কবির সংগীত সেই বিচ্ছেদের বিদারণ-রেখাটিকে স্মরণের সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতে সুরু করেছে। কবি নিজেই বলেছেন—

"আমি যে সময়কার কথা বলিতেছি সে সময়ের দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই, তখন শরৎঋতু সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তখনকার জীবনটা আশ্বিনের একটা বিস্তীর্ণ স্বচ্ছঅবকাশের মাঝখানে দেখা যায়—সেই শিশিরে ঝলমল-করা সরস সবুজের উপর সোনা-গলানো রৌদ্রের মধ্যে মনে পড়িতেছে, দক্ষিণের বারান্দায় গান বাঁধিয়া তাহাতে যোগিয়া সুর লাগাইয়া গুনগুন করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছি সেই শরতের সকালবেলায়—আজি শরত-তপনে প্রভাত-স্বপনে কী জানি পরান কী যে চায়।

বেলা বাড়িয়া চলিতেছে—বাড়ির ঘণ্টায় দুপুর বাজিয়া গেল—একটা মধ্যাহ্নের গানের আবেশে সমস্ত মনটা মাতিয়া আছে। কাজকর্মের কোনো দাবিতে কিছুমাত্র কান দিতেছি না, সেও শরতের দিন—

হেলাফেলা সারাবেলা এ কী খেলা আপন-সনে।" (বর্ষা ও শরৎ, জীবনস্মৃতি)

মনে হয় দ্বিতীয় গানটি আর এক শরতে রচিত, যদিও উভয় রচনাই কড়ি ও কোমলের অন্তর্গত। 'আজি শরত-তপনে প্রভাত স্বপনে' গানটিতে সদ্যোলব্ধ যে মৃত্যুবেদনার অশ্রু স্মৃতির মর্মরফলকে ক্ষোদিত, 'হেলাফেলা সারাবেলা' গানটিও সেই শ্বেত প্রস্তরেই লেখা হয়েছে—

হেলাফেলা সারাবেলা এ কী খেলা আপন-সনে
এই বাতাসে ফুলের বাসে মুখখানি কার পড়ে মনে।
আঁখির কাছে বেড়ায় ভাসি কে জানে গো কাহার হাসি,
দুটি ফোঁটা নয়নসলিল রেখে যায় এই নয়নকোণে।
কোন ছায়াতে কোন উদাসি দূরে বাজায় অলস বাঁশি,
মনে হয় কার মনের বেদন কেঁদে বেড়ায় বাঁশির গানে।
সারাদিন গাঁথি গান কারে চাহে, গাহে প্রাণ—
তরুতলের ছায়ার মতন বসে আছি ফুলবনে।

তাই কি শরতকে কবি 'গান-পাকানো শরৎ' বলেছিলেন? গীতাঞ্জলির এই গানটি কোন বিরহ-জাগিয়ে-দেওয়া শরৎ?

এই শরৎ-আলোর কমলবনে
বাহির হয়ে বিহার করে যে ছিল মোর মনে মনে।

তারি সোনার কাঁকন বাজে আজি প্রভাত-কিরণ মাঝে,
হাওয়ায় কাঁপে আঁচলখানি—ছড়ায় ছায়া ক্ষণে ক্ষণে।
আকুল কেশের পরিমলে
শিউলিবনের উদাস বায়ু পড়ে থাকে তরুর তলে।
হৃদয়-মাঝে হৃদয় দুলায়, বাহিরে সে ভুবন ভুলায়—
আজি সে তার চোখের চাওয়া ছড়িয়ে দিল নীল গগনে।

শরৎ-প্রভাতে বাঁশির সুর বারবার তাঁর গানে ঘুরে ফিরে এসেছে—কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিল। সে বাঁশিকে সম্বোধন করেই কবি বলেছেন—

যে কথা রয় প্রাণের ভিতর অগোচরে
গানে গানে নিয়েছিলে চুরি করে।

বিদেশী নায়ের এই 'সকরুণ বেণু' শুনেই 'সে সুর বাহিয়া ভেসে আসে কার সুদূর বিরহবিধুর হিয়ার অজানা বেদনা।' এই বাঁশির গোপন বুকে কী কথা আছে তার একটি বিধুর স্বীকৃতি পাই এই গানটিতে—

আমার একটি কথা বাঁশি জানে, বাঁশিই জানে—
ভরে রইল বুকের তলা, কারো কাছে হয়নি বলা,
কেবল বলে গেলেম বাঁশির কানে কানে।
আমার চোখে ঘুম ছিল না গভীর রাতে,
চেয়েছিলেম চেয়ে-থাকা তারার সাথে।
এমনি গেল সারারাতি পাইনি আমার জাগার সাথি—
বাঁশিটিরে জাগিয়ে গেলেম গানে গানে।

গানে গানে যে গোপননিভৃত কথা বাঁশি দিয়েছে প্রচার করে, সেই গানগুলিই শরতের একান্ত-করে পাওয়া গান। তাই শরতের আকাশে 'কাহার চাওয়া এমন করে লাগে আজি আমার নয়নে'। তাই শরত-আলোর কমলবনে বাহির হয়ে বিহার করে যে ছিল মোর মনে মনে'। তাই—

আমি যা দেখিতে চাই প্রাণের মাঝে
সেই মুরতি এই বিরাজে—
ছায়াতে আলোতে আঁচল-গাঁথা
আমার অকারণ বেদনার বীণাপাণি।

এই 'অকারণ বেদনার বীণাপাণি' যে কবির 'পরাণের পদ্মবনে বিরহের বীণাপাণি'রই রূপান্তর, তাতে সন্দেহ নেই।

৭

হেমন্ত ও শীত বাঙলার ঋতুপ্রকৃতিতে যতখানি আসন অধিকার করে আছে, তার চেয়ে বেশি গৌরব কবি এই দুই ঋতুকে দেননি। হেমন্ত স্বল্পায়ু ঋতু, শরৎও তাই। কিন্তু শরতের উৎসব প্রাহ্ণে, হেমন্তের সায়াহ্নে। শরতের আনন্দ নয়নে, হেমন্তের উপলব্ধি দেহে—সে উপলব্ধি কাব্যের নয়, প্রীতিরও নয়। কিন্তু সাহিত্যের প্রেরণা হিসাবে হেমন্ত নিঃসম্বল একথা সত্য নয়। হেমন্ত ও শীত দুই ঋতুর দান আমাদের আহার্য-বিভাগে, ফসলভাণ্ডারে। 'হেমন্তে তাহা মাঠ ভরিয়া প্রবীণ শোভায় পাকে, আর শীতে তাহা ঘর ভরিয়া পরিণত রূপে সঞ্চিত হয়।' ঋতুরঙ্গশালায় এই কারণে হেমন্তকে কবি হেমন্তলক্ষ্মী বলে বর্ণনা করেছেন, তাই তাঁর গান—

নম নম নম
তুমি ক্ষুধার্তজন-শরণ্য
অমৃত অন্ন-ভোগ-ধন্য করো অন্তর মম।

গীতবিতানে হেমন্তের ৫টি এবং শীতের ১২টি গান আছে। অন্যান্য পর্যায়ের গানে এই দুই ঋতুর হিমশৈত্য বিশেষ সঞ্চারিত হয়নি। একাধিক গানে শরতের পরই কবি শীতের উল্লেখ করেছেন হেমন্তকে শীতের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে। যেমন 'তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে' গানে—

লিখন তোমার বিনিসুতোর শিউলিফুলের মালা
বাণী যে তার সোনায়-ছোঁওয়া অরুণ-আলোয়-ঢালা—
এল আমার ক্লান্ত হাতে ফুল-ঝরানো শীতের রাতে
কুহেলিকায় মন্থর কোন মৌন সমীরণে
তখন ছুটি ফুরিয়ে গেছে কখন অন্যমনে।

'কেন আমায় পাগল করে যাস' গানটিতেও উদাস বাতাসে, অধীর পবনে চলে-যাওয়ার-দল—যারা শরতমেঘের ক্ষণিক ধারার মত কবিকে পাগল করে যায়, তাদের সম্বোধন করে কবি গেয়েছেন—

নাগকেশরের ঝরা কেশর ধুলার সাথে মিতা।
গোধূলি সে রক্ত আলোয় জ্বালে আপন চিতা।
শীতের হাওয়ায় ঝরায় পাতা আমলকিবন মরণ-মাতা,
বিদায়বাঁশির সুরে বিধুর সাঁঝের দিগঞ্চল।

'এই কথাটি মনে রেখো তোমাদের এই হাসিখেলায়' গানটিতেও হেমন্ত-শীতের সন্ধ্যাপ্রদীপ হাতে-নেওয়া পাতা-ঝরা সন্ধ্যার ছবি পাওয়া যায়। এই সমস্ত আনুষঙ্গিকের বিচারে 'এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে,' 'যেদিন সকল মুকুল গেল ঝরে', 'দে পড়ে দে আমায় তোরা' প্রভৃতি গানগুলিকে এই দুই ঋতুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে গ্রহণ করা যায়।

নটরাজ ঋতুরঙ্গশালার কবিতা ও গান এবং হেমন্তের অন্যান্য গানে হেমন্তের নারীরূপটি প্রাধান্য পেয়েছে। হেমন্তলক্ষ্মীর বাস সুদূর হিমাচলে, শৈবালবিলগ্ন তিমির গুহাতলে—

যে পথ বাহি বলাকা যায় ফিরে
সৈকতিনী নদীর তীরে তীরে,
সে পথ দিয়ে ধানের খেত ঘিরে
হিমের ভারে চলিবে পলে পলে।
যেতে যে হবে সুদূর হিমাচলে।

কবি এই হেমন্তরানীকে ক্ষণেকতরে ঘরে ডেকে নিতে বলেছেন, বধূদের-জ্বালা সন্ধ্যাপ্রদীপের একটি প্রদীপ তার হাতে দিতে অনুরোধ করেছেন। নটরাজের 'হেমন্ত' কবিতায় হৈমন্তিকার রূপটি ধূসরবিবর্ণ, রুক্ষকেশ দিয়ে ঢাকা তাঁর চোখ, ললাটের চন্দ্রকলা অযত্নম্লান, কুয়াশায় আড়াল-করা তাঁর হাতের সন্ধ্যাদীপখানি, কণ্ঠের বাণীও অশ্রুবাষ্পমাখা, ধূমলহিমের ঘোমটায়-ঢাকা মুখটি তাঁর। কিন্তু তাঁর আরেক রূপ আছে যেখানে দিগঙ্গনার পাত্রটি তিনি ভরে দেন ধরার বৈভবে তণ্ডুলে-শস্যে, সেখানে তিনি অন্নপূর্ণা। গোপন থেকে এই তাঁর পূর্ণতা। দানের আড়ালে দৈন্যের ছদ্মবেশে অন্নপ্রসূ জননী-মূর্তির এই বিবরণ আছে কবির 'হায় হেমন্তলক্ষ্মী তোমার নয়ন কেন ঢাকা' এই গানখানিতে। হেমন্তের আর একটি রূপ আছে 'হিমের রাতে ওই গগনের দীপগুলিরে' গানে, সেখানে তিনি গগনের দীপগুলিকে আঁচল দিয়ে ঢেকে ঘরে ঘরে ডাক পাঠান দীপালিকায় আলো জ্বালাতে—'জ্বালাও আলো আপন আলো সাজাও আলোয় ধরিত্রীরে'। হেমন্তের এই তামসীজয়ের সাধনা। 'হেমন্তে কোন বসন্তেরই বাণী' হেমন্তের পূর্ণিমায় সহসা অকাল-বসন্তের মদির স্পর্শলাভের গান। 'কার মধুর স্মরণখানি পূর্ণশশী ওই-যে দিল আনি'—সৌন্দর্যের গভীরে বিরহের আভাস—রবীন্দ্রসংগীতের এই সাধারণ লক্ষণ এই গানেও আছে।

শীত. স্বভাবতই বসন্তের দৌবারিক—এসেছ শীত গাহিতে গীত বসন্তেরই

জয়। মহুয়ার (১৩৩৬) প্রথম কবিতা 'বোধনেও' এই কথার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। শীতের গানগুলির মধ্যে তাই যৌবনের প্রত্যাশা, বসন্তের ছদ্মবেশ। 'শীত' কবিতায় শীতের প্রতি কবির যে সম্বোধন—

ওগো শীত, ওগো শুভ্র, হে তীব্র নির্মম,
তোমার উত্তরবায়ু দুরন্ত দুর্দম
অরণ্যের বক্ষ হানে। বনস্পতি যত
থর থর কম্পমান। শীর্ষ করি নত
আদেশ-নির্ঘোষ তব মানে। জীর্ণতার
মোহবন্ধ ছিন্ন করো এ বাক্য তোমার
ফিরিছে প্রচার করি জয়ডঙ্কা তব
দিকে দিকে। কুঞ্জে কুঞ্জে মৃত্যুর বিপ্লব
করিছে বিকীর্ণ শীর্ণ পর্ণ রাশি রাশি
শূন্য নগ্ন করি শাখা, নিঃশেষে বিনাশি
অকাল-পুষ্পের দুঃসাহস।

তারই সংগীতরূপ নিবেদিত হয়েছে গানে—

হে সন্ন্যাসী
হিমগিরি ফেলে নিচে নেমে এলে কিসের জন্য
কুন্দমালতী করিছে মিনতি হও প্রসন্ন।
যাহা-কিছু ম্লান বিরসজীর্ণ দিকে দিকে দিলে করি বিকীর্ণ
বিচ্ছেদভারে বনচ্ছায়ারে করে বিষণ্ণ—হও প্রসন্ন।...

শীতের গানে বৈচিত্র্য নেই, কারণ শীতের তত্ত্ব একটাই—সে তত্ত্ব ফাল্গুনী নাটকে, সে তত্ত্ব নটরাজ ঋতুরঙ্গশালায়, সে তত্ত্ব গানের ভাষায় 'মাঘ মরিল ফাগুন হয়ে খেয়ে ফুলের মার গো'। 'ছাড় গো তোরা ছাড় গো' গানটি ফাল্গুনীতে শীতের বিদায়গান, 'আমরা নূতন প্রাণের চর' নবযৌবনের গান, 'আর নাই যে দেরি নাই যে দেরি' আসন্ন মিলনের গানরূপে ফাল্গুনীতে আছে —এইগুলিও শীতের গান। 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' ফসলকাটার গান, রক্তকরবীর মর্মকথা এই গানটিতে নিহিত। 'এল যে শীতের বেলা' গানটি শীতাগমনের একটি হৃদ্য বর্ণনা। 'আয় রে মোরা ফসল কাটি' গানটি আনুষ্ঠানিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং ফসল কাটার কালসংকেতে এটিকেও শীতের উৎসব-সংগীতরূপে গণ্য করা যায়।

৮

১২৮৮ সালের ভাদ্র সংখ্যা ভারতীতে 'বসন্ত ও বর্ষা' নামে কবির একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, পরে সেটি বিবিধ প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রবন্ধে কবি তাঁর প্রথম জীবন থেকেই এই দুই ঋতুর প্রতি গভীর অনুরাগের পরিচয় ব্যক্ত করেছেন—

"বসন্ত উদাসীন গৃহত্যাগী। বর্ষা সংসারী, গৃহী। বসন্ত আমাদের মনকে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। বর্ষা তাহাকে একস্থানে ঘনীভূত করিয়া রাখে। বসন্তে আমাদের মন অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া যায়, বাতাসের উপর ভাসিতে থাকে, ফুলের গন্ধে মাতাল হইয়া জ্যোৎস্নার মধ্যে ঘুমাইয়া পড়ে···বসন্তে বহির্জগৎ গৃহদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আমাদের মনকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যায়। বর্ষায় আমাদের মনের চারিদিকে বৃষ্টিজলের যবনিকা টানিয়া দেয়, মাথার উপরে মেঘের চাঁদোয়া খাটাইয়া দেয়।··· বর্ষাকালে আমাদের 'আমি' গাঢ়তর হয়, আর বসন্তকালে সে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।···বসন্তকালে বিরহিণীর জগৎ অসম্পূর্ণ। বর্ষাকালে আমি আত্মা চাই, বসন্তকালে আমি সুখ চাই। সুতরাং বর্ষাকালের বিরহ গুরুতর। এ বিরহে যৌবন মদন প্রভৃতি কিছু নাই, ইহা বস্তুগত নহে। মদনের শর বসন্তের ফুল দিয়া গঠিত, বর্ষার বৃষ্টিধারা দিয়া নহে। বসন্তকালে আমরা নিজের উপর সমস্ত জগৎ স্থাপিত করিতে চাহি, বর্ষাকালে সমস্ত জগতের মধ্যে সম্পূর্ণ আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহি।"

বসন্ত ও বর্ষা বিষয়ে প্রাগুক্ত প্রবন্ধে কবির মত হয়ত শেষজীবন পর্যন্ত অপরিবর্তিত ছিল না, কিন্তু এই উভয় ঋতু তাঁর কবিজীবনকে কী গভীর লীলা-সূত্রে বেঁধেছিল তার ভূমিকা এখানেই নিহিত। বর্ষা ও বসন্ত এই দুই ঋতুই তাঁর প্রৌঢ় জীবনের গৃহপ্রকোষ্ঠের দুটি বাতায়ন—এই দুই মুক্তিপথ দিয়েই উভয় ঋতুর জলবায়ু এবং স্মৃতিপুঞ্জ অবাধে প্রবেশ করেছে। নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা ঋতুচক্রের আবর্তনাট্য হলেও বসন্তের প্রেরণাই ছিল সেখানে মুখ্য, কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে, দোলপূর্ণিমারাত্রে এর অভিনয় হয়েছিল। আষাঢ় ও ফাল্গুন কবিজীবনে ছিল দুটি গানের মাস, শান্তিনিকেতনে উৎসবের। এই দুই মাস নিরন্তর প্রতিদিনের শিকড় দিয়ে কবিজীবনের মৃত্তিকা থেকে রস সংগ্রহ করেছে, গানের ফুলে-পাতায় তা মেলে ধরেছে সারস্বত পল্লবাগ্রে। মায়ার খেলা, রাজা ও রানী, রাজা, ফাল্গুনী এবং নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা সবই

বসন্তের আবহমণ্ডলে উল্লসিত, শাপমোচনও তাই। যেন বর্ষার চেয়েও মনে হয় তাঁর নাট্যসাহিত্যে বসন্তের অভ্যর্থনা বেশি হয়েছে—ভারতীর বসন্ত ও বর্ষা প্রবন্ধের মতই বলতে ইচ্ছা জাগে যে বসন্তে বহির্জগৎ গৃহদ্বার উদ্ঘাটন করে কবিকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেছে। এ ছাড়াও বসন্ত গীতনাট্য (১৩২৯), মহুয়া কাব্য (১৩৩৬), নবীন গীতনাট্য (১৩৩৭) এই বসন্তেরই জয়গাথা। মহুযা কাব্য প্রসঙ্গে একটি পত্রে কবি লিখেছিলেন—

"পূরবী ও মহুযার মাঝখানে আর একদল কবিতা আছে—সেগুলি অন্য জাতের। তাদের মধ্যে নটরাজ ও ঋতুরঙ্গই প্রধান। নৃত্যাভিনয়ের উপলক্ষ নিযে এগুলি রচিত হযেছিল, কিন্তু এরাও স্বভাবতই উপলক্ষকে অতিক্রম করেছে। আর কোনোখানেই শান্তিনিকেতনের মত ঋতুর লীলারঙ্গ দেখিনি—তারই সঙ্গে মানবভাষায় উত্তরপ্রত্যুত্তর কিছুকাল থেকে আমার চলছে। তার রীতিমত স্বরু হয়েছে শারদোৎসবে—তারপরে ঋতুগীতির প্রবাহ বেয়ে এসে পডেছিল ঋতুরঙ্গে। বিষয় এক তবু প্রভেদ যথেষ্ট।"[৪]

রাজা ও ফাল্গুনী এই দুই নাটকে বসন্তের তত্ত্বরূপটি যথাস্থানে ব্যাখ্যা করা হযেছে। দুই ক্ষেত্রেই বসন্ত কবির চোখে যৌবনের প্রতীক। যে যৌবন বাইরে রিক্ত, অন্তরে ঐশ্বর্যপূর্ণ। চিত্রাঙ্গদা মদনের কাছ-থেকে ধার-করা যৌবনে অর্জুনকে বিভ্রান্তবিভোল করলেও শেষ পর্যন্ত যে যৌবনে উভয়ের সার্থক প্রেমমিলন ঘটল সেখানে যৌবনের ছদ্মবেশ ছিল না। রাজা নাটক এক দিক দিয়ে বসন্তোৎসবই—'আজি দখিন দুয়ার খোলা' বসন্তের এই উল্লসিত সংগীত এই নাটকের ধ্রুবপদ। কিন্তু সে বসন্ত বাহিরের উন্মত্ততায সার্থক নয। একদিকে তাঁর রাজবেশ—নব শ্যামলশোভন রথে, বকুল-বিছানো পথে তাঁর আগমন, মুখে তাঁর পিয়ালরেণু, উতলা উত্তরীয আকাশে লুন্ঠিত। অন্যদিকে তিনি রিক্ত সন্ন্যাসী—ফোটা-ফুলের পাশে যেমন ঝরা-ফুলের খেলা। এই যে বসন্ত তারই গান ঠাকুরদার লোকায়ত স্বরে—

আমার প্রভুর পায়ের তলে শুধুই কি রে মাণিক জ্বলে
চরণে তার লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলা।
আমার গুরুর আসন কাছে সুবোধ ছেলে কজন আছে
অবোধ জনে কোল দিয়েছেন তাই আমি তাঁর চেলা।

ফাল্গুনী নাটকের বসন্ত কবির বহুদিনকার ভুলে-যাওয়া যৌবনের প্রতীকিত

রূপ মাত্র, জরামৃত্যুর আক্রমণ যাকে মারতে পারে না। ফাল্গুনীর আলোচনা প্রসঙ্গে কবি এই ভাবটি ব্যাখ্যা করে লিখেছিলেন—

'বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রতি ফাল্গুনে চিরপুরাতন এই যে চিরনূতন হয়ে জন্মাচ্ছে, মানুষ-প্রকৃতির মধ্যেও পুরাতনের সেই লীলা চলছে। প্রাণশক্তিই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আপনাকে বারেবারে নূতন করে উপলব্ধি করছে। যা চিরকালই আছে তাকে কালে কালে হারিয়ে হারিয়ে না যদি পাওয়া যায় তবে তার উপলব্ধিই থাকে না।'[৫]

বসন্ত পালাগানেও বসন্তের বক্তব্য যেন রাজা ও ফাল্গুনীর যুগলবন্ধ। এখানে বসন্ত ঋতুরাজ, ঐশ্বর্যে পূর্ণ হলেও বিজয়াদিত্যের মত তিনি নিঃস্ব নিঃসম্বল বেশে রাজ্যপরিদর্শনে যাত্রা করেন। মূর্তিমান পুরাতনই চিরনূতন। কবি এই পালায় রাজাকে বলেছেন—

"আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপডখানা আছে তার এক পিঠে নূতন, এক পিঠে পুরাতন। যখন উলটে পরেন তখন দেখি শুকনো পাতা, ঝরা ফুল; আবার যখন পালটে নেন, তখন সকালবেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী, তখন ফাগুনের আম্রমঞ্জরী, চৈত্রের কনকচাঁপা। উনি একই মানুষ, নূতন-পুরাতনের মধ্যে দিয়ে লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছেন।"

এই নাটকে পাত্রপাত্রী বসন্তের ফুলফল বনভূমি, রাজা কবি সভাসদবৃন্দ দর্শক মাত্র, আর কবিই কেবল ঋতুনাট্যের প্রযোজক ও সূত্রধর। বসন্ত পর্যায়ে গীতবিতানের বিখ্যাত গানগুলি এই নাটকে প্রাকৃত কুশীলবদের কণ্ঠে স্থাপিত। যেমন 'বাকি আমি রাখব না' বনভূমির গান, 'ফল ফলাবার আশা' আম্রকুঞ্জের, 'সে কি ভাবে গোপন রবে' মাধবীর, 'কে দেবে চাঁদ' নদীর গান ইত্যাদি। নবীনেও বসন্তের একাধিক গান আছে। তবে নবীন ঠিক নাটক নয়, কারণ এর পদ্যভাগ আবৃত্তির উপযোগী, সংলাপ নেই। নবীন পালাগানের গানগুলি যথাক্রমে—বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী, সুরের গুরু দাও গো সুরের দীক্ষা, তুমি সুন্দর যৌবনঘন, আন গো তোরা কার কী আছে, ফাগুন তোমার হাওয়ায় হাওয়ায়, গানের ডালি ভরে দে গো, নিবিড় অমা-তিমির হতে, ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল, আমি সকল নিয়ে বসে আছি, হে মাধবী দ্বিধা কেন, তুমি কোন ভাঙনের পথে এলে, ওরা অকারণে চঞ্চল, মোর পথিকেরে বুঝি এনেছ, ফাগুনের নবীন আনন্দে, কেন ধরে রাখা, চলে যায় মরি হায়, বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক, যখন মল্লিকাবনে প্রথম ধরেছে কলি, ঝরা পাতা

গো, কখন দিলে পরায়ে, ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল, তুমি কিছু দিয়ে যাও, বাজে করুণ সুরে। নবীন পালাগানের সূচনা হয়েছে ভুবনমোহিনী বাসন্তীর আহ্বান-গীতের দ্বারা—যার অনন্ত মাধুরীকে অবিস্মরণীয় অনির্বচনীয় সুরে কবি দিকপ্রান্তে বনবনান্তে, শ্যামপ্রান্তরে আম্রছায়ে সরোবরতীরে মলয়বাতাসে নীলাকাশে, নদীতীরে, নগরে গ্রামে, মধুমদমোদিত হৃদয়ে হৃদয়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন। নবীন পালায় বসন্তের রঙ্গনটীদের ডাক দিয়েছেন কবি—

"যে রসরাজের নিমন্ত্রণে এসেছ তাঁর প্রসন্নতা যেমন আজ নেমেছে আমাদের নিকুঞ্জে ওই অন্তঃস্মিত গন্ধরাজ-মুকুলের প্রচ্ছন্ন গন্ধরেণুতে, তেমনি নামুক তোমাদের কণ্ঠে, তোমাদের দেহলতার নিরুদ্ধনটনোৎসাহে।" কবি বলেছেন—"চিরপুরাতনী ধরণী চিরপুরাতন নবীনের দিকে তাকিয়ে বলছে, লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল।" সেই নিত্যনন্দিত সহজশোভন নবীনের উদ্দেশে আত্মনিবেদনের গান 'আন গো তোরা কার কী আছে আন।' নটরাজ পালায় বসন্তবন্দনায় কবির লেখনী ধৈর্যহারা হয়ে উঠেছে, তাঁর দিনের সকল নিমেষ যেন এই অশেষের ধনে পূর্ণ। বসন্ত সুন্দর, বসন্ত নটরাজ, বসন্ত উমাপতি মহাদেব, বসন্ত নন্দনে আনন্দ। সে বসন্তকে কে বন্দী করবে মর্তের মৃৎশৃঙ্খলে? সে বন্ধন তাঁর দোলরজ্জু হয়ে ওঠে, স্বর্গমর্ত দোলে ছন্দভরে, সেই দোলে কখনো মিলনচঞ্চলতা, কখনো বিরহব্যথা। সেই দোলের গানেই নটরাজ পালার অবসান—

আনো গো আনো ভরিযা ডালি করবীমালা লযে
আনো গো আনো সাজায়ে থালি কোমল কিশলয়ে।
এসো গো পীতবসনে সাজি কোলেতে বীণা উঠুক বাজি,
ধ্যানেতে আর গানেতে আজি যামিনী যাক বয়ে।
এসো গো এসো দোলবিলাসী বাণীতে মোর দোলো
ছন্দে মোর চকিতে আসি মাতিয়ে তারে তোলো।
অনেক দিন বুকের কাছে রসের স্রোত থমকি আছে,
নাচিবে আজি তোমার কাছে সময় তারি হল।

গীতবিতানে বসন্তের গীতসংখ্যা ৯৬টি, তার মধ্যে অধিকাংশ গানই রাজা অরূপরতন, শাপমোচন, ফাল্গুনী, বসন্ত, নটরাজ পালা ও নবীনের গান। বসন্ত পর্যায়ের বাইরে অন্যান্য পর্যায়ক্রমে বসন্ত-প্রসঙ্গের গীতসংখ্যাও

প্রভূত। বসন্তের নৈসর্গিক শোভার পটে প্রেমের যেমন পরিণাম, তেমন আর কোনো ঋতুতে নয়। তাই প্রেম পর্যায়ের অসংখ্য গানেও বসন্তের পশ্চাদ্‌ভূমি খুঁজে পাই আমরা, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করি সেখানে বসন্তকে। বিচিত্র এবং পূজা পর্যায়েও বসন্তঘটিত গানের অভাব নেই। কারণ বসন্তে যখন ধরার চিত্ত উতলা হয় তখন যে সৌন্দর্যস্বরূপ নন্দনকানন থেকে স্খলিত হয়ে এই পৃথিবীর বুকে নেমে আসে সে তো কবির পূজারও বাতাবরণ। যে-সুন্দরকে কবি বরণ করতে চান সে সুন্দর ফাল্গুন হয়েই কবির পরানের পাশে আসে, সুধারসধারে অঞ্জলি ভরে দেয়।

বসন্ত পর্যায়ের গানগুলি প্রায়ই প্রেমের সুগন্ধে সুবাসিত। আর সেখানেও বিরহের দীর্ঘশ্বাসই প্রবল। রোদনভরা বসন্তের রূপের সঙ্গে উৎসবসংগীতগুলিকেও তিনি ঋতুর গান রূপে নির্দিষ্ট করেছেন। 'কার যেন এই মনের বেদন' গানটি এই অতীতস্মৃতির বিষণ্ণ বেদনায় ভারাক্রান্ত। তাছাড়া 'এবেলা ডাক পড়েছে কোনখানে', 'মন যে বলে চিনি চিনি', 'বেদনা কী ভাষায় রে', 'আজি গন্ধবিধুর সমীরণে', 'অনেক দিনের মানুষ যেন এলে কে', 'পূর্বাচলের পানে তাকাই অস্তাচলের ধারে আসি', 'নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল', 'ফাগুনের পূর্ণিমা এল কার লিপি হাতে', 'এক ফাগুনের গান সে আমার', 'চেনা ফুলের গন্ধস্রোতে ফাগুন রাতের অন্ধকারে', 'সেই তো বসন্ত ফিরে এল', 'মম অন্তর উদাসে'—বসন্ত পর্যায়ের এই গানগুলি উৎসবের মধুছন্দা বাঁশির অন্তরালে একটি তৃষিত স্মৃতিকাতর প্রাণের আতুর আর্তনাদ বহন করে নিয়ে চলেছে। বর্ষা ও বসন্তের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথের ঋতুসংগীতগুলি যথার্থ পূর্ণতা পেয়েছে। বর্ষার গানে একদিকে যেমন বহির্নিসর্গের প্রগল্‌ভ মত্ততা ও অন্তর্লোকের নিঃসঙ্গ স্মৃতিভারাকুলতা, তেমনি বসন্তের গানেও। সেখানেও ঋতুর নিমন্ত্রণে চিরযৌবনের আতিথেয়তা, বাইরের প্রলাপিত উৎসব, কিন্তু নিভৃত অন্তঃপুরে একটি প্রবাসী বিরহীর ঊর্ধ্ববাহু ক্রন্দন—

> হে সখা, বারতা পেয়েছি মনে মনে তব নিশ্বাসপরশনে,
> এসেছ অদেখা বন্ধু দক্ষিণ সমীরণে।
> কেন বঞ্চনা কর মোরে, কেন বাঁধো অদৃশ্য ডোরে—
> দেখা দাও দেখা দাও দেহ মন ভরে মম নিকুঞ্জবনে।

৯

গীতবিতানের তৃতীয় খণ্ডে প্রেম ও প্রকৃতি পর্যায়ে সংকলিত অনেকগুলি গান ঋতুসংগীতের আলোচনায় অনুল্লিখিত থেকে গেছে। এর মধ্যে অনেকগুলি গান অবশ্য পূর্বরচিত কোনো গানের পাঠান্তর—যেগুলি নাট্য-প্রয়োজনে বা অন্য কোনো কারণে কবিকর্তৃক পরিবর্তিত হয়েছিল। যেমন বসন্তের গান 'চরণরেখা তব যে পথে দিলে লেখি'—এটিকে পাঠ বদলে কবি নটরাজ পালায় শরতের গানে পরিণত করেছিলেন। তৃতীয় খণ্ডে বর্ষা-ঋতুর সঙ্গে বিজড়িত কয়েকটি গান পাই—যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, কালো মেঘের ঘটা ঘনায়, ওরা অকারণে চঞ্চল (বসন্তের সুপরিচিত গানখানির কথা পরিবর্তন করে বর্ষার গানে পরিণত), মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম (সুপরিচিত গানের পাঠান্তর), জানি জানি এসেছ এপথে (পাঠান্তর), কী বেদনা মোর জানো, আমার কী বেদনা সে কি জানো (পাঠান্তর ও সুরান্তরসহ দুটি গানই জনপ্রিয় হয়েছে), যবে রিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা, এসো এসো ওগো শ্যামছায়াঘন দিন, শ্রাবণের বারিধারা ঝরিছে বিরামহারা এবং আমার হারিয়ে-যাওয়া দিন। এগুলির অধিকাংশ জীবনশেষের প্রদীপশিখার আলো—শেষ বয়সের বর্ষামঙ্গল উপলক্ষে রচিত। বর্ষার স্মৃতিবেদনাই এদের চরম পরিচয়। ইতিপূর্বে আলোচিত শেষ বয়সের যে বর্ষাগীতগুলি সানাই কাব্যের পাঠভেদরূপে গীতবিতানে আছে, কবির অতীতচারিতার উদাহরণ হিসাবে সেই বহু-আলোচিত গানগুলি জানুয়ারি বা ডিসেম্বরে রচিত দেখা যায়, যখন শান্তিনিকেতনের আকাশে মেঘের রেখামাত্র ছিল না। অথচ কোন দূরকালের বৃষ্টিধারার ব্যথিত স্মৃতি বহন করে দারুণ শীতের দিনে প্রৌঢ় কবির নিঃসঙ্গ পাংশু প্রহরগুলি বর্ষণোন্মুখ বেদনায় ভরিয়ে তুলেছিল। ১৩৪৬ সালের চৈত্রদিনের এক দিনান্তবেলায় তাই কবি লিখেছিলেন—

আজি কোন সুরে বাঁধিব দিন-অবসান-বেলারে
দীর্ঘ ধূসর অবকাশে সঙ্গীজনবিহীন শূন্য ভবনে।

দিনাবসান-বেলার সেই নির্জনধূসর অবকাশ শেষবিরহের সুরে ভরিয়ে তুলেছিলেন কবি, যে বিরহ কোন বিস্মৃতপ্রায় শ্রাবণের ধারাবর্ষণে সিক্ত। ২০শে ভাদ্র ১৩৪৭ তারিখে লেখা এই গানখানি যেমন—

শ্রাবণের বারিধারা ঝরিছে বিরামহারা।
বিজন শূন্যপানে চেয়ে থাকি একাকী।
দূর দিবসের তটে মনের আঁধার পটে
অতীতের অলিখিত লিপিখানি লেখা কি।
বিদ্যুৎ মেঘে মেঘে গোপন বহ্নিবেগে
বহি আনে বিস্মৃত বেদনার রেখা কি।
যে ফিরে মালতীবনে সুরভিত সমীরণে
অস্তসাগরতীরে পাব তার দেখা কি।

সমাপ্তিবাক্যটি কী করুণ প্রত্যাশায়, কী বিষণ্ণ বিশ্বাসে বিদায়পথের যাত্রীকে দোলায়িত করে তুলেছে! মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস আগে, অস্তগমনের শেষ মুহূর্তে, গোধূলির কান্নাকাতর আকাশের শিরে ঐ একটি স্মৃতির নিঃসঙ্গ তারা দেখতে দেখতে কম্পিত অঙ্গুলি প্রহরগণনার অক্ষমালায় নীরব হয়ে এসেছে—

আমার হারিয়ে-যাওয়া দিন
আর কি খুঁজে পাব তারে
বাদল-দিনের আকাশ-পারে—
ছায়ায় হল লীন।
কোন্ করুণ মুখের ছবি
পুবেন হাওয়ায় মেলে দিল
সজল ভৈরবী।
এই গহন বনচ্ছায়
অনেক কালের স্তব্ধবাণী
কাহার অপেক্ষায়
আছে বচনহীন। (১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১। বিকাল)

তৃতীয় খণ্ডের প্রকৃতিবিষয়ক গানগুলির মধ্যে তরুণ প্রাতের অরুণ আকাশ শিশির ছলোছলো (বলাকার একটি কবিতায় সংগীতরূপ হিসাবে পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে আলোচিত), জলে-ডোবা চিকন শ্যামল (গানটি ৩১ আষাঢ় ১৩২৯ তারিখে রচিত) দুটি গানকে শরৎ পর্যায়ে ফেলা যায়। অন্যান্য গানগুলি বসন্তের—এ কী হরষ হেরি কাননে, তুই রে বসন্ত সমীরণ, দুজনে দেখা হল মধু-যামিনী রে (সবগুলি রবিচ্ছায়ার গান), জীবনে এ কি প্রথম বসন্ত এল

(মায়ার খেলার গান), স্বপনলোকের বিদেশিনী (অনেক দিনের মনের মানুষ গানের পাঠান্তর), হৃদয় আমার ঐ বুঝি তোর ফাল্গুনী ঢেউ আসে, ওরে বকুল পারুল (দুটিই পাঠান্তর), অবেলায় যদি এসেছ আমার বনে (প্রবাহিনী ১৩৩২ অগ্রহায়ণ), আয় তোরা আয় আয় গো (১৩৩৮ বৈশাখ), ভয় নেই রে তোদের নেই রে ভয় (ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩), আমরা ঝরে-পড়া ফুলদল (দোল-পূর্ণিমা ১৩৪৩) এবং নির্জনরাতে নিঃশব্দ চরণপাতে কেন এলে।

ঋতুসংগীতগুলি রবীন্দ্রনাথের সংগীতসৃষ্টির যে মুগ্ধ বিস্ময়, নিবিড় আনন্দ-বেদনা, রোমাঞ্চিত মর্ত্যপ্রেম, জীবনধারণের আতপ্ত অতৃপ্তিতে সিঞ্চিত, কোনো ভাষ্যে বা সমালোচনায় তার অণুও সঞ্চারিত হতে পারে না। সে মহাজীবনের মধুকোষ থেকে ক্ষরিত মকরন্দে আমাদের আস্বাদ্যমানতা চিরসংযুক্ত থাকবে। ভাষায় কে তাকে প্রকাশ করতে পারে? যিনি গেয়েছিলেন—

সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা
যেন আমার গানের শেষে থামতে পারি শমে এসে,
ছয়টি ঋতুর ফুলে ফলে ভরতে পারি ডালা।
এই জীবনের আলোকেতে পারি তোমায় দেখে যেতে,
পরিয়ে যেতে পারি তোমায় আমার গলার মালা—
সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা।

কে তাঁর সেই ঋতুর ডালির পরিমাপ করবে? সে সৌরপরিক্রমায় কি আমাদের অধিকার আছে?

১। রবীন্দ্রসংগীত—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর: দিনেন্দ্ররচনাবলী

২। গানের সুন্দর—ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার: সুরঙ্গমা রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সংখ্যা

৩। রবীন্দ্রসংগীত—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর; দিনেন্দ্ররচনাবলী

৪। মহুয়ার গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী ১৫শ খণ্ড

৫। ফাল্গুনীর গ্রন্থপরিচয়—রবীন্দ্ররচনাবলী ১২শ খণ্ড

রবীন্দ্রসংগীতে প্রেম পর্যায়

১

রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে মানব ও দেবতা যেমন অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত, তেমনি তাঁর সংগীতেও দেবতা ও মানব প্রায়শ এক চৈতন্যভূমিতে মিলিত হয়েছে। তাঁর গানের মধ্যে দিনে দিনে সঞ্চিত হয়েছে আলোকের প্রকাশ ও ভালোবাসার অমৃত, সৃষ্টির প্রথম ও শেষ রহস্য। দেবলোক থেকে মানবলোকে, আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষ আর মনের মানুষে, কবির অন্তরতম আনন্দে যে পূজা মন্দিরের বাহিরে সমাপ্ত হয়েছে, পত্রপুটের পনেরো সংখ্যক কবিতায় তার স্বীকৃতি আছে। সংগীতসৃষ্টির প্রাথমিক লগ্ন থেকেই দেখতে পাই এই দুই চেতনা তাঁর গানে গভীরভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। একদিকে ঠাকুর পরিবারের অভ্যস্ত ধর্মবোধ, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রাহ্মসমাজের নিয়মিত উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রেরণায় কবি একের পর এক ধর্মসংগীত লিখে চলেছেন, অন্যদিকে তাঁর নিভৃত শিল্পীমানসে হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্মতম তরঙ্গাঘাত সুর হয়ে ঝংকৃত হয়েছে, গানরূপে উৎসারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের প্রথম পর্যায়ে লিখিত ধর্মগীতগুলিতে অপরিণত চিত্তের যে ঈশ্বরসচেতনতা অভিব্যক্ত হয়েছে, তার মধ্যে বিশুদ্ধ সারস্বত প্রেরণা অপেক্ষা পরোক্ষ প্রভাব ও কৌতূহলই বেশি। কিন্তু কিশোর ও অপরিণত যৌবনকালের প্রেমসংগীত-গুলিতেই তাঁর কবিজীবনের যথার্থ আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। এই সব প্রেম-সংগীতের পটভূমিকারূপে কবির প্রথম জীবনের কাব্যগুলির আলোচনাও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কবিকাহিনী (১৮৭৮ নভেম্বর) বনফুল (১৮৮০ মার্চ), ভগ্নহৃদয় (১৮৮১ জুন), রুদ্রচণ্ড (১৮৮১ জুন), মায়ার খেলা (১৮৮৮) প্রভৃতি নাট্যসৃষ্টিগুলির বিষয়বস্তু নরনারীর অস্ফুট ভাবোদ্‌বেল হৃদয়রক্তরাগ। তাছাড়া সন্ধ্যাসংগীত (১৮৮২), প্রভাতসংগীত (১৮৮৩), শৈশবসংগীত (১৮৮৪), কড়ি ও কোমল (১৮৮৬) এবং মানসী (১৮৯০) কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই প্রেমের। বনফুল কাব্য কবির নিতান্ত বয়ঃসন্ধিকালের অনুচিকীর্ষু রচনা, কিন্তু এর বিষয়বস্তুও প্রেম—যে প্রেম হৃদয়অরণ্যে পথভ্রষ্ট, সামাজিক বিবাহবন্ধন সত্ত্বেও পাত্রভেদে স্থানান্তরিত, নির্বাক দুঃখে দুঃসহ, সংশয়ে জটিল। অস্ফুট নব-যৌবনের অনির্দেশ্য বেদনায় মসীবর্ণ এই নাট্যলেখের প্রেরণা কবি কোথা থেকে

সংগ্রহ করলেন? ১২৮৩ সালের কার্তিক মাসে মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় গ্রন্থসমালোচনা প্রসঙ্গে কবি লিখেছিলেন—

"গীতিকাব্য আমরা নিজের জন্য রচনা করি। যখন প্রেম করুণা ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তিসকল হৃদয়ের গূঢ় উৎস হইতে উৎসারিত হয়, তখন আমরা হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া তাহা গীতিকাব্যরূপ স্রোতে ঢালিয়া দিই…"

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কাব্য, বিশেষ করে প্রেমসংগীতগুলির আলোচনাপ্রসঙ্গে এই উক্তিটি অসাধারণ মূল্যবান সন্দেহ নেই। এই মন্তব্যের আলোকেই রবিচ্ছায়া নামক কবির প্রথম গীতসংকলনের প্রণয়-সংগীতগুলি নূতন তাৎপর্যে উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে। তাঁর গাথা নাট্যগুলির প্রণয়সমস্যা, পাত্রপাত্রীর অব্যক্ত প্রেমবেদনা, করুণা বৈরাগ্য অনুরাগ প্রভৃতি বৃত্তিগুলির বহিঃপ্রকাশও ঐ সকল ক্ষেত্রে তাদের কণ্ঠের ক্ষুদ্র গানগুলির মধ্য দিয়ে অধিকতর সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। তাই বনফুল কাব্যে কমলার কণ্ঠে শুনি—

লভেছি জনম করিতে রোদন
রোদন করিব জীবন ভরে।

সংসারানভিজ্ঞা বিবাহিতা কমলা ভালবেসেছিল স্বামীর বন্ধু নীরদকে। সেই নিষিদ্ধ প্রেমের দুর্বহ অনুভূতি তার গীতিকবিতায় ভারলাঘবের স্রোতে প্রবাহিত হয়েছে—'জেনেছি হায় রে ভালোবাসিলে কেমন হৃদয়ে আগুন জ্বলে'

এবং এইটুকু জানি শুধু এইটুকু জানি
দেখিবারে আঁখি মোর ভালবাসে যারে
শুনিতে বাসি গো ভাল যার সুধাবাণী
শুনিব তাহার কথা দেখিব তাহারে।

কবিকাহিনী গাথাকাব্যের নায়ক কবি, তাঁর প্রেমপাত্রী নলিনী। নলিনীর সঙ্গে কবির তখনই পরিচয় ঘটেছে যখন প্রকৃতিলালিত সৌন্দর্যমুগ্ধ কবি এক মানবীপ্রেমের অনির্দেশ্য অভাবে বিহ্বল উন্মন—

এখনও বুকের মাঝে রয়েছে দারুণ শূন্য
সে শূন্য কি এ জনমে পুরিবে না আর?
মনের মন্দির-মাঝে প্রতিমা নাহিক যেন
শুধু এ আঁধার গৃহ রয়েছে পড়িয়া।

তবু কবি ও নলিনীর প্রণয়নিবেদন বিঘ্নহীন অনায়াস হয়নি। অন্তরে অনির্বচনীয় বেদনা নিয়ে কবি বিশ্বভ্রমণে নির্গত হয়েছে, কিন্তু ততোধিক

অশান্তিতে অন্তরে নালিনীর স্মৃতি বহন করে মুমূর্ষ নলিনীর কাছে প্রত্যাবর্তন করেছে। ভগ্নহৃদয় কাব্যেও একটি কবিচরিত্র আছে, সেখানেও মুরলার প্রেম উপেক্ষা করে দূরযানী কবি শেষ পর্যন্ত আবার সেই প্রেমেরই আকর্ষণে মরণোন্মুখ মুরলার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। মায়ার খেলায় অমরও যখন শান্তার প্রেম উপেক্ষা করে চলে গিয়েছিল, তখন মায়াকুমারীদের গান—

কেহ কারো মন বোঝে না, কাছে এসে চলে যায়।

এই সময় লেখা রুদ্রচণ্ড এবং ভগ্নহৃদয়ের মধ্যেও সেই অস্ফুটকোরক হৃদয়ের প্রেমানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। রুদ্রচণ্ডে চাঁদকবির সঙ্গে অমিয়ার প্রেম, ভগ্ন-হৃদয়ের কবির জন্য মুরলার নীরব প্রেম—সবই প্রেমের এক ভাষাহীন অব্যক্ত বেদনা ও বিস্মিত সম্পর্কের পটে স্থাপিত।

১২৯২ সালে প্রকাশিত রবিচ্ছায়া নামক গীতসংকলনে বিবিধ সংগীত শিরোনামায় কবির গীতসংখ্যা ছিল ১১৬ টি এবং সেগুলির অধিকাংশই প্রেমের গান। কবির ২৪ বৎসর বয়সে প্রকাশিত এই গীতসংকলনে তাঁর প্রথম বয়সের প্রেমানুভূতি এই গানগুলির আনন্দবিষাদের আখরে ধরা পড়েছে। ভূমিকায় কবি লিখেছিলেন—

"ইহার অনেক গানই বিস্মৃত বাল্যকালের মুহূর্তস্থায়ী সুখদুঃখের সহিত দুই দণ্ড খেলা করিয়া কে কোথায ঝরিযা পড়িয়াছিল—সেই সকল শুষ্কপত্র চারিদিক হইতে জড়ো করিযা বইয়ের পাতার মধ্যে তাহাদিগকে স্থায়ী ভাবে রক্ষা করিলে গ্রন্থকার ছাড়া আর কাহারও তাহাতে কোনো আনন্দ নাই"।

কবির প্রথম বয়সের গাথানাট্যগুলির যাবতীয় গান এবং বিলাত থেকে ফেরার পর ২৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত রচিত গানগুলি সবই রবিচ্ছায়ায় সংকলিত হয়েছে। অধিকাংশ গানেই একটি বিফল নৈরাশ্য, অনির্দেশ্য বিষণ্ণতা, ব্যর্থ হৃদয়বেদনা বাসা বেঁধেছে। হায রে সেই ত বসন্ত ফিরে এল, যে ফুল ঝরে, কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া, দেখায়ে দে কোথা আছে একটু বিরল, কিছুই ত হল না, এ ভালবাসার যদি দিতে প্রতিদান, কেহ কারো মন বুঝে না, মন হতে প্রেম যেতেছে শুকায়ে, সহে না যাতনা, প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন, পুরানো সেই দিনের কথা, দুজনে দেখা হল মধুযামিনী রে—প্রভৃতি গানগুলি পাঠ করলেই দেখা যাবে এই শূন্যতা ও অজ্ঞেয় হতাশা সেইগুলিতে কী প্রবল। কবিকাহিনীর নায়ক কাছে থাকার সময় নলিনীর প্রেম অনুভব করেনি। কিন্তু দূরান্তে এসে তার কাছে নলিনীর প্রেম প্রকাশিত হল।

ভগ্নহৃদয় কাব্যেও দেখি মুরলাকে ত্যাগ করার সময় কবি জানত না মুরলা তাকেই ভালবেসেছে। মায়ার খেলায় অমর শান্তার প্রেম উপেক্ষা করে চলে গিয়েছিল। রবিচ্ছায়ার এই গানটি স্মরণ করা যাক—

কতদিন একসাথে ছিনু ঘুমঘোরে,
তবু জানিতাম নাকো ভালবাসি তোরে।
মনে আছে ছেলেবেলা কত যে খেলেছি খেলা,
কুসুম তুলেছি কত দুইটি আঁচল ভরে।
ছিনু সুখে যতদিন দুজনে বিরহহীন
তখন কি জানিতাম ভালবাসি তোরে।
অবশেষে এ কপাল ভাঙিল যখন,
ছেলেবেলাকার যত ফুরাল স্বপন,
লইয়া দলিত মন হইনু প্রবাসী,
তখন জানিনু সখি কত ভালবাসি।

ভগ্নহৃদয়ে এই গানটি কবি ও নলিনীর পুনর্বার সাক্ষাৎকালে নলিনীর কণ্ঠে আছে। ভগ্নহৃদয় কবির বিলাতবাসকালে রচিত এবং দেশে ফিরে সমাপ্ত হয়। এই গানের অনুভূতি তাঁর একাধিক নাটকে যেভাবে ঘুরে-ফিরে দেখা দিয়েছে, তাতে সংকোচে-সতর্কভরে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, এর সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত জীবনের কোনো অনুভূতি কি জড়িত ছিল? এ কি কবির আত্মঅভিজ্ঞতার বাণীময় সুরময় আত্মপ্রকাশ?

এই বয়সের প্রেম ও হৃদয়ানুরাগের স্মৃতি যে তাঁর কবিতা ও সংগীতে আছে, রবীন্দ্রজীবনীকার স্বয়ং সে কথার উল্লেখ করেছেন। বিলাতযাত্রার পূর্বাহ্ণে মেজদাদার সঙ্গে আমেদাবাদ-বোম্বাই বাসকালে আন্না তরখড়ের সঙ্গে কবির সাময়িক সম্পর্কের কথা কবিজীবনীপাঠকের অজ্ঞাত নয়। এই আন্নার স্মৃতি কবি দীর্ঘজীবন বহন করেছিলেন, একেবারে মৃত্যুপূর্ব ছেলেবেলা নামক স্মৃতিরচনাতেও তার প্রমাণ আছে। আন্নার নামকরণ করেছিলেন তিনি নলিনী। ঐ প্রিয় নাম তাঁর প্রথমবেলার নাটকে-গাথায় বারবার আবির্ভূত। ছেলেবেলায় লিখেছেন কবি—

"ইচ্ছে করেছিলেম সেই নামটি আমার কবিতার ছন্দে জড়িয়ে দিতে। বেঁধে দিলুম সেটাকে কাব্যের গাঁথুনিতে; শুনলেন সেটা ভোরবেলাকার

ভৈরবী সুরে, বললেন, কবি, তোমার গান শুনলে বোধ হয় আমার মরণদিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি।" [১]

তীর্থংকর গ্রন্থে দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে আলোচনায় কবি তাঁর এই প্রণয়-সম্পর্কের আরও গভীর বিবরণ দিয়েছেন। ছেলেবেলায় অবিস্মরণীয় ভাষায় কবি লিখেছেন—

"আমাদের ঐ বটগাছটাতে কোনো কোনো বছরে হঠাৎ বিদেশী পাখি এসে বাসা বাঁধে। তাদের ডানার নাচ চিনে নিতে নিতেই দেখি তারা চলে গেছে। তারা অজানা সুর নিয়ে আসে দূরের বন থেকে। তেমনি জীবনযাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন-মানুষের দূতী, হৃদয়ের দখলের সীমানা বড়ো করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই আসে, শেষকালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না। চলে যেতে যেতে বেঁচে-থাকার চাদরটার উপরে ফুলকাটা কাজের পাড় বসিয়ে দেয়, বরাবরের মত দিন রাত্রির দাম দিয়ে যায় বাড়িয়ে"।[২]

এ অনুভূতি যে প্রেমের তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পরিণত বয়সে কবি গানে গেয়েছিলেন 'চলে যবে গেল তারই লাগিল হাওয়া'। আকাশপ্রদীপের 'বধূ' কবিতায়, একদিন যার স্পর্শে রহস্যের তীব্রতায় হর্ষস্পৃষ্ট কবি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমিই কি সেই—

উত্তরে সে হেনেছিল চকিত বিদ্যুৎ,
ইঙ্গিতে জানায়েছিল, আমি তারই দূত,
সে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে,
নিত্যকাল সে শুধু আসিছে।

কবির জীবনে কিশোর বয়স থেকে যারা প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে গেছে, তাদের কবি আপন মানুষের দূতী, প্রত্যক্ষের পিছনে-থাকা চির-আগন্তুক বধূর দূত বলেছেন। শেষসপ্তক কাব্যের তেতাল্লিশ সংখ্যক কবিতায় কবি তাঁর কিশোর-যৌবন-সন্ধিকালের প্রেমের উল্লেখ করে বলেছেন যে, তরুণযৌবনের বাউল যেদিন সুর বেঁধে নিয়েছিল আপন একতারাতে, ডেকে বেড়িয়েছিল নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে অনির্দেশ্য বেদনার খ্যাপা সুরে—

তাই শুনে কোন কোন দিন বা
বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর আসন টলেছিল,

তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন

তাঁর কোনো কোনো দূতীকে

পলাশবনের রঙমাতাল ছায়াপথে

কাজ-ভোলানো সকাল-বিকালে।

তখন কানে কানে মৃদু গলায় তাদের কথা শুনেছি,

কিছু বুঝেছি কিছু বুঝিনি।

দেখেছি কালো চোখের পক্ষ্মরেখায়

জলের আভাস ;

দেখেছি কম্পিত অধরে নিমীলিত বাণীর

বেদনা,

শুনেছি কণিত কঙ্কণে

চঞ্চল আগ্রহের চকিত ঝংকার।

বৈকুণ্ঠলক্ষ্মীর সেই দূতীরা কবির অজ্ঞাতেই হয়ত বা তাঁর জন্মদিবসের প্রথম নিদ্রাভঙ্গ উষায় সদ্যোস্ফুট বেলফুলের মালা রেখে গেছে, ভোরের স্বপ্নকে দিয়ে গেছে বিহ্বলউন্মন করে। সুতরাং নলিনীর প্রভাবও কবির অল্পবয়সের গানে কোথাও মুদ্রিত আছে তাতে সন্দেহ নেই। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

"আমাদের সন্দেহ হয় শৈশবসংগীতের কয়েকটি কবিতা ও গানের মধ্যে এই তরুণীর মর্মবেদনা কবির ভাষায় রূপ পাইয়াছে। 'ফুলের ধ্যান' 'অপ্সরা প্রেম' কবিতা দুইটি এই বেদনাভারে নত। রবীন্দ্রনাথের 'শুন নলিনী খোল গো আঁখি' গানটি ইহারই উদ্দেশে রচিত তাহা কবি তো স্বয়ং ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। আর একটি গান এই তরুণীস্মরণে রচিত বলিয়া আমাদের মনে হয়—

'আমি স্বপনে রয়েছি ভোর সখী আমারে জাগায়ো না।'

আন্নার দস্তানাচুরি সম্বন্ধে যে কৌতুককাহিনী তীর্থংকরে বর্ণিত আছে ইহা তাহারই স্মরণে রচিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।" ৩

২

"যে শিল্পরূপ যত সার্থক আর যত উন্নত, যেমন তার গূঢ় সূচনা না হলেই নয় বিশেষ ব্যক্তিসত্তায়, তারও শেষও অবশ্য হওয়া চাই নির্বিশেষ বিশ্বসত্তায় উদ্ভাসিত শিল্পজীবনে—তা সকল কালের সব মানুষের প্রাণস্পন্দনে সঞ্জীবিত।

পরিণামে তা. নৈর্ব্যক্তিক। শিল্পরূপের এই যে ব্যক্তিসত্তা-সঞ্জাত নৈর্ব্যক্তিকতা চরমে পৌঁছয় তা গানে, এ হয়ত না বললেও চলে। সুতরাং রবীন্দ্রসংগীত-সৃষ্টির কল্পলোকে অনধিকার প্রবেশ করে ব্যক্তিজীবনের সূত্র আমরা কোথায় খুঁজে পাব আর কেনই বা খুঁজতে যাব? সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে পথে যেতে যেতে যে তুলনাহীনারে কবি দেখেছিলেন শুনতে পাই. তিনি কি সত্যি কেউ? অথচ তাঁরই মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের কে আছে, কে বা নেই কে বলতে পারে? আকাশের সমস্ত আলোঅন্ধকার, পৃথিবীর আদিগন্ত শ্যামলতা, নীলসিন্ধুর উচ্ছল তরঙ্গ আর বাউল বাতাসের অশরীরী হিল্লোল—এসবই ঐ তুলনাহীনার কায়া ধরেনি যে এ কখনও হলপ করে বলা যাবে না। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার এমন যে সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতর বিবর্তন, কল্পনাতীত রূপান্তর, তার কথা যদি মনে রাখি তবেই বুঝব রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের গানগুলিতে কী আনন্দবেদনার কিংবা আনন্দান্বিত বেদনার অভিব্যক্তি; তবু বুঝব না কে সে, যার হাত থেকে নিয়েছেন বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল, যাকে মিনতি করেছেন বিজন ঘরের কোণে দীপশিখা জেলে দিয়ে যেতে, বারেবারেই যে এসেছে তবু আসেনি, যে প্রিয়ার ছায়া আকাশে আজ ভাসে হায় হায়! বৃষ্টি-সজল বিষন্ন নিশ্বাসে হায় হায়! আসলে সে আসেনি কোনদিন জীবনে, আসবারও নয়। আপন আত্মার মধ্যে ধরে যখন যে-কোনো রহস্যময়ী অপরি-চিতাকেই জিজ্ঞাসা করেছেন কবি, তুমিই কি সেই—

> উত্তরে সে হেনেছিল চকিত বিদ্যুৎ;
> ইঙ্গিতে জানাযেছিল, আমি তারই দূত।
> সে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে,
> নিত্যকাল সে শুধু আসিছে।" ৪

উদ্ধৃত অনুচ্ছেদে যে অভিমত প্রকাশিত হয়েছে সাহিত্যে তা গ্রহণযোগ্য হলে রসসাহিত্য-আস্বাদনের কোঠা সংকীর্ণ হয়ে আসে। বরং এই মন্তব্যের মধ্যে এক জাতীয় অসহিষ্ণুতা আছে, স্পর্শকাতরতা নামেও তাকে অভিহিত করা যায়। শিল্পরূপের গূঢ়সূচনা বিশেষ ব্যক্তিসত্তায় এবং পরিণাম নির্বিশেষ বিশ্বসত্তায় একথা সর্বদা স্বীকার্য হলেও সমালোচনা, জীবন-বিশ্লেষণ, বিচার ও আস্বাদনের পদ্ধতি কখনই নৈর্ব্যক্তিক সৃষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, গভীর গূঢ়উৎস থেকে সেই উৎসারণ তার মর্মে পৌঁছতে চায়। রবীন্দ্রনাথের সংগীত-সম্পর্কেও এ সত্য বিশেষভাবেই প্রযোজ্য। সে বিশ্লেষণে সংগীতের মাধুর্য

ব্যাহত হয় না, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তা আহত হয় না, বরং জীবনের আলোকে কাব্য আরও রমণীয় হয়ে দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার বা গানের প্রসঙ্গচ্যুত উদ্ধৃতি দিয়ে জীবনধর্মী কাব্য-বিচারের পদ্ধতি অস্বীকার করা যায়, কিন্তু সৌভাগ্যবশত রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোনো মনোভাব কোনো অনুভূতিই গোপন রাখেননি। শেষ সপ্তকের পূর্বকথিত তেতাল্লিশ সংখ্যক কবিতায় কবি তাঁর কিশোর বয়সের প্রেমের স্মৃতির উল্লেখ করে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীপ্রেরিত দূতীর কথা বলেছিলেন। ঐ কবিতারই অন্য স্থানে কবি তাঁর পরিণত জীবনের অন্য এক প্রেমস্মৃতির উল্লেখ করেছেন কী অকুণ্ঠিত অনাবৃত বাক্‌বন্ধে! অবসাদের অপরাহ্ণে কবি অপ্রত্যাশিতভাবে অমরাবতীর মর্তপ্রতিমার দেখা পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন, সেবাকে যারা সুন্দর করেছে, তপঃক্লান্তের জন্য যারা সুধার পাত্র এনেছে। কবির নির্বাণমুখ প্রদীপে তারা জ্বালিয়ে গেছে শিখা, শিথিলীভূত বীণার তারে সুর তুলে দিয়েছে—

তাদের পরশমণির ছোঁওয়া
আজো আছে
আমরা গানে আমার বাণীতে।

অর্থাৎ জীবনে কোনো ভালোবাসাকেই অবহেলা করেননি কবি, বলেছেন 'আমি রাখবো গেঁথে তারে রক্তমণির হারে'। রবিচ্ছায়ার 'ভাল যদি বাস সখি কী দিব তোমারে আর' গানে বলেছিলেন,

তা হলে এ হৃদিধামে তোমারি তোমারি নামে
বাজিবে মধুর স্বরে মরমবীণার তার।
যা-কিছু গাহিব গান ধ্বনিবে তোমারি নাম—
কী আছে কবির বল, কী তোমারে দিব আর।

ছবি কবিতার 'নাহি জানে কেহ নাহি জানে/তব সুর বাজে মোর প্রাণে' এরই প্রতিধ্বনি। আবার যাত্রী গ্রন্থ থেকে কবির বেদনাময়ী ভাষায় আর এক আত্মস্বীকৃতি স্মরণ করতে পারি, যা সন্ধ্যার আকাশপটে ফুটে-ওঠা তারার মত—

"কিশোর বয়সে যারা আমাকে কাঁদিয়েছিল হাসিয়েছিল, আমার কাছ থেকে আমার গান লুঠ করে নিয়ে ছড়িয়ে ফেলেছিল, আমার মনের কৃতজ্ঞতা তাদের দিকে ছুটল।...তারা দেখা দিয়েছে কেউ বা বনের ছায়ায়, কেউ বা নদীর ধারে কেউ বা ঘরের কোণে, কেউ বা পথের বাঁকে। তারা স্থায়ী কীর্তি

রাখবার দল নয়, ক্ষমতার ক্ষয়বৃদ্ধি নিয়ে তাদের ভাবনাই নেই,...তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললুম, আমার জীবনে যাতে সত্যিকার ফসল ফলিয়েছে সেই আলোর সেই উত্তাপের দূত তোমরাই। প্রণাম তোমাদের। তোমাদের অনেকেই এসেছিল ক্ষণকালের জন্য, আধো-স্বপ্ন আধো-জাগার ভোরবেলায় শুকতারার মত, প্রভাত না হতেই অস্ত গেল। মধ্যাহ্নে মনে হল তারা তুচ্ছ; বোধ হল তাদের ভুলেই গেছি। তারপরে সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন নক্ষত্রলোক সমস্ত আকাশ জুড়ে আমার মুখের দিকে চাইল তখন জানলুম সেই ক্ষণিকা তো ক্ষণিকা নয়, তারাই চিরকালের। ভোরের স্বপ্নে বা সন্ধ্যাবেলার স্বপ্নাবেশে জানতে-না-জানতে তারা যার কপালে একটুখানি আলোর টিপ পরিয়ে দিয়ে যায় তাদের সৌভাগ্যের সীমা নেই।"[৫]

পূরবী থেকে সানাই পর্যন্ত কবির সন্ধ্যার আকাশ এই স্মৃতির নক্ষত্রছবিতে কম্পান্বিত। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সেই ইঙ্গিত অতীব স্পষ্ট, সংগীতে তার উল্লেখে স্পর্শকাতরতার কোনো কারণ নেই। পূরবী, শেষ সপ্তক, শ্যামলী, আকাশপ্রদীপ, সানাই প্রভৃতি কাব্যের বাতায়নগুলি দিয়ে চেনা-মুখটি বারবার উঁকি দিয়ে যায়। শেষ জীবনের গানেও তার সুস্পষ্ট আবির্ভাবধ্বনি শোনা যায়।

অবশ্য একথাও সত্য যে প্রেমসংগীত মাত্রই কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ক্রিয়া নয়, সুতরাং তাঁর সব গানেই কোনো মানসী মূর্তির অন্বেষণ অপরিহার্য হয়ে ওঠে না। প্রেমের কবিতা এবং প্রেমের গান এই উভয় জাতীয় সৃষ্টি বিষয়ে দুই পৃথক মানদণ্ডও ব্যবহার্য নয়। মহুয়া কাব্যরচনাপ্রসঙ্গে কবি তাঁর প্রেমের কবিতাগুলির যে বিশ্লেষণ করেছিলেন, তাঁর প্রেমের গানের ক্ষেত্রেও আমরা তাই প্রযোজ্য মনে করি। কবি লিখেছিলেন—

"আমি নিজে মহুয়ার কবিতার মধ্যে দুটো দল দেখতে পাই। একটি হচ্ছে নিছক গীতিকাব্য, ছন্দ ও ভাষার ভঙ্গিতেই তার লীলা। তাতে প্রণয়ের প্রসাধনকলা মুখ্য। আর একটিতে ভাবের আবেগ প্রধান স্থান নিয়েছে, তাতে প্রণয়ের সাধনবেগই প্রবল।

...প্রেমের মধ্যে সৃষ্টিশক্তির ক্রিয়া প্রবল। প্রেম সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করে রচনা করে—নিজের ভিতরকার বর্ণে রসে রূপে। তার সঙ্গে যোগ দেয় বাইরের প্রকৃতি থেকে নানা গান গন্ধ নানা আভাস। এমনি করে অন্তর-বাহিরের মিলনে চিত্তের নিভৃত লোকে প্রেমের অপরূপ প্রসাধন নির্মিত

হতে থাকে—সেখানে ভাবে ভঙ্গিতে সাজে সজ্জায় নূতন নূতন প্রকাশের জন্ম ব্যাকুলতা, সেখানে অনির্বচনীয়ের নানা ছন্দ, নানা ব্যঞ্জনা। একদিকে এই প্রসাধনের বৈচিত্র্য, আর একদিকে এই উপলব্ধির নিবিড়তা ও বিশেষত্ব। মহুয়ার কবিতা চিত্তের সেই মায়ালোকের কাব্য, তার কোনো অংশে ছন্দে ভাষায় ভঙ্গিতে এই প্রসাধনের আয়োজন, কোনো অংশে উপলব্ধির প্রকাশ"।[৬]

অর্থাৎ প্রেমবিষয়ক কবিতার মধ্যে স্বভাবতই এই দুই ধারা এসে মেশে—উপলব্ধি ও প্রসাধন, আবেগ ও ভঙ্গি, অভিজ্ঞতা ও শিল্প। মহুয়ার মায়া কবিতাটিকে কবি এর উদাহরণরূপে চিহ্নিত করেছিলেন—

চিত্তকোণে ছন্দে তব বাণীরূপে
সংগোপনে আসন লব চুপে চুপে।
সেখানেতেই আমার অভিসার, যেথায় অন্ধকার
ঘনিয়ে আছে চেতন-বনের ছায়াতলে,
যেথায় শুধু ক্ষীণ জোনাকির আলো জ্বলে।

সেথায় নিয়ে যাব আমার দীপশিখা,
গাঁথব আলো-আঁধার দিয়ে মরীচিকা।
মাথা থেকে খোঁপার মালা খুলে পরিয়ে দেব চুলে,—
গন্ধ দিবে সিন্ধুপারের কুঞ্জবীথির,
আনবে ছবি কোন বিদেশের কী বিস্মৃতির।
পরশ মম লাগবে তোমার কেশে বেশে,
অঙ্গে তোমার রূপ নিয়ে গান উঠবে ভেসে।
ভৈরবীতে উচ্ছল গান্ধার, বসন্তবাহার,
পুরবী কি ভীমপলাশি রক্তে দোলে—
রাগরাগিণী দুঃখে সুখে যায় যে গলে।

হাওয়ায় ছায়ায় আলোয় গানে আমরা দোঁহে
আপন মনে রচব ভুবন ভাবের মোহে।
রূপের রেখায় মিলবে রসের রেখা মায়ার চিত্রলেখা,—
বস্তু হতে সেই মায়া তো সত্যতর,
তুমি আমায় আপনি রচে আপন কর।

কবির প্রীতিগীতির মধ্যেও প্রেমের সাধনবেগ ও প্রসাধনকলা, উপলব্ধি ও রূপান্বয় সমবেত হয়েছে। প্রেম-পর্যায়ের একটি গান—

আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে—
তুমি জান না, আমি তোমারে পেয়েছি অজানা সাধনে।
সে সাধনায় মিশিয়া যায় বকুলগন্ধ,
সে সাধনায় মিলিয়া যায় কবির ছন্দ—
তুমি জান না, ঢেকে রেখেছি তোমার নাম
রঙিন ছায়ার আচ্ছাদনে।
তোমার অরূপ মূর্তিখানি
ফাল্গুনের আলোতে বসাই আনি।
বাঁশরি বাজাই ললিত-বসন্তে, সুদূর দিগন্তে
সোনার আভায় কাঁপে তব উত্তরী
গানের তানের সে উন্মাদনে।

'কবির অন্তরে তুমি কবি' ছবি কবিতার এই প্রীতিতত্ত্বের কথাই বিশেষ ভাবে মনে পড়ে যায়। শেষ বয়সে লেখা (ভাদ্র ১৩৪৬) আর একটি গান গীত-বিতানের তৃতীয় খণ্ডের প্রেম ও প্রকৃতি-পর্যায় থেকে এখানে উদ্‌ধৃত হল—

বারে বারে ফিরে ফিরে তোমার পানে
দিবারাতি ঢেউয়ের মত চিত্ত বাহু হানে,
মন্দ্রধ্বনি জেগে ওঠে উল্লোল তুফানে।
রাগরাগিণী উঠে আবর্তিয়া তরঙ্গে নর্তিয়া
গহন হতে উচ্ছলিত স্রোতে।
ভৈরবী রামকেলি পূরবী কেদারা উচ্ছুসি যায় খেলি,
ফেনিয়ে ওঠে জয়জয়ন্তী বাগেশ্রী কানাড়া গানে গানে।
তোমায় আমায় ভেসে
গানের বেগে যাব নিরুদ্দেশে।
তালী-তমালী-বনরাজি-নীলা বেলাভূমিতলে ছন্দের লীলা
যাত্রাপথে পালের হাওয়ায় হাওয়ায়
তালে তালে তানে তানে।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানগুলিকে কেবলমাত্র প্রসাধনকলার দিক থেকেই গ্রহণ করা যায় না, সাধনবেগ-উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার ভূমি থেকেই

তাদের উৎসারণ। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানের একটি মুখ্য বিশেষত্ব হল তার বেদনায়—বিরহবেদনার দুঃসহ অশ্রুস্রোত সেগুলিকে আগাগোড়া পূর্ণ করে রেখেছে। অধিকাংশ গানে কান পাতলেই এক বিচ্ছেদবিরহের রাগিণী শোনা যায়। কোন অন্তহীন শোক, বিরহের কোন গভীর বিলাপ কবিজীবনকে এমন করে বেষ্টন করে রেখেছিল, রবীন্দ্রজীবনীপাঠকের কাছে সে সত্য অজ্ঞাত নয়। যে গভীর হাহাকার যৌবন থেকে গোধূলির অন্তমুহূর্ত পর্যন্ত কবিজীবনকে এমন দুরপনেয় ক্রন্দনের দিকে চালিত করেছে, যে শোক-বেদনার উপর বারেবারে কবি তাঁর গতি ও চলমানতার দর্শনটিকে গড়ে তুলেছেন, যে একমাত্র শোক তাঁর 'পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিযাছে', সেই শোক সেই বিরহ তাঁর সমস্ত প্রেমসংগীতের মন্দিরের একমাত্র বেদী। সেই বেদীর উপর অধিষ্ঠিত একটি মাত্র প্রতিমা—'নিত্যকাল সে শুধু আসিছে'। নক্ষত্রলিপির পত্রে কবির সঙ্গে একটি নামই লেখা আছে, অনাদি অজ্ঞাত যুগে সে চড়েছে তার চতুর্দোলা, চিরভোলা সেই নারী জ্যোতিষ্কের আলোছায়ার পথে—কণ্ঠে মুক্তাহার, চরণে সোনার চরণচক্র আঁকা। সেই মহীয়সী নারী স্নান করে উঠেছে মহাসমুদ্রের জলে—এসেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে কবির সর্বদেহে-মনে, পূর্ণতর করেছে কবিকে, তাঁর বাণীকে—

জ্বেলে রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে
চিরবিরহের প্রদীপশিখা।
সেই আলোকে দেখেছি তাকে অসীম শ্রীলোকে,
দেখেছি তাকে বসন্তের পুষ্পপল্লবের প্লাবনে,
সিসুগাছের কাঁপন-লাগা পাতাগুলির থেকে
ঠিকরে পড়েছে যে রৌদ্রকণা
তার মধ্যে শুনেছি তার সেতারের দ্রুতঝংকৃত সুর।
দেখেছি ঋতুরঙ্গভূমিতে
নানা রঙের ওড়না-বদল-করা তার নাচ
ছায়ায় আলোয়।

আবার ইতিহাসের সৃষ্টি-প্রাঙ্গনে কবি তাকে দেখেছেন 'বিধাতার বাম পাশে'। জগতে ও জীবনে সুন্দরের অবমাননায়, কদর্য কলুষের অশুচি স্পর্শে সভ্যতার বিকারে কবি দেখেছেন সেই প্রেমিকা রূপান্তরিত হয়েছে রুদ্রাণীতে,

তারই ত্রিনয়নের প্রলয়াগ্নি 'ধ্বংস করেছে মহামারীর গোপন আশ্রয়'। হয়ত বা কবি বলতে চান, তারই প্রেরণায় কবিও জীবনে সুন্দরের অসম্মানে, কল্যাণের প্রতি পীড়ন-অমর্যাদায় ধিক্কার দিয়েছেন, প্রলয়াভিশাপ বর্ষণ করেছেন। সুতরাং চেতনার নিভৃত গভীরে চিরবিরহের প্রদীপশিখা জ্বেলে গেছে যে মহীয়সী নারী, অপরিসীম ধ্যানরূপিণী সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে রবীন্দ্র-সংগীতরসিকেরও পক্ষে চিনতে না পারার কথা নয়।

গীতবিতানে প্রেমাপর্যায়ের গানগুলি কালানুক্রমিকতায সাজানো নেই বলে রবীন্দ্রসংগীতে প্রেমচেতনার ধারাবাহিক মানচিত্রটি আমরা পাই না। তাঁর অনেক প্রেমের গানেই প্রেমিকার রূপমূর্তি অস্পষ্ট। প্রসাধনকলা ও সাধনবেগ, অভিজ্ঞতা ও রূপসৃষ্টির যৌগপত্যে তাই অনেক প্রেমের গানেই একটি কল্পমানসী গড়ে উঠেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে' গানটির কথাই ধরা যাক। ২ মার্চ ১৯৩০ তারিখে একটি পত্রে কবি লিখেছেন—

"আজ চলেছি রেলগাড়িতে চড়ে মাদ্রাজের দিকে। জানালার বাইরে আমার দুই চক্ষের অভিসার আর থামে না···মন বলচে দেখে নিলুম।···যারা এতকাল দেখেচে এবং চিরকাল দেখবে তাদেরই দেখাকে সংগ্রহ করে নিলুম—সেই সঙ্গে একটা কবিতাও লেখা গেল

সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে
দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে।"

এই পত্রেই সাক্ষ্যেই তো বলা যায়, তুলনাহীনা কবির রূপদর্শনের আনন্দ-মাত্র, জগতে কোথাও কোনোদিনই তার অস্তিত্ব ছিল না। হয়ত বা তাই—কিন্তু কবির মনোলোকের স্বরূপনির্ণয়প্রসঙ্গে বাইরের ঘটনা বা পত্রের উল্লেখ কখনো কখনো সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর অথবা অর্ধসত্য হয়ে উঠতে পারে। যথার্থ কবিতার প্রেরণা তো বাইরের জগতে নয়, মনের সংগোপনে—

সেইখানেতেই আমার অভিসার যেথায় অন্ধকার
ঘনিয়ে আছে চেতন-বনের ছায়াতলে
যেথায় শুধু ক্ষীণ জোনাকির আলো জ্বলে।

এই চেতন-বনের ছায়ান্ধকার অভিসারকুঞ্জে, সৃষ্টির এই নিভৃত নেপথ্যে একটি লাবণ্যলক্ষ্মীই অধিবাসিতা—তিনিই রূপে রূপে, নানা দেশে, নানা সেবায় ও

প্রেমে দেখা দেন, তবু 'অতল মাধুরী-সিন্ধুতীরে' সেই বিচিত্রা কখনও কখনও যেন কবির অপরিচিত বলেই মনে হয়েছে। পরিশেষের 'আমি' কবিতার ভাষায় বলা যায়—

আজি ভাবি মনে মনে তাহারে কি জানি
যাহার বলায় মোর বাণী
যাহার চলায় মোর চলা,
আমার ছবিতে যার কলা,
যার স্বর বেজে ওঠে মোর গানে গানে,
সুখে দুঃখে দিনে দিনে বিচিত্র যে আমার পরাণে।

১৯৩০ সালের ৭ নভেম্বর নিউ ইয়র্কে বসে লেখা 'তুমি' কবিতায় সেই একতমার নির্দিষ্ট নির্ভুল পদধ্বনি শুনতে পাই। কবির উক্তির মধ্যে যে প্রেম একটি সুপবিত্র উদ্‌গাথা হয়ে উঠেছে, সামান্যের সন্দিগ্ধ কলুষতা থেকে তাকে উদ্ধার করাই সমালোচকের প্রথম কাজ। 'তুমি' কবিতায় কবি লিখেছেন—

প্রেমের দেয়ালি দিয়েছিল জ্বালি তোমারই দীপের দীপ্তি
মোর সংগীতে তুমিই সঁপিতে তোমার নীরব তৃপ্তি।
আমারে লুকায়ে তুমি দিতে আনি
আমার ভাষায় সুগভীর বাণী,
চিত্রলিখায় জানি আমি জানি তব আলিপনলিপ্তি
হৃৎশতদলে তুমি বীণাপাণি সুরের আসন পাতি
দিনের প্রহর করেছ মুখর এখন এল যে রাতি।

সুতরাং তুলনাহীনারে গানেও কবির প্রেমভাবনা ও সৌন্দর্যচেতনা একটি ঘনীভূত রূপ ধারণ করেছে। 'যে নারী বিচিত্রবেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার' সেই নারীই নিখিলের সৌন্দর্যসত্তায় মিশ্রিত হয়ে আছে—'আছে সে নিখিলের মাধুরীরুচিতে'। এই সত্য কোনো মতেই অস্বীকার করা যায় না বলেই 'একথা কভু আর পারে না ঘুচিতে'। পথে যেতে হঠাৎ-দেখা সৌন্দর্যের বিস্ময় থেকে তুলনাহীনার জন্ম হয়, কিন্তু অচিরেই আবিষ্কৃত হয় অনন্তবিশ্বের সৌন্দর্যলোকে সেই অতুলনীয়ার ধ্যানরূপ পূর্ব থেকেই আছে এবং কবির গান এতকাল তার উদ্দেশেই নিবেদিত। আজও তাঁর সারস্বত সৃষ্টিতে সেই স্বপ্নলোকবাসিনীর স্মৃতি, তাঁর গানে প্রকৃতির পটে ঋতুর বিবর্তনে জেগে থাকে স্মৃতিবেদনার রঙে-আঁকা একটি সেই বিরহিণী মূর্তি, সুর দিয়েই যাকে পাওয়া

যায়। অর্থাৎ ছোট ছোট রূপখণ্ডগুলি একটি অপরূপের স্মৃতি জাগিয়ে যায়—বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীর দূতীরা যেমন ইঙ্গিতে জানিয়ে যায় 'আমি তারই দূত, সে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে, নিত্যকাল সে শুধু আসিছে।' মৃত্যুবিচ্ছিন্না, অসীমে স্থানান্তরিতা, স্মৃতিলোকবাসিনী সেই সৌন্দর্যময়ী সত্তা কখনো বিরহিণী, কখনও বিদেশিনী, কখনও জীবনদেবতারূপেও কল্পিত হয়েছে। জীবনস্মৃতি গ্রন্থে 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে' গানখানির রচনাকালীন কবিমনোভাবটি এখানে উদ্ধারযোগ্য—

"ঐ সুরের মন্ত্রগুঞ্জরণে বিদেশিনীর এক অপরূপ মূর্তি জাগিয়া উঠিল। আমার মন বলিতে লাগিল, আমাদের এই জগতের মধ্যে একটি কোন বিদেশিনী আনাগোনা করে—কোন রহস্যসিন্ধুর পরপারে ঘাটের উপরে তাহার বাড়ি—তাহাকেই শারদপ্রাতে মাধবীরাত্রিতে ক্ষণে ক্ষণে দেখিতে পাই—হৃদয়ের মাঝখানেও মাঝে মাঝে তাহার আভাস পাওয়া গেছে, আকাশে কান পাতিয়া তাহার কণ্ঠস্বর কখনও বা শুনিয়াছি। সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ব-বিমোহিনী বিদেশিনীর দ্বারে আমার গানের সুর আমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল……।"

এই যে বিদেশিনী সে কোনো বিদেশের নারী বলেই বিদেশিনী নয়, রহস্য-সিন্ধুর পরপারে ঘাটের উপর তার নিবাস—সেই ঘাট থেকেই বিদেশিনী সম্ভবত কখনও কখনও বা সোনার তরী বেয়ে কবির কাছে চলে আসে, নিয়ে যায় কবিকে নিরুদ্দেশ যাত্রায়। কখনো বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কবি গেয়ে বলেন, 'ঠাঁই হল না তোমার সোনার নায় গো'। হৃদয়ের মাঝখানেও কখনও কখনও তার আভাস পাওয়া গেছে, আকাশে কান পেতেও তার কণ্ঠস্বর শোনা যায়। সোনার তরীর মানসসুন্দরী কবিতায় কবি যাকে প্রকৃতির মাধুর্যসার দিয়ে বিশ্ববিমোহিনী শোভাময়ী মানসী মূর্তিতে এঁকেছেন, পরিণত বয়সের একটি গানে তার স্মৃতি-উদ্বোধন ঘটেছে নিসর্গবিশ্বের মধ্য দিয়েই—

লিখন তোমার ধুলায় হয়েছে ধূলি,
হারিয়ে গিয়েছে তোমার আখরগুলি।
চৈত্ররজনী আজ বসে আছি একা, পুন বুঝি দিল দেখা—
বনে বনে তব লেখনীলীলার রেখা,

নব কিশলয়ে গো, কোন ভুলে এল ভুলি, তোমার পুরানো আখরগুলি।

মল্লিকা আজি কাননে কাননে কত

সৌরভে-ভরা তোমারই নামের মত।

কোমল তোমার অঙ্গুলি-ছোঁওয়া বাণী মনে দিল আজি আনি

বিরহের কোন ব্যথাভরা লিপিখানি।

মাধবীশাখায় উঠিতেছে দুলি দুলি তোমার পুরানো আখরগুলি।

এইজন্যই প্রেমিকা রবীন্দ্রনাথের গানে কোথাও স্পষ্টরেখায় অঙ্কিত নয়, সে শুধুই ইঙ্গিতপ্রতিমা। 'উদাসিনীবেশে বিদেশিনী কে সে নাইবা তাহারে জানি'—এখানে বিদেশিনীর প্রতি অর্ধপরিচিত বিস্ময়। 'তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম/নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথিনীসম'—এখানে হৃদয়বাসিনীর প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস। তাই তাকে কোথাও সম্পূর্ণ করে দেখা যায় না, ধরা-ছোঁওয়া যায় না। 'আরও কিছুক্ষণ না হয় বসিয়ো পাশে' গানে কবি গেয়েছেন—

দ্বিধাভরে আজো প্রবেশ করনি ঘরে

বাহির আঙনে করিলে সুরের খেলা

জানি না কী নিয়ে যাবে যে দেশান্তরে,

হে অতিথি আজি শেষ বিদায়ের বেলা।

যেন গৃহান্তঃপুরে প্রবেশের অসমাপ্তির বেদনায় কবির মনে সন্দেহ রয়ে গেছে, কবির অন্তরের নিরুদ্ধ-গোপন অনুরাগের কথা সে জেনে গেছে কিনা—'সে মোর অগম অন্তরপারাবারে রক্তকমল তরঙ্গে টলোমলো'। কবি কিন্তু সেই প্রভাতের বক্ষ থেকে ছিনিয়ে-আনা বাণীটিকে আজও বহন করে চলেছেন—'সে বাণী আপন গোপন প্রদীপ জ্বেলে রক্ত আগুনে প্রাণে মোর জলোজ্বলো'। কবির প্রেমিকা নাম-না-জানা অতিথির মত। সহস্র লোকের মধ্যে সঙ্গীহীন কবির কাছে হঠাৎ আলোর মত এসে পড়বে, সেই কামনা নিয়ে, প্রতীক্ষা নিয়ে তিনি বসে আছেন। কবির এই অসীম প্রতীক্ষা, কানে-কানে কথা-বলা, রাত্রির আলাপ, প্রভাতের বিদায়, বৃষ্টিজলে আগমনের সংকেত, বসন্তে তার উত্তরীয়ের আভাস, এ সবই বাস্তব লৌকিক সংসারের জীবনলীলার আনুমানিক নাট্যগীতি বলে মনে হয় না। 'কত কথা তারে ছিল বলিতে'—কিন্তু এখন যে নেই তা কেবল-মাত্র অদর্শন নয়, সাময়িক বিচ্ছেদ নয়। তা এমন-কিছু, যা ইহজন্মে আর কখনও মিলনের প্রত্যাশা রাখে না। তাই কবি—

বসে বসে দিবারাতি বিজনে সে কথা গাঁথি
কত যে পুরবীরাগে কত ললিতে।
সে কথা ফুটিয়া ওঠে কুসুমবনে,
সে কথা ব্যাপিয়া যায় নীল গগনে।
সে কথা লইয়া খেলি হৃদয়ে বাহিরে মেলি
মনে মনে গাহি কার মন ছলিতে।

'সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দনফুলহার' বলে যাকে বন্দন-উপহার দেওয়া যায়, সে কি বাস্তবিকা নারী, না পলাতকা সৌন্দর্যাধিষ্ঠাত্রী মানসসুন্দরী? নইলে 'ছিঁড়ি মর্মের শত বন্ধন তোমা-পানে ধায় যত ক্রন্দন' এই উক্তি কি সম্ভব হত? 'আজি গোধূলি লগনে এই বাদলগগনে' শুধু তার আগমনের সম্ভাবনা মাত্র, শুধু উতলা বাতাসে তার উত্তরীয়ের আভাস, রজনীগন্ধার গন্ধে তার আবির্ভাবের সৌরভ-ঘোষণা, দিগঙ্গনার হৃদঞ্চলে কম্পন—'সে আসিবে' এই রোমান্টিক প্রত্যাশা। সে কখনও বিচিত্রা, কখনো বিদেশিনী, কখনও চঞ্চল, কখনও স্বপ্নস্বরূপিণী—

এবার উজাড় করে লও হে আমার যা-কিছু সম্বল।
ফিরে চাও, ফিরে চাও, ফিরে চাও, ওগো চঞ্চল।
চৈত্ররাতের বেলায় না হয় এক প্রহরের খেলায়
আমার স্বপনস্বরূপিণী প্রাণে দাও পেতে অঞ্চল।...

কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন এঁকে আবার মুছে দিয়ে যায় এই চঞ্চল, বেলা না যেতে খেলা দেয় ঘুচিয়ে। চকিত চোখের অশ্রুসজল বেদনায় ছুঁয়ে যায় সে কোন সুদূর পারে, আর তখনই—

এসো এসো এসো আঁখি কয় কেঁদে
তৃষিত বক্ষ বলে রাখি বেঁধে।

এই স্বপ্নস্বরূপিণীর অভিসারের পথে পথে স্মৃতির দীপ-জ্বালা। আজও তন্দ্রা-বিহীন রাত্রে ঝিল্লিঝংকৃত স্পন্দমান বাতাসে সেই স্বপ্নস্বরূপিণীর অঞ্চলের কম্পন সঞ্চারিত হয়। 'জানি তোমার অজানা নাহি গো' গানে অনুভব করি নীরব প্রেমবহনের বেদনা কেবল প্রিয়জনের দৃষ্টিতে ধরা পড়ার জন্যই—এই উক্তিতে যে বাস্তবতা আছে তা পরবর্তী উক্তিগুলিতে খণ্ডিত হয়, কবি যখন বলেন, তিনি তাঁর অন্তর 'পুজাবেদী' নির্মাণ করেছেন, ধেয়ানের মালা গেঁথে রাত্রি

যাপন করেন। কবির প্রেম বয়সের ভারে জীর্ণ হয় না, মৃত্যুবিচ্ছিন্না প্রিয়তমা যেহেতু অনন্ত-যৌবনা। তাই কবি বলেন—

তোমার প্রেমে যে লেগেছে আমায় চিরনূতনের সুর
সব কাজে মোর সব ভাবনায় জাগে চিরসুমধুর।
মোর দানে নেই দীনতার লেশ, যত নেবে তুমি না পাবে শেষ—
আমার দিনের সকল নিমেষ ভরা অশেষের ধনে।

রক্তকরবীর বিশু নন্দিনীকে উদ্দেশ করে গেয়েছিল 'মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে'—এ গানের ভাষা সোনার তরীর ও নিরুদ্দেশ যাত্রার চিত্রকল্পকেই মনে করিয়ে দেয়। 'আমার দোসর যে জন ওগো তারে কে জানে' গানটিও অনির্দেশ্য নারীর। এই ধরনের উদাহরণ অসংখ্য।

৪

পত্রপুটের পূর্বোল্লিখিত পনেরো সংখ্যক কবিতায় কবি তাঁর প্রেমের ইতিবৃত্ত বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে তাঁর ভালোবাসার একটি ধারা গ্রামের চিরপরিচিত অল্পবেগের অগভীর নদীপ্রবাহের মত প্রিয়ার সামান্য প্রতিদিনের অনুচ্চ তটচ্ছায়ায় বয়ে চলেছে এবং ভালোবাসার আর একটি ধারা মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিতবাহিনী। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানে ভালোবাসার এই দুই ধারাকে সহজে পৃথক করা যায় না একথা সত্য। কিন্তু মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিতবাহিনী প্রেমের পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছেন—

সে এসেছে অপারসীম ধ্যানরূপে
আমার সর্বদেহে মনে—
পূর্ণতর করেছে আমাকে, আমার বাণীকে।
জেলে রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে
চিরবিরহের প্রদীপশিখা।

বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারই রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানগুলির স্থায়ী ভাব। মিলনের চেয়ে বিরহেই কবির প্রেমবেদনা যথার্থ সারস্বত প্রকাশ লাভ করেছে। এমন কি তাঁর ঈশ্বর-সম্বোধনে ভক্তি-সাধনাতেও মিলনের চেয়ে বিরহের বাণীই প্রবল—'হেরি অহরহ তোমারই বিরহ ভুবনে ভুবনে রাজে হে'। বলাকার ২৯ পৌষ ১৩২১ তারিখে লেখা 'আনন্দগান উঠুক তবে বাজি' কবিতায় কবি বলেছেন—

কোনো কালে হয়নি যারে দেখা, ওগো, তারই বিরহে
এমন করে ডাক দিয়েছে—ঘরে কে রহে।

২৫ আশ্বিন ১৩১৬ তারিখে লেখা গীতাঞ্জলির 'গায়ে আমার পুলক লাগে' গানে মর্তপ্রীতির নিবিড় হর্ষপুলকের মধ্যেও বিরহের রোমাঞ্চ—

আনন্দ আজ কিসের ছলে কাঁদিতে চায় নয়নজলে
বিরহ আজ মধুর হয়ে করেছে প্রাণ ভোর।

বিরহের মধ্যে আছে চিরপ্রতীক্ষা, যুগান্তের বেদনা, প্রণয়ের জন্মজন্মান্তর-বাহিত নিরবচ্ছিন্নতার অনুভব। তাই বিরহের বার্তাই কবির প্রণয়ভাবনার ধ্রুবপদ, তাই 'প্রেম বলে যে যুগে যুগে তোমার লাগি আছি জেগে'। প্রেমের গানের চরণে চরণে জড়িয়ে ধরেছে 'বিরহের কোন ব্যথাভরা লিপিখানি'। 'না না গো না কোর না ভাবনা' গানে কবি লিখেছেন

দোলাতে দোলে মন মিলনে বিরহে
বারে বারেই জানি তুমি তো চির হে।

কড়ি ও কোমল মায়ার খেলার যুগ থেকেই এই বিরহের লবণাম্বুসমুদ্রের ধারে কবির স্থায়ী গৃহপত্তন। কড়ি ও কোমলের 'ওগো এত প্রেম-আশা প্রাণের তিয়াষা কেমনে আছে সে পাশরি' গানের পংক্তিগুলি উদ্ধারযোগ্য—

যদি আমারে আজি সে ভুলিবে সজনী, আমারে ভুলালে কেন সে
ওগো এ চিরজীবন করিব রোদন, এই ছিল তার মানসে।
যবে কুসুমশয়নে নয়নে নয়নে কেটেছিল সুখরাতি রে,
তবে কে জানিত তার বিরহ আমার হবে জীবনের সাথি রে।

'পুষ্পবনে পুষ্প নাহি আছে অন্তরে' গানে কবি এই দুঃখকে অনিবার্য বলেই গ্রহণ করেছেন—

দুখেরে করি না ডর, বিরহে বেঁধেছি ঘর,
মনকুঞ্জে মধুকর তবু গুঞ্জরে।
হৃদয়ে সুখের বাসা, মরমে অমর আশা,
চিরবন্দী ভালোবাসা প্রাণপিঞ্জরে।

মায়ার খেলার দ্বিতীয় দৃশ্যে শান্তার গান 'আমার পরাণ যাহা চায়' মনে পড়ছে। শান্তাও বলেছিল—

আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন তোমাতে করিব বাস
দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী দীর্ঘ বরষ-মাস।

এই উপলব্ধি কবির নিজের জীবনেই সত্য হয়ে উঠেছে। বিরহই তাঁর প্রেমসংগীতের উদ্দীপনবিভাব—

যখন থাক দূরে
আমার মনের গোপন বাণী বাজে গভীর সুরে।

'কাল রাতের বেলা গান এলো মোর মনে' এই গানটিতে কবির সংগীত-সৃষ্টিতে বিরহের প্রেরণাই স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাই 'আমার মনের কোণের বাইরে' গানে কবির ভালোলাগার পাত্রী 'অনেক দূরে উদাস সুরে আভাস যে তার পাই রে'। শাপমোচনের 'কখন দিলে পরায়ে স্বপনে' গানটিতে দেখি কবি তাঁর প্রিয়তমার কাছ থেকে যে বরণমালা পেয়েছিলেন, তা স্বপ্নলব্ধ মাত্র, বিরহই তার পরম প্রাপ্তি, কারণ সে আগমন ছিল দৃষ্টির অতীত। তাই কী দুঃখময় সেই প্রাপ্তি—

আঁধারে দুঃখডোরে বাঁধিলে মোরে,
ভূষণ পরালে বিরহবেদন-ঢালা।

এইজন্যই দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে গানের আলোচনাপ্রসঙ্গে কবি বলেছিলেন—"হৃদয়ের বাণীকে সে রাঙিয়ে তোলে সুরে। যেমন ধরো, যখন ভালোবাসার গান গাই তখন পাই শুধু গানের আনন্দকেই না, ভালোবাসার উপলব্ধিকেও মেলে এমন এক নতুন নৈশ্চিত্যের মধ্যে দিয়ে যে, মন বলে পেয়েছি তাকে যে অধরা, যে অলোকবাসী, যে কাছের থেকে দেয় না ধরা দূরের থেকে ডাকে"।[৭]

সুতরাং বিচ্ছেদবিরহের দ্বারাই কবির প্রেম প্রদীপ্ত। এই বিরহই তাঁর প্রেমের মূল সুর। এই বিরহকে কত রাগে, কত রঙে, কান্নাহাসির কত বাঁধনে, প্রকৃতির আলোছায়া দিয়ে সাজিয়েও কবির কথা শেষ হল না। গান দিয়েই এই বিরহকে কবি স্পর্শ করেছেন, 'যার বিরহের নাই অবসান তার মিলনের আনে ভাষা' কবির সংগীত। এই সংগীতেই তিনি বলতে পেরেছেন—

ভয় করব না বিদায়বেদনারে
আপন সুধা দিয়ে ভরে দেব তারে।
চোখের জলে সে যে নবীন রবে, ধ্যানের মণিমালায় গাঁথা হবে,
পরব বুকের হারে।
নয়ন হতে তুমি আসবে প্রাণে মিলবে তোমার বাণী আমার গানে।
বিরহব্যথায় বিধুর দিনে দুখের আলোয় তোমায় নেব চিনে
এ মোর সাধনারে।[৮]

বস্তুত বিরহার্ত দুঃখদিনে ধ্যানের মণিমালায় প্রিয়জনের স্মৃতি গেঁথে রেখে বাণীতে গানে তাকে অনিঃশেষ প্রকাশ করে যাওয়াই প্রেমের গীতকার রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সারস্বত সাধনা। এই বিরহ কোনো বসন্ত পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাপুলকিত মিলনস্মৃতিতে উদ্দাম হয়ে উঠেছে, কখনও কোনো মধ্য-দিনের বিজন বাতায়নে, কখনো বা যূথীগন্ধ-অশান্ত সমীরে, নিদারুণ বিচ্ছেদের নিশীথে উদাসী হয়ে উঠেছে, কখনও সেই চিরবিরহের বক্ষোপঞ্জর থেকে চিরমিলনের প্রত্যাশায় উঠেছে করুণ সুর—হারানো-দিনের ভাষা স্বপ্নে সঞ্চরণ করেছে শুধু। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রেমসংগীতগুলির মধ্যে এই বিরহ-বেদনার ঐক্যসূত্রে একটি মানসপ্রতিমাকেই অঙ্কিত করে নিতে ইচ্ছা করে, পূরবী থেকে সানাই পর্যন্ত স্মৃতিমথিত কবিতাগুলি যার ধ্যানে উৎসৃষ্ট, গানে গানে তারই অঞ্চলের ছায়া। আবার গান দিয়ে বলা যায়—

ওগো আমার চির-অচেনা পরদেশী,
ক্ষণতরে এসেছিলে নির্জন নিকুঞ্জ হতে কিসের আহ্বানে।
যে কথা বলেছিলে ভাষা বুঝি নাই তার,
আভাস তারই হৃদয়ে বাজিছে সদা
যেন কাহার বাঁশির মনোমোহন সুরে।
প্রভাতে একা বসে গেঁথেছিনু মালা,
ছিল পড়ে তৃণতলে অশোকবনে।
দিনশেষে ফিরে এসে পাইনি তারে,
তুমিও কোথা গেছ চলে—
বেলা গেল, হল না আর দেখা।

শেষ বয়সে মায়ার খেলার নৃত্যনাট্য রূপদানকালে কবি যে কয়েকটি নতুন গান রচনা করেছিলেন, তার একটিতে কবির এই বিরহদুঃখোজ্জ্বল প্রেমের অপূর্ব পরিচয়লিপি আছে—

দুঃখের যজ্ঞঅনল-জ্বলনে জন্মে যে প্রেম
দীপ্ত সে হেম।…
দুরাকাঙ্ক্ষার পরপারে বিরহতীর্থে করে বাস
যেথা জ্বলে ক্ষুব্ধ হোমাগ্নিশিখায় চিরনৈরাশ—
তৃষ্ণাদাহনমুক্ত অনুদিন অমলিন হয়।
গৌরব তার অক্ষয়।…

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় দুরাকাঙ্ক্ষা বা অসম্ভব প্রত্যাশার পরপারে যে বিরহ, কবি তাকে তীর্থের মর্যাদা দিয়েছেন। সেখানে ক্ষুব্ধ অগ্নিসম নৈরাশ্যের বাস থাকলেও তা তৃষ্ণাদাহমুক্ত, তাই সে জ্যোতির্ময়, অশ্রু-উৎসজলস্নানে তাপস। ভাসান-খেলার নদীতটে বাসা নিয়েছেন কবি, 'বেদনাহীন মুখের ছবি স্মৃতির পটে' নিয়ে। 'তুমি কোন ভাঙনের পথে এলে সুপ্তরাতে' গানে যে নারীর স্মৃতিকে কবি রক্তমণির হারে গেঁথে রাখতে চেয়েছেন, 'তা বক্ষে দুলিবে গোপনে নিভৃত বেদনাতে'।

শেষ বয়সের প্রেমসংগীতগুলিতে এই বিরহের তীব্রতা শোনা যায় আরো কয়েকটি গানে—মম দুঃখের সাধন যবে করিনু নিবেদন, বাণী মোর নাহি, আজি দক্ষিণ পবনে, যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল, আমার আপন গান আমার অগোচরে, অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে, আমি যে গান গাই জানিনে সে, ওগো স্বপ্নস্বরূপিণী, ধূসর জীবনের গোধূলিতে, দোষী করিব না করিব না তোমারে, দৈবে তুমি কখন নেশায় পেয়ে, ভরা থাক স্মৃতিসুধায়, জ্বলেনি আলো অন্ধকারে, নীলাঞ্জন ছায়া, ফিরবে না তা জানি, দিনের পরে দিন যে গেল—এ সব গান কবির সেই প্রেমবেদনা স্মৃতিপুলক বিরহরাগে অনুভাবিত। না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, ফিরে ফিরে ডাক দেখি রে পরাণ খুলে, নাই যদি বা এলে তুমি, শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ণ সন্ধ্যায়, কোন গহন অরণ্যে তারে এলেম হারায়ে—গানগুলিও কবির সেই প্রেমস্মৃতিতে শিহরিত। 'কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে' গানে মৃত্যুর অন্ধকারে হারিয়ে-যাওয়া একটি পুষ্পের প্রতীকে কার জন্য কবির এই গভীর বিষণ্ণতা—

আঁধারে যাহারা চলে সেই তারাদের দলে
এসে ফিরে গেল বিরহের ধারে ধারে।
করুণ মাধুরীখানি কহিতে জানে না বাণী
কেন এসেছিল রাতের বন্ধ দ্বারে।

'যখন ভাঙল মিলন-মেলা' গানটি যেন ছবি কবিতারই গীতরূপ, বিস্মৃতির অভিশাপ থেকে সহসা লুপ্ত স্মৃতির চকিত আবির্ভাবে বিপন্ন। 'সময় আমার নাই যে বাকি' গানে কবি বলেছেন—

পণ করেছি তোমার হাতে আপনারে
শেষ করে আজ চুকিয়ে দেব একেবারে।...
তোমার আলোয় ডুবিয়ে নেব সজাগ আঁখি।

কী সুর বাজে আমার প্রাণে, গহন ঘন বনে পিয়াল-তমাল-সহকার-ছায়ে, কে উঠে ডাকি মম বক্ষোনীড়ে থাকি থাকি, ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে, হেলাফেলা সারাবেলা, তুই ফেলে এসেছিস কারে, আমায় থাকতে দে না আপন মনে, হে বিরহী হায় চঞ্চল হিয়া তব প্রভৃতি গানগুলিও সবই কবির ব্যক্তিগত প্রেমবেদনাতুর বিরহার্ত হৃদয়ের চিত্র। রবীন্দ্রনাথের প্রেম-সংগীতগুলির সাহায্য না নিলে কবির প্রেমচেতনার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়।

৫

রবীন্দ্রনাথের প্রেমপর্যায়ের গীতসংখ্যা গানবিষয়ক ২৭টি, এবং অন্যান্য সংখ্যা ৩৬৮টি। প্রেমবৈচিত্র্য নামেই কবি তাদের সন্নিবেশিত করেছেন। বিরহ-বেদনাই যে-প্রেমের সর্বোত্তম তিলক সেখানে সূক্ষ্মতর প্রসঙ্গভেদের প্রয়োজনীয়তা সম্ভবত কবির কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছিল। তাই প্রেমের গানে কবি কোনো পর্যায়বিভাগ করেননি বলে আমাদের ক্ষীণ আক্ষেপ থেকে যায়। যদিচ প্রেমবৈচিত্র্য শব্দই তাদের বিচিত্রতার নিশ্চিত নির্দেশ—কিন্তু কী সেই বিচিত্রতা? সে কি শুধু মহুয়ার মত সাধনবেগ ও প্রসাধনকলা এই দুই ভাগে বিভাজ্য? সে বিভাজনও স্পষ্ট হতে পারে না, কারণ মহুয়ার মায়া কবিতাই তো এক বাণীদেহে দুই প্রকাশরীতির মিলন। আসলে প্রেম-বৈচিত্র্যের মধ্যেও বহু গানের পরস্পর-সংস্থাপনের দ্বারা কবি কিছু-কিছু ভাবসাম্য রক্ষা করেছেন। বেশ কয়েকটি গানের মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম অদৃশ্য কোনো ভাবসূত্র একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য নয়। অবশ্য কবির নিভৃত সারস্বতনিকেতনে কোন গান কী কোমল সূক্ষ্ম ভাবগ্রন্থিতে পরস্পরসম্বদ্ধ ছিল আমাদের পক্ষে তা আবিষ্কার করা কঠিন। সেইজন্য যখনই কয়েকটি গানের মধ্যে একটি ভাবসারূপ্যের সূত্র পাওয়া গেল বলে মনে হয়, পরবর্তী কোনো একটি গানের ভাষায় এসে দেখা যায় সেটি 'আবার হারায়ে যায়'।

প্রেমবৈচিত্র্যের গানগুলির মধ্যে 'বিদায়' একটি অনুল্লিখিত শিরোনাম তাতে সন্দেহ নেই, প্রেমপর্যায়ের ১৪৮-১৭৯ পর্যন্ত সংখ্যা-চিহ্নিত গানগুলি এই বিদায়-সংক্রান্ত। এর মধ্যে বিদায়ের আশঙ্কা, বিদায়-প্রার্থনা, বিদায়ের পর স্মৃতিবেদনার উচ্ছল প্লাবন, বিদায়ের পূর্বে স্মৃতিরক্ষার করুণ মিনতি, না-যাওয়ার জন্য কাতর অনুনয়, প্রভাত-প্রারম্ভে অভিসারিকার ক্লান্ত অথচ সন্ত্রস্ত বিদায়,

ক্ষণআগমন ও মুহূর্ত-বিদায়ের জন্য অনুযোগ, বিদায়ের অনিবার্যতা সত্ত্বেও প্রেমের আকর্ষণে দ্বিধা, বিদায়-মুহূর্তে শেষ বাণীর কাতরতা, বিদায়ের নিশ্চিত অনিবার্য সত্য—এমন সূক্ষ্মতর প্রসঙ্গে গানগুলিকে চিনে নেওয়া যায়। কিন্তু এই ধরনের বিষয়বিভাগ বস্তুত অবান্তর, বিশেষত রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে। মিষ্টতার ইতরবিশেষ আছে, মাধুরীর কোনো স্তরপরম্পরা নেই। মোটামুটি গীতবিতান থেকে বিদায়বাচক এই গানগুলি নির্দেশ করা যেতে পারে—তবে শেষ করে দাও শেষ গান, সখী আমারই দুয়ারে কেন আসিল, নাই বা এলে যদি সময় নাই, কাঁদালে তুমি মোরে, স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে, মিলনরাতি পোহাল, হে ক্ষণিকের অতিথি, হায় অতিথি এখনি কি হল তোমার, মুখখানি কর মলিন বিধুর, ওকে বাঁধিবি কে রে, সকালবেলার আলোয় বাজে, কাঁদার সময় অল্প ওরে, কেন রে এতই যাবার ত্বরা, জানি জানি হল যাবার আয়োজন, আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে, কে বলে যাও যাও আমার যাওয়া তো নয় যাওয়া, কেন আমায় পাগল করে যাস, যদি হল যাবার ক্ষণ, ক্লান্ত বাঁশির শেষ রাগিণী, কখন দিলে পরায়ে, যাবার বেলা শেষ কথাটি, জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার, না রে না রে ভয় করব না বিদায়বেদনারে ইত্যাদি। এইগুলির ভিতর দিয়ে বিদায়ের নানা ব্যঞ্জনা বহুতর ইঙ্গিতে ধ্বনিত হয়েছে। কোথাও নিষিদ্ধ প্রেমের ক্ষণিক মিলনাবসানে প্রভাতের লজ্জিত বিদায় এবং প্রেমিকার সকাতর মিনতি, কোথাও বর্ষার বা বসন্তের পটভূমিতে বিদায়ের আভাস। আবার এরই পাশে প্রেম তার বিষয়ের সংকীর্ণ সীমা ভেঙে এই সুখদুঃখমর্মরিত প্রেমবেদনাপুলকিত জীবন ও মর্তপৃথিবী থেকে করুণ বিদায়ের সুর তুলেছে। 'তবু মনে রেখো' গানে যে বিদায়ের আভাস, তা যেন এই জীবনের সর্বক্ষেত্রের বিস্মৃতিবেদনা। তবু মনে রেখো—এই স্মৃতির আর্তনাদ নিখিল জগতের অন্তরলোক থেকে উত্থিত হয়ে মরণপীড়িত চিরজীবী প্রেমের জয়ঘোষণা করে। অন্যদিকে, তুমি যেও না এখনি, ও যে মানে না মানা এবং অন্যত্র সংযোজিত কেন যামিনী না যেতে জাগালে না এইগুলি যেন পদাবলীর মত ক্ষণস্থায়ী মিলনের অবসানের বিচ্ছেদবেদনা। কোথাও বিদায়দানের অস্বীকৃতি ও অনিচ্ছা নায়িকার পক্ষ থেকে, 'কাঁদালে তুমি মোরে' গানে তাকে দেখা যেতে পারে নায়কের পক্ষ থেকে। 'স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে' ও 'মিলনরাতি পোহালো'—উভয়ত্রই নায়ক যেন বিদায়গ্রহণের পূর্বে আপন স্মৃতিকে বিরহপ্রদীপে জ্বালিয়ে যেতে চেয়েছেন। প্রথম গানে প্রেমিকার স্মৃতি

বক্ষে নিয়ে প্রেমিক গমনোদ্যত—এমন দেশে যেখানে নিমেষহারা শুকতারা সেখানকার বিরহাকাশভালে উদিত হয়ে প্রেমিকার স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখবে। সেই শুকতারাকে দেখে প্রেমিকের চিত্তে থাকবে সজল আঁখির কোনো অপলক দৃষ্টি যা বেদনাকে আরও রমণীয় করে তুলবে—

রজনীশেষে এই যে শেষ কাঁদা
বীণার তারে পড়িবে তাহা বাঁধা
হারানো মণি স্বপনে গাঁথা রবে—
হে বিরহিণী আপন হাতে তবে বিদায়দ্বার খোলো।

'মিলনরাতি পোহালো' গানেও প্রেমিকার চিত্তপটে আপন স্মৃতিমুদ্রণের ব্যাকুলতা—

স্মৃতির ছবি মিলাবে যবে ব্যথার তাপ কিছু তো রবে
তা নিয়ে মনে বিজন ক্ষণে বিরহদীপ জ্বেলো।

'ওকে বাঁধিবি কে রে' একদিকে প্রেমপাত্রের সঙ্গে মিলনাবসানে বিরহের অনিবার্যতার গান, অন্যদিকে আবার শেষ বর্ষণ বা বর্ষাবিদায়ের গানরূপেও কবি এটি ব্যবহার করেছেন নটরাজ ঋতুরঙ্গশালায়। 'কেন রে এতই যাবার ত্বরা' গানটিকেও অনুরূপ শেষ বসন্ত বা বসন্তবিদায়ের গানরূপে গ্রহণ করা যায়। 'কে বলে যাও যাও আমার যাওয়া তো নয় যাওয়া' গানে বিদায়ের সুর মিলনে শেষ হয়েছে। যাওযাই যে চরম নয়, হারিয়ে ফিরে-পাওয়ার উৎসবই কবির চিরন্তন বাণী, এই কথাটি তাঁর ফাল্গুনী-বসন্তে যেমন, গানেও তেমনি অভিব্যক্ত। পথের বাণী 'ক্লান্ত বাঁশির শেষ রাগিণী বাজে' গানটিতেও আছে, সেখানে বিদায়কালে কবির গান—

পথিক আমি এসেছিলেম তোমার বকুলতলে—
পথ আমারে ডাক দিয়েছে এখন যাব চলে।
ঝরা যূথীর পাতায় ঢেকে আমার বেদন গেলেম রেখে
কোন ফাগুনে মিলবে সে-যে তোমার বেদনাতে।

কয়েকটি গানে মরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, মরণসম্পর্কে পূজাপর্যায়ের মধ্যেও অনেকগুলি গান আছে এবং সেখানে কবির আধ্যাত্মিক দৃষ্টি মৃত্যুর মধ্যে কেবল দেহাবসানেরই ঘোষণা নয়, জীবনান্তরের ইঙ্গিত আবিষ্কার করেছে। কিন্তু প্রেমের বাতাবরণে মরণের উল্লেখ কেন? ভালোবাসার গৃহভিত্তির উপর কি কেউ মৃত্যুর ধ্বজবজ্রাঙ্ক এঁকে রাখে?

অথচ 'তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে', 'মরণ রে তুহুঁ মম শ্যামসমান' এবং 'উতল হাওয়া লাগল আমার গানের তরণীতে' এই তিনটি গানে নিশ্চিত-ভাবে মৃত্যুর উল্লেখ আছে। বিচিত্র পর্যায়ে আমি ফিরব নারে ফিরব না আর, তোমার হল সুরু আমার হল সারা, আমাকে বাঁধবি তোরা, ওরে মাঝি ওরে আমার মানবজন্মতরীর মাঝি, আমার যাবার সময় হল, যেতে হবে আর দেরি নাই—এই গানগুলিতে মৃত্যুর বিষাদ লেগেছে বলে মনে হয়।

কতকগুলি প্রেমের গানে কবির অন্তরলোকের অধিষ্ঠাত্রী মানসী বা মানস-সুন্দরীর ছায়াপাত ঘটেছে। বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা যে লভ্য নয়, অন্তরলোকেই যার রাজসিংহাসন, সেই চিরমানসোদ্দিষ্টার প্রতি গানগুলি নিবেদিত। এই পর্যায়ে—না না না ডাকব না ডাকব না, তোরা যে যা বলিস ভাই, ও আমার ধ্যানেরই ধন, হায় রে ওরে যায় না কি জানা প্রভৃতি গানগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। ডাকব না ডাকব না গানে কবি অন্তরে যাকে ডাক পাঠিয়েছেন পরবর্তী গানগুলিতে তারই সঙ্গে অন্তরের দানপ্রতিদানের লীলারস উচ্ছলিত। 'তোরা যে যা বলিস ভাই' কবির বহুপরিচিত বিখ্যাত রচনা, এ গানের সোনার হরিণ অপ্রাপণীয়ের চিরপ্রতীক, রোমান্টিক কবির চিরঅভীষ্ট—'যারে যায় না পাওয়া তারই হাওয়া লাগল কেন মোরে'। পরবর্তী গানে কবি তাঁর ধ্যানরূপিণী মানসপ্রিয়ার ঠিকানা বাইরের ভুবনে হারিয়েছেন বলে 'প্রাণের মাঝে আছ গোপন স্বপন' বলে সান্ত্বনা পেয়েছেন। 'হায় রে ওরে যায় না কি জানা' গানেও করুণ নির্বিঘ্ন স্মৃতি নিয়ে বিদেহী অন্তরলক্ষ্মীর ব্যর্থ সন্ধান চলেছে, অবশেষ অনুভব এই রকম—

> অলখ পথেই যাওয়া আসা, শুনি চরণধ্বনির ভাষা—
> গন্ধে শুধু হাওয়ায় হাওয়ায় রইল নিশানা।

'ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি' গানটিতে আর বিষাদ নেই, দীর্ঘশ্বসিত স্মৃতি নেই, এখানে কবির সঙ্গে অন্তরলক্ষ্মীর নবমিলনোৎসবের পরিকল্পনা, অভিনব ভাবসম্মিলন। অন্যত্র কবি বলেছেন—

> এসো আমার ঘরে
> বাহির হয়ে এসো তুমি যে আছ অন্তরে,

এখানে তারই অনুরূপ উক্তি—

> তব কণ্ঠে দিব মালা, দিব চরণে ফুলডালা—

আমি সকল কুঞ্জকানন ফিরি এনেছি যূথী জাতি।
তব পদতললীনা আমি বাজাব স্বর্ণবীণা—
বরণ করিয়া লব তোমারে মম মানসসাথি।

এই অংশগুলি মনে পড়ে যায়। পরবর্তী কয়েকখানি গানেও বিরহের সুর গভীরভাবে বেজেছে, প্রতি গানেই চলে-যাওয়ার হাহাকার স্পষ্ট। চলে-যাওয়া বিষয়ক এই গানগুলি যথাক্রমে—কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া, সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে, সেই ভালো সেই ভালো, কাছে যবে ছিল পাশে হল না যাওয়া, আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে, মনে রয়ে গেল মনের কথা, ওগো আমার চির-অচেনা পরদেশী, কোথা হতে শুনতে যেন পাই, পান্থপাখির রিক্ত কুলায়, বাজে করুণ সুরে। 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে' মিলনস্মৃতির রসোদ্গার—এতে বেদনার তীব্রতার বদলে স্মৃতিরোমন্থনের স্নিগ্ধতা আছে। যদিও গানে আছে 'এখন আমার বেলা নাহি আর বহিব একাকী বিরহের ভার', তথাপি কবির হৃদয় স্মৃতিগন্ধবহ বলেই সেই তুলনায় বিরহের তীব্রতা নেই। 'সেই ভালো সেই ভালো'—এটিও বিরহের গান। এ গানে কবি মিলন অপেক্ষা বিরহবেদনাকেই বরণীয় মনে করেছেন। 'কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে' এই গানটির উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। সেখানে কবি বলেছেন, প্রিয়বিরহের বিষণ্ন মুহূর্তেই তাঁর বাঁশিতে গান বাজে, মিলনে সে গান বাজে না। 'সেই ভালো সেই ভালো' গানটিতেও তারই প্রতিধ্বনি শুনি, 'না-বলা বাণীর নিয়ে আকুলতা আমার বাঁশিটি বাজানো'। 'কাছে যবে ছিল পাশে হল না যাওয়া'—এটিও একই প্রসঙ্গঘটিত গান। এখানেও কবির বক্তব্য—

হারানো দিনের ভাষা স্বপ্নে আজি বাঁধে বাসা।
আজ শুধু আঁখিজলে পিছনে চাওয়া।

'বাজে করুণ সুরে' গানে এই বিরহ-বিপ্রলম্ভের তীব্রতা সমস্ত আকাশকে তীব্র ব্যথায় স্পর্শ করেছে—

যূথীগন্ধ অশান্ত সমীরে ধায় উতলা উচ্ছ্বাসে,
তেমনি চিত্ত উদাসী রে, হায় নিদারুণ বিচ্ছেদের নিশীথে।

প্রেমপর্যায়ের ১৯৮-২০৩ সংখ্যক গানগুলির বিষয় প্রেমে নিঃসংশয় নির্ভরতা, সংকোচের অবসানে প্রেমের সুনিশ্চিত উপলব্ধি। জীবনে পরম লগন কোর না হেলা, সখী দেখে যা এবার এল সময়, আমি আশায় আশায় থাকি, আমার

নিখিল ভুবন হারালেম আমি যে, না না ভুল কোর না গো, ভুল করেছিনু ভুল ভেঙেছে এইগুলিকে এই প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। প্রেমপর্যায়ের ২৫৯-২৬৫ সংখ্যক গানগুলিকে বলা যায় ভাবসম্মিলন। বিরহের মধ্যে মিলনের ব্যঞ্জনা এগুলিতে আভাসিত। গানগুলি যথাক্রমে—ফিরবে না তা জানি, দিনের পরে দিন যে গেল, না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, বিরহ মধুর হল আজি, ফিরে ফিরে ডাক দেখি রে, প্রভাত-আলোরে মোর কাঁদায়ে গেলে, নাই যদি বা এলে তুমি। কত ভাবানুভূতি, কত স্বপ্ন অনুভবে কবির প্রেমচেতনা বারবার অনুরঞ্জিত হয়েছে, এই গানগুলি তার প্রমাণ। 'ফিরবে না তা জানি' গানে কবি স্পষ্টই বুঝেছেন যে হারিয়ে যায় সে আর ফিরে আসে না। তবু বিরহী মানুষের কল্পনার অবসান হয় না। চলে যাওয়ার পথ যে দিকে সেদিক পানে অনিমিষে ফিরে চাওয়ারও তার শেষ নেই। পদাবলীতে এই ফিরে-পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকেই ভাবসম্মিলনরূপে কল্পনা করা হয়েছিল। কবিও তাঁর অকথিত আশার পথে প্রদীপ জেলে রেখেছেন তারই নামে, যার মালা গাঁথা ফুরিয়েছে, তারই নামে আজো বকুল অকারণেই ফুটে ঝরে চলেছে প্রাণে শুধু ঐ স্পর্শের পিপাসাটুকু জাগিয়ে। যেখানেই থাকুক সেই বিদেহিনী মানসীপ্রিয়া, তবু কবি তারই প্রতীক্ষায় তাঁর চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে দিয়েছেন। তাঁর গীতহীন রজনী সেই সুরেই বীণা বেঁধে চলেছে, যাকে ঘিরে কাঙাল বাণীর আলাপন চলে এই বিরহগীতে। 'দিনের পরে দিন যে গেল' গানটিতেও কবি অন্ধকার নিঃসঙ্গ গৃহে তার ফেলে-যাওয়া আসনখানির দিকে চেয়ে উন্মনা হয়ে আছেন। এখানেও দেখি কবির পুষ্পবনে মঞ্জরীতে সাজি ভরে উঠেছে, 'ব্যথার হারে' কবি তাদের গেঁথে রেখেছেন। কী গভীর বেদনায় কবি গেয়েছেন—

> পায়ের ধ্বনি গণি গণি রাতের তারা জাগে,
> উত্তরীয়ের হাওয়া এসে ফুলের বনে লাগে।
> ফাগুনবেলার বুকের মাঝে পথ-চাওয়া সুর কেঁদে বাজে—
> প্রাণের কথা ভাষা হারায়, চোখের জলে ঝরে।

'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়' গানে বেদনার বিনিময়ে সারস্বতপ্রাপ্তির সুর ফুটে উঠেছে। কবির সংগীতে সে অপ্রাপ্তির রাগিণী কেমন করে বেজে ওঠে সেই রহস্য ব্যাখ্যাত হয়েছে—

> তারি লাগি যত ফেলেছি অশ্রুজল
> বীণাবাদিনীর শতদলদলে করিছে তা টলোমল।

মোর গানে গানে পলকে পলকে ঝলসি উঠিছে ঝলকে ঝলকে,
শান্ত হাসির করুণ আলোকে ভাতিছে নয়নপাতে।

'নাই যদি বা এলে তুমি' গানের একটি চরণ—'অন্তরেতে নাই তুমি কি সামনে আমার নাই বলে' পুনরায় ছবি কবিতাকে মনে করিয়ে দেয়।

৬

গীতবিতানে প্রেম-পর্যায়ের অন্তর্গত প্রেমবৈচিত্র্য বিভাগের প্রথম গান 'বিরস দিন বিরল কাজ।' মহুয়ার একটি কবিতার গীতরূপ এই গানটিতে প্রেমের দুর্দম আগমনের রূপটি সুন্দর ভাষায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পূরবীর 'কিশোর প্রেম' কবিতায় সহসা প্রৌঢ় বয়সে কয়েকটি স্মৃতিবহ অনুষঙ্গের সংস্পর্শে এসে কবির মনে পুরাতন প্রেমের করুণ ব্যাকুলতা জোয়ারবেগে নেমে এসেছিল—তারপর থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত সেই প্রেমের উত্তাল তরঙ্গ কবির বিরস দিন, কর্মহীন অবকাশ, প্রৌঢ়তার অলস মন্থর প্রহরগুলিকে অকারণ যৌবনের চঞ্চলতা দিয়ে ভরিয়ে দিয়ে গেছে। 'গঙ্গা যেন হেসে দুলায় ধূর্জটির জটা'—এই নিপুণ উৎপ্রেক্ষায় কবি প্রৌঢ় বয়সের সেই সমারোহপূর্ণ প্রেমের বিবরণ দিয়েছেন। বহুকাল পূর্বে (১৩০১ জ্যৈষ্ঠ ১২ তারিখে) চিত্রার বিকাশ কবিতায় প্রেমের আগমনের বর্ণনা ছিল কোমল সংকেতে আঁকা—

বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে
আমার নিভৃত নবজীবন 'পরে।
প্রভাতকমলসম ফুটিল হৃদয় মম
কার দুটি নিরুপম চরণ তরে।

মৃদু সংকুচিত সেই প্রেমের সঙ্গে মহুয়ার 'বিরস দিন বিরল কাজে'র তুলনা করলেই বোঝা যাবে শেষ বয়সের এই অতর্কিত প্রেমের স্বভাব কী দুরন্ত—'দস্যুর মত ভেঙে দিয়ে যায় চিরাভ্যাসের মেলা'। 'এ কী সুধারস আনে' গানটিও প্রেমের আবিভাবের স্মারকগীত। কিন্তু এই প্রেম উন্মদ অকালবসন্ত নয়, এ যেন ফাল্গুনের আম্রমঞ্জরীর মত ধীরে ধীরে তার গন্ধ বিকাশ করে। যে প্রেমের সুধারসে প্রাণমনে রোমাঞ্চ ওঠে, সমগ্র বিশ্ব প্রেমিকার অস্তিত্বের প্রভাবে শ্যামসুন্দর হয়ে ওঠে, সেই প্রেমের আবির্ভাবেই গান জাগে কবির বীণায়—

পুরাতন বীণাখানি ফিরে পেল হারা বাণী।

নীলাকাশ শ্যামধরা পরশে তাহারই ভরা—
ধরা দিল অগোচরা নব নব সুরে তানে।

চৈতালির 'উৎসর্গ' কবিতায় দ্রাক্ষাকুঞ্জের স্তবকাবনম্র যৌবনবেদনায় কবি লিখেছিলেন—

লুটে লও ভরিয়া অঞ্চল, জীবনের সকল সম্বল,
নীরবে নিতান্ত অবনত বসন্তের সর্ব-সমর্পণ—
হাসিমুখে নিয়ে যাও যত বনের বেদন নিবেদন।

'মম যৌবননিকুঞ্জে গাহে পাখি' সেই পূর্ণপ্রস্ফুটিত যৌবনবেদনার একটি অপূর্ব পরিণতফলশ্যাম কাব্যসংগীত। যে মৃগনাভি প্রেম আপন অন্তরে প্রথম প্রণয়ের অনির্দেশ্য বেদনা ও পুলকচঞ্চলতা জাগিয়ে তোলে সেই উন্মনা প্রেম দিয়ে কবি জাগিয়েছেন তাঁর প্রণয়পাত্রীকে—

আজি চঞ্চল এ নিশীথে জাগ ফাগুনগুণগীতে
অয়ি প্রথমপ্রণয়ভীতে, মম নন্দন-অটবীতে
পিক মুহুমুহু উঠে ডাকি— সখি জাগ জাগ।

প্রাচীন কালের প্রেমনিবেদনের ভঙ্গিতে কল্পনা কাব্যের 'যাচনা' কবিতাটি রচিত এবং এটিকে সুরারোপিত করে একটি সার্থক প্রীতিগীতিতে পরিণত করা হয়েছে। কবিতার শেষ চরণগুলিতে প্রণয়-নিবেদনের রোমান্টিক ভঙ্গি সহসা গভীরতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং জীবনদেবতার আভাস এসে গেছে। রোমান্টিক কবির অনির্দেশ্য বেদনা প্রেমচেতনায় মিশে গেছে 'যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা' গানে। এক অনির্বচনীয় দুর্জ্ঞেয় বেদনার সুর 'আমি যে আর সইতে পারিনে' গানটিতেও আছে। দুটি গান যথাক্রমে গীতিমাল্য ও গীতালির অন্তর্গত। কী আশ্চর্য রোমান্টিকতায় কবি কল্পনা করেছেন দূরবর্তী বাণী লিপিলেখার মধ্য দিয়ে যখন কবির কাছে আসবে তখন তার সঙ্গে আসবে শস্যক্ষেতের সুদূর গন্ধ, পান্থহাওয়া ও নীলাকাশের সুর 'দে পড়ে দে আমায় তোরা' এই গানটিতে। বিশুদ্ধ রোমান্টিকতার সংজ্ঞা পাওয়া যায় 'আমার মন বলে চাই চাই গো' গানটিতে। তাছাড়া 'এবার সখী সোনার মৃগ দেয় বুঝি দেয় ধরা' 'সে কোন বনের হরিণ ছিল আমার মনে', 'যে কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়' গানগুলিতে হরিণ সর্বত্রই অনির্বচন রোমান্টিক উৎকণ্ঠা ও নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যব্যাকুলতার প্রতীক বলে মনে হয়। বিচিত্র-পর্যায়ের 'স্বপনপারের ডাক শুনেছি' এবং ডাকঘর নাটকের জন্য লিখিত 'কোথাও

আমার হারিয়ে-যাওয়ার নেই মানা' গানদুটিও রবীন্দ্ররোমান্টিকতার ভাষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমসংগীতগুলিতে সমগ্র নিসর্গপ্রকৃতি পটভূমিকারূপে বিতত হয়ে আছে। মানসীর ভূমিকায় কবি বলেছিলেন যে, এই বহির্ভুবন কত গান কত দৃশ্যকে সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে আমাদের হৃদয়ের দ্বারে প্রেরণ করে এবং সেই মোহমন্ত্রগানে কবির গভীর প্রাণে বিরহী ভাবনা জেগে ওঠে। মূর্তিমতী মর্মকামনা সেই বাইরের বর্ণগন্ধ নিয়েই আশা ভাষা ও প্রেমের সাহায্যে মানসী-প্রতিমা নির্মাণ করে। প্রিয়জন মৃত্যুর পরে স্মৃতিরূপে বিশ্বলোকে থেকে যায়, সৌন্দর্যরূপে নিসর্গলোকে মিলিয়ে যায় বলেই মানসসুন্দরী কবিতায় কবি সন্ধ্যার কনকবর্ণে তার অঞ্চল, উষার গলিত স্বর্ণে মেখলা, পূর্ণ তটিনীর কলস্বরে তার ললিত যৌবন, বসন্তবাতাসে চঞ্চল যৌবনব্যথা ও নিষুপ্ত পূর্ণিমারাতে তার দুগ্ধশুভ্র বিরহশয়নখানি দেখতে পান। তাই গানে এই মানসীর অরূপ মূর্তিখানিকে তিনি ফাল্গুনের আলোতে উপস্থাপিত করেন, তাঁর সুরের সাধনায় মিশে যায় বকুলের গন্ধ, রঙিন মাধুরীচ্ছায় আচ্ছাদনে ঢাকা পড়ে তাঁর নাম। এই নিসর্গচিত্ররূপময়ী মানসপ্রতিমা প্রকৃতিমাধুরীসারে অপরূপা হয়ে উঠেছে 'একলা বসে হেরো তোমার ছবি' গানটিতে। 'আছ আকাশপানে তুলে মাথা' গানে দেখি গানের সুরে তার কায়া যায় মিলিয়ে, কাছের ব্যক্তি হয় সুদূরের রোমান্টিক নারী। তখন পিয়ালবনে তার আলুলায়িত কুন্তল ওড়ে, বকুলবনে তার আঁচল পাতা হয়। কখনও-বা মেঘমুক্ত শশাঙ্কলা তার সিঁথি-প্রান্তে জ্বলে। 'লিখন তোমার ধুলায় হয়েছে ধুলি' গানে প্রিয়জনের বিস্মৃতপ্রায় লিপিখানিকে কবি খুঁজে পেয়েছেন প্রকৃতির মধ্যে—'বনে বনে তব লেখনী-লীলার রেখা'। 'আজি সাঁঝের যমুনায়' গানে সান্ধ্যচন্দ্রালোকিত যমুনায় তরুণ চাঁদের কিরণতরীর ভেসে-চলা থেকে কবির মনে জাগে বিরহবেদনা—'তারই সুদূর সারিগানে বিদায়স্মৃতি জাগায় প্রাণে'। 'গহন বন বনে পিয়াল-তমাল-সহকার-ছায়ে' প্রকৃতির ছবি গানটির প্রাণ। ঋতুবিষয়ক গানগুলির পূর্বে কয়েকটি গান আছে গীতবিতানে, বস্তুত সেগুলি প্রেমেরই গান। আঁধার কুঁড়ির বাঁধন টুটে চাঁদের ফুল যখন ফুটে ওঠে তখন তার গন্ধ থাকে কবির 'গভীর ব্যথায় হৃদয়-মাঝে লুটে'। পূর্ণচাঁদের মায়ায় কবির ভাবনা যখন পথ ভোলে, সিন্ধুপারের পাখির মত দিগন্তে পাড়ি দেয়, তখনও হারা ফাল্গুনরাতির জন্য সাথি-খুঁজে-মরা কাঁদন তার সঙ্গে হায় হায় করে ওঠে। মনোহর

প্রকৃতির দিকে চেয়ে মনে হয় কবির 'আকাশে ওই দেখি কী যে তোমার চোখের চাহনি যে'। ব্যাকুল বকুলের ফুলে যখন ভ্রমর পথ ভুলে মরে, তখন 'নিখিল তাই মরে ঘুরি বিরহসাগরের কূলে'।

সুর দিয়ে স্মৃতিজাগানোর বেদনায় কবি পূরবীর যুগে লিখেছিলেন 'অনেক দিনের আমার যে গান আমার কাছে ফিরে আসে'। কী বিধুর বেদনায় স্মৃতি-কুশাহত কবি প্রশ্ন করেছিলেন সেই পুরাতন অনুষঙ্গবাহী গানকে—

যে ফুল গেছে সকল ফেলে গন্ধ তাহার কোথায় পেলে,
যার আশা আজ শূন্য হল কী সুর জাগাও তাহার আশে।

হারানো-দিনের ঝরানো-স্মৃতির গানকে নিয়ে এমন নিশ্চল শোকের স্ফটিক, এমন শুভ্র অশ্রুর মুক্তা, এমন বেদনাভারার্ত অন্ধকারের বুকে-জমা হীরকখণ্ড আর কে রচনা করতে পারেন? বীণার ঝংকারে তার থেকে রাগিণী ঝরে গিয়ে রসিকের চিত্তে বাসা বাঁধে, কবিও তাঁর জীবনের বীণাতার থেকে শোককে তুলে নিয়ে গানের স্তরে স্তরে শ্লোক করে রেখেছেন—

সকল গৃহ হারালো যার তোমার তানে তারই বাসা,
যার বিরহের নাই অবসান তার মিলনের আনে ভাষা।
শুকালো যেই নয়নবারি তোমার সুরে কাঁদন তারই,
ভোলা দিনের বাহন তুমি স্বপ্ন ভাসাও দূর আকাশে।

মাঝে মাঝে বর্ষার দমকা বাতাসে, বসন্তের মৃদু সমীরণে, অর্ধজাগর স্বপ্নাভাসে সেই নব পুরাতন দিনের সহস্র স্মৃতি ভেসে আসে কোন ঊর্ধ্বাচারী স্মৃতিলোক থেকে। নিশীথরাতের বাদল ধারা যখন নিদ্রামগন ভুবনে কেবল কবির ঘুম হরণ করে, তখন চোখের জলের সাড়া দিয়ে কবি তার সঙ্গে মেলান তাঁর কবেকার ভালোবাসার স্বরলিপিটিকে—

অনেক কথা বলেছিলেম কবে তোমার কানে কানে
কত নিশীথ অন্ধকারে কত গোপন গানে গানে।
সে কি তোমার মনে আছে তাই শুধাতে এলেম কাছে
রাতের বুকের মাঝে তারা মিলিয়ে আছে সকলখানে।

এ গানের ভঙ্গিটি ছলনার—যেন কবি স্বয়ং তাঁর শরীরিণী প্রিয়তমার কাছে উপস্থিত হয়ে জানতে এসেছেন—সে কি তোমার মনে আছে? কিন্তু এ জিজ্ঞাসা কাল্পনিক। কারণ উত্তরের প্রতিপক্ষ কোনোদিনই মানবকণ্ঠে সে জবাব পাঠাবে না বলেই তো রাতের বুকের নিভৃত অন্ধকারের স্তবকে

বৃষ্টির ধারাপতনে সিক্ত বনযূথীর গন্ধে স্মৃতিবহ বেদনায় সেই প্রেম বাসা বেঁধেছে। মানসসুন্দরী কবিতাতেও দেখি মানসসুন্দরীকে কল্পনা করে তাঁর সঙ্গে রহস্যমধুর প্রেমের লীলারঙ্গ সংলাপ-প্রলাপ চলেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই স্বপ্ন-কল্পনা প্রলাপাবেশ কেটে গেছে, কবি আবার পদ্মাবক্ষে নৌকায় নিঃসঙ্গ নির্জন অন্ধকারে আপনার শূন্যতার মধ্যে ফিরে এসেছেন। আর 'অনেক কথা বলেছিলেম' গানেও সঞ্চারীর ভাষাই কবির নিরুত্তর নৈঃসঙ্গ্যের হাহাকারে দোলায়িত—

> ঘুম ভেঙে তাই শুনি যবে দীপ-নেভা মোর বাতায়নে
> স্বপ্নে-পাওয়া বাদলহাওয়া ছুটে আসে ক্ষণে ক্ষণে –
> বৃষ্টিধারার ঝরোঝরে ঝাউবাগানের মরোমরে
> ভিজে মাটির গন্ধে হঠাৎ সেই কথা সব মনে আনে।

'মেঘছায়ে সজল বায়ে' গানে স্পষ্টই বলেছেন, মেঘচ্ছায় সজল বর্ষণমুখর দিনে কবির মনকে 'উতলা করে সারাবেলা কার লুপ্ত হাসি সুপ্ত বেদনা'। কোন বসন্তের নিশীথে যে বকুলমালাটি প্রিয়কণ্ঠ থেকে তিনি আপন গলায় পরেছিলেন আজ তার দলগুলি ঝরে গেলেও গন্ধমাত্র বাতাসে ভেসে বেড়ায়। তবু সেই বেদনার মধ্যেও কবির কী সারস্বত সান্ত্বনা—

> জানি, ফিরিবে না আর ফিরিবে না, পথ তব গেছে সুদূরে।
> পারিলে না তবু পারিলে না, চিরশূন্য করিতে এ ভুবন
> তুমি নিয়ে গেছ মোর বাঁশিখানি, দিয়ে গেছ তোমার গান।

গোধূলিগগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা, কে দিল আবার আঘাত আমার দুয়ারে, যদি হল যাবার ক্ষণ, তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি, শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ণ সন্ধ্যায় গানগুলি সবই বর্ষার সজল হাওয়ার পটভূমিতে স্থাপিত বিরহবেদনার উন্মথিত রাগিণী এবং সবগুলি গানই বক্তব্যের সাদৃশ্যে, প্রকাশের একমুখীনতায় কবির একই ব্যক্তিগত স্মৃতি থেকে উৎসারিত বলে মনে হয়। প্রেমের গানে বসন্তের পটক্ষেপ ঘটেছে অসংখ্য বার, ঋতু ও প্রকৃতি-পর্যায়ের গানে তার উল্লেখ আছে। বসন্তপ্রেক্ষণী প্রেমসংগীতগুলি অবশ্য বর্ষার মত বিরহ-ব্যাকুল নয়—মিলনাকুলতা ও উল্লাস-হিল্লোলই সেখানে প্রধান, তবু বেদনার স্মৃতি অস্পষ্ট নয়। 'এই উদাসি হাওয়ার পথে পথে' গানে বসন্তের ঝরা মুকুল সংগ্রহ করে কবি তাঁর প্রিয়জনের হাতে তুলে দিতে চেয়েছেন, কারণ

> যখন যাব চলে ওরা ফুটবে তোমার কোলে,

তোমার মালা গাঁথার আঙুলগুলি মধুর বেদনভরে
যেন আমায় স্মরণ করে।

'বসন্ত সে যায় তো হেসে' গানের বসন্ত বিদায়পারের অভিযাত্রী, সেই সঙ্গে কবির প্রিয়জনও। এখন সংসারের কূলে একা উপবিষ্ট কবির স্মৃতিচারণার প্রৌঢ় দিনগুলি—যা তাঁর শেষ বয়সের অসংখ্য কাব্যে পুনরাবৃত্ত, একটি কয়েক-চরণের স্তবকে ঘনীভূত রূপ নিয়েছে—

রইব একা ভাসান-খেলার নদীর তটে
বেদনাহীন মুখের ছবি স্মৃতির পটে।
অবসানের অস্ত-আলো তোমার সাথি সেই তো ভালো—
ছায়া সে থাক মিলনশেষের অন্তরালে।

তাই দক্ষিণ পবনে যখন দোলা লাগে, 'দিকললনার নৃত্যচঞ্চল মঞ্জীরধ্বনি অন্তরে ওঠে রনরনি বিরহবিহ্বল হৃৎস্পন্দনে', দক্ষিণ সমীরে দূর গগনে যেখানে একলা বিরহীর অবস্থান, সেখান থেকে ডুবন্ত ফাল্গুনের উচ্ছ্বসিত হাওয়া পালে এসে লাগে কবির, তখন শুনি মনহরণের এই গান—

কোথায় তুমি মম অজানা সাথি
কাটাও বিজনে বিরহরাতি,
এসো এসো উধাও পথের যাত্রী—
তরী আমার টলোমলো ভরা জোয়ারে।

৭

আমরা পূর্বেই বলেছি বাঙলা কাব্যসংগীতের ঐতিহ্য ও ধারা অনুসরণ করেই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটেছিল, কাব্যসংগীতের উনিশ শতকীয় ইতিহাস অস্বীকার করে নয়। নিধুবাবু, হরু ঠাকুর, রাম বসু, শ্রীধর কথকের প্রেমের গানগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের প্রেমসংগীতগুলির তুলনা করলেই প্রমাণিত হবে যে, কথা ও সুরের রীতিনীতির দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে উক্ত গীতকারবৃন্দই প্রথামজয়ী দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন, সংগীতরচনায় কাব্য-মূল্যের নিঃসন্দিগ্ধ প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছিলেন, ব্যক্তিগত জীবনের অনুভূতিকে কাব্য-সংগীতে মূর্ত করে তোলার উপায় জানতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের গানে কেবল টপ্পার সুর নয়, উনিশ শতকের হাফ-আখড়াই, ঢপকীর্তন, কীর্তন-পাঁচালির সুর কতখানি কার্যকরী হয়েছিল, অনুসন্ধানী গবেষকদের

কাছে তা আলোচনার বস্তু হয়ে থাকবে। উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের প্রথম দশকে বাঙলা কাব্যগীতের যে সকল সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রায় সবগুলিতেই রবীন্দ্রনাথের গীত-সংখ্যা নিতান্ত অঙ্গুলিমেয় ছিল না। রাগরাগিণী এবং তালের উল্লেখ থাকায় সহজেই প্রমাণ করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের সেই সময়কার গানগুলি প্রচলিত রাগরাগিণীর উপর ভিত্তি করেই রচিত এবং তাঁর প্রেমের গানগুলিই মোটামুটি সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিল।

তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের প্রেমসংগীতগুলি বাঙলাদেশে একদা অমসৃণ প্রতিকূলতা লাভ করেছিল একথা ভাবতে আশ্চর্য লাগে। রবীন্দ্রনাথের প্রেম-সংগীতের সর্বাধিক বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল, সে ইতিহাস অনেকেরই অজানা নেই। দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছিলেন—

"কবিতা লিখিতে গেলেই নব্য কবিগণ প্রেম লইয়া বসেন।...তাও যদি কবিরা দাম্পত্য প্রেম লইয়া কাব্য লেখেন, তাহাও সহ্য হয়। ইহাদের চাই— হয় বিলাতি কোর্টশিপ, নয়ত টপ্‌পার প্রেম। নহিলে প্রেম হয় না।...

ইংরাজিতেও কোর্টশিপ অবস্থার গান অনেক আছে বটে, কিন্তু দাম্পত্য প্রেমের গানেরও অভাব নাই। কিন্তু আমাদের দেশে যেখানে দাম্পত্য প্রেম ভিন্ন অন্যরূপ বিশুদ্ধ প্রেম নাই, সেখানে দাম্পত্য প্রেমের গান নাই বলিলেই হয়। হা অদৃষ্ট!

উদাহরণ দিতে হইবে? রবীন্দ্রবাবুর প্রেমের গানগুলি নিন। সে আসে ধীরে, সে কেন চুরি করে চায়, দুজনে দেখা হল ইত্যাদি বহুতর খ্যাত গান— সবই ইংরাজি কোর্টশিপের গান। তাঁহার তুমি যেও না এখনি, কেন যামিনী না যেতে জাগালে না ইত্যাদি গান লম্পট বা অভিসারিকার গান। তাঁহার যে কয়টি গানকে দাম্পত্য প্রেমের গান নামে অভিহিত করা যাইতে পারে— তাহারা সেরূপ খ্যাতিলাভ করে নাই।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এরূপ গানে মৌলিকতাও নাই। শয়ন রচনা করা, মালা গাঁথা, দীপ জ্বালা এ সকল ব্যাপার বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতা হইতে অপহরণ। স্থানে স্থানে পংক্তিকে পংক্তি উক্তরূপে গৃহীত। তবে...রবিবাবুর কবিতায় বৈষ্ণব কবিদিগের ভক্তিটুকু নাই, লালসাটুকু বেশ আছে"।[৮]

এই ভাষার সঙ্গে আধুনিক রবীন্দ্রকাব্যসমালোচনার স্বভাবতই কোনো সম্পর্ক নেই। দ্বিজেন্দ্রলাল একই ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্যটিকেও নির্যাতিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেমসংগীতসম্পর্কে এই জাতীয়

সমালোচনায় সেকালের একশ্রেণীর রক্ষণশীল মনোভাবই প্রতিফলিত হয়েছে, তৎসহ কিছু ব্যক্তিগত অসূয়াও থাকতে পারে বলে সন্দেহ জাগে। দ্বিজেন্দ্রলালের অভিযোগ ও রবীন্দ্রনাথের প্রেমসংগীতসম্পর্কিত সমালোচনার উত্তর দিয়েছিলেন প্রিয়নাথ সেন সাহিত্য পত্রিকার কার্তিক ১৩১৬ সংখ্যায়। প্রিয়নাথ সেন বলেছিলেন যে কোর্টশিপ আসলে পূর্বরাগ মাত্র। দ্বিজেন্দ্রলাল নীতির দোহাই দিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে সকল 'নির্দোষ ও পবিত্র' গানের নিন্দাবাদ করেছেন সেগুলি প্রকৃতপক্ষে এই 'পূর্বরাগের মাধুরীতে পূর্ণ'। প্রিয়নাথ লিখেছিলেন—

"আমাদের গুরুজনভূয়িষ্ঠ একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারের মধ্যে অপর সকলের অজানিতভাবে নববধূর স্বামীর নিকট লাজসংকুচিত ধীরপদক্ষেপে গমন—দ্বিজেন্দ্রবাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অভিসারই নয় বলিলাম—নববিবাহিত পাত্রপাত্রীর পরস্পরকে চুরি করিয়া বা অপাঙ্গে দর্শন, পূর্বরাগের এ সমস্ত মধুময় লক্ষণ রবিবাবুর সে সকল অতুলনীয় গীতগুলির মধ্যে পঞ্চম রাগিণীতে নিত্য গুঞ্জরিত।

আমাদের এমন আশা যে, দ্বিজেন্দ্রবাবুর আপত্তি সত্ত্বেও এই নির্দোষ এবং মনোমুগ্ধকর কোর্টশিপ শীঘ্র সমাজ হইতে বিচ্যুত হইবে না এবং দ্বিজেন্দ্রবাবুর নিন্দা সত্ত্বেও রবিবাবুর এই গানগুলি যতদিন বাঙলা ভাষা ও বাঙালি জাতি থাকিবে, ততদিন তাহারা আদরের সহিত গীত হইবে।"

উনিশ শতকের গীতকারদের গান—কথকতা-পাঁচালি-টপ্‌পার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আবাল্য পরিচয় ছিল। ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক সংগীতচর্চা ও গায়কদের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগে এই সকল গীতরূপের সঙ্গে কবির পরিচয় বাধাহীন হয়েছিল, একথা তিনি বহুস্থানে বলেছেন। জোড়াসাঁকোর বাড়ি কেবল বিষ্ণু চক্রবর্তী যদুভট্টের ধ্রুপদী কণ্ঠস্বরে নয়, নলদময়ন্তী যাত্রায়, কিশোরী চাটুজ্জের কণ্ঠের পাঁচালির সুরে, মধুকানের ঢপকীর্তনে, নিধুবাবু-হরুঠাকুর-রাম বসুর টপ্‌পা-কবিগান-সখীসংবাদ-বিরহ-গানে নিয়ত ভরপুর হয়ে থাকত। 'শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান' নামক একটি প্রবন্ধে (প্রবাসী ফাল্গুন ১৩৪২) কবি কিশোরকালে লব্ধ এই সব লোকায়ত তথা জনপ্রিয় গীতরূপ ও সুরগুলির প্রভাবের কথা কৃতজ্ঞচিত্তেই স্মরণ করেছেন। '[illegible] বলে ভালবাসিনে', 'মনে রইল সই মনের বেদনা' প্রভৃতি গানের উল্লেখ করে তিনি উক্ত প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

"এ যে অত্যন্ত বাঙালি গান। বাঙালির ভাবপ্রবণ হৃদয় অত্যন্ত তৃষিত হয়েই গান চেয়েছিল, তাই সে আপন সহজ গান আপনি সৃষ্টি না করে বাঁচেনি।"

বাঙলার সংগীতবহুল যাত্রা-কথকতা সম্পর্কে কবি স্পষ্টই স্বীকার করেছেন—

"একদিন তাতে মুগ্ধ হয়েছিলুম। সাহিত্যরচনার প্রচলিত পাশ্চাত্য বিধির কথা স্মরণ করে উদ্বেল আনন্দকে লজ্জিত হয়ে সংযত করিনি তো।"

তাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের প্রেমসংগীতগুলিতে উনবিংশ শতকের মধ্য ও শেষার্ধের তৎকালীন প্রীতিসংগীতগুলির প্রভাব সুস্পষ্ট। ঠাকুরবাড়ির সাংগীতিক পরিবেশ, গীতপ্রাণ আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের সান্নিধ্য বাঙলার সেকালের কাব্যসংগীত সম্পর্কে কবিকে উদাসীন রাখেনি। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর কাছে তিনি নিধুবাবু হরু ঠাকুর শ্রীধর কথক কালী মির্জা মধু কানের গান শুনতেন। ছোটবেলায় শোনা 'তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিল' গানটি কেমন করে কবির 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী' এই গানটি রচনায় প্রেরণা দিয়েছিল, জীবনস্মৃতিতে তার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। লোকায়ত বহু গানের সুর ও কথাই তাঁর পরবর্তী কাব্যজীবনে নবসাজে দেখা দিয়েছে, যে ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত করা দরকার। 'সংগীতসংগ্রহ' নামক একটি প্রাচীন গীতসংকলনের অন্তর্গত লোকায়ত প্রেমসংগীতগুলির সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনিই লিখেছিলেন—

"প্রেমের তারের মধ্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তড়িৎ খেলাইতে থাকে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খবর নিমিষের মধ্যে প্রাণের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহাকে তুমি ভালবাস তাহার কাছে বসিয়া থাক, অদৃশ্য প্রেমের তার দিয়া তাহার প্রাণ হইতে তোমার প্রাণে বিদ্যুৎ বহিতে থাকে, নিমেষে নিমেষে তাহার প্রাণের খবর তোমার প্রাণে আসিয়া পৌছায়।...

গ্রন্থে প্রেমের গান এত আছে এবং এক একটি গান শুনিয়া এত কথা মনে পড়ে যে, সকল গান তুলিলে, সকল কথা বলিলে পুঁথি বাড়িয়া যায়।

প্রকাশকের সহিত এক বিষয়ে কেবল আমাদের ঝগড়া আছে। তিনি ব্রহ্মসংগীত ও আধুনিক ইংরেজিওয়ালাদিগের রচনাকে ইহার মধ্যে স্থান দিলেন কেন? আমরা ত ভাল গান শুনিবার জন্য এ বই কিনিতে চাই না। অশিক্ষিত অকৃত্রিম হৃদয়ের সরল গান শুনিতে চাই। প্রকাশক স্থানে স্থানে তাহার বড়ই ব্যাঘাত করিয়াছেন"।[১]

এই কারণে আমরা বিশ্বাস করি রবীন্দ্রনাথের সাংগীতিক প্রতিভা বাঙলা কাব্যসংগীতের ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করেই বিকশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সংগীতস্রজনী-প্রতিভার প্রেরণা-উৎসাহদাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কেবল সুরকার-বাদ্যপটু ব্যক্তি ছিলেন না, অন্তরের গীতসিসৃক্ষাকে তিনিও স্বরচিত কাব্যছন্দে ধরে রাখতেন। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সংগীতের কাব্যোৎকর্ষ নিঃসন্দেহে বেশি ছিল। 'প্রেমের গানে যে হালকা ভঙ্গি, যে বাগ্‌বয়নকৌশল রবীন্দ্রপূর্ব-গীতকারগণ ব্যবহার করেছেন তাঁদের তুলনায় কবির অল্প বয়সের গানে কাব্যধর্ম অনেক পরিণত, রুচি অনেক মার্জিত এবং ভাবপ্রকাশ উচ্চাঙ্গের। কিন্তু বিষয়ের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই অনুবর্তন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, 'প্রীতিগীতি' নামক পূর্বোল্লিখিত কাব্যসংকলনের 'নিরপেক্ষ প্রেম' এই পর্যায়টি গ্রহণ করা যায়। প্রেমের প্রতিদানহীন নিরপেক্ষতাই এই প্রসঙ্গের শর্ত। এই পর্যায়ে সংকলিত কয়েকটি গানের বাণী—

ভাল বলে ভালবাসি যায় প্রাণ সঁপি তায়
সে কি মন্দ হলে তারে মন্দ বলা যায়?
এক তারও শঠতা ব্যাভার তবু সে অত্যাজ্য আমার,
সখ্যতা করেছি আগে কেমনে বিপক্ষ হই। (নিত্যানন্দ বৈরাগী)

ভালবাসিব বলে ভালবাসিনে
আমার স্বভাব এই তোমা বই জানিনে।
বিধুমুখে মধুর হাসি আমি বড় ভালবাসি
তোমায় দেখতে আসি দেখা দিতে আসিনে। (নিধুবাবু)

যেন সে না দুঃখ পায়
যতনে জীবন মন সঁপিয়াছি যায়।
মজিয়া পরেরই ভাবে সেই যেন পর ভাবে
আমি তো স্বীয় স্বভাবে ভালবাসি তায়। (দয়ালচাঁদ মিত্র)

প্রাণ কাঁদে তাই আসি তাতে কেন অসন্তোষী
চোখের দেখা দেখতে আসি নহি প্রেম-অভিলাষী
দূরে থেকে সুখী হই কথা কও তাই কথা কই
এত অপমান সই তবু তোমায় ভালবাসি। (হরু ঠাকুর)

নিতান্ত না রইতে পেরে দেখতে এলাম আপনি
দেখ বা না দেখ আমায় দেখিব ও মুখখানি।

মনে করি আসিব না এ মুখ আর দেখাব না,
না দেখিলে প্রাণ কাঁদে কেন যে তা নাহি জানি।
এসেছি দিব না ব্যথা তুলিব না কোন কথা
সাধিব না কাঁদাব না যাব এখনি।
যেথায় আছ সেথায় থাক আর কাছে যাব নাক,
চোখের দেখা দেখব শুধু দেখেই যাব এখনি। (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ)

এই ধরনের উদাহরণ আরও সংকলন করা যায়। এগুলির পাশে রবীন্দ্রনাথের 'আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে', 'আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি' এবং 'আমার পরান যাহা চায়' এই গানগুলির তুলনা করলেই দেখা যাবে, প্রেমের প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে প্রাক্তন গীতরূপকে কবি কতখানি গ্রহণ করেছিলেন। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের মত কবিপ্রতিভা সে যুগে কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর গীতকারদের মধ্যেই ছিল না। তাই শেষ পর্যন্ত অসামান্য সৌন্দর্যচেতনায়, পরিণতশ্রী মাধুর্যে, সুনিপুণ কারুকলায় রবীন্দ্রনাথের গান সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগীতে পরিণত হয়েছে।

'প্রীতিগীতি'র দৃষ্টি-নয়ন-আঁখি-বিষয়ক গানগুলির পারম্পর্যেও রবীন্দ্রনাথের গানের স্মৃতি জাগতে পারে। প্রেমের উদ্বিগ্ন ব্যাকুলতায় প্রেমিকার নয়নের ভূমিকা গীতকারদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। নিধুবাবুর গানে আছে—

নয়ন পাগল সই করিল আমারে
যত দেখি তথাপি আশা নাহি পুরে।
যদি বিনয়েতে মন স্থির হয় কদাচন
নয়ন মন্ত্রণা দিয়া ভুলায় তাহারে।···

আর একটি গানে তিনি বলেছেন, 'নয়ন মনঃ ডুবিল প্রাণ নয়নে তোমার।' রাধামোহন সেনের গানে আছে 'কটাক্ষে মরি ওলো কটাক্ষে তরি আমি তোমার।' কালী মির্জা গেয়েছেন সিন্ধু-ভৈরবীতে—

পাসরিতে চাই তারে না যায় পাসরা
আমারে মজালে আমার নয়ানেরই তারা।

কালিদাস গাঙ্গুলি, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, জগন্নাথপ্রসাদ বসুমল্লিক, মদনমোহন তর্কালংকার মহারাজা মহতাবচন্দ্র, রাজা মহেন্দ্রলাল খান—এঁদের সকলের গানেই নয়নের প্রসঙ্গ আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানেও নয়নের উল্লেখ

একাধিক স্থানে আছে। ঐ আঁখি রে, ধরা দিয়েছি গো, তুমি কোন কাননের ফুল প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। হরু ঠাকুরের একটি গানের অংশ—

সই দেখ নিজ করে প্রাণপণ করে গাঁথিলাম এ কুসুমহার
এ কী নিরানন্দ বিনে সে গোবিন্দ হেনমালা গলে দিব কার।

এর সঙ্গে তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের 'আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে' গানের শেষাংশ—

আমি যদি গাঁথি গান অথির পরান সে গান শুনাব কারে আর
আমি যদি গাঁথি মালা লয়ে ফুলমালা কাহারে পরাব ফুলহার।

রবীন্দ্রনাথের একটি গানের চরণ 'বাহির হয়ে এসো তুমি যে আছ অন্তরে'। নিধুবাবুর একটি গানে আছে—

ধীরে ধীরে যায় দেখ চায় ফিরে ফিরে
কেমনে আমারে বল যাইতে ঘরে।
যে ছিল অন্তরে মোর বাহে দেখি তারে
নয়ন-অন্তর হলে পুনঃ সে অন্তরে।

উনিশ শতকের অনেক প্রেমের গানে পদাবলীর অনুষঙ্গ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের গানেও পদাবলীর অনুষঙ্গ ছড়ানো আছে, কিন্তু তা পৃথক আলোচনার দাবি রাখে।

১। আন্নার এই উক্তিটিও কবি যথাযথ স্মরণ রেখেছিলেন বলে মনে হয়। ঠিক এই ভাষা কবির একটি গানে ব্যবহৃত হয়েছে, সাদৃশ্যটি কৌতূহলজনক। যথা—'তোমার কাছে এ বর মাগি মরণ হতে যেন জাগি গানের সুরে।' অবশ্য এই গান প্রেমের নয়, এখানে বরপ্রার্থনা দেবতার কাছে। কেবল ভাষাঘটিত সাদৃশ্যই আলোচ্য

২। এই অনুচ্ছেদের ভাবার্থের সঙ্গে তুলনীয় প্রেম-পর্যায়ের ১৯৬ সংখ্যক গানখানি—'পান্থপাখির রিক্তকুলায় বনের গোপন ডালে'

৩। রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড ২য় সং, পৃ ৭৫

৪। রবীন্দ্রকাব্যের নেপথ্যবর্তিনী—কানাই সামন্ত, রবীন্দ্রপ্রতিভা

৫। আলোচ্য উদ্ধৃতি এবং শেষ সপ্তক ও পত্রপুটের দুএকটি কবিতাংশ আলোচনাসূত্রে অনিবার্য কারণে পুনরুদ্ধৃত হয়েছে

৫। মহুয়া সম্পর্কে কবির পত্র, রবীন্দ্ররচনাবলী ১৫শ খণ্ড, গ্রন্থপরিচয়

৬। দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে কবির আলোচনা, সংগীতচিন্তা পৃ ১৩০

৭। কাব্যে নীতি—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়; সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬

৮। ভারতী, বৈশাখ ১২৯০, দ্র অচলিত সংগ্রহ রবীন্দ্ররচনাবলী ২য় খণ্ড

রবীন্দ্রসংগীতে পূজা-পর্যায়

১

প্রবাসী পত্রিকার কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩২২ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের এই সংগীতটি প্রকাশিত হয়—

কান্নাহাসির দোল-দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা,
তারই মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ডালা—
এই কি তোমার খুশি, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের-গন্ধ-ঢালা।

এই গানটিকে কবি তাঁর গীতবিতানের প্রথম সংগীতরূপে নির্দেশ করেছেন, যেন এই গানখানির মধ্য দিয়েই কবির সংগীতসাধনার মর্মকথাটি অভিব্যক্ত হয়েছে। কবি যেন জানতে চান, কবির জীবনদেবতার অভিপ্রায় কি কবির কণ্ঠে সুরের সুগন্ধিমাল্যখানি পরিয়ে-দেওয়া? তাই কি ঋতুর কান্নাহাসির দোলায়, রাতের না-বাঁধা বাসায় দুঃখজাগরণে, অসমাপ্ত দিনকৃত্যে, বিনা কাজের সেবায়, অশান্তির আঘাতে-তাড়নে কবি শুধুই বীণা বাজিয়ে চলেছেন? সে গান অগ্নিশিখার মত অন্তরকে দাহ করলেও তাঁর ইচ্ছায় কবিকে গান গাইতেই হবে। কারণ

সুর ভুলে যেই ঘুরে বেড়াই কেবল কাজে
বুকে বাজে তোমার চোখের ভৎর্সনা যে।

গীতবিতানের পূজা-পর্যায়ে মোট ৬২৬টি গান সংকলিত হয়েছে, যে সংখ্যা প্রেম প্রকৃতি বা স্বদেশ-পর্যায়ের তুলনায় অনেক বেশি।[১] পূজা-পর্যায়ের গানগুলিকে আবার কবি স্বয়ং দ্বিতীয় সংস্করণ গীতবিতানে গান, বন্ধু, প্রার্থনা, বিরহ, সাধনা ও সংকল্প, দুঃখ, আশ্বাস, অন্তর্মুখে, আত্মবোধন, জাগরণ, নিঃসংশয়, সাধক, উৎসব, আনন্দ, বিশ্ব, বিবিধ, সুন্দর, বাউল, পথ, শেষ ও পরিণয়—এই কয়টি উপপর্যায়ে বিন্যস্ত করেছিলেন। এই বিভাগের মধ্যে 'গান' উপপর্যায়ের গীতসংখ্যা মোট ৩২টি এবং এই গানগুলিতেই রবীন্দ্রনাথের সুরময়ী ভক্তিপ্রাণতার মানচিত্রটি নিহিত আছে। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনা, ঈশ্বরানুভূতি, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নিয়ে বাঙলা সাহিত্যে অনেক আলোচনা হয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধর্মসংগীত বা পূজা-পর্যায়ের গানগুলি নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়নি। শ্রদ্ধেয় অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর কাব্যপরিক্রমায় গীতাঞ্জলি

গীতিমাল্য ও রবীন্দ্রনাথের ধর্মসংগীত নিয়ে সামান্য আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক পূজাসংগীত সে আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। গীতাঞ্জলি সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল ও কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এবং সাম্প্রতিককালের বহু যশস্বী রবীন্দ্রসাহিত্যসমালোচক নানা বিশ্লেষণ করেছেন। গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালির বাইরে রবীন্দ্রনাথের ভক্তি-চেতনার যে পরিচয় তাঁর বহুশত সংগীতে ছড়ানো আছে সেইগুলির মূল্যায়ন অসম্পূর্ণই রয়েছে। 'সুপ্রভাত' নামক একটি পত্রিকার ১৩১৮ আশ্বিন সংখ্যায় কাশীচন্দ্র ঘোষালের 'রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে প্রকাশিত ও রবীন্দ্রনাথের ধর্মমনস্ক সংগীতের তাৎপর্য-নির্ণয়ে উল্লেখযোগ্য। আধুনিককালে প্রকাশিত কিছু কিছু রচনার মধ্যে শেফালিকা শেঠের 'রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ' এবং 'সুরঙ্গমা' পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত সুবোধ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথের ধর্মসংগীত' প্রবন্ধ এই বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত বলা যেতে পারে।

ঈশ্বর মানব এবং প্রকৃতি এই তিন ভুবনের নাগরিক রবীন্দ্রনাথ বোধ করি ঈশ্বরের প্রতিই তাঁর সর্বাধিক আনুগত্য প্রকাশ করেছেন সংগীতের মধ্য দিয়ে। পারিবারিক ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান-উৎসবে সংগীতরচনার যে ঐতিহ্যে তিনি লালিত হয়েছিলেন, সেখানে গানের সুর কেবল শিল্পকর্ম বা চিত্তবিনোদ মাত্র ছিল না, সুরকে অন্তরের গভীরে ভক্তির সোপানরূপে গ্রহণ করার বিশ্বস্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। কবি যখন নিজে একথা স্বীকার করেছেন—

ঘরে আমার রাখতে হয় যে বহুলোকের মন—
অনেক বাঁশি অনেক কাঁসি অনেক আয়োজন।
বঁধুর কাছে আসার বেলায় গানটি শুধু নিলেম গলায়,
তারই গলার মাল্য করে করব মূল্যবান।

তখন এই উপলব্ধিকে কেবল অতিরঞ্জন বলে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

বস্তুত ভক্তিপ্রেরণার সঙ্গে সংগীতসৃষ্টির ও সুরবন্ধনের প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ ঠাকুর পরিবারের সকল তরুণ প্রতিভাশালীকেই উদ্দীপ্ত করেছিল, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বিশিষ্ট গুণী আচার্য গায়কদের কণ্ঠে প্রচারিত ও শিক্ষালব্ধ ধ্রুপদ ধামার হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিণী-আশ্রয়ী গানগুলির সুর যখন তাঁদের মাতিয়ে রেখেছে, তখন সেই

প্রবল সুরের দানকে তাঁরা ভক্তিনৈবেদ্য করে আপনাদের কৌলিক সাধনার নামে উৎসর্গ করতে চেয়েছেন। তাই সেই সব সুরের উপর বাঙলা কথা বসিয়ে বাঙলা ব্রহ্মসংগীতের ভাণ্ডার পূর্ণ করতে পারলে অনেকের কাছ থেকে উৎসাহ পাওয়া যাবে, এই আগ্রহে ঠাকুরপরিবারের প্রায় সকলেই হিন্দি গানকে বাঙলায় রূপান্তরিত করতে সুরু করেছিলেন। যদুভট্টের গান বাঙলায় রূপান্তরিত করা যেন একটি আনন্দময় প্রতিযোগিতা ছিল। তাছাড়া ধ্রুপদী রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শান্তিপুরের রাজচন্দ্র রায়ের গান সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"ইহাদের গান ভাঙিয়া তখন আমি ও বড়দাদা অনেকে ব্রহ্মসংগীত রচনা করিয়াছিলাম"। সোনার তরীর বৈষ্ণব কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'প্রিয়জনে যাহা দিতে চাই তাই দিই দেবতারে'। এঁরাও সকলে এঁদের শিল্পীজীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা ও শিক্ষাকে দেবতার বেদীতে অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করে ধন্য হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও প্রথম জীবনে এইভাবে অসংখ্য মার্গসংগীত ও হিন্দি গানের সুর অবলম্বন করে ব্রহ্মসংগীত সৃষ্টি করেছেন। যদুভট্টের 'ফুলিবন ঘন মোর আয় বসন্তরি' গান অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'আজি মম মন চাহে জীবনবন্ধুরে'। একটি সাধারণ প্রকৃতি-বর্ণনার গানের বাক্‌গত তুচ্ছতাকে কী নিবিড় ভক্তিভাবে দ্রবীভূত করে দেওয়া হল! ভগবদনুভূতির নিবিড়তাকে কে কতখানি গানে রূপান্তরিত করতে পারেন, যেন তার প্রতিযোগিতার একটি নিঃশব্দ আয়োজন লক্ষ্য করি একই সুরে রচিত একাধিক ব্যক্তির গীতরচনায়। যদুভট্টের কাফি সুরে রচিত 'রুমঝুম বরখে আজু বাদরবা গিয়ে বিদেশ মোরি' এই প্রেমের গানটিকে রূপান্তরিত করে দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখলেন—

দীনহীন ভকতে নাথ কর দয়া অনাথনাথ তুমি
হৃদয়রাজ বিরাজো নিশিদিন হৃদিমাঝে।
তহ সহবাস-আশে আনন্দে হৃদয় ভাসে;
তোমা বিনা নিশিদিন মন নাথ নাথ ধ্যায়ে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথও ঐ সুরকে বরণ করে অন্যতালে আর একটি ব্রহ্মসংগীতে জন্ম দিলেন—

তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে
আর কেহ নাহি যে বিপদভয় বারে।
এ আঁধার যে তারে।

এক তুমি অভয়পদ জগৎসংসারে,
কেমনে বল দীনজন ছাড়ে তোমারে।

শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকেও দেখি সেই সুর গ্রহণ করে তাঁর ভক্তি-উপাসনার বাঙ্ময় নৈবেদ্য রচনা করতে—

শূন্যহাতে ফিরি হে নাথ, পথে পথে,
ফিরি হে দ্বারে দ্বারে—
চিরভিখারি হৃদি মম নিশিদিন চাহে কারে।
চিত্ত না শান্তি জানে, তৃষ্ণা না তৃপ্তি মানে,
যাহা পাই তাই হারাই, ভাসি অশ্রুধারে।
সকল যাত্রী চলি গেল, বহি গেল সব বেলা,
আসে তিমিরযামিনী ভাঙিয়া গেল মেলা—
কত পথ আছে বাকি, যাব চলে ভিক্ষা রাখি,
কোথা জ্বলে গৃহপ্রদীপ কোন সিন্ধুপারে।

সুতরাং নতুন গীতি-আন্দোলনের আবহাওয়াতেই রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ম-সংগীতগুলি রচিত হতে থাকে, নিছক আনুষ্ঠানিক ধর্মবোধ ও কর্তব্যপালনের অঙ্গীকার থেকে নয়। অথচ কাব্যরচনার ক্ষেত্রে সুরের অনুরূপ প্রেরণা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনায় তাই হয়ত ভগবদুপলব্ধির ক্ষেত্র তাঁর প্রেম-প্রকৃতিচেতনার তুলনায় সংকীর্ণতর। গানের সুরেই কবি আপনাকে অধিকতর দেবচরণে আত্মনিবেদিত করেছেন। ঈশ্বর ও ভক্তের নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সংসারের শত কর্মভাবনার ভিতর দিয়ে প্রবহমান নীরব বিশ্বাস, বিশ্বজগতের অচিন্ত্যশক্তির সঙ্গে কবিচিত্তের ব্যক্তিগত মানব-সম্বন্ধস্থাপন, ঐশ্বর্য-মাধুর্যের মধ্যে বিলসিত ধর্মচেতনা—রবীন্দ্রনাথের ভক্তি-সংগীতের প্রধান সম্পদ। পারিবারিক ধর্মানুশীলনের অভ্যস্ত গণ্ডীতে লালিত হওয়ায় ব্রহ্মসংগীতের ঐতিহ্যকে কবি ছোটবেলা থেকেই গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রতি বৎসর বিভিন্ন ধর্মোৎসব উপলক্ষে গীতরচনা তাঁর প্রায় অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের পূজা-পর্যায়ের গানগুলি নিছক ব্রহ্মসংগীত নয়। ব্রহ্মসংগীতের গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতা ও ভক্তিপ্রকাশের অভ্যস্ত রীতি রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত হয়নি, ব্রাহ্মের অদ্বৈত অপৌত্তলিক ঈশ্বরোপাসনাই রবীন্দ্রনাথের পূজাগীতের একমাত্র অভীষ্ট নয়। ছিন্নপত্রের একটি পত্রে একদা রামমোহনের অদ্বৈতবেদান্ত সম্পর্কে কবি তাঁর কবিমনের স্পর্শকাতর অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে লিখেছিলেন—

"বেদান্তপাঠে বিশ্ব এবং বিশ্বের আদিকারণ সম্বন্ধে অনেকেই নিঃসংশয় হয়ে থাকেন, কিন্তু আমার সংশয় দূর হয় না।...এই মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই যে মুক্তি একথা কিছুতে মনে হয় না।" (১১৭ নং পত্র)

এই কারণে তথাকথিত ব্রাহ্মসমাজের গানগুলিতে যেখানে শুষ্ক বৈরাগ্য, জীবনবিমুখ পারত্রিকতা, মর্তানন্দবিরোধী ভীতিপ্রদ তত্ত্বকথা প্রচারিত হয়েছে, সেখানে রবীন্দ্রনাথের পূজা-পর্যায়ের গানে জীবনের প্রতি গভীর প্রীতি, মর্ত-মমতা, দিনযাপনের আনন্দ ইত্যাদি প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পূজা-পর্যায়ের গানে তাঁর পারিবারিক ধর্মবোধের বদলে ব্যক্তি-চিত্তের ধর্মানুভূতিরই সপ্রীত-বিকাশ ঘটেছে।

ক্রোচে বলতেন Art is a vision—শিল্প একটি দিব্যানুভূতির প্রকাশ মাত্র। রবীন্দ্রনাথের ভক্তিসংগীত ধর্মের শাস্ত্রীয় আচার-বিশ্বাসের তুলনায় কবিকল্পনার সেই দিব্যানুভূতির দ্বারা অনুস্পৃষ্ট। রবীন্দ্রনাথের একটি পূজা-পর্যায়ের গান ('ওহে জীবনবল্লভ ওহে সাধনদুর্লভ') আলোচনা-প্রসঙ্গে দিলীপ-কুমার রায় একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

"এ গানটির ভাবে যে আমাদের মনে পুলক জাগে তার কারণ এ নয় যে, রবীন্দ্রনাথ এ গানটিতে আমাদের অকাট্য যুক্তিবলে ঈশ্বরে ভক্তিমত্তার ঔচিত্য সম্বন্ধে নিঃসংশয় করেছেন—তার কারণ এই যে, তিনি তাঁর হৃদয়ের গভীর অনুভূতিটিকে তাঁর অনুপম কবিত্ব-শক্তির জাদুতে জাগিয়ে তুলেছেন।"[২]

সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় ধর্মসংগীত তথা পূজা-পর্যায়ের গান সম্পর্কেই এই মন্তব্য প্রযোজ্য। ধর্মবিশ্বাসে সাম্প্রদায়িক হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের গানে সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস অপেক্ষা কবিজীবনের সত্যই অধিকতর প্রতিফলিত হয়েছে, সেইজন্যই সেগুলি আমাদের সকলের সমাদরণীয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মচেতনা সম্পর্কে জীবনের নানাপর্বে নানাপ্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। তাঁর সেই সকল ধর্মালোচনা থেকে কবির ধর্মমতের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা কোনো শাস্ত্র লোকাচার অভ্যাস বা সংস্কারমাত্র নয়, তাকেই বলা হয়ে থাকে কবির ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের পূজার গান সেই কবির ধর্মের ভাষ্য, ব্রাহ্মসমাজের একমাত্র সম্পদ নয়। তাই গীতবিতানের পূজা-সংগীত সেই কবিহৃদয়ের বিগলিত হ্লাদিনী, সেই আত্মার আনন্দ। তাঁর একটি সুপরিচিত গানের উল্লেখ করা যায়—

আকাশভরা সূর্য-তারা বিশ্বভরা প্রাণ,

তাহারই মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।

গীতবিতানে এই গানটি প্রকৃতি—ঋতু-পর্যায়ের ভূমিকায় স্থাপিত হলেও এই গান যথার্থ ই পূজা-পর্যায়ের—'অসীমকালের যে হিল্লোলে জোয়ার-ভাঁটায় ভুবন দোলে' তারই অতীন্দ্রিয় উপলব্ধিতে এই গানের প্রতিটি অক্ষর শিহরিত। এই গানে কবি যে জীবনদর্শনের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর সুদীর্ঘকালের সারস্বত জীবনে এইরূপ অনুভূতি বারবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে। সপ্ততিতম জয়ন্তী উৎসবে ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনার জবাবে কবি যে অভিভাষণটি পাঠ করেছিলেন, তার অংশবিশেষ উল্লেখযোগ্য—

"আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনও তাতে ক্লান্ত হল না। বিস্ময়ের অন্ত পাইনি। চরাচরকে বেষ্টন করে অনাদিকালের যে অনাহতবাণী অনন্তকালের অভিমুখে ধ্বনিত, তাতে আমার প্রাণমন সাড়া দিয়েছে, মনে হয়েছে, যুগে যুগে এই বিশ্ববাণী শুনে এলুম। সৌরমণ্ডলীর প্রান্তে এই আমাদের ছোট শ্যামলা পৃথিবীকে ঋতুর আকাশদূতগুলি বিচিত্র রসের বর্ণ-সজ্জায় সাজিয়ে দিয়ে যায়, এই আদরের অনুষ্ঠানে আমার হৃদয়ের অভিষেকবারি নিয়ে যোগ দিতে কোনদিন আলস্য করিনি। প্রতিদিন উষাকালে অন্ধকার রাত্রির প্রান্তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছি, এই কথাটি উপলব্ধি করার জন্য যে যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। আমি সেই বিরাট সত্তাকে আমার অনুভবে স্পর্শ করতে চেয়েছি যিনি সকল সত্তার আত্মীয় সম্বন্ধের ঐক্যতত্ত্ব, যার খুশিতেই নিরন্তর অসংখ্য রূপের প্রকাশে বিচিত্রভাবে আমার প্রাণ খুশি হয়ে উঠেছে, বলে উঠেছে—কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ—যাতে কোনো প্রয়োজন নেই, তাও আনন্দের টানে টানবে, এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপারের চরম অর্থ যাঁর মধ্যে, যিনি অন্তরে অন্তরে মানুষকে পরিপূর্ণ করেই বিদ্যমান বলেই প্রাণপণ কঠোর আত্মত্যাগকে আমরা আত্মঘাতী পাগলের পাগলামি বলে হেসে উঠলুম না।"[৩]

এরই সুরে সুর মিলিয়ে কবির কণ্ঠে গান বেজে উঠেছে—

মধুর তোমার শেষ যে না পাই প্রহর হল শেষ
ভুবন জুড়ে রইল লেগে আনন্দ-আবেশ।
দিনান্তের এই এক কোণাতে সন্ধ্যামেঘের শেষ সোনাতে
মন যে আমার গুঞ্জরিছে কোথায় নিরুদ্দেশ।

২

তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের পূজা-পর্যায়ের গানগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম, তথাকথিত ব্রহ্মসংগীত এবং দ্বিতীয়, রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধর্মবোধ ও ভক্তিপ্রেরণা থেকে উৎসারিত পূজার গান। বাঙলাদেশে ব্রাহ্মধর্মের মুখ্য উদ্যোক্তা ও প্রচারপীঠস্থান ঠাকুরবাড়িতে ব্রহ্মসংগীত-রচনার ঐতিহ্যে লালিত কবিমন অল্প বয়স থেকে ব্রাহ্মসমাজের আনুষ্ঠানিকতাকেই ভক্তিগীত-রচনার প্রেরণারূপে লাভ করেছিল। ব্রাহ্মধর্ম বাঙলার ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি বিচিত্র অধ্যায় যোজনা করেছিল। ধর্মের নৈষ্ঠিক পথে পদচারণা না করে এই ধর্ম বুদ্ধিজীবী বাঙালির জীবনকর্মে একটি রুচি ও শুচিস্মিত পরিশীলিত জীবন-চর্যা ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সৃষ্টি করেছিল।[৪] হিন্দুধর্ম ও সংস্কারের উদার শিক্ষাগুলিকে গ্রহণ করে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার দ্বারা পরিমার্জিত ভদ্র ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বাঙালি সমাজ রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ধর্মদেশনার এক অতিশোভন পথ গ্রহণ করেছিলেন। আচারমার্গীয় হিন্দু সমাজের সঙ্গে তার বিবিধ কারণে সেদিন সংঘর্ষ বেধেছিল সত্য। কিন্তু ইতিহাসের কালান্তরে দাঁড়িয়ে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ব্রাহ্ম-ধর্ম মূলত বাঙালির সাংস্কৃতিক চেতনা ও আত্মিক কৃষ্টির পুনরুজ্জীবনের ব্রতই গ্রহণ করেছিল। তাই ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ও অনুশীলনের এক বৃহৎ অংশে রয়েছে বাঙলা সাহিত্যের চর্চা, বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ-সাধন, সূক্ষ্মতর মানসিক চিৎপ্রকর্ষের অনুশীলন ও সংগীতের জোয়ার। বাঙলা গানকে আপন প্রয়োজনে ব্যবহার করা ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা[৫]। রামমোহন থেকে সুরু করে বিশ শতকের তরুণ ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী সকলেই বাঙলা গানকে ব্রাহ্মধর্মের দ্বিতীয় মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের সংগীতসৃষ্টি সেই গীতধারাটিতে করতোয়া গতিদান করেছিল। নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মপরিবারভুক্ত হওয়ায় ব্রাহ্মধর্মের প্রায় প্রতি পার্বণ-অনুষ্ঠান-উৎসবে গীতপ্রচারের ঐতিহ্যে আবাল্যপরিচিত ছিলেন বলে এবং সেই উপলক্ষে অগ্রজ ও গুরুজন প্রায় সকলকেই নিয়মিত সংগীতরচনা করতে দেখেছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথও কিশোর বয়স থেকে ব্রাহ্মধর্মের নামেই তাঁর অপরিণত গীতপ্রতিভাকে নিবেদিত করার শিক্ষা লাভ করলেন। গুরুস্থানীয় অভিভাবকদের প্রশংসাও তাঁকে এই ব্যাপারে ক্রমশ অধিকতর উৎসাহিত করে তুলেছিল। স্বয়ং মহর্ষিদেব রবীন্দ্রনাথের তরুণ-কণ্ঠের গীতসৃষ্টিকে পুরস্কৃত করে কবির কাব্যপ্রতিভাকেই শুধু

অনুপ্রাণিত করেননি, তাঁর ধর্মপ্রাণতা ও সৎব্রাহ্মীয় মনোবৃত্তিকেও নিশ্চয় অভিনন্দিত করেছিলেন।[৬] সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ভক্তিগীতরচনার প্রাথমিক প্রেরণা ছিল ব্রাহ্মসমাজের সাংগীতিক ঐতিহ্য এবং ঠাকুরপরিবারসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের গীতরচনা। তবু বাল্যবয়সের বা প্রথম যৌবনের এই সকল অধ্যাত্ম-সংগীতে কবিমন যথেষ্ট স্ফূর্তিলাভ করেনি, বরং সে রচনা আংশিক প্রথানির্দিষ্ট ও পূর্বপ্রচলিত ব্রহ্মসংগীতের আদর্শ ও রূপানুসারী। এরই মধ্যে কদাচিৎ কবির বিশুদ্ধ শিল্পোচিত শাস্ত্রনিরপেক্ষ কবিআত্মার চকিত স্পর্শ অনুভব করা যায়। ক্রমশ পরিণত বয়সে কবির ভক্তিগীতগুলি ব্রাহ্মধর্মের আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনের দাসত্ব অতিক্রম করে স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত কবিমনের রহস্য ও দিব্যানুভূতির বাহন হয়ে উঠেছে।

ব্রহ্মসংগীত রচনার ইতিহাস সন্ধান করলে দেখা যায় বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর বিংশতিবর্ষীয় প্রায় তরুণ কবি প্রথম মাঘোৎসবের জন্য আটখানি গান রচনা করেন। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—

"কবি ও সংগীতকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মসংগীত রচনা করিলেন বটে, তবে সেগুলিকে তাঁহার অনুভূতিমূলক কাব্যঐশ্বর্য বলা যায় কিনা তাহাই বিচার্য। জীবনের অনেক কাজ আমরা সামাজিক প্রয়োজন লৌকিক চাহিদা অথবা ব্যক্তিগত অনুরোধাদির জন্য কর্তব্যপালন হিসাবে সম্পন্ন করি। রবীন্দ্রনাথের বিশ বৎসর বয়সে রচিত ব্রহ্মসংগীতগুলি ভগবৎভক্তিপ্রণোদিত আধ্যাত্মিক সংগীত বলিয়া স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। জীবনস্মৃতির একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন, 'আমাদের পরিবারের যে ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না—আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই।' রবীন্দ্রনাথের একথা লিখিবার অর্থ কী বলা কঠিন, কারণ দেখা যায়, প্রতি বৎসর নববর্ষ বা মাঘোৎসবের সময় তিনি বহু ব্রহ্মসংগীত রচনা করিতেছেন। এক্ষেত্রে পরিবারের ধর্মসাধনার সহিত তাহা সংস্রবহীন বলিয়া কিরূপে স্বীকার করা যায়? তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম বয়সে যে সব ব্রহ্মসংগীত রচনা করিয়াছিলেন, সে সব সামাজিক কর্তব্যপালনের জন্য লেখা, ধর্মবিশ্বাস বা আধ্যাত্মিক আন্তরিকতা হইতে উৎসারিত নহে। গানের সুরে মুক্তি আসে নাই, অধিকাংশ গানই মার্গসংগীতের বাঁধা পথের পথিক।"

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনার ইতিহাস আমাদের আলোচ্য নয়, কিন্তু রবীন্দ্র-

সংগীতের ধারাবাহিক বিশ্লেষণে এই সম্পর্কে একটি প্রাঞ্জল ধারণা অপরিহার্য। কেবল জীবনস্মৃতিতে নয়, অন্যত্রও রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু সন্ধ্যাসংগীতের যুগে এই বিদ্রোহ ঠিক স্পষ্ট নয়। বাল্মীকিপ্রতিভারচনার পূর্বেও রবীন্দ্রনাথ হয়ত ব্রহ্মসংগীত লিখেছিলেন, কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে বিলাতপ্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথই যথার্থ ব্রহ্মগীতের যে সূচনা করলেন, গীতাঞ্জলির পূর্ব পর্যন্ত সেই ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল। এর মধ্যে প্রায় প্রতিবৎসরই ব্রাহ্মসমাজের নানা প্রকার প্রয়োজন ও প্রেরণায় উৎসবে অনুষ্ঠানে স্বকণ্ঠে বা অপরের দ্বারা গীত হওয়ার জন্য কবি অসংখ্য গান লিখে চলেছেন। প্রভাতকুমার মন্তব্য করেছেন যে, ব্রাহ্মসমাজের ধর্মভাবকে ভাষা ও সুরদান করেই কবির এই সকল ব্রহ্মসংগীতগুলি রচিত অর্থাৎ এইগুলি 'রচিত গান', 'ভক্ত হৃদয়ের বেদনা-সঞ্জাত ভাবসংগীত' নয়। রবীন্দ্রজীবনীকার সুস্পষ্ট অভিমত জানিয়ে বলেছেন,

"রবীন্দ্রনাথের যথার্থ অধ্যাত্মসংগীতের পালা সুরু হয় গীতাঞ্জলির পর্বে, তাহার পূর্বের পর্বের গানকে ব্রহ্মসংগীত বলিব।"

রবীন্দ্রজীবনীকার রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মসংগীতগুলিকে যেভাবে ভাগ করেছেন, অর্থাৎ গীতাঞ্জলি-পূর্ববর্তী গানগুলিকে ব্রহ্মসংগীত এবং পরবর্তী গানগুলিকে 'যথার্থ অধ্যাত্মসংগীত', তার সার্থকতা সম্পর্কে অনেকেই জিজ্ঞাসা জানাতে পারেন। কারণ একথা রবীন্দ্রজীবনীলেখকও স্বীকার করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর-জিজ্ঞাসা ছিল চিরকালই স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক, 'ব্রাহ্মসমাজের creed-এর দ্বারা সীমায়িত ঈশ্বরজ্ঞান হইতে অন্যরূপ'। মাঘোৎসব অথবা নববর্ষ, বিবাহ বা অন্য কোনো অনুষ্ঠান, যে জন্যই কবি গান রচনা করুন না কেন, তাঁর ধর্ম-ভাবনায় যে বিশিষ্টতা ছিল তাঁর প্রথম জীবনের ব্রহ্মসংগীতেও তা স্পষ্ট। সুতরাং কেবল প্রেরণা বা উপলক্ষের দিক থেকে না দেখে রচনারীতি, অনুভূতি-প্রকাশের ভঙ্গি, গীতরূপের দিক থেকে দেখলে রবীন্দ্রনাথের সামান্য গানই গতানুগতিক 'ব্রহ্মসংগীত' হয়েছে, অন্যথায় তাঁর সমগ্র জীবনের ভক্তিগীত একই কবিমনের সৃষ্টি—তারা অখণ্ড একক ব্যক্তিত্বে উদ্ভাসিত।

৩

রবীন্দ্রনাথের প্রেমসংগীতের তুলনায় তাঁর ধর্মসংগীতের সংখ্যা বেশি, অথচ রবীন্দ্রসাহিত্যে ধর্মচেতনা তাঁর প্রেম-প্রকৃতি-মানববিষয়ক কবিতার তুলনায়

অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ বলে মনে হবে। খেয়া থেকে গীতিমাল্য-গীতালি পর্যন্ত সময়পর্বেই রবীন্দ্রকাব্যে ভগবদ্‌ভক্তি, আত্মসমর্পণ, বৈরাগ্য ও বিশ্বাসের প্রসারিত প্রান্তর, জীবনের অন্য পর্যায়ে সেই তুলনায় ঈশ্বরচেতনা কোথায়? বলাকা থেকে রবীন্দ্রনাথ তো একান্তভাবে মানবের কবি, ব্রহ্মচেতনা অপেক্ষা মনুষ্যত্ব-বোধই তাঁর কবিধর্মকে উদ্দীপিত করেছে, একথা মনে হতে পারে। তবু ধর্মচেতনা ও ধর্মসাধনাই রবীন্দ্রসাহিত্য ও কবিজীবনের অন্যতম মূল প্রেরণা। জীবনের সর্বত্রই তার প্রভাব প্রচ্ছন্ন বা প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় ছিল[৭]। খেয়া থেকে গীতালি পর্যন্ত সে প্রভাব প্রত্যক্ষীভূত, অন্য সময় প্রচ্ছন্ন, এই মাত্র বলা যায়। কড়ি ও কোমলের যৌবনসংরক্ত দেহসচেতন সম্ভোগাখ্য কবিতার অন্তরালেও ঈশ্বরানুভূতি ও অনন্ত দেবতার প্রতি সুচিন্তিত বিশ্বাস অনুভব করা যায়। মানসীর অনেকগুলি কবিতাতেই ঈশ্বরচেতনার পরিচয় আছে—ঈশ্বরের পানে ফুটে-ওঠা শতদল বলেই দেহকামনার মধ্যে নিষ্ফলতার এত হাহাকার। সুরদাস যে দেবীর মধ্যে হরি ও দেবতাকে অনুভব করতে চেয়েছিলেন, তাও মিথ্যা নয়। সোনার তরী চিত্রার যুগ থেকেই রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-অন্তর্যামী তত্ত্বের পরিচয় পাই—তার রোহভূমি যাই হোক না কেন, প্রকারান্তরে তা তাঁর ধর্মচেতনারই পর্যায়ভেদ মাত্র, যদিচ সে ধর্মচেতনার সঙ্গে কৌলিক ব্রাহ্মধর্মের সম্পর্ক ছিল না। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনায়, শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালায়, ধর্ম ও মানুষের ধর্ম প্রভৃতি গ্রন্থে কবি তাঁর এই সম্প্রদায় বা কাল্ট্-নিরপেক্ষ ধর্মবোধের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অথচ কবিতায় এরই সমান্তরালে তখন তাঁর বক্তব্য, 'আমি ব্রাত্য আমি মন্ত্রবর্জিত'।

মোটের উপর প্রেমানুভূতির তুলনায় ধর্মানুভূতি রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও সাহিত্যে কোনোমতেই কম নয়। তাছাড়া তাঁর ধর্মানুভূতি ছিল নিবিড় অনুভবের বিষয়, তত্ত্বের নয়। মানুষের ধর্ম গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত 'মানবসত্য' প্রবন্ধে প্রথম জীবনের ধর্মবোধ সম্পর্কে কবি বলেছেন, 'এটা উপলব্ধি হয়েছিল অনুভূতিরূপে, তত্ত্বরূপে নয়।' এই অনুভূতির ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ ধ্যানের দৃষ্টিতে ভূমার যে সাধনা করেছেন, তাই তাঁর কবিধর্মের চরম অনুভূতি। ব্রাহ্মসমাজের ধর্মীয় উৎসবকেও রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টি কী গভীরভাবে দেখতে শিখেছিল ধর্ম গ্রন্থের 'উৎসব' প্রবন্ধে তার আভাস আছে। এখানে কবি বলেছেন যে, উৎসবই সংসারে খণ্ডছিন্ন বিচ্ছিন্ন মানুষকে এক

অখণ্ড সমগ্রতার-দ্বারা গ্রথিত করে, মিলনের মধ্যে সত্যকে প্রেমকে প্রকাশ করে। "যে মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা খণ্ডকে মিলিত করিয়া দেখি সেই ক্ষণেই সেই মিলনেই আমরা সত্যকে উপলব্ধি করি এবং এই অনুভূতিতেই আমাদের আনন্দ। তখনই আমরা দেখতে পাই

জগতে তব কী মহোৎসব বন্দন করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয় শরণে।"

উৎসবকে, বিশেষত ব্রাহ্মসমাজের ধর্মীয় উৎসবকে এইভাবে গভীর আত্মিক মাহাত্ম্যে দেখার জন্য কবির কাছে কোনো উপলক্ষই আনুষ্ঠানিকতার পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল না। উপনয়নের সঙ্গে দীক্ষা, বিবাহ, মাঘোৎসব, মন্দিরস্থাপন সমস্তই এক জগদ্ব্যাপী মহোৎসবের বিশ্ববন্দনায় পরিণত হয়েছিল। কবির ভাষায়—

"মিলনের মধ্যে যে সত্য তাহা কেবল বিজ্ঞান নহে, তাহা আনন্দ, তাহা প্রেম। তাহা আংশিক নহে, তাহা সমগ্র। কারণ তাহা কেবল বুদ্ধিকে নহে, তাহা হৃদয়কেও পূর্ণ করে। যিনি নানাস্থান হইতে আমাদের সকলকে একের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, যাঁহার সম্মুখে যাঁহার দক্ষিণ করতলচ্ছায়ায় আমরা সকলে মুখোমুখি করিয়া বসিয়া আছি, তিনি নীরস সত্য নহেন, তিনি প্রেম। এই প্রেমই উৎসবের দেবতা—মিলনই তাঁহার সজীব সচেতন মন্দির।"

ধর্ম গ্রন্থের 'উৎসবের দিন' প্রবন্ধের (১৩১১) বক্তব্য একই প্রকার[৮]। এই-ভাবে উৎসবকে কেবল ক্রিড বা কাল্টের দৃষ্টিতে না দেখে কবিদৃষ্টিতে, অসাম্প্রদায়িক অধ্যাত্মভৌম দৃষ্টিতে দেখতে শিখেছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত অনায়াসে রবীন্দ্রসংগীত হয়ে গেছে।

৪

মানুষের ধর্ম (মে ১৯৩৩) গ্রন্থে কবি বলেছেন, মানুষের দুই দিক। একদিকে সে বৈষয়িকতার সিদ্ধির জন্য, জীবনযাত্রা-নির্বাহের জন্য ব্যাপৃত, অন্যদিকে সে বৈষয়িকতার ঊর্ধ্বে, ব্যক্তিগত তুচ্ছতার অতীত। মানুষের জীবনের সেই দ্বিতীয় দিকটিকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে-সংগীতে গ্রহণ করেছেন। তাই তাঁর গান বলে

ক্ষত যত ক্ষতি যত মিছে হতে মিছে
নিমেষের কুশাঙ্কুর পড়ে রবে পিছে।

মানুষের এই দ্বিতীয় দিকটির কথায় কবি বলেছেন, 'সেখানে জীবনযাত্রার আদর্শে যাকে বলি লাভ, যাকে বলি মৃত্যু তাই অমরতা।' সেখানে মানুষ মহত্তর জীবনের মধ্যে বাঁচতে চায়। 'যা আমাদের ত্যাগের দিকে তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।'

এই মানুষের ধর্মই কবির ধর্ম। কবির দেবতা কোনো শাস্ত্রাচার, কাল্টের দেবতা নয়, সে দেবতা মানুষেরই পূর্ণতার রূপ। মানুষের ধর্ম গ্রন্থের ভূমিকায় কবি স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন—

"আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদাজনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। তিনি সর্বজনীন, সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব। মহাত্মারা সহজে তাঁকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে, তাঁর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবনসীমা অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়।...সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করেছে, তাঁকেই বলেছে 'এষো দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা।' 'সকল মানবের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাঁকে পাবে আশা করে তাঁর উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়েছে স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। সেই মানব সেই দেবতা য একঃ, যিনি এক, তাঁর কথাই আমার এই বক্তৃতা-গুলিতে আলোচনা করেছি।"

প্রশ্ন উঠতে পারে, কবির এই মানবসম্বন্ধ দেবতার ধারণাটি নিতান্ত শেষ বয়সের কবিচেতনা ও মানববোধ থেকে উৎসারিত। কিন্তু এই প্রশ্নেরও উত্তর আছে। মানুষের ধর্ম গ্রন্থে এই দেবতাকেই একস্থানে কবি বলেছেন 'মনের মানুষ'। তিনি বলেছেন—

"মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ; জ্ঞানে কর্মে ভাবে যে পরিমাণে সত্য হই, সেই পরিমাণেই সেই মনের মানুষকে পাই—অন্তরে বিকার ঘটলে সেই আমার আপন মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাইনে। মানুষের যত কিছু দুর্গতি আছে, সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে, তাকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে, অর্থাৎ আপনাকেই পর করে দিয়ে।'

বাউলদের সাধনায় এই মনের মানুষের সন্ধান তাই কবিকে বিচলিত করেছিল। প্রাগুক্ত অংশের শেষ বাক্যটি একটি পুরাতন বাউল গানের ভাষান্তর মাত্র। 'আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে' এই গানটির

উল্লেখ তিনি জীবনের নানা সময়ে করেছেন[৭]। মানুষের ধর্ম গ্রন্থেও তিনি এই গানটির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, "সেই বাইরে বিক্ষিপ্ত আপনহারা মানুষের বিলাপগান একদিন শুনেছিলেম পথিক ভিখারির মুখে"। তাছাড়া 'মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ' এই বাউল গানের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন—

"সেই অন্বেষণের প্রার্থনা বেদে আছে, আবিরাবীর্ম এধি—পরম মানবের বিরাট রূপে যার স্বতঃপ্রকাশ আমারই মধ্যে তাঁর প্রকাশ সার্থক হোক।"

গীতবিতানের পূজা-পর্যায়ের অনেকগুলি গানে কবি এই মনের মানুষের রূপক-প্রতীক সচেতনভাবে ব্যবহার করেছেন। 'বাউল' নামে একটি গীত-পর্যায়ের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কেবল বাউল সুরই গানগুলির একমাত্র লক্ষণ নয়, সেই সুরের অনুষঙ্গে কবির একতারায় তাদের যে ঔদাস্য ও বৈরাগ্যের গৈরিক রাগিণী ধ্বনিত হয়েছে, তার অন্তরালে রয়েছে সহজিয়া সাধনার মর্ম-কথাটি, 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে আমার মনে'। মানুষের ধর্ম ভাষণের বহুপূর্বে ১৩২৯ সালের ৩২ আষাঢ় কবি একটি গানে গেয়েছেন—

আমি কান পেতে রই আমার আপন হৃদয়গহন-দ্বারে
কোন গোপনবাসীর কান্নাহাসির গোপন কথা শুনিবারে।

'মনের মানুষ' শব্দটি দীর্ঘকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে সঞ্চরণ করেছে একথা তাঁর রচনাবলী থেকে আমরা জানি। আপন হৃদয়ের সেই পরমপ্রিয় মহাজনের সঙ্গে কবির গভীর আত্মিক সম্পর্কের বিচিত্র লীলা ধ্বনিত হয়েছে এই পর্যায়ের 'সে যে মনের মানুষ কেন তারে বসিয়ে রাখিস নয়নদ্বারে', 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে', 'ও আমার মন যখন জাগলি না রে', 'আমি তারেই জানি আমায় যে জন আপন জানে' প্রভৃতি গানগুলিতে। 'বাউল' নামে পরিচিত হলেও এইগুলির ভাবে-ভাষায় কবির পূজা-পর্যায়ের গানের যাবতীয় সাধারণ ধর্মই নিহিত—সেই মর্তপ্রীতির সুরে নিষিক্ত হয়ে বিশ্ব-দেবতার চরণে গভীর প্রণতিনিবেদন, কবির সংগীতে মনের মানুষের একান্ত বাণীটিকেই অজ্ঞাতে-অগোচরে ঘোষণা করা, সেই অন্তর্লোকশায়ী দেবতার দৃষ্টি-প্রদীপেই বিশ্বের দৃশ্যরূপের আরতি করা। হৃদয়ের যে নিভৃতে এই মনের মনের মানুষের বাস, 'ভ্রমর সেথায় হয় বিবাগি নিভৃত নীল পদ্ম লাগি'। এই মনের মানুষের জন্যই এ বিশ্ব আজও কবির চোখে অনিঃশেষ সুষমার ভাণ্ডার, অসীম সৌন্দর্যের উপাদান—

সে আছে বলে
আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে,
প্রাতে ফুল ফুটে রয় চোখের তারার আলোয়,
এত রূপের খেলা রঙের মেলা অসীম সাদায় কালোয়।

এও সেই 'ছবি' কবিতার প্রিয়জনকে হারিয়ে-ফিরে-পাওয়ার উৎসবের মত। 'ছবি' কবিতায় কবি বলেছিলেন,

নয়নসম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই,
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল,
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।

মনের মানুষ সম্পর্কেও কবি ঠিক একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। 'ছবি' কবিতার সুরে সুর মিলিয়ে কবির একতারায় বাজে—

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,
তাই হেরি তায় সকল খানে।
আছে সে নয়নতারায় আলোক-ধারায়, তাই না হারায়,
ওগো তাই হেরি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যেদিক পানে।

'ছবি' কবিতায় কবি বলেছিলেন, 'কবির অন্তরে তুমি কবি'। প্রিয়জনকে বলেছিলেন,

নাহি জানে, কেহ নাহি জানে,
তব সুর বাজে মোর গানে।

এইভাবে মৃত্যু-বিচ্ছিন্না প্রিয়জনকে অতীন্দ্রিয়তার দ্বারা ঊর্ধ্বায়িত করে কবি অন্তরপ্রেরণার অধিষ্ঠাত্রী করেছিলেন। অন্যদিক থেকে বিশ্বজগতের ঊর্ধ্বসীমা থেকে দেবতাও কবির প্রিয়জনে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। সুতরাং 'প্রিয়জনে যাহা দিতে পারি তাই দিই দেবতায়'। তারই যথার্থ প্রকাশ ঘটল গানে—

মাঝে মাঝে তার বারতা
আমার ভাষায় পায় কী কথা রে,
ও সে আমায় জানি পাঠায় বাণী গানের সুরে লুকিয়ে তারে

কিংবা, কবি যখন গেয়ে থাকেন—

তারই বাণী হঠাৎ উঠে পুরে
আনমনা কোন তানের মাঝে আমার গানে সুরে।

অথবা, আজ ফিরে এসে নিজের দেশে এই-যে শুনি
শুনি তাহার বাণী আপন গানে।

'মানুষের ধর্মে' কবি এক জায়গায় বলেছেন, "ইনি প্রেমের সম্বন্ধে মানবের ভূত ভবিষ্যৎকে পূর্ণ করে আছেন নিখিল মানবলোকে। আহ্বান করছেন দুর্গমপথের ভিতর দিয়ে পরিপূর্ণতার দিকে, অসত্যের থেকে সত্যের দিকে, অন্ধকার থেকে জ্যোতির দিকে, মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে, দুঃখের মধ্য দিয়ে তপস্যার মধ্য দিয়ে।" আর কবির সংগীতে তারই অপরূপ প্রকাশ ঘটেছে এই ভাবে—

জানি তোমার প্রেমে সকল প্রেমের বাণী মেশে,
আমি সেইখানেতেই মুক্তি খুঁজি দিনের শেষে।
সেথায় প্রেমের চরম সাধন,
যায় খসে তার সকল বাঁধন—
মোর হৃদয়পাখির গগন তোমার হৃদয়দেশে।

৫

রবীন্দ্রনাথের পূজা-পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে প্রতিফলিত ধর্মচেতনার বিশ্লেষণ করতে হলে তাঁর 'ধর্ম', 'শান্তিনিকেতন' ভাষণমালা ও 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থ তিনটির আলোচনা অপরিহার্য। 'ধর্ম' ও 'শান্তিনিকেতন' প্রায় একই পর্যায়ভুক্ত। 'ধর্ম' ১৩১৫ সালে 'গদ্যগ্রন্থাবলী'র ষোড়শ ভাগরূপে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি অধিকাংশই শান্তিনিকেতনে বর্ষশেষ, নববর্ষ বা পৌষোৎসবে কথিত বা পঠিত, কয়েকটি অন্যত্র পঠিত। ব্রাহ্মসমাজের আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গেই এই বক্তৃতা, ভাষণ ও আলোচনাগুলি বিশেষভাবে জড়িত। মন্দিরে আচার্যের বেদীতে উপবেশন করেই অধিকাংশ আলোচনা কথিত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও এই সকল আলোচনা-ধর্মদেশনা-উপদেশের সর্বস্বত্ব কবি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃকই সংরক্ষিত। দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানের সঙ্গে এদের পার্থক্য এইখানেই। এইগুলি রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনা, নিজস্ব ধর্মবোধ ও ঈশ্বরভাবনার ব্যক্তিগত আলোকে দীপ্যমান—কোনো

সাম্প্রদায়িক মতবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ বারবার তাঁর এইসব আলোচনাকে উদ্ভাসিত করার জন্য স্বরচিত সংগীতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যেন সেইগুলি তাঁর পূজা-সংগীতেরই গদ্যভাষ্য। এইজন্য তাদের স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকৃতি ও নামকরণ করা হয়েছে। উপনিষদের শ্লোকাদির যে ব্যাখ্যা সময়ে সময়ে এতে করা হয়েছে, তার সঙ্গে কোনো প্রচলিত উপনিষদভাষ্যের মিল নেই—সমস্ত ব্যাখ্যাই কবির নিজস্ব। কোথাও তা উপলব্ধির নিবিড়তায় অনন্য, কোথাও আবেগে কম্পমান, প্রেমে শিহরিত, কোথাও কাব্যিক অনুভবের দ্বারা রোমাঞ্চিত, সন্ধ্যাপ্রভাত-সৌন্দর্যে পুলকিত।

'ধর্ম' বা 'শান্তিনিকেতনে'র ভাষণগুলির পটভূমিতে আছে নৈবেদ্যের কবিতা, গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির গান, একথা চিন্তা করলে প্রতিটি আলোচনাই হৃদ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। মনে হয় যেন, এখনই কথার অবসানে সেই বিশেষ গানটি শোনা যাবে, সমস্ত কথাকে সুরের মহানুভবতায় পূর্ণ করে দেওয়া হবে, সমস্ত ব্যাখ্যান-প্রচারের নেপথ্যবর্তী উপলব্ধিটির নিবিড়তা ছড়িয়ে পড়বে, গানের ভিতর দিয়ে ভুবনকে দেখা চেনা ও জানা সম্পূর্ণ হবে। গান ছাড়া যেন এই সব ভাষণের কোনো অর্থই নেই। ভাষণগুলি ব্রাহ্মসমাজের তথাকথিত প্রচলিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রদত্ত হলেও কবির নিজের অনন্যসাধারণ আশ্চর্য অনুভব ও প্রকাশক্ষমতায় এই গদ্য ভাষণগুলি এক অদৃশ্য বিশ্বদেবতার মহোৎসবসভার মন্ত্রপাঠে পরিণত হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথের পূজা-সংগীতগুলি সেই উৎসবের শেষ অঞ্জলিনিবেদন মাত্র। নৈবেদ্য-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য নামগুলিও এই দিক থেকে সার্থক। 'উৎসব' প্রবন্ধে কবি প্রশ্ন করেছিলেন—

"আমাদের এই সংগীতধ্বনি কি আমাদিগকে জগতের সেই গভীরতম অন্তঃপুরে প্রবাহিত করিয়া লইয়া যাইতেছে—যেখানে বিশ্বভুবনের সমস্ত সুর তাহার আপাত-প্রতীয়মান বিরোধবিশৃঙ্খলতা মিলাইয়া দিয়া প্রতি মুহূর্তেই পরিপূর্ণ রাগিণীরূপে উন্মেষিত হইয়া উঠিতেছে"। (উৎসব—ধর্ম)

অন্তত কবির নিজের সংগীত-সম্পর্কে এই প্রশ্নের সদর্থক অবসান ঘটেছে: যে-কোনও উৎসব-উপলক্ষে রচিত কবির সংগীত তাই উপলক্ষ-মাত্রেই সীমাব থাকেনি, জগতের সেই গভীরতম অন্তঃপুরে প্রবাহিত হয়েছে এবং বিশ্বভুবনে সমস্ত বিরোধ-বৈপরীত্যকে মিলিয়ে দিয়ে এক পরিপূর্ণ রাগিণীরূপে উন্মেষি

হয়ে উঠেছে। একমাত্র তাই কবিই উৎসব-উপলক্ষে 'ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর' গানে বলতে পেরেছেন—

কলুষ-কল্মষ বিরোধ-বিদ্বেষ হউক নির্মল, হউক নিঃশেষ—
চিত্তে হোক যত বিঘ্ন অপগত নিত্য কল্যাণকাজে।
স্বর তরঙ্গিয়া গাও বিহংগম, পূর্ব-পশ্চিম-বন্ধুসংগম,—
মৈত্রীবন্ধন-পুণ্যমন্ত্র পবিত্র বিশ্বসমাজে।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, গীতবিতানের পূজা-পর্যায়ান্তর্গত কবিযোজিত একটি উপ-পর্যায়ের নাম 'উৎসব' (গীতিসংখ্যা ৭টি, ৩০২-৩০৮ সংখ্যক)। কিন্তু 'ধর্ম' গ্রন্থের 'উৎসব' প্রবন্ধের ভাবসম্পদ ঐ সাতটি গানে বিশেষ নেই। অথচ 'উৎসব' প্রবন্ধে কবি যেভাবে মিলনের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর কবিতা ও গানে সে বিষয়ে প্রচুর উদাহরণ ও ভাষ্য পাওয়া যায়। 'উৎসব' প্রবন্ধে কবি যখন বলেন, "সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রকাশ, সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রেম, আনন্দ"—তখন স্বতই মনে পড়ে—

মোরা সত্যের পরে মন আজি করিব সমর্পণ,
জয় জয় সত্যের জয়……
মোরা আনন্দমাঝে মন আজি করিব বিসর্জন,
জয় জয় আনন্দময়।

এবং আরও বহু সমধ্বন্যাত্মক গানও একই সূত্রে স্মর্তব্য। কবি লেখেন, "আনন্দ হইতেই সত্যের প্রকাশ এবং সত্যের প্রকাশ হইতেই আনন্দ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—এই যে যাহা কিছু হইয়াছে, ইহা সমস্ত আনন্দ হইতেই জাত। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত এই জগৎ আমাদের নিকট সেই আনন্দরূপে প্রেমরূপে ব্যক্ত না হয়, ততক্ষণ তাহা পূর্ণ সত্যরূপেই ব্যক্ত হইল না। জগতে আমাদের আনন্দ, জগতে আমাদের প্রেমই সত্যের প্রকাশরূপের উপলব্ধি। জগৎ আছে—এটুকু সত্য কিছুই নহে, কিন্তু জগৎ আনন্দ—এই সত্যই পূর্ণ।"—১৩১২ সালে লিখিত এই উক্তির ঘনীভূত রসায়িত প্রকাশান্তর পরবর্তী গীতাগুলি কাব্যে, যেখানে প্রত্যয় সংগীতে, বিশ্বাস সুরে, উপলব্ধি গানে পরিণত হয়েছে—'জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।'

৬

ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক কিরূপ ছিল, রবীন্দ্রনাথের পূজা-সংগীতগুলি আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সেই বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা জেনে রাখা দরকার। রামমোহনের জীবনাদর্শের পুণ্যশ্লোক উত্তরসাধক ও অধ্যাত্ম-জীবনের যোগ্যতম ভাবশিষ্য দেবেন্দ্রনাথ যে ব্রাহ্মধর্মের প্রচারব্রত নিয়েছিলেন তাঁর জীবদ্দশাতেই শিষ্য ও পরবর্তী প্রচারকদের দ্বারা ভারতীয় ধর্মবিবর্তনের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রীতি অনুযায়ী তা বহুধাবিভক্ত হয়ে গেল। আদি নববিধান সাধারণ ইত্যাদি নানা নামে ব্রাহ্মসম্প্রদায় আপনাদের স্বতন্ত্র করে তুললেন। ১৮৯১ সালে ভারতীয় লোকগণনাকালে ব্রাহ্মরা হিন্দুরূপেই পরিগণিত হবেন কিনা, এই বিষয়ে সংশয় ও মতভেদ দেখা দিয়েছিল। নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই সনাতন পৌত্তলিক হিন্দুধর্মের প্রতিস্পর্ধী ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও এই সময় আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্যক্তিদের হিন্দুব্রাহ্মরূপে পরিগণিত হওয়ার দাবি পেশ করেছিলেন[১০]। রবীন্দ্রনাথের কাছে ব্রাহ্মত্ব ও হিন্দুত্বে কোনো বিরোধ ছিল না, কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের নৈষ্ঠিক আচারপালনে ক্রিয়ানুষ্ঠানে সাধনায় ও চিন্তায় অন্তত চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত কবি প্রকাশ্যে কোনো বিদ্রোহ করেননি। একমাত্র তাঁর প্রবন্ধ ও ভাষণেই তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়েছে এবং তাঁর সংগীত আপাতভাবে ব্রহ্মসংগীতরূপে রচিত এবং প্রচারিত হলেও সেগুলির ভিতর দিয়েই কবি আপনার একান্ত নিজস্ব, সম্প্রদায়নিরপেক্ষ, ব্যক্তিগত উপলব্ধির ধর্মবোধকে প্রকাশ করেছেন। ১৮৯১ সালের ২২শে ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে (১২৯৮, পৌষ ৭) মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। কবির অধ্যাত্ম-জীবনের সূচনা এবং পরিণতি এই শান্তিনিকেতনকে ঘিরেই সুরু হয়। তাঁর ধর্মদেশনা এই মন্দিরের বেদীতে, কিন্তু তাঁর ধর্মসংগীত এই শান্তিনিকেতনের নীলিম নক্ষত্রপুঞ্জিত নিস্তব্ধ আকাশের নিচে, গৈরিক মাটির উপর বর্ষাপ্লাবনের ছন্দে, শালমঞ্জরীর নিম্নতলের ধ্যানাসনে, সপ্তপর্ণীর স্নিগ্ধচ্ছায় শান্তিপীঠে। এই শান্তিনিকেতনেই কবির ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন, এখানেই তাঁর গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যের গানের ধারা বন্যাবেগে উৎসারিত হয়েছে। শান্তিনিকেতন উপদেশমালার সমান্তরালেই তাই গীতাঞ্জলির যুগ। অথচ সামাজিক জীবনে কবি যে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত ছিলেন সে কথাও সত্য। ধর্মজ্ঞান, ধর্মচেতনা, ব্রহ্মোপলব্ধি মহর্ষিদেবের শিক্ষায় কবির কিশোর

বয়স থেকেই চিত্তক্ষেত্রে দৃঢ়প্রোথিত হয়েছিল। ব্রহ্মসংগীতরচনার ঐতিহ্যও ছিল তাঁর কৈশোরাগত অনায়াস অভ্যাস। নৈবেদ্য রচনাকালেই কবি ব্রাহ্ম-ধর্মের ব্যাখ্যান বা ধর্মোপদেশনা (sermon) রচনা করেছিলেন—নৈবেদ্য কাব্যেও এই ধর্মদেশনার প্রভাব পড়েছে—"ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে সমষ্টির যোগচেষ্টা হইতেছে নৈবেদ্যের কবিতাগুচ্ছের নির্গলিত বাণী" (রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড পৃ ১৮৫)। নৈবেদ্যের অনেকগুলি কবিতা যে আদি ব্রাহ্মসমাজের ধর্মমতবাদের প্রভাবে আচ্ছন্ন, সম্ভবত সেই কারণেই কাব্যখানি কবি মহর্ষিদেবের নামে উৎসর্গিত করেছিলেন বলে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন। অবশ্য ব্রাহ্মসমাজের সমর্থনে কবি ইতিপূর্বেও প্রবন্ধাদি লিখেছেন, মহর্ষিদেবের নির্দেশেই আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হয়েছেন। কিন্তু এই উৎসাহ তাঁর জীবনে ক্রমশ শিথিল হয়ে এসেছিল, অথচ ধর্মচেতনা হ্রাস পায়নি। স্বভাবতই সেই সম্প্রদায়নিষ্ঠার অন্তর্ধানজনিত শূন্যস্থান পূর্ণ করেছে তাঁর নতুন পূজাসংগীত।

কবির স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা ও প্রচলিত ব্রাহ্মসমাজের ব্যাখ্যায় কখনও বৈপরীত্যও দেখা গেছে। ব্রাহ্মসমাজের একটি প্রার্থনা এইরূপ—

"অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও। অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও। মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃততে লইয়া যাও। হে সত্যস্বরূপ, আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও। দয়াময়, তোমার যে অপার করুণা, তাহা দ্বারা আমাদিগকে সর্বদা রক্ষা কর"।[১১]

যে মূল শ্লোকের এটি অনুবাদ, সেই শ্লোকগুলি রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনার অনেকখানি অধিকার করে আছে। তাঁর বহু আলোচনায়-কবিতায়-সংগীতে এই শ্লোকগুলি কী গভীরভাবে প্রবেশ করেছে, প্রভাব বিস্তার করেছে, তার যথোপযুক্ত গবেষণা ও মূল্যায়ন হয়নি। কিন্তু আলোচ্য শ্লোকগুলির যে ব্যাখ্যা কবির রচনায় প্রাপ্তব্য, তার সঙ্গে বর্তমান ব্রহ্মোপদেশের সম্পর্ক কতখানি দেখা যাক। শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবিশ একটি স্মৃতি উদ্ধার করে একস্থানে লিখেছেন যে, আলোচ্য শ্লোকটির প্রাগুক্ত ব্রাহ্মসমাজীয় ব্যাখ্যা কবির অভিপ্রেত মনে হয়নি। কবি বলেছিলেন—

"ব্রাহ্মসমাজের একটি শ্লোককে বাঙলায় তর্জমা করতে গিয়ে একটা চরণের মানে এমন বদলে দেওয়া হয়েছে, যাতে করে সমস্ত শ্লোকটাই আমার মতে নিরর্থক হয়ে গেছে। ঐ যে রুদ্র যত্তে দক্ষিণম্ মুখম্ তেন মাম্ পাহি নিত্যম্—

এর বদলে বলা হয়েছে, 'দয়াময় তোমার যে অপার করুণা তাহার দ্বারা সর্বদা আমাকে রক্ষা করো'। এটা প্রথম চরণগুলোর সঙ্গে মোটেই খাপ খায়নি। কারণ গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সবটাই দুটো জিনিসকে পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে আসল মন্ত্রটাতে। যেমন অসত্য না থাকলে সত্যের, অন্ধকার না থাকলে আলোর, মৃত্যু না থাকলে অমৃতের কোন মানে নেই, তেমনি রুদ্র না থাকলেও তাঁর প্রসন্নতার কোনো তাৎপর্য থাকে না। সেখানে তাঁকে শুধু দয়াময় বলা ভুল। কারণ তাঁর রুদ্রমূর্তিও যে সংসারে দেখছি, সেটা তো অস্বীকার করতে পারিনে। তাই উপনিষদ তাঁর কাছে দয়া ভিক্ষা না করে চেয়েছেন তাঁর প্রকাশ। সে প্রকাশ বিশ্বজগতের সব জিনিসের মধ্যেই রয়েছে ; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের অন্তরের মধ্যে তা অনুভব করি ততক্ষণ আমার ভয় ঘোচে না, ততক্ষণ তিনি আমার কাছে রুদ্ররূপেই দেখা দেন। তাইতো প্রার্থনা 'অসত্য থেকে আমাকে সত্যেতে নিয়ে যাও, অন্ধকার পেরিয়ে জ্যোতিতে, মৃত্যু পার হয়ে অমৃতলোকে উত্তীর্ণ করো। হে আবিঃ, হে স্বপ্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। হে রুদ্র, তোমার দক্ষিণমুখ যেন সর্বদা আমি দেখতে পাই।' রুদ্রের প্রসন্নতা লাভ করা কী করে সম্ভব হয় যদি না তাঁর প্রকাশ নিজের হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করি ?·· মা যখন সন্তানকে শাসন করেন, সে মনে করে মা নির্দয় হচ্ছেন, তাকে দণ্ড না দিলেই যেন দয়া করা হত, কিন্তু আসলে তো তা নয়। সেই দণ্ডটাই যে তাঁর দয়া, শৈশবদশা কাটিয়ে উঠলে তবে তা আমরা বুঝতে পারি। মায়ের রুদ্র মূর্তির আড়ালে যে তাঁর দক্ষিণমুখ রয়েছে তা যখন দেখতে পায়, তখন তার কান্না থেমে যায়। তাই বলছিলুম অসত্যের পাশে সত্য, অন্ধকারের পাশে আলো, মৃত্যুর পাশে অমৃতের উল্লেখ যেমন করা হয়েছে, তেমনি রুদ্রের পাশে দক্ষিণ মুখের কথাটা বলাই চাই। নইলে সমস্ত মন্ত্রটাই নিরর্থক হয়ে যায়। এটা কিন্তু আমার বাবামশায় করেননি। তাঁর ব্রাহ্মধর্ম ব্যাখ্যানের মধ্যে তিনি মন্ত্রটাকে ঠিকই রেখেছিলেন। এই রুদ্রকে সরিয়ে দিয়ে দয়াময়কে আনার জন্য দায়ী তাঁর পরের যাঁরা, তাঁরা।"

(ও পিতা নোহসি—বাইশে শ্রাবণ, নির্মলকুমারী মহলানবিশ)

তাই শান্তিনিকেতন ভাষণের একস্থানে কবি প্রার্থনা জানিয়েছিলেন—

"হে প্রকাশ, তোমার প্রকাশের দ্বারা আমাকে একেবারে নিঃশেষ করে

ফেলো—আমার আর কিছুই বাকি রেখো না, কিছুই না, অহংকারের লেশমাত্র না।......

হে রুদ্র, পাপ দগ্ধ হয়ে ভস্ম হয়ে থাক। তারপর প্রচণ্ড তাপ বিকীর্ণ কর।......

তারপর হে প্রসন্ন, তোমার প্রসন্নতা আমার সমস্ত চিন্তায় বাক্যে কর্মে বিকীর্ণ হতে থাক। আমার সমস্ত শরীরের রোমে রোমে সেই তোমার পরম পুলকময় প্রসন্নতা প্রবেশ করে এই শরীরকে ভগবতী তনু করে তুলুক।"

(প্রার্থনা—শান্তিনিকেতন)

রুদ্রের সঙ্গে এই প্রসন্নতার ব্যঞ্জনা দীর্ঘকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও চেতনাকে আচ্ছন্ন করে আছে। তাঁর গানের মধ্যেও আমরা রুদ্রের প্রেমের উল্লেখ পাই—

ওগো রুদ্র দুঃখে সুখে এই কথাটি বাজল বুকে
তোমার প্রেমে আঘাত আছে নাইকো অবহেলা।

এই রুদ্র বজ্র হয়ে, ঝড়ের হাওয়া হয়ে কবির কাছে মত্ততার আহ্বান এনেছে বারবার। 'মালা হতে খসে পড়া ফুলের একটি দল' গানে কবি প্রার্থনা করেছেন, 'বহুক তোমার ঝড়ের হাওয়া আমার ফুলবনে'। 'লুকিয়ে আস আঁধার রাতে' গানে শুনতে পাই—

রুদ্র তুমি হে ভয়ের ভয় তুমি আমার আনন্দ।
বজ্র এসো হে বক্ষ চিরে, তুমিই আমার বন্ধু
মৃত্যু লও হে বাঁধন ছিঁড়ে, তুমি আমার আনন্দ।

শুষ্ক জীবনে যাঁর আবির্ভাব করুণাধারায়, মাধুরীহীনতার পর যাঁর আগমন গীতসুধারসে, তাঁকেই কবি আহ্বান করেছেন—

বাসনা যখন বিপুল ধুলায়
অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়
ওহে পবিত্র ওহে অনিদ্র রুদ্র আলোকে এসো।

'যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার' গানে কবির অনুরূপ প্রার্থনা—

যদি কোনো দিন তোমার আহ্বানে
সুপ্তি আমার চেতনা না মানে
বজ্রবেদনে জাগায়ো আমারে ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।

এই প্রসঙ্গে 'আমি যখন ছিলেম অন্ধ', 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি', 'ভয়েরে মোর আঘাত করো ভীষণ হে ভীষণ', 'এই করেছ ভাল নিঠুর', 'আরো আঘাত সইবে আমার', 'হে মহাদুঃখ হে রুদ্র', 'সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ', 'জাগো হে রুদ্র জাগো', 'পিনাকেতে লাগে টংকার', প্রভৃতি সুপরিচিত গানগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে।

৭

দিন ও রাত্রি, আলোকিত প্রভাত ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলিত অন্ধকার, প্রকৃতি-সৌন্দর্যমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথের কাছে যেমন বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে প্রতিদিন আবির্ভূত হয়েছে, তেমনি তাঁর ধর্মচেতনাতেও এই দিনরাত্রির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। একদা ছিন্নপত্র-সোনারতরী-চিত্রার যুগে নিসর্গপুলকিত দিনযাপনের আনন্দ-রোমাঞ্চে কবি লিখেছিলেন—

"আমি প্রায়ই এক এক সময় ভাবি, এই যে আমার জীবনে প্রত্যহ এক একটি করে দিন আসছে—কোনোটি সূর্যোদয়-সূর্যাস্তে রাঙা, কোনোটি ঘনঘোর মেঘে স্নিগ্ধনীল, কোনোটি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় সাদা ফুলের মত প্রফুল্ল, এগুলি কি আমার কম সৌভাগ্য। এবং এরা কি কম মূল্যবান।" (ছিন্নপত্র, ৫৩ সংখ্যক)

আর এই কথা ভালো করে মনে করেই পৃথিবীর প্রতি কবি নতুন এক মমতাসঘন দৃষ্টিপাত করেছিলেন, ইচ্ছা করেছিলেন, 'জীবনের প্রত্যেক সূর্যোদয়কে সজ্ঞান ভাবে অভিবাদন করি এবং প্রত্যেক সূর্যাস্তকে পরিচিত বন্ধুর মত বিদায় দিই।' এই চিন্তা কেবল প্রকৃতিপ্রীতি ও যৌবনবেদনার প্রকাশ মাত্র নয়, এর সঙ্গে কবির আধ্যাত্মিক জীবনের চেতনাও নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছে, সৌন্দর্যের সঙ্গে সত্য। ধর্ম গ্রন্থের 'দিন ও রাত্রি' প্রবন্ধে কবি ছিন্নপত্রের মতই লিখেছেন—

"এই যে দিন এবং রাত্রি প্রত্যহই আমাদের জীবনকে একবার আলোকে একবার অন্ধকারকে তালে তালে আঘাত করিয়া যাইতেছে, ইহারা আমাদের চিত্তবীণায় কী রাগিণী ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে? এইরূপে প্রতিদিন আমাদের মধ্যে যে এক অপরূপ ছন্দ রচিত হইতেছে, তাহার মধ্যে কি কোনো বৃহৎ অর্থ নাই?"

অনন্ত গগনতলের নাড়িস্পন্দনের মত দিবসরজনীর নিয়মিত উত্থান-পতনের অভিঘাত আমাদের জীবনে যে একটি বৃহত্তর তাৎপর্যসূত্রে গ্রথিত, তারই প্রমাণ মেলে কবির কয়েকটি প্রভাত-সন্ধ্যাবিষয়ক কাব্যসংগীতে। গীতবিতানে এইগুলি স্বতন্ত্র পর্যায়ভুক্ত হলেও এই কালচিহ্নের দ্বারাই এদের পৃথক তাৎপর্য বিচার করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রভাত-সম্পর্কিত কয়েকটি পূজা-পর্যায়ের গান, (উপপর্যায়গুলি পার্শ্বে উল্লিখিত)—

আজ আলোকের এই ঝরনাধারায়	...	প্রার্থনা
আজি শুভ শুভ্র প্রাতে	..	বিবিধ
আজিকে এই সকালবেলাতে	...	বিশ্ব
আঁধার রজনী পোহাল		আনন্দ
আমারে দিই তোমার হাতে	...	সুন্দর
আমি কেমন করিয়া জানাব	...	বন্ধু
আলো যে যায় রে দেখা	..	আশ্বাস
আলোয় আলোকময় করে হে	.	আনন্দ
এ কী সুগন্ধ-হিল্লোল বহিল	..	সুন্দর
এ দিন আজি কোন ঘরে গো	...	আনন্দ
এই যে তোমার প্রেম ওগো	..	সুন্দর
ওই অমলহাতে রজনীপ্রাতে	...	আনন্দ
ওই পোহাইল তিমিররাতি	.	উৎসব
কার হাতে এই মালা তোমার	...	বন্ধু
জননী তোমার করুণ চরণখানি	...	বিবিধ
জয় হোক জয় হোক	...	বিবিধ
জানি হে যবে প্রভাত হবে	...	নিঃসংশয়
ডাকিল মোরে জাগার সাথী	...	সুন্দর
তিমিরদুয়ার খোল	...	বিবিধ
তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ	...	বন্ধু
তোমার সুর শুনায়ে যে ঘুম	...	বন্ধু
তোমার হাতের রাখিখানি	...	বিশ্ব
তোমারি নামে নয়ন মেলিনু	...	বিবিধ
ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর	...	১—

নদীপারের এই আষাঢ়ের ... আত্মবোধন
নব আনন্দে জাগো .. আনন্দ
প্রথম আলোর চরণধ্বনি ... বিশ্ব
প্রভাতে বিমল আনন্দে ... সুন্দর
বাজাও আমারে বাজাও ... প্রার্থনা
ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময় ... বিবিধ
মোর প্রভাতের এই প্রথম ক্ষণের ... বন্ধু
মোরে ডাকি লয়ে যাও ... বিশ্ব
যদি প্রেম দিলে না প্রাণে .. সুন্দর
রজনীর শেষ তারা গোপনে আঁধারে ... শেষ
শুভ্র আসনে বিরাজো ... বিবিধ
হেরি তব বিমল মুখভাতি আনন্দ

এ ছাড়াও গীতবিতানের পূজাভুক্ত 'জাগরণ'-পর্যায়ের (পূজা ২৬৪—২৮৯) গানগুলি প্রভাতী অনুষঙ্গে পূর্ণ। বলা বাহুল্য এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়—এছাড়াও তাঁর অসংখ্য গানে প্রভাতের প্রসঙ্গ, অনুষঙ্গ বা চিত্রকল্প বিকীর্ণ আছে। এরই পাশে গীতবিতানের কয়েকটি নিশা-বিষয়ক সংগীতের উল্লেখ করা যায়—

অকারণে অকালে মোর পড়ল যখন . বিশ্ব
অশ্রুনদীর সুদূর পারে পথ
আকাশ জুড়ে শুনিনু ঐ বাজে ... বিশ্ব
আজি এ আনন্দ-সন্ধ্যা ... আনন্দ
আজি যত তারা তব আকাশে ... বন্ধু
আঁধার এল বলে . শেষ
আমার গোধূলিলগন ... বিরহ
আমার বেলা যে যায় ... গান
আমার মন তুমি নাথ ... বিরহ
আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে ... বিশ্ব
এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে ... বন্ধু
এবার রঙিয়ে গেল হৃদয়গগন .. পথ
গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে ... অন্তর্মুখে
জাগে নাথ জ্যোৎস্নারাতে ... সুন্দর

জানি গো দিন যাবে এ দিন	...	শেষ
জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে	...	গান
তিমিরবিভাবরী কাটে কেমনে	...	বিবিধ
তোমারই ঝরনাতলার নির্জনে	...	গান
দিন অবসান হল	...	শেষ
দিন যদি হল হল অবসান	..	শেষ
দিনের বেলায় বাঁশি তোমার	..	শেষ
বিশ্ব যখন নিদ্রামগন		বিরহ
মধুর তোমার শেষ যে না পাই	...	শেষ
মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরবেশে	...	সুন্দর
সন্ধ্যা হল গো ও মা	...	বিরহ
হার মানালে গো ভাঙিলে	...	পথ

বলা বাহুল্য রাত্রিবিষয়ক গানের তালিকাও সম্পূর্ণ নয়। মোটের উপর এই সুদীর্ঘ তালিকার দিকে চোখ বোলালে একথা সহজেই প্রমাণিত হয় যে রবীন্দ্রনাথের কাছে দিবস ও রাত্রি কেবল প্রকৃতির দুই কালবাচক পর্যায় মাত্র ছিল না। ধর্ম গ্রন্থের 'দিন ও রাত্রি' প্রবন্ধে কবি লিখেছেন যে, রাত্রি প্রেমের কাল, মিলনের কাল। রাত্রি কেবল সুপ্তির দ্বারা আমাদের ক্ষতিপূরণ করে না, 'সে আমাদের প্রেমের নিভৃত নির্ভরস্থান ; সে আমাদের মিলনের মহাদেশ।' এই মিলন আমাদের জীবনাধিদেবের সঙ্গে, এই প্রেম যেন আমাদের আত্মার পরম প্রিয়ের সঙ্গে। তাই গানে কবি বলেছেন—

আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে
তোমারই নাম সকল তারার মাঝে।......
অমনি করে আমার এ হৃদয়
তোমার নামে হোক না নামময়
আঁধারে মোর তোমার আলোর জয়
গভীর হয়ে থাক জীবনের কাজে।

অথবা 'বিশ্ব যখন নিদ্রামগন গগন অন্ধকার', 'তোমারই ঝরনাতলার নির্জনে', 'জাগে নাথ জ্যোৎস্নারাতে', 'দিন যদি হল অবসান' প্রভৃতি গান-গুলিতে রাত্রির এই তাৎপর্যময় মিলন-পরিবেশটি সুরে গীতায়িত হয়ে উঠেছে। প্রবন্ধের একস্থানে কবি লিখেছেন—

"রাত্রিই উৎসবের বিশেষ সময়। এখন বিশ্বভুবন অন্ধকারের মাতৃকক্ষে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। যে অন্ধকার হইতে জগৎচরাচর ভূমিষ্ঠ হইয়াছে যে অন্ধকার হইতে আলোক-নির্ঝরিণী নিরন্তর উৎসারিত হইতেছে, যেখানে বিশ্বের সমস্ত উদ্‌যোগ নিঃশব্দে শক্তি সঞ্চয় করিতেছে,······সেই অন্ধকার আমাদের নিকট যাহা গোপন করিতেছে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক প্রকাশ করিতেছে।"

এই সঙ্গেই মনে পড়ে, 'এত আলো জ্বালিয়েছ', 'এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে', 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো' প্রভৃতি গানগুলি। আমাদের কবিতায় সংগীতে দেহাবসানের সঙ্গে দিনান্তের তুলনা করা হয়। কবির গানেও দিনাবসানের সঙ্গে মৃত্যুসংকেতকে একাধিক স্থানে উপমিত করা হয়েছে। 'হার মানালে ভাঙিলে অভিমান' গানে কবি বলেছেন—

> এসো পারের সাথি
> বইল পথের হাওয়া নিবল ঘরের বাতি।
> আজি বিজন বাটে অন্ধকারের ঘাটে
> সব-হারানো নাটে এনেছি এই গান।

পূজা-পর্যায়ের পরিচিত ও জনপ্রিয় কয়েকখানি গান—'অশ্রুনদীর সুদূর পারে,' 'অকারণে অকালে মোর পড়ল যখন ডাক', 'জানি গো দিন যাবে এ দিন যাবে', 'দিন যদি হল অবসান', 'দিনের বেলায় বাঁশি তোমার' গানগুলি সেই জীবন থেকে মৃত্যুর দিকে যাত্রার প্রতীককে দিন থেকে রাত্রির পথে যাত্রার দ্বারা আভাসিত করেছে। 'দিন ও রাত্রি' প্রবন্ধে এই ভাবটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে কবি বলেছেন—

"এইরূপে জীবন হইতে মৃত্যুতে পদার্পণ দিন হইতে রাত্রিতে সংক্রমণেরই অনুরূপ। ইহা বাহির হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ, কর্মশালা হইতে মাতৃক্রোড়ে আত্মসমর্পণ—পরস্পরের সহিত পার্থক্য ও বিরোধ হইতে নিখিলের সহিত মিলনের মধ্যে আত্মানুভূতি।"

অন্যদিকে প্রভাতকে কবি চিরকালই মনুষ্যজাগরণের, চেত[illegible] পটভূমিরূপে দেখেছেন। রাত্রির অবসানে নবীন সূর্যোদয় ও আলোকাভাস তাঁর কাছে অজ্ঞানতার অবসানে চৈতন্যজাগরণের ইঙ্গিতরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ধর্ম গ্রন্থের 'মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' এই দুই বাণীর সাহায্যে কবি বলেছেন—

"অশ্রুশিশিরধৌত আমাদের নবজাগরণের জন্য নিখিল অনিমেষনেত্রে প্রতীক্ষা করিয়া আছে—কবে সেই প্রভাত আসিবে, কবে সেই রাত্রির অন্ধকার অপগত হইয়া আমাদের অপূর্ব বিকাশকে নির্মল নবোদিত অরুণালোকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবে। কবে আমাদের বহুদিনের বেদনা সফল হইবে, আমাদের অশ্রুধারা সার্থক হইবে।"

এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথের প্রভাত-সম্পর্কিত বহু গানেরই ভিত্তিমাত্র, তাতে সন্দেহ নেই। 'আজ আলোকের এই ঝরনাধারায়' 'বাজাও আমারে বাজাও' 'আলো যে যায় রে দেখা', 'মন জাগ মঙ্গললোকে', 'এখনো ঘোর ভাঙে না তোর যে', নিশার স্বপন ছুটল রে', 'ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর'—প্রভৃতি এই পর্যায়ের গান। 'মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে একটি ফুলের উদাহরণ দিয়ে কবি বলেছেন যে, ফুলকে সকালবেলায় বলতে হয় না রজনী প্রভাত হল। 'বনে বনে আজ বিচিত্র পুষ্পগুলি অতি অনায়াসেই বিশ্বজগতের অন্তর্গূঢ় আনন্দকে বর্ণে গন্ধে বিকশিত করিয়া মাধুর্যের দ্বারা নিখিলের সহিত কমনীয়ভাবে আপনার সম্বন্ধস্থাপন করিয়াছে।' কবির গান যেমন করে বলেছে,—

মোর প্রভাতের এই প্রথম ক্ষণের কুসুমখানি
তুমি জাগাও তারে ওই নয়নের আলোক হানি।

ঠিক একই ভঙ্গিতে কবির প্রার্থনা—"আমার জীবন কেন বিশ্বব্যাপী আনন্দকিরণপাতে এমনি সহজে, এমন সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠে না?" প্রাতঃসূর্যের রশ্মিচ্ছটা এবং বিশ্বদেবতার প্রেম কবির কাছে একাকার হয়ে গেছে বলেই তো গুনগুনিয়ে উঠেছে গান—

এই যে তোমার প্রেম ওগো হৃদয়হরণ
এই যে পাতায় আলো নাচে সোনার বরণ।

শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালার 'সমগ্র' নামক কথিকাতেও প্রভাতের মধ্য দিয়ে কবি তাঁর এই বিশেষ জাগরণ-তত্ত্বটি প্রচার করেছেন—

"এই প্রাতঃকালে যিনি আমাদের জাগালেন, তিনি আমাদের সব দিক দিয়েই জাগালেন। এই যে আলোটি ফুটে পড়েছে, এ আমাদের কর্মের ক্ষেত্রেও আলো দিচ্ছে, জ্ঞানের ক্ষেত্রেও আলো দিচ্ছে—সৌন্দর্যক্ষেত্রকেও আলোকিত করছে।"

শান্তিনিকেতনের 'পরশরতন' ভাষণে 'পরশরতন' শব্দে কবি প্রভাতের

শুভ্র অনিন্দ্যসুন্দর জ্যোতিকেই ঈশ্বরের প্রসাদরূপে ব্যক্ত করেছেন। 'হে মহাজীবন হে মহামরণ' গানে কবি প্রার্থনা করেছেন

পরাও পরাও জ্যোতির টিকা, করো হে আমার লজ্জাহরণ।
পরশরতন তোমারই চরণ লইনু শরণ লইনু শরণ।

'আজ আলোকের এই ঝরনাধারায়' গানে এই পরশরতন সোনারকাঠি হয়ে গেছে—

যে জন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে
আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে,
এই অরুণ-আলোর সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দাও।

৮

রবীন্দ্রনাথের পূজাসংগীতগুলির মধ্যে 'দুঃখ' নামে একটি অধ্যায় আছে, এই পর্যায়ের গীতসংখ্যা উনপঞ্চাশটি, পর্যায়ভুক্ত ১৯২-২৪০ গানগুলি এই বিভাগে কবি-নির্দিষ্ট [১২]। রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনায় দুঃখবাদ একটি বিশেষ তত্ত্ব ও তাৎপর্য বহন করে। তাঁর নাটক-কাব্য-সংগীতের নানাস্থানে এই দুঃখের তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে। দুঃখ-পর্যায়ের গানগুলি অবশ্য সবই এক বক্তব্যের নয়—এর মধ্যে দুঃখের সঙ্গে শোক, প্রিয়বিচ্ছেদবেদনা, পার্থিব ক্ষয়ক্ষতির দুঃখও মিশে গেছে। ব্যক্তিগত জীবনের বহু স্বজনহারানোর আর্তনাদ, প্রিয়জনবিয়োগের অপ্রত্যাশিত সর্বনাশ বারবার কবির জীবনের ভারসাম্য বিচলিত করেছিল। উৎসবের দীপমালা কতবার আততায়ী মৃত্যুর আক্রমণে পাণ্ডুর হয়ে গেছে তাঁর কবিজীবনের বহু পর্বে-পর্যায়ে। মৃত্যুর হাত থেকে বারবার জীবনের পেয়ালা তুলে নিতে নিতে কবির মন এইভাবে দুঃখের দর্শন গড়ে নিয়েছে, শোকের কষ্টিপাথরে ঘষে ঘষে দুঃখকে করে তুলেছে বিশুদ্ধ স্বর্ণাভ। এই কারণে আপাতদৃষ্টিতে যা নিরাসক্ত দার্শনিকের দুঃখবাদ, সেই জাতীয় আলোচনার নেপথ্যে প্রায়ই কোনো গভীর শোকাবহ ঘটনার স্মৃতি নিহিত থাকে। ১৩১০ সালে শান্তিনিকেতনে পৌষ-উৎসবে প্রদত্ত ভাষণ 'দিন ও রাত্রি' এবং একমাস পরে কলকাতায় মাঘোৎসবে প্রদত্ত ভাষণ 'মনুষ্যত্ব' এই ব্যক্তিগত দুঃখের ছায়ায় নিবিড়। গত এক বৎসরের মধ্যে কবিপত্নী ও মধ্যমা কন্যা রেণুকার আকস্মিক তিরোধান ঘটেছে। 'দিন ও রাত্রি'র মধ্যে তাই 'ঈশ্বরের মাতৃরূপের ব্যাখ্যাই প্রাধান্য লাভ করেছে', রবীন্দ্রজীবনীকারের এই অভিমত সুচিন্তিত। 'মনুষ্যত্ব'

প্রবন্ধে ব্রহ্মের মধ্যে আত্মসমর্পণের দ্বারা কবি দুঃখকে মহত্তর অনুভূতি করে তুলতে চেয়েছেন। ১৩১৪ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ কবি হারালেন প্রাণাধিক কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রকে (এই একই তারিখে তাঁর স্ত্রীবিয়োগও ঘটেছিল)। মাঘোৎসবে সেই বৎসর পঠিত 'দুঃখ' প্রবন্ধে তার অনিবার্য প্রভাব পড়েছে।

সাধারণভাবে দুঃখ বলতে কবি যা বুঝিয়েছেন, তাঁর সংগীতের ভাষাতেই তার সর্বাধিক ঘনীভূত সংযত ও সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে। এই দুঃখ বিষয়ে কবির অভিসিদ্ধান্ত—

দুঃখ যদি না পাবে তো দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে
বিষকে বিষের দাহ দিয়ে দহন করে মারতে হবে।

এই দুঃখতত্ত্ব সম্পর্কে কবির দার্শনিক মনের সুস্পষ্ট ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে। সেখানে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, 'আমার ব্যক্তিগত মনে সুখদুঃখের যে অনুভূতি সেটা বিশ্বমনের মধ্যেও সত্য কিনা'। এর উত্তরে তিনি নিজেই বলেছেন—

"অহংসীমার মধ্যে যে সুখদুঃখ আত্মার সীমায় তার রূপান্তর ঘটে। যে মানুষ সত্যের মধ্যে জীবন উৎসর্গ করেছে, দেশের জন্যে লোকহিতের জন্যে—বৃহৎ ভূমিকায় যে নিজেকে দেখেছে, ব্যক্তিগত সুখদুঃখের অর্থ তার কাছে উল্টো হয়ে গেছে। সে মানুষ সহজেই সুখ ত্যাগ করতে পারে এবং দুঃখকে স্বীকার করে দুঃখকে অতিক্রম করে। স্বার্থের জীবনযাত্রায় সুখদুঃখের ভার গুরুতর, মানুষ স্বার্থকে যখন ছাড়িয়ে যায় তখন তার ভার এত হালকা হয়ে যায় যে, তখন পরম দুঃখের মধ্যে তার সহিষ্ণুতাকে, পরম অপমানের আঘাতে তার ক্ষমাকে, অলৌকিক বলে মনে হয়। আপনাকে বৃহতে উপলব্ধি করাই সত্য, অহংসীমায় অবরুদ্ধ জানাই অসত্য। ব্যক্তিগত দুঃখ এই অসত্যে।"

এ কেবল দার্শনিকের উপদেশ মাত্র নয়, এই বিশ্বাসকে কবিও আপন জীবনে সত্য করেছিলেন। দুঃখকে স্বীকার করে তাকে অতিক্রম করার সাধনা 'নটীর পূজা'য় ছিল নটীর সাধনা, ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'প্রায়শ্চিত্তে'র সাধনা, এই সাধনাই গীতাঞ্জলির কবির, রাজা নাটকের। তাই নটীর পূজায় আছে এই দুঃখজয়ের গান, 'আর রেখো না আঁধারে আমায় দেখতে দাও'। বৃহতের মধ্যে ব্যক্তিগত শোকদুঃখকে দেখলে তবেই স্বার্থিক দুঃখের উত্তরণ ঘটে মহত্তরে—

কাঁদাও যদি কাঁদাও এবার সুখের গ্লানি সয় না যে আর
নয়ন আমার যাক না ধুয়ে অশ্রুধারে
আমায় দেখতে দাও।

'অহংসীমায় অবরুদ্ধ জানাই অসত্য, ব্যক্তিগত দুঃখ এই অসত্যে'— বাক্যটি সুরে বলেছেন কবি প্রাগুক্ত গানে—

জানি না তো কোন কালো এই ছায়া
আপন বলে ভুলায় যখন ঘনায় বিষম মায়া।

'মানুষের ধর্মে' কবি আরও লিখেছেন—

"আমরা দুঃখকে যে ভাবে দেখি বৃহতের মধ্যে সে ভাব থাকতে পারে না, যদি থাকত তা হলে সেখানে দুঃখের লাঘব বা অবসান হত না।...তাই বিরাটকে বলি রুদ্র, তিনি মুক্তির দিকে আকর্ষণ করেন দুঃখের পথে। অপূর্ণতাকে ক্ষয় করার দ্বারা পূর্ণের সঙ্গে মিলন বিশুদ্ধ আনন্দময় হবে, এই অভিপ্রায় আছে বিশ্বমানবের মধ্যে। তাঁর প্রতি প্রেমকে জাগরিত করে তাঁরই প্রেমকে সার্থক করব যুগে যুগে এই প্রতীক্ষার আহ্বান আসছে আমাদের কাছে।"

সংগীতে এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি পাই একাধিক গানে। 'নয় এ মধুর খেলা' গানে বিরাটের সঙ্গে কবির লীলাকে সংসারের তরঙ্গভঙ্গে দোলায়িত, সংশয়-সংকটাপন্ন, দুঃখময়, ঝঞ্ঝামুখর সম্পর্ক বলে বর্ণনা করে কবি গেয়েছেন—

বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া বন্যা ছুটেছে
দারুণ দিনে দিকে দিকে কান্না উঠেছে।
ওগো রুদ্র দুঃখে সুখে এই কথাটি বাজল বুকে
তোমার প্রেমে আঘাত আছে নাইক অবহেলা।

আর একটি গানে কবি বলেছেন, 'তোমার কাছে শান্তি চাব না, থাক না আমার দুঃখভাবনা।' দুঃখশোক যে মঙ্গলময়ের প্রদত্ত কল্যাণের ছদ্মবেশী বিধিলিপি, মৃত্যুবেদনা যে অমৃতের উপলব্ধির সোপান মাত্র, এই গভীর বিশ্বাস অন্তরের নিবিড় থেকে ক্ষণে ক্ষণে উৎসারিত বলেই তা এত প্রসন্ন প্রত্যয়ে গান হয়ে উঠতে পারে। 'দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল-আলোক', 'এবার দুঃখ আমার অসীম পাথার পার হল যে', 'আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করব নিবেদন', 'দুঃখ যদি না পাবে তো', 'না বাঁচাবে আমায় যদি মারবে কেন তবে', 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে',

'আঘাত করে নির্লে জিনে কাড়িলে মন দিনে দিনে,' 'ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর', 'সুখে আমায় রাখবে কেন রাখো তোমার কোলে', 'ও নিঠুর আরও কি বাণ তোমার তূণে আছে', 'ভয়েরে মোর আঘাত করো ভীষণ হে ভীষণ', 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি সে কি সহজ গান', 'এই করেছ ভালো নিঠুর', 'আরও আঘাত সইবে আমার' 'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা', 'তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ দুখের অশ্রুধার', 'দুখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে'—এই গানগুলিতে দুঃখবেদনাকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করার যে সহিষ্ণুতা প্রকাশ করেছেন, তা তাঁর গভীর ভক্তিরই পরিচায়ক।

অনেকগুলি গানে ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রবিদ্যুৎ অন্ধকার রাত্রিকে দুঃখের প্রতীক-রূপে কল্পনা করা হয়েছে। এই প্রতীক কবির অতীব প্রিয়, দীর্ঘকাল ব্যবহৃত এবং প্রায় পরিচিত প্রথায় পরিণত। 'দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল-আলোক' গানে কেবল তিমিরের উল্লেখ আছে, 'আমার আঁধার ভালো আলোর কাছে বিকিয়ে দেবে আপনাকে সে' গানের আঁধারও দুঃখেরই প্রতীক। 'যারে নিজে তুমি ভাসিয়েছিলে' গানে গীতাঞ্জলি পর্বের চিত্রকল্পই পুনরাবৃত্ত হয়েছে—'শ্রাবণরাতে বাদলধারে উদাস করে কাঁদাও যারে'। কিংবা সেই বিখ্যাত কাব্যগীতি—

আমি মারের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ের বায়ে
আমার ভয়ভাঙা এই নায়ে।

'আজি বিজনঘরে নিশীথরাতে' যে বন্ধুর আবির্ভাব গীতায়িত হয়েছে, কবির স্বীকৃতি অনুযায়ী তাকেও দুঃখরাতের বন্ধু হিসাবেই গ্রহণ করা যায়। ঝড়বাদলের আঁধার রাতের দুঃখবরণ সার্থক হয়েছে 'যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি', 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে, 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি' এবং 'প্রচণ্ড গর্জনে আসিল একি দুর্দিন' গানগুলিতে। এই সকল গানে দুঃখকে সর্বত্রই প্রতীকিত করা হয়েছে। কতকগুলি গানে দুঃখ যে মৃত্যুবেদনা থেকে স্পষ্টই উৎসারিত অথবা দুঃখের তালিকায় মৃত্যুশোকও অন্যতম তারও প্রমাণ মেলে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অমৃতের প্রার্থনাও সেখানে নিঃসংশয়িত-ভাবে জানা যায়। যেমন 'দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে' গানে আছে—

মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অমৃতময় লোক
তবে তাই হোক

পূজার প্রদীপে তব জলে যদি মম দীপ্ত শোক
তবে তাই হোক।

'দুঃখ যদি না পাবে তো' গানে কবি বলেছেন, 'মরতে মরতে মরণটারে শেষ করে দে একেবারে'। 'না বাঁচাবে আমায় তুমি' গানেও মৃত্যুপ্রসঙ্গ এসে পড়েছে—'জীবনদাতা মেতেছে যে মরণ-মহোৎসবে'। আর একটি গানে—

মোর মরণে তোমার হবে জয়
মোর জীবনে তোমার পরিচয়।

'এক হাতে ওর কৃপাণ আছে' গানে কবি বলেছেন, 'মরণেরই পথ দিয়ে ওই আসছে জীবনমাঝে'। 'ও নিঠুর আরও কি বাণ' গানে দুঃখবাণাহত কবির বিশ্বাস 'মরণকে প্রাণ বরণ করে বাঁচে'। 'আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি' গানের বাণীও অনুরূপ—'মরণটানে টেনে আমায় করিযে দেবে পার'। 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি' গানের সেই বহুপরিচিত পংক্তিও প্রসঙ্গত স্মর্তব্য—'মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহীন প্রাণ'। 'যা হারিযে যায় তা আগলে বসে রইব কত আর'—এই উপলব্ধিও স্পষ্টতই মৃত্যুর আলোকে উদ্ভাসিত, বিচিত্র প্রবন্ধের 'রুদ্ধগৃহ' নামক রচনার কথাই এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে।

দুঃখের এই মহদীকরণ রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বালোচনায় বহুদ্রষ্টব্য। 'ধর্ম' গ্রন্থের 'মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে কবি মনুষ্যত্বকে দুঃখের মূল্যে লভ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। সংসারে পুষ্পের দুঃখ নেই, মানুষের দুঃখই গভীর বিচিত্র ও অনির্বচনীয়। আর এই দুঃখ আছে বলেই মানুষ অপূর্ণতা থেকে চলেছে পূর্ণতার দিকে, 'এই দুঃখই মানুষকে বৃহৎ করে, মানুষকে আপন বৃহত্ত্ব সম্বন্ধে জাগ্রত সচেতন করে তোলে, এবং এই বৃহত্ত্বেই মানুষকে আনন্দের অধিকারী করে তোলে।' দুঃখ-পর্যায়ের পূর্বালোচিত গানগুলির মর্মকথাই এই আলোচনায় সংক্ষেপে বিশ্লেষিত হয়েছে। 'বিপদে মোরে রক্ষা করো' গানে কবি বলেছেন, 'নম্রশিরে সুখের দিনে তোমারই মুখ লইব চিনে, /দুখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা, তোমারে যেন না করি সংশয়।' এই বাণী নতুন নয়। গীতাঞ্জলি রচনার পূর্বেই কবি লিখেছেন, "মনুষ্যত্ব আমাদের পরম দুঃখের ধন, তাহা বীর্যের দ্বারাই লভ্য।...এইরূপে সংসারের বিচিত্র অভিঘাতে, দুঃখবাধার সহিত নিরন্তর সংগ্রামে যে আত্মার সমস্ত শক্তি জাগ্রত, সমস্ত তেজ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেই আত্মাই ব্রহ্মকে যথার্থভাবে লাভ করিবার উদ্যম প্রাপ্ত হয়—

ক্ষুদ্র আরামের মধ্যে, ভোগবিলাসের মধ্যে যে আত্মা জড়ত্বে আবিষ্ট হইয়া আছে, ব্রহ্মের আনন্দ তাহার নহে।”

গীতাঞ্জলির পরবর্তীকালে কবি ব্রহ্ম শব্দটি আর বিশেষ ব্যবহার করেননি, কিন্তু দুঃখ সম্পর্কে কবির বক্তব্য অবিকৃতই আছে। দুঃখের আঘাতে আঘাতে কবির পরমায়ু যতই ক্ষত-লাঞ্ছিত হয়েছে, ততই দুঃখের হাত থেকে তিনি তুলে নিয়েছেন দুঃখাতীত জীবনসত্যকে। সেই অসহ্য প্রাপ্তির নিরুত্তম বিশ্বাস, দুঃসহ বেদনার সর্পশিরে স্থাপিত পদ্মরাগমণির মত দুঃখবাদের তত্ত্বই তাঁর দুঃখের গানে ঘনীভূত হয়েছে। বলাকার ‘ঝড়ের খেয়া’ কবিতায় কবি লিখেছিলেন—

মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে—

‘দুঃখ সাথে যুঝে’ সেই সত্য খোঁজার পালা কি কবির শেষ হয়েছিল? হয়ত তার শেষেই কবি আবিষ্কার করেছিলেন দুঃখের মহিমাতেই এই ভূমণ্ডল এত সুন্দর—

এই-যে কালো মাটির বাসা শ্যামল সুখের ধরা—
এইখানেতে আঁধার-আলোয় স্বপন-মাঝে চরা।
এরই গোপন হৃদয় পরে ব্যথার স্বর্গ বিরাজ করে
দুঃখে-আলো-করা।

৯

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন লীলাবাদী—ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের লীলার সম্পর্কে তিনি বিশ্বাস সমর্পণ করেছিলেন। তাঁর ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধে এই লীলার কথা বারবার দেখা দিয়াছে, যেমন সাহিত্যতত্ত্বেও লীলাবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। লীলাবাদ বেদান্ত দর্শনের কথা, ব্রহ্মসূত্রকারের ভাষায় ‘লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্’। রবীন্দ্রনাথ এই লীলাতত্ত্বটিকে ঠিক বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যে বা বৈষ্ণবীয় দর্শনের আদর্শে গ্রহণ করেননি। এই লীলাবাদের তত্ত্বটি সম্পূর্ণত তাঁর কবিমনের অভিপ্রেত। কবি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার স্বরূপ অস্বীকার করেননি, বরং তাঁর মতে, এই স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারাই মানুষ ‘প্রেমের রাজ্যে ঈশ্বরের অংশীদার’ হতে চেয়েছে। শান্তিনিকেতন প্রবন্ধমালার ‘প্রেমের অধিকার’

প্রবন্ধে কবি এই ভক্ত মানুষের যে প্রেমাধিকারের কথা বলেছেন, তাই তাঁর গানে অন্য ভাষায় আছে—

আমরা বসব তোমার সনে,
শরিক হব রাজার রাজা তোমার আধেক সিংহাসনে।

অন্যত্র কবি বলেছেন যে ঈশ্বরের সঙ্গে কবির জন্মজন্মান্তরের প্রেমসম্পর্ক, 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে'। বিশ্বদেবতার পূর্ণতার আদর্শ কবির জীবনের মধ্য দিয়েই বিবর্তিত। কবির জীবনকে ঈশ্বরের বাঁশরি-রূপে বাজানোর কথা যেমন তাঁর কবিতায়, তেমনি বহু গানেও প্রকাশিত হয়েছে। রসে-রহস্যে কবিত্বে-সৌন্দর্যে গানগুলি অতুলনীয়। গীতবিতানের বন্ধু পর্যায়ের গানগুলি মুখ্যত কবির লীলাবাদী ধ্যানধারণাকেই প্রচার করে, তাই নিছক ব্রহ্মসংগীত-পর্যায়ে সেইগুলিকে বিচার করা যায় না। গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য এবং গীতালির যুগ থেকেই কবির অধ্যাত্মভাবনায় এই লীলাবাদ প্রবেশ করেছে ও বলাকার কয়েকটি কবিতায় এসে সেই লীলাবাদ সমাপ্ত হয়েছে। ব্যক্তিহৃদয়ের আবেগে, উপলব্ধির গাঢ়তায় কবির ঈশ্বরচেতনা এগুলিতে অনুরঞ্জিত। রবীন্দ্রজীবনীকার লিখেছেন—

"একদিকে তিনি মহাভিক্ষুরূপে আমাদের সমস্ত কিছু মাগিতেছেন, অন্য-দিকে তিনি রাজরাজেশ্বরবেশে আমাকে তাহার অংশীদার হইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। অধ্যাত্মজীবনের এই আকৃতিকে অহংকার বলা যায় না, ইহা প্রেমের অধিকার—যিনি প্রেমস্বরূপ তাহারই দান। কিছুকাল পরে এই ভাবটি কবি গানের ভাষায় ব্যক্ত করেন—তাই তোমার আনন্দ আমার পর তুমি তাই এসেছ নিচে…। ঈশ্বর মানুষের মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়া সেই ইচ্ছাকে পুনরায় প্রেমরূপে দাবী করেন, ইহা ধর্মতত্ত্বের একটি আশ্চর্য বিষয়। ঈশ্বর মানুষের সমস্তকে যেমন কঠোর নিয়মের মধ্যে বাঁধিয়াছেন ইচ্ছাকে তেমন করেন নাই। ইচ্ছার স্বাধীনতাকে তিনি কাড়িয়া লন নাই, তিনি মন ভুলাইয়া লন—তিনি চাহিয়া লন। এই রহস্যকে আমাদের দেশে লীলা বলা হইয়াছে।…লীলাভাব কবির বহু ধর্মসংগীতে প্রকাশ পাইয়াছে, সাধারণ প্রেমের কবিতায় উহার প্রয়োগ যথেষ্ট। ঈশ্বর মহাভিক্ষুরূপে দ্বারে উপস্থিত, ঈশ্বর বিরহীরূপে কাতর—ইত্যাদি কল্পনা সম্পূর্ণ মধ্যযুগীয় অথবা উপনিষদ যুগের পরের যোজনা। এই ধর্মসাধনা বহুল পরিমাণে বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের আধ্যাত্মিক রূপ হইতে উপলব্ধ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।" (রবীন্দ্রজীবনী ২য়)

রবীন্দ্রনাথের পূজা-পর্যায়ের অনেকগুলি গানেই ঈশ্বরের সঙ্গে কবির এই লীলায়িত সম্বন্ধ বিলসিত। একটি গানে কবি বলেছেন, আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থী, তখন আমাদের প্রার্থিত প্রাপ্তি ক্ষণবিলুপ্ত—কিন্তু স্বয়ং জগদীশ্বর যখন ভিক্ষাভাণ্ড নিয়ে আমার কাছে যাচনা করেন তখন আমার নিঃস্ব ভাণ্ডার অপার্থিব সম্পদে পূর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি ভিখারি বলেই তাঁর ঐশ্বর্য বিশ্বে অবারিত অযাচিত। তিনি প্রার্থী না হলে, উর্ধ্ববাহু না হলে, রিক্ত না হলে পূর্ণ হবেন কেমন করে? তাই বিশ্বপ্রভুর নিঃস্বতায় কাছে আপনার দৈন্য ও ভিক্ষাবৃত্তি কী করুণ তুচ্ছতায় নিষ্ফল মনে হয়—

আমি যখন তাঁর দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই তখন যাহা পাই
সে যে আমি হারাই বারে বারে।
তিনি যখন ভিক্ষা নিতে আসেন আমার দ্বারে
বন্ধ তালা ভেঙে দেখি আপন-মাঝে গোপন রতনভার,
হারায় না সে আর।

'কবে আমি বাহির হলেম তোমারই গান গেয়ে', 'তোমায় আমায় মিলন হবে বলে', 'তুমি একলা ঘরে বসে বসে কী সুর বাজালে', 'আমারে তুমি অশেষ করেছ', 'তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভরে', 'অসীম ধন তো আছে তোমার', 'হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহ-প্রাণ', 'তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ভরবে', 'আমায় তুমি বাঁচাও তবে' প্রভৃতি গানগুলি এই নিখিলেশ্বরের সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত লীলামাধুরীর বিরহমিলনে রোমাঞ্চিত। বলাকার একটি কবিতায় কবি বলেছিলেন—

আমি এলেম ভাঙল তোমার ঘুম—
শূন্যে শূন্যে উঠল আলোর আনন্দকুসুম।...
আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে।
আমায় তুমি মরণমাঝে লুকিয়ে ফেলে
ফিরে ফিরে নূতন করে পেলে।...
আমায় দেখবে বলে তোমার অসীম কৌতূহল—
নইলে তো এই সূর্যতারা সকলই নিষ্ফল।

এই কথাই কয়েকদিন পূর্বে লেখা গীতালির গানখানিতে অপরূপ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে—

তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে
আমার প্রাণে নইলে সেকি কোথাও ধরবে।
এই যে আলো সূর্যে গ্রহে তারায় ঝরে পড়ে শত লক্ষ ধারায়
পূর্ণ হবে এ প্রাণ যখন ভরবে।
তোমার ফুলে যে রঙ ঘুমের মত লাগল
আমার মনে লেগে তবে সে যে জাগল।
যে প্রেম কাঁপায় বিশ্বীণায় পুলকে সংগীতে সে উঠবে ভেসে পলকে
যেদিন আমার সকল হৃদয় হরবে।

এই লীলাবিলাসে কখনো কবির অভিমান-শেষের মিলনানন্দ, কখনো অকারণ প্রয়োজনহীন বরণমালা-পরানো, কখনো 'আমার হাসি বেড়ায় ভাসি তোমার হাসি বেয়ে বেয়ে'। তাই তিনি বিশ্বদেবতা হয়েও কবির 'ব্যক্তি-দেবতা, প্রভু হয়েও প্রিয়। তাই কবির কণ্ঠে শুনি—

ওগো সবার ওগো আমার বিশ্ব হতে চিত্তে বিহার
অন্তবিহীন লীলা তোমার নূতন নূতন হে।

অনন্তকাল থেকেই তিনি কবির জন্য অভিসারযাত্রা করেছেন, অথবা প্রতীক্ষারত। তাই কবি শুনতে পান—

কত কালের সকালসাঁঝে তোমার চরণধ্বনি বাজে
গোপনে দূত হৃদয়-মাঝে গেছে আমায় ডেকে।

বিরহী-পর্যায়ের গানগুলিতে ঈশ্বরকে প্রেমিকার ভূমিকায় স্থাপন করে কবি নিজেকে বিরহিণী প্রিয়া কল্পনা করেছেন। বেদনাদূতীর মুখে কবি যে শুনতে পেয়েছেন—

তোমার লাগি জাগেন ভগবান।
নিশীথে ঘন অন্ধকারে ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে
দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান।

সেই অভিসার অনন্ত বলেই কবির সকল সুর সকল গানে তারই আগমনী বাজে, দুঃখে সুখে কবির বুকে বাজে তারই চরণধ্বনি—'সে যে আসে আসে আসে'। 'হে অন্তরের ধন' গানে কবি বলেছেন—

হে অন্তরের ধন,
এই বিরহে কাঁদে আমার নিখিল ভুবন।

তোমার বাঁশি নানা সুরে আমায় খুঁজে বেড়ায় দূরে
পাগল হল বসন্তের এই দখিণসমীরণ।

এই পর্যায়ের অন্যান্য গান 'তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে', 'নিশা-অবসানে কে দিল গোপনে আনি', 'বিশ্ব যখন নিদ্রামগন গগন অন্ধকার', 'হেরি অহরহ তোমারই বিরহ', 'যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু এবার এ জীবনে, 'আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে', 'আমার গোধূলিলগন এল বুঝি কাছে', যারে নিজে তুমি ভাসিয়েছিলে', 'তব সিংহাসনের আসন হতে', 'দেওয়া-নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া' প্রভৃতি। শেষোক্ত গানটি সম্ভবত লীলাবাদের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি—

দেওয়া-নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া তোমায় আমায়—
জনম জনম এই চলেছে, মরণ কভু তারে থামায়?
যখন তোমার গানে আমি জাগি আকাশে চাই তোমার লাগি,
আবার একতারাতে আমার গানে মাটির পানে তোমায় নামায়।
ওগো তোমার সোনার আলোর ধারা তারই ধারি ধার—
আমার কালো মাটির ফুল ফুটিয়ে শোধ করি তার।
আমার শরৎরাতের শেফালি বন সৌরভেতে মাতে যখন
তখন পালটা সে তান লাগে তব শ্রাবণরাতের প্রেমবরিষায়।

১০

রবীন্দ্রনাথের 'গানের ভিতর দিয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কী হিতোপদেশ' পাওয়া যেতে পারে, এই বিষয়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী তাঁর গানের কয়েকটি বিষয়বিভাগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সংগীতের দুঃখবাদ সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন—

"দুঃখকষ্ট সন্তুষ্ট চিত্তে সহ্য করবার যে দুই অমোঘ ব্যবস্থা আমাদের শাস্ত্রকারগণ দিয়েছেন—এক অদৃষ্টবাদ অপর জন্মান্তরবাদ—রবীন্দ্রনাথের গানে সেইগুলির বিশেষ ব্যবহার দেখতে পাইনে। অবশ্য জন্মান্তরবাদের ইঙ্গিত সেইখানে আছে যেখানে তিনি আপনাকে দেশেকালে ছড়িয়ে ছাপিয়ে বিলিয়ে দিতে চান, পৃথিবীর সমবয়সী সাথী হতে চান, ক্ষুদ্র ব্যক্তিবিশেষের একটি মাত্র সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকতে পারেন না, যথা—

এই ধরণীর গগনপারের ছাঁদে সে যে তারার সাথে বাঁধে,
সুখের সাথে দুখ মিলায়ে কাঁদে—'এ নহে এই নহে'

কিম্বা 'সে যে ভাই হাওয়ার সখা ঢেউয়ের সাথি' কিংবা 'কে বল গো সেই প্রভাতে নেই আমি···আসব যাব চিরদিনের সেই আমি'। তবে তাঁর এই জন্মান্তরের সঙ্গে কর্মফল জড়িত নেই।"১৩

হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের জন্মান্তরবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জন্মান্তরে বিশ্বাসের কোনো সম্পর্ক নেই। কয়েকটি সংগীতে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার পিছনে কবির মর্তপ্রীতি ও জীবনমমতারই গভীররসাত্মক অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। সোনার তরীর মানসসুন্দরী কবিতায় প্রেমের জাতিস্মরতায় কবির যে বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে, তাও কবিচেতনা থেকে উৎসারিত, শাস্ত্রীয় বিশ্বাসের প্রতিফলন নয়। মানসীর অনন্ত প্রেমেই কবি ঘোষণা করেছিলেন তাঁর প্রণয় যুগান্তর-জন্মান্তর-বাহিত। 'জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার' কোটি প্রেমিকের প্রেমলীলার মধ্য দিয়ে তিনি একটি মিলন-বিরহের শাশ্বত প্রেমকেই আস্বাদন করেন। মানসসুন্দরীর প্রতি তাঁর উক্তি—

জানি, আমি জানি সখী,
যদি আমাদের দোঁহে হয় চোখাচোখি
সেই পরজন্ম-পথে, দাঁড়াব থমকি;
নিদ্রিত অতীত কাঁপি উঠিবে চমকি
লভিয়া চেতনা।···
কার এত দিব্যজ্ঞান,
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ—
পূর্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কিনা তুমি
আমারই জীবন-বনে সৌন্দর্যে কুসুমি
প্রণয়ে বিকশি।

প্রেমের ক্ষেত্রে এই জন্মান্তরে বিশ্বাস তাঁর পূজা-সংগীতগুলির মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। চৈতালির পদ্মাকে সম্বোধন করে কবি একদা বলেছিলেন—

কতদিন ভাবিয়াছি বসি তব তীরে
পরজন্মে এ ধরায় যদি আসি ফিরে,
যদি কোনো দূরতর জন্মভূমি হতে
তরী বেয়ে ভেসে আসি তব খরস্রোতে—

কত গ্রাম কত মাঠ কত ঝাউঝাড়
কত বালুচর কত ভেঙে-পড়া পাড়
পার হয়ে এই ঠাঁই আসিব যখন
জেগে উঠিবে না কোনো গভীর চেতন ?
জন্মান্তরে শতবার যে নির্জন তীরে
গোপনে হৃদয় মোর আসিত বাহিরে,
আর বার সেই তীরে সে সন্ধ্যাবেলায়
হবে না কি দেখাশুনা তোমায় আমায় ?

জীবনের প্রতি এই সুগভীর কম্পমান আনুরক্তি তাঁর 'আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে' গানটিতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে' গানটির উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। 'আপনাকে এই জানা আমার' গানটিও প্রসঙ্গত স্মর্তব্য।

এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের পূজা-সংগীতে মৃত্যুচেতনার প্রসঙ্গ আলোচনা করা যেতে পারে। পূজা-সংগীতগুলিকে রবীন্দ্রনাথ যে সকল উপশাখায় বিন্যস্ত করেছিলেন, তার মধ্যে মর্তপ্রেম বা মৃত্যু সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কোনো ইঙ্গিত নেই, অথচ এই দুটি বাদী-সংবাদী সুর তাঁর সমস্ত কাব্যসংগীতে, বিশেষত পূজা-পর্যায়ের গানে ছড়িয়ে আছে। মৃত্যুচেতনা রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের কাব্যে বহু স্থলেই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর সংগীতের মধ্যে এই মৃত্যুর উপলব্ধি সূক্ষ্মভাবে মিশে আছে, বাইরে থেকে সহজে তাকে ধরা যায় না। মানবাত্মার অমর অখণ্ডতায় যেহেতু কবি চিরবিশ্বাসী ছিলেন, সেইজন্য তাঁর মৃত্যুসম্পর্কিত ধারণা সেই অদ্বয়বোধেরই অঙ্গীভূত। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন— "রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে মানুষের মুক্তি ও অমৃতত্ব বা অমরত্বের ধারণা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল, কারণ উভয় ধারণাই মূলে প্রসূত তাঁহার অন্তর্নিহিত একটি গভীর অদ্বয়বোধ হইতে"।[১৪] এই অদ্বয়বোধের দিক থেকে উপনিষদ্ কবিকে খানিকটা প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে অমৃতত্ব বিষয়ে কবির নিজেরই উপলব্ধিজনিত এক প্রকার বিশ্বাস কবিচেতনার বিবর্তনের স্তরগুলি অবলম্বনে গড়ে উঠেছিল। উপনিষদের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে— 'ঐ যা কিছু তা পূর্ণ, এই যা কিছু তা পূর্ণ, পূর্ণ থেকেই পূর্ণের উদয়, পূর্ণের পূর্ণ গ্রহণ করলেও পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে'। এই পূর্ণতাকে রবীন্দ্রসাহিত্যে এবং সংগীতে আমরা বারবার অসীম বলে দেখতে পাই। কবির মৃত্যু-

ভাবনা এই অসীমত্তার বিচারে খণ্ডের সীমায় ভাবনা, অসীমের কাছে যা মিথ্যা—

> তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি ধাই—
> কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।
> মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় সে দুঃখের কূপ,
> তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই।...

পূর্ণের চরণের কাছে কোনো কিছুই অর্থাৎ অপূর্ণ স্বরূপের হারাবার ভয় নেই, পরিপূর্ণ অস্তির মধ্যেই সব ক্ষুদ্রতা অভাবের সমাধান ঘটে। 'নিশিদিন কাঁদি তাই' বলে কেবল ক্ষুদ্র অহংকেই কাঁদতে হয়, কিন্তু জীবনের মধ্যে পূর্ণের স্বরূপ উপলব্ধি করলে 'অন্তরগ্লানি সংসারভার'কে নিমিষে বিস্মৃত হতে হয়।

নৈবেদ্য কাব্যের এই গানটি ছাড়া 'অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়' গানটিও এই পূর্ণ-অসীমের দৃষ্টিতে মৃত্যু-নামক খণ্ডতার তুলনা। আমি-র সঞ্চয় অতি ক্ষুদ্র, তাই তাকে হারাবার ভয়ে আত্মা শঙ্কিত হয়ে থাকে। আমি-কে যখন তুমিতে উৎসর্গ করা যায়, অপূর্ণ যখন পূর্ণের দিকে যায় তখন 'তবে নাই ক্ষয় সবই জেগে রয় তব মহামহিমায়'। ধর্ম গ্রন্থের 'প্রাচীন ভারতের একঃ' প্রবন্ধে এই কথাই ব্যাখ্যা করে কবি লিখেছেন—

"মৃত্যু এই জগতের সহিত, বিচিত্রের সহিত, অনেকের সহিত আমাদের সম্বন্ধের পরিবর্তন করিয়া দেয়—কিন্তু সেই একের সহিত আমাদের সম্বন্ধের পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না। অতএব যে সাধক অন্তঃকরণের সহিত সেই একেকে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি অমৃতকে বরণ করিয়াছেন; তাঁহার কোনো ক্ষতির ভয় নাই, বিচ্ছেদের আশঙ্কা নাই। তিনি জানেন জীবনের সুখদুঃখ নিয়ত চঞ্চল। কিন্তু তাহার মধ্যে সেই কল্যাণরূপী এক স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন, লাভক্ষতি নিত্য আসিতেছে যাইতেছে। কিন্তু সেই এক পরমলাভ আত্মার মধ্যে স্তব্ধ হইয়া বিরাজ করিতেছেন, বিপদসম্পদ মুহূর্তে মুহূর্তে আবর্তিত হইতেছে, কিন্তু এষাস্য পরমা গতিঃ সেই এক রহিয়াছেন, যিনি জীবের পরমা গতি, যিনি জীবের পরমা সম্পৎ, যিনি জীবের পরম লোক, যিনি জীবের পরম আনন্দ"।

সেই পরমা গতি পরম আনন্দের কাছে মৃত্যুর ক্ষয়ক্ষতির তুচ্ছতার কথা আছে 'ক্ষত যত ক্ষতি যত মিছে হতে মিছে' গানে। 'শেষ নাহি যে শেষ

কথা কে বলবে' গানটিকেও এই তত্ত্বের আলোকে দেখা যেতে পারে। 'কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়' গানটি সম্পর্কে প্রাগুক্ত প্রবন্ধে শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন, 'বহুত্ব হইতে খণ্ডত্ব হইতে ফিরিয়া পূর্ণস্বরূপ একে সমাহিত হইবার চেষ্টা'। এই গানে কবি যে অজানার জয় ঘোষণা করেছেন, শেষ জীবনে সেই মহাঅজানার কথাই পুনরুক্ত হয়েছে 'সমুখে শান্তিপারাবার' গানে।

মোটের উপর রবীন্দ্রনাথের সংগীতগুলিতে নানাভাবে মৃত্যুকে ক্ষণিক রূপান্তর বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অদ্বৈতের অসীমের ধারাবাহিকতায় মানুষের আত্মা পূর্ণ হয়ে উঠছে বলেই মৃত্যুর সাময়িক ভ্রান্তি অপসারিত করে কবি সেই পরমা গতিকে অনুভব করার চেষ্টা করেছেন। মানুষের আমি তার রূপান্তর-জন্মান্তরের বিবর্তনের ভিতর দিয়ে চিরপ্রসার্যমান ব্যক্তিপুরুষে বর্ধিত হয়ে চলেছে। এর পিছনে রয়েছে একটি নিরবচ্ছিন্ন বিবর্তনধারায় বিশ্বাস, তাই মৃত্যু বলে কিছু থাকতে পারে না, শোক সেখানে নশ্বর বিলাপ—

যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে রইব কত আর?

কখনও হিন্দু জন্মান্তরবাদীর মত কবি বলেন 'এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে হবে গো এইবার', কখনো মহামৃত্যুর সঙ্গে আত্মজীবনের বিবাহসম্পর্কের মধ্য দিয়ে জীবনের নিত্যলীলাটি কবির দৃষ্টিতে উপভোগ করতে চান— 'আমার গোধূলিলগন এল বুঝি কাছে গোধূলিলগন রে'। 'মানুষের মধ্যে বহুব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে গঠিত যে মানবতা তাতেই হল অমরতা', মানুষের ধর্মে কবি একথা বলেছেন। এই অমর-মানবাত্মার খণ্ডরূপ অহং বা আমি এবং অখণ্ডরূপ অনন্ত। মানুষের ধর্মে কবির উক্তি, "মানুষ যেদিকে সেই ক্ষুদ্র, অংশগত আপনার উপস্থিতকে প্রত্যক্ষকে অতিক্রম করে সত্য, সেইদিকে সে মৃত্যুহীন"। রবীন্দ্রনাথের অনেক গানেই আত্মার এই খণ্ড ও অখণ্ডরূপের কথা আছে। গীতাঞ্জলির এই বিখ্যাত গানটির মধ্য দিয়ে কবির মানবাত্মার বিবর্তনের পথে পূর্ণস্বরূপে উপনীত হওয়ার প্রত্যয়টি কাব্যসৌন্দর্যে অপরূপ হয়ে উঠেছে—

জানি জানি কোন আদি কাল হতে
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে—
সহসা হে প্রিয়, কত গৃহে পথে
রেখে গেছ প্রাণে কত হরষন।...

সঞ্চিত হয়ে আছে এই চোখে
কত কালে কালে কত লোকে লোকে
কত নব নব আলোকে আলোকে
অরূপের কত রূপদরশন।

শান্তিনিকেতন গ্রন্থের 'সত্য হওয়া' প্রবন্ধে কবি লিখেছেন—

"মানুষের আত্মা মুক্তিলোকে আনন্দলোকে জন্মগ্রহণ করবে বলে বিশ্বের সূতিকা-গৃহে অনেকদিন ধরে চন্দ্রসূর্যতারার মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালানো রয়েছে। যেমনি নবজাত মুক্ত আত্মার প্রাণচেষ্টার ক্রন্দনধ্বনি সমস্ত ক্রন্দসীকে পরিপূর্ণ করে উচ্ছ্বসিত হবে তখনি লোকে লোকান্তরে আনন্দশঙ্খ বেজে উঠবে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সেই প্রত্যাশাকে পূরণ করার জন্যই মানুষ"।

শেষ জীবনের 'ঐ মহামানব আসে' গানটি যেন এই অনুচ্ছেদেরই গীতরূপ।

দার্শনিকের তত্ত্বালোচনা আর কবির বৈচিত্র্যসন্ধানী মন এক পথে চলে না। রবীন্দ্রনাথ একান্তই কবি, তাই জীবনের নানা অবকাশে অনুভূতির বিচিত্র লীলায় মৃত্যুর নানারূপকেও তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। একদিকে যেমন মৃত্যু থেকে মৃত্যুহীনতায় কবির বিশ্বাস, অন্যদিকে মৃত্যুর আর এক জাগতিক রূপও তাঁর কয়েকটি মৃত্যুবিষয়ক গানে আভাসিত হয়েছে। ভয়ংকর রুদ্রবেশে যে মরণ জীবনের শিয়রে সহসা ভয়ের অন্ধকাররাত্রে এসে উপস্থিত হয় কবি তাকে অস্বীকার করেননি, কিন্তু সেই মহামৃত্যুকে প্রসন্নচিত্তে বরণ করে নেওয়ার চিত্তপ্রসার দেখিয়েছেন। 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি', 'প্রচণ্ড গর্জনে আসিল এ কী দুর্দিন', 'এক হাতে ওর কৃপাণ আছে' প্রভৃতি গানের ভয়ংকর অতিথিকে মৃত্যু বলেই গ্রহণ করা যেতে পারে। এই অতর্কিত সর্বনাশও তাঁর আর্তত্রাসের বদলে শান্ত প্রণতি আকর্ষণ করেছে—

জয় জয় পরমা নিষ্কৃতি হে নমি নমি।
জয় জয় পরমা নির্বৃতি হে নমি নমি।
নমি নমি তোমারে হে অকস্মাৎ
গ্রন্থিচ্ছেদন খর সংঘাত—
লুপ্তি সুপ্তি বিস্মৃতি হে নমি নমি।...

সাধারণত ইহজীবন এবং লোকান্তরের মধ্যবর্তী অবস্থাকে আমাদের আধ্যাত্মিক চেতনায় নদীস্রোতের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে এবং পরজীবনের যে দূতের আকস্মিক আবির্ভাবে আমাদের ইহজীবনের সমস্ত লীলাখেলা

মুহূর্তে অবসিত হয় তাকে আমরা সেই বৈতরণীর কর্ণধাররূপে প্রতীকিত করি। খেয়ানৌকায় পারান্তরে যাত্রা, রহস্যময় কর্ণধার প্রভৃতি চিত্রকল্পের ব্যবহারে কবির কতকগুলি সংগীতকে সেই চিরাভ্যস্ত মৃত্যুচেতনার অন্তর্গত বলে ধরা যেতে পারে। এই দিক থেকে 'তুমি এপার ওপার কর কে গো ওগো খেয়ার নেয়ে', 'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে', 'অশ্রুনদীর সুদূরপারে ঘাট দেখা যায় তোমার দ্বারে' 'বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন হবে', 'আমায় মুক্তি যদি দাও বাঁধন খুলে' প্রভৃতি কাব্যসংগীতকে মৃত্যুভাবনার দিক থেকেও ব্যাখ্যা করা যায়। 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু' এবং 'দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে' এই দুটি গানে মৃত্যুর মধ্য দিযে দুঃখের ভিতর দিয়ে কল্যাণরূপ অমৃতরূপের উপলব্ধি ঘটে, এই পূর্বতনোক্ত বিশ্বাস প্রতিফলিত। গৃহপ্রবেশ নাটকের 'ঐ মরণের সাগরপারে চুপে চুপে' স্পষ্টতই মৃত্যুর গান। মৃত্যু এখানে আলুলায়িতকুন্তলা বধূর বেশে রূপায়িত হয়েছে। গীতবিতানের 'শেষ' উপপর্যায়ের গানগুলি, পূজা ৫৮৪ সংখ্যক থেকে ৬১৭ অর্থাৎ স্বদেশের পূর্ব পর্যন্ত, সবই মৃত্যুসংক্রান্ত। এই পর্যায়ের গানে কোথাও বিদায়ের আগে প্রসন্নচিত্তে ধরার প্রতি কবির সৌন্দর্যসন্নত দৃষ্টিখানি শেষবারের মত মেলে-ধরা, বিশ্বের প্রতি অনিঃশেষ আসক্তির কথা আর একবার ঘোষণা করার কথা আছে, 'আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে', 'জানি গো দিন যাবে এ দিন যাবে', 'আমি আছি তোমার সভার', 'মধুর তোমার শেষ যে না পাই প্রহর হল শেষ', 'রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি', 'যেতে যদি হয় হবে যাব যাব যাব তবে' প্রভৃতি গানগুলিতে। আবার কোথাও মানবাত্মার চিরযাত্রাই মৃত্যুর নামে ব্যাখ্যাত হযেছে, যেমন 'মেঘ বলেছে যাব যাব', 'পথের শেষ কোথায় কী আছে শেষে', 'যাত্রাবেলায় রুদ্ররবে বন্ধনডোর ছিন্ন হবে'।

১১

রবীন্দ্রনাথের পূজা-সংগীতগুলি সম্পর্কে যে কোনও আলোচনাই অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য। একটি মহৎ মহাকবির সমগ্র জীবনের ঈশ্বরানুভূতির যে বিচিত্র স্তরপরম্পরা, সমালোচক তার কতটুকু অংশ ব্যাখ্যা করতে পারেন? উপনিষদের যুগ থেকে মধ্যযুগীয় লোকায়ত সাধকদের মরমী সাধনায় রবীন্দ্রনাথের অনায়াসসঞ্চরণ ছিল, সুতরাং সংগীত বিশ্লেষণ করে ভারতীয় ধর্মসাধনার বিকাশের ইতিহাস পর্যন্ত রচনা করা যেতে পারে। একদিকে

যেমন বৈদিক ঋষিদের কণ্ঠের অনুবাদ কবির গানে বেজে উঠেছে, অন্য দিকে তাঁর গানে সন্ত কবীর নানকের সহজ ভক্তিবিশ্বাস, বাউলদের সহজিয়া সাধনারও প্রতিধ্বনি শুনি, সুফী ও বৈষ্ণব সাধনার ঐক্যমন্ত্রও রবীন্দ্রসংগীতে খুঁজে পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই কারণে রবীন্দ্রনাথের ভক্তি-ভাবাশ্রিত গানগুলি থেকে ধর্মসম্প্রদায়নির্বিশেষে আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভ করা সহজ। ইন্দিরা দেবীর পূর্বোদ্ধৃত প্রবন্ধ থেকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিমত তুলে দিচ্ছি—

"মেয়েরা জানেন সেলাই করবার সময় নানা রঙের রেশম পশম জড়িয়ে গেলে তার থেকে বিশেষ একটা রঙের সুতা ছাড়িয়ে নিতে কত ধৈর্য কত সযত্ন অঙ্গুলিসঞ্চালনের আবশ্যক করে। তেমনি তাঁর শতরঙী ধূপছায়া গানের আস্তরণ এত রঙবেরঙের ভাবের সুতায় বোনা যে একটা ধরে টান দিতে গেলেই আর একটা সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে। 'প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই তাই দিই দেবতারে—আর পাবো কোথা' অথচ প্রেম ও সৌন্দর্যের উপাসনাই বা তাঁর মত অমন মধুর স্তোত্রে আর কে করেছে? ত্যাগ আর ভোগ যেন তাঁর কাছে একই স্বর্ণমুদ্রার এপিঠ আর ও পিঠের মত; দুয়ের তুল্যমূল্য মিলনেই মানুষ সম্পূর্ণ হয়—যেমন মৃত্যু ও অমৃত, সুখ ও দুঃখ। এই বলিষ্ঠ সমগ্র মানবতাই আমাদের মত ক্ষীণজীবী মানবকদের পক্ষে প্রধান শিক্ষণীয় ও মহনীয় বিষয়"।

এই বলিষ্ঠ মানবতার দিক থেকেই মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের সন্ত সাধক মরমী ধর্মাচার্যদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা করেছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী। তাঁদের গানে কোনো বিশেষ শাস্ত্রধর্মের কথা নেই, ঈশ্বরকে তাঁরা অনুভব করে ছিলেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে। মানবতাই তাঁদের ধর্মের মূল আদর্শ। দেহের সহজাত প্রবৃত্তিকে স্বীকার করে নিয়েও আত্মাকে চৈতন্যমুখী ঈশ্বরচেতন করে তোলা যায়, সুফী সাধকদের গানে তার প্রভূত দৃষ্টান্ত পাই। সাধককবি মীরাবাঈ তুকারাম নানক দাদূ প্রভৃতি সাধকদের গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটেছিল গীতাঞ্জলি পর্বে, এইজন্য এই সময় থেকে তাঁর ভক্তিসংগীতে তাঁদের সাধনার ধারা ও উপলব্ধির বিশিষ্টতা গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন—

"আমারই ভিতর সমস্ত বিশ্ব পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, আমারই জীবনের মধ্যে সমস্ত বিশ্বসৌন্দর্য অবাধে ফুটিতেছে, তাঁহাদের গান এই আনন্দের সুরে

বাঁধা।—য়া ঘট ভীতর চন্দ্র সুরহৈ য়াহী মে নৌলখ তার।—আমারই মধ্যে চন্দ্রসূর্য, আমারই মধ্যে নবলক্ষ তারা প্রকাশিত।—কবীর

আজি যত তারা তব আকাশে

সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে।—রবীন্দ্রনাথ

যাবহী মূরত বীচ অমূরত মূরতকী বলিহারী—সকল মূর্তিরই মধ্যে অমূর্ত ; বলিহারি যাই সকল মূর্তির।—কবীর

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি।—রবীন্দ্রনাথ

এইরূপে দেখা যাইবে যে ইহাদের গানের ভিতরকার তত্ত্বটিই এই যে, বিশ্বকে কোথাও বাদ দেওয়া নয়, রূপকে কোথাও অস্বীকার করা নয়, কিন্তু আত্মার আনন্দের দ্বারা সমস্তকে পূর্ণ করিয়া গ্রহণ কর। আশ্চর্য ইহাদের উপলব্ধি, পরিপূর্ণ ইহাদের আনন্দোদ্‌বোধন এবং রসানুভূতি"।[১৫]

অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে ভারতীয় মরমী সাধকদের অরূপ-উপলব্ধির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সংগীতের মিষ্টিসিজমের তুলনামূলক আলোচনা অনেকেই করেছেন, এই প্রসঙ্গে সে কথাও স্মরণ করা যায়। উপনিষদের আলোকে রবীন্দ্রকবিমানসের, বিশেষ করে রবীন্দ্রসংগীতের আলোচনার জন্য আমরা ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের কাছে ঋণী। তাছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে রবীন্দ্রনাথের গানে কোন শ্লোক কোন মন্ত্র গভীর তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিয়েছে, আমাদের জীবনকে সুমহান অদ্বয়বোধে পূর্ণ করে তোলে, সে বিষয়েও বহু আলোচনা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রয়োজন আছে। ইন্দিরা দেবীর প্রাঞ্জল বিশ্লেষণের জন্য এই নাতিবৃহৎ অনুচ্ছেদটি স্মরণ-যোগ্য—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য—উপনিষদের এই বাক্য ভাঙিয়ে তিনি অনেক কথা বলেছেন। তারপর অল্পে সন্তুষ্ট-থাকারূপ শাস্ত্রীয় উপদেশ ও (সন্তোষং পরমাস্থায়) তিনি বহুবার বহুগানে শুনিয়েছেন। যথা—যাহা পাও তাই লও (বিচিত্র ১৩৭ সংখ্যক)। এই অপ্রচলিত ছোট গানটি সুরে তালে বসানো তত্ত্বকথা ছাড়া আর কী? কিংবা 'নাইবা হল পারে যাওয়া' কিংবা 'না হয় তোমার যা হয়েছে তাই বল' (বিচিত্র ৫৬ সংখ্যক)—এই গানটির 'নাই হল' বাক্যটির বারংবার পুনরাবৃত্তিতে মনে হয় যেন জপ করে কথাটা মনে বসাবার চেষ্টা হচ্ছে, নইলে মুখে 'নাই হল' বললেই যদি মন প্রবোধ মানত ত ভাবনা ছিল না। 'কি পাইনি' গানটিও এই মনোভাবের বেশ একটি ভালো দৃষ্টান্ত"।

বৈষ্ণব পদাবলীর অনুষঙ্গও রবীন্দ্রসংগীতে ছড়ানো। 'কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো' গানে বিরহের অন্ধকারে বিরহিণীর প্রতীক্ষাপরায়ণতা এবং বেদনাদূতীর দৌত্য, ভগবানকে প্রেমাভিসারে আহ্বান সবই বৈষ্ণব ধর্মের রূপকে কল্পিত। কখনও কখনও ঐশ্বর্যবান হলেও মুখ্যত কবির দেবতা সুন্দর লীলাঘন মাধুর্যোপম। পদাবলীর পূর্বরাগ প্রেমবৈচিত্ত্য আক্ষেপানুরাগ মান লীলা-বৈচিত্র্য তাঁর গানে বারবার দেখা দিয়েছে। তাছাড়া বাঁশি, যমুনাকূল, এই দুটি বৈষ্ণব সংকেতানুষঙ্গও কবি গ্রহণ করেছেন।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের পূজাসংগীত একটি বিপুল ভাবসম্পদ। উপনিষদ থেকে ভারতীয় সাধনার বিভিন্ন ধারা, সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শ, সুফীধর্মে ঈশ্বরকে প্রেমিকরূপে দেখার কল্পনা, মরমী সাধকদের দেহসচেতন আধ্যাত্মিক অনুভূতি, বৈষ্ণবীয় অভিসার—রবীন্দ্রনাথ সবই তাঁর ভক্তিসংগীতে গ্রহণ করেছিলেন। তবু তাঁর কোনো সংগীতই উপনিষদের শ্লোকানুবাদ বা নানকের ভজনের বঙ্গীয় তর্জমা নয়। সমস্ত সাধনার ধারাই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভক্তিচেতনায় মিলিত হয়ে একটি যৌগিক ধর্মানুভূতি গড়ে তুলেছে। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন ছোট ছোট আধ্যাত্মিক তত্ত্বঘন কাব্যসম্পদপ্রদীপ্ত রবীন্দ্রসংগীতকে, বিশেষ করে পূজার গানকে রবীন্দ্রসূক্ত, রবীন্দ্রপ্রার্থনা, রবীন্দ্রোপনিষদ ইত্যাদি শব্দে বিশেষিত করেছিলেন। তাঁর ভাষায়, "দেশকালনিরপেক্ষ বিশ্বজনীনতা ও চিরন্তনতাই এই রবীন্দ্রসূক্তগুলির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বৈদিক সূক্তের তুলনায় রবীন্দ্রসূক্তের উৎকর্ষও এখানেই"।[১৬] ঋগ্‌বেদের সূর্যবন্দনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'ভেঙেছে দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়' গানের তুলনা সহজেই মনে আসে। রবীন্দ্রনাথের পূজা-পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে এমন এক অসাধারণ দীপ্ত মহিমা আছে যা কোনও ধর্মবিশ্বাসীর চিত্তকেও অনায়াসে অধিকার করতে পারে। ভারতের অন্যান্য ভক্তিধর্মের কবিসাধকগণ কেবল আধ্যাত্মিকতাকেই তাঁদের জীবনের একমাত্র ব্রতরূপে গ্রহণ করে ভক্তিসংগীত রচনা করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য তিনি প্রেমেরও কবি, প্রকৃতিরও কবি, মানবতারও প্রবক্তা। প্রেম প্রকৃতি মানব ঈশ্বর এই চারটি বিষয়েই তাঁর সজীব কবিচিত্ত এক অখণ্ড অনুভূতি গড়ে তুলেছিল। তিনি পরিপূর্ণ জীবনের কবি, তাঁর অধ্যাত্ম-উপলব্ধির সঙ্গে জীবনের অন্যান্য রসোপলব্ধির কোনো বিরোধ ঘটেনি। অজিতকুমার চক্রবর্তী যথার্থই লিখেছিলেন—

"রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র উপনিষদের অধ্যাত্মযোগতত্ত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত নন, এবং কেবলমাত্র বৈষ্ণবের লীলাতত্ত্বের দ্বারাও অনুপ্রাণিত নন। এই দুই তত্ত্বই তাঁহার জীবনের সাধনায় জৈব মিলনে মিলিত হইয়া এক অপরূপ নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।"[১৭]

সেই 'অপরূপ নূতন রূপকে' কোন ধর্মশাস্ত্রের কী শব্দের দ্বারা চিহ্নিত করা যাবে? এমন কোন একটি নিশ্চিত ধ্বনি আছে যার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র পূজা-সংগীতের মর্মকোষটি উন্মোচিত হতে পারে? মনে হয় আনন্দই সেই একটিমাত্র শব্দ যার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের ভক্তিসাধনার মর্মকথাটিকে নিভুর্লভাবে চিহ্নিত করা যায়। সকল দুঃখ, সকল রৌদ্রদাহ, বিঘ্নবিপদ, সৃষ্টির বেদনা, অন্তহীন বিরহ অতিক্রম করেও জেগে থাকে কবির আনন্দ। তাঁর সমস্ত উপাসনা নৈবেদ্য গীতাঞ্জলি গীতার্ঘ্য এই আনন্দেরই প্রকাশ, এই আনন্দেই বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে তাঁর যোগ, বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, সৃষ্টিতে তাঁর ভূমিকা, জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে তাঁর আনন্দময় বিবর্তন। আপনার অণুপরমাণুর মধ্যে ভূমার সেই আনন্দোপলব্ধিই কবির পূজা-সংগীতের মূল সুর—

তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ
তার অণু-পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ,
ও তার অন্ত নাই গো নাই।
তারে মোহনমন্ত্র দিয়ে গেছে কত ফুলের গন্ধ,
তারে দোলা দিয়ে দুলিয়ে গেছে কত ঢেউয়ের ছন্দ,
ও তার অন্ত নাই গো নাই।...
সে যে প্রাণ পেয়েছে পান করে যুগ-যুগান্তরের স্তন্য—
ভুবন কত তীর্থজলের ধারায় করেছে তায় ধন্য,
ও তার অন্ত নাই গো নাই।
যে যে সঙ্গিনী মোর আমারে সে দিয়েছে বরমাল্য।
আমি ধন্য সে মোর অঙ্গনে যে কত প্রদীপ জ্বালল—
ও তার অন্ত নাই গো নাই।

১। আপাতদৃষ্টিতে ৬১৭টি, কিন্তু 'আনুষ্ঠানিক' পর্যায়ের প্রথম ৯টি গানও মূলত পূজা-পর্যায়ভুক্ত, যেগুলির প্রচলিত পরিচয় 'পরিণয়'-রূপে

২। অতুলপ্রসাদ ও তাঁহার সংগীত—প্রবাসী ফাল্গুন ১৩৩১, পৃ ৫৭৬

৩। রবীন্দ্ররচনাবলী ১ম খণ্ড, অবতরণিকা

৪। ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন, "ব্রাহ্মধর্ম একটি মহান ধর্ম। ইহাতে পৌত্তলিকতা, অবতারবাদ, গ্রন্থপূজা প্রভৃতি ভ্রমাত্মক মতসমূহের অভাব দৃষ্ট হয়। ইহার মত নিতান্ত উচ্চ ও পরিশুদ্ধ।" তাঁর বক্তৃতায় ব্রাহ্মধর্মের চারিটি লক্ষণের কথা আছে—অসাম্প্রদায়িকতা, ব্যবধানবিমুখতা, আধ্যাত্মিকতা, সর্বসমগ্রসীভূতত্তা। দ্র 'ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের বর্তমান আধ্যাত্মিক অভাব', কলিকাতা চৈত্র ১৭৯৬ শকাব্দ (১৮৭৪)

৫। "অবস্থা বিশেষে এক একটি সংগীত এক একজন ধর্মাচার্যের কার্য করিতে পারে।... ছন্দোবদ্ধে রচিত শ্লোক স্তোত্র গীতিমালা কীর্তন যেমন জাতিসাধারণের প্রকৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পুরুষানুক্রমে চলিয়া যায় সাধারণ হৃদয়গ্রাহী এমন আর কিছুই নাই।"—'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রকাশিত 'ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্তন' পুস্তকের ভূমিকা (১৮৮০)

৬। দ্র জীবনস্মৃতি, হিমালয়যাত্রা অধ্যায়

৭। "রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য যাঁহারা গভীরভাবে অধ্যয়ন ও তাঁহার সংগীত শুদ্ধভাবে শ্রবণ করিবার অবকাশ পাইয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ঈশ্বরবিশ্বাস কবির আশৈশবের সংস্কার। তবে তিনি ঈশ্বরকে যেভাবে কল্পনা করিতেন, তাহা যে কেবল লৌকিক হিন্দুধর্ম হইতে পৃথক তাহা নহে, তাহা ব্রাহ্মধর্মানুমোদিত ব্রহ্মজ্ঞান হইতেও অন্যরূপ, তাঁহার ধর্ম তাঁহার নিজেরই।" (রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড, পৃ ১৮৪ ২য় সং)

৮। ব্রাহ্মসমাজের ১১ই মাঘের উৎসব সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য—"আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের চেয়ে অনেক বড়, এমন কি, একে যদি ভারতবর্ষের উৎসব বলি তাহলেও একে ছোট করা হবে। আমি বলছি আমাদের এই উৎসব মানবসমাজের উৎসব।...আমাদের উৎসবকে ব্রহ্মোৎসব বলব কিন্তু ব্রাহ্মোৎসব বলব না এই সংকল্প মনে নিয়ে আমি এসেছি। যিনি সত্যম্ তাঁর আলোকে এই উৎসবকে সমস্ত পৃথিবীতে আজ প্রসারিত করে দেখব, আমাদের এই প্রাঙ্গণ আজ পৃথিবীর মহাপ্রাঙ্গণ, এর ক্ষুদ্রতা নেই।"—নবযুগের উৎসব, শান্তিনিকেতন

৯। জমিদারি পরিদর্শনউপলক্ষে শিলাইদহ পতিসর প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থানকালে যৌবনে এই গানটি কবি সংগ্রহ করেন। এরই সুরে তাঁর বিখ্যাত রচনা 'আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি'

১০। ১২৯১ সালে রচিত রামমোহনসম্পর্কিত একটি প্রবন্ধে কবি নিজেকে ব্রাহ্ম বলে প্রচার করেছিলেন। ১৩১০ সালে ধর্মপ্রচার নামক প্রবন্ধে কবি বলেছিলেন—"আমি ব্রাহ্মসমাজে—ব্রাহ্মসমাজে নহে—আমাদের সমাজে—হিন্দুসমাজে সেই ব্রহ্মোপাসনা একান্তমনে প্রার্থনা করি।" এখন তিনি মনে করেন, নিজেদের ব্রাহ্ম নামে বিশেষরূপে চিহ্নিত করে হিন্দুসমাজের অপর অংশকে সেই চিহ্নের সাহায্যে হৃদয় থেকে বঞ্চিত করা হয়, ব্রহ্মের নামে তাঁকেই দূরবর্তী করা হয়

১১। ব্রহ্মসংগীত ১৫শ সংস্করণের ভূমিকা থেকে সংকলিত। ১৮২২ শকাব্দে (৭২ ব্রাহ্মাব্দে) প্রকাশিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের 'ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্তন' গ্রন্থেও এই অংশটি আছে

১২। অবশ্য দুঃখ-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়নি, অন্যত্র স্থান পেয়েছে, এমন একাধিক গানেও এই দুঃখ ও দুঃখতত্ত্ব প্রাধান্য লাভ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, 'দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল' গানটি বন্ধু-পর্যায়ের

১৩। রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষা—ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী; সুরঙ্গমা পত্রিকা, রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সংখ্যা ১৯৬১

১৪। রবীন্দ্রনাথ ও অমরতা—শশিভূষণ দাশগুপ্ত, দেবীপদ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে সংকলিত

১৫। ধর্মসংগীত—অজিতকুমার চক্রবর্তী, কাব্যপরিক্রমা; ধর্মসংগীত প্রবন্ধটি অগ্রহায়ণ ১৩১৯ প্রথম প্রকাশিত হয়

১৬। বাণী ও বীণা—প্রবোধচন্দ্র সেন, গীতবিতান পত্রিকা ১৩৬৮

১৭। গীতিমাল্য—অজিতকুমার চক্রবর্তী, কাব্যপরিক্রমা

রবীন্দ্রসংগীতের স্বদেশ-পর্যায়

১

গীতবিতানের প্রথম খণ্ডে 'স্বদেশ'-পর্যায়ে কবিকর্তৃক সংকলিত গীতসংখ্যা ৪৬টি এবং তৃতীয় খণ্ডে 'জাতীয় সংগীত' শিরোনামায় আরও ১৬টি গান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়াও আমরা পূর্ববর্তী কোনো কোনো পরিচ্ছেদে আলোচনাকালে মন্তব্য করেছি যে রবীন্দ্রসংগীতের বিষয়বিভাগ সর্বত্রই অপরিবর্তনীয় অভ্রান্ত বা অনমনীয় নয়। স্বদেশ-আখ্যায় চিহ্নিত এমন একাধিক গান অধুনা বিস্মৃতপ্রায় হয়ে আছে এবং স্বদেশ বা জাতীয় সংগীত-অধ্যায়বহির্ভূত বহু গানকেও জাতীয় উদ্দীপনার স্মারক হিসাবে গাওয়া হয়ে থাকে। জাতীয় চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত গান প্রথম রচনাকালে ব্রহ্মসংগীতরূপে প্রচারিত হয়েছিল এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। বরং রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমের স্বরূপনির্ণয়কালে একটি আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও ভগবদভক্তির প্রাবল্য প্রায়শই উপলব্ধ হয় একথাও ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। মৃত্তিকাময়ী দেশমাতৃকাকে কবি বিশুদ্ধ সমাজচেতনার সঙ্গে গ্রহণ করেননি, বরং তাঁর বিশ্বচেতনার অঙ্গরূপেই স্বদেশসত্তা তাঁর কাছে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল।

তথাপি রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গানের সঙ্গে বাঙলাদেশের জাতীয় আন্দোলন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনই সর্বপ্রথম কবিকে প্রদীপ্ত জনসংগীত ও জাতীয় সংগীতরচনায় বিপুলভাবে উদ্বুদ্ধ করে, যদিও বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের পূর্বেও তিনি স্বদেশগৌরবকে স্মরণ করে একাধিক দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছিলেন। বাঙলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে, স্বাধীনতালাভের উদ্যম ও পরাধীনতার বন্ধনমোচনের সুদীর্ঘ সংগ্রামে ঠাকুর-পরিবারের যে গৌরবময় ভূমিকা ছিল, তার ঐতিহ্যেই রবীন্দ্রনাথ লালিত হয়েছিলেন। সুতরাং উনিশ শতকের শেষভাগের মধ্যে রচিত কবির অনেকগুলি গানেই মাতৃভূমির প্রতি কবিমনের অকৃত্রিম মাহাত্ম্য ধ্বনিত হয়েছে। তেরো বছর বয়সে হিন্দুমেলার সংস্পর্শে ও ঠাকুরবাড়ির বিশেষ পরিবেশে তাঁর সুকুমার কবিচিত্তে যে জাতীয়তাবোধের স্ফুরণ হয়েছিল, তার মুদ্রাচিহ্ন 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' অথবা 'তোমারই তরে মা সঁপিনু দেহ তোমারই তরে মা সঁপিনু প্রাণ' গানে নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায়।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, স্বদেশী সংগীতের ঐতিহ্য আত্মসাৎ করেই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব, জাতীয় জাগরণের প্রেরণাতেই তিনি প্রথম জীবনে উপরিউক্ত গানগুলি লিখেছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের স্বদেশচেতন গানগুলিতে স্বদেশের প্রেরণা যতটা সক্রিয় ছিল, তাঁর সমকালীন কবিজীবনের প্রেরণাও তদপেক্ষা কম সকর্মক ছিল না। সন্ধ্যাসংগীত প্রভাতসংগীত ছবি ও গান কড়ি ও কোমল প্রভৃতি কাব্যে, রুদ্রচণ্ড কালমৃগয়া মায়ার খেলা প্রভৃতি নাটকে একজাতীয় আত্মলীন বিষন্নতার প্রভাব আছে। তাঁর দেশাত্মিক গানগুলিতেও স্বদেশগৌরবকে অতিক্রম করে এই ব্যক্তিচিত্তের নৈরাশ্য সংক্রামিত হয়েছে বলে মনে হয়। স্বদেশের মাহাত্ম্যজ্ঞাপন ও ভারতের জয়ঘোষণার তুলনায় নিষ্প্রদীপ নৈরাশ্য হতাশা ও নির্বিন্নতাই তাঁর তৎকালীন দেশপ্রেমাত্মক অনেকগুলি সংগীতকে প্রবলভাবে অভিভূত করেছিল। যে হিন্দুমেলা নবজীবনের পথে বাঙালিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তারই পটভূমিকায় ভৈরবী সুরে রবীন্দ্রনাথ এই শোকগীতি কেন রচনা করলেন ?

ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি
যতদিন সিন্ধু না ফেলিবে গ্রাসি ততদিন তুই কাঁদরে।

এ গানে স্বাধীনতার জন্য তরুণ কবিমনের উদ্যম মাত্র নেই। এ গান কেবল নৈরাশ্যের দীনতায় অশ্রুজলমোচন। ভারতের কলঙ্কের জন্য কবির ক্রন্দন যতটা সত্য তার চেয়ে বেশি সত্য কবির অনিবার্য রোদনপরায়ণতা। আর একটি গানে কবি গেয়েছেন—

অয়ি বিষাদিনী বীণা আয় সখী
গা লো সেইসব পুরানো গান।

—পুরানো গান গাইবার উদ্দেশ্য আমাদের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার না বরং পুরানো গানের মধ্যে লুকিয়ে আছে কবির ব্যক্তিগত জীবনের কোনো গোপন বেদনা ? তাই—

ভয়ে ভয়ে ভয়ে লুকায়ে লুকায়ে
নীরবে নীরবে কাঁদি
পাছে জননীর রোদন শুনিয়া
একটি সন্তান ওঠে রে জাগিয়া
কাঁদিতেও কেহ দেয় না বিধি।

কী নিবিড় অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন কিশোর কবির স্বদেশচিন্তা! পুনঃপুন বিলাপে মাতৃভূমির অস্তিত্বই কবি ভুলে গেছেন বলে মনে হয়—

শোনো শোনো আমাদের ব্যথা দেবদেব, প্রভু দয়াময়—
আমাদের ঝরিছে নয়ন, আমাদের ফাটিছে হৃদয়।

—চতুর্দিকে অশ্রুকাতর শোকবিলাস। অথচ বাঙলাদেশের সমকালীন রাজনৈতিক আকাশ তখনও পর্যন্ত দমননিপীড়নে এমন ভয়ংকর হয়ে ওঠেনি যে, জনসাধারণের বাক্‌স্বাধীনতা সেখানে অবরুদ্ধ; কোনো প্রকার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষামাত্রই নিঃশেষে দমনীয়, সকল প্রকার বন্ধনমোচনের চেষ্টাই নিভৃত গোপনসাধ্য আন্দোলনে পর্যবসিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কৈশোরক যুগের এই গানগুলি পাঠ করলে তাই মনে হয়। অধিকাংশ গানেই কবি সমসাময়িক দেশাত্মবোধক গানের উদ্দীপনার ও মাতৃমহিমার সুরটি গ্রহণ না করে এক প্রকার আত্মকেন্দ্রিক দুঃখকৈবল্যের সুর গ্রহণ করেছেন। নিঃসন্দেহে দেশ-প্রেমই তাঁকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল, কিন্তু কবিমনের নিজস্ব নৈরাশ্য ও বিষণ্ণতার দ্বারা আক্রান্ত বলেই কবির প্রথম জীবনের স্বদেশী গানগুলি অতিমাত্রায় দুঃখার্তি-হতাশায় দুর্বহ হয়ে উঠেছিল। এইজন্যই জাতীয় সংগীতের সর্বগুণোপেত লক্ষণ এইগুলিতে নেই। কবির এই দেশচেতনা দুঃখবাদেরই নামান্তর মাত্র। কী অনিবার্য রাষ্ট্রীয় দুর্যোগে কবি এই গান রচনা করেছিলেন?

এ কী অন্ধকার এ ভারতভূমি!
বুঝি পিতা, তারে ছেড়ে গেছ তুমি।
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে—কে তারে উদ্ধার করিবে।
চারিদিকে চাই, নাহি হেরি গতি। নাহি যে আশ্রয় অসহায় অতি।
আজি এ আঁধারে বিপদপাথারে কাহার চরণ ধরিবে।
তুমি চাও পিতা ঘুচাও এ দুখ। অভাগা দেশেরে হয়ো না বিমুখ—
নহিলে আঁধারে বিপদপাথারে কাহার চরণ ধরিবে ···

এ যেন ঈশ্বরের সম্মুখে মুমুক্ষু অনুতপ্ত ভক্তের কাতর প্রার্থনা। ঠিক একই ধরনের একটি ব্রহ্মগীতি রবিচ্ছায়া থেকে উদ্‌ধৃত করছি। ঈশ্বরের কাছে অন্ধকার নিরাশ্রয় ভারতভূমির জন্য প্রার্থনা আর ধর্মপথভ্রষ্ট [illegible] জন্য প্রার্থনার মধ্যে কি গভীর পার্থক্য আছে বলে মনে হয়?

সকাতরে ঐ কাঁদিছে সকলে, শোনো শোনো পিতা।
কহো কানে কানে, শুনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গলবারতা।

ক্ষুদ্র আশা নিয়ে রয়েছে বাঁচিয়ে, সদাই ভাবনা
যা-কিছু পায় হারায়ে যায় না মানে সান্ত্বনা।
সুখ-আশে দিশে দিশে বেড়ায় কাতরে—
মরীচিকা ধরিতে চায় এ মরুপ্রান্তরে।…

এমন কি প্রেমের ক্ষেত্রেও সেই নৈরাশ্য-বৈকল্য, হৃদয়ারণ্যে পথভ্রষ্ট হওয়া, সুখের মাঝখানে অনিবার্য অথচ অহেতুক বিষাদে অবগাঢ় হওয়া। প্রমোদে মন ঢেলে দিলেও 'তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে'। একটি গানে কবি চন্দ্রমাকে সম্বোধন করে বলেছেন—

ঢাকো রে মুখ চন্দ্রমা জলদে বিহগেরা থামো থামো,
আঁধারে কাঁদো গো তুমি ধরা।

এই গানটিকেও জাতীয় সংগীতেরই অন্তর্গত বলে ঘোষণা করা হয়েছে, হয়ত উদ্দেশ্যও ছিল তাই; কিন্তু 'আঁধারে কাঁদো গো তুমি ধরা'—এই গানে 'ধরা' শব্দটির ব্যবহারেই কবিমনের অন্য ধর্মটি ধরা পড়ে গেছে।

২

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীত রচনার প্রথম যুগে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। এবার ফিরাও মোরে (১৮৯৩) রচনার পূর্বে দেশের জনসাধারণের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তাঁর ধারণা যে অস্পষ্ট ছিল, কবি নিজেই তা স্বীকার করেছেন। সেইজন্য প্রাথমিক যুগের কোনো স্বদেশী গান জাতীয় আন্দোলনকেও প্রভাবিত করেনি। কিন্তু উনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে এবং বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন কাল পর্যন্ত ধীরে ধীরে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন সমস্যায় রবীন্দ্রনাথ অংশগ্রহণ করেছেন, কখনো কর্মিষ্ঠ নেতারূপে দেখা দিয়েছেন, কখনো চিন্তাশীল সাংবাদিকরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। গদ্যে-পদ্যে নাটকে-প্রবন্ধে জাতীয় জীবনের নানা অধ্যায়ে তাঁর সাহচর্য লেগেছে। সাধনা বঙ্গদর্শন ভাণ্ডার প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনীতি-সচেতনতা ও সমাজমনস্কতার বহু উদাহরণ প্রকীর্ণ রয়েছে। কিন্তু বহির্জীবনের এই সব তরঙ্গাঘাত তাঁর শিল্পমনের গভীরে প্রবেশ করেনি, কারণ এই পর্বে খুব বেশি দেশাত্মবোধক গান তিনি রচনা করেননি। এ পর্যন্ত শিল্পী রবীন্দ্রনাথের যেন দুটি ব্যক্তিত্ব—একটি সামাজিক আর একটি আত্মকেন্দ্রিক। সামাজিক ব্যক্তিসত্তা প্রবন্ধে-বক্তৃতায় বিশেষভাবে সক্রিয়,

ছোটগল্পেও খানিকটা এবং কবিতায় কদাচিৎ ধ্বনিত। ছোটগল্পগুলি রবীন্দ্রনাথের সামাজিক সত্তা ও ব্যক্তিগ্রহের মধ্যবিন্দু। কিন্তু কবিতায় তিনি একান্ত আত্মলীন ও সংগীতে তিনি সম্পূর্ণ স্বচিত্তকেন্দ্রিত। ফলে সাধনা-যুগে উত্তেজিত রাজনৈতিক আলোচনার আসরে রবীন্দ্রনাথের কোনো স্বদেশপ্রাণ সংগীত নেই, কবিতাতেও তার বিস্তৃত প্রত্যাশিত প্রকাশ নেই। সেইজন্য কলকাতার ব্যাপ্ত সামাজিক কর্মের অব্যবহিত পরেই বোলপুরের নিভৃত অবকাশে সাধনার অন্তর্যামী-তত্ত্বে নিবিষ্ট হতে পেরেছেন। ছিন্নপত্রের এক-জায়গায় কবি লিখেছিলেন—

"আমার স্বীকার করতে লজ্জা করে এবং ভেবে দেখতে দুঃখবোধ হয়—সাধারণত মানুষের সংসর্গ আমাকে বড় বেশি উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়—আমার চারিদিকেই এমন একটি গণ্ডী আমি কিছুতেই সে লঙ্ঘন করিতে পারিনে।"

সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন স্বদেশী গানগুলিকে বাঙলা দেশাত্মবোধক কাব্যগীতির ধারাবাহিকতার অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। সেইগুলি যেন নৈবেদ্যেরই সম্প্রসারিত রূপ। নৈবেদ্যের মধ্যেও দেশপ্রীতি আছে, কিন্তু তা ঠিক স্বদেশপ্রীতি নয়, দেশাতীত মানুষের মঙ্গলকামনাও তার সঙ্গে জড়িত। এখানে কবির দেশভক্তি ও বিশ্বানুভূতি এক হয়ে গেছে। নৈবেদ্যের আত্ম-নিবেদনের সুরে রচিত এই গানগুলিতে স্বাদেশিকতার সেই উন্মাদন নেই যা পরাধীন ধমনীকে উদ্‌বেজিত উত্তাল করে তোলে—যথা 'আনন্দধ্বনি জাগাও', 'এ ভারতে রাখো নিত্য প্রভু', 'আজি এ ভারত লজ্জিত হে'। শেষ গানটিতে কবি বর্তমান ভারতের দুরবস্থার কী কারণ ব্যাখ্যা করেছেন দেখা যাক—

আজি এ ভারত লজ্জিত হে, হীনতাপঙ্কে মজ্জিত হে—
নাহি পৌরুষ নাহি বিচারণা কঠিন তপস্যা সত্যসাধনা
অন্তরে বাহিরে ধর্মে কর্মে সকলই ব্রহ্মবিবর্জিত হে।

দেশনিষ্ঠা ও ব্রহ্মজ্ঞান, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা, স্বদেশাত্মকতা ও বিশ্বানুভূতি এই দুই দ্বিধায় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানগুলি তখনও পর্যন্ত খণ্ডিত হয়েছে সন্দেহ নেই। এই পর্বের জাতীয় গীতিগুলি কোনো অনুষ্ঠান-উপলক্ষে বা কারো অনুজ্ঞা-উপরোধে রচিত হয়েছে। একথা বলার তাৎপর্য এই নয় যে, আনুষ্ঠানিক গানে স্রষ্টার সহানুভূতির অভাব ঘটে থাকে। কিন্তু একথা খুব সম্ভব সকলেই স্বীকার করবেন যে, সাধারণ মানুষের প্রেরণা আর অনুষ্ঠানে উদ্বোধনসংগীত গাইবার প্রেরণা এক নয়। রাজনৈতিক অধিবেশনের

উদ্বোধনে গীত হওয়ার জন্য কবি বন্দে মাতরম্ গানেও সুর দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকর্তৃক বন্দে মাতরম্ গানে সুরসংযোজনা আমাদের সংগীতের ইতিহাসে একটি বড় সম্পদ, এমন কি রবীন্দ্রনাথের নিজের সংগীতরচনার চেয়েও এর মূল্য কম নয়। অথচ এই সুরযোজনা তিনি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় করেছিলেন কি? ১৩০৩ সালে কলকাতায় পৌষ মাসে কংগ্রেসের অধিবেশনে গাইবার জন্য এই সুর সংযোজিত হয়েছিল। ১৮৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসেও কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি স্বকণ্ঠে গেয়েছিলেন—

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে
এমন ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে।

একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ একবার লিখেছিলেন, 'দেশের কাজ যদি আমায় করতে হয় সে দশের সংসর্গ বাঁচিয়ে। আমার আত্মরক্ষার একটি মাত্র উপায় আমি দেখতে পাচ্ছি আপনাকে দূরে রক্ষা করা" (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা)। কোনো বিশেষ পরিবেশ ও উপলক্ষে একথা লিখলেও রবীন্দ্র-নাথের এই মনোভাব অধিকাংশ দেশাত্মবোধক গানের পটভূমিতে লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ যদি অকুণ্ঠ জননেতা হতেন, তবে তাঁর কাব্যজীবনের কী ক্ষতি হত বলতে পারি না, কিন্তু তার দেশাত্মবোধক গানগুলি হয়ত আরও বলিষ্ঠ হত। যে সময়ে তিনি বন্দে মাতরম্ গানে সুর দিচ্ছেন, সে সময়ে তাঁর অন্তরের প্রবণতা সম্পূর্ণ অন্য দিকে চলেছিল। আনুষ্ঠানিক স্বদেশী সংগীতের পাশেই একের পর এক মাঘোৎসবের গান লেখা চলেছে 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে', অথবা 'আমায় ছ জনায় মিলে পথ দেখায় বলে'। এই গানগুলি কবি আন্তরিকতার সঙ্গে রচনা করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এইগুলি বন্দে মাতরম্ সুরের সহধর্মী নয়। রবীন্দ্রজীবনীকার পর্যন্ত মন্তব্য করেছেন, "এ কি কড়ি ও কোমলের রচয়িতা ভাবুক কবির রচনা না কোনো ধর্মসাধকের অন্তরের আকূতিভরা প্রার্থনা"?

এক সময় ডক্টর প্রসন্নকুমার রায়-আহূত ছাত্রসম্মেলন-উপলক্ষে কবিকে সময়োচিত গান রচনার অনুরোধ করা হলে কবি 'আগে চল আগে চল ভাই' এই গানটি রচনা করেন। এই গানটিও তাঁর স্বদেশ-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু এই গানের সুরঘটিত বীর্যবত্তা সত্ত্বেও এর মধ্যে পরাধীনতার মর্মবেদনা নেই, অথবা এমন কোনো ভাষা নেই, যার দ্বারা গানখানি জাতীয় সংগীতের অন্যান্য

শর্তের আনুকূল্য করে। এ গানে যে অগ্রগতির আহ্বান আছে তা সর্বকালীন ও সর্বমানবসাধারণ, বিশেষ করে ছাত্র তরুণ সম্প্রদায়ের জন্য এই উদ্দীপনা নিতান্তই আনুষ্ঠানিক। একই উপলক্ষে দ্বিতীয় গানটি 'তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ'। এই দুটি গান অবলম্বনে একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনের বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের দিকটির বদলে চিরকালই ভারতবাসীর আত্মনির্ভরতার উপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলীর সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁদের কাছে একথা বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ স্বায়ত্তশাসন স্বরাজ ইত্যাদি শব্দ অপেক্ষা বারবার আমাদের স্বনির্ভরশীলতা, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, এগুলির উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। 'আত্ম-শক্তি ও স্বদেশী সমাজ' নামক প্রবন্ধ পাঠ করলেই এই বিষয়ে কবির রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার সুস্পষ্ট মানচিত্রটি ধরা পড়ে। 'সত্যের আহ্বান' নামক প্রবন্ধে ১৩২৮ পরিণত বয়সে কবি লিখেছেন, "১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে আমি বাঙালিকে ডেকে এই কথা বলেছিলেম যে, আত্মশক্তির দ্বারা ভিতরের দিক থেকে দেশকে সৃষ্টি করো, কারণ সৃষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়।...দেশকে পাওয়ার মানে হচ্ছে দেশের মধ্যে আপনার আত্মাকেই ব্যাপক করে উপলব্ধি করা। আপনার চিন্তার দ্বারা, কর্মের দ্বারা, দেশকে যখন নিজে গড়ে তুলতে থাকি তখনই আত্মাকে দেশের মধ্যে সত্য করে দেখতে পাই। মানুষের দেশ মানুষের চিত্তের সৃষ্টি। এইজন্যেই দেশের মধ্যে মানুষের আত্মার ব্যাপ্তি, আত্মার প্রকাশ। যে দেশে জন্মেছি কী উপায়ে সেই দেশকে সম্পূর্ণ আমার আপন করে তুলতে হবে বহুকাল পূর্বে 'স্বদেশী সমাজ' নামক প্রবন্ধে তার বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেই আলোচনাতে যে কোনো ত্রুটি থাকুক এই কথাটি জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে যে, দেশকে জয় করে নিতে হবে পরের হাত থেকে নয় নিজের নৈষ্কর্ম্য থেকে, ঔদাসীন্য থেকে। দেশের যে কোনো উন্নতি-সাধনের জন্যে যে উপলক্ষে আমরা ইংরেজ রাজসরকারের দ্বারস্থ হয়েছি সেই উপলক্ষেই আমাদের নৈষ্কর্ম্যকে নিবিড়তর করে তুলেছি মাত্র।"

কবির এই মতের সত্যাসত্য আমাদর আলোচ্য নয়, কিন্তু স্পষ্টতই এই মনোভাবই তাঁর পূর্বালোচিত দুটি গানে প্রাপ্তব্য। 'আগে চল আগে চল ভাই' গানে আছে—

প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময়
দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়—

সময় সময় করে পাঁজি পুঁথি ধরে
সময় কোথায় পাবি বল ভাই।

আগে আত্মকর্তৃত্ব আসুক তবে দেশের উন্নতি ঘটবে, এই জাতীয় মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে কবির অনুযোগই গানটিতে নিক্ষিপ্ত। 'তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ' গানে তথাকথিত দেশপ্রেমিকদের প্রতি গ্লানি আরও তীব্র, উষ্মা আরও প্রচণ্ড। পুনরায় 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধ থেকে কবির তৎকালীন মনোভাবের সন্ধান নেওয়া যেতে পারে—

"আজ ত্রিশ বৎসর হয়ে গেল, যখন সাধনা কাগজে আমি লিখছিলুম, তখন আমার দেশের লোককে এই কথাই বলবার চেষ্টা করেছি। তখন ইংরেজি-শেখা ভারতবর্ষ পরের কাছে অধিকার-ভিক্ষার কাজে বিষম ব্যস্ত ছিল। তখন বারে বারে আমি কেবল একটি কথা বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছি যে মানুষকে অধিকার চেয়ে নিতে হবে না, অধিকার সৃষ্টি করতে হবে। কেন না মানুষ প্রধানত অন্তরের জীব, অন্তরেই সে কর্তা। বাহিরের লাভে অন্তরে লোকসান ঘটে। আমি বলেছিলেম অধিকারবঞ্চিত হবার দুঃখভার আমাদের পক্ষে তেমন বোঝা নয় যেমন বোঝা আমাদের মাথার উপরে 'আবেদন আর নিবেদনের থালা'"।

এই মনোভাব যে গানটি অনিবার্যভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় তা এই—

তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ।
পলে পলে মরি সেও ভালো সহি পদে পদে অপমান।
কথার বাঁধুনি কাঁদুনির পালা চোখে নাহি কারো নীর।
আবেদন আর নিবেদনের থালা বয়ে বয়ে নত শির।
কাঁদিয়ে সোহাগ ছি ছি এ কী লাজ!
জগতের মাঝে ভিখারির সাজ—
আপনি করিনে আপনার কাজ পরের পরে অভিমান।…

তৎসত্ত্বেও ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনার মধ্যেও একটি দ্বিধাগ্রস্ততার ভাব, একটি বিপ্রতীপ চিন্তা ছিল। ১৮৯০ সালে লেখা 'মন্ত্রীঅভিষেক' প্রবন্ধে কবি ইংরাজ শাসনের রূঢ় সমালোচনা করলেও তারই এক কোণে সবিনয়ে বলেছেন, "তোমাদের প্রতি ভক্তি আছে বলিয়াই কথা কহি, নহিলে নীরব হইয়া

থাকিতাম'। মানসী কাব্যের আলোচনাকালে প্রমথ চৌধুরীকে একটি পত্রে কবি লিখেছিলেন—

"আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলেছে। একটা আমাকে সর্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করছে আর একটা আমাকে বিশ্রাম করতে দিচ্ছে না।...একদিকে বেদনা আর একদিকে বৈরাগ্য। একদিকে কবিতা আর একদিকে ফিলজফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালবাসা আর একদিকে দেশহিতৈষিতার প্রতি উপহাস।..."

সৌভাগ্যের বিষয় দেশহিতৈষিতার প্রতি উপহাস মানসীর এবং পরবর্তী-কালের অন্য কোনো কবিতায় প্রকাশ পেলেও তাঁর কোনো গানে এই মনোভাব প্রতিবিম্বিত হয়নি।

৩

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশগৌরবী সংগীতরচনার শ্রেষ্ঠ কাল বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনপর্ব। এই যুগে আসমুদ্রহিমাচল বঙ্গভূমি সমবেতভাবে ব্রিটিশ-বিরোধিতায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল, বাঙলা সাহিত্য ও সংগীত সেই জাতীয় জাগরণের মহাযজ্ঞে যথোচিত সমিধ সরবরাহ করতে পেরেছিল। যদিও এই আন্দোলনকালে রবীন্দ্রনাথের ব্রিটিশবিরোধী রূপ তত স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আন্দোলনের জাতীয় প্রকৃতি, মাতৃভূমি-মাতৃভাষা ও স্বদেশের সম্পদের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ, সর্বজনীন ঐক্যবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা—এই চারিত্র্য-গুলিকে তিনিই সুস্পষ্টভাবে সংগীতে রূপদান করেছিলেন। একথা বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন জনপ্রিয় স্বদেশী গানগুলিই পরোক্ষভাবে আন্দোলনের ধ্বংসাত্মক দিকগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। ১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের অনুমতি দান করার পূর্ব থেকেই, বঙ্গচ্ছেদের সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণার কাল থেকেই বাঙলাদেশের সর্বত্র বিদ্রোহ-বিক্ষোভ-ধূমায়িত হয়ে ওঠে। বাঙলার সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে এমন ব্যাপক গণ-চেতনা, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে এহেন বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ ইতিহাসে ইতিপূর্বে আর কখনও ঘটেনি। অবশ্য বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের নেতৃত্ব বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতেই আগাগোড়া ন্যস্ত ছিল এবং মুসলমান জনসাধারণ এই আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেনি। তথাপি দেশের চারিদিকে আন্দোলন অগ্নিশিখার মত ছড়িয়ে পড়ল। এই আন্দোলনই

রবীন্দ্রনাথকে জননেতায়, গণআন্দোলনের চারণকবিতে পরিণত করল। বঙ্গদর্শনে কবি লিখলেন, "আমরা প্রশ্রয় চাহি না, প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে।" সঞ্জীবনী পত্রিকায় কৃষ্ণকুমার মিত্র লিখলেন, "আমরা স্বদেশের কল্যাণের জন্য মাতৃভূমির পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে অতঃপর আমরা দেশজাত দ্রব্য পাইলে কোনো বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিব না।" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথায় ঘোষণা করলেন, "মা লক্ষ্মী কৃপা কর, কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেব না, ঘরের থাকতে পরের নেব না। শাঁখা থাকতে চুড়ি পরব না, পরের দুয়ারে ভিক্ষা করব না। মোটা বসন অঙ্গে নেব।···মোটা অন্ন অক্ষয় হোক, মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোক।" ৭ই অগস্ট টাউন হলের মহতী জনসভায় বিদেশী দ্রব্য-বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হল, দেশের সর্বত্র হাজার হাজার সভাসম্মেলনে এই প্রতিজ্ঞা ঘোষিত হল। স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি দেশীয় শিল্পকলার প্রতি এই অনুরাগ তদানীন্তন বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠাবোধের জলন্ত সাক্ষ্য। এই সাক্ষ্যকে স্বাক্ষরিত করলেন কান্তকবি রজনীকান্ত, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, মনোমোহন চক্রবর্তী এবং আরও শত শত গীতিকার[১]। অশ্বিনীকুমার দত্তের নেতৃত্বে এই আন্দোলন বরিশালে সর্বাপেক্ষা উগ্রমূর্তি ধারণ করল, সরকার বরিশালকে নিষিদ্ধ জেলারূপে চিহ্নিত করলেন। অশ্বিনীকুমার মুকুন্দদাস ও মনোমোহন চক্রবর্তীর গান দেশবাসীর কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হল। খ্যাত-অখ্যাত অসংখ্য কবিই সেদিন তাঁদের দৃপ্ত দেশপ্রেমকে সংগীতের রক্তরাগে পরিণত করে স্বদেশজননীর বেদীপীঠতলে উপহার দিয়েছিলেন। তথাপি আজ নিঃসন্দেহে বলা যায় সেই আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য ছিল রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গানগুলি। আন্দোলনের প্রাত্যহিক তুচ্ছতা নিয়ে নয়, চিরায়ত উদ্দেশ্যকে অকম্প প্রদীপশিখার মত ঊর্ধ্বমুখী রেখে কবি বঙ্গভূমির নিত্যমহিমাকে গীতান্বিত করেছিলেন। অসংখ্য গীতিকার সুরকার রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমাত্মক গানগুলির দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ১৬ অক্টোবর বঙ্গচ্ছেদ-দিবসে দেশব্যাপী রাখীবন্ধন ও অরন্ধন ব্রতের একমাত্র সংগীত ছিল 'বাঙলার মাটি বাঙলার জল' এবং 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে'। আন্দোলনের পুরোধায় থেকেও এ গানের মধ্যে এমন একটি সত্যব্রত মহিমা আছে যা সাময়িকতাকে অতিক্রম করে যেতে পারে, বাঙালির চিরকালের জাতীয় সংগীত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীতগুলির

শ্রেষ্ঠত্ব এইখানেই নিহিত বলে মনে করি। অন্যান্য কবিদের গানে সাময়িকতার মুদ্রাচিহ্ন তীব্র ভাষায় অঙ্কিত হলেও রবীন্দ্রনাথ আন্দোলনের বজ্রগর্ভ অগ্নি-কুণ্ডলিত মুহূর্তেও প্রত্যহের ধূলিসমারোহ থেকে তাঁর গানকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। যে বঙ্গ রাষ্ট্রশক্তির ষড়যন্ত্রে দ্বিখণ্ডিত হতে চলেছে, তার খণ্ডননিবারণের জন্য কবি সেই বঙ্গমহিমাকে উদাত্তকণ্ঠে ছড়িয়ে দিলেন আকাশে-বাতাসে, যে বঙ্গ তার ফাল্গুনের আম্রমঞ্জরির ঘ্রাণে, অঘ্রাণের শস্য-বিকাশে, নদীতটে, ধেনুচরা প্রান্তরে, বিহঙ্গকুজিত পল্লীবাটে, সন্ধ্যার প্রদীপ-শিখায় কবির মুগ্ধচিত্তে শাশ্বত মূর্তিতে বিরাজ করে। আন্দোলনের কোলাহলকে নিয়ে গেলেন এক নিভৃত রূপধ্যানে, বিহ্বল মাতৃস্তবে, স্বপ্নাপ্লুত মৃদাসক্তিতে, অনুরাগে কেঁদে-ফেলার আশ্চর্য অভিজ্ঞতায়। কোথায় রইল মোটা কাপড়-পরার রজনীকান্তের প্রতিজ্ঞাগীত, মনোমোহনের কণ্ঠে কাঁচের চুড়ি ফেলে দেওয়ার জন্য বঙ্গনারীর প্রতি কাতরপ্রার্থনা, কালীপ্রসন্নের গানে বরিশালের উপর শারীরিক আঘাতের জন্য বিকৃত তিরস্কার! তার বদলে পেলাম বৈরাগীর একতারায় মমতার বাউল গান। দেশের সীমারেখা আর অঙ্গচ্ছেদের সমস্যা নয়, কেবল ধূলি অঙ্গে মেখে মাতৃস্পর্শ লাভের কী করুণ অথচ হিরণ্ময় বাসনা! আর তারই অন্তে একটিমাত্র পংক্তি, যেখানে সাময়িক আন্দোলনের প্রতিজ্ঞা একটি অবিচলিত বিশ্বাস নিয়ে,—সমবেত ঘোষণা নয়, একটি নিবিড় প্রত্যয়ে উদ্গীত হয়েছে—'আমি পরের ঘরে কিনব না আর ভূষণ বলে গলার ফাঁসি'। অসংখ্য লোষ্ট্রবর্ষণে বিক্ষুব্ধ নদীস্রোতের উপর ক্ষণস্থায়ী বিক্ষোভ-বৃত্তগুলি যখন মিলিয়ে যায় আর চঞ্চল স্রোতের উপর চাঁদের প্রতিকৃতিটি স্থির অথচ থরথর করে কাঁপে, তেমনি বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সমস্ত উত্তেজিত চিৎকার, কণ্ঠনালির যন্ত্রনা, ক্রোধ-ভৎ´সনার মাঝখানে ধীরে ধীরে স্থিরপ্রশান্ত একটি চিরশ্রী বঙ্গের মূর্তি থরথর করে কেঁপেছে যাকে কোনো রাজশক্তি কোনো চক্রান্ত কখনও দ্বিখণ্ডিত করতে পারে না। সে মূর্তি একমাত্র রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাঙলা', 'ও আমার দেশের মাটি', 'বাঙলার মাটি বাঙলার জল' প্রভৃতি গানগুলিতেই সম্ভব হয়েছে। এই গানগুলিতে স্বদেশভূমির গতানুগতিক পুরাণবিলাস নেই, ভৌগোলিক-মাহাত্ম্যে পুলকিত হওয়ার প্রেরণা নেই, এই গানগুলির কামনা মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ ও মর্মানুগ। পরবর্তী জীবনে এই ধরনের গান রবীন্দ্রনাথ আর একটিও রচনা করেননি। 'আমি ভয় করব না ভয় করব না'—কত সহজ সুরে আত্মশক্তির তেজস্বিতাকে

ধ্বনিত করেছেন কবি। 'যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা না', 'ছি ছি চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', 'তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে' প্রতিটি গানই একক কণ্ঠের, সমবেত ঘোষণার নয়। 'একমনে তোর একতারাতে একটি যে তার সেইটি বাজা'—কবিজীবনের এই সূত্রই রবীন্দ্রনাথের জাতীয় গানগুলির লক্ষণ। আপনাকে এককরূপে দেখেছেন বলেই সমস্ত জনবিক্ষোভের মাঝখানে সহিষ্ণুতার নীরব নিঃসঙ্গ আদর্শে দীক্ষা নিয়েছেন তিনি।

বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন থেকে অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্তই রবীন্দ্রনাথ অধিক-মাত্রায় স্বদেশী সংগীত রচনা করেছেন এবং এই মধ্যবর্তী সময়ে বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যে অগণ্য জাতীয় সংগীতসংকলন প্রকাশিত হয়েছে তার প্রায় প্রত্যেকটিতেই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-পর্যাযের গান অন্তর্ভুক্ত হযেছে। অথচ বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের পর জাতীয় উত্তেজনা থেকে স্বয়ং কবি সরে এসে-ছিলেন, প্রকাশ্যে আর জননায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেননি। অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধীজীর আবির্ভাব ঘটার পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, গান্ধীজীকে দেশনায়কের সম্মান দিয়ে তাঁকে তিনিই মহাত্মা বলে প্রচার করেছেন, কিন্তু স্বয়ং অসহযোগ আন্দোলনকে অনেক দিক থেকে সমর্থন করতে পারেননি। দেশের প্রতি, স্বাধীনতার প্রতি, আন্দোলনের প্রতি তাঁর ঔদাসীন্য ঘটেনি—তার গতিপ্রকৃতির প্রতি যথাসম্ভব সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন, বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে বিচার করেছেন, আন্দোলনের বিকৃতিনিবারণের চেষ্টা করেছেন, পথভ্রষ্টতার আশঙ্কায় সতর্ক করেছেন, কিন্তু বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময়কালীন প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব আর কবির পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর নিভৃত জীবনদেবতার নেপথ্য-নির্দেশে কবিজীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে কোলাহল থেকে নৈঃসঙ্গ্যে, বিক্ষোভ থেকে নৈভৃত্যে, বিশ্বলোকের অসীম প্রাঙ্গণে।

বাঙলা স্বদেশভাবাত্মক সংগীতের সামগ্রিক তালিকায় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানগুলির পর্যালোচনা করলে দেখি তার কয়েকটি সাধারণভাবে বাঙলার সৌন্দর্য, তার স্মরণীয়তা, মহনীয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর গানের সুর হয়ত সর্বত্র বলিষ্ঠ নয়, কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে, দেশপ্রেমের একক আদর্শে সেগুলি অনুপ্রাণিত, সমবেত উত্তেজনায় উদ্দীপিত নয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন স্বদেশী গানগুলি সম্পর্কে যথার্থই বলেছিলেন—

His patriotic songs are characteristic—some of them enthrone the Motherland as the Adored in the shrines of our souls, some sound as a clarion call to our dropping spirits, filling us with hope and the will to do and dare and suffer.

৪

আজ ইতিহাসের পূর্বপৃষ্ঠাগুলি এলোমেলো নাড়াচাড়া করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গানগুলি সম্পর্কে কিছু বিপরীত প্রতিক্রিয়ার তথ্য চোখে পড়ে। কবির বিখ্যাত 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' কল্পনার যুগে লেখা। এই গানে কবির আর্ষ দৃষ্টি দেশপ্রেমের সাময়িক আন্দোলনের ঊর্ধ্বে গিয়ে সনাতন ভারতবর্ষকে ধ্যানমূর্তির রূপকল্পে অঙ্কিত করেছে। বহুকাল পূর্বে কবি 'কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে' গানটিতে লিখেছিলেন—

এরা তোমায় কিছু দেবে না দেবে না—মিথ্যা কহে শুধু কত কী ভানে।
তুমি তো দিতেছ মা যা আছে তোমারই—স্বর্ণশস্য তব, জাহ্নবীবারি,
জ্ঞানধর্ম কত পুণ্যকাহিনী।

এরা কী দেবে তোরে—কিছু না কিছু না। মিথ্যা কবে শুধু হীনপরাণে।

এই গানটির কিছু শব্দধ্বনি 'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী' গানটিতে পাওয়া যায়। কল্পনার যুগে কবি প্রাচীন তপোমহিমাপূত সৌন্দর্যখচিত ভারতবর্ষের স্বপ্নলোকে মানসভ্রমণ করছিলেন। তারই ফলে সমগ্র ভারতের এই গরীয়সী জননীমূর্তিটি তাঁর রূপকল্পনায় ধরা দিয়েছিল। সংস্কৃত উচ্চারণের গাম্ভীর্যে ও উচ্চাবচতায়, তৎসম শব্দের ধ্বনিস্পন্দে, মাতৃমহিমার মহৈশ্বর্যে এই গানটি আন্দোলনের সীমা ছাড়িয়ে একটি মন্ত্রের ঔদাত্ত্য লাভ করেছে। এই গানটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে এর উদ্ভবকালীন একটি ক্ষুদ্র ইতিহাসও বিবৃত করেছিলেন—

"একদিন আমার পরলোকগত বন্ধু হেমচন্দ্র মল্লিক বিপিন পাল মহাশয়কে সঙ্গে করে একটি অনুরোধ নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁদের কথা ছিল এই যে, বিশেষভাবে দুর্গামূর্তির সঙ্গে মাতৃভূমির দেবীরূপ মিশিয়ে দিয়ে তাঁরা শারদীয়া পূজার অনুষ্ঠানকে নূতনভাবে দেশে প্রবর্তিত করতে চান, তার উপযুক্ত ভক্তি ও উদ্দীপনামিশ্রিত স্তবের গান রচনা করবার জন্যে আমার প্রতি তাঁদের ছিল বিশেষ অনুরোধ। আমি অস্বীকার করে বলেছিলুম, এ ভক্তি

আমার আন্তরিক হতে পারে না, সুতরাং এতে আমার অপরাধের কারণ ঘটবে। বিষয়টা যদি কেবল সাহিত্যক্ষেত্রের অধিকারগত হতো তাহলে আমার ধর্মবিশ্বাস যাই হোক আমার পক্ষে তাতে সঙ্কোচের কারণ থাকত না। কিন্তু ভক্তির ক্ষেত্রে পূজার ক্ষেত্রে অনধিকারপ্রবেশ গর্হণীয়। আমার বন্ধুরা সন্তুষ্ট হননি। আমি রচনা করেছিলুম 'ভুবনমনোমোহিনী'। এ গান পূজা-মণ্ডপের যোগ্য নয় সে কথা বলা বাহুল্য। অপরপক্ষে একথাও স্বীকার করতে হবে যে এ গান সর্বজনীন ভারতরাষ্ট্রসভায় গাবার উপযুক্ত নয় কেন না এ কবিতাটি একান্তভাবে হিন্দুসংস্কৃতি আশ্রয় করে রচিত। অহিন্দুর এটা সুপরিচিতভাবে মর্মংগম হবে না।"[২]

কল্পনার অন্তর্গত 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' (১৩০৩) গানটির এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে স্বয়ং কবি সচেতন ছিলেন। কিন্তু রচনা ও প্রচারের সমকালে গানটি কোনরূপ বিরোধিতার সম্মুখীন হয়নি। অথচ তার বেশ কিছুকাল পরে দেশ-ব্যাপী ক্রমবর্ধমান রবীন্দ্রবিরোধিতার একটি অনুজ্জ্বল অধ্যায়ে গানটির প্রতি বিদ্বিষ্ট সমালোচনা প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল। ১৩২২ সালে 'সাহিত্য' পত্রে অমরেন্দ্রনাথ রায় 'সাহিত্যে রুচি ও নীতি' নামক একটি প্রবন্ধে লেখেন—

"দেশমাতার রূপ বর্ণনা করিতে যাইয়াও কবি নিজের বিকৃত রুচি ঢাকিতে পারেন নাই। বলিতেছেন—অযি ভুবনমনোমোহিনী। জননীর রূপের কথা কি এমন করিয়া বলিতে আছে?"

সাহিত্য পত্রিকার যথানিয়মিত রবীন্দ্রবিরোধিতা, রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছিদ্রান্বেষণপ্রবৃত্তি ও অহেতুক বিদ্বিষ্টতা-ব্যতীত এই সমালোচনার অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত মন্তব্যের প্রতিবাদ প্রকাশিত হয় প্রবর্তক পাক্ষিক পত্রিকার প্রথম বর্ষ ২০ সংখ্যায় (পৃ ৩১৯)। প্রবর্তকে লেখা হয়—

"হরি! হরি! যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। রবীন্দ্রনাথের বিকৃতরুচির পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া সমালোচক মহাশয়ের হৃদয় যে নিতান্তই শুষ্ক ও অগভীর তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। মা যে আমার সত্যই ভুবনমোহিনী! একথা যে তন্ত্রে লেখা আছে। একি রবীন্দ্রনাথের কথা? উপরন্তু মাতৃমন্ত্রে সিদ্ধ রামপ্রসাদ কী বলিয়াছেন শোন—

কে রে ঐ মনোমোহিনী
একি চিত্তছলনা দৈত্যদলনা ললনা নলিনী বিড়ম্বিনী।

…জানি না অমরেন্দ্রবাবু ঐ ভুবনমনোমোহিনীর মধ্যে কী দুর্নীতির সন্ধান পাইলেন—অবশ্যই মহাকৌল মাতৃসাধক রামপ্রসাদের অপেক্ষা সমালোচক মহাশয় মাতৃমহিমা কমই বুঝেন।”

প্রবর্তকের এই মন্তব্য সাহিত্য পত্রের নিকট প্রীতিপ্রদ হয়নি, তাই অর্ঘ্য নামক একটি পত্রিকা সমালোচনাপ্রসঙ্গে সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রবর্তক পত্রিকার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেন এবং অর্ঘ্য পত্রিকাতে তারও একটি প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। প্রবর্তক পাক্ষিক পত্রের প্রথম বর্ষ ২৪ সংখ্যায় ‘বিশ্ববিমোহিনী বঙ্গভূমি’ এই নামে পুনরায় একটি সুচিন্তিত সম্পাদকীয়ের মধ্যে ‘অয়ি ভুবনমনোমোহিনী’-র বিমল সৌন্দর্যের প্রতি সশ্রদ্ধ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয় এবং রবীন্দ্রবিরোধী বিদ্বেষপ্রসূত সমালোচনার জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করা হয। অর্ঘ্য-সম্পাদক মন্তব্য করেছিলেন—“জগন্মাতাকে যদিও বা ভুবনমনোমোহিনী বলা যায দেশমাতাকে কিছুতেই তাহা বলা যায না।” প্রবর্তকের সম্পাদকীয় মন্তব্যের কিয়দংশ এখানে উদ্ধার করছি—

“[অর্ঘ্য-সম্পাদক] একথা স্পষ্টাক্ষরে বলিযাছেন যাহারা রবীন্দ্রনাথের নাম শুনিযা অজ্ঞান হয় তাহাদের মস্তিষ্ক বলিযা জিনিস তো নাই। তা আমরা রবীন্দ্রনাথের নাম শুনিয়া অজ্ঞান হই আর না হই—ইহাই সম্পাদক মহাশয়ের ধারণা। কিন্তু তিনি যে উদাহরণ দিয়াছেন উহা বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী হইতে উদ্ধৃত—‘ব্রজেশ্বরের প্রশ্নের উত্তরে রঙ্গরাজ বলিল, আমাদের মা ভগবতীর তুল্য’। এই কথার উপর টিপ্‌পনী কাটিয়া অর্ঘ্য-সম্পাদক বলেন, কৈ রঙ্গরাজ এখানে ব্রজেশ্বরের কথার উত্তরে বলিতে পারিল না, ‘মা আমার ভুবন-মনোমোহিনী।’

এক্ষণে এই অনাড়ি লেখক যদি দেখাইতে পারে যে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং জগন্মাতাকে নয়, বঙ্গভূমিকে দেশমাতৃকাকে বিশ্ববিমোহিনী বলিয়াছেন তবেই রক্ষা, তখন লেখককে যে সকল মধুর সম্ভাষণে সম্ভাষিত করিয়াছেন তাহা কোন পক্ষে প্রযুজ্য তাহার বিচারের ভার পাঠকদের উপর।

কমলাকান্ত আপিঙ চড়াইয়া সপ্তমী পূজার দিন প্রতিমাদর্শনে বাহির হইলেন—মৃন্ময়ী প্রতিমার মধ্যে দেশ-মাতৃকার সন্ধান পাইয়া তিনি স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। এই স্তবের মধ্যেই তিনি বলিয়াছেন—

‘দিগ্‌ভুজা, নানাপ্রহরণপ্রহারিণী শত্রুমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞান-মূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়,

কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম এই স্বর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।'

ইহার উপর তো আর কথা নাই—তারপর ভক্তিগদগদচিত্তে বলিতেছেন—

'তুমি এই অনন্ত জলমণ্ডল ত্যাগ করিয়া এই বিশ্ববিমোহিনী মূর্তি একবার জগৎসমীপে প্রকাশ কর।'

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি ভুবনমনোমোহিনী আর বিশ্ববিমোহিনীর মধ্যে পার্থক্য আছে নাকি?

এই সকল অসার আলোচনায় প্রবর্তকের পৃষ্ঠা পূর্ণ করিতে আমরা বেদনা অনুভব করি, কিন্তু বাধ্য হইয়া এইটুকু লিখিতে হইল।"

অতঃপর ভারতী ১৩২২ পৌষ সংখ্যায় এই বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিত হয়—

"রূপ বলতে কি শুধু কটাক্ষচঞ্চলা যৌবনপ্রধানা ষোড়শীর মাংসত্বকের রূপই বুঝায়? মাতৃত্বের কি পবিত্ররূপ নেই? সে রূপ কি ভুবনমনোমোহন হতে পারে না? তাছাড়া প্রত্যেক হিন্দু যাকে দেশমাতৃকার চেয়ে অনেক বড় মনে করে থাকেন, সেই জগন্মাতাকে ষোড়শী ভুবনেশ্বরীরূপে পূজা করবার পদ্ধতি এদেশের সাধকরা কি প্রতিষ্ঠা করে যাননি? কবির দেখা মাতৃত্বের যে রূপের মধ্যে পরতে পরতে পবিত্রতা ফুটে উঠেছে, যে মাতৃত্বের বন্দনায় দেশবাসীর হৃদয় ভক্তিশ্রদ্ধায় প্রণত হয়েছে, তার মধ্যে যিনি কুৎসিত ইঙ্গিতের আরোপ করতে এতটুকু লজ্জিত হন না, বঙ্কিমের ভাষায় তাকে বলতে হয়, 'কবি এখানে অশ্লীল নয়, এখানে পাঠকের হৃদয় নরক।'

কেবল রবীন্দ্রনাথই যে দেশজননীকে ভুবনমনোমোহিনী বলেছেন তা নয়। আধুনিক কবি দ্বিজেন্দ্রলাল নিচের লাইনটি লেখবার সময় কিছুমাত্র সংকোচের ভাব মনে আনেননি—

জয় মা জগন্মোহিনী জগজ্জননী ভারতবর্ষ।

অন্যত্রও তিনি দেশজননীর মনোমোহন রূপ দেখতে একটু লজ্জাবোধ করেননি। কারণ এর মধ্যে লজ্জার কিছুই নেই। তারপর আমাদের প্রাচীন সাধককবিদেরও সকলেই জননীকে এইভাবেই বন্দনা করেছেন। যথা রামপ্রসাদী গানে

তাই কালোরূপ ভালবাসি

শ্যামা জগমনোমোহিনী এলোকেশী।

কেলে মা মোর বিরাজে পূর্ণিমার শশী।

সাধক কমলাকান্তের শ্যামাসংগীতেও ঐ একই কথা শুনি—

কালী জগমনোমোহিনী মুক্তকেশী

মায়ের বদনশশী মধুর হাসি

সুধা ক্ষরে রাশি রাশি।

বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গা তারা ও অম্বিকা প্রভৃতি নানা নামে জগন্মাতাকে সম্বোধন করে, সেই সকল রূপের মধ্যেই দেশমাতৃকার রূপ দেখেছিলেন। ধর্মসাধকের হৃদয়ে শ্যামার যে আসন, স্বদেশসাধকের কাছেও জন্মভূমির সেই আসন। দুজনেই প্রাণের আবেগে বিভোর হয়ে বলেছেন, আমার মায়ের রূপে ভুবন আলো। এমন স্বর্গের আলোয় যে মনের কালো যায় না, সে মন অতি ভয়ংকর কুৎসিত মন বলতেই হবে।"

'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' গান রচনার দুই দশক পরে এই গানটি সম্পর্কে রবীন্দ্রবিরোধী সমালোচনায় যে বিকৃত অপব্যাখ্যা ঘটেছিল তার উদাহরণ শুধু এই কথাই প্রমাণ করে, দেশাত্মবোধক সংগীতরচনায় রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত রীতিকে কতখানি উল্লঙ্ঘন করেছিলেন। তাঁর 'জনগণমনঅধিনায়ক জয় হে' অধুনা ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত, কিন্তু সেই গানখানিও একদিন তীব্র বিদ্বেষপরায়ণ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল। এই গানের 'ভারতভাগ্যবিধাতা' শব্দের উদ্দিষ্ট সম্রাট পঞ্চম জর্জ এইরূপ অভিযোগ শুনতে হয়েছিল ভারতবর্ষের সেই একমাত্র ব্যক্তিকে, যিনি ব্রিটিশ রাজশক্তির চরমতম বর্বরতায় ঘৃণাভরে নাইট উপাধি একদিন পরিত্যাগ করেছিলেন। সেই বিবাদ-বিতর্কের ইতিহাস রবীন্দ্রজীবনীর চতুর্থ খণ্ড সংযোজনীতে এবং অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের 'ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত' পুস্তিকায় সংকলিত আছে।

৫

জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার কালে লিখিত ও প্রকাশিত গানগুলির মধ্যে 'আজি বাঙলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি' এবং 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' গান দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম গানটি স্বসম্পাদিত ভাণ্ডার পত্রের ১৩১২ ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় এবং দ্বিতীয়

গানটি 'বাউল' (১৯০৫) নামক ক্ষুদ্র গীতসংকলনে প্রকাশিত হয়। 'আজি বাঙলাদেশের হৃদয় হতে' গানখানি 'আমার সোনার বাঙলার'ই সমসাময়িক, একই মাতৃঅনুগত চিত্তের যুগলপ্রসূতি। 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' গান রচনার ইতিহাসপ্রসঙ্গে আমরা জেনেছি যে দশভুজার সঙ্গে দেশমাতৃকাকে মিলিয়ে দিয়ে শারদীয়-প্রতিমার নূতন বোধনউৎসব উপলক্ষে কবিকে একটি গান রচনার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। ধর্মের দিক থেকে কবি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেননি, লিখেছিলেন 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী।' কিন্তু বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন উপলক্ষে দেশমাতৃকার মূর্তিগ্রাহ্য রূপকল্পকে কবি আর অবহেলা করতে পারেননি, বিমূর্ত বিশ্বাসের কবিকেও অন্তত একবার স্বদেশচেতনার কাছে পৌত্তলিক হতে হল। রামেন্দ্রসুন্দর যে বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা প্রচলিত করলেন, সেখানেও পৌরাণিক লক্ষ্মীমূর্তির সঙ্গে মাতৃভূমির একাত্মীভবন ঘটল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশভূমক গানে দেশকে জননীরূপে দেখেছেন, মাতৃমূর্তির মানবিক বর্ণনা সেক্ষেত্রে পৌত্তলিক বলে মনে হয় না। কিন্তু এই একটিমাত্র গানে কবি মাতৃমূর্তির যে ঐশ্বর্যময়ী প্রতিমাখানি নির্মাণ করেছেন, অন্তত সাহিত্যের দিক থেকে তার তুলনা নেই। কোনো শাস্ত্রীয় বর্ণনার সাহায্যে কবি রূপপ্রতিমা গড়ে তোলেননি। বঙ্গভূমির হৃদয়-নিঃসৃত এই দেবীরূপখানি বঙ্গবাসীর গভীর স্বদেশানুরাগের মৃত্তিকা ও অনুরাগের নয়ন-সলিলে নির্মিত, কবির সৌন্দর্যচেতনার তুলিকায় এই প্রতিমার মুখশ্রী অঙ্কিত হয়েছে। এই স্বর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা দ্বিভুজা, দক্ষিণ হস্তে তাঁর প্রহরণ, বামহস্তে বরাভয়, দুই নয়নে স্নেহবৎসলতা, ললাটনেত্রে অরাতিনিসূদন অগ্নিতেজ, বজ্রসম্ভব মেঘপুঞ্জ তাঁরই আলুলায়িত কেশদাম, রৌদ্রাংশুক অঞ্চল নীলাম্বর-প্রান্তে বিতত করে এই মা স্বর্ণদেউলের মুক্তদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন। কী গর্বে-গৌরবে বঙ্গবাসীর এই গরীয়সী চিৎপ্রতিমাটিকে কবি অপরূপ সুরে স্থাপিত করেছেন। সমগ্র বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের গীতসংখ্যার মধ্যে বোধ হয় এই একটি গান রচনা করলেই রবীন্দ্রনাথ স্মরণীয় হয়ে থাকতেন।

'সার্থক জনম আমার' অন্য ধরনের গান। এ গান মাতৃবন্দনা বা জননীস্তব নয়, দেশের প্রতি গভীরনিবিড় অশ্রুরুদ্ধ ভালোবাসায় এই-জন্মের প্রতি কৃতজ্ঞতার গান। এই বঙ্গভূমির পল্লীনিভৃত ছায়ান্ধকার স্নেহকুঞ্জে, সুগন্ধ-ব্যাকুল অরণ্যকান্তারে, চন্দ্রকরোজ্জ্বল নভোতটে কবি তাঁর ভালবাসাকে ধূপ-সৌরভের মত ধীরে ধীরে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এমন মুহূর্ত আসে আমাদের

জীবনে যে মুহূর্তে মনে হয় মৃত্তিকাকে দুহাতে আলিঙ্গন করি, আপনাকে বিগলিত করে এই বাঙলার নদীস্রোতে মিশে যাই, ধূলি হয়ে ছড়িয়ে পড়ি ; মনে হয় এই-জন্মের মত পুণ্যায়ু নশ্বর আশ্চর্য অপ্রত্যাশিত নরজন্ম ইহলোকে আর কেউ কোনদিন যেন পায়নি। সেই ক্ষণজন্ম আবেগকে একটি গানের দূরপ্রসারী, কম্পমান, ব্যথাকাতর, প্রকাশব্যগ্র সুরে সঞ্চার করে দেওয়ার—সেই অনুভূতিকে অপরের চিত্তে অনুরূপভাবে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়ার সার্থক সংগীত 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।'

স্বদেশ-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য গানের মধ্যে 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে' রাজা নাটকের (১৩১৭ পৌষ) গান। ঠাকুরদার কণ্ঠে গীত এই গানে বলা হয়েছে যে, সার্থক নরপতি তাঁর প্রজাদের প্রতি গণ-তান্ত্রিক অধিকারদানে কার্পণ্য করেন না। প্রায়শ্চিত্ত নাটকে (১৩১৬) ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'রইল বলে রাখলে কারে' গানটিকেও কবি স্বদেশ-পর্যায়ের অন্তর্গত করেছেন। উদ্ধত প্রজাপীড়ক প্রতাপাদিত্যের মুখের উপর অমোঘ দণ্ডদাতা ইতিহাসবিধাতার চরমদণ্ডের নির্দেশ স্মরণ করিয়ে ধনঞ্জয় এই গান গেয়েছিলেন। ১৯৩১ সালে কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে ও বিশ্বভারতীর প্রযোজনায় নবীন গীতিনাট্যের অভিনয় ও জাপানি জুজুৎসু প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। সেই শারীরিক স্বাস্থ্যবিদ্যার প্রতি উৎসাহাধিক্যেই 'সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান' গানটি কবি ব্যবহার করেছিলেন। 'নাই নাই ভয় হবে হবে জয় খুলে যাবে এই দ্বার' গানখানি সাধারণভাবে উদ্দীপনার—কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই গানের প্রেরণায় স্বাধীনতা-আন্দোলনের কোনো স্পর্শই ছিল না। ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ মিউনিকে এই গানটি কবি রচনা করেন। 'হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে' গীতাঞ্জলি পর্বের গান, ১৮ আষাঢ় ১৩১৭ তারিখে রচিত। 'জনগণমনঅধিনায়ক' গানটির রচনাকালও ১৩১৮ সালের কাছাকাছি। ১৩২৪ সালের ২৬ শ্রাবণ 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী', এবং 'মাতৃমন্দির-পুণ্য অঙ্গন' গানটি আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্মদিন ও বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে একটি পুরাতন গান অবলম্বনে ১৪ অগ্রহায়ণ ১৩২৪ তারিখে রচিত হয়। 'চলো যাই চলো যাই' এবং 'শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান' গান দুটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে সময়োপযোগী গীতরচনার অনুরোধে লিখে দিয়েছিলেন—রচনাকাল ২৭ জানুয়ারি ১৯৩৮।

মোটামুটি স্বদেশ-পর্যায়ে পরিচিত রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক সংগীতবিষয়ে

রচনাকালীন জ্ঞাতব্য তথ্যাদি পেশ করা হল। সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক কাব্যসংগীতগুলির পর্যালোচনা করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসি—

প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী-আন্দোলনের সঙ্গে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের কাল পর্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কর্মকাণ্ড থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে আনেন এবং নিরপেক্ষ দর্শকের মত ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের ভাষ্যরচনা করে চলেন শেষ জীবন পর্যন্ত। স্বদেশের প্রতি, স্বদেশবাসীর প্রতি, মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও গণমুক্তির প্রতি একান্ত অনুরক্ত থেকেই কবি আমাদের রাজনৈতিক বিক্ষোভের ত্রুটিবিচ্যুতির সমালোচনা করেছেন, দেশনায়কদের কার্যাবলীর বিচারবিশ্লেষণ করেছেন, সত্যসন্ধ দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ ইতিহাসের গতিপথ নির্ণয় করেছেন। কিন্তু আন্দোলনের পক্ষপুটে না থাকার জন্য তেমন করে আর স্বদেশী গান সৃষ্টি করতে পারেননি, অথবা করেননি।

দ্বিতীয়ত, জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে নানা সময়ে রচিত তাঁর বহুগান স্বদেশী আন্দোলনের প্রেরণারূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সেগুলি সাধারণভাবে জাতীয় জাগরণের গান, প্রগতির গান—দুঃসহ পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামী আন্দোলনের প্রেরণা থেকে উৎসারিত নয়।

তৃতীয়ত, তাঁর অধিকাংশ দেশাত্মবোধক গানে কবি লোকায়ত সুর ব্যবহার করেছেন। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের কিছুকাল পূর্ব থেকেই বাঙলা লোকগীত, বিশেষ করে বাউল-ভাটিয়ালি-সারি গানের সুর তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ দেশাত্মবোধক গানগুলি এই সব লোকগীতের সুরেই জনগণহৃদয় আন্তরিকভাবে স্পর্শ করেছিল। যে সব গানে তিনি ক্লাসিকাল রাগরাগিণী ব্যবহার করেছেন সেগুলি তত জনপ্রিয় হতে পারেনি। যেমন, আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে (হাম্বীর), আজি এ ভারত লজ্জিত হে (ভূপালী), এ ভারতে রাখো নিত্য প্রভু তব শুভ আশীর্বাদ (সুরট) ইত্যাদি।

চতুর্থত, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনার সঙ্গে ধর্মবোধ মনুষ্যত্ব এবং ঈশ্বর-চেতনার অঙ্গাঙ্গী যোগ আছে। ইতিহাসবিধাতার এক অমোঘ সত্যের বিধানেই আমাদের আত্মকর্তৃত্ব অর্জন সম্ভব হবে, মনুষ্যত্বঘাতী বর্বর প্রভুর ত্রাসন্ত্র চিরস্থায়ী হতে পারে না—একথা তিনি বিশ্বাস করতেন। তাই 'বিধির বাঁধন

কাটবে তুমি এমনি শক্তিমান'—ইংরাজ শাসনের ঔদ্ধত্যের প্রতি তাঁর এই জিজ্ঞাসা। একথা তিনি বিশ্বাস করতেন—

শাসনে যতই ঘেরো আছে বল দুর্বলেরও,
হও না যতই বড় আছেন ভগবান।

তাই অপশাসনের বোঝা ভারি হলে তার ভাগ্যের তরী আপনি ডুববে, এই ছিল কবির প্রত্যয়। গণআন্দোলনের সংগ্রামশক্তিকে তিনি অবহেলা করেননি, কিন্তু সর্বোপরি এই দার্শনিক প্রত্যয়ের জন্যই কবি প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনে জড়িত থাকতে পারেননি। 'আমি ভয় করব না ভয় করব না' গানে স্বাধীনতাকামী দেশবাসীর নির্ভীকতার এই প্রেরণা তিনি নির্দেশ করেছেন—'ধর্ম আমার মাথায় রেখে চলব সিধে রাস্তা দেখে'। 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী' গানে 'জাগ্রত ভগবানে'র প্রতি প্রার্থনাই কবির ধ্রুবপদ। তাই 'জনগণমনঅধিনায়ক' গানে যে ভারতভাগ্যবিধাতার জয়ঘোষণা করা হয়েছে তিনি ব্রহ্ম।[৩] অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছেন—

"মানবের ভাগ্যবিধাতা বিশ্বেশ্বর বা ত্রিলোকনাথ বা ব্রহ্মই এই গানে ভারতবিধাতা বলে বর্ণিত ও বন্দিত হয়েছেন।…রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রীতি যে ধর্মনিরপেক্ষ নয়, একথা সুবিদিত"।[৪]

'আমাদের যাত্রা হল শুরু' গানে যে কর্ণধারকে প্রণতি জানানো হয়েছে তিনিও ঈশ্বর।

এই কারণেই মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় ১৯১২ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় সম্পাদক মহাশয় মন্তব্য করেছিলেন—

…his politics and his spiritual ministrations merge in each other.

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসবউপলক্ষে প্রকাশিত জয়ন্তী-উৎসর্গ গ্রন্থে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কবির দেশাত্মবোধক গানগুলির যে পর্যালোচনা করেছিলেন, তার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-পর্যায়ের গানগুলির আলোচনায় বিরতি টানা যেতে পারে—

"তাঁহার রচিত স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশভক্তিবিষয়ক গানগুলি অতীব প্রাণস্পর্শী। ভারতবর্ষের ইতিহাস এরূপ যে, আমাদের জাতীয় সংগীতে বীররসের সঞ্চার করিতে হইলেই ভারতবাসী কোন না কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে মনকে উত্তেজিত না করিয়া বীরত্বব্যঞ্জক গান রচনা করা

কঠিন। কিন্তু এরূপ গান সমগ্র জাতির পক্ষে কল্যাণকর এবং সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে প্রীতিকর ও উৎসাহবর্ধক হইতে পারে না। তদ্দ্বারা সম্প্রদায়-বিশেষ ক্ষণিক উত্তেজনা, উৎসাহ ও তৃপ্তি লাভ করিলেও তাহা জাতিগঠনের অনুকূল হইতে পারে না। এই প্রকারের বীররসাত্মক গান রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন নাই ভালই করিয়াছেন। কিন্তু তা বলিয়া বীরত্বসঞ্চারী কোন গানই যে তিনি রচনা করেন নাই, এমন নয়। সাহস, নির্ভীকতা, অপরের জন্য আত্মোৎসর্গ, স্বদেশবাসীর ও অপর মানবের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের বিকাশে ও প্রকাশে অটল বিশ্বাস বীরত্বের প্রধান উপাদান। এই সব উপাদান তাঁহার স্বদেশী গানগুলিতে, কথা ও কাহিনীতে, নৈবেদ্যে ও অন্য রচনায় প্রচুর পরিমাণে আছে। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' এ শিক্ষা তাঁহার মত আর কে দিয়াছে? আমাদের শৃঙ্খল অন্যে যত দূর করিবার চেষ্টা করে, আমাদের আভ্যন্তরীণ বন্ধন তত টুটিয়া যায়। 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান'? এ প্রশ্ন তাঁহার মত দৃঢ়স্বরে আর কে করিয়াছে? তাঁহার রচনাবলীর অসামান্য সংযম ও সুষমা এবং তৎসমুদয়ে বাহ্য হাঁকডাক স্পর্ধা বীরত্বোচ্ছ্বাস ও আস্ফালনের অভাব আমাদিগকে অনেক সময়ে ভুলাইয়া দেয় যে তাহাদের মধ্যে কিরূপ শান্ত সংযত আত্মসংবৃত অটল বীরত্ব নিহিত আছে।...তাঁহার স্বদেশপ্রেমে সংকীর্ণতা, অতীত গৌরবের অতিপূজা এবং বিদেশ ও বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষ অবজ্ঞা নাই।"

জাতীয়তাবোধ নিয়ে পঞ্চাশোর্ধে কবি আর কোনো সংগীত রচনা করেননি। তাসের দেশকে দেশপ্রেমের পটভূমিকায় বলিষ্ঠ প্রহসনাত্মক ব্যঙ্গনাট্যে পরিণত করার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা রোমান্টিক রূপকথা হয়েই রইল। 'খরবায়ু বয় বেগে চারিদিক ছায় মেঘে' এই উদ্বোধনী গান ঐ নাটকের লঘু চপল সুরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রক্ষা করেনি।[৫] প্রৌঢ় বয়সে ন্যাশানালিজমকে তিনি এড়িয়ে চলেছেন—তখন তিনি বিশ্বপথিক। সে রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্র অন্যত্র। শেষ বয়সে কবি 'ঐ মহামানব আসে' এই মানববন্দনা লিখেছিলেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে মনুষ্যত্বের প্রতি কবির দৃষ্টি সমস্ত স্বাদেশিকতার সংকীর্ণ সীমা উত্তীর্ণ হয়েছিল। তথাপি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস তাঁর কাছে কত স্বচ্ছ ছিল, ইংরাজ শাসনের অন্তঃসারশূন্য ভবিষ্যৎ কত স্পষ্ট ছিল 'সভ্যতার সংকট' পড়লেই বোঝা যায়। 'ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্যশাসনের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে

তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে'—স্বদেশের প্রতি এই সুগভীর মমতাই তাঁর সর্বশেষ গদ্যভাষণকে সত্যের এমন অকপট নির্ভীকতা দান করেছে। অপরাজেয় মানুষের জয়যাত্রার অভিযানের কল্পনা নিয়েই তিনি চলে গেছেন। তবু যাবার আগে তাঁর ক্লান্ত বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ভারতবর্ষই ছিল, ছিল এই পূর্বাচল—'মহাপ্রলয়ের পর বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের যে নির্মল আত্মপ্রকাশ' তিনি কল্পনা করে গেছেন, তাঁর শেষ বিশ্বাস ছিল, তা 'হয়ত আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকেই'।

১। স্বদেশী আন্দোলন ও স্বদেশী গানের বিস্তারিত আলোচনা পূর্ববর্তী উনিশ শতকের স্বদেশী সংগীতবিষয়ক আলোচনায় দ্রষ্টব্য। বাহুল্যবোধে কোনো কোনো প্রসঙ্গ এখানে পুনরুক্ত হয়নি

২। পুলিনবিহারী সেনের নিকট রবীন্দ্রনাথের পত্র. রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ডে উদধৃত

৩। ১৩১৮ মাঘ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় গানটি প্রথম প্রকাশিত হয়. শিরোনাম 'ভারতবিধাতা', নিচে 'ব্রহ্মসংগীত' লেখা। ১৯১৪ সালের ধর্মসংগীত গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯১১ সালের কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে (২৭ ডিসেম্বর) গানটি উদ্বোধন সংগীতরূপে গীত হয়েছিল

৪। ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত—প্রবোধচন্দ্র সেন

৫। তাসের দেশ (১৩৪৫) দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করে কবি লিখেছেন—"স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ. সেই কথা স্মরণ করে তোমার নামে তাসের দেশ নাটিকা উৎসর্গ করলুম।"

রবীন্দ্রসংগীতে লোকায়ত প্রভাব

১

বাঙলা লোকসাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম উনিশ শতকের শেষ দিকে শিক্ষিত বাঙালির মনোযোগ ও গবেষণার উদ্দীপনা জাগ্রত করেছিলেন। কবিজীবনের সূচনা থেকে শেষ বয়স পর্যন্ত বাঙলা লোকসাহিত্য-লোকসংগীত ও লোকসংস্কৃতি রবীন্দ্রনাথের মনীষা ও সারস্বত চেতনায় এক অনন্যসাধারণ মহিমা এবং তাৎপর্য নিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছিল। লোকসাহিত্যের মানবধর্মী আবেদন, রূপকথার বিবিধ রূপকল্প, ছড়ার সৌন্দর্য ও সাহিত্যমূল্য কবির সাহিত্যসাধনার উপর গভীর ও অবিশ্রান্ত ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল।[১] পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে জমিদারি-পরিদর্শন-উপলক্ষে কবি প্রথম পল্লীবাঙলার হৃৎকেন্দ্রে বসতিস্থাপন করার পর থেকে বাঙলা লৌকিক সুর ও কথার সঙ্গে পরিচিত হতে থাকেন এবং তখন থেকেই তাঁর সংগীত সেই সকল গানের দ্বারা সংক্রামিত হয়। এই প্রভাব ক্রমশই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনাদর্শের মধ্যে বাউল সাধনা কী নিবিড়ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, সে বিষয়ে অনেকেই অবগত আছেন। লোকজীবনের রস-আবেদন ও মানবিকতাবোধ, জাতীয় জীবনের সুখদুঃখ, বেদনা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তার লোকসাহিত্যের মধ্যেই সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয় এ সত্য কবির অজ্ঞাত ছিল না বলেই বারবার শিক্ষিত সমাজকে তিনিই এই বিষয়ে অবহিত করেছেন। লোক-সাহিত্যই জাতির যথার্থ ইতিহাস ও জীবনীশক্তির উপাদান বহন করে। এই লোকসাহিত্যের প্রাণরসের দ্বারাই শিষ্ট সাহিত্য শক্তি গতি ও প্রেরণা লাভ করে থাকে। উচ্চগ্রামের মননশীল সাহিত্যে তথা শিক্ষিত সমাজের সারস্বত চেতনায় লোকায়ত চেতনা গভীরভাবে অনুস্যূত হয়ে থাকে। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতি শিল্পগত আকর্ষণ বা শ্রেণীগত সাদৃশ্য, ভাষা ও ছন্দোগত আঙ্গিক, রূপকল্প-আহরণ, লোকসাহিত্যের মোটিফ, লোকায়ত প্রকাশভঙ্গির অনুকরণ—এগুলির দ্বারাই রবীন্দ্রসাহিত্যে লোকসাহিত্যের প্রেরণা ও প্রভাব সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি। লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখা রূপকথার প্রতি কবির তরুণ মনের আকর্ষণ তাঁর নিতান্ত অপরিণত বয়সের সাহিত্যচিন্তাতেই গড়ে উঠেছিল। কালক্রমে সে আকর্ষণ তীব্রতর হয়েছে।

ছিন্নপত্র-সাধনার যুগে বাঙলার ঘরোয়া রূপকথাগুলি তিনি ভালো করে জানেন না বলে আক্ষেপ করেছিলেন। সোনার তরীতে তাঁর কয়েকটি রূপকথাময়ী কবিতা লেখার উদ্যম আছে। গল্পগুচ্ছের 'একটি আষাঢে গল্প' সম্পূর্ণ ই রূপকথার টেকনিকে লেখা। ১৩১৪ সালে দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার মহাশয় সংকলিত রূপকথার সংকলন 'ঠাকুরমার ঝুলি' প্রকাশিত হলে তিনি গভীর তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করেছিলেন। জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও লৌকিক কল্পনা তাঁর সমগ্র সাহিত্যের মৌল উপাদান। লালন বাউলের একটি গানে আছে, কথা কয় রে ধরা দেয় না—রাজা নাটকেরও মূলে যেন এই তত্ত্বই নিহিত। লোকসংগীতের প্রভাব তাঁর সারা জীবনের সংগীতে ছড়িয়ে আছে। ছড়ার ছন্দ ও বৈশিষ্ট্য তিনি তাঁর সংগীতে এবং কবিতায় আত্মসাৎ করেছেন। তাঁর প্রথম জীবনের কাহিনীকাব্যগুলি এক জাতীয় ব্যালাড।

১২৯১ সালের শেষ দিকে বৌঠাকুরাণীর হাট লেখার পর রবীন্দ্রনাথ সংগীত-সংগ্রহ নামক একখানি গীতসংগ্রহের সমালোচনাপ্রসঙ্গে বাঙলার লোক-সাহিত্যের ও লোকসংগীতের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই প্রবন্ধ রচনার কয়েক মাস পরে কবি বাঙলার গ্রাম্যগীতসংগ্রহের জন্য দেশবাসীর কাছে সনির্বন্ধ আবেদন জানান।[২] এরও দশ বছর পর ভারতীতে ১৩০১ আশ্বিনে বাঙলার ছড়ার উপর তাঁর অসাধারণ আলোচনাটি প্রকাশিত হয়। বাউলসাধনা ও বাউল সংগীতের প্রতি বহুকাল যাবৎ তাঁর অন্তরের অনুরাগ ও আকর্ষণ ছিল। মুহম্মদ মনসুরউদ্দিনের বিখ্যাত লোকগীতসংগ্রহ 'হারামণি'র (বৈশাখ ১৩৩৭) ভূমিকায় কবি লিখেছিলেন—"বাউলের সুর ও বাণী কোনো এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে" (১৩৩৪)। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গেও কবি একবার বাউলদের প্রতি তাঁর কবিপ্রাণের অনুরাগ ব্যক্ত করেছিলেন। ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথের 'বাউল' নামক একটি গীতসংকলন মজুমদার লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়। এতে কয়েকটি তৎকালীন জনপ্রিয় দেশাত্মবোধক গান সংকলিত হয়েছিল। এছাড়াও ক্রিয়েটিভ ইউনিটির অন্তর্গত 'এ্যান ইণ্ডিয়ান ফোক্ রিলিজিয়ান' (১৯২২) প্রবন্ধে, মডার্ণ রিভিউর জানুয়ারি ১৯২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত ভারতীয় দর্শনকংগ্রেসের ১৯২৫ সালের বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণে, রিলিজিয়ান অফ ম্যান (১৯৩০) বক্তৃতায়, মানুষের ধর্ম গ্রন্থে (১৯৩৩) ও অন্যান্য স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে কবি বাঙলার বাউল ও বাউলসাধনা সম্পর্কে তাঁর অনুরক্তি

বিবরণ দিয়েছেন। অবশ্য এই সব আলোচনায় বাউলসাধনার তান্ত্রিক ক্রিয়া-চার বা পদ্ধতি-বিষয়ে কবি কোন ইঙ্গিত দেননি, কারণ এগুলিকে তিনি বাউল-সাধনায় প্রক্ষিপ্ত মনে করতেন। শা[illegible]ক বিচারআচার ও পূজার্চনার সঙ্গে বিরোধই বাউলের ধর্ম। এক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনাও ব্রাত্য। বাউলদের আচারহীনতা রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল, 'তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে থাকি'। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই ধরেছিলেন, মনের মানুষের জন্ম ব্যাকুলতাই বাউলদের চরম কথা। 'আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে—' এই বাউল গানের ঢঙেই কবি গেয়েছেন—

ও আমার মন যখন জাগলি নারে
তোর মনের মানুষ এল দ্বারে।

পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাউল সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও সাধনা এক হলেও গানের সুরের দিক থেকে পার্থক্য আছে। পশ্চিমবঙ্গের বাউল গান নৃত্যময়, নাচের সঙ্গে গান সেখানে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। কিন্তু পূর্ববঙ্গের বাউল গানে নৃত্য নেই, সেখানে সুর আছে তালের খুব একটা গুরুত্ব নেই। রবীন্দ্রনাথের কর্মসাধনার বৃহত্তর অংশ কেটেছিল শান্তিনিকেতনে—আর বীরভূম কেবল বাউলদের পীঠস্থান নয়, উদ্ভবতীর্থও বটে। রবীন্দ্রনাথের গোড়ায় গলদ নাটকের 'ওগো তোমরা সবাই ভালো', বিসর্জন নাটকের 'আমারে কে নিবি ভাই সঁপিতে চাই আপনারে' এই দুটি রবীন্দ্রনাথের একেবারে প্রথম যুগের বাউল সুরের গান। ১৩১২ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময় কবি ব্যাপক-ভাবে বাউল সুরের দ্বারা প্রভাবিত হন। তাঁর তৎকালীন অধিকাংশ জাতীয় সংগীতের জনপ্রিয়তা এই বাউলাঙ্গ সুরের উপরই নির্ভরশীল ছিল। শুধু সুর নয়, বাউলের বাণী ও ভাবনাকে কবি যে কত গভীরভাবে তাঁর গানে ব্যবহার করেছেন, তা ভাবলে অবাক লাগে। মনের মানুষ, প্রাণের মানুষ, সহজিয়া জীবনানন্দ প্রচার, বন্ধনহীনতা, সংস্কারমুক্তি, মনকে সম্বোধন করা এই বৈশিষ্ট্য-গুলি রবীন্দ্রনাথের পূজা-পর্যায়ভুক্ত অধিকাংশ বাউল শিরোনামার গানে পাই। আমি কান পেতে রই, আমি তারেই খুঁজে বেড়াই, সে যে মনের মানুষ, আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে, ও আমার মন যখন জাগলি নারে, আমি তারেই জানি, জানি তোমার প্রেমে, তোমার খোলা হাওয়া, আমি যখন ছিলেম অন্ধ, মন রে ওরে মন—এই সব গান কবির বাউলপ্রাণতার অভ্রান্ত প্রমাণ।

২

অবশ্য বাউল ও দেহতত্ত্ববিষয়ক গান, লোকায়ত আধ্যাত্মিক অনুভূতির গান, লোককবির রচনায় ঈশ্বরচেতনার সহজিয়া প্রকাশ, লোকসংগীতে প্রেমের স্বভাবগত আত্মবিকাশ কবিকে যে ছোট বয়স থেকে আকর্ষণ করেছিল, তার কারণ কেবল লোকায়ত জীবনদর্শনের প্রতি তাঁর চিত্তের একাত্মতা নয়, বরং মানবস্বভাবের সার্বভৌমতার দাবি। আশ্বিন ১২৯১ ভারতী পত্রিকায় সংগীতসংগ্রহ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের সমালোচনায় বাউলের গান নামক প্রবন্ধে কবি লিখেছিলেন—

"প্রাচীন কবিতার মধ্যে আমাদের হৃদয়ের ঐক্য দেখিতে পাইলে আমাদের হৃদয় সেই প্রসন্নতা লাভ করে। অতীতকালের প্রবাহধারা যে হৃদয়ে আসিয়া শুকাইয়া যায় সে হৃদয় কী মরুভূমি।"

অবশ্য এই বয়সে বাউল গানের তত্ত্বান্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার কবির হয়ত ছিল না। কিন্তু বাঙলার গ্রামীণ গীত লোকসংগীত সংগ্রহে তিনি যে এই সময় থেকেই উদ্যোগী হয়েছিলেন, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। পূর্বোক্ত প্রবন্ধেই কবি লিখেছিলেন, "গ্রাম্য গাথা ও প্রচলিত গীতসমূহ (যে বিষয়ের ও যে সম্প্রদায়েরই হউক না কেন) সকলে মিলিয়া যদি সংগ্রহ করেন, তবে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বিস্তর উপকার হয়। আমরা আমাদের দেশের লোকদের ভালো করিয়া চিনিতে পারি, তাহাদের সুখদুঃখ আশাভরসা আমাদের নিকট নিতান্ত অপরিচিত থাকে না।" কবি স্বয়ং বৈশাখ ১২৯০ সংখ্যা ভারতীতে কয়েকটি স্বসংগৃহীত লোকগীত প্রকাশ করেন এবং জ্যৈষ্ঠ সংখ্যাতে পাঠকদের প্রেরিত কয়েকটি অনুরূপ পদ মুদ্রিত হয়। ১৩২২ বৈশাখ সংখ্যা থেকে প্রবাসীতে 'হারামণি' বিভাগে কবি তাঁর সংগৃহীত 'আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে' গগন হরকরার এই গানটি প্রকাশ করেন এবং পরবর্তী কয়েক সংখ্যায় লালন ফকিরের কয়েকটি গান কবির সংগ্রহ থেকে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও কবির সংগ্রহে আরও বহু লোকগীত ছিল। 'হারামণি' বিভাগে কবির অনুরোধেই ক্ষিতিমোহন সেন ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে কয়েকটি লোকগীত তথা বাউল গান মুদ্রিত করেছিলেন।[৩] কবির সাহিত্যে নানাস্থানে বিচ্ছিন্ন বাউল গানের পংক্তি উদ্ধৃত দেখা যায়। জীবনস্মৃতির 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ' অধ্যায়ে কবি লিখেছেন যে, একদিন বোলপুরের রাস্তায় একটি বাউল গান শুনেছিলেন

খাঁচার মাঝে অচিন পাখি কমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।

এই গানটি সম্পর্কে তিনি সেখানে লিখেছেন—

"মাঝে মাঝে বদ্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়; মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু পারে না। এই অচিন পাখির নিঃশব্দ যাওয়া-আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে।"

গোরা উপন্যাসের সূচনাতেও এই গানটি আছে—কবি লালন ফকির এটির রচয়িতা। গানটি যে কবির বিশেষ প্রিয় ছিল তার প্রমাণ প্রৌঢ় বয়সে রচিত শেষ সপ্তকের তেরো সংখ্যক কবিতা, যেখানে আছে

রাস্তায় চলতে চলতে
বাউল এসে থামল
তোমার সদর দরজায়।
গাইল, অচিন পাখি উড়ে আসে খাঁচায়;
দেখে অবুঝ মন বলে—
অধরাকে ধরেছি।

শিশু ভোলানাথ (১৩২৯) গ্রন্থে 'বাউল' কবিতায় বাউলদের প্রতি কবির আকর্ষণের পরিচয় আছে। বাউলের মুক্তি তার নৃত্যে, যে নৃত্য আছে ঝড়ের দোলায় দোলায়িত বৃক্ষশাখে। বাউলের মুক্তি তার একতারার গানে, যে একতারাই তার গুরু। তাই কবির মুমুক্ষা রুদ্ধদ্বার গৃহে অন্তরীণ শিশুর কণ্ঠে প্রকাশ পেয়েছে—

মন যে আমার পালায়
তোমার একতারা পাঠশালায়— আমায় ভুলিয়ে দিতে পার?
নেবে আমায় সাথে?
এ সব পণ্ডিতেরই হাতে আমায় কেন সবাই মার?
ভুলিয়ে দিয়ে পড়া
আমায় শেখাও সুরে-গড়া তোমার তালা-ভাঙার পাঠ।
আর কিছু না চাই,
যেন আকাশখানা পাই, আর পালিয়ে যাবার মাঠ।

দূরে কেন আছ ?
দ্বারের আগল ধরে নাচ, বাউল আমারই এইখানে।
সমস্ত দিন ধরে
যেন মাতন ওঠে ভরে তোমার ভাঙন-লাগা গানে।

বাউলের একতারা কবির গানে বারবার ঝংকার তুলেছে—এই একতারা-টিকে তিনি প্রতীকরূপে ব্যবহার করেছেন পূজা ও প্রকৃতির গানে। একমনে তোর একতারাতে একটি যে তার সেইটি বাজা, আমার দোসর যে জন ওগো তারে কে জানে, আমার বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে, আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী, বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা প্রভৃতি গানগুলি এই মুহূর্তে রবীন্দ্রসংগীত-পাঠকের মনে পড়বে। প্রায়শ্চিত্ত-পরিত্রাণ-মুক্তধারার ধনঞ্জয় বৈরাগী প্রচ্ছন্ন বাউল মাত্র, তার গানের সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য একতারার নীরব ঝংকার শোনা যায়। তাছাড়া রাজা, ফাল্গুনী, অরূপরতন, প্রভৃতি নাটকে বাউল নামক একটি করে চরিত্রের আবির্ভাব ঘটেছে যারা নাট্য-বিষয়ে প্রবেশ না করে কেবল গান দিয়ে নাটকীয় তত্ত্বের দরজায় আঘাত করে গেছে, যদিও তাদের সব গান অনিবার্যভাবে বাউল সুরে রচিত নয়।

রবীন্দ্রনাথের উপর বাউল সুরের প্রভাব পড়ার পূর্ব থেকেই উনিশ শতকের শেষ তিন দশকে বাঙলাভাষায় শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত কবির হাতে বহু বাউল গান রচিত হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, কাঙাল ফিকিরচাঁদ বা হরিনাথ মজুমদার, মনোমোহন বসু, আনন্দচন্দ্র মিত্র, নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বা দ্বিজ নরেশচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, পাগলা কানাই, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (পরিব্রাজক), শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, গোলকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বা দীন বাউল, প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কালীনারায়ণ গুপ্ত, কৃষ্ণকান্ত পাঠক, অমৃতলাল বসু, কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি বহু কবি ও গীতকার-রচিত গানের তালিকায় একাধিক গান বাউল সুর বলে প্রাচীন গীতসংকলনগুলিতে উল্লিখিত আছে।[৪] বলা বাহুল্য এই সব শিষ্ট সাহিত্যিক বাউল গানের পিছনে মধ্যপশ্চিমবঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ বাউল-সাধক লালন ফকিরের (১৭৮৪-১৮৯০) প্রভাবই ছিল সর্বাধিক।

সুতরাং বাউল সুরকে রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাঙলা গানে প্রচলিত করেননি। কবির প্রথম জীবনের গানে যেখানে বাউল সুরের প্রভাব পড়েছে তা বাউলদের সঙ্গে সম্পর্ক-স্থাপনের পূর্বে, উনিশ শতকের বাউল সুরাশ্রিত নাগরিক গানের

প্রভাবেই। সেইজন্য সেইসব গানের বিষয়বস্তুতে গভীরতা বা মিষ্টিক অনুভূতির বদলে হালকা চালের ভাবনা ও ভাষা দেখা যায়। রাজা ও রানীতে 'যমের দুয়ার খোলা পেয়ে', বিসর্জনের 'আমারে কে নিবি ভাই সঁপিতে চাই', গোড়ায় গলদে 'যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে সেই আমাদের ভালো' প্রভৃতি গানগুলি রবীন্দ্রনাথের বাউলধর্মী গানের প্রথম পর্বের দুএকটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। ডকটর সুকুমার সেন লিখেছেন—"বাউল গানের ভাব ও ভঙ্গি পুরাপুরি দেখা গেল ক্ষ্যাপা তুই আছিস আপন খেয়াল ধরে গানে। বাউল গানের গভীরতায় তখনও কবি ডুব দেন নাই, এবং তাঁহার অধ্যাত্ম অনুভূতিতে তখনও মরমিয়া রঙ ধরে নাই।"[৫]

খেয়ার যুগ ও স্বদেশী গানের যুগেই বাউল সুর কবিজীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করল। এই সুরেই তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ দেশপ্রাণ গানগুলি রচনা করলেন, এই সুর দিয়েই জনজীবনের উত্তেজনাকে সংবদ্ধ করলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে কবির আত্মচৈতন্যে এল একটি অন্তর্মুখিতা, কোলাহল থেকে দূরে এসে নির্জন সাধনায় মগ্ন হওয়ায় আহ্বান। তখনও বাউলের একতারাই তাঁকে পথ দেখাল—'আমার নাই বা হল পারে যাওয়া'। খেয়ার কৃপণ কবিতায় 'ভিক্ষা করে ফিরতে ছিলেম গ্রামের পথে পথে' বাউলের চিত্রকল্প ছাড়া আর কিছু নয়। 'একমনে তোর একতারাতে একটি যে তার সেইটি বাজা'—কবি-আত্মা এই গানে সম্পূর্ণ বাউলেই রূপান্তরিত এবং এটিও খেয়ার 'সীমা' কবিতা। গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যের যুগে এসে কবির স্থায়ী বাসও বদলে গেল। নগরের সংক্ষুব্ধ জনতাসংঘ রাজপথ থেকে তিনি আশ্রয় নিলেন বীরভূমের রুক্ষগৈরিক রাঙা মাটির পথের ধারে। তাঁর গানের বসনেও বৈরাগ্যের গেরুয়া ছোপ গাঢ়তর হল। তাই কি এই পর্বে লেখা অচলায়তনে বাউলদের গুরুবাদ এসে পড়েছে, যে গুরু বাউলকে যথার্থ মুক্তির পথ দেখান?

কলকাতায় ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের সভায় সভাপতির অভিভাষণে ১৯২৫ সালে কবি লোকায়ত দর্শন সম্পর্কে যা বলেছিলেন, ১৩৩২ মাঘ সংখ্যা প্রবাসী থেকে তার অংশ উদ্ধৃত হল—

"আমাদের জনসাধারণ সহজেই তত্ত্বদর্শীকে কবিত্বের অধিকার দিয়া থাকে যখন তাহার ধীশক্তি প্রজ্ঞার আভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। আমাদের মহাকাব্য মহাভারত তাহার সাক্ষী।... একজন বিশেষ কবির খামখেয়ালী এখানে নাই, সমগ্র জাতির সাধারণ মনোভাব এখানে দেখিতে পাই।...

মুসলমান যুগেও এই ভারতে যে সব সাধুসন্ত আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার প্রায় প্রত্যেকেই গীতরসিক।

শৈশবে মনে পড়ে, একজন ভক্ত হিন্দু গায়কের মুখে কবীরেই এই গানটি শুনি—

পানীমে মীন পিয়াসী রে
মুকো শুনত শুনত লাগে হাঁসিরে।
পূরণ ব্রহ্ম সকল ঘটবরতে
ক্যা মথুরা ক্যা কাশীরে।

কবীরের এই উচ্চহাস্য সেই হিন্দু গায়কের ধর্মনিষ্ঠায় এতটুকুও আঘাত করে নাই। বরং কবীরের সঙ্গে তিনি একাত্ম··· তিনি বুঝিয়াছেন তীর্থ হিসাবে মথুরা বা কাশীর প্রতীকগত তাৎপর্য থাকিলেও চিরন্তন সত্য হিসাবে তাহাদের স্থান নাই।··

পূর্ববঙ্গে একটি গ্রাম্য কবির গানে দর্শনের একটি বড় তত্ত্ব পাই—সেটি এই যে, ব্যক্তিস্বরূপের সহিত সম্বন্ধসূত্রেই বিশ্বসত্য। তিনি গাহিলেন—

মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমীন;
শরীরে করিল পয়দা শক্ত আর নরম;
আর পয়দা করিয়াছে ঠাণ্ডা আর গরম।
নাকে পয়দা করিয়াছে খুশবয় বদবয়।[৬]

এই সাধক কবি দেখিতেছেন যে, শাশ্বত পুরুষ তাঁহারই ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাঁহার নয়নপথে আবির্ভূত হইলেন। বৈদিক ঋষিও এমনই ভাবে বলিয়াছেন যে,.যে পুরুষ তাঁহার মধ্যে তিনিই আদিত্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত।

রূপ দেখিলাম রে নয়নে আপনার রূপ দেখিলাম রে
আমার মাঝও বাহির হইয়া দেখা দিল আমারে।

এই সব তত্ত্বসংগীতের বিশেষত্ব এই যে, ইহা গ্রাম্য সাধারণের ভাষায় লিখিত এবং নিতান্ত অমার্জিত বলিয়া উচ্চ সাহিত্যকর্তৃক অবজ্ঞাত। এই সব গ্রাম্য গায়কেরা তত্ত্ববিদ্যার কোনো ধার ধারেন না, সেটা তাঁহারা বেশ একটু জোরের সঙ্গেই বলিয়া থাকেন।···

ফুলের বনে কে ঢুকেছে রে সোনার জহরি
নিকষে খসয়ে কমল আ মরি মরি।

ইহারা পথে বিপথে তাহাদের গান গাহিয়া ফেরে। একটি গান বহুকাল

পূর্বে শুনি, কিন্তু এখনও মনের মধ্যে গাঁথা হইয়া আছে—খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি কমনে আসে যায়। ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম তাহার পায়। এই গ্রাম্য কবি দেখি উপনিষদের ঋষিদের সঙ্গে একমত।…শেলির সেই কবিতাটির কথা স্মরণ করায় যাহাতে তিনি সুন্দরের অতীন্দ্রিয় আবেশের বন্দনা গাহিয়াছেন।

সেই অজানা দুরধিগম্য হইলেও যে সকল সত্যের মূল সত্য, তাহা এই বিখ্যাত ইংরাজ কবি এবং সেই অজ্ঞাতনামা বাঙালি বাউল উভয়েই বুঝিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার গ্রাম্য সংগীত সেই অজানা পাখির ডানার ছন্দে মুখরিত।"

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বাঙলার লোকধর্ম বাউল সাধনাকে তাদের গানের মধ্য দিয়েই অনুভব করে ভারতীয় দার্শনিকদের সভায় পেশ করলেন। পরবর্তীকালে অক্‌স্‌ফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতায়ও কবি এই লোকধর্মের কথা নতুন করে বলেছিলেন। সেখানে কবি যে মনের মানুষের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন, পূজাসংগীত প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে তার আলোচনা করা হয়েছে।

৩

১৩৩৪ সালের চৈত্রে মুহম্মদ মনসুরউদ্দিনের 'হারামণি' নামক লোকগীত-সংকলনের ভূমিকায় কবি অকপটে বাঙলার বাউল গান ও বাউল সাধনার প্রতি তাঁর কবিজীবনের আত্মীয়তার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন—

"শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউল দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিলন ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে বাউলের সুর ও বাণী কোন্‌-এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে। আমার মনে আছে, তখন আমার নবীন বয়স, শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল—

কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে!
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে: তং বেদ্যং

পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ। যাঁকে জানবার সেই পুরুষকেই জানো, নইলে যে মরণবেদনা। অপণ্ডিতের মুখে এই কথাটিই শুনলুম তার গেঁয়ো সুরে সহজ ভাষায়—যাঁকে সকলের চেয়ে জানবার তাঁকেই সকলের চেয়ে না-জানবার বেদনা—অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছে না যে শিশু তারই কান্নার সুর—তার কণ্ঠে বেজে উঠেছে। 'অন্তরতম যদযমাত্মা' উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন 'মনের মানুষ' বলে শুনলুম আমার মনে বড় বিস্ময় লেগেছিল। এর অনেককাল পরে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের অমূল্য সঞ্চয়ের থেকে এমন বাউলের গান শুনেছি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না—তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব তেমনি কাব্যরচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেছে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করিনে।

...এ জিনিস হিন্দু মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভাসমিতির প্রতিষ্ঠা হয়নি; এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরান পুরাণে ঝগড়া বাধেনি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে বিরোধে বর্বরতা। বাঙলাদেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুল-কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কিরকম কাজ করে এসেছে, হিন্দু মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।"[৭]

এই প্রবন্ধে ভারতীয় মধ্যযুগের দরবেশ-সন্ত-সাধু-মরমিয়াদের ঐক্য-সাধনাকে কবি অভিনন্দিত করেছেন এবং সেই সূত্রে রামানন্দ কবীর দাদু রবিদাস নানক প্রভৃতি পুণ্যশ্লোক লোকায়ত সাধনপথিকদের নামোল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, এই প্রবন্ধ রচনার কয়েক বৎসর পর পুনশ্চ কাব্যে (১৩৩৯) কবি রামানন্দ ও রবিদাসের জাতিধর্মবর্ণভেদহীন মানবতার সাধনাকে কয়েকটি আখ্যান-কবিতায় তুলে ধরেছিলেন।

বসন্ত গীতিনাট্যে কবি 'ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক' বলে যাদের ডাক দিয়েছিলেন, তাদের প্রলয়গানের মহোৎসব কেবল নটরাজের বন্দনাই নয়, বাউলদেরও আনন্দসাধনা। বাউলরাও মুক্তিপাগল। কবিও গেয়েছিলেন—

ভাঙন-ধরার ছিন্ন করার রুদ্র নাটে

যখন সকল ছন্দ বিকল বন্ধ কাটে,
মুক্তিপাগল বৈরাগীদের চিত্ততলে
প্রেমসাধনার হোমহুতাশন জ্বলবে তবে।

বাউলরা প্রচারক নয় গায়ক, গানেই তাদের সাধনা। ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন—"গান কেন করেন, কথায় কেন বলেন না জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, আমরা পাখির জাত, আমরা হেঁটে চলার ভাও জানি না, আমাদের উড়ে চলার ধাত।" রবীন্দ্রনাথের কথাই কি মনে পড়ে না? রবীন্দ্রনাথ তো সারা জীবন এ সত্যই প্রচার করে এলেন—

যারা কথা দিয়ে তোমার কথা বলে
তারা কথার বেড়া গাঁথে কেবল দলের পরে দলে।
একের কথা আরে
বুঝতে নাহি পারে,
বোঝায় যত কথার বোঝা ততই বেড়ে চলে।
যারা কথা ছেড়ে বাজায় শুধু সুর
তাদের সবার সুরে সবাই মেলে নিকট হতে দূর।
বোঝে কি নাই বোঝে
থাকে না তার খোঁজে,
বেদন তাদের ঠেকে গিয়ে তোমার চরণতলে।

বিধিনিয়ম শাস্ত্রবন্ধন আচারানুশাসন বাউলদের কাছে মিথ্যা অবান্তর। কৃচ্ছ্রসাধনের বৈরাগ্যে তাদের অনীহা, কবির মতই তাদের সহজিয়া দর্শন, যেন অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদগ্রহণ, যেন 'গানের সুরে আমার মুক্তি ঊর্ধ্বে ভাসে'। পত্রপুটের পনেরো সংখ্যক কবিতায় কবি বারবার নিজেকে আচারভ্রষ্ট ব্রাত্য বলেছেন এবং তার কিছুদিন পূর্বে হিবার্ট বক্তৃতা দি রিলিজিয়ান অফ ম্যানে সেই কথাই দর্শনের ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। 'তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে থাকি' এই গানের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে, গীতাঞ্জলির 'ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে' এই কবিতার কথাও এই সূত্রে স্মরণীয়। গীতাঞ্জলি-গীতালি পর্বের অসংখ্য গানে বাউল সুর ও বাউল সাধনার উল্লেখ আছে। 'দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা'—এই সুপ্রসিদ্ধ বাউল গানের রূপসাগরই কি অরূপরতনের

রত্নাকর হয়েছে কবির কাছে? গীতাঞ্জলির 'এই কথাটা ধরে রাখিস মুক্তি তোরে পেতেই হবে' গানে কবি বলেছেন—

অভয় মনে কণ্ঠ ছাড়ি গান গেয়ে তুই দিবি পাড়ি
খুশি হয়ে ঝড়ের হাওয়ায় ঢেউ যে তোরে খেতেই হবে।

বাউলরা যে সহজ শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন এবং বিশ্বাস করেন, রবীন্দ্রনাথের গানে বারবার তার পরিচয় মেলে। 'যা পেয়েছি প্রথম দিনে সেই যেন পাই শেষে', 'সহজ হবি সহজ হবি,' 'সেই তো আমি চাই' গানগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'আমার আঁধার ভালো' গানে রবি-বাউলের বাণী সাধক বাউলের অসংখ্য গান মনে পড়িয়ে দেয়—

তোমার পথ আপনায় আপনি দেখায় তাই বেয়ে মা চলব সোজা
যারা পথ দেখাবার ভিড় করে গো তারা কেবল বাড়ায় খোঁজা।
ওরা ডাকে আমায় পূজার ছলে এসে দেখি দেউলতলে
আপন মনের বিকারটারে সাজিয়ে রাখে ছদ্মবেশে।

বাউলদের গানে যে আনন্দের সাধনা, রবীন্দ্রসংগীতে সেই আনন্দ শব্দটি যে কতবার প্রত্যাবৃত্ত হয়েছে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। বাউলদের ঈশ্বর প্রেমিক রূপে দেখা দেন, এই তত্ত্বটিও রবীন্দ্রনাথের ভক্তিতত্ত্বের অন্তর্নিহিত সত্য, যথাস্থানে তার ব্যাখ্যা হয়েছে।

বিসর্জনের 'আমারে কে নিবি ভাই সঁপিতে চাই আপনারে' এই গানেই প্রথম বাউলের কণ্ঠস্বর শুনি। ১৮৯০ সালের জানুয়ারিতে রচিত এই গানে কবি বাউলের মত ভাষায় ও সুরে বিশ্বমানবচিত্তে আত্মসমর্পণের আকৃতি প্রকাশ করেছেন। এই গানের বক্তব্য, সবাই রূপজগতের আনন্দবাজারের হাটে অধরার সন্ধানে চলেছে, আর আমিই শুধু আপন মায়াজালে কর্মজালে পড়ে রয়েছি। আমার মাঝে সেই ভালোবাসার, অধরার বন্যা কই যে এক মুহূর্তে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে আমার সব কিছু পিছনটান সব রকম বন্ধন? তারপর যখন মুক্তির জন্য উল্লাস জাগে তখন কবি লেখেন 'ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে, তারে আজ থামায় কে রে' (১৯১৪)। বাউলের মনের মানুষ ও কবির জীবনদেবতাকে একই ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায়। তাঁর অনেকগুলি গানেই মনের মানুষ প্রাণের মানুষ শব্দের ব্যবহার আছে। কোথাও শব্দের ভাবার্থ পরিপূর্ণ ঈশ্বরের প্রতি উদ্দিষ্ট, কোথাও মানবিক প্রেমের দৈবায়ন ঘটেছে। ১৯২২ সালে বাউল সুরের সঙ্গে সারি-কীর্তনের সুর মিলিয়ে তিনি

কান পাতলেন আরও নিভৃত-গোপনে 'আমি কান পেতে রই' গানে। আর ঐ বাউলের সহজ ছন্দে-গানে ১৯২৬ সালে মৃত্তিকার আনন্দকে ধ্বনিত করে তুললেন 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' গানে।

দেশাত্মবোধক গানগুলিতে কবি বাউলাঙ্গের সুর ব্যবহার করেছিলেন উন্মাদনা আশ্বাস ও উদ্দীপনা ফুটিয়ে তোলার জন্য। কেবল তাই নয়—কবির স্বদেশচেতনা তো গণসংগ্রাম ছিল না, তা ছিল আত্মার একক সংগ্রাম, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে' কিংবা 'তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে' অথবা 'নিশিদিন ভরসা রাখিস'। সমষ্টির কাছে যা স্বাধীনতা, ব্যষ্টির কাছে তা আত্মার পরমপ্রাপ্তি, মুক্তির লৌকিক সুখ, তাও এক রকমের অধরাকে ধরার সাধনা তো বটে। তাই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-প্রেমের গানে লোকায়ত সুর অনিবার্য ছিল। কিন্তু শেষ জীবনে লোকগীতের বৈশিষ্ট্য এসে মিশল কবির প্রকৃতির গানে, প্রকৃতিপ্রীতি ও নিসর্গদর্শনে। প্রকৃতিতত্ত্বে নটরাজ আর বাউলকে গভীরদৃষ্টিতে দেখলে আর পৃথক করে চেনা যায় না। নটরাজ ঋতুরঙ্গশালার প্রথম কবিতায় কবি যে মুক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন তাও বাউলদৃষ্টির সঙ্গে মিলে যায়। বাউল শব্দের অর্থ পাগল, বাউলরা নিজেদের সৃষ্টিছাড়া পাগল বলেন। কবির নটরাজও তো পাগল। মনে পড়বে, শিশু ভোলানাথ কাব্যেই বাউল কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত।

বর্ষার প্রলয়মত্ততায়, বসন্তের প্রগল্‌ভ পুষ্পপ্রলাপে এবং অন্তরস্থিত বৈরাগ্য-বাণীতে কতবার যে বাউল সুর এসে মিশেছে তার ইয়ত্তা নেই। আবার কবির কণ্ঠ যখন মৃত্তিকার প্রতি ঋণে, বিশ্বভুবনের প্রতি লক্ষ শিরার আকর্ষণে উদ্বেল, তখনও বাউলের নিরাসক্ত সুর দিয়েই কবি তাঁর সেই মর্ত্যজন্মের প্রীতিবৎসলতাকে ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে' গানটিতে।

বাউল সুরকে সর্বদা কবি অবিচ্ছিন্ন ভাবে গ্রহণ করেননি, তাকেও রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বে বিগলিত করে নিয়েছেন। বাউল সুরকে নানাভাবে গ্রহণ করলেও অবশ্য বাউল সুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বাউল সুরের প্রভেদ আছে। এই বিষয়ে রবীন্দ্রসংগীত-বিশারদ শান্তিদেব ঘোষ লিখেছেন—"সাধারণ নিয়মে এই [বাউল] গানের যত কলিই থাকুক না কেন সুরে পার্থক্য দেখা যায় কেবল প্রথম কলির সঙ্গে দ্বিতীয় কলির। পরের আর সব কলির সুর দ্বিতীয় কলিকে অনুসরণ করে চলে এবং প্রথম কলি ছাড়া অন্যান্য সব কটি কলির ছন্দ ও

এক।…গুরুদেবের হাতে পড়ে বাউলদের গানের ঢঙ অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ সীমা থেকে এইভাবেই বড় ও বিচিত্র হয়ে উঠেছে। তাঁর বাউল সুরের বহু গানে আছে ধ্রুপদের মত চারটি অংশ। অস্থায়ী অন্তরা ও সঞ্চারীতে আছে সুরের বৈচিত্র্য ও আভোগ ঠিক ধ্রুপদের মত অন্তরাকে অনুসরণ করে। অধিকাংশ গানের সঞ্চারীর সুর গুরুদেবের নূতন সৃষ্টি। বাউলদের সুরের গঠনপ্রণালীর সঙ্গে মিল রেখেই এগুলি তিনি তৈরি করেছিলেন। এই কাজে গুরুদেবকে অনেক সময় প্রাচীন রাগরাগিণী বা কীর্তনের সুরের সাহায্য নিতে হয়েছে। বাউলের বৈশিষ্ট্যও তাতে আছে অথচ সুরে বৈচিত্র্য পেয়েছে গানগুলি। তাঁর বাউল গানে রাগরাগিণী মিশেছে অথচ বাউল সুরের সঙ্গে তার সামঞ্জস্যটি চমৎকার"।[৮]

এই মিশ্রিত বাউলের উদাহরণরূপে শান্তিদেব ঘোষ দেখিয়েছেন আমি তারেই জানি (সঞ্চারী পিলু), বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা (সঞ্চারী দেশ), রাঙিয়ে দিয়ে যাও (বাউল ও পিলু), আকাশ জুড়ে শুনিনু (বাউল কীর্তন ও বেহাগ), এই তো ভালো লেগেছিল (বাউল কীর্তন) ইত্যাদি গান। তাঁর মতে, "বাঙলার নিজস্ব দেশী সুরের প্রেরণায় রচিত গুরুদেবের গান হবে প্রায় দুশোর মত।" বাউলাঙ্গ কয়েকটি গানের তালিকা এখানে পেশ করা যেতে পারে—

আমার পথে পথে পাথর ছড়ানো, আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে, আমারে কে নিবি ভাই, আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়, আমি কান পেতে রই, আমি তারেই খুঁজে বেড়াই, আমি তারেই জানি, আমি মারের সাগর পাড়ি দেব, আমি যখন ছিলেম অন্ধ, এক হাতে ওর কৃপাণ আছে, এ পথ গেছে কোনখানে গো, ও আমার মন যখন জাগলি না রে, ওরে আগুন আমার ভাই, কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ, জানি জানি তোমার প্রেমে, তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে, তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে, তুমি বাহির থেকে দিলে, তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায়, তোর শিকল আমায় বিকল করবে না, দুঃখ যদি না পাবে তো, বলো বলো বন্ধু বলো, বাঁচান বাঁচি মারেন মরি, বারে বারে পেয়েছি যে তারে, ভুলে যাই থেকে থেকে, ভেঙে মোর ঘরের চাবি, যিনি সকল কাজের কাজী, যেথায় তোমায় লুট হতেছে, যেতে যেতে চায় না যেতে, লহো লহো তুলে লহো।

আমার সোনার বাঙলা, আজি বাঙলাদেশের হৃদয় হতে, এবার তোর

মরা গাঙে বান এসেছে, ও আমার দেশের মাটি, খ্যাপা তুই আছিস আপন, তোর আপন জনে, নিশিদিন ভরসা রাখিস, যদি তোর ডাক শুনে কেউ, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক।

আমার কী বেদনা, আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, আনমনা আনমনা, এসো এসো ওগো শ্যামছায়াঘন দিন, ও তো আর ফিরবে না রে, ডাকব না ডাকব না, তোরা যে যা বলিস ভাই, ফিরে ফিরে ডাক দেখি রে, যা ছিল কালো ধলো, সে আমার গোপন কথা, হৃদয়ের এ কূল ও কূল।

আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে, এ বেলা ডাক পড়েছে, এই শ্রাবণের বুকের ভিতর, কোন খ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এল, পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে, পথিক মেঘের দল জোটে ওই, পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, ফাগুনের শুরু হতেই শুকনো পাতা, বসন্তে কি শুধু কেবল, মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে, সকল জনম ভরে ও মোর দরদিয়া, সারানিশি ছিলেম শুয়ে, সেকি ভাবে গোপন রবে, হে আকাশবিহারী নীরদবাহন জল।

উতল হাওয়া লাগল আমার, ওগো দখিন হাওয়া, ওরে শিকল তোমায় কোলে করে, কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা, গগনে গগনে ধায় হাঁকি, দিনের পর দিন যে গেল।

আমার নাই বা হল পারে যাওয়া, এই তো ভালো লেগেছিল, ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে, ওগো তোরা কে যাবি পারে, ওগো তোমরা সবাই ভালো, কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে, মালা হতে খসে-পড়া, যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন, রাঙিয়ে দিয়ে যাও, স্বপনপারের ডাক শুনেছি।[৯]

বলা বাহুল্য এর সবগুলিই বিশুদ্ধ বাউল সুরের নয়, কারণ কবি নিজেই 'হারামণি'র ভূমিকায় স্বীকার করেছেন যে বাউল সুরের সঙ্গে তিনি অন্যান্য সুরের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে।[১০] বাউলের সঙ্গে সারি-ভাটিয়ালি গানের অবাধ মিশ্রণ যেমন তিনি ঘটিয়েছেন তেমনি কীর্তনের সুরকেও বাউলের সঙ্গে বিচিত্রভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন। সমগ্রভাবে রবীন্দ্রসংগীতে বাউল সুরের এবং লোকসংগীতের প্রভাবের বিস্তারিত আলোচনার বিরাট পরিসর রয়েছে, যোগ্য ব্যক্তি সে কাজে হস্তক্ষেপ করবেন। আমরা কেবল রবীন্দ্রনাথের গানের ভাবধারায় বাউলের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করলাম।[১১] তাছাড়া রবীন্দ্রসংগীতের ছন্দে ছড়ার প্রভাব[১২], [illegible] গানে রূপ-কথার রূপকল্প ও লক্ষণাদির বিশ্লেষণ, অন্যান্য মরমিয়া সাধকদের গানের

বা চিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের পংক্তিগত সাদৃশ্য আমাদের আলোচনায় স্থান পায়নি, কারণ সেই ধরনের বিস্তারিত বিশ্লেষণ বৃহত্তর পরিবেশ ও প্রসঙ্গের দাবি রাখে।

১। সম্প্রতি ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এই সম্পর্কে বিস্তৃত গবেষণা করে সাহিত্যপাঠকের, বিশেষ করে রবীন্দ্রসাহিত্যরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন

২। "ভিক্ষুকরা মাঝিরা যে সকল গান গাহে তাহা লিখিয়া লইতে অধিক পরিশ্রম নাই।... পাঠকেরা যদি কেহ নিজ নিজ সাধ্যানুসারে প্রচলিত গ্রাম্য গীতসকল সংগ্রহ করিয়া আমাদের নিকট প্রেরণ করেন তবে তাহা ভারতীতে সাদরে প্রকাশিত হইবে।" দ্র সংগীতচিন্তা

৩। বাঙলার বাউল—ক্ষিতিমোহন সেন

৪। দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত বাঙ্গালীর গান (১৩১২) দ্রষ্টব্য

৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—৩য় খণ্ড, ডঃ সুকুমার সেন

৬। পদটির রচয়িতা হাসন (হাছন) রজা। কবির উদ্ধৃত পাঠ, সম্ভবত মুদ্রণপ্রমাদের ফলে, মূলের সঙ্গে মেলে না। গানটি ক্ষিতিমোহন সেনের 'বাঙলার বাউলে' আছে। প্রথম চরণের পর এইরূপ—'কর্ণ হৈতে পৈদা হৈছে মুসলমানী দিন॥' তারপর আছে 'আর পয়দা করিল যে শুনিবারে যত। শব্দ সাজ আরাজ ইত্যাদি যে কত॥' এর পর কবিকর্তৃক উদ্ধৃত 'শরীরে করিল পয়দা' ইত্যাদি ছত্র। শেষ ছত্র—'আমি হইতে সব উৎপত্তি হাছন রজা কয়।'

৭। সংগীতচিন্তায় সংকলিত। বিস্মৃতপ্রায় লোকগীতির পুনরুদ্ধারকল্পে 'হারামণি' নামক বিভাগ প্রবাসী ১৩২২ বৈশাখ থেকে কবিই প্রবর্তন করেন, এ তথ্য পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। ১৩৩৪ চৈত্র প্রবাসীতে প্রকাশিত কবির 'বাউলগান' রচনাটিকেই মনসুরউদ্দিন তাঁর 'হারামণি' (বৈশাখ ১৩৩৭) গ্রন্থে ভূমিকারূপে ব্যবহার করেছেন কবির সম্মতিতে

৮। রবীন্দ্রসংগীত—শান্তিদেব ঘোষ

৯। 'একতারা' অনুষ্ঠান-উপলক্ষে প্রকাশিত 'গীত-নৃত্য-নাট্য পরিষদে'র 'রবি বাউল' পুস্তিকা থেকে (তারিখের উল্লেখ নেই)

১০। "তাঁর অনেক সুরে বাউল সংগীতের প্রভাব খুব বেশি দেখা যায় এবং বাউল সংগীতকে জাতে তোলা তাঁর সংগীতপ্রতিভার একটি বিশেষ কীর্তি বলে ধরা যেতে পারে"। ইন্দিরা দেবী-চৌধুরাণী, সংগীতে রবীন্দ্রনাথ: জয়ন্তী উৎসর্গ

১১। এই বিষয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংগীত—ডঃ সুধীর করণ, বৈতানিক, শারদীয়া

১২। 'রবীন্দ্রসংগীতের উপর লোকসংগীতের প্রভাব' এই বিষয়ে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের সঙ্গে একটি আলোচনার বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য 'বিশ্ববীণা' জুলাই-সেপ্টেম্বর

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য ও গদ্যগান

১

কবিতায় যেমন ছন্দের ক্ষেত্রে কবির মুক্তির সাধনা, কাব্যসংগীতের ক্ষেত্রেও কবি একই প্রকারে সেই ছন্দোমুক্তির সাধনা করেছেন। সেই ছন্দোমুক্তি অভ্যাসের দাসত্ব থেকে, প্রথার বন্ধন থেকে, অতিনিরূপিত পদ্ধতির ব্যবহারিক জীর্ণতা থেকে, গতানুগতিকতার ক্লিষ্ট শৃঙ্খল থেকে মুক্তি। গান ও কবিতা এক্ষেত্রে একই পথে চলেছে। কিন্তু তবু এখানে গানেরই জয়। কারণ অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভেঙে কবিতার যে মুক্তি তিনি ঘটিয়েছেন তারই নাম গদ্যছন্দ—যেখানে কবিতা তার অন্তঃপুর-অভ্যস্ত অবগুণ্ঠনকে উন্মোচিত করে স্বাধীনভর্তৃকা নারীর মত বিনা নাচের ছন্দে স্বাভাবিক তনুসৌন্দর্যে পথ হেঁটে গেছে। সেখানে কবিতার শাস্ত্রীয় অনুশাসন লঙ্ঘন করার জন্য তাতে আমদানি করতে হযেছে প্রাত্যহিকতার ভগ্নাংশ, জনজীবনের ম্লান হস্তক্ষেপে তার অঙ্গ হয়েছে ঈষৎধূসর। লোকায়ত বাণীভঙ্গিমায় কবিতাকে সাজাবার জন্য গদ্যকবিতাকে খালি পায়ে হেঁটে যেতে হয়েছে বনপাহাড়ি নদীর ভিজে বালির ওপর দিয়ে, তরবারি ফেলে নিতে হয়েছে সাঁওতালি ধনুক। হয়ত বা এমনি অনেক কিছু। কিন্তু সেই একই পদ্ধতিতে ছন্দের বাঁধন খুলতে খুলতে কাব্যসংগীতে যে গদ্যছন্দ এসেছে তার ভাষায় একমাত্র নৃত্যনাট্যগুলি ছাড়া কোথাও দৈনিকের দৈন্য নেই, লৌকিক জীবনের প্রয়োজনলাঞ্ছিত বাক্‌ভঙ্গি নেই। পরন্তু তাদের উপর নন্দনকানন থেকে স্বর্গের জ্যোতি এসে পড়েছে, সুর এসে তাকে নিয়ে গেছে সেই 'আনন্দময় নীরব রাতের নিবিড় আঁধারে'—পুনশ্চ শ্যামলীর গদ্যছন্দ যেখানে পায়ে হেঁটে কখনো যেতে পারত না।

বুদ্ধদেব বসু বহুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথের এই সব গদ্যভঙ্গিম ছন্দোশিথিল কাব্যসংগীতগুলির আভ্যন্তর সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন[১]। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংগীতে বাংলা ছন্দের নিপুণ কারুকলার বহু প্রত্যাশাতীত উদাহরণ থাকলেও শেষ পর্যায়ের রবীন্দ্রসংগীতে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত যে 'ছন্দমিলের অলংকৃত প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল' এ বিষয়ে তিনি একটি নিপুণ কবিজনসুলভ আলোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের একটি সুপরিচিত বর্ষাসংগীত (গীতবিতানে প্রেম-পর্যায়ভুক্ত) 'নীলাঞ্জন ছায়া, প্রফুল্ল কদম্ববন' উদ্ধৃত

করে তিনি লিখেছিলেন—'এ গানে মিল নেই, কবিতার বিচারে ছন্দও এখানে শিথিল। ছন্দের সুর আছে, তাল নেই। নির্দিষ্ট কোনো ছন্দের কাঠামোর মধ্যে এ পড়ে না, পড়বার সময় দীর্ঘ স্বরগুলিকে টেনে পড়বার ঝোঁক হয়, যা বাঙলা ছন্দের রীতি নয়, একে মুক্তছন্দ বললে বোধহয় দোষ হয় না।" তবে গানটিকে 'গদ্যগান' বলতে হযত অনেকের আপত্তি হবে। কারণ, প্রথমত, এটি কবির শেষ পর্যায়ের গান নয়, অর্থাৎ ছন্দোবন্ধনমুক্তির যে প্রেরণা তাঁর গদ্যকবিতারচনার যুগে ছন্দোভ্রষ্ট কাব্যগীতরচনায় নিবিষ্ট হয়েছিল, এই গানটি সেই যুগের রচনাই নয়। দ্বিতীয়ত, এই গানটি 'হিন্দিভাঙা', অর্থাৎ কোনো সুপরিচিত ক্লাসিকাল হিন্দি গানের সুরে রচিত। যে সমস্ত রাগরাগিণী-ভিত্তিক হিন্দিগানের সুরে কবি বাঙলা কথা বসিয়েছেন সেই সব গানের কথায় ছন্দের বা কবিতার স্বাভাবিক রূপ নেই, কারণ সেখানে সুরের উপর কথা বসাবার জন্যই কবিতার রূপ রক্ষিত হয়নি। যেমন 'হে সখা মম হৃদয়ে রহো' বা 'চিরসখা ছেড়ো না মোরে'। সেগুলিকে ছন্দের মুক্তির উদাহরণ হিসাবে গণ্য করা যায় না। বরং 'মন মোর মেঘের সঙ্গী', 'মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো' প্রভৃতি শেষ পর্যায়ের গানে সেই তুলনায় অনেক বেশি ছন্দ-স্বাধীনতা আছে।

কাব্যসংগীতে ছন্দের বন্ধন ভাঙার চেষ্টা সম্ভবত নৃত্যনাট্যগুলিতেই প্রথম দেখা দেয়। এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দ রচনার ইতিহাস ১৩৩৮ সাল থেকে ১৩৪২ সাল এই চার বৎসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং তাঁর নৃত্যনাট্য-রচনার ইতিহাসও এরই মধ্যে সূচিত হয়েছে। তাঁর প্রথম নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ১৩৪২ সালের ফাল্গুনে প্রথম অভিনয়োপলক্ষে প্রকাশিত হয়। তাঁর শেষ গদ্য-ছন্দের কাব্যগ্রন্থ শ্যামলী তারও পরে ১৩৪৩ সালের ভাদ্রে প্রকাশিত হয়। অবশ্য গদ্যকবিতায় সুরযোজনার ইচ্ছা কবির ঠিক কোন সময় থেকে দেখা দিয়েছিল সে তথ্য জানা সহজ নয়। দীর্ঘজীবন সহস্র গানে সুর দিয়ে কবি নিশ্চয় সুরসিদ্ধ হযে উঠেছিলেন। তানপ্রধান ছন্দের কবিতা 'ছবি' এবং 'গান-রচনা'য় (এ শুধু অলস মাযা এ শুধু মেঘের খেলা) সুরসংযোগ করে শাপ-মোচনে ব্যবহার করেছিলেন ১৩৩৮ সালের পৌষে এবং সেই জটিল ছন্দকেও সংগীত করে তোলার পারংগমতা নিশ্চয় কবিকে অন্তরে এই দুঃসাহস দিয়েছিল যার দ্বারা আরও এলায়িত গদ্যধর্মী ছন্দোশিথিল রচনাতেও সুর দেওয়া যেতে পারে। মনে পড়তে পারে শাপমোচনের দু-একটি গদ্য-সংলাপেও তিনি সুর

দিয়েছিলেন, তবে তা ১৩৪১ সালের শাপমোচন অভিনয়কালে। গদ্যরচনায় স্বরযোজনার ইচ্ছা তিনি ১৯২৯ সালেই জ্ঞাপন করেছেন নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা একটি পত্রে—

"গদ্যরচনায় আত্মশক্তির, সুতরাং আত্মপ্রকাশের, ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত। হয়ত ভাবীকালে সংগীতটাও বন্ধনহীন গদ্যের গূঢ়তর বন্ধনকে আশ্রয় করবে। কখনো কখনো গদ্যরচনায় স্বরসংযোগ করবার ইচ্ছা হয়। লিপিকা কি গানে গাওয়া যায় না ভাবছ"।[২]

তারপর এল গদ্যরচনায় স্বরদানের পরীক্ষা নৃত্যনাট্যে। ১৩৪২ থেকে ১৩৪৬ সালের মধ্যে কবি চিত্রাঙ্গদা চণ্ডালিকা ও শ্যামা এই তিনখানি নৃত্যনাট্যে স্বরযোজনা করলেন। এরপর সানাই কাব্যরচনাকালে কবি অনেকগুলি গদ্যগান রচনা করেন, মধ্যবর্তী সময়েও হয়ত করেছেন, যথেষ্ট তথ্যের অভাবে নির্দিষ্ট গান বলে দেওয়া যায় না। সানাই কাব্যে অনেকগুলি কবিতাই গানের পাঠান্তর—যেগুলি গদ্যগানরূপে প্রথম রচিত ও স্বরারোপিত হয়েছিল, পরে তাদের ছন্দোবদ্ধ কবিতায় রূপান্তরিত করে সানাই গ্রন্থে স্থান দেওয়া হয়েছে। চিত্রাঙ্গদাকে কবি যখন নৃত্যনাট্যের আকৃতি দান করলেন বোধ হয় তখনও গদ্যগানের ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিল না। চিত্রাঙ্গদা নামক বহুপূর্বের কাব্যনাট্য থেকে কবি কেবল কাহিনীটিই নিয়েছিলেন কিন্তু এর সংলাপ ও গীতরচনা সবই তো নতুন করে হয়েছে। তাই সুস্পষ্ট আদর্শ ছিল না বলে চিত্রাঙ্গদার অনেক গান গদ্য ও ছন্দোবদ্ধ কবিতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, অনেকগুলি ছন্দোবদ্ধ মিলগ্রথিত অর্থাৎ গানের আঙ্গিকে লেখা কাব্যসংগীত। আবার স্বর-না-দেওয়া তথা আবৃত্তির উপযোগী গদ্যাংশও এতে এসে পড়েছে, যদিও তা হয়ত ছন্দে-গাঁথা।

নৃত্যনাট্য আরম্ভ হয়েছে যৌবনকুঞ্জবনে মোহিনী মায়ার আগম-সংবাদে। একে কি গদ্যছন্দ বলা যায়? এর চরণে এখনো ছন্দোশিঞ্জিতের অশ্রুত ঝংকার, কিংবা যেন ছন্দের পাথর তুলে নেওয়ায় কবিতার ঘাসে শ্বেতচিহ্ন পড়েছে—

মোহিনী মায়া এল,
এল যৌবনকুঞ্জবনে।
এল হৃদয়শিকারে,
  এল গোপন পদসঞ্চারে,
এল স্বর্ণকিরণবিজড়িত অন্ধকারে।

পাতিল ইন্দ্রজালের ফাঁসি
হাওয়ায় হাওয়ায় ছায়ায় ছায়ায়
বাজায় বাঁশি।
করে বীরের বীর্যপরীক্ষা,
হানে সাধুর সাধনদীক্ষা,
সর্বনাশের বেড়াজাল বেষ্টিল চারিধারে।...

আর উদ্ধৃতি না দিলেও এই গানের কাব্যরূপ নিশ্চিত নিঃশব্দে ধ্বনিত হতে সুরু করেছে ছান্দসিক পাঠকের শ্রুতিতে। এরপর 'গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ গরজে পর্বতশিখরে' কিংবা অর্জুনের উক্তি—

অহো কী তুঃসহ স্পর্ধা
অর্জুনে যে করে অশ্রদ্ধা
সে কোনখানে পাবে তার আশ্রয়!

—ইত্যাদি অংশ উনিশ শতকীয় গিরিশচন্দ্র-ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের মত গৈরিশ ছন্দে বা ভগ্ন অমিত্রাক্ষরে রচিত ছন্দে আবৃত্তি করলে খুব একটা অশোভন ঠেকে না। আগাগোড়া নাটকেই এই ছন্দ আর মিলের লুকোচুরি, 'ওকি এল ওকি এল না বোঝা গেল না'-র মত কবিতার আবির্ভাব-সংশয়, পলাতক পদশব্দ। সম্ভবত সেইজন্যই চিত্রাঙ্গদার অর্ধেক নিটোল কাব্যগীতে পূর্ণ। ওরে ঝড় নেমে আয়, বঁধু কোন আলো লাগল চোখে, যাও যদি যাও তবে, শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে অতলজলের আহ্বান, দে তোরা আমায় নূতন করে দে, রোদনভরা এ বসন্ত কখনো আসেনি বুঝি আগে, তোমার বৈশাখে ছিল প্রখর রৌদ্রের জ্বালা, আমার এই রিক্তডালি দিব তোমারই পায়ে, আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি, স্বপ্নমদির নেশায় মেশা এ উন্মত্ততা, কোন দেবতা সে কী পরিহাসে ভাসালো মায়ার ভেলায়, অশান্তি আজ হানল এ কী দহনজ্বালা, কেটেছে একেলা বিরহের বেলা, সন্ন্যাসের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান, নারীর ললিত লোভন লীলায়, বিনা সাজে সাজি দেখা দিবে তুমি কবে, তৃষ্ণার শান্তি সুন্দর কান্তি, এসো এসো বসন্ত ধরাতলে— এতগুলি কাব্যসংগীত চিত্রাঙ্গদায় আছে যা মায়ার খেলার কথাই মনে করিয়ে দেয়।[৩] গদ্যধর্মী কবিতায় নির্বিচার সুরযোজনার তুঃসাহস এখনো যেন কবির অনায়ত্ত, তাই চিত্রাঙ্গদার কাব্যসংগীতরূপ সংলাপগুলি ছাড়া অন্য সংলাপের অর্ধেকেরও বেশি সুরহীন আবৃত্তিরূপেই রয়ে গেছে। সুর-দেওয়া গদ্যধর্মী

সংলাপ এবং সুর-না-দেওয়া আবৃত্তি অংশ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবল এইমাত্র যে দুইই মিলহীন, কিন্তু আবৃত্তি অংশে কেবল অমিল প্রবহমান পয়ার বা মুক্তবন্ধের আভাস আছে যা ইতিপূর্বে পরিশেষের অরণ্ডী, বাঁশি ইত্যাদি কবিতায় পেয়েছি। আর সুরযোজিত গদ্যধর্মী রচনাগুলিতে ধ্বনিপ্রধান ছন্দের স্পন্দনই সুস্পষ্টতর। যেমন চিত্রাঙ্গদার আরোপিত যৌবনাবেশ প্রত্যাহার করে নেওয়ার সময় মদনের উক্তি—

তাই হোক তবে তাই হোক,
কেটে যাক রঙিন কুয়াশা,
দেখা দিক শুভ্র আলোক।
মায়া ছেড়ে দিক পথ,
প্রেমের আসুক জয়রথ
রূপের অতীত রূপ
দেখে যেন প্রেমিকের চোখ—
দৃষ্টি হতে খসে যাক, খসে যাক মোহনির্মোক।

চিত্রাঙ্গদার দেহ থেকে কৃত্রিম যৌবননির্মোক খসে গেলেও এই কবিতার অঙ্গ থেকে কৃত্রিম ছন্দনির্মোক কবি খসাতে পারেননি। বীতমোহ অর্জুনের সম্মুখে স্বতরূপ চিত্রাঙ্গদার আত্মপরিচয় অংশ ১২৯৯ সালে লেখা কাব্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা থেকেই গ্রহণ করেছেন, কিন্তু ছন্দের অনুশাসনকে সবেগে নিক্ষেপের দুঃসাহস কোথায় এখানে? প্রথমে কাব্যনাট্যের অংশটি দ্রষ্টব্য—

আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।...

আজ

শুধু নিবেদি চরণে, আমি চিত্রাঙ্গদা,
রাজেন্দ্রনন্দিনী।

খুবই বিস্ময় লাগে একথা ভাবতে যে, নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা রচনাকালে ১২৯৯ সালের কাব্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা বইটি দেখার কী প্রয়োজন ছিল কবির? যে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে এই নৃত্যনাট্যের নূতন সংগীতগুলি উৎসারিত হয়েছে, সেখানে কাব্যনাট্যের ভাষান্তরের প্রয়োজন কি অনিবার্য ছিল? উপরে উদ্‌ধৃত চিত্রাঙ্গদার কাব্যসংলাপটি ঈষৎ রূপান্তরে নৃত্যনাট্যে পাই—

আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী।
নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।
পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে সে নহি নহি,
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সংকটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।
আজ শুধু করি নিবেদন—
আমি চিত্রাঙ্গদা রাজেন্দ্রনন্দিনী।

২

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার পর নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা (১৩৪৪ ফাল্গুন) রচনাকালে গদ্যছন্দের দিকে কবি আরও অনেকটা অগ্রবর্তী হয়েছেন দেখা যাচ্ছে। বুদ্ধদেব বসুও মন্তব্য করেছেন—

"নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকাতেও মোটামুটি এই আঙ্গিকই অবলম্বন করা হয়েছে, কিন্তু তার কোনো কোনো অংশ বিশুদ্ধ গদ্যের ছাঁচে ঢালাই হয়ে এমন একটি অভিনব রূপ পেয়েছে যা এর সহচর নাট্য দুটিতে পাওয়া যায় না। চণ্ডালিকার বিষয়বস্তুতে যে বিশেষ একটি মানবিক মহিমা আছে, তার প্রভাব পড়েছে এর রূপকল্পেও। অন্য দুটি নৃত্যনাট্যের তুলনায় এর রচনাভঙ্গি নিরাভরণ, পদে পদে মিলের ঝংকার নেই, স্থানে স্থানে পদ্যছন্দের শেষ বেশটুকু পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে গদ্যের সরলতায় নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছে। আমার মনে হয়, কবির তিনটি নৃত্যনাট্যের মধ্যে, রূপকল্পের দিক থেকে চণ্ডালিকা সবচেয়ে পরিণত ও সুসম্পূর্ণ; তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে অন্য দুটি পুরনো রচনা থেকে রূপান্তরিত,

চণ্ডালিকা সম্পূর্ণ মৌলিক। কাব্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা; নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ভুলতে পারেনি, পরিশোধ কবিতার স্মৃতি শ্যামাকে জড়িয়ে আছে। কিন্তু চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যরূপেই কবির মনে প্রতিভাত হয়েছিল বলে তার রচনা ঠিক বিষয়ের অনুরূপ ভাষা ও ভঙ্গি নিয়ে সুসম্পূর্ণ হতে পেরেছে।" (পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ)

চণ্ডালিকা সম্পর্কে এই মন্তব্য মোটামুটি সমর্থনযোগ্য, অর্থাৎ চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামার তুলনায় চণ্ডালিকায় ছন্দোহীনতা ও গদ্যধর্মিতা অধিক, কিন্তু তার কারণ এই নয় যে, চণ্ডালিকা মৌলিক। নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকাও কবির চণ্ডালিকা নামক গদ্যনাটক অবলম্বনে রচিত। গদ্যনাটক চণ্ডালিকা ১৩৪০ সালের ভাদ্রে রচিত হয়, অভিনীতও হয়। প্রকৃতপক্ষে চণ্ডালিকা প্রথম গদ্যরচনা ছিল বলেই ১৩৪৪ সালের নৃত্যনাট্যে তাকে গানে রূপান্তরিত করা সহজ হল। চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামা সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্য সমর্থনযোগ্য অর্থাৎ এই দুই নৃত্যনাট্যে কাব্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ও পরিশোধ কবিতাকে কবি ভুলতে পারেননি। কিন্তু চণ্ডালিকার প্রথম রূপ যেহেতু সৌভাগ্যক্রমে কাব্যনাট্য নয়, গদ্যনাট্য—তাই সেই গদ্যকেই সহজে সংগীত করে তুললেন কবি। চণ্ডালিকার নৃত্যনাট্যের ভাষা যে ছদ্মবেশী গদ্য নয়, নিরলংকৃত ছন্দোভ্রষ্ট গদ্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিষয়ের দিক থেকেও তার মধ্যে এমন সব প্রাত্যহিক ঘরোয়া শব্দ প্রবেশ করেছে যা চিত্রাঙ্গদায় ছিল না, শ্যামাতেও নেই। বুদ্ধদেব বসুও বলেছেন "সুরমন্দিরে যে সব প্রসঙ্গের প্রবেশের অধিকার ছিল না, একটি অস্পৃশ্যার সঙ্গে সঙ্গে সেই অস্পৃশ্যদেরও মুক্তি দিলেন আমাদের কবি।"

গদ্য কত সহজে গদ্যছন্দ এবং গদ্যছন্দ কত অনায়াসে গদ্যগান হয়ে উঠল, চণ্ডালিকার গদ্যরূপ ও নৃত্যনাট্যরূপের তুলনা করে সহজেই তা দেখান যেতে পারে। যেমন, গদ্যনাট্যে যেখানে আছে—

মা। জাত লুকোস নি? বলেছিলি যে তুই চণ্ডালিনী?

প্রকৃতি। বলেছিলেম। তিনি বললেন, মিথ্যে কথা। তিনি বললেন, শ্রাবণের কালো মেঘকে চণ্ডাল নাম দিলেই বা কী, তাতে তার জাত বদলায় না, তার জলের ঘোচে না গুণ। তিনি বললেন, নিন্দে কোর না নিজেকে। আত্মনিন্দা পাপ, আত্মহত্যার চেয়ে বেশি।

নৃত্যনাট্যে সেই অংশের ভাষা এইরূপ—

প্রকৃতি।... আমি চণ্ডালী, সে যে মিথ্যা, সে যে মিথ্যা,
সে যে দারুণ মিথ্যা।

শ্রাবণের কালো যে মেঘ
তারে যদি নাম দাও 'চণ্ডাল'
তা বলে কি জাত ঘুচিবে তার,
অশুচি হবে কি তার জল।
তিনি বলে গেলেন আমায়—
নিজের নিন্দা কোরো না,
মানবের বংশ তোমার,
মানবের রক্ত তোমার নাড়ীতে।

গদ্যনাট্যের এই নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদটির নৃত্যনাট্যরূপান্তরের উল্লেখ সর্বাধিক করা হয়ে থাকে। মা প্রকৃতির মুখে তার নতুন জন্মের কথা শুনে অবিশ্বাসের ইঙ্গিত দিতে আত্মবিস্মৃত অভিভূত প্রকৃতি একটানা বলে গেল—

"সেদিন রাজবাড়িতে বাজল বেলা-দুপুরের ঘণ্টা, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। মা-মরা বাছুরটাকে নাওয়াচ্ছিলুম কুয়োর জলে। কখন সামনে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু, পীতবসন তাঁর। বললেন, জল দাও। প্রাণটা উঠল চমকে, শিউরে উঠে প্রণাম করলেম দূর থেকে। ভোরবেলাকার আলো দিয়ে তৈরি তাঁর রূপ। বললেম, আমি চণ্ডালের মেয়ে, কুয়োর জল অশুদ্ধ। তিনি বললেন, যে মানুষ আমি তুমিও সেই মানুষ; সব জলই তীর্থজল যা তাপিতকে স্নিগ্ধ করে, তৃপ্ত করে তৃষিতকে।...

কেবল একটি গণ্ডুষ জল নিলেন আমার হাত থেকে, অগাধ অসীম হল সেই জল। সাত সমুদ্র এক হয়ে গেল সেই জলে, ডুবে গেল আমার কুল, ধুয়ে গেল আমার জন্ম।"

লক্ষ্য করার বিষয়, প্রকৃতির এই উক্তির মধ্যে প্রথম দিকে সাধারণ জীবনের লোকায়ত বাণীভঙ্গি থাকলেও শেষ দিকে সেই অস্পৃশ্য মেয়ের ভাষা বিষয়ের স্বগৌরবে আপনিই যেন অনির্বচনীয় হয়ে গেছে। অসামান্য উপলব্ধিতে যার কূপের অশুদ্ধ জলে সাতসমুদ্রের অতলান্ত রহস্য সঞ্চারিত হয়, তার ভাষাকে গানে পরিণত করতে কবিকে তাই বেগ পেতে হয়নি। তাই নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকায় আমরা এই অংশের কাব্যরূপ পেলাম স্বচ্ছন্দে—

এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম, নতুন জন্ম আমার।
সেদিন বাজল দুপুরের ঘণ্টা, ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর,
স্নান করাতে ছিলেম কুয়োতলায় মা-মরা বাছুরটিকে।

সামনে এসে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু আমার—
বললেন, জল দাও, জল দাও, জল দাও।
শিউরে উঠল দেহ আমার, চমকে উঠল প্রাণ।
বল দেখি মা, সারা নগরে কি কোথাও নেই জল!
কেন এলেন আমার কুয়োর ধারে,
আমাকে দিলেন সহসা
মানুষের তৃষ্ণা-মেটানো সম্মান।

গদ্যসংলাপে চণ্ডালিকার পরবর্তী উক্তিঅংশ নৃত্যনাট্যের প্রথম দৃশ্যে স্থানান্তরিত হয়েছে, যেখানে বৌদ্ধশিষ্য আনন্দ চণ্ডালিকার কাছে এক গণ্ডূষ জল পান করে তাকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন। তারপর জলদানতৃপ্তির বিস্ময়াহত আনন্দে চণ্ডালিকার মুখে শুনি—

শুধু একটি গণ্ডূষ জল,
আহা, নিলেন তাঁহার করপুটের কমলকলিকায়।
আমার কূপ যে হল অকূল সমুদ্র—
এই যে নাচে, এই যে নাচে, তরঙ্গ তাহার
আমার জীবন জুড়ে নাচে—
টলোমলো করে আমার প্রাণ,
আমার জীবন জুড়ে নাচে।
ওগো কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী পরম মুক্তি!
একটি গণ্ডূষ জল—
আমার জন্মজন্মান্তরের কালি ধুয়ে দিল গো
শুধু একটি গণ্ডূষ জল।

গদ্যনাট্য ও নৃত্যনাট্য থেকে সমজাতীয় দৃষ্টান্ত আরও দেখান যেতে পারে, কিন্তু মোটামুটি সিদ্ধান্ত একই দাঁড়াবে। গদ্যবাক্যগুলিই নৃত্যনাট্যে কবিকে সুরযোজনায় প্রণোদিত করেছে এবং সুরের সহযোগিতায় সেগুলি অপরূপ হয়ে উঠেছে। চণ্ডালিকার গদ্য সংলাপ সুরের সংস্কারেই অবশ্য আমাদের —অর্থাৎ শিক্ষিত, রবীন্দ্রানুরাগী, রবীন্দ্রসংস্কৃতিপুষ্ট ও রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য বারবার দর্শন-শ্রবণের অভিজ্ঞতায় প্রায় শ্রুতিধর আমাদের, ভালো লাগে। কিন্তু চেষ্টা করে তার কথা ভুললেও এই গদ্যস্পন্দকে আমরা নিতান্ত গদ্য বলে

উড়িয়ে দিতে পারি না। চিত্রাঙ্গদার নৃত্যনাট্য সংস্করণের ভূমিকায় কবি লিখেছিলেন—

"এই গ্রন্থের অধিকাংশই গানে রচিত এবং সে গান নাচের উপযোগী। একথা মনে রাখা কর্তব্য যে, এই জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম করে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে। কাব্য আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়। যে পাখির প্রধান বাহন পাখা, মাটির উপরে চলার সময় তার অপটুতা অনেক সময় হাস্যকর বোধ হয়।"

উপমানটির চমৎকৃতিই এই কৈফিয়তের কারণ কিনা বলা যায় না। কিন্তু এই আত্মসমর্থনের কোন প্রয়োজন ছিল না। পুনশ্চ থেকে শ্যামলী যদি কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে বিচার্য হয় তবে চিত্রাঙ্গদা থেকে শ্যামার নৃত্যনাট্যরূপও কাব্যআদর্শে বিচার্য হতে পারে। সুরের একতালিতে একঝাঁক পায়রা চক্রাকারে এখনি আকাশে উড়ে তাদের উড্ডীন জীবনছন্দকে শূন্যে ছড়িয়ে দেবে জানলেও মাটিতে শস্য খুঁটে খুঁটে খাওয়ার সেই দৃশ্যটিই কি অপটু হাস্যকরের নমুনা হয়ে ওঠে? চিত্রাঙ্গদার ভাষার কাব্যধর্মের উল্লেখ তো আগেই করা হয়েছে। চণ্ডালিকার এই অংশ কি সুরব্যতিরেকে অপটু হাস্যকরতার উদাহরণ হয়েছে?

মা। বাছা, তুই যে আমার বুকচেরা ধন।
তোর কথাতেই চলেছি পাপের পথে, পাপীয়সী।
হে পবিত্র মহাপুরুষ,
আমার অপরাধের শক্তি যত
ক্ষমার শক্তি তোমার আরো অনেক গুণে বড়।
তোমারে করিব অসম্মান—
তবু প্রণাম, তবু প্রণাম, তবু প্রণাম।

চণ্ডালিকায় কবি অনেকগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ গানও ব্যবহার করেছেন, তবে সেগুলির সংখ্যা চিত্রাঙ্গদার তুলনায় কম। গদ্যনাট্য চণ্ডালিকায় কাব্যগীত ছিল এই কটি—যে আমারে দিয়েছে ডাক (অসম্পূর্ণ কয়েকটি পংক্তি, নৃত্যনাট্যে এটি পূর্ণ হয়েছে), বলে জল দাও দাও জল, চক্ষে আমার তৃষ্ণা, ফুল বলে ধন্য আমি মাটির পরে, ওগো তোমার চক্ষু দিয়ে মেলে সত্যদৃষ্টি, না না ডাকব না ডাকব না অমন করে বাইরে থেকে, আমি তারেই জানি

তারেই জানি, দোষী করো দোষী করো, যায় যদি যাক সাগরতীরে, হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরুগুরু, দুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার, হে মহাদুঃখ হে রুদ্র হে ভয়ংকর, আমি তোমারই মাটির কন্যা, মম রুদ্ধ মুকুলদলে এসো, পথের শেষ কোথায়। সবগুলিই এই নাটকের জন্য রচিত নয়, কয়েকটি গান যে পূর্বকালের রচনা সে তথ্য ইতিপূর্বের অধ্যায়গুলিতে পাওয়া যাবে। নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকায় কাব্যগীতি আছে এইগুলি—নব বসন্তের দানের ডালি এনেছি তোদেরই দ্বারে, আমার মালার ফুলের দলে আছে লেখা, দই চাই গো দই চাই, ওগো তোমরা যত পাড়ার মেয়ে, যে আমারে পাঠাল এই অপমানের অন্ধকারে, কী যে ভাবিস তুই অন্যমনে, কাজ নেই কাজ নেই মা, মাটি তোদের ডাক দিয়েছে, ওগো ডেকো না মোরে, ফুল বলে ধন্য আমি, যে আমারে দিয়েছে ডাক, বলে জল দাও দাও জল, চক্ষে আমার তৃষ্ণা, আমায় দোষী করো, যায় যদি যাক সাগরতীরে, ঐ দেখ পশ্চিমে মেঘ ঘনালো, দুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার, জাগেনি এখনো জাগেনি রসাতলবাসিনী নাগিনী, ঘুমের ঘন গহন হতে যেমন আসে স্বপ্ন। অবশ্য এর সবগুলিকেই আদর্শ কাব্যগীতি বলা যায় কিনা প্রশ্ন উঠতে পারে। অনেকগুলি গান নাট্যসংলাপের বিচ্ছিন্নতার দৃষ্টান্ত, ছন্দে দীন, সাধারণ সংবাদ বক্ষে ধারণ করে আছে। গীতবিতানের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে প্রেম-পূজা-প্রকৃতি ইত্যাদি পর্যায়ে তাদের উল্লেখও নেই হয়ত। কিন্তু তথাপি, নাট্য-সংলাপ রচনাতেও, এগুলির মধ্যে যে একটি কাব্যসংগীতের পূর্ণতা এসেছে, লিরিকের স্বয়ংসম্পূর্ণতার কাছাকাছি এসেছে, সেজন্যই কাব্যগীত বললে অন্যায় হয় না। ফুলওয়ালির দলের দ্বিতীয় গান—

আমার মালার ফুলের দলে আছে লেখা
বসন্তের মন্ত্রলিপি।
এর মাধুর্যে আছে যৌবনের আমন্ত্রণ।
সাহানা রাগিণী এর রাঙা রঙে রঞ্জিত,
মধুকরের ক্ষুধা অশ্রুত ছন্দে
গন্ধে তার গুঞ্জরে।

তারপর 'আন গো ডালা গাঁথ গো মালা' এই দীর্ঘ গানটি ছন্দে মিলে কবিতার কোনো প্রত্যাশা পূরণ করে না। তথাপি এর পুষ্পিত বাসন্তী শব্দ-পিঞ্জনে একটি মধুর কাব্যসুরভি সঞ্চারিত। সংলাপকে অন্তর্দিক থেকে, গানের

প্রচলিত আকৃতিতে মিলযোজনা করেও, এই নৃত্যনাট্যে এক প্রকার কাব্যগীতি করে গড়ে তুলেছেন কবি, যেমন—

যে আমারে পাঠাল এই অপমানের অন্ধকারে
পূজিব না, পূজিব না, পূজিব না সেই দেবতারে, পূজিব না।
কেন দিব ফুল, কেন দিব ফুল,
কেন দিব ফুল আমি তারে—
যে আমারে চিরজীবন রেখে দিল এই ধিক্‌কারে।
জানি না হায়রে কী দুরাশায় রে
পূজাদীপ জ্বালি মন্দিরদ্বারে।
আলো তার নিল হরিয়া, দেবতা ছলনা করিয়া,
আঁধারে রাখিল আমারে।

'ঘুমের ঘন গহন হতে যেমন আসে স্বপ্ন' এইরূপ একটি চমক-দেওয়ার মত কাব্যগীতের তুলনা কি সমগ্র প্রেম-পর্যায়ের গানে একটিও আছে? গানের প্রচলিত স্তবক নেই, স্তবকান্ত অনুপ্রাস নেই, কেবল 'তেমনি তুমি এসো' এই ধ্বনির পুনরাবৃত্তিতে আগমন-সম্ভাবনার ব্যাকুলতাকে অনিবার্য করে তোলার ধ্বনি, আর সামান্য পর্বরীতির অস্তিত্ব এই গানটিকে অসামান্য করেছে। সেই জন্য স্বয়ং কবিও গীতবিতানের প্রেম-পর্যায়ে গানটিকে স্বতন্ত্রভাবে স্থান দিয়েছেন।

৩

শ্যামা নৃত্যনাট্য রচিত হয়েছিল ১৩৪৬ সালের ভাদ্রে, যদিও নৃত্যনাট্যরূপে শ্যামাকে গড়ে তোলার একটি প্রয়াসের সন্ধান পাওয়া যায় ১৩৪৩ সালের আশ্বিনে। কার্তিকের প্রবাসীতে প্রকাশিত উক্ত প্রাথমিক খশড়াটি রবীন্দ্র-রচনাবলীর পঞ্চবিংশ খণ্ডের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হয়েছে। নৃত্যনাট্য শ্যামা সেই খশড়াটির উপরই গড়ে উঠেছে তাতে সন্দেহ নেই। চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামার তুলনায় চণ্ডালিকার গদ্যধর্মিতার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে—বস্তুত শ্যামার স্বতন্ত্র কাব্যগীতগুলি ছাড়া সংলাপাংশে গদ্যধর্মিতা কিছুটা পরিশোধ কবিতার ছন্দো-ধ্বনি ও ভাষাকে অবলম্বন করে রচিত। তবে এই কাব্যের কাব্যগীতিগুলি গদ্যগান হয়ে উঠেছে অবলীলাক্রমে। যেমন—

হে বিরহী, হায় চঞ্চল হিয়া তব—

নীরবে জাগ একাকী শূন্য মন্দিরে,
কোন সে নিরুদ্দেশ লাগি আছ জাগিয়া।
স্বপনরূপিণী অলোকসুন্দরী
অলক্ষ্য-অলকাপুরী-নিবাসিনী,
তাহার মুরতি রচিলে বেদনায় হৃদয়-মাঝারে।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের গদ্য গানগুলিতে সাধুক্রিয়াপদ (যেমন—আছ জাগিয়া) সাধুভাষার সর্বনাম (যেমন—তাহার), হেন সম তব প্রভৃতি কাব্যগন্ধী শব্দ শেষ পর্যন্ত বর্জিত না হলেও ভাষা যে অনেক বলিষ্ঠ, শব্দ-ব্যবহারে স্বাধীন হয়ে উঠেছে তাতে সন্দেহ নেই। শ্যামাতে কাব্যগীতের সংখ্যা বেশি নয়। সম্পূর্ণ কাব্যগীত এগুলি—ফিরে যাও কেন ফিরে ফিরে যাও, মায়াবনবিহারিণী হরিণী, হতাশ হয়ো না হয়ো না হয়ো না সখা, জীবনে পরম লগন কোর না হেলা, ধরা সে যে দেয় নাই দেয় নাই, সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে ঘুচাবে কে, আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান, প্রেমের জোয়ারে ভাসাব দোঁহারে, হায় হায় রে হায় পরবাসী, নীরবে থাকিস সখী ও তুই নীরবে থাকিস, ক্ষমিতে পারিলাম না যে। আসলে শ্যামার সংলাপাংশে চণ্ডালিকার তুলনায় গদ্যভাগ কম, এখানে সংলাপাংশে স্বতন্ত্রভাবে কবি কবিতার মিল বা ছন্দের দোলা সঞ্চার করেছেন। যেমন, দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে—

শ্যামা। তোমাদের এ কী ভ্রান্তি—
কে ঐ পুরুষ দেবকান্তি,
প্রহরী, মরি মরি।
এমন করে কি ওকে বাঁধে।
দেখে যে আমার প্রাণ কাঁদে।
বন্দী করেছ কোন দোষে।

কোটাল। চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে,
চোর চাই যে করেই হোক, চোর চাই।
হোক-না সে যেই কোন লোক, চোর চাই।
নহিলে মোদের যাবে মান।

শ্যামা। নির্দোষী বিদেশীর রাখো প্রাণ,
দুই দিন মাগিনু সময়।

কোটাল। রাখিব তোমার অনুনয়—
দুই দিন কারাগারে রবে।
তারপর যা হয় তা হবে।

শ্যামার সখীদের গান মায়াকুমারীদের গানগুলিকে মনে করিয়ে দেয়।

এইভাবেই নৃত্যনাট্যের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের কাব্যছন্দে গদ্যধর্মিতার প্রয়োগ ঘটল এবং শেষ জীবনের অধিকাংশ গানেই কবি গানের আঙ্গিকে ছন্দকে অপরিহার্য করে তুললেন না। কখনও মিত্রাক্ষরকে রক্ষা করলেন, কিন্তু সমমাত্রিক পর্বের রীতিকে উপেক্ষা করলেন। কখনও পর্বের বন্ধন রয়ে গেল, কিন্তু মিত্রাক্ষরের চিহ্ন মুছে গেল। আর প্রথাগত ছন্দের এই দুই প্রহরী-কেই একেবারে প্রত্যাহার করে কাব্যের ভাষাকে তিনি খুলে দিলেন গদ্যপথ-চারীদের অবাধ বিহারের জন্য। তবু শেষ পর্যন্ত তাঁর অসামান্য প্রতিভার স্পর্শেই গদ্যে রঙ ধরেছে পদ্যের। তাঁর ভাষার আশ্চর্য ধ্বনিবহ ক্ষমতা, অলংকার-চিত্রকল্পের অভাবনীয় দ্যুতি, উপলব্ধির অনন্ততা এই সব গদ্যের উপর এনে দিয়েছে দুর্লভ কাব্যগুণের প্রতীয়মান ধর্মগুলিকে, শেষ পর্যন্ত সুরের ছোঁওয়ায় তারা উধাও হয়েছে নিঃসীম শূন্যে—ছন্দের অভাবকে দুঃখের চিহ্ন বলে মনে রাখতে দেয়নি। ছন্দের শাসন এড়িয়ে গদ্যের দিকে কাব্যবাণীকে নিয়ে যাওয়ার এই চেষ্টা বিশেষভাবে নৃত্যনাট্যগুলির সমকালীন এবং পরবর্তী যুগের গানেই বেশি করে ঘটলেও তার পূর্ববর্তীকালের কিছু কিছু গানকে এই ধরনের দৃষ্টান্তের ইতিহাসে ফেলা যায় না এমন নয়। তাসের দেশের 'উতল হাওয়া লাগল আমার গানের তরণীতে', শাপমোচনের 'কখন দিলে পরায়ে স্বপনে বরণমালা'—এই দুই গানেই ছন্দের প্রতীতি আছে মাত্র, কিন্তু কাব্যছন্দ নির্ভুল ভাবে নেই—মিলটুকু পড়ে আছে। 'ও আমার ধ্যানেরই ধন' এই জাতীয় উদাহরণ। 'ওগো আমার চিরঅচেনা পরদেশী'তেও ছন্দমিল কিছুই নেই। গীতবিতানের প্রেম-পর্যায়ের 'না না ভুল কোরো না গো ভুল কোরো না, 'ভুল করেছিনু ভুল ভেঙেছে', 'ডেকো না আমারে ডেকো না ডেকো না', 'হায় হতভাগিনী,' 'ছি ছি মরি লাজে,' 'শুভ মিলন লগনে বাজুক বাঁশি,' 'আর নহে আর নয়', 'ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে ওরে পাখি,' 'যাক ছিঁড়ে যাক ছিঁড়ে যাক', 'দুঃখের যজ্ঞ-অনল-জ্বলনে জন্মে যে প্রেম,' 'অজানা সুর কে দিয়ে যায় কানে কানে,' 'মম দুঃখের সাধন যবে করিনু নিবেদন,' 'বাণী মোর

নাহি,' 'আজি দক্ষিণ পবনে,' 'যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল', 'আমার আপন গান আমার অগোচরে,' 'অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে,' 'আমি যে গান গাই,' 'ওগো স্বপ্নস্বরূপিণী,' 'ওরে জাগায়ো না ও যে বিরাম মাগে', 'দিনান্তবেলায় শেষের ফসল,' 'ধূসর জীবনের গোধূলিতে,' 'দোষী করিব না করিব না তোমারে,' 'শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ণ সন্ধ্যায়'—গানগুলি পূর্বকথিত তিন ধরনের গদ্য গানের উদাহরণরূপে গৃহীত হতে পারে। এগুলির মধ্যে কয়েকটি গান একেবারে শেষ পর্যায়ের সানাই কাব্যের সমকালীন—কয়েকটি গদ্যগানের ছন্দোরূপ সানাই কাব্যেও আছে। কয়েকটি গান শেষ জীবনে নৃত্যনাট্য মায়ার খেলার জন্য রচনা করেছিলেন।[৪] বর্ষা-পর্যায়ে 'আমি শ্রাবণ আকাশে ঐ দিয়েছি পাতি', 'থামাও রিমিকি ঝিমিকি বরিষণ', 'যায় দিন শ্রাবণ দিন যায়', 'আমি কী গান গাব যে ভেবে না পাই', 'মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো', 'আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে', 'এসো গো জ্বেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি', 'আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদর দিনে', 'শ্রাবণের গগনের গায়', 'স্বপ্নে আমার মনে হল', 'শেষ গানেরই রেশ নিয়ে যাও চলে', 'এসেছিলে তবু আস নাই', 'নিবিড় মেঘের ছায়ায় মন দিয়েছি মেলে', 'আমার যে দিন ভেসে গেছে চোখের জলে', 'সঘন গহন রাত্রি', 'ওগো তুমি পঞ্চদশী'—এইগুলিও গদ্যগানের তালিকায় আলোচনার যোগ্য।

এই সমস্ত তালিকা থেকে একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, জীবনের একেবারে অন্তিম প্রান্তে এসে কবি স্বেচ্ছায় গানের ছন্দকে ফেলে দিয়েছেন। অধিকাংশ গানের বিষয়ই প্রেম এবং সে প্রেম বিরহধূসর অতীতস্মৃতিমন্থর। গোধূলির শেষলগ্নে এসে প্রৌঢ় কবির স্মার্তবিবশ চেতনায় প্রভাতের আবছা ছবিগুলো ভেসে উঠেছে—

> এ কান্না নয়, হাসি নয়, চিন্তা নয়, তত্ত্ব নয়,
> যত কিছু ঝাপসা-হয়ে-যাওয়া রূপ,
> কথা-হারিয়ে-যাওয়া গান,
> তাপহারা স্মৃতিবিস্মৃতির ধূপছায়া'[৫]—

যে স্মৃতি অর্ধস্ফুট, বয়সের জীর্ণতায় মলিন, কালের দূরত্বে অস্পষ্ট—সেই স্মৃতির অসম্পূর্ণতার জন্যই কি স্মৃতিবহ গানে ছন্দের প্রতি এত অমনোযোগ? মিলভাঙা জীবনের স্মৃতিই কি মিলহারা ছন্দোহারা হাহাকারে পরিণতি?

এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা নেই।

১ রবীন্দ্রনাথের গদ্য গান—বুদ্ধদেব বসু, গীতবিতান বার্ষিকী ১৩৫০। এই প্রসঙ্গে আরও দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের গদ্যগান—বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতবিতান পত্রিকা

২। পথে ও পথের প্রান্তে, ৮ আগস্ট ১৯২৯এর পত্র। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য—"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শেষ জীবনে নিরন্তর রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করতে না হলে রবীন্দ্রনাথ গদ্যগানকে একটা সুস্পষ্ট দৃঢ় আকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। লিপিকার অনেক রচনাই হয়ত এতদিনে গান হয়ে মুখে মুখে ফিরতো, নতুন গদ্যগান আরও হতো। গদ্যগানের রাস্তাটি তিনি খুলেছিলেন মাত্র, তাতে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেননি, মৃত্যু বাধা দিল।"—বুদ্ধদেব বসুর পূর্বউল্লিখিত প্রবন্ধ

৩। শেষ গান 'এসো এসো বসন্ত ধরাতলে' মায়ার খেলা থেকেই পরিবর্তিত আকারে গৃহীত

৪। গীতবিতান গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য

৫। বিদায়বরণ—শ্যামলী

পরিশিষ্ট

গীতগ্রন্থাদি

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে বিংশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে কাব্যসংগীতের যে সকল একক সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল, তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা সংকলন করা হচ্ছে। (এই তালিকায় প্রকাশিত গ্রন্থাদি জাতীয় গ্রন্থাগার এবং বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে সংরক্ষিত আছে। তাছাড়াও লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে বহু সংগীতগ্রন্থের সন্ধান মেলে।) বাঙলা কাব্যসংগীতের ইতিহাস-রচনায় এই গ্রন্থগুলিকেই আমরা প্রধানত অবলম্বন করেছি। অজস্র গ্রন্থের নামপত্র আখ্যাপত্র না থাকায় প্রকাশকাল ও রচয়িতার নাম জানা যায় না। বিষয়ভেদেও গ্রন্থগুলি সর্বদা বিন্যস্ত করা সম্ভব নয়, কারণ একই কবির কাব্যসংগীত-সংকলনে নানা ধরনের গীত সংকলিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা গীতিকবিতার বিস্তারিত ইতিবৃত্ত-রচনায় এই সকল ক্ষণায়ু কবিদের দানও অবহেলার যোগ্য নয় বলেই আমাদের বিশ্বাস। এই তালিকায় উল্লিখিত গীতকার ও তাঁদের গীতগ্রন্থ ব্যতীত বিভিন্ন অধ্যায়ে ও পরিচ্ছেদে আরও বহু গীতকার এবং গীতগ্রন্থের নাম ও প্রসঙ্গ আছে। এখানে সেগুলির পুনরুক্তি যথাসম্ভব পরিহার করা হয়েছে।

অঘোর দাস ঘোষ—বিদ্যাসুন্দর (ছাকা) টপ্‌পা

অতুল চট্টোপাধ্যায়—আনন্দোচ্ছ্বাস সংগীত

অতুলচন্দ্র ঘটক—গীতমালিকা ১৯০৭

অবনীকান্ত রায়—অবনী রায়ের গান ১৯১৫

অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য—অমরগীতি ১৯২১

আনন্দস্বামী—সর্বধর্মগীত ১৯২১

আশুতোষ ঘোষাল—গীতাবলী

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—প্রেমতত্ত্ব গীতাবলী

আবদুল হামিদ খান—বিরাগসংগীত, —প্রবোধসংগীত

ইন্দ্রনারায়ণ দত্ত—ইন্দ্রনারায়ণ গীতমালা ১৯১৬

ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য—ঈশানসংগীত ১৯২৪ ২য় সং

উদয়চন্দ্র দাস চৌধুরী—সাধক সংগীত ১৯১৪

উদয়নারায়ণ ভাদুড়ী—গীতো[illegible]

উপেন্দ্রচন্দ্র রায়—গীতাবলী ১৯১৬

এ কে কোকভ—সংগীতপরিচয় ১ম

করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায়—বঙ্গের আহ্বান ১৯১৮
কৃষ্ণানন্দ স্বামী—পরিব্রাজকের সংগীত
কালীপ্রসাদ সরকার—আত্মগীতি ১৯১৯
কালিদাস মুখোপাধ্যায়—সংগীত-লহরী ১৯০৪
কৃষ্ণকুমারী মুখোপাধ্যায়—মাতৃসংগীত
কালিদাস রায়—সমরসংগীত ১৯১৭
কালাচাঁদ রায়—ভক্তিতত্ত্ব কুসুমাঞ্জলি ১৯২৫
কালীনারায়ণ গুপ্ত—ভাবসংগীত ১৯০১
কালীনারায়ণ রায়—নারায়ণী সংগীত
কালীনাথ ঘোষ—অনুষ্ঠান সংগীত ১৯১৮
কার্তিকচন্দ্র ধর—ঠকাঠকি তর্জা ১৯২৩
কিরণচন্দ্র দরবেশ—গানের খাতা ১৯১৪
কৃষ্ণবন্ধু সান্যাল—ছুটি গান ১৯১৪
কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন—প্রবোধকৌমুদী ১৯২২
ক্ষেত্রমোহন পাল—গান
ক্ষিতিনাথ দাস—অঞ্জলি ১৯২১
কুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কুলসংগীত ১৯২১
কালীপ্রসন্ন ঘোষ—সংগীতমঞ্জরী ১৮৭২
গোবিন্দ চৌধুরী—বংশী ১৮৯৪
গোপীচন্দ্র সেনগুপ্ত—গোপীগীতমালা ১৯০৩
গোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—গীতিপুষ্পাঞ্জলি ১৯১৫
—সংগীত কুসুমাঞ্জলি ১৯২২
—প্রাণকান্ত গীতাঞ্জলি ১৯২৫
—মাতৃগীতাঞ্জলি ১৯২৬
—সংগীত পুষ্পাঞ্জলি ১৯২৫
গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী—সংগীত পুষ্পাঞ্জলি ১৯১২
—সদ্‌ভাব সংগীত ১৯০১
গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য—গীতিনির্মাল্য
গোপাল চট্টোপাধ্যায়—সাত্ত্বিক সংগীতমালা ১৯২৬
গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়—গীতহার ১৮৭৪
গৌরচন্দ্র সেনগুপ্ত—বিধবাসুহৃদ-গীতাবলী ১৯০৩
গিরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য—সংগীত-কুসুমাঞ্জলি ১৯১৪
গোপাল উড়ে—গোপাল উড়ের টপ্‌পা ১৯১০
—বিদ্যাসুন্দর গীতাভিনয় ১৯১১
চিরঞ্জীব শর্মা—গীতরত্নাবলী
কালিদাস সিংহ—সাধক সংগীত ১৮৯৯
চুনিলাল মিশ্র—ব্রহ্মসংগীত শিক্ষা (১ম)
চণ্ডীদাস গোস্বামী—সংগীত লহরী ১৯২৩
জিতেশচন্দ্র চক্রবর্তী—অর্চনা ১৯১৮
জ্ঞানানন্দ নাথ—পাগল সংগীত ১৯২৩
জ্ঞানেশ্বরানন্দ স্বামী—গীতিগুচ্ছ ১৯২৫
জনমেজয় মিত্র—সংগীত রসার্ণব
জমিরুদ্দিন—বাঙলা গজল ১৯১৪
টেকচাঁদ ঠাকুর—গীতাঙ্কুর ১৮৭১
দেবনারায়ণ দত্ত—সংগীতামৃত

দ্বিজেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত—মোহন মূরতি ১৯২৫
দেবকণ্ঠ বাগচী—কবির ঝংকার ১৯১২
দিগিন্দ্রনারায়ণ ঘোষ—পুষ্পাঞ্জলি
দীনবন্ধু—দীনবন্ধু গীতাবলী ১৯২২
দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ—উপাসনা সংগীত
(দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত)
দুর্গাগতি মুখোপাধ্যায়—গীতি-
পুষ্পাঞ্জলি ১৯১৮
ধরণী ধর—অঞ্জলি ১৯১৬
নগেন্দ্রকুমার দে—নগেন সংগীত
১৯২৭
নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী—পরমার্থ
সংগীতাবলী ১৯১৮
নবকিশোর গুপ্ত—সাধুসংগীত বা
সাধক সংগীত ১ম
নৈদের বাঁশি বৈষ্ণব—বিবিধ সংগীত
১৯২৩
নকুলচন্দ্র চক্রবর্তী—দেশের সাথী
১৯২৩
—পথের সাথী ১৯২১
ননীলাল দে—কোরক ১৯২৬
নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—নরেন্দ্র-
গীতাবলী ১৯৩২
নবদ্বীপচন্দ্র রায়বর্মা—ক্ষাত্রসংগীত
১৯১৯
নন্দকুমার মুখোপাধ্যায়—সংগীতরত্ন-
মালা
নীলকণ্ঠ—নীলকণ্ঠ গীতাবলী ১৮৭৭
নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়—নীলকণ্ঠ
পদাবলী ১৯১১

নিমানন্দ দাস—পাগল সংগীত ১৯২৬
নীরদ মিত্র—সংগীতকুসুম ১৯১৮
নির্মলানন্দ ভারতী—যুগের গান ১৯২৬
নিশিকান্ত দত্ত—সাধনগীতি ১৯২৫
নিষ্ফল চৈতন্য—শান্তি সংগীত ১৯২২
নীরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র—সংগীতসোপান
নিত্যরঞ্জন সেন—নামের মালা ১৯২৬
নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত—প্রেমাঞ্জলি
১৯১৭
ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল—গীতরত্নাবলী
১৮৮৪
মনুলাল মিশ্র—প্রাচীন ওস্তাদি কবির
গান
—ভাবলহরী গীত ১৯১৪
মনুলাল মিশ্র—ভজন সংগীত
বিশ্বম্ভর পানি—সংগীত মাধব
কুমার মহেন্দ্রলাল খান—সংগীতলহরী
পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়—সংগীতহার
মহিমচন্দ্র কিন্নর—ঢপসংগীত অক্রুর-
সংবাদ, কলঙ্কভঞ্জন, মাথুর, প্রবাস
বেণীমাধবদাস—গীতসিন্ধু
মহতাব চাঁদ—সংগীতসুধাকর
—ভক্তি গানামৃত
পূর্ণচন্দ্র সিংহ—গীতিমঞ্জরী
বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়—গীতিমালা
বলাইচাঁদ ঘোষাল—চাঁদসংগীত
ভোলানাথ ভট্টাচার্য—প্রসূনাঞ্জলি
১৯০৭
ভবপ্রীতানন্দ ওঝা—ঝুমুর রসমঞ্জরী
১৯১৭

পাারীমোহন কবিরত্ন—গীতাবলী ১৮৭৬
বোধচৈতন্য ব্রহ্মচারী—গীতাবলী ১৯২৩
মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী—হৃদয়লহরী ১৯১২
মধুসূদন দাস—সূদন সংগীত ১৮৮৩
মধুসূদন কিন্নর—ঢপকীর্তন ১৯৩৬
মহেন্দ্রনাথ দাস—বন্ধুগীতি ১৯২১
মহেন্দ্রনাথ মল্লিক—সংগীতসুধাকর ১৯১৫
মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী—সংগীতমালা ১৮৭৯
মহীউদ্দিন—পথের গান ১৯২৯
মৈত্রেয়ী—ময়নার বুলি ১৯১৫
মনীন্দ্রমোহন সেন—মনীন্দ্র গীতাঞ্জলি ১৯১৭
মনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মূর্ছনা ১৯২৩
মনোমোহন দত্ত—মলয়া ১৯১৬
পাগল ব্রহ্মচারী—সাধন সোপান ১৯২৪
পাগল গুরুদাস—আরাধনা ১৯২৬
পঞ্চানন ভট্টাচার্য—যোগসংগীত ১৯১৯
পরমানন্দ পুরী—আনন্দকানন ১৯১৪
—নির্ঝর ১৯১৪
—প্রদীপ ১৯১৪
পীতাম্বর দাস—ঝুমুরসংগীত ১৯২১
প্রবোধচন্দ্র দেবশর্মা—আন্দুল কালী-কীর্তন ও বাউল গীতাবলী ১৯২৭

প্রমথনাথ রায় চৌধুরী—গান ১৯০২
প্রমীলাসুন্দরী পাল—গীতিচয়নিকা ১৯২৬
পুলিনবিহারী লাল হাণ্ডে—পুলিন-গীতি ১৯০১
পূর্ণচন্দ্র কর্মকার—ভজনমালা ১৯০৬
মদনমোহন অধিকারী—সংগীতচন্দ্রিকা ১৮৮৪
ভোলানাথ ভট্টাচার্য—প্রসূনাঞ্জলি ১৯০৭
বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী (দ্বিজদাস)—পাগল দ্বিজদাসের গান ১৯২৫
বিজয়গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়—বিজয়-সংগীত ১৯১২
বসন্তকুমার চৌধুরী—গীতিমালা ১৯২১
প্রতাপচন্দ্র ঘোষ—মাতৃসাধন সংগীত ১৯২৬
বৃন্দাবনচন্দ্র গোপ—মায়ের গান ১৯২০
মধুসূদন মুখোপাধ্যায়—মধুর সাধন ১৯১৪
মনোমোহন রায়—পুষ্পাঞ্জলি ১৯২০
বঙ্কুবিহারী সাহা দাস—গীতরত্নাবলী ১৯১১
বিহারীলাল সরকার—গান ১৯০২
ভোলানাথ সিংহ—গীতমালা বা বিবিধ সংগীত ১৯১৮
রাজকৃষ্ণ রায়—গান
হরিমোহন মুখোপাধ্যায়—সংগীত-তরঙ্গ
হরদেব চট্টোপাধ্যায়—স্বভাব সংগীত

হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর—গীতিকুঞ্জ
রামনিধি গুপ্ত—গীতরত্ন ১২১৪
রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়—মূল সংগীতাদর্শ
যদুনাথ ঘোষ দাস—সংগীত মনোরঞ্জন
হরিজীবন প্রামাণিক—সংগীতসূত্রসার
রাধামোহন সেনদাস—সংগীততরঙ্গ ১৮৪৮
রামচন্দ্র ভট্টাচার্য—সংগীতানন্দ লহরী
—সংগীতামৃত লহরী
হরিশচন্দ্র দত্ত—সংগীত তানসেন
রামজয় বাগচী কবিরত্ন—সংগীতকুসুম ১৮৮৬
সত্যসন্ধ্যায়িনী সভা—ব্রহ্মসংগীত
হরকুমার বসু—সংগীতমঞ্জরী
সানকুল চট্টোপাধ্যায়—জাতীয় সম্মিলনী সংগীত
রামমোহন রায়—বঙ্গীয় সংগীত-রত্নমালা
যদুনাথ ঘোষাল—সংগীত মনোরঞ্জন
হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়—হারান গীতাবলী ১৯১৮
হারানচন্দ্র রক্ষিত—প্রাণের গান ১৯২৬
হরিদাস মিত্র—সংগীত লহরী ১৯১২
হরিনাথ মজুমদার (ফিকিরচাঁদ)—
ফিকিরচাঁদের বাউল সংগীত ১৯০৩
হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—সংগীতসুধা ১৯২৬
হেমেন্দ্রলাল পাল—লহরীমালা ১৯২১

হিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী—গীতিকুঞ্জ ১৯০২
হৃদানন্দ—পাগল সংগীত,
—পাগলচাঁদ গীতাবলী ১৯২৬
রামদুলাল পাল—ভাবের গীত ১৮৮২
রাধাবল্লভ সাহা—বসন্ত উৎসব ১৯২২
রজনীকান্ত মৈত্র—বসন্ত সংগীত ১৮৯৪
রাজকুমার পুরোকায়স্থ—সাধক সংগীত ১৯২৫
রাজমোহন দাস ঘটক—সাধন সংগীত ১৯২৫
রাজনারায়ণ সেন—পরমার্থ সংগীত-সার ১৮৮৩
সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী—শান্তিগীতি ১৯১২
রাজেন্দ্র দালাল—কুসুমাঞ্জলি ১৯১৪
রাজচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—সাধনা ১৯২৫
রাজকৃষ্ণ দাস দীন—গীতিপুষ্পাঞ্জলি ১৯২১
রামলাল দাস—নির্বাণ পদাবলী ১৮৯৪
রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—সংগীত মঞ্জরী ১৯০৭
শ্যামসুন্দর বাগচী—আবেগলহরী ১৯২৪
রজনীকান্ত চৌধুরী—সুষমা ১৯১৭
সীতানাথ চৌধুরী—অঞ্জলি
হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মোহন মুরতি ১৯২৭
যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ—ভাগবত গীতি-মালা ১৯২৬
হেমচন্দ্র কবিরত্ন—ধ্বনি ১৯২৫

রমেশচন্দ্র কানুনগো—গীতাঞ্জলি ১৯২২
রামদেব মিশ্র—সংগীতরত্নাবলী ১৯০৬
শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—ভক্তিসংগীত ১৯১৬
সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—উচ্ছ্বাস ১৯২৭
শ্যামাকান্ত মুখোপাধ্যায়—সাধনগীতি ১৯১
যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—যোগী-সংগীত ১৯১৩
হরিচরণ নাথ—গানের পুস্তক ১৯২৫
সুনীতি দেবী—অমৃতবিন্দু ১৯২৫
—কথকতার গান ১৯২১
হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—সংগীতসুধা ১৯২৬
শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—নিজের গান
যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—গীতাবলী ১৯১৬
শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর—ভিক্টোরীয়া গীতিমালা ১৮৭৭
শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—ভক্তিসংগীত ১৯১৫
সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস—সদ্ভাবসংগীত ১৯১৮
সুরেন্দ্রনাথ চন্দ্র—অস্পৃশ্যতাবর্জন ও বিধবাবিবাহ সংগীত ১৯২৬
উপানন্দ—আকুল সংগীত ১৯২৬
উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল—উপেন সংগীত ১৯২১
বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়—বিষাদ সংগীত ১৮৭০

খ্রীস্টধর্মবিষয়ক গীতসংগ্রহ

খ্রীষ্টসংগীত—চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
আমাদের গীত—রেভাঃ টি, কে, চ্যাটার্জি ১৮৯৯
—ধর্মগীত ১৮৪৬
—পবিত্র ক্রুশ গীতাবলী ১৯২৪
খ্রীষ্টমণ্ডলের ধর্মগীত, সংগীতমালা—রেভাঃ জে ডি মরিস ১৯২০
ধর্মসংগীত সংগ্রহ—মুক্তিসেনা ১৯১৮
ভক্তি সংগীত—রাজেন ফকির ১৯২০
খ্রীষ্টগীত—১৯২১

ইসলামী ধর্মসংগীতসংগ্রহ

ইসলাম সংগীত—মহম্মদ আবদুল ওয়াহেদ ১৯২১
প্রেম ভাণ্ডার—আবদুর রহমান ১৯২৩
—ভক্তিদর্পণ, ভক্তি ভাণ্ডার ১৯২০
জ্ঞান সংগীত—মহম্মদ নুরেল ইসলাম ১৯২৫
প্রেমতরঙ্গ—মহম্মদ ফরখদ্দিন দায়রা ১৯২৩
রুহনি সংগীতমালা—মহম্মদ আবদুল হাকিম রুহানি ১৯২৪

গীতসংকলন গ্রন্থ

গীতরত্নমালা—অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় ১৩০৩
গীতসূত্রসার—কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৯২
গীতাবলী বা রামনিধি গুপ্তের যাবতীয় গীতসংগ্রহ—বৈষ্ণবচরণ বসাক ১৩০৩
গুপ্তরত্নোদ্ধার—কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৫
পরমার্থ সংগীত—বৈষ্ণবচরণ বসাক ১৯১৬
প্রাচীন কবিসংগ্রহ—গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮৪
প্রীতিগীতি—অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল ১৮৯৮
বঙ্গভাষার লেখক—হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ১৯০৪
বঙ্গের কবিতা—অনাথকৃষ্ণ দেব ১৯১১
বাংলার গান—উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১৯০৫
বাঙ্গালীর গান—দুর্গাদাস লাহিড়ী ১৩১২
বিবিধ ধর্মসংগীত—প্রসন্নকুমার সেন ১৯০৭
বিশ্বসংগীত—বৈষ্ণবচরণ বসাক ১৩৩৪
ভারতীয় সংগীতমুক্তাবলী—নবকান্ত চট্টোপাধ্যায
মনোমোহন গীতাবলী—মনোমোহন বসু ১২৯৩
রসভাণ্ডার—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা ১৩০৬
সংগীত কল্পতরু—নরেন্দ্রনাথ দত্ত ও বৈষ্ণবচরণ বসাক ১৮৮৭
সংগীতকোষ—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৯৬
সংগীতরত্নমালা—আশুতোষ ঘোষাল ১২৯৩
সংগীত-রাগকল্পদ্রুম—কৃষ্ণানন্দ ব্যাস রাগসাগর ১৮৪৬
সংগীত-সংগ্রহ—নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ১৮৮২
সংগীত-সহস্র—গ্রন্থকারসমিতি ১৮৯১
সংগীত-সার-সংগ্রহ—বঙ্গবাসী কার্যালয় ১৮৯৯

অন্যান্য গ্রন্থ পত্রপত্রিকার তথ্যাদি পরিচ্ছেদের পাদটীকায় দ্রষ্টব্য

নির্ঘণ্ট

শুদ্ধিপত্র

অনেকগুলি মুদ্রণপ্রমাদ রয়ে গেছে। ৬৫ পৃষ্ঠায় প্রথম ছত্রে চুনিলাল মিত্র হবে চুনিলাল মিশ্র। ১৩৮ পৃষ্ঠায় ২৪ ছত্রে পরদেশী-র নাট্যকারের নাম হবে পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়। ১৫৩ পৃষ্ঠায় ২ ছত্রে ও ৪৭৮ পৃষ্ঠায় ৯ ছত্রে অবিনাশচন্দ্র ঘোষের পদবী গঙ্গোপাধ্যায় হবে। ১৭৩ পৃষ্ঠায় ২৪ ছত্রে অতুল-প্রসাদের কাব্যসংকলনের নাম গীতিগুচ্ছ হবে গীতিগুঞ্জ। ২০০ পৃষ্ঠায় ১৬।১৯ ছত্রে সঠিক নাম দুটি যথাক্রমে অক্ষয়কুমার দাশগুপ্ত ও অক্ষয়শংকর ভট্টাচার্য। ৩৭৯ পৃষ্ঠায় কড়ি ও কোমলের কাব্য-গীতির তালিকায় 'ওগো শোন কে বাজায়' (বাঁশি) বাদ পড়েছে। ৬৯৯ পৃষ্ঠায় ১০ ছত্রে 'আত্মশক্তি ও স্বদেশী সমাজ' স্থানে হবে 'আত্মশক্তি' গ্রন্থের 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ। অন্যান্য মুদ্রাকর-প্রমাদ সম্ভবত গুরুতর তথ্যঘটিত নয়, তাই সেগুলির তালিকা দেওয়া হয়নি। পাঠকবর্গের কাছে লেখক ক্ষমাপ্রার্থী।

তবে এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ২৫ পৃষ্ঠার বক্তব্য। অধ্যায়-শেষে বলা হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে রবীন্দ্রসংগীতের কালনির্ণয় ও রবীন্দ্রনাথের সংগীতশিল্পী-জীবনের রেখাবয়ব রচনা করা হয়েছে। তাছাড়া পরিশিষ্টে রবিচ্ছায়া প্রবাহিনী প্রভৃতি গীতিগ্রন্থে প্রকাশিত কবির গানগুলির তালিকা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থের আয়তন দীর্ঘ হওয়ার জন্য পরবর্তী অধ্যায় মুদ্রণকালে অনিবার্য নির্মমতায় সে প্রস্তাব বর্জিত হয়েছে। গ্রন্থে অনেক কথাই পুনরুক্ত হয়েছে—দৈর্ঘ্যের কারণেই। যেমন ১০৭ পৃষ্ঠার ৮ ছত্রে হরু ঠাকুরের একটি গানের সঙ্গে একটি রবীন্দ্রসংগীতের সাদৃশ্য ৬৪৩ পৃষ্ঠাতেও পুনরুদ্ধৃত হয়েছে। এই সব ত্রুটির জন্যও লেখক লজ্জিত।